গল্পমালা ২

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

জিজ্ঞাসা

কলকাতা ৯ ॥ কলকাতা ২৯

আত্মকথা

আত্মকথা বলা ধরতে গেলে খুবই সহজ। আর একদিক থেকে খুবই কঠিন কাজ। গ্রহণ বর্জনের পরীক্ষা আত্মকথায় বোধহয় কঠোরতর। অবশ্য লেখক সারাজীবন তাঁর নিজের রচনার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে নিজের কথাই বলেন। কখনো স্ববেশে কখনো ছদ্মবেশে তাঁর রচনার মধ্যে তিনি উপস্থিত থাকেন। তাঁর কোন লেখাই নিজের অভিজ্ঞতা কি অনুভূতি উপলব্ধির বহির্ভূত নয়।

লেখার প্রেরণা প্রথমে কোত্থেকে এসেছিল এ একটি মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর দিতে পারব এমন আশা করি না। তবে এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মুখোমুখি বসবার একটা উপলক্ষও হয়। আত্মচরিতের উৎস সন্ধানে অভিযাত্রী হতে মাঝে মাঝে কারই বা না সাধ হয়? কিন্তু চেনা পথ বলে সে পথ কম দুর্গম নয়। বরং ফিরে তাকিয়ে দেখি বহু পুরোন চিহ্ন লুপ্ত হয়ে সে পথ এক অচিন পথেরই সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখার প্রেরণা প্রথম কোত্থেকে এসেছিল এর জবাব দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তবে সন্ধানে আনন্দ আছে। যদি বলি আরো পাঁচটি প্রবণতার মত এও একটি প্রবণতা কারো কারো মধ্যে থাকে। সহজাত বলেই তাকে মনে হয়। অনুকূল পরিবেশে তা ক্রমে পরিপুষ্ট হয়। প্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা এঁকে সারা জীবনের সঙ্গিনী রূপে পান। আবার অনেকের ক্ষেত্রেই ইনি ক্ষণসঙ্গিনী। প্রেমের মতই এঁর আবির্ভাবও যেমন রহস্যময় অন্তর্ধানের পথও তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য।

প্রবণতার কথা বলছি। সেই প্রবণতা যে পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়েছিল তার দিকে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক।

আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তার পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী কুমার। এই নামটি আমার কানে বড় মধুর লাগে। শব্দটির ধ্বনির জন্যে। নামের মত এর রূপটিও স্নিগ্ধ শান্ত। বর্ষায় এই নদী প্রতি বছরই প্লাবিত হত। খাল বিল ভরে যেত। কিন্তু দু-একবার বন্যার বছর ছাড়া গৃহস্থের উঠানে কখনো জল উঠত না। তেমনি সারা বছরই নদীতে জল থাকত। চৈত্র কি বৈশাখ মাসে এ জল কোমরের নিচে নামত না।

পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।

বৃহৎ গ্রাম ছিল আমাদের সদরদি। শুনেছি সদরদি একটি গ্রাম নয়। বাইশটি গ্রামের একটি মৌজা। কিন্তু ছেলেবেলায় আমাদের আনাগোনা ছিল একটি পাড়ার মধ্যেই। সেই পাড়ায় নানা জাতের বাস। চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমনি ছিল ধোপা নাপিত কামার কুমার, ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়, জেলে জোলা আরো বহু রকমের বৃত্তিজীবী। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কি কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে এক বিশেষ ধরনের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তখন যেমন থাকত আমাদের পরিবারটি ছিল বৃহৎ আর একান্নবর্তী। সেই পরিবারে আমার বাবা ছিলেন সবচেয়ে বড় আর প্রধান পুরুষ। কিন্তু তাঁকে কেউ বড়কর্তা বলত না, বলত মেজো কর্তা। তাঁর দাদা শুনেছি পঁচিশ বছর বয়সে দুটি ছেলে মেয়ে রেখে মারা গিয়েছিলেন। আমি সেই জ্যাঠামশাইকে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে আমার জন্ম। কিন্তু যতদূর জানি তিনি বড়কর্তা হবার আগেই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তবু বাবা মেজো কর্তা বলেই পরিচিত হয়ে রইলেন।

তাঁর সমবয়সী কি সামান্য কম বয়সী বন্ধুরা তাঁকে ডাকত মেজদা বলে। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর তাঁর এই সব অনুজের আনাগোনা দেখেছি আমাদের বাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল না কিন্তু ভাবের সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ়।

আপন কাকা একজনকেই দেখেছি। তিনি ছিলেন বাড়ির ধলা কর্তা। পাড়ার ধলাদা। ধলা মানে সাদা। খুব ফর্সা রং ছিল তাঁর। দেখতেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই এই নাম।

বাবার আরো পাঁচ ভাই ছিলেন। তাঁদের আমি দেখিনি। তাঁরা সব অল্প বয়সে মারা গেছেন। কেউ কৈশোরে কেউ তারুণ্যে কেউ প্রথম যৌবনে। তাঁদের গল্প শুনতাম আমার এক ঠাকুরমার কাছে। তিনি বাবার মা ছিলেন না, ছিলেন মাতৃসমা পিসীমা। নিঃসন্তান বালবিধবা। ভাইপোদের লালন-পালন করেছেন। তাঁর মুখে আমার সেই মৃত কাকাদের কাহিনী শুনতাম। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন বিষম ক্রোধী আর তেজস্বী পুরুষ। কেউ বা অল্প বয়সেই যোগ সাধনার অভ্যাস করেছিলেন। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে মনে হত যেন রূপকথা শুনছি। আমাদের সেই ঠাকুরমাকে আমরা ভাই বলে ডাকতাম। সেই ভাইয়ের স্নেহ স্মৃতিতে আমার মৃত কাকারা আবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠতেন।

সবচেয়ে জীবন্ত প্রাণবান পুরুষ ছিলেন আমার বাবা। এমন পুরুষ মূর্তি আমি আর জীবনে দেখিনি। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাধারে যেমন বৈষয়িক ছিলেন তেমনি ছিলেন শিল্পরসিক। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মার্গসঙ্গীত রাগসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল। অথচ কোন ওস্তাদের কাছে তিনি বিধিবদ্ধভাবে গান শেখেননি। সেই সঙ্গতি তাঁর ছিল না। শুনেছি অল্প বয়সে একটি বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে তাঁর জীবনসংগ্রাম ছিল কঠোরতর।

শুধু গান নয় তিনি অভিনয় করতে পারতেন। ভালোবাসতেন তাস পাশা খেলা। যখন খেলতে বসতেন খেলার মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে যেতেন মনে হত না তিনি কাজের মানুষ। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথোপকথনে কৌতুক রস ঢেলে দিতে জানতেন।

তাঁর সাহিত্যপ্রীতিও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী তাঁকে পড়তে দেখেছি।

লেখালেখির মধ্যে তিনি চিঠিপত্র ভালো লিখতে জানতেন। আর দলিলপত্রের মুসাবিদায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পেশায় তিনি মুহুরী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেরেস্তার উকিল ছিলেন বহু বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভরশীল। সমব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

এই কোমলে কঠিনে গড়া একই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি আর শিল্পবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ বহুকর্মা পুরুষটির প্রায় কিছুই আমি পাইনি। না তাঁর আকার না তাঁর প্রকৃতি। শুধু সাহিত্যপ্রীতি, শুধু যৎসামান্য লেখার শক্তি। শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।

আমি বাবার মত হইনি এ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই আমি সচেতন ছিলাম। আমার চার দিকের উচ্চারিত অনুচ্চারিত মন্তব্য আর মনোভাব আমাকে সচেতন করে তুলেছিল। বাবা ছিলেন আটপিঠে মানুষ। দরকার হলে যেমন কোদাল কুড়ুল চালাতে পারতেন, তেমনি কলম চালাতেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু গাঁয়ের ছেলে হয়েও আমি না পারি গাছে উঠতে, না পারি নৌকো বাইতে। আরো এমন হাজার কাজ পরি না যা আমার ছোট ভাই পারে, যা আমার সমবয়সীরা এমন কি কম বয়সীরাও পারে। বাবা যেমন সামাজিক মানুষ, বলতে কইতে ওস্তাদ. আমি ঠিক সেই পরিমাণে লাজুক মুখচোরা কুনো স্বভাবের।

আমার ছোট মামীমা দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি সুরসিকা। সেই আমলের তুলনায় লেখাপড়াও মোটামুটি ভালোই জানতেন। তিনি মানিকদি থেকে আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসে বাবাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'ঠাকুরজামাই, খুব যে বাবা বাবা করে ছেলেকে আদর করছেন। আপনার বাবা কিন্তু তার বাবার মত হয়নি।' শুনে বাবার মুখখানা মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বউঠান, একজন কি আর একজনের মত হয়?'

হয় না। অন্তত সব সময় হয় না। কিন্তু প্রত্যেক বাপের মনেই বোধহয় সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে

ছেলে তাঁর সদ্‌গুণগুলির অধিকারী হোক। ছেলের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি দেখতে চান।

বাবার সেই আশা পূর্ণ হয়নি। আমি তা মুহূর্তে মুহূর্তে টের পেতাম। তাঁর নৈরাশ্য যেন আমারও নৈরাশ্য। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম, পিতৃগৌরবে গৌরব বোধ করতাম। আমাদের ওই অঞ্চলের মধ্যে তিনি নিজের ধরনে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর জন্যে আমার গৌরব ছিল। কিন্তু তাঁর এই নৈরাশ্য ভিতরে ভিতরে আমাকে পীড়িত করত। মাঝে মাঝে বিদ্বিষ্ট বিরূপ করে তুলত। আমি তাঁর যত কাছে ছিলাম, তত দূরে। তাঁর চারদিকে লোকজনের ভিড় থাকত আমি সরে আসতাম নির্জনে ঘরের কোণে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই নৈরাশ্য আর অসহায় নিঃসঙ্গতাই কি আমাকে কাগজ-কলমের আশ্রয় নিতে শিখিয়েছিল ?

অথচ বাবা আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যখন আমি বেশ বড় হয়েছি তখনো পাশাপাশি শুয়ে মাঝে মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতেন। আমার দিকে পিছন ফিরে বলতেন, 'তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, আরো কাছে এসে জড়িয়ে ধর।'

আমরা অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকতাম। পরে মাঝে মাঝে আমি ভেবেছি নিজের দুর্বলতম অঙ্গকে মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখতে চায়, মানুষ যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসে, একি সেই ভালোবাসা ?

কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণার মূলে শুধু নেতিবাদের একাধিপত্য মেনে নিতেও আমার মন সায় দেয় না। যা অস্মিতাসূচক যা সম্ভাববাচক বাল্যে কৈশোরে তাও কি আমি প্রচুরভাবে দু হাত ভরে পাইনি ? একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুরমা, মা, জেঠীমা, কাকীমাদের স্নেহ, সযত্ন মনোযোগ কি আমার চারদিক ঘিরে থাকেনি ? আমি যে তুচ্ছ নই, ফেলনা নই সেই বোধ আমার মনে জাগিয়ে রাখেনি ? আমি যেমন বর্জন করেছি বর্জিত হয়েছি তেমনি কি গৃহীতও হইনি ? গ্রহণও করিনি ? মনে পড়ে ছেলেবেলায় ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে তাঁর বিছানায় ডেকে নিতেন। একের পর এক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন, আবৃত্তি করাতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিৎ হয়ে গান গাইতেন। শুনতে শুনতে অনেক গানের কথাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কতদিন আমি কথা বলে দিয়েছি, তিনি গেয়েছেন। আমার পছন্দ মত গান তিনি খুশি হয়ে গেয়েছেন।

ভাবতে ভালো লাগে জীবনপ্রভাতে সেই গীতগুঞ্জিত ভোরবেলাগুলি আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই সুর কণ্ঠে ধরা দেয়নি। কলমে কিছুটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমার বাল্যশিক্ষক অক্ষয়কুমার শীল থাকতেন আমাদের পাশের বাড়িতে। দুই বাড়ির মাঝখানে ছিল অন্ধকার বাঁশের ঝাড় আর বড় একটা এঁদো পুকুর। তারই পাশ দিয়ে ছিল ছায়াচ্ছন্ন যাতায়াতের পথ। সেই পথে মাস্টারমশাই কতবার যে যাতায়াত করতেন তার ঠিক নেই। বাড়ির কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরে আসতেন। বাবাকে ডেকে বলতেন, 'ভাই মহেন্দ্র, আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

বাবা হেসে বলতেন, 'তোমার মনের কথার কি আর শেষ আছে মাস্টার ?'

অক্ষয় মাস্টার শুধু শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি আমাদের ওই অঞ্চলের মধ্যে একজন নামকরা কীর্তনীয়াও ছিলেন। তাঁর নিজের একটি কীর্তনের দল ছিল। বছরের প্রায় সব সময় তাঁর দলবল বাড়িতে লেগে থাকত। দাম্পত্য কলহও লেগে থাকত সারা বছর। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে খোল করতালের বোল ভেসে আসত, কীর্তনের কলি ভেসে আসত বাঁশবন পেরিয়ে।

ছিপছিপে চেহারার এই মানুষটি খুব কড়া মাস্টার। রাগলে তাঁর মুখ থেকে যে-সব ভাষা বেরোত তা অশ্রাব্য। কিন্তু সেই মানুষই যখন কীর্তনের আসরে নামতেন তখন শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

আমি বই শ্লেট নিয়ে তাঁর বাড়িতে পড়তে যেতাম। মাস্টার হিসাবে তাঁকে দারুণ ভয় করতাম, কিন্তু অভয়রূপ দেখতাম কীর্তনীয়ার মধ্যে।

শ্লেট পেনসিলে তাঁর কাছেই আমার হাতেখড়ি। মনে পড়ে প্রথম যেদিন ক লিখতে শিখলাম তিনি আমাকে কোলে করে নিয়ে এলেন সেই বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ডেকে বললেন, 'ভাই মহেন্দ্র, দেখ, তোমার ছেলে ক লিখেছে।'

চেয়ে দেখলাম তাঁর দুটি চোখ ছল ছল করছে। সেই আনন্দাশ্রুর হেতু সেদিন বুঝতে পারিনি। এই প্রবীণ শিক্ষক জীবনভর কত শত নিরক্ষর ছেলেকে সাক্ষর করে তুলেছেন. এই ক অক্ষর তো তাঁর কাছে নতুন নয়। না কি সেই ক নিত্য নতুন। প্রতিটি ছাত্রের প্রথম ক অক্ষরের মধ্যে সেই শিক্ষকেরও যেন প্রথম বর্ণপরিচয়।

আমাদের কুলধর্মও ছিল বৈষ্ণব। বাবা মা খড়দহের গোস্বামী বংশের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁদের সেই দীক্ষাগুরুকে আমি দেখিনি। দেখেছি গুরুপুত্রদের। ওরা কেউ না কেউ বছরে একবার করে আসতেন। কোন কোনবার এক সঙ্গে দু-তিন জনও আসতেন। তাঁরা যখন আসতেন বাড়িতে উৎসবের ধূম পড়ে যেত। সেই উপলক্ষে পাড়া-পড়শীরা সব আসতেন। পুবের ঘর আর দুদিকে দুখানি বারান্দা প্রায় সারাদিন লোকজনে ভরা থাকত।

এঁদের একজনের নাম ছিল ব্রজকিশোর গোস্বামী। তিনি আমাদের খুব স্নেহ করতেন। দেখতে ভারি সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর। কপালে তিলক সেবা। হাতে জপমালার লাল রঙের থলি।

একদিনের কথা মনে পড়ে। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বসালেন।

দিদিভাই সামনে ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও কি করছেন ? পাপ হবে যে।'

বাবার পিসীমাকে পিসীমা বলেই ডাকতেন ব্রজকিশোর। তিনি হেসে বললেন, 'না পিসীমা পাপ হবে না। শিশুর আবার পাপ কিসের।' তারপর নিজের মনেই যেন বললেন, 'বড় হয়ে এরা কি আর আমাদের কাছে আসবে ? আমাদের কাছে দীক্ষা নেবে ?'

দীক্ষা সত্যিই নিইনি। ও পাট বাবা কাকাদের আমলেই শেষ হয়েছিল। বড় হয়ে গুরু পুরোহিততন্ত্রের অনেক সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর সস্নেহ ব্যবহারটুকুর কথা এখনও মনে আছে।

একথা অস্বীকার করবার জো নেই আমার মন সেই কীর্তন, ভাগবতপাঠ, পূজাপার্বন, যাত্রা, কবি, কথকতার মধ্যে রসের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন চাকলাদার ঠাকুরদা। বাবার মামা হতেন তিনি। আমার লেখকজীবনের প্রথম পর্বেই তাঁকে নিয়ে আমি গল্প লিখেছি। পরে পিছে ফিরে দেখা পর্যায়ের লেখাগুলিতেও তাঁর কথা বলেছি। এখানেও সংক্ষেপে একটু বলে রাখি।

ঠাকুরদার অনেক গুণ ছিল। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারতেন। গান বাজনা জানতেন। বিশেষ করে তবলায় তাঁর হাত খুব ভালো ছিল। তাঁর কথাবার্তা ছিল কৌতুকস্নিগ্ধ। প্রয়োজনীয় কত কিছুই তিনি জানতেন। অপ্রয়োজনের কাজও কম জানতেন না। হাউই তুবড়ি চরকি নানারকমের আতসবাজি তৈরি করতে পারতেন তিনি। তাঁর গুণপনার যেন শেষ ছিল না। ছিল না শুধু একটি গুণ। বিষয়বুদ্ধি। আর কোন গুণপনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা। শুনেছি তিনি কলকাতায় গিয়েও নানা রকমের চাকরি করেছিলেন কিন্তু কোন কাজেই টিকে থাকতে পারেননি। কোন কাজেই তাঁর মন বসেনি। আসলে মনটা ছিল তাঁর ভবঘুরে ধরনের। ভুল করে গৃহস্থ হয়েছিলেন। সে গৃহ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি।

আমাদের বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে আসবার সময় তিনি নানা জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। মাছধরা জাল, ছোট বড় কয়েকখানা দা, একখানা রামদা, বাঁয়া তবলা—অগুনতি জিনিস। সেই সঙ্গে এনেছিলেন বড় একটি কাঠের বাক্স বোঝাই বই। সেই বাক্সে হরেক রকমের বই ছিল। তবলা তরঙ্গিনী, আতসবাজি প্রস্তুত প্রণালী, ম্যাজিক শিক্ষা। আর ছিল রামায়ণ, মহাভারত, মাইকেল গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ আরো অনেক বই। এখন যাঁরা বিস্মৃতনামা, তাঁদের বহু নাটক উপন্যাস।

আমাদের গাঁয়ের এম্ ই স্কুলে পড়বার সময়ই আমি তাঁর এই বইয়ের বাক্সটি দখল করেছিলাম। তিনি আপত্তি করেননি। কি করলেও অন্য কারো সামনে লোক দেখানো আপত্তি।

আমাদের কাঁঠালতলার ছায়ায় বসে চটি (বাঁশের বাঁখারি) চাঁছতে চাঁছতে তিনি মেঘনাদ বধ আর পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন সেই কথা আজ মনে পড়ে।

আবার কাজ করতে করতে কবিগানও গাইতেন।

"পাগলা মনটা আমার
বিরজা নদীর কূলে থেকে না জানো সাঁতার।"

কাজ করতে করতে এই ধূয়ার সঙ্গে নতুন পদ তৈরি করে কবে ঠাকুরদা গান গাইতেন। যিনি সংসারের আর পাঁচজনের মত নন সেই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষটির প্রতি আমি দারুণ আকর্ষণ-বোধ করতাম। তাঁর কাছ ছেড়ে নড়তে চাইতাম না।

চাকলাদার ঠাকুরদার সান্নিধ্যে আমি ভারি আনন্দ পেতাম। বাড়ির অন্য কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললে আমি ক্ষুব্ধ হতাম। প্রতিবাদ করতাম।

বাবার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন তিনি। বাবা তাঁকে ঠাকুরমামা বলে ডাকতেন। কিন্তু মামা ভাগ্নের মধ্যে প্রকৃতির মিল ছিল না। মামার চালচলন তাঁকে মাঝে মাঝে ধৈর্যহীন করে তুলত। বিরূপ মন্তব্য করে বলতেন, 'উনি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন।'

আমার কিন্তু এই নিস্ফল অসার্থক মানুষটির ওপর গোপনে গোপনে দারুণ সহানুভূতি ছিল। তিনি কত কাজ জানতেন। আমি কিছুই জানতাম না। বা এখনও জানি না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি এক ধরনের সাদৃশ্য অনুভব করতাম। কোন কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে না পারার সাদৃশ্য।

কবে যে প্রথম লিখতে শুরু করি তার সন তারিখ কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাল্যরচনার সেই বিষয়বস্তুও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

মনে পড়ে ঠাকুরদার সেই আমকাঠের বাক্সের মধ্যে একখানি পৌরাণিক নাটক পেয়েছিলাম 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ'। সে বইয়ের গোড়ার দিকটাও ছিল না শেষের দিকটাও ছিল না। তবু সেই নাটকের অনুকরণে আমিও একটি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

আর একবার আমাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখেছিলাম ডায়েরির মত করে। তখন আমি ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের বড়দা (আমার জ্যেঠতুতো ভাই) সেই সময় যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। এই নিয়ে দিন-কয়েক ধরে যে নানারকম আলাপ আলোচনা কথান্তর মতান্তর বাদানুবাদ হয়েছিল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিদিন লিখে যাচ্ছিলাম। আমি কী লিখছি সে সম্বন্ধে বাবা খুব কৌতূহলী ছিলেন। ভাঙ্গার সেরেস্তা থেকে ফিরে এসে প্রতি রাত্রেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'দেখি কী লিখেছিস।'

যে পিতৃহীন ভাইপোকে তিনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কলকাতায় ভালো চাকরি পেয়ে বিয়ে থা করে সে পৃথক হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে বাবার মনে অশান্তি কম ছিল না। তবু আমি কী লিখলাম, এই পারিবারিক ঘটনা আমার মনে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সে সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ ঔৎসুক্য ছিল। তাঁর কাছে আমারও কোন সংকোচ ছিল না। যা লিখেছি সব তাঁকে পড়তে দিতাম। খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে আমার রচনার প্রথম পাঠকের মুখের দিকে আমি সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর মুখে কখনো হাসি ফুটত, কখনো সেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত। কারণ আমার সেই লেখায় পিতৃচরিত্রের সমালোচনাও ছিল। বাবা পড়তে পড়তে বলতেন, 'হুঁ। কিন্তু তোমার বানান এত ভুল হয় কেন?'

আমি ভাবতাম বানান ভুলটাই কি বড় কথা?

যৌথ পরিবারের সেই ভাঙন আমার কৈশোর মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল পৃথগন্ন হয়ে বড়দা যেন সত্যিই আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেলেন! অনাত্মীয় হয়ে গেলেন। আলাদা হয়ে গিয়ে জেঠীমা আর আমাদের তেমন ভালোবাসবেন না, বউদি আর তেমন করে গল্প করবেন না। এই ধরনের আশঙ্কা আমার মনকে ছেয়ে রেখেছিল।

আমার চেয়ে বিশ বছরের বড় এই বড়দাকে আমরা দারুণ ভালোবাসতাম। তিনি ছিলেন আমাদের চোখে হিরো। বংশের মধ্যে তিনিই প্রথমে কলেজে পড়েছিলেন। কলকাতায় গিয়ে বৃটিশ মার্চেন্ট অফিসে স্থায়ী চাকরি করেছিলেন। পুজোর ছুটিতে যখন বাড়ি আসতেন আমাদের প্রত্যেকের জন্যে জামাকাপড় নিয়ে আসতেন সঙ্গে। বড়দাও অভিনয় করতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন। তাঁর মুখেই প্রথম শুনি রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি। তিনি আমাদের আবৃত্তি

শেখাতেনও। বিদেশী উপন্যাস পড়ার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। সেই সব উপন্যাসের কাহিনী তিনি আমাদের মুখে মুখে শোনাতেন।

ভালো চিঠি লিখতে পারতেন বড়দা। তাঁর হাতের লেখা ছিল যেমন সুন্দর, লেখার মধ্যেও তেমনি ছিল মুনশীয়ানা। খুব ছেলেবেলায় আমি তাঁর চিঠির উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম না। বাবা কি কাকা বলে বলে দিতেন আমি লিখতাম। কিন্তু তাঁদের সেই ডিকটেশন সব সময় যেন আমার মনঃপূত হত না। কাকা মাঝে মাঝে ধমক দিতেন, 'কী হল তোর, নিজেও লিখতে পারবি না, আবার আমি যা বলব তাও তোর পছন্দ হবে না। এ তো মহাজ্বালা।'

কিছুকাল পরে অবশ্য ওঁদের কাউকে আর জ্বালাতাম না। যেমন করেই হোক নিজের চিঠির জবাব নিজেই দিতাম।

চিঠি লেখা ছিল বড়দার অন্যতম বিলাস। কলকাতা থেকে তিনি সবাইকে চিঠি লিখতেন। বউদিকেই অবশ্য বেশি চিঠি লিখতেন। ঘন ঘন মোটা মোটা চিঠি আসত তাঁর। গ্রামের ডাকঘর থেকে আমিই সেই চিঠি নিয়ে আসতাম।

বউদি খামের মুখ ছিঁড়ে ছোট চিঠিটা আমার হাতে দিতেন। কিন্তু তাঁর কাছে লেখা কয়েক পাতা জোড়া চিঠি কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না।

বউদি আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। একই উপন্যাস কাড়াকাড়ি করে ভাগাভাগি করে পড়তাম।

একদিন আমি দাবি করলাম, 'বউদি তোমার কাছে বড়দা কী লিখেছে দাও না একটু দেখি।'

বউদি হেসে বললেন, 'হুঁ, তোমাকে আমার ওই চিঠি দেখাই। পাকা ছেলে কোথাকার।'

তবু আমি কাড়াকাড়ি করে কিছুটা দেখেছিলাম। একটি সম্বোধন ভারি অপূর্ব আর মধুর লেগেছিল, 'প্রাণের কুসুম'। ভেবেছিলাম ঠিক ওইরকম সম্বোধন করে আমি কবে কাকে চিঠি লিখতে পারব।

বড়দা একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমি শুধু চিঠিতেই সাহিত্যচর্চা করে গেলাম। তার বেশি আর এগোল না। তুমি লিখছ। আরো লিখবে, তুমি হবে আমাদের বংশের প্রথম লেখক।'

আমারই বা বেশিদূর এগোল কই।

বড়দার জীবনপ্রবাহ বড় বিচিত্র। একসময় তিনি ছিলেন খুবই সম্ভোগী পুরুষ। সংসারের ভোগ সুখে তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। পরে তিনি সেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বিরূপাক্ষের নামান্তর রূপান্তর ঘটেছিল স্বামী কৃষ্ণানন্দে। সম্প্রতি তাঁর লোকান্তর হয়েছে।

তাঁর বিচিত্র জীবননাট্য নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে লেখার ইচ্ছা আছে। পরে একদিন লিখব।

পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে কৈশোরে তারুণ্যে আমার আরো একজন সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী দিগিন্দ্রনাথ রাহা। তিনি বড়দারই প্রায় সমবয়সী। দুই পরিবারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। দিগিনকাকা ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। পাশা খেলতে যেমন ভালোবাসতেন, সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর তেমনি অনুরাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে পছন্দমত অংশগুলি তিনি পড়ে পড়ে শোনাতেন। পঠিত বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন আলোচনা করতেন। চাকলাদার ঠাকুরদা আর আমি সেই আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতাম।

ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে যখন পড়ি আমরা ক্লাসের কয়েকজন বন্ধু মিলে একখানি হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলাম। সেই পত্রিকার নাম ছিল আহ্বান। ক্লাসের সেরা ছাত্র শান্তি মুখার্জি—ভালো নাম সুখেন্দু—ছিল সেই পত্রিকার সম্পাদক। আর আমি ছিলাম ঔপন্যাসিক। আমার সেই ধারাবাহিক উপন্যাসের নাম ছিল মুক্তার হার। কিন্তু সেই হার পুরোপুরি গাঁথা হবার আগেই কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। সে উপন্যাস আর শেষ করা হল না। সেই লেখার বিষয়বস্তু ভুলে গেছি। মনে করে রাখবার মত গুরুত্বও তাতে ছিল না। কিন্তু মুক্তার অক্ষরে গাঁথা হয়ে আছে সেদিনের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা সাহিত্যচর্চা আর বন্ধুসান্নিধ্য।

প্রায় একই সময় আমাদের গ্রাম থেকে আমরা একখানা হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলাম। সে কাগজের নাম ছিল মাসিক মুকুল। আমার ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র তার ব্যবস্থাপক, সহযোগী

খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্র। আমি সম্পাদক। আর আমার বন্ধু কৃষ্ণদাস বৈরাগী একাধারে ছিল সেই কাগজের কবি চিত্রকর আর লিপিকর। কৃষ্ণদাস সেই পত্রিকার কয়েকখানি করে কার্বন কপিও তৈরি করত। সেগুলি বিতরিত হত পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামান্তরেও। দু-এক কপি বিক্রীতও হয়েছিল বলে মনে পড়ে। চার আনা ছিল তার দাম।

কৃষ্ণদাস প্রথমে লেখক ছিল না, ছিল গায়ক। চমৎকার গান গাইতে পারে বলে তাকে সবাই ভালোবাসত। কিন্তু আমি কী করে খোঁজ পেলাম তার লেখারও অভ্যাস আছে, ছবি আঁকারও অভ্যাস আছে। তাকে ডেকে বললাম, 'কেষ্ট, এই কাগজে তোমাকে লিখতে হবে।'

কৃষ্ণদাস সানন্দে রাজি হল। সে আমার চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছ' বছরের বড় ছিল। আমি যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র সে তখন পাশের চোমরদি গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে সে আমার আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। খুব অনুগত ছিল কৃষ্ণদাস।

আরো একজনকে ডেকে এনেছিলাম সাহিত্যের আসরে। সে আমাদের কার্তিক দেউড়ী। জাতিতে ছিল সে সাহা, বৃত্তিতে কুমার। প্রতিমা গড়ত, দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী শীতলা মনসা আরো নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়ত কার্তিক। মাটির প্রতিমা বছর বছর গড়ত আর পুজোর পরে সেগুলি বিসর্জিত হত। জলে বিলীন হয়ে যেত সেই সব প্রতিমা।

আজ দেখি সেই মৃৎশিল্পীব সঙ্গে আমাদের মত অনেক বাকশিল্পীরও বিশেষ কোন তফাৎ নেই। আমরাও জীবনভর কয়েকখানি মূর্তি বার বার গড়ি আর সেই মূর্তি স্মৃতির অতলে বিসর্জিত হয়।

কারিগর হিসাবে কার্তিক ক্রমে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল।

আমি একদিন তার বাড়িতে গিয়ে বললাম, 'কার্তিকদা, তোমাকে আমাদের কাগজের জন্যে ছবি এঁকে দিতে হবে।'

কার্তিকদা হেসে বলল, 'তুমি তো আচ্ছা পাগল পল্টু। আমি কি তুলি ধরতে জানি না কলম ধরতে জানি? সবাই কি সব কাজ পারে?'

শেষ পর্যন্ত কার্তিকদা কিন্তু আমাব অনুরোধ রেখেছিল। কাগজের জন্যে ছবি এঁকে দিয়েছিল দুখানা। কবিতাও লিখেছিল দুতিনটি। আমার দাবি ছিল নিজের জীবন নিয়ে সে গল্প লিখবে। কার্তিকদা বলল, 'আমি পারব না তুমি লিখো।'

আমারও লেখা হয়নি। সবাই কি আর সব লিখতে পারে? যে কোন লেখকেরই অলিখিত রচনার তুলনায় লিখিত রচনা সামান্য।

সেই অল্প বয়স থেকেই গ্রামের যারা নানা মাধ্যমের শিল্পী তাদের সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করতাম। তাদের আমি সমাদর করতাম। তাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত। সবাইকে পারিনি কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।

লেখা ছাপা হবার আগে আরো দুখানি ক্ষণজীবী হাতে-লেখা কাগজের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছিলাম।

ফবিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়বার সময় আলাপ হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে গিয়ে পৌঁছল। সাহিত্যচর্চায় পরস্পরের সঙ্গী হলাম আমরা। দুজনে মিলে বের করলাম একখানি হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা। নাম নারায়ণই দিয়েছিল জয়যাত্রা। নারায়ণের হাতের লেখা ভালো। তাই সেই হল লিপিকর। নিখিলের চিঠি নামে আমি শুরু কবলাম একখানি পত্রোপন্যাস। নারায়ণ কবিতা গল্প প্রবন্ধ সবই লিখতে লাগল। আমিও তাই। কাবণ সেই কাগজে আমরা দুজনেই ছিলাম প্রধান লেখক। সম্ভবত পাঠকও। সেই যাত্রা দু চার পায়ের বেশি এগোয়নি।

অন্য একদল বন্ধুকে নিয়ে আরো একখানি হাতে-লেখা কাগজ বার করেছিলাম। এবার আর জয়যাত্রা নয়, অভিসার। সেই গোপন পথের সঙ্গী ছিল সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অচ্যুত গোস্বামী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রণেন মজুমদার আর শান্তিপ্রিয় ঘোষ। শান্তিবাবু আমাদের চেয়ে তিন বছরের সিনিয়র ছিলেন। তিনিই ছিলেন সম্পাদক। তিনি একটি কল্পিতা সঙ্গিনীকেও গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'শ্যামলী সেন'।

আমি বললাম, 'এই শ্যামলীকে আবার কোথায় পেলেন ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

শান্তিবাবু জবাব দিলেন, 'চোখ বুজুন, তাহলে দেখতে পাবেন।'

সেই অভিসার পত্রিকায় আমাদের সব দুঃসাহসিক লেখা বেরোত। আর সমালোচনাও হত তীব্র রকমের। আমরা উপভোগ করতাম।

দু' তিন সংখ্যা বেরোবার পর সেই অভিসারও নিঃসাড়ে থেমে গেল।

আমরা ইতস্তত ছিটকে পড়লাম। আমি এসে ভর্তি হলাম কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে। পুরোন বন্ধুদের কেউ আমার সঙ্গে এল না। নারায়ণ গেল বরিশালে। সত্যেন আর অচ্যুত ফরিদপুরেই রয়ে গেল।

এই হল আমার লেখক-জীবনের অমুদ্রিত প্রস্তুতিপর্ব। এই পর্বই বড় করে লিখলাম। দ্বিতীয় পর্বে মনে হয় এত কথা লেখার থাকবে না।

আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সনের 'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম মুদ্রিত রচনা কবিতা। তখন বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ পড়ি। থাকি বউবাজারের একটি দ্বিতল মাঠকোঠায়। গির্জার ধার দিয়ে সরু গলি। সেই গলির মধ্যে ডানদিকের দোতলা ভাড়াটে বাড়িটায় তখন তিনচার ঘর ভাড়াটে থাকত। আমি যাঁদের বাড়িতে থাকতাম তাঁরা দূর সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হতেন। গ্রামে ওঁরা ছিলেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে প্রমদা ঘোষ। আমার নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতেন। অসুখবিসুখে সেবা করতেন। তাঁদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু আদরযত্নে আন্তরিকতা ছিল। তাঁর স্বামী কুঞ্জ ঘোষের ছোট্ট একটি ফার্নিচারের দোকান ছিল বউবাজার স্ট্রীটে। সারাদিন তিনি সেই দোকানে কাজ করতেন। শিরিষ কাগজ ঘষে ঘষে মসৃণ করতেন টেবিল চেয়ার। পালিশ করতেন নিজের হাতে। দোকান বন্ধ করে রাত্রে যখন ফিরতেন খুব সস্তার জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন হাতে করে। একদিন একটি ছোট আর শুকনো কমলালেবু আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পল্টু খাও।'

দিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'তুমি কি এগুলি পয়সা দিয়ে কিনে এনেছ না কুড়িয়ে এনেছ ? ওই লেবু আবার মানুষ মানুষকে দেয় ?'

রোগা অস্বাভাবিক লম্বা আধময়লা ধুতি আর ফতুয়া পরা মানুষটি স্ত্রীর ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে হাসলেন, 'দেখ দেখ, কী বলে।'

কৃপণ ছিলেন কুঞ্জ ঘোষ। তবু তাঁরও দাতা হবার সাধ হত।

তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড়টি ছিল বোবা। মেজোটি চোখে মুখে কথা বলত। রাধার পুরো নাম ছিল রাধিকামোহন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় ছিল। ছেলেবেলায় ওরা যখন গাঁয়ের বাড়িতে যেত, আমরা একসঙ্গে খেলতাম টেলতাম। সেই খেলার সঙ্গী এখন আমার ছাত্র হয়ে গেল। পড়াশুনোয় ও খুবই পিছিয়ে পড়েছিল। আমি যখন কলেজে ও তখনো স্কুলের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তাই ওর ওপর মাস্টারি করার আমার অধিকার আছে। দিদিও তাই বলে দিয়েছিল। রাধার ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কেষ্ট। আমি ওদের দুজনকে পড়াতাম। বিনিময়ে আমার বাসাহারের ব্যবস্থা হত। কিন্তু ব্যাপারটা উচ্চারিত ছিল না।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে উঠতে হত। নিচে রান্নাঘরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। ওপরের ঘরটি থাকবার। সেই ঘরে আমরা সবাই থাকতাম। সামনে এক ফালি বারান্দাও ছিল। সেখানে কেউ কেউ শুত।

সেই কাঠের ঘরে বসে ছোট্ট এক জোড়া টেবিল চেয়ার সামনে নিয়ে আমি পড়তাম পড়াতাম আর গল্প কবিতা লিখতাম।

রাধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। মাঝে-মাঝে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কী লিখিস রে দিনরাত ? এ তো তোর কলেজের লেখা নয়।'

'কী করে বুঝলি ?'

'ওকি আর বুঝতে বাকি থাকে ?'

রাধার পড়াশুনোর দিকে বেশি ঝোঁক ছিল না। খেলাধুলো সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি এই সবই

ভালোবাসত। তবু লেখাটাকে একটা বিশেষ গুণ বলে স্বীকার করত। ওর বন্ধুমহলে আমার কথা বলে বেড়াত।

আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা কবিতা। ১৯৩৬ সনের দেশে বেরিয়েছিল। তখন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দেশের কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন। তিনি পর পর আমার আরো অনেক কবিতা ছেপেছিলেন। তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে আমার কবিতার মিল ছিল না। তবু তিনি আমার কবিতা পছন্দ করতেন। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর সে-কথা আমাকে বলেছিলেন।

প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম ছিল 'মূক'। কবি যে মেয়েটিকে ভালোবাসে. তার কাছে বার বার যায়, কিন্তু বলি বলি করেও মনের কথা বলতে পারে না, এই ছিল কবিতাটির বিষয়বস্তু।

সে যাই হোক আমার নিজের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ওই নামটি যে এমন সার্থক হবে তা কখনো ভাবিনি। যদিও সেই '৩৬ সনের পর থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে কবিতা লিখেছি. তবু সেই ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, এখন তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তাঁরাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি। কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোন রচনায় যায় না।

১৯৩৯ কি '৪০ সনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একযোগে আমার ছোট্ট একখানি কাব্যসংকলন বেরিয়েছিল. নাম ছিল জোনাকি। তার অনেকদিন পরে আমার স্বতন্ত্র একখানা কবিতার বই বেরোয়। নাম দিয়েছিলাম নিরিবিলি।

আমার প্রথম উপন্যাসের নাম দ্বীপপুঞ্জ। এই বইখানি বেরোয় ১৯৪৭ সনে। তার চার বছর আগে ১৯৪২ কি '৪৩-এ বইখানি হরিবংশ নামে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। তখন সাগরময় ঘোষ দেশের সহকারী সম্পাদক। তিনিই চেয়েছিলেন সেই ধারাবাহিক উপন্যাস। ধারা যাতে নিয়মিত বহন করি, তার জন্যে তিনি রীতিমত তাড়া লাগাতেন।

এই বইয়ের পটভূমি ছিল গ্রাম। গ্রামকে কেন্দ্র করে গল্প অনেক লিখেছি, কিন্তু উপন্যাস দু-তিনখানার বেশি লিখিনি।

হরিবংশে আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। দোকানপাট ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্যই ছিল এদের জীবিকা। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে যে শহরটি আছে, তার নাম ভাঙ্গা। কে জানে কেন এই নাম হয়েছে। কুমার নদীর দুই ধারে শহরের দুই টুকরো পড়েছে বলেই কি? খেয়া নৌকোয় ছিল পারাপারের ব্যবস্থা। আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। কেউ বড় দোকানের মালিক, কারো দোকান ছোট ছোট। কারো বা দোকানঘর আছে. গুদামঘর আছে, কেউ বা বাজারের মধ্যেই চট বিছিয়ে বসে যায়। রোজ সকালবেলায় বাজার বসে। হাট বসে সোমবার শুক্রবার। ধুলো ওড়ে, শুকনো লঙ্কা আর তামাক পাতার গন্ধ পাওয়া যায়। সেই হাট আর বাজার ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। বাবা কাকা কি চাকলাদার ঠাকুরদার সঙ্গে যেতাম ভাঙ্গার সেই হাটবাজারে। কেনাকাটা করতে পারতাম না। পিছনে পিছনে থলি ধরতাম। সেই থলি যখন ভারি হয়ে যেত, ওঁরা হাত থেকে তুলে নিতেন।

সেই সাহাপাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আমার প্রথম উপন্যাসে। যদিও আমার বইয়ের আখ্যানভাগের সঙ্গে তাঁদের কারো জীবন-কাহিনীর তেমন কোন সাদৃশ্য ছিল না। প্রত্যেক লেখকই তাঁর চেনাজানা লোকজন থেকে কিছুটা নেন, কিছুটা বানান। এই বানানোর কাজ সব সময় সচেতনভাবে হয় না। মনে হয়, চরিত্রগুলি যেন নিজেরাই বানিয়ে বানিয়ে ওঠে। এই আত্মকর্তৃত্ব লোপেই লেখকের আনন্দ। এরই মধ্যে তিনি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের স্বাদ পান।

বইখানির মধ্যে একটি কীর্তনের দল আছে। একটি চরিত্র আছে আত্মভোলা কীর্তনীয়ার। এই চরিত্রে আমার সেই বাল্য শিক্ষকের ছাপ পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাঁর মাস্টারিটুকু হরণ করেছিলাম, বর্জন করেছিলাম তাঁর রূপ। গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, তাঁকে রূপ লাবণ্যময় পুরুষ করে তুলে, সেই দৈহিক রূপ তাঁর নিজের ছিল না।

বইখানি যখন দেশ পত্রিকায় বেরোয়, চেনাজানা অনেকেই তাঁদের ভালোলাগার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটু বিশেষ প্রকাশভঙ্গির জন্যে একজনের কথা মনে পড়ছে। তিনি লেখক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবর্তক অফিসে কাজ করতেন। বোধ হয় এখনো সেখানেই আছেন। গল্প লিখতেন, কবিতা লিখতেন। এখনো লেখেন, তবে আগের মত অত নয়।

সেই প্রিয়দর্শন প্রিয়ম্বদ নারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বর্মন স্ট্রীটে। তিনি দেশ অফিসে ঢুকছেন, আমি বেরোচ্ছি কিংবা হয়তো উল্টোটা হবে। দেখা হতেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন। হেসে বললেন, 'পড়লাম দেশের গত সংখ্যা। কীর্তনের খোলের আওয়াজ এখনো শুনতে পাচ্ছি।'

আর একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি কালিকলমের সম্পাদক মুরলীধর বসু। আমরা যখন লিখতে শুরু করি, তার অনেক আগেই কালি-কলম উঠে গেছে। পত্রিকাটি আমার কাছে তখন জনশ্রুতি মাত্র। কিন্তু সম্পাদক মুরলীধর বর্তমান আছেন। এমন সাহিত্যরসিক সাহিত্যপ্রাণ মানুষ খুব কমই দেখেছি।

লেখক জীবনের সেই প্রায় প্রথম পর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব হয়েছিল। শুধু বয়সেই অসম নয়, কোন বিষয়েই আমি তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারি না। কিন্তু সব ব্যবধান উপেক্ষা করে তিনি আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

'দেশে' যখন হরিবংশ বেরোয়, আমি আর মুরলীধর দুজনেই নিবেদিতা লেনের একটি বাড়িতে থাকি। তিনতলার একই ঘরে আমাদের বসবাস। বোমাবর্ষণের ভয়ে আমার সেই আত্মীয়গৃহের গৃহিণীরা পুত্রকন্যা নিয়ে স্থানান্তরিতা। পাশাপাশি তক্তপোষে মুরলীবাবু থাকেন, আমি থাকি আরো অনেকেই থাকেন। আমি তক্তপোষের ওপর বসে উপুড় হয়ে 'দেশের' জন্যে কিস্তি লিখি আর তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন। লেখা বেরোলে পড়েনও।

তিনি একদিন মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি আমার নামটি চুরি করলেন কেন ? চুরি করে এমন একজনকে দিলেন যার সঙ্গে আমার স্বভাবের কোন মিল নেই। আমি কি অমন দুশ্চরিত্র ?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিনি। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম তিনি কতটা রাগ করেছেন। তাঁর রাগ তত মারাত্মক নয় বুঝতে পেরে বলেছিলাম, 'আপনার ওপর আমার খুব লোভ। আপাতত শুধু নামটিই নিলাম। পরে মানুষটিকেও নেব।'

আরো একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ। এই লেখাটি যখন বেরোয়, তার কিছু আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব হয়েছে। শুনেছিলাম, তিনি নিবেদিতা লেনে এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। কিন্তু আমি বাড়ি ছিলাম না বলে দেখা হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় প্রত্যহ পত্রিকার অফিসে।

হরিবংশের ফাইল বহুদিন বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। খানিকটা আমার অমনোযোগ, খানিকটা বা ঔদাসীন্য। সন্তোষবাবু লেখাটা পড়তে চাইলেন। বললেন, 'যখন বেরোয় খাপছাড়াভাবে পড়েছি। এখন আর একবার দিন। পুরোটা একসঙ্গে পড়ে দেখি।'

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনি দু-একদিন বাদেই ফাইলটি ফেরত দিলেন। সেই সঙ্গে প্রশংসার বন্যায় ভাসিয়েও দিলেন। আমি চিরকালই কুণ্ঠিত, তিনি অকুণ্ঠ, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে, সর্বত্র প্রবল। জানি না সেদিনের সেই প্রশস্তির মধ্যে কতখানি সাহিত্য বিচার ছিল, কতখানি বন্ধুকৃত্য। কিন্তু আমি সেদিন দারুণ উৎসাহ পেয়েছিলাম।

পরিবর্তন পরিবর্ধনের পরে যখন হরিবংশ রূপান্তরিত নামান্তরিত হয়ে দ্বীপপুঞ্জ নামে বেরোল বইখানি উৎসর্গ করলাম আমার সেই উৎসাহদাতাকে।

আমার প্রথম উপন্যাসের প্রকাশক হতে চেয়েছিলেন দুজনে। একজন হলেন শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু। অবিভক্ত বেঙ্গল পাবলিশার্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। আর একজন নাট্যকার দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ধীরেন্দ্রনাথ রায় নামে আর একজন উৎসাহী উদ্যমশীল যুবকের সঙ্গে নতুন পাবলিশিং ফার্ম খুলেছেন। আমি দ্বিধান্বিত। কাকে দিই প্রকাশের ভার। কিন্তু দিগিনবাবু একদিন আমাকে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পেয়ে আমার বইয়ের কীর্তনীয়ার মত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,

'এ বইখানা আমাকে দিন। পরেরখানা মনোজবাবুকে দেবেন।'

আলিঙ্গনাবদ্ধ আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম। বইখানি যখন বেরোয়, আমি সানুজ পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ব্রজদুলাল স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়ির একতলার বাইরের একখানি ঘরে থাকি। বেশি বৃষ্টি হলে সেখানে জল ওঠে। তক্তপোষের ওপর বসে বসে আমি দ্বীপপুঞ্জের প্রুফ দেখি। নিজেই যেন এক দ্বীপবাস। আর বৃষ্টি ভিজে ছাতা মুড়ি দিয়ে ধীরেন রায় নিতে আসেন সেই প্রুফ। দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে। সেদিনের বর্ষাকে ঠিক দুঃখের বর্ষা বলে মনে হত না। বরং দিনগুলি আশা-ভরসায় ভরা ছিল। আমি তখন প্রথম ঔপন্যাসিক হতে যাচ্ছি।

কয়েক বছর বাদে দিগিনবাবুদের পুস্তকালয় বন্ধ হয়ে গেল। তারও বহু বছর বাদে দ্বীপপুঞ্জের আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন কানাইলাল সরকার তাঁদের ত্রিবেণী থেকে। সেই ত্রিবেণীও বন্ধ হল। তারপর দ্বীপপুঞ্জের পাবলিশার্স হলেন মুকুন্দ পাবলিশার্স। সেই মুকুন্দ পাবলিশার্সও অচিরকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। এখন বইখানি আর বাজারে পাওয়া যায় না। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

এককালের জনপ্রিয় চেনামহলের অবস্থাও তাই। বেশ কয়েক বছর ধরে বইখানি ছাপা নেই। আমি হয়তো স্বজনপ্রিয়, খুব জনপ্রিয় লেখক কোনদিনই ছিলাম না। অন্তত পাবলিশাররা সেই কথাই বলেন। তবুও তার মধ্যে চেনামহলের গোটা ছয়-সাত মুদ্রণ হয়েছে।

চেনামহলও প্রথমে ধাবাবাহিকভাবে 'দেশে' বেরিয়েছিল ১৯৫১-৫২ সনে। কিস্তিতে কিস্তিতে লিখতাম। সাগরবাবু প্রেরণা দিতেন, তাড়নাও করতেন। কিস্তি খেলাপ হলে বন্ধুবিচ্ছেদের ভয় দেখাতেন।

চেনামহল যখন লিখি, তখন থাকি সপরিবারে লিন্টন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। সে বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। প্রায় বস্তি বাড়ির তুল্য। কিন্তু বন্ধুজনের আনাগোনায় আর লেখার প্রাচুর্যে, স্ফূর্তিতে সেই গৃহটির কথা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চেনামহলের প্রথম প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ বসু। তিনি তখন প্রথম পাবলিশিং ফার্ম খুলেছেন; নাম দিয়েছেন ক্যালকাটা বুক ক্লাব। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে দোতলার ঘরে ছিল সেই ক্লাব বনাম অফিস। নবীন প্রবীণ বহু লেখকের সমাগম হত সেখানে। সেই অফিস অন্য নামে এখনো আছে। অ-পাঠ্য ছেড়ে জ্যোতিবাবু এখন পাঠ্যবই প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সেদিনের সেই কলকোলাহল বৈভবের দীপ্তি এখন আর নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। একথা কাকেই বা না মানতে হয়? কখনো প্রসাদে কখনো বিষাদে।

জ্যোতিবাবু তাঁর প্রকাশিত বইগুলির অঙ্গসজ্জার দিকে খুব মন দিয়েছিলেন। নিত্যনতুন অভিনবত্বের দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। চেনামহলকে তিনি ফ্লক্‌স্‌-এর মলাটে মুড়ে দিয়েছিলেন। হয়তো বিয়েব বাজারের দিকে চোখ ছিল। তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। তখনকার দিনে নব-দম্পতিদের করকমলে তিনি চেনামহল পৌঁছে দিয়েছিলেন। চেনামহলের পরবর্তী দুটি কি তিনটি মুদ্রণের প্রকাশক মিত্র ঘোষ। নিঃশেষিত হবার পর বইখানি বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে তখন যাঁরা নবদম্পতি ছিলেন—এবং এখন পুরোন দম্পতি পুত্রকন্যা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছেন—তাঁদের কারো কারো ঘরে অক্ষত না হোক অন্তত ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থায় চেনামহলের দু-এক কপি রক্ষিত আছে।

আমার সেই পুরোন দিনের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা কথায় কথায় চেনামহলের কথা তোলেন। হয়তো লেখককে খুশি করবার জন্য বলেন, 'হ্যাঁ পড়েছিলাম সেই একখানা বই। কই, তেমন আর হল না।'

ভেবে রোমাঞ্চিত হই, এরই মধ্যে কিংবদন্তী হয়ে পড়েছি।

চেনামহলের বহু চরিত্রের সঙ্গে কলকাতার আমার একটি বৃহৎ আত্মীয় পরিবারের অনেকের মিল দেখা যায়। সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু হুবহু এক ছিল না। লেখাটি যখন দেশে ধারাবাহিকভাবে বেরোয়, তখন তাঁরা সেই উপন্যাস পড়তেন। কোন্ চরিত্র কার আদলে গড়া, তাঁরা অনুমান করতেন। আমার তো মনে হয়, উপভোগও করতেন। চরিত্রগুলির সঙ্গে খানিকটা খানিকটা মিল থাকলেও

বইয়ের আখ্যানভাগের সঙ্গে তাঁদের জীবন কাহিনীর তেমন কোন মিল ছিল না। যেটুকু সাদৃশ্য ছিল, তার জন্যে আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন বিসদৃশ আচরণ করেন নি। তাঁদের স্মিতমুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার লেখার উপাদান হতে তাঁদের আপত্তি নেই, লেখাটি উপাদেয় হলেই হল।

এই বইয়েব সারাংশ দিতে চেষ্টা করব না। সারাংশ যে কোন উপন্যাসের অসার অংশ। চেনামহলের চরিত্রগুলি যাঁদেব চেনা নেই, তাঁদের চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা। হয়তো তা পারবও না। এক বই কি আর দুবার করে লেখা যায়?

চেনামহল উৎসর্গ করেছিলাম আমার পুরোন বন্ধু কলেজের সহপাঠী সেই অভিসারগোষ্ঠীর সাহিত্যরসিক সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে। এই তীক্ষ্ণধী বন্ধুর সমালোচনা আমি সাগ্রহে শুনতাম। তার সমালোচনা সব সময় প্রীতিকর ছিল না। মাঝে মাঝে সে আমাকে শরবিদ্ধ করত। কিন্তু তার সৌহৃদ্যে আর বিদগ্ধতায় কোনদিন সন্দেহ করনি।

আরো একখানি উপন্যাসেব কথা উল্লেখ করতে হয়। সূর্যসাক্ষী। এই বইখানিও দেশে ১৯৬৪ সনের মার্চ থেকে ধাবাবাহিকভাবে বেরিয়ে '৬৫ সনের মার্চে শেষ হয়। এখানি আমার বৃহত্তম উপন্যাস। প্রিয়তম কিনা সে সম্বন্ধে এখনো মনস্থিব করিনি। তবে বিশেষ পক্ষপাত যে আছে তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সনে। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। বইখানি প্রিয় সুহৃদ নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গীকৃত।

আজকের এই রচনাটি যেভাবে লিখতে চেয়েছিলাম, সেভাবে লেখা হল না। জীবনে কটি লেখাই বা ঠিক সেইভাবে নিজের মনঃপূত হয়। ভেবেছিলাম নিজের মুখোমুখি বসব। নামব নিজের মনেব গহনে। কিন্তু স্মৃতির আয়নায় আবো অনেকের মুখ দেখতে দেখতে এগোলাম। আরো অনেকের মুখ মনে পডলেও স্থানাভাবেব আশঙ্কায় তাঁদের কথা অলিখিত রইল।

আত্মকথা বলতে গিয়ে যাঁদের কথা বলেছি সেই আত্মীযদের মধ্যেই তো আমি পরিব্যাপ্ত। সেই তো বৃহত্তর আমি।

লেখার প্রবণতাটা নিশ্চযই নিজের। তাব উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্রম পরিণতি মৃত্যু সবই রহস্যজনক। অন্তত দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য তাতে সন্দেহ নেই। অন্তঃপ্রেরণাও তাই। আমি তার রহস্যময়তায় বিশ্বাস করি।

কিন্তু বাইরের প্রেরণাও আছে। সুহৃদদের সেই উৎসাহবাক্য লেখকের সৃষ্টির মূলে রস সঞ্চাব করে। সাবা জীবন তাকে সঞ্জীবিত করে রাখে। সবাইকার ভাগ্যে সেই উৎসাহ আর আনুকূল্য অবশ্য সারাজীবন আসে না।

কিন্তু যা পেয়েছি, যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তাঁদেব প্রতি যেন কোনদিন অকৃতজ্ঞ না হই। ভাই, বন্ধু, বান্ধবীগণ, পরমাত্মীয়া, অনাত্মীযা অপরিচিতা কোন কোন পত্রলেখিকা কি লেখকেরা কতজনে কত ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সহায়তা করেছেন তার ঠিক নেই।

ধর্মীয় কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিই নি, গুরুবাদ মানি নি, কিন্তু সাহিত্যের গুরু যে কত মহাজন তার কি কিছু ঠিক আছে। উত্তমর্ণেরা সংখ্যাতীত। গ্রহণের প্রকার পদ্ধতিও বিচিত্র।

মাঘ ১৩৮১

পুনশ্চ

সন্ধ্যাব অন্ধকারে জৈনুদ্দিন শহরেব গলিতে গলিতে সুন্দর মুখ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। আনারসের চালান নিয়ে ভিন্ন জেলা থেকে যে যুবক মহাজনটি খালেব ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়েছে তাব ভিতরে ভিতরে বস যে টলমল করছে এ কথা মাত্র ঘন্টাখানেকের আলাপেই টের পেয়েছে জৈনুদ্দিন। যুবক কাঞ্চন মিঞা এ ভবসাও দিয়েছে যে টাকা-পয়সাব জন্য জৈনুদ্দিন যেন না ঘাবড়ায়। হেসে বলেছে, 'সাহেব, কৃপণ লোক কি আব আনারস খেতে পারে? অনেক ফেলে ছড়িয়ে তবে না রস?'

সুতরাং রস সংগ্রহের ব্যাপাবে জৈনুদ্দিন কিছু বিশেষ মনোযোগই দিয়েছে আজ। বেশ উৎসাহই লাগছে। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও পরকে এ রসেব কেবল জোগান দেওয়াতেও কম সুখ নেই।

গলিতে ঢুকতেই থানার এক সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেপাই মুচকি হেসে বলল, 'কি মিঞা খবর কি? অমন করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ, কোন জহরৎ-টহরৎ হারাল নাকি?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে বলেছেন ভালো, হেঃ হেঃ হেঃ! জহরৎই খুঁজছি বটে।' সেপাই হাসল, 'কিন্তু জহরৎ পেলেই বা তোমার কি লাভ? দেবে তো অন্যকে। তুমি মিঞা কেবল নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়েই গেলে, ভিতরটা আর ভেঙে দেখলে না। যাই হোক জহরৎ টহরৎ কিছু পেয়ে গেলে গরীবকে ভুলো না।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে তাই কি পারি? আপনাদেব মেহেরবানীতেই তো আছি।'

জৈনুদ্দিনের মনে পড়ল আগে এই সব থানার লোকদের কি রকম ভয়টাই না সে করত। দূর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার বুক কাঁপত, কারো সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করা তো দূরের কথা। কিন্তু এই বছর দেড়েকের অভিজ্ঞতায় এদের সঙ্গে ভাব রাখার কৌশলটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। কোন ভয় আর তার নেই। জেলা শহরের গণ্যমান্য অনেক লোকের সঙ্গে তার গোপন আলাপ, এমন কি দোস্তী পর্যন্ত হয়েছে। সেই সব দিনের কথা জৈনুদ্দিন প্রায় ভুলেই গেছে যখন ছত্রিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এই জেলা শহরের লঙ্গরখানার সামনে এসে তিন দিন মড়ার মত পড়েছিল। মাছের বাজারে এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে পাঁজরেব একখানা হাড় যে প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার উদ্যোগ হয়েছিল সে কথাটাও জৈনুদ্দিন তেমন করে মনে রাখতে পারেনি। কদাচিৎ এক আধ সময় ব্যথাটা হয়ত একটু একটু এখনও লাগে কিন্তু আব পাঁচজনের মত সেই ইতিহাসটা জৈনুদ্দিনেরও আর সব সময় মনে পড়ে না।

জহরৎরা এর আগে শহরের কেবল কয়েকটা জায়গাতেই বাসা বেঁধে থাকত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে তারা প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে, কোথায় আধা-আধি, কোথাও পুরোপুরি। জৈনুদ্দিন দেখতে দেখতে দেখতে শহরেব এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এসে পড়ল, পছন্দ মত মুখ আব মেলে না। কাঞ্চন মিঞার প্রমোদের সামগ্রী তো নয় যেন নিজের জন্যই কনে খুঁজে বেড়াচ্ছে জৈনুদ্দিন। এত খুঁৎ-খুঁৎ!—এক সময় তার নিজেরই হাসি পেল।

রাস্তার দুপাশের প্রত্যেকটি মুখের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ একখানি মুখে জৈনুদ্দিনের দৃষ্টি একেবারে নিবদ্ধ হয়ে রইল। পলক যেন আর পড়তে চায় না। এ মুখ অত্যধিক সুন্দর নয়, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচিত।

জৈনুদ্দিনকে চিনতে পেরে ফতেমারও হৃৎস্পন্দন যেন মুহূর্তকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু

পরমুহূর্তেই সপ্রতিভভাবে ফতেমা বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল, যেন জৈনুদ্দিনকে লক্ষ্যই করেনি।
জৈনুদ্দিন একবার ভাবল চলে যায়। কিন্তু চিনে যখন ফেলেছেই পালিয়ে কি লাভ? তাছাড়া ফতেমার সঙ্গে কথা বলবার একটা দুর্দম ইচ্ছা জৈনুদ্দিনকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল। কিন্তু জৈনুদ্দিন এগিয়ে যেতেই ফতেমা মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল।
জৈনুদ্দিন পিছন থেকে ডেকে বলল, 'শোন।'
ফতেমা ফিরে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল, 'কি?'
জৈনুদ্দিন বলল, 'এখানে এলে কবে? তুমি না শেষে বুড়া অবদুল খাঁর সঙ্গে নিকা বসেছিলে?'
ফতেমা তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'নিকা তো একসময় তোমার সঙ্গেও বসেছিলাম মিঞা।' জৈনুদ্দিন একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'ভিতরে চল কথা আছে।'
ফতেমা রুক্ষ স্বরে বলল, 'না।'
'না কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ঘরে ঢুকে তোমার জিনিসপত্র লুটে নিয়ে পালাব, না?'
ফতেমা বলল, 'আর যাওয়ার সময় গলা টিপেও রেখে যেতে পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।'
জৈনুদ্দিন ক্রুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বটে! কিন্তু তোমার সাধ্যটাও তো বিবি কম দেখছি না।'
ফতেমা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, জৈনুদ্দিন ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'আহা হা বিবি গোসা ক'রে নিজের ক্ষতি করছ কেন, তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি', বলে জৈনুদ্দিন সত্যই সরে গেল।
পাশের মেয়েটি বলল, 'ও ফতি, খদ্দেরকে ঝগড়া করে তাড়ালি কেন?'
ফতেমা বলল, 'তাড়াব না? ও যে এককালে আমার সোয়ামী ছিল রে!'
'তাই না কি? তা হলে তো আরো জমতো ভালো।'
ফতেমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'হাঁ তাতো জমতই।'

জমাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রেছিল জৈনুদ্দিন আজ নয়, আরো বছর সাতেক আগে। তার দাদা মৈনুদ্দিন ফতেমাকে বিয়ে ক'রে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর জৈনুদ্দিনের চোখ পড়েছিল। মেটে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে ফতেমা জল নিয়ে ফিরত সেই চোখ তাকে অনুসরণ করতে করতে আসত। ঢেঁকিতে যখন ধান ভানত ফতেমা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই চোখ তার চঞ্চল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকত। কেবল নীরব দৃষ্টিতেই নয়, আড়ালে আবডালে পেয়ে ফতেমার কাছে ভাষা দিয়েও জৈনুদ্দিন নিজের সেই দৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে।
'ভাবী সাব, আমার চোখে ভাবী সুন্দর লাগে তোমাকে।'
ফতেমা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'খবরটা তোমার মিঞা ভাইকে একবার দিয়ে দেখব।'
'ভাবী সাব, তোমার ভিতরটা কি কাঠ?'
'তোমার মিঞা ভাইকে জিজ্ঞেস কোরো।'
কিন্তু মিঞা ভাইর দোহাই বেশীদিন চলল না। পাঁচ বছরের মাথায় নিমুনিয়ায় মৈনুদ্দিনের মৃত্যু হ'ল। মাসখানেক যেতে না যেতেই ফতেমার বাপ ইব্রাহিম কারিগর নিকা দেওয়ার জন্য সম্বন্ধ দেখছে, জৈনুদ্দিন গিয়ে বলল, 'ভাবীসাব, মিঞা ভাই তো ফাঁকি দিয়েই গেল। খোদার ইচ্ছার ওপর তো মানুষের আর জোর থাকে না। জোর জুলুম মানুষের আপন জনের ওপরই চলে।'
কথার ভাব বুঝতে পেরে ফতেমা আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'নিকা করবার আমার আর কোথাও ইচ্ছা নেই রাঙা মিঞা। কিন্তু তুমি যদি ভরসা দাও এই বাড়ীতেই আমি থাকতে পারি।'
জৈনুদ্দিন বলল, 'তোমার বাড়ী তোমার ঘর, এ ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়। কিন্তু পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে। এই জন্যেই দু'দশ টাকা ব্যয় ক'রে কেবল মোল্লা মুন্সীদের মুখটা বন্ধ ক'রে রাখা!'
ফতেমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবল। কেবল ঠাট্টা ইয়ার্কি নয়। সাময়িক ইচ্ছাপূরণ নয়। জৈনুদ্দিন

সঙ্গতভাবে নিজে যেচে তাকে বিয়ে করতে চাইছে।

এই অনুরাগকে সন্দেহ করা যায় না, এই ভালোবাসার ওপর সারাজীবন নির্ভর ক'রে থাকতে সাধ যায়। এমন আপনজন ক'জন মেলে সংসারে?

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরও তো পরিবার আছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে রাঙা মিঞা।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'থাকলেই বা। আমার বাজানের কয় বিবি ছিল জানো? চার জন। পুরোপুরি একহালি। শেষ রাতে উঠে আমার চার মা তাঁতখোলায় গিয়ে তানা করতে আরম্ভ করত। খটখট শব্দে আমার ঘুম যেত ভেঙে। বাজান হুঁকো টানতে টানতে বিবিজানদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। আজকালও এক এক রাত্রে খোয়াবের মধ্যে সেই তানা করবার শব্দ শুনে বিছানার ওপর উঠে বসি। তুমি যদি মেহেরবানী কর বরুবিবি, তোমাদের নিয়ে আমি আগের মত সেই রকম ক'রে তাঁত খুলব। মেহের কারিগরের ছেলে আমি, আমার কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে এমন জন-মজুরী পোষায়?'

ফতেমা জৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ভারী যে সরম করে মিঞা।'

জৈনুদ্দিন হেসে ফিস ফিস করে বলল, 'বিবিজান তুমি তো জানো না এই সরমের সময় তোমাকে আরো বেশী খাপসুরৎ ঠেকে।'

জৈনুদ্দিন যেন মত্ত হ'য়ে উঠল। নিত্য নতুন তার আদর জানাবার কায়দা, এত কায়দা মৈনুদ্দিনের কোন দিন মাথায় আসত না। নিত্য নতুন নামে ডাকে জৈনুদ্দিন, নিত্য নতুন ভাষায় ভালোবাসা জানায়। এত কথা কোন দিন মুখচোরা মৈনুদ্দিনের মুখে আসত না।

পাশের ঘরে সাকিনা ছেলে নিয়ে ছটফট করত। ফতেমাই শেষে দয়া ক'রে বলত, 'হয়েছে, হয়েছে, এবার ছোট বিবির ঘরে যাও দেখি একটু।'

কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। এক ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জৈনুদ্দিন সর্বস্বান্ত হ'ল। ভিটে মাটি বাঁধা পড়ল। যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁত আর খোলা হ'ল না, তার বদলে দুই বউকে দুই ঢেঁকি পেতে দিল জৈনুদ্দিন। ফি হাটে ধান কিনে আনে, দুই বউকে পাল্লা দিয়ে চাল ভেনে দিতে হয়। সেই চাল বিক্রির পয়সায় চলে সংসার। ক্রমে দেখা গেল এদিক থেকে বরুবিবি কেবল পটের বিবি কোন কাজের বিবি নয়। তার সময়ও লাগে বেশী কাঁড়া চালের ক্ষুদও বেশী থাকে। সাকিনা তার চেয়ে অনেক শক্ত অনেক খাটিয়ে। ফলে সাকিনার ওপরই দরদটা গিয়ে পড়ে জৈনুদ্দিনের। তার জন্য মাজন আসে, তার ছেলের জন্য আখ আর বাতাসা। দুধেল গাইকে খোল জাব বেশী করে খাওয়াতে হয়। ফতেমা ছটফট করে কিন্তু সাকিনা কিছুমাত্র ভাগ দেয় না। স্বামীর ভাগ দিয়েছে আবার আরো?

তারপর এল সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধার মিলে না, ফতেমা আর সাকিনা দুজনেই বেকার। তবু সাকিনা আর তার ছেলে-মেয়ের ওপরই টান বেশী জৈনুদ্দিনের। শত হলেও সাকিনা তার বিয়ে করা বৌ, বজলু নিজের ছেলে।

বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চেয়ে চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সাকিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈনুদ্দিন। শুকিয়ে শুকিয়ে ফতেমা অস্থিসার হয়, নড়ে বসবার শক্তি থাকে না; তবু জৈনুদ্দিনের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এর পর ফতেমা আর সবর রাখতে পারে না। বলে, 'একি তোমার ব্যবহার মিঞা? পায়ে ধরে চৌদ্দবার ক'রে সিধে নিকা করেছিলে মনে নেই?'

জৈনুদ্দিন জবাব দেয়, 'না নেই। কিন্তু এখন পায়ে ধরেই বলছি রেহাই দে, রেহাই দে আমাকে, মিঞা ভাইকে খেয়েছিস, আমাকে আর খাসনে। গাঁয়ে আরো তো মুসলমান আছে, তাদের কারো ঘরে যা।'

দিনকয়েক উপবাসের পর ফতেমা সোজা চলে এল বুড়ো আবদুল খাঁর বাড়ি। জৈনুদ্দিন কোন বাধা তো দিলই না। বরং খুসি হ'ল।

আবদুল খাঁ তার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বলল, 'নিকা তো তোমাকে করবই বিবি। গণ্ডা কয়েক ছেলে মেয়ে সুদ্ধ দু'জন বিবিকে যখন এই বাজারে পুষতে পারছি, তোমাকেও পারব। কিন্তু তার আগে চল একবার শহর থেকে ঘুরে আসি। খাসি আর মুরগীর চালান নিয়ে যেতে হবে, একা

একা যেতে ভালো লাগছে না।'

আবদুল খাঁর চালানের নৌকায় উঠে বসবার সময় ফতেমার কানে গেল কলেরায় বজলু আর সাকিনা দু'জনেই শেষ হ'য়ে গেছে।

ফতেমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই প্রার্থনা করল, 'হে খোদাতাল্লা, জৈনুদ্দিনও যেন আজ রাতে গোরে যায়।'

খানিক ঘোরাঘুরির পর জৈনুদ্দিন আবার এসে উপস্থিত হ'ল। ফতেমা অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি কোন সরম নেই মিঞা?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'সরমের কথা থাক। তোমার সাথে একটা কাজের কথা বলতে এসেছি বরুবিবি।'

'কাজের কথা? আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই। লাভ তোমারই। আমার আর কি।'

জৈনুদ্দিন নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাকে একটু আড়ালে এনে ফতেমা তার প্রস্তাবটা শুনল এবং শুনে প্রথমটা থ' খেয়ে গেল। সে ভেবেছিল কাকুতি মিনতি ক'রে জৈনুদ্দিন নিজেই আসতে চাইবে। কিন্তু অন্যের জন্য যে সুপারিশ করবে জৈনুদ্দিন তা সে ধারণাই করতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে এমন পিশাচ হয়েছে জৈনু মিঞা, এমন পাকাপোক্ত শয়তান? কিন্তু সেই যদি পারে ফতেমাই বা কেন পারবে না, বিশেষত লোকটিকে যখন শাঁসালো বলেই শোনা যাচ্ছে। লাভ ছেড়ে দিয়ে ফল কি?

কাঞ্চন মিঞা দু'তিন দিন যাতাযাত করে। তারপর চলে আসে থানার নুরুদ্দিন সাহেব, তারপর কাছারির কল্যাণ গাঙ্গুলি।

না, পিশাচ হলেও জৈনুদ্দিন একেবারে ডাহা চালবাজ নয়। তার আনা লোকগুলির সত্যি পয়সা আছে আর তারা পয়সা ব্যয় করতেও জানে।

ইতিমধ্যে বেশ একটু নতুন ধরনের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে জৈনুদ্দিন আর ফতেমার মধ্যে। মাঝে মাঝে ডিমটা, মাছটা আনাজটা হাতে ক'রে আনে জৈনুদ্দিন। ফতেমা গরমের দিনে সরবৎ করে দেয়, ঠাণ্ডার দিনে চা খাওয়ায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জৈনুদ্দিন বলে, 'গাঙ্গুলি ছোঁড়াটা কিন্তু কেমন যেন একটু বোকা বোকা, নয়?'

ফতেমা হেসে ওঠে, 'ছাই জানো তুমি। আসলে বজ্জাতের ধাড়ী। এখানে এসে অনেকেই অমন ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে। কিন্তু একটু টিপে দেখলেই আমরা সব টের পাই।'

জৈনুদ্দিন হেসে মাথা নাড়ে, 'তা ঠিক, তোমাদের ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

ফতেমা আবার বলে, 'তোমাদের নুরুদ্দিন কিন্তু ভারি ধার্মিক। বলে, ফতেমা আমার একজন গুরুজনের নাম। আমি বলি তাতে কি, আমার আরো হাল্কা হাল্কা দু'তিনটে নাম আছে—আতরজান, দিলজান যা খুসি বলে ডাকতে পার।' বলে ফতেমা মুখ টিপে হেসে জৈনুদ্দিনের দিকে তাকায়। যখন নিত্য নতুন নামে ডাকার শৌখিন ছিল জৈনুদ্দিনের এ-সব সেই তখনকার নাম। জৈনুদ্দিন এবার গম্ভীর ভাবে বলে, 'আচ্ছা এখন উঠি বরু বিবি, বেশি সময় নিয়ে তোমার ক্ষতি ক'রে লাভ কি।'

ফতেমা বলে, 'এত তাড়াতাড়ি কেন। গোসা হল নাকি মিঞার!'

জৈনুদ্দিন হেসে ওঠে, 'ক্ষেপেছ। গোসা হ'লে দু'জনেরই ক্ষতি।'

ফতেমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। কেবল ক্ষতির ভয়েই কি জৈনুদ্দিন কোন গোসা করে না, অভিমান করে না, হিংসা করে না? ক্ষতির ভয় কি মানুষকে এমন পাথর ক'রে ফেলে?

দিনকয়েক আগে ফতেমা সেদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'যা'ই বল, আজকাল তুমি কিন্তু একেবারে পয়গম্বর হ'য়ে গেছ মিঞা। তাবিচ কবচ নিয়েছ নাকি হাসেম ফকিরের কাছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জৈনুদ্দিন বলেছিল, 'ময়রায় কি আর সন্দেশ খায় বিবি?'

ফতেমা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তা ঠিক, সন্দেশ-বেচা পয়সা খেলে

তো জাত যায় না।'

জৈনুদ্দিন এমন পাথর হ'ল কি ক'রে। তার চোখে রঙ নেই, হাসিতে রঙ নেই—পরিহাস ওপর ওপর যতই করুক জৈনুদ্দিন কোন দিন তাকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখে না, অথচ সবাই বলে ফতেমা আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে। কল্যাণ বলে, তেমন করে সেজেগুজে বেরুলে তাকে নাকি ঠিক কলেজে পড়া মেয়েদের মত দেখায়। কিন্তু জৈনুদ্দিন তাকে ছোঁয় না। জৈনুদ্দিন তাকে ঘৃণা করে। এতখানি ঘৃণা করবার অধিকার কোথায় পেল সে, জৈনুদ্দিন কি তার চেয়ে কম পাপী? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের অন্তরকেই ফতেমা জর্জর করে তোলে, ক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না।

সেদিন আবার আর একজন শাঁসালো লোকের সন্ধান আনল জৈনুদ্দিন। বলল, 'ভালো ক'রে সেজেগুজে থেকো বরু বিবি। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন।'

ফতেমা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার যে ভারি মাথা ধরেছে। জ্বরই যেন এসে পড়ে পড়ে।'

জৈনুদ্দিন ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'তাই নাকি? তবে আজ থাক, চুপচাপ শুয়ে থাক বিছানায়।'

কথার মধ্যে পুরোন আন্তরিকতার সুর যেন আবার ফিরে এসেছে।

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তুমি তো কথা দিয়ে এসেছ, কথার খেলাপ করলে ক্ষতি হবে না? তার চেয়ে নিয়েই এসো।'

জৈনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলল 'যা বলছি তাই কর। শুয়ে থাকো চুপ-চাপ। পয়সার লোভ বড় বেশী তোমাদের।'

ফতেমা মনে মনে খুসি হ'ল, কিন্তু খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

'আর তোমাদেরই বুঝি কম?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তর্ক না ক'রে একটু শুয়ে থাক দেখি, মাথা কি দু'দিকেই ধরেছে খুব বেশী?'

ফতেমা শুয়ে পড়ে বলল, 'খুব। যেন ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে।'

'তা হ'লে এক কাজ কর। জলপটি দিয়ে রাখো মাথায়।'

ফতেমা কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। জলপটির স্মৃতি তাকে আরেক যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনও দারুণ মাথা ধরেছিল ফতেমার। ছটফট করছিল যন্ত্রণায়। হাট থেকে এসে শুনতে পেয়ে, হাত ধোয়া নেই, জৈনুদ্দিন নিজে এসে তাড়াতাড়ি ভিজে নেকড়ার পটি বেঁধে দিল ফতেমার কপালে, তার পর শিয়রে বসে শুরু করল পাখা দিয়ে বাতাস করতে। সাকিনা ঠাট্টার ছলে অনেক বাঁকা বাঁকা কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। বলল, 'জলজ্যান্ত এমন লম্বা চওড়া পুরুষ মানুষটাকে ভেড়া ক'রে ফেললে কি ক'রে বরুবিবি, ধন্য তোমার যাদুর মহিমা।'

সেই যাদু এমন ক'রে ভেঙে গেল কি ক'রে? কেবল কি ফতেমাই তা ভেঙেছে?

জৈনুদ্দিন বলল, 'কি, শুয়েই আছ যে। যা বলছি তাই কর, নেকড়া ভিজিয়ে জলপটি দাও', ব'লে জৈনুদ্দিন আবার বিড়ি টানতে লাগল।

ফতেমা হঠাৎ একেবারে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই আমার। ভারী দরদ দেখাতে এসেছ। দরদ যে কিসের জন্য তা কি বুঝি না? ভয় নেই, মাথা-ধরায়, মরে যাব না, কালই উঠতে পারব। কালই আনতে পারবে তোমার লোক।'

জৈনুদ্দিন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এত রাত্রেও শহর ভরে বেশ লোক-জন চলাচল করছে। ক্রমেই বসতি বাড়ছে। দোকানে দোকানে চলছে বেচা কেনা। জনকয়েক অল্পবয়সী মেয়ে-পুরুষ সেজেগুজে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলেছে। তাদের হাসির শব্দ অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে রইল জৈনুদ্দিনের। চুলের আর শাড়ির গন্ধ বাতাসে ভেসে রইল বহুক্ষণ ধরে। সামনের বটগাছের তলাতেই ছিল লঙ্গরখানা। আর তার সম্মুখেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল জৈনুদ্দিন, ফৈজু আর কেষ্ট মণ্ডল। ফৈজু আর কেষ্ট আর ওঠেনি। কিন্তু কে আর মনে রেখেছে তাদের কথা। ফৈজুর বিবি নাকি আবার নিকা বসেছে। তার ছেলে-মেয়েও হয়েছে এর মধ্যে। গাঁয়ে আবার লোকজন ফিরে গিয়েছে। ধান চাল আবার পাওয়া

যাচ্ছে। দৈনিক মজুরির হার নাকি গাঁয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেড় টাকার কমে কেউ আর জন খাটে না। শহরে বসে বসেই সব খবর জৈনুদ্দিন পায়। সব খবরটা তার কাছে এসে পৌঁছায়।

পরদিন বিকালের দিকে জৈনুদ্দিন আবার গেল ফতেমার কাছে। ফতেমা তখন সাজসজ্জা কেবল শুরু করেছে।

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোসা ভেঙেছে বিবি সাহেব ?'

ফতেমা বলল, 'না ভাঙলে তো দু'জনেরই ক্ষতি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সাজ-গোজটা আজ একটু ভালো রকম হয় যেন। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন। কোন খুঁৎ থাকে না যেন কোথাও।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা, সে আর তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

জৈনুদ্দিন পকেট থেকে একটা শিশি বার করল আর বোঁটাওয়ালা দুটো লাল গোলাপ।

ফতেমা অবাক হ'য়ে বলল, 'ও আবার কি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোলাপ দু'টো খোঁপায় গুঁজে নিয়ো। বেশ চমৎকার মানাবে। আর গন্ধটা একটু ছিটিয়ে নিয়ো কাপড়-চোপড়ে। বেশ খোসবয় আছে। লোকটি ভারী সৌখীন কিনা।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আজ একেবারে ডানাকাটা পরী হয়ে থাকব। কিছু ভেব না।'

জৈনুদ্দিন আবার ফিরে গেল।

খানিক বাদে গোল হয়ে চাঁদ উঠল আকাশে। কিছুক্ষণ জৈনুদ্দিন শহরের এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়াল। এক বাড়ি থেকে চমৎকার রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের কোলাহল, একটা জানালার ধারে স্বামী-স্ত্রীতে ফিস্ ফিস্ করে কি আলাপ করছে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই জৈনুদ্দিন চোখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যার খানিক পরেই জৈনুদ্দিনকে ফিরে আসতে দেখে ফতেমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও মা, এত সকাল সকাল যে ? এই না বলেছিলে রাত হবে ? কই, তোমার সেই সৌখীন লোক কোথায় ?'

জৈনুদ্দিন মুহূর্তকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফতেমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার নির্দেশ মত ফতেমা আজ ভারী সুন্দর করে সেজেছে। খোঁপায় গুঁজেছে তারই দেওয়া গোলাপ, শাড়িতে ছিটিয়েছে তারই আনা সুগন্ধি। আজকের বেশে ভারী অপরূপ মানিয়েছে ফতেমাকে। মনে পড়ল না এ সজ্জা কার জন্য।

জৈনুদ্দিন বলল, 'সে আছে একটু আড়ালে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে নি চল।'

ফতেমা দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল তার পাতা বিছানার এক কোণে জৈনুদ্দিন বসে পড়েছে। সাধারণত এ ভাবে জৈনুদ্দিন বসে না।

ফতেমা বলল, 'কি কথা ?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'শোনই।'

ফতেমা আরও একটু কাছে সরে এসে বসল।

জৈনুদ্দিন ব্যাগ খুলে নতুন একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ফতেমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর চেপে ধরে বলল, 'সে যদি আজ নাই আসে, তোমার কি খুব মন পোড়বে বরুবিবি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ফতেমাকে জৈনুদ্দিন নিজের দিকে আরও একটু আকর্ষণ করল। ফতেমা একবার জৈনুদ্দিনের দিকে তাকাল, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু হেসে নোটখানা ফের জৈনুদ্দিনের পকেটেই গুঁজে দিল।

জৈনুদ্দিন একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল, 'কম হ'ল নাকি ? আরো চাই তোমার ?'

ফতেমা অপূর্ব মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাই না ? খরচ কত তার খেয়াল আছে মিঞার ? এত

কাণ্ডের পর মোল্লা-মুনসীদের মুখ কি আর দু'-পাঁচ টাকায় বন্ধ হবে ভেবেছ ?'

আষাঢ় ১৩৫২

কুলপী বরফ

ষ্টেসন থেকে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। রাস্তার দু' দিকে নারকেল আর সুপারির সার। ফাঁকে ফাঁকে একতলা কোঠা বাড়ী। মেটে বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। এক জায়গায় ছোট্ট একটি বাঁশের ঝাড়।

যেতে যেতে নীরদ বলল, 'শহর ব'লে কিন্তু মনেই হয় না মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'শহর নাকি যে শহর বলে মনে হবে ? কয়েকটা চটকল আর কাপড়ের কল আছে এই পর্যন্ত। অবশ্য স্কুল, পোষ্ট অফিস, বাজার সবই আছে। সেগুলি সব ওই দিকে' —বলে মনোহর হাত দিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

নীরদ একটু হাসল, 'এটা বুঝি তাহলে তোমাদের শহরতলী ?'

মনোহর তখনও শহরেরই বর্ণনা দিচ্ছে, 'গতবার দুটো ব্যাঙ্ক এসেছে, এবার শুনছি সিনেমাও হবে।' উজ্জ্বল, উৎফুল্ল দুটি চোখে মনোহর নীরদের দিকে তাকাল।

শিয়ালদ' থেকে ট্রেণে মাত্র মিনিট পনেরর পথ। কিন্তু ভীড়ে আর গোলমালে গাড়ীতে যে দুর্ভোগ নীরদকে ভোগ করতে হয়েছে পনের ঘণ্টাতেও যেন তার দাগ মুছবে না। একখানা গাড়ী ফেল করায় ষ্টেসনে এসে বসে থাকতে হয়েছে পুরো দেড় ঘণ্টা। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বার কয়েক চা টোষ্ট খেয়েও ক্ষিদেয় জ্বলছে পেট। শহরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা নীরদের কানে খুব মধুর লাগল না, বলল, 'আর কতদূর তোমার বাসা ?'

মনোহর তাড়াতাড়ি বলল, 'এই তো, এই তো এসে গেছি। খুব কষ্ট হল তোর, বেলা গেছে কোথায়, আমরা কিন্তু সেই সকাল থেকে আশায় আশায় আছি, এই আসে, এই আসে। একেকটা গাড়ীর শব্দ শুনি, আর দৌড়ে দৌড়ে আসি ষ্টেসনে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মানুষের দেখা নেই। শেষে তোর বউদি বললে— ।—এই যে নীরু, এই আমার কুঁড়ে।'

সদরের দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে অত্যন্ত ছোট মেটে একখানা ঘর, ওপরে গোলপাতার ছাউনি। পাশেই আর একটু দোচালার মধ্যে পাকের জায়গা। কুঁড়েই বটে। কিন্তু মনোহরের কথার ভঙ্গিতে মনে হল বড় একটা প্রাসাদকে নিতান্ত বিনয় আর সৌজন্যেই সে কুঁড়ে আখ্যা দিয়েছে। কুঁড়ে যেন এটা আসলে নয়।

ভিতরে ঢুকেই মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল মনোহর। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল, 'কথাবার্তা আলাপ সালাপ পরে হবে। আগে খেতে দাও ওকে। দেখ, মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, বেলা আর আছে নাকি !'

নীরদরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে, নির্মলা আধ হাত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। আলাপ করবার কোন গরজই তার মধ্যে দেখা গেল না। উনানের উপর কি একটা তরকারি হচ্ছিল। সেটা নামিয়ে নিয়ে সে এল শোয়ার ঘরে। দ্রুতহাতে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নিল জায়গা, দুখানা আসন পাশাপাশি পেতে ঠাঁই করে দিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'বসতে বল ঠাকুরপোকে।'

মনোহর একটু রসিকতা করল, 'বাঃ, কেবল আমি বললেই হবে নাকি ? তোমার মুখের কথা না শুনলে—'

ঘোমটার ভিতর থেকে অনুচ্চ ধমক শোনা গেল, 'আঃ, রঙ্গ রাখো। আমার কথা ওঁর পরে শুনলেও চলবে। খেয়ে দেয়ে আগে সুস্থ হয়ে নিন।'

নীরদ আসনে বসতে বসতে বলল, 'থাক মনোহরদা, খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছ খেয়েই যাই, মুখ দেখা আর কথা শোনার নিমন্ত্রণ আর একদিন কোরো, সেদিন এসে দেখে শুনে যাব।'

এবার ঘোমটার ভিতর থেকে চাপা হাসির শব্দ উঠল।

আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। দু রকমেব ডাল, তিন রকমের নিরামিষ তরকারী, মাছ তিন-চাবটা, টক, দই, মিষ্টান্ন, বাদ নেই কিছুই।

মনোহব খেতে খেতে বলল, 'কেমন হয়েছে রান্না। তুই যে কিছুই প্রায় খাচ্ছিসনে।'

নীরদ জবাব দিল, 'আমাকে কি মহাপেটুক ঠিক করেছ। চেহারা দেখে তাই মনে হয নাকি ? আর এত সব আয়োজনই বা কেন। আমি কি অতিথি না কুটুম্ব ?'

মনোহর মৃদু হেসে বলল, 'আয়োজন আর করতে পারলাম কই। কিন্তু অতিথি-কুটুম্বের চেয়েও তুই বাড়া হয়ে গেছিস। সেদিন দেখে তো চিনতেই পাবলিনে।'

নীরদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'সাত আট বছব পরে দেখা। তারপর অত বড় বড় গোঁপ গজিয়েছে ঠোঁটেব ওপর। কি করে হঠাৎ চিনে ফেলি বল। গল্পটা আপনার কাছে বলছি বউদি। আপনি নিশ্চয়ই এর আগে শুনেছেন। কিন্তু এবার শুনতে হয়তো একটু অন্য রকম লাগবে। এক বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছি ষ্টেসনে। আসন্ন বিচ্ছেদে মন অন্যমনস্ক। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কে একটি লোক এসে আচমকা আমার কব্জী চেপে ধবল। নাড়া লেগে সদ্য-ধরানো সিগারেটটা গেল পড়ে। চোখ গরম করে বললাম, কে আপনি। লোকটি মুচকি হেসে বলল, দেখুন মনে করে। মনে ক'রে দেখবাব আগে আমি চেহারাটা আব একবার চেয়ে দেখলাম। বেঁটে ছোটখাটো মজবুত শরীব। বর্ণ ঘনশ্যাম। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, বাঁ হাতে মস্ত বড এক ঝুলি। তার ভাবে ভদ্রলোক ঈষৎ কাৎ হয়ে পড়েছেন। ---ভালো কথা মনোহরদা, সেদিন জিজ্ঞেস করা হয় নি। অত বড় ঝুলির মধ্যে কি বাজার করে নিয়ে ফিবছিলে ? কি ছিল তার মধ্যে ?'

এতক্ষণ নির্মলা হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ছিল, মনোহব নিজেও উপভোগ করছিল নীরদের সেদিনকাব বর্ণনা। কিন্তু ঝুলির কথা তুলতেই নির্মলাব হাসি বন্ধ হ'ল, ম্লান হয়ে গেল মনোহরের মুখ।

মনোহর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়।'

নীরদ প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'কিছু নয বললেই আমি বিশ্বাস করলাম আর কি। আচ্ছা বউদি আপনিই বলুন না দাদাকে সেদিন এত কি আনতে পাঠিয়েছিলেন বাজারে।'

কিন্তু নির্মলা মুখ নিচু করেই রইল। নীবদের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

মনোহর খানিকক্ষণ গম্ভীবমুখে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'কি দরকার এত ঢাকঢাক গুড়গুড়ের। থলেব মধ্যে আর কি থাকবে। ছিল বরফ।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'ববফ ! অত বরফ দিয়ে করলে কি। অসুখ-বিসুখ ছিল নাকি বাড়ীতে ?'

নির্মলা আর বসল না। খালি ভাতের থালা হাতে রান্নাঘরের দিকে চলল।

মনোহর সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈস লজ্জার বহর দেখ। যাতে ভাত জুটছে, কাপড় জুটছে, তার নাম করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে, অপমান বোধ হয় !'

নীরদ বলল, 'ব্যাপাব কি মনোহরদা।'

মনোহর বলল, 'না,ব্যাপার এমন কিছু নয়। আচ্ছা ভায়া, এম এ· বি·এ· পাশ করেছ, চাকরি বাকিরও করছ কিন্তু গাড়ী বাড়ী কোথায় কি করতে পেরেছ শুনি।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন মনোহবদা ?'

মনোহর বলল, 'শুনিই না, করেছ নাকি কোথাও কিছু।'

নীরদ বলল, 'ক্ষেপেছ, যা দিনকাল তাতে নিজের খরচটা কোনরকমে চালিয়ে থাকতে পারলেই ঢের।'

মনোহর স্ত্রীর উদ্দেশে বলল, 'ঐ শোন।' তারপর নীরদের দিকে আবার ফিরে তাকাল মনোহর, 'কিন্তু ভায়া বরফই বেচি, আব যাই করি, এই যা দেখছ, তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে সব নিজের। মাসে মাসে ভাড়া গুণতে হয় না, কথার তলায় থাকতে হয় না কারো।' আত্মপ্রসাদে মনোহরের চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল !

নির্মলা নিঃশব্দে পরিবেশন করে যেতে লাগল।

নিজেদের সামান্য বাড়ীঘর নিয়ে স্বামীর এই আকস্মিক দম্ভে নির্মলার লজ্জার যেন আর সীমা রইল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি ভাবলেন ঠাকুরপো। এই দু তিন দিন ধ'রে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ঠিক করেছিল নিজেদের ব্যবসার কথা এই উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টির কাছ থেকে তারা গোপন রাখবে। কতক্ষণই বা থাকবে নীরদ। যে গাড়ীতে আসবে তার পরের গাড়ীতেই চলে যাবে। কি দরকার তাকে নিজেদের জীবিকার কথা জানানো। প্রসঙ্গক্রমে কথাটা যদি ওঠেই মনোহর না হয় বলবে এখানেই কোন অফিস-টপিসে কাজ করে। মনোহরকে আজ তাই বরফ ফিরি করতে বের হতে দেয়নি নির্মলা। নিজেও বরফ রাখবার হাঁড়ি, দুধ জ্বাল দেওয়ার বড় কড়াই, ছোট ছোট কুড়ি কয়েক টিনের চোঙা এবং অন্য সব ছোট বড় সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছে এখানে ওখানে, রান্নাঘরের কোণে তক্তপোষের তলায়। কিন্তু মনোহর মেজাজ খারাপ করে হঠাৎ যে সমস্ত কথা এমন ভাবে ফাঁস করে দেবে তা নির্মলা আশঙ্কা করেনি। তবু একটা কথা ভেবে সে মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল। ভদ্রলোকের অযোগ্য এই জীবিকার জন্য যে তাকেও সাহায্য করতে হয়, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেবল এই নিয়েই যে তার কাটে, মনোহরের হাস্যকর দম্ভের মধ্যে এ কথাটা প্রকাশ হয়নি। এখন পর্যন্ত বাপের বাড়ীর তরফের দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এ সব কথা জানে না। তাদের কাছ থেকে এ তথ্যটা নির্মলা অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে গোপন রেখেছে। বাবা বেঁচে থাকলে এমন সম্বন্ধ তার হ'ত না। দেনায় ডুবু ডুবু দাদা তাকে যে পাত্রস্থ করতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট। তার বর কি করে না করে এটা আর কে যাচাই করে দেখতে আসে। নির্মলা ভেবেছিল ঠিক ঐ রকম কৌশলে নীরদকেও কিছু জানতে দেবে না। নীরদ জেনে যাক মনোহরও ভদ্ররকমের চাকরি বাকরি করে, ভালো খায়, ভালো পরে, কারো চেয়ে সে হীন নয়। কিন্তু নিজের ধৈর্যহীন অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্য এমন কাণ্ড মনোহর করে বসল যে নির্মলার আর মুখ দেখাবার জো রইল না।

ব্যাপারটা এবার নীরদও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারল। মনে পড়ল অনেককাল আগে মনোহরের বরফের কারবারের কথা কার কাছে সে যেন শুনেছিল। কিন্তু কথাটা মোটেই তার মনে ছিল না। তার নিরর্থক মেয়েলি কৌতূহলের জন্যই যে এমন একটি অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হ'ল সে কথা ভেবে নীরদ অপ্রতিভ এমন কি খানিকটা অনুতপ্তই হয়ে পড়ল।

দাওয়ায় পাটি বিছিয়ে বালিশ পেতে এরই মধ্যে পরিপাটি বিশ্রামের আয়োজন ক'রে রাখা হয়েছে। পিতলের ছোট রেকাবিতে এসেছে পান, মশলা। নীরদ একটু সুপারি তুলে নিয়ে বলল, 'যে রকম ব্যবস্থা দেখছি তাতে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এমন একটা জরুরী কাজ আছে আড়াইটের সময়—'

মনোহর বলল, 'রবিবার আবার জরুরী কাজ কিসের। তা ছাড়া গাড়ীও তো নেই এখন।'

দোরের আড়াল থেকে নির্মলা বলল, 'খেয়ে উঠেই যদি ছোটেন লোকে ভাববে দাদার বাড়ীতে কেবল নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু নিমন্ত্রণ খাওয়া ছাড়া আর কি কোন রকম আশা আছে? এতক্ষণ তবু ঘোমটার আড়ালে ছিলেন, এবার গেলেন দোরের আড়ালে। সামনে যে আসবেন এমন কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মনোহর বলল, 'হবে হে ভায়া, সময়ে সব হবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে আসতে দাও।'

নীরদ বলল, 'সত্যি, আজ ভারি দেরী হয়ে গেল ওঁর খেতে।'

মনোহর বলল, 'এ আর নতুন কি। এমন দেরী ওর রোজই হয়।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'রোজ! কেন?'

মনোহর বলল, 'কেন আবার, বেলা একটা দেড়টা তো বরফের ক্ষীর জ্বাল দিতেই কাটে। কুলির মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে আমি বেরোই তবে তোমার বউদি গিয়ে খেতে বসে।'

নীরদ কৌতূহল-কণ্ঠে বলল, 'ও, উনিই বুঝি নিজ হাতে সব করেন?'

'আর কে করবে তবে? এর জন্য কি লোক ভাড়া ক'রে আনব নাকি বাইরে থেকে?'

নির্মলা আর দাঁড়াল না। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু খেতে বসতে তার ইচ্ছা করছে না। মনোহর খুঁটিনাটি নীরদকে সব না জানিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু এসব কথা কি এমনই গৌরবের যে সবাইকে তা বলে বেড়ান যায়।

সিগারেট আনতে মনোহর গেল বাইরে। দোকান কাছাকাছি নেই। খানিকটা দূরেই যেতে হবে। নীরদ বলল, 'থাক না,' কিন্তু মনোহর সে কথা কানে তুলল না।

একটু পরেই রান্নাঘরের কাজ সেরে নির্মলা এসে উপস্থিত হল। বরফের ব্যবসার কথা তার কাছে সব প্রকাশ ক'রে দেওয়া যে নির্মলার ইচ্ছা ছিল না তা নীরদের বুঝতে বাকি নেই, তবু একটু ইতস্তত করে নীরদ বলল, 'ভিতরে ভিতরে যে এত গুণ আছে আপনার সে সব আমার কাছে গোপন করে যাবেন ভেবেছিলেন, না?'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুণ! গুণ আবার কোথায় দেখলেন আমার!'

নীরদ বলল, 'গুণ নয় তো কি! এমন কুলপী বরফ নাকি এ অঞ্চলে আর কেউ তৈরী করতে পারে না। আর এত বড় কথাই আপনি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছিলেন! কিন্তু আজ আপনার হাতের কুলপী বরফ না খেয়ে আমি এক পাও নড়ছি না। হাজার জরুরী কাজ থাকলেও না। বাইরের এত আজে বাজে লোককে খাওয়াতে পারেন আর যত দোষ করলাম বুঝি আমি!'

নির্মলা মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু আজ তো হবে না।'

'বেশ, কবে হবে বলুন। সেদিনই আমি আসব।'

নির্মলা বলল, 'যেদিন আপনার সুবিধা। তৈরী তো রোজই আমাকে করতে হয়।'

নীরদ বলল, 'কিন্তু রোজ তো অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। মনোহরদাও নিমন্ত্রণ করবেন না। আমি আসব সামনের রবিবার। যেচে নিজেই নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন। সেদিন যেন বঞ্চিত না হই।'

কুলপী বরফ রোজ তৈরী করলেও রবিবার একটু বিশেষ আয়োজন করল নির্মলা। অন্য দিনের আটপৌরে বেশটি বদলালো। কড়াই আর ছোট ছোট চোঙাগুলিকে ঝকঝকে করল মেজে। যেখানে বসে তৈরী করে জিনিস, নিকিয়ে পুছে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখল সে জায়গাটা।

নীরদ আজ অনেক সকাল সকাল এসে পৌঁছল। বাজার ক'রে নিয়ে এসেছে বৈঠকখানা থেকে। মাছ, তরকারি, এক ঝুড়ি আম, কুলির হাত থেকে নিজেই সব নামিয়ে রাখতে লাগল দাওয়ায়।

মনোহর বলল, 'এসব কি।'

নীরদ বলল, 'জিজ্ঞেস কর বউদিকে। আজকের নিমন্ত্রণ তিনি করেন নি, করেছি আমি। তিনি শুধু খাওয়াবেন কুলপী বরফ।'

সিগারেট টানতে টানতে নীরদ ছোট্ট উঠানটুকুতে পায়চারি করে আর রান্নাঘরের সামনে এসে একেকবার থামে আর চেয়ে চেয়ে দেখে নির্মলার কুলপী বরফ তৈরীর আয়োজন।

নীরদের এই কৌতূহল মনোহরের কাছেও উপভোগ্য হয়ে উঠল। নিজের ঔৎসুক্যে, আগ্রহে, নীরদ যেন তাদের ব্যবসাকে নতুন মূল্য দিয়েছে, গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে তার আর নির্মলার।

মনোহর বলল, 'নীরদকে একটি বসবার আসন টাসন দাও না এখানে। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে বিদ্যাটি ও শিখে নিতে চায়। সে তো আর অমন ঘুরে ঘুরে হবে না, মন স্থির ক'রে এক জায়গায় বসে শিখতে হবে।'

নির্মলা তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ঘর থেকে বার ক'রে আনল ছোট একখানা জলচৌকি। তার ওপর পেতে দিল চারিদিকে লতা-ঘেরা নিজ হাতে বোনা কার্পেটের আসন। আসনটি তার কুমারী বয়সের তৈরী। স্বামীর ঘরে আসবার সময় নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

মনোহর ঠাট্টা ক'রে বলল, 'ঈস, নীরদ যে একেবারে দেখতে দেখতে গুরুদেব হয়ে উঠলি দেখছি।'

নীরদ সেই আসন-ঢাকা জলচৌকির ওপর বসতে বসতে বলল, 'উল্টো কথা বললে যে মনোহরদা। এখন থেকে গুরু তো হলেন ইনিই। বিদ্যেটা এঁর কাছ থেকেই তো শিখে নিতে হবে।'

নির্মলার সেই ঘোমটার দৈর্ঘ আর নেই। খাটো ঘোমটার ফাঁকে চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানি ভারি সুন্দর লাগল নীরদের। এমন ঘরে এমন মুখ সতিাই অপ্রত্যাশিত।

কথা বলল কিন্তু নির্মলা স্বামীকে উদ্দেশ করেই। বলল, 'তুমিও যেমন. ঠাকুরপো ভেবেছেন আমরা এমনি বোকা যে ওঁর ঠাট্টাটাও বুঝতে পারিনে। এ বিদ্যে শিখবেন উনি কোন দুঃখে।'

জিনিস প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। মনোহর বেরুবার জন্য প্রস্তুত হ'তে গেল। একটা কুলি ঠিক করাই আছে। হাঁড়িগুলি মাথায় ক'রে সেই বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর দিয়ে আসবে ষ্টেসনের কাছে নির্দিষ্ট সেই আমগাছটির তলায়। জলচৌকির ওপর বসে বসে সেখানেই বরফ বিক্রি করবে মনোহর। বছর কয়েক হ'ল এইটুকু আভিজাত্য তার হয়েছে। নিজের মাথায় বয়ে নেয় না হাঁড়ি, ফিরি করে না শহর ভরে। তার বরফের খাবারের ঔৎকর্ষ শহর ভরে লোক জানে। তারা আজকাল নিজেরাই আসে তার কাছে।

মনোহর একটু অন্তরালে গেলে নীরদ বলল, 'বিদ্যাটি শিখতে যত দুঃখ কষ্টই হোক তাতে আমি রাজী আছি। কিন্তু আপনার বোধ হয় শেখাবার দিকে মন নেই।'

নির্মলা ঠোঁট টিপে একটু হাসল, 'আপনাকে শিখিয়ে হবে কি। তার চেয়ে বউ নিয়ে আসুন বিয়ে ক'রে, তাকে দেব শিখিয়ে। বাড়িতে আপনাকে মাঝে মাঝে তৈরী ক'রে দেবে।'

নীরদ বলল, 'কেন. বিয়ে না করলেও মাঝে মাঝে এ জিনিস তৈরী করে খাওয়াবার লোক মিলবে না নাকি?'

নির্মলা বলল, 'তা মিলবেনা কেন। কিন্তু বাইরের লোকের হাতের জিনিস খেয়ে আর কতদিন মন ভরবে?'

নীরদ বলল, 'মনের কথা আপাতত মনেই থাক। তা বাইরে বলে লাভ নেই! কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবেনা সে কথা। যাক, আমি কিন্তু এবার একটা কথা বুঝতে পারছি।'

নির্মলা দুটি আয়ত কৌতূহলী কালো চোখে নীরদের দিকে তাকাল, 'কি কথা।'

নীরদ বলল, 'বরফের হাঁড়ি বয়ে নিতে মনোহরদার কেন কোন কষ্ট হয়না তা আজ বুঝতে পারলাম।'

নির্মলা বলল, 'কিন্তু আজকাল তো উনি নিজে আর বয়ে নেন না।'

নীরদ বলল, 'নিতান্ত বেরসিক তাই। আমি হ'লে চিরকাল বয়ে বেড়াতাম।'

'কেন, বলুন তো।'

'জিনিসগুলি আপনার হাতের তৈরী বলে।'

নির্মলা মুখ টিপে হাসল।'হুঁ, তাই না আরো কিছু। হাঁড়ি বয়ে বয়ে মাথায় যখন টাক পড়ে যেত তখন?'

নীরদ বলল, 'তা পড়তই বা। সেই টাকে বুলাবার জন্য কাঁকন-পরা একখানা হাত তো সেই সঙ্গে পেতাম।'

নির্মলা বলল, 'রক্ষা করুন, টাক আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

মনোহরের মাথায় যে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে এ কথাটা বলতে বলতে নীরদ চেপে গেল, তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু জানেন তো টাকে টাকা আসে।'

নির্মলা বলল, 'কাজ নেই আমার টাকায়!'

খেয়ে দেয়ে বিকালের দিকে নীরদ বিদায় নিল। যাওয়ার সময় আরো একবার প্রশংসা করে গেল নির্মলার কুলপী বরফের। প্রশংসা নির্মলা আরো অনেক শুনেছে। বাজার ভরে সমস্ত লোকই তার হাতের তৈরী জিনিসের তারিফ করে। কিন্তু নীরদের প্রশংসার ভাষা আলাদা। সে কেবল তৈরী জিনিসের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি, হাতের গুণগানও করেছে। গুণ অবশ্য মনোহরও তার গায়। কিন্তু তার গলায় কেবল তার ক্রেতাদেরই প্রতিধ্বনি। একমাত্র নীরদের মুখেই নির্মলা শুনল নতুন সুর, নতুন ভাষা। যা ছিল নিতান্তই গুরুভার প্রয়োজনের বস্তু, দৈনন্দিন জীবিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাকে নীরদ যেন নতুন রূপ দিয়ে গেছে। সে কেবল নির্মলার গুণপনার রূপ। নীরদের হাসি পরিহাসে মিশে নির্মলার কুলপী বরফ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে, হয়ে উঠেছে নতুন রকমের সামগ্রী।

তার তৈরী জিনিসে নিত্য নতুন স্বাদ যাতে আসে, জিনিসের ঔৎকর্ষ যাতে বাড়ে সেদিকে আরও ঝুঁকে পড়ল নির্মলা। মাথা খাটিয়ে রোজ নতুন নতুন ধরণ সে আবিষ্কার করে। নতুন নতুন মশলার ফরমায়েস দেয় মনোহরকে। মনোহর মহাখুশি। বাজারে গিয়ে বসতে না বসতে হাঁড়ি ফুরিয়ে যায়। মাল জুগিয়ে ওঠা যায় না।

মনোহর বলে, 'ঈস্, দু'হাতের বদলে হাত যদি তোর চারখানা হ'ত নির্মলা, চার মাসের মধ্যে পাকা বাড়ী তুলে ফেলতুম।'

নির্মলার মনে পড়ে যায় তার কেবল একখানা হাতের প্রশংসায় আর একজন কেমন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

একটু চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'কিন্তু তা যখন হবার জো নেই আর একটি দু'হাতওয়ালা বউই বরং নিয়ে এসো ঘরে।'

মনোহর বলে, 'উঁহু, তাতে সুবিধা হবে না। সে রকম চার হাতে কেবল হাতাহাতি হবে, কুলপী বরফ তৈরী হবে না।'

যেন হাতাহাতি হবার ভয় না থাকলে মনোহরের তাতে কোন আপত্তি থাকত না।

তারপর থেকে নীরদ প্রায় রবিবারই আসতে লাগল। ছুটি উপভোগের জায়গা হিসাবে স্থানটুকু তার চমৎকার লেগেছে। কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর রাজধানীর এত কাছে এই আধা-শহর আর গ্রামের এক মেটেঘরে যে এমন মাধুর্য তার জন্য প্রচ্ছন্ন ছিল তা কে জানত?

রবিবারও আটটার মধ্যে শিয়ালদ' থেকে বরফ নিয়ে আসে মনোহর। আনে দুধ, চিনি, আরো অন্য সব মশলা। তারপর শুরু হয় নির্মলার কাজ। বরফ কুচোয়, দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে, তারপর দ্রুতহাতে সেই ক্ষীর ছোট ছোট টিনের চোঙাগুলির মধ্যে ভরে শেষে ময়দা দিয়ে আটকে দেয় চোঙার মুখ। যেন অসংখ্য রহস্যের টুকরোকে রাখে আড়াল করে। পিছনের দিকে না তাকিয়েও নির্মলা টের পায়, নীরদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে হাতের কাজ। বরফের খাবার তৈরী করতে করতে অদ্ভুত এক আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করে নির্মলা, যেন সত্যই এক দুরূহ কলাকৌশলময় শিল্প-সৃষ্টিতে সে হাত দিয়েছে।

কুলির মাথায় কুলপী বরফের হাঁড়ি চাপিয়ে খেয়ে দেয়ে মনোহর বেরিয়ে পড়ে। আর দাওয়ায় শীতল-পাটি বিছিয়ে নির্মলা নীরদের জন্য করে বিশ্রামের আয়োজন। বাইরে খর রোদ ঝলসাতে থাকে। কিন্তু আমগাছের ছায়ায় ঢাকা এই ছোট্ট উঠান আর ছোট্ট দাওয়াটুকু ভারি স্নিগ্ধ, ভারি ঠাণ্ডা লাগে নীরদের কাছে। ঝির ঝির করে বাতাস বয়। নির্জন নিস্তব্ধ শহরতলী পড়ে পড়ে ঘুমায়। কিন্তু ঘুম আসেনা নীরদের চোখে। আগাছার জঙ্গলের ফাঁকে দেখা যায় রেল লাইনের উঁচু রাস্তা। হুইসল দিয়ে গাড়ী যায়, গাড়ী আসে। তারপর এক সময় পানের রসে ঠোঁট লাল করে পা টিপে টিপে আসে নির্মলা।

'ওমা, এখনো ঘুমোন নি।'

নীরদ বলে, 'না, ঘুমোলেই তো চোখ বুজতে হবে।'

নির্মলা বলে, 'শোন কথা। যেন চোখ মেলে থাকবার জন্য মাথার দিব্যি কেউ দিয়েছে আপনাকে।'

নীরদ বলে, 'মুখের কথায় দেয়নি; কিন্তু মনে মনে হয় তো দিয়ে থাকবে।'

নির্মলা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, 'বয়ে গেছে মানুষের আপনাকে দিব্যি দেওয়ার। চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে কেবল তো দেখছেন লোহার রেল লাইন।'

নীরদ এবার হেসে চোখ ফেরায় নির্মলার দিকে। বলে, 'কি আর করি বলুন। রেল লাইন ছাড়া আর যা দ্রষ্টব্য এখানে আছে তা ভারি নিষিদ্ধ বস্তু। তাকে চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে থাকা চলে না।'

কথা বলবার ভঙ্গিটা নীরদের জটিল, কিন্তু ইঙ্গিতটা নির্মলার বুঝতে বাকি থাকে না। শব্দের অর্থ সর্বদা বোধগম্য না হ'লেই বা কি, তার ধ্বনির ব্যঞ্জনাই কি কম অনর্থ ঘটায়।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নির্মলা বলে, 'যত সব বাজে বানানো কথা আপনার। আসলে আপনি যে কি জন্য ছটফট করছেন তা জানি। কখন গাড়িতে উঠবেন আর কখন গিয়ে পৌঁছবেন কলকাতা তাইতো ভাবছেন মনে মনে ?'

নীরদ এক মুহূর্ত নির্মলার দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে এটা যেন আপনার নিজের মনের কথা।'

নির্মলা একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'ধরুন না হয় তাই-ই। মানুষের বুঝি আর কলকাতা যেতে ইচ্ছা করে না ? কাছে থাকি অথচ কলকাতা যাওয়া ভাগ্যে আমার মোটে হয়েই ওঠে না।'

'কেন, গেলেই তো পারেন মনোহরদার সঙ্গে।'

'হুঁ, ভালোমানুষ ঠিক করেছেন আপনি। কলকাতা বলতে তিনি তো চেনেন কেবল বৈঠকখানার বাজার। তার ওদিকে নিজেই যেতে সাহস পান না, তারপর আবার আমাকে নেবেন সঙ্গে।'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সাহস পান না কেন ?'

নির্মলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'বোধ হয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

নীরদ বলল, 'তার চেয়ে বেশি ভয় বোধ হয় কাউকে হারিয়ে ফেলবার। আর ভয়টা বোধ হয় নিতান্ত অমূলকও নয়'—বলে নীরদও একটু হাসল, 'আচ্ছা ভাববেন না, আমি জোগাড় করে দেব আপনার পাসপোর্ট। চলুন সামনের রবিবার সিনেমা দেখে আসি মিড-ডে ট্রিপে।'

নির্মলার কালো চোখ দুটি যেন একবার চক্ চক করে উঠল। কিন্তু মুখে বলল, 'দরকার কি ভাই, কাজ নেই গরীবের অমন ঘোড়ারোগে। উনি বলেন কলকাতায় গেলেই নাকি আমার মাথা ঘুরে যাবে, আর এই ছোট শহরে ফিরে আসতে চাইব না।'

নীরদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটু দুলে উঠল, মৃদু কম্পিত গলায় বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। না ফিরতে চান নাই চাইবেন।'

মনোহর বাড়ী এলে প্রস্তাবটা তার কাছেও পাড়ল নীরদ। বলল, 'ভেবেছি সামনের রবিবার বউদিকে একটু সিনেমা দেখিয়ে আনব কলকাতা থেকে, তুমিও চল মনোহরদা।'

মনোহর স্থিরদৃষ্টিতে নীরদের দিকে তাকাল, তারপর বলল 'ক্ষেপেছিস ?'

নীরদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কেন, দোষটা কি ?'

মনোহর হেসে উঠল, 'ওই দেখ, চোরের মন বোঁচকার দিকে। দোষের কথা কে বলল। আমি গেলে লোকসান হবে তাই বলছি। বেশ তো, যেতে চাস তোরা যাবি।'

নীরদ বলল, 'না, তুমি না গেলে হবে না।'

মনোহর বলল, 'খুব হবে। কথাটি আমিই তোর কাছে বলব ভাবছিলাম, 'কলকাতা যাব কলকাতা যাব' বলে মাথা আমার খুঁড়ে খাচ্ছিল একেবারে। যেন ভারি মধু আছে কলকাতায়। তুই যদি ভারটা নিস ভালই হয়।'

নীরদ যে নির্মলার রূপগুণের প্রশংসা করছে, ক্রমশ বাধ্য হয়ে উঠছে তার, এতে মনোহর এক ধরনের গর্বই অনুভব করছিল মনে মনে। এমন কি সমব্যবসায়ী দু' একজনের কাছে একথা সে বলেওছে। নির্মলা যে সত্যিই খুব দামী মেয়ে এ কথা নীরদের মত উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ভদ্রসমাজের ছেলের মুখে শুনলে স্ত্রীর সম্বন্ধে অহঙ্কারের ভিত্তিটা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। এখানকার লোক তো নির্মলার প্রশংসা করবেই। তারা ক'টি মেয়েই বা দেখেছে, ঘরের বউ ছাড়া ক'টি মেয়ের সঙ্গেই বা মিশেছে। কিন্তু নীরদ তো আর তেমন নয়। কত মেয়ের সঙ্গে সে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কত পার্টিতে, জলসায়, কত রূপবতী গুণবতীর সান্নিধ্যে এসেছে সে, সুতরাং তার সার্টিফিকেটের দাম আছে।

পরের রবিবার একটু সকালে সকালেই কাজকর্ম সেরে নিল নির্মলা। তারপর মাতলো সাজসজ্জা নিয়ে। চুল বাঁধল, আলতা পরল, সব চেয়ে ভালো শাড়িখানা নামাল বাক্স থেকে, গয়না যে কয়েকখানা ছিল বার করল, তবু মনের মত সাজ যেন আর হয় না।

নীরদ বলল, 'কিছু কমিয়ে টমিয়ে আসুন বউদি। আপনার পাশে লোকে যে আমাকে গমস্তা বলে ভাববে।'

নির্মলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তার চেয়ে বড় কিছু ভাবুক তাই আপনি চান বুঝি।'

নীরদ বলল, 'না না না, অত স্পর্দ্ধা রাখি না।'

বহু সাধাসাধি উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও মনোহর গেল না তাদের সঙ্গে। কেবল বলতে লাগল, 'তাতে ক্ষতি হবে, লোকসান হবে ব্যবসার।'

গাড়ীতে তুলে দেওয়ার সময় বলল, 'সাবধান হে ভায়া, দেখো যেন হারিয়ে টারিয়ে এসনা।'

নীরদ মৃদু হেসে বলল, 'অত যদি ভয় নিজেও চলনা সঙ্গে।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মনোহর বলল, 'তা ভয় তো মনে একটু রইলই। এ তো আর যে সে স্ত্রী নয়, একেবারে আমার কারবারের মূলধন নিয়ে চলেছ সঙ্গে।'

কথাটা নীরদ আর নির্মলা দু'জনের কানেই হঠাৎ বড় স্থূল শোনাল। কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পর বেশিক্ষণ তা আর কারোরই মনে রইল না।

ছোট খাঁচার ভিতর থেকে হঠাৎ যেন এক বৃহত্তর পৃথিবীতে ছাড়া পেয়েছে নির্মলা। নীরদ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল উল্লাসে-আনন্দে নির্মলার রূপ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আরও উচ্ছল, আরও প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে নির্মলাকে।

ইণ্টারক্লাস কামরায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নির্মলাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। পাশে একটি যুবক বসে ছিল। সঙ্কোচের সঙ্গে একটু স'রে এসে সেও নীরদকে বসবার অনুরোধ জানাল। বলল, 'যেন তেন প্রকারে আপনিও এখানে এসে বসে যান মশাই। না হলে যে ভদ্রলোক উঠে গেলেন তাঁর আত্মত্যাগ সার্থক হবে না। মিসেস বসবার জায়গা পেয়েও শান্তি পাবেন না মনে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও মৃদু হাসলেন, বললেন, 'তা যাই বলুন মশাই, ভারি চমৎকার মানিয়েছে এঁদের। যেন একেবারে লক্ষ্মীনারায়ণ।'

নীরদ আর নির্মলা দু'জনেই দু'জনার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। কেউ কোন কথা বলল না।

শিয়ালদ' থেকে দুবার করে ট্রামে উঠতে নামতে হল। তারপর তারা পৌঁছল এসে সুসজ্জিত সিনেমা হাউসটির সামনে।

ছবিটি বোধ হয় একদিন কি দুদিন আগে মাত্র সুরু হয়েছে। শুভারম্ভের কলার চারা আর মঙ্গল-কলস এখনো রয়েছে দু পাশে।

নির্মলা বলল, 'এ যে একেবারে বিয়ে-বাড়ীর মত সাজিয়েছে দেখছি।'

নীরদ পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। আসুন দেখা যাক, ভিতরে বাসরঘরেরও কোন ব্যবস্থা করেছে কি না।'

সেকেণ্ড ক্লাসের একেবারে পিছনের সারিতে পাশাপাশি দুটি সিটে নির্মলাকে নিয়ে বসল নীরদ। আসল বই আরম্ভ হওয়ার আগে সুরু হবে দেশের সংবাদের চিত্ররূপ ও তারপর একটি কুকুর গিয়ে কি ক'রে চিড়িয়াখানার একপাল ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পড়ল রঙে বেরঙে তার বিচিত্র কাহিনী।

দেখতে দেখতে নির্মলা একেবারে মগ্ন হয়ে গেল। আর পাতলা অন্ধকারে নির্মলার অস্পষ্ট তনু-দেহটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নীরদ।

একটু বাদেই আলো জ্বলল। কাঠের ট্রেতে ক'রে একটি সুদর্শন হিন্দুস্থানী ছোকরা কতকগুলি আইসক্রীম নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, 'লিজিয়ে বাবুজী।'

নীরদ স্মিতহাস্যে দুটি আইসক্রীমের দাম দিয়ে দিল। তারপর একটি নিজের হাতে তুলে দিল নির্মলাকে। আঙুলে আঙুলে লাগল ছোঁয়া। একটা অদ্ভুত অনাস্বাদিত আনন্দে নির্মলার সর্বশরীর শিহরিত হয়ে উঠল। তারপর কাঁচের ছোট্ট সুগোল সুন্দর বাটিটিতে মুখ ছুঁইয়ে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নির্মলা হঠাৎ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'বাঃ! বেশ চমৎকার হয়েছে তো। অবশ্য

আমিও যে এমন না পারি তা নয়। দামী মালমসলা যদি পাই, স্বাদে গন্ধে আমার কুলপী বরফ কেবল বেলঘরিয়া কেন কলকাতার বাজারকেও টেক্কা দিতে পারে।'

পরম আত্মপ্রসাদে আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা নীরদের দিকে ফেরালো নির্মলা।

কিন্তু ততক্ষণে আশেপাশের আরো কয়েকটি সুশ্রী সুবেশা তরুণী সকৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়েছে।

মুহূর্তের জন্য লজ্জায় আর অপমানে আরক্ত হয়ে উঠে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল নীরদের মুখ। চাপা ধমকের স্বরে বলল, 'ছিঃ, রক্ষা করো, কুলপী বরফ এখন থাক।'

ভারী একখণ্ড পাথর যেন নির্মলার হৃদয়ের ওপর সশব্দে গিয়ে পড়েছে। বিস্মিত বেদনার্ত চোখ দুটি নীরদের দিকে তুলে ধরল নির্মলা। পুরু চশমার ভিতর দিয়ে নীরদের আরক্ত ঘোলাটে দুটি চোখ দেখা যাচ্ছে। সে চোখে মোহ নেই, মাধুর্য নেই, অদ্ভুত ঘৃণায় আর বিদ্বেষে চোখ দুটি পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

খানিক বাদে নির্মলার ঠোঁটেও তীক্ষ্ণ একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে নির্মলা বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল ঠাকুরপো।'

নীরদ কোন জবাব দিল না, তার চোখের দৃষ্টিও তখন অন্যদিকে। নির্মলাও ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

চিত্রগৃহের সব কটি আলোই এতক্ষণে নিভে গিয়েছে। অন্ধকার কালো পর্দায় এবার আসল ছবি আরম্ভ হবে।

ভাদ্র ১৩৫৩

দ্বিরাগমন

বছর সাতেক আগে পূর্ববঙ্গের একটি মহকুমা শহরে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ঘটনা না বলে তাকে দৃশ্য বলাই ভালো কেননা, কোন প্রসঙ্গে সেই ঘটনার কথা মনে হলে আজও ছবির মত তা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কি একটা ছুটি উপলক্ষে সেই শহরে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাসখেলা আর নৌকা বাচ্ ছাড়া সময় কাটানোর আর কোন উপায় ছিল না। বন্ধুটির আবার তাসের উপরই আসক্তি ছিল বেশি।

যতীশদের বাইরের ঘরে মাদুর বিছিয়ে সেদিনও খাওয়া দাওয়ার পর তাস নিয়ে বসেছি—বাইরে থেকে কে ডাকল, "যতীশবাবু, যতীশবাবু আছেন?"

তাস ফেলে যেভাবে মুখখানা বিকৃত ক'রে যতীশ ঘর থেকে বারান্দায় নামল, তাতে আমরা না হেসে উঠে পারলাম না। কিন্তু বাইরে থেকে যতীশের বিস্মিত, কিছুটা বরং উদ্বিগ্ন, স্বর শুনে আমরা হাসি থামিয়ে কান খাড়া ক'রে রইলাম।

যতীশকে বলতে শুনলাম, "এ কি বজলু, ব্যাপার কি বল তো।"

বজলু বলল, "ব্যাপার আর কি, আতোয়ার সাহেব কিছুতেই শুনলেন না। ছোট দিদিজানকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেছেন ঘাটে। বড়দিদিজান কাঁদতে কাঁদতে গেছেন পিছনে পিছনে। আমাকে বললেন, যতীশদাকে খবর দিয়ে এসো।"

যতীশ কিছুটা হতাশার সুরে বলল, "আমি গিয়েই বা কী করব।"

পরমুহূর্তে যতীশ ঘরে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খেলাটা খানিকক্ষণ বন্ধ রাখতে হচ্ছে প্রশান্ত, একটু কাজে যাচ্ছি।"

তারপর অন্য দুজন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনলাম চৌধুরী সাহেবের ছোট মেয়েকে নাকি তার স্বামী জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চল না, কিছু করা যায় কিনা দেখি।"

কিন্তু সঙ্গীরা মাথা নাড়ল, "দরকার নেই ভাই, ওসব হাঙ্গামা হুজ্জুত সহ্য হবে না।"

বললাম, "আমি যদি আসি তোমার কোন আপত্তি নেই তো যতীশ?"

যতীশ বলল, "না, আপত্তির কি আছে, এসো।"

যতীশের পিছনে পিছনে মিনিট দশেক হেঁটে খালের ধারে এসে পৌঁছলাম। বজলুই আগে আগে পথ দেখিয়ে নিল। গোটা তিনেক ঘাট ছাড়িয়ে ছোট্ট একটি ঘাটের সামনে বজলু থেমে দাঁড়াল। বলল, "ওই দেখুন।"

দেখলাম ইতিমধ্যেই সেখানে জনতিরিশেক লোক জড়ো হয়েছে। অধিকাংশই স্থানীয় মুসলমান। হাবে।ভাবে তাদের মধ্যে মজা দেখবার মনোভাবটাই বেশি বলে মনে হল।

ঘাটের কাছাকাছি দুটি মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। দুজনেরই বেশবাস এলোমেলো হয়ে গেছে। দেখে মনে হল সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমান ঘরের মেয়ে। কিন্তু এমন চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। যে কোন অভিজাত বড় ঘরেই এরা মানাতো। দুজনেরই রং ফর্সা। আর বড় বড় চোখ, সুন্দর মুখের গড়ন, বড়টির বয়স একুশ বাইশ, ছোটটি আঠার উনিশ। চেহারার সাদৃশ্য এত বেশি যে দেখেই বোঝা যায় দুটি বোন, বলে দিতে হয় না। ছোট মেয়েটি বড় বোনের কাঁধে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আর তার দিদির চোখেও জল টলটল করছিল।

যতীশ কাছে গিয়ে বলল, "কি হয়েছে কুসুম?" বড় মেয়েটি একটু যেন চমকে উঠল।

"এই যে তুমি এসেছ, যতীশদা।" তারপর নালিশের ভঙ্গিতে বলল, "আতোয়ার জোর ক'রে রোশেনাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কারো কথাই শুনছে না।"

যতীশ কোন জবাব দেওয়ার আগেই ঘাটজোড়া একখানা বড় নৌকার ওপর দাঁড়ানো পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক বলে উঠল, "ঈস, আবার নালিশ করা হচ্ছে। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব তাতে কার কি বলবার আছে শুনি? কি করবার ক্ষমতা আছে তোমার যতীশদার?"

এতক্ষণে যুবকটির দিকে ভালো করে তাকালাম। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং খুব কালো। ছোট ছোট চোখ আর নাক দেখে শ্রীহীনের পর্যায়েই ফেলা যায়। এমন একটি সুন্দরী মেয়ের স্বামী বলে ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু চেহারার চেয়েও ওর অভদ্রতা আমাকে বেশি পীড়া দিচ্ছিল।

যতীশ শান্তভাবে বলল, "ক্ষমতা অক্ষমতার কথা তো হচ্ছে না আতোয়ার সাহেব। আপনার স্ত্রীকে আপনি নিয়ে যাবেন তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে। আর সে আপত্তি আপনি শুনবেনই বা কেন। কিন্তু আপনার স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলেও একটা জিনিস আছে। এখন যদি না যেতে চায়, বেশতো না হয় দুদিন পরেই নেবেন।"

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনার ওকালতি আমি শুনতে চাইনি যতীশবাবু। যত সব চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। সবাইকেই আমি চিনি।" তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হুকুম করল, "ভালো চাওতো এখনও নৌকায় উঠে এসো রোশেনা। এটা ঠিক জেনো এখানে কেউ তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না। খালি নৌকা আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না।"

রোশেনা জলভরা চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, "দিদি, ওকে বলে দাও, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।"

আতোয়ারের আর ধৈর্য রইল না। নৌকা থেকে এক লাফে ডাঙ্গায় নামল। তারপর রোশেনার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে আনল দিদির কোল থেকে। টানতে টানতে রোশেনাকে নৌকায় তুলে বলল, "যাব না! দেখি, না গিয়ে তুমি পার কী করে।"

রোশেনা একবার তার দিদির দিকে আরেকবার যতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে সত্যিই নিয়ে গেল যে।"

ওর সুর্মাপরা চোখের কোলে দেখা গেল জল টলমল করছে।

কুসুম শাসনের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলল, "খবরদার আতোয়ার! এর ফল কিন্তু ভালো হবে না, তা বলে দিচ্ছি। দেশে এখনও আইন আদালত আছে।"

যতীশ কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "ছিঃ কুসুম, ঝগড়া ক'রে চেঁচামেচি ক'রে কি কিছু লাভ

আছে ?"

কুসুম বলল, "তুমিও এইকথা বলছ যতীশদা ! রোশেনাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও তুমি কথাটি বলছ না, উল্টে আমাকে দোষ দিচ্ছ।"

কুসুমের আয়ত সুন্দর চোখে এতক্ষণ যে জল থমকে ছিল, যতীশের কথায় তা এবার গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

যতীশ নৌকার একেবারে কাছে গিয়ে বলল, "আতোয়ার সাহেব, আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান, বড় বংশের ছেলে—আপনার কি এসব খাটে ?"

আতোয়ার শ্লেষ ক'রে বলল, "সে তো বটেই। বিদ্বান বুদ্ধিমানেরা কি আর সবাই বউ নিয়ে ঘর করে। পরের ভোগের জন্য তারা বউকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে যায়। আপনি বলে ফের শালিসী করতে এসেছেন। কোন মুসলমানের বাচ্ছা হলে সরমে ঘর থেকে বেরোতে পারত না।"

দেখলাম আতোয়ারের কথায় কুসুম আব রোশেনা দুই বোনেরই মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রাগে আর অপমানে যতীশের মুখও লাল হয়ে উঠল।

যতীশ বলল, "আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন আতোয়াব সাহেব।"

ইতিমধ্যে দু'তিনজন প্রৌঢ় মাতব্বর গোছের মুসলমান মাঝখানে এসে পড়লেন। তাঁরা বললেন, "যা হবার তাতো হয়েই গেছে যতীশবাবু। এ নিয়ে আর ঝামেলা করবেন না। বয়স্কা মেয়ের স্বামীর ঘর কবাই ভাল। তা না হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। একসঙ্গে থাকলে দেখবেন দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া বয়সের একটা ইয়ে আছে তো—"বলে বয়স পার-হওয়া প্রৌঢ়রা একটু হাসলেন।

মাঝিরা আর দেরী করল না। মালিকের হুকুম পেয়ে লম্বা লগি দিয়ে খালের জলে খোঁচ দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে কুসুম কেঁদে উঠল। লগির খোঁচ যেন মাটিতে নয় তার বুকে গিয়ে লেগেছে। দোমাল্লাই নৌকা এগিয়ে চলল। নৌকার ভেতরে রোশেনার চাপা কান্নার শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়া কুসুমকে যতীশ বলল, "ছিঃ অমন কোরো না কুসুম। তোমার এ সব শোভা পায় না।"

মাতব্বরদের মধ্যে একজন বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না যতীশবাবু। কুসুম বিবিকে আমরাই এগিয়ে দিয়ে আসব।"

জ্বলন্ত চোখে তাঁদের দিকে কুসুম একবার তাকাল। তারপর যতীশের দিকে ফিরে বলল, "চল যতীশদা।"

যতীশ এবার আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলল."তুমি বাড়ি যাও প্রশান্ত। মাকে বলো আমি চৌধুরী সাহেবের বাসায় গিয়েছি, খানিক বাদে ফিরব।"

যতীশ ফিরে এল সন্ধ্যাব পর। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে দুজনে মুখোমুখি চেয়ার পেতে বসলাম বারান্দায়। একটু চুপ ক'রে থেকে যতীশ বলল, "তুমি বোধহয় খুব অবাক হয়ে গেছ।"

বললাম, "তুমিও কি হওনি।"

যতীশ বলল, "না। একেবারে তোমার মত নয়। একটু সবাক না হলে ঘটনাটা তোমাকে বোঝাতে পারব না ! আর তাতে তোমার মনেও কিছু হেঁয়ালী থেকে যাবে।—

ছেলেবেলা কুসুম আর রোশেনা আমার কাছে পড়ত। ওদের বাবা আমিনর রহমান চৌধুরী বয়সের দিক থেকে এখানকার সবচেয়ে পুরোন উকিল। অবশ্য পসার-প্রতিপত্তির দিক থেকে নয়। ভদ্রলোক আমার বাবার বন্ধু এবং অত্যন্ত হিন্দুঘেঁষা। আমিনর সাহেবের বাড়িতে হিন্দু ছেলেদের ভীড়। গানবাজনার জলসা। আমিনর সাহেবের মেয়েরাও অবধি সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকে, চায়ের নিমন্ত্রণে সাড়া দেয়। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে বিধবা হয়েও কুসুম আর বিয়ে করতে চায় না। ভালো ভালো সম্বন্ধ উপস্থিত হলেও রোশেনা বাপ আর দিদির কাছে কেবল অনিচ্ছা জানায় এবং চৌধুরী সাহেবও যে মেয়েদের রুচিমত খুশিমত চলেন তা এখানকার

মুসলমান সমাজ ঠিক সুনজরে দেখতে পারেনি। ফলে এই চৌধুরী পরিবার অনেক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়েছে। এমন কি চৌধুরী সাহেবের সেরেস্তায়ও মুসলমান মক্কেল দিনের পর দিন কমে এসেছে। বাবা অনেকবার সাবধান ক'রে দিয়েছেন আমিনর সাহেবকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ঘরের কোণে পুরোন একটা ইজিচেয়ারে তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কারো কথায় কান দেননি। ক্রমে সংসারের অবস্থা অচল হবার জো হল। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। একদিন তিনি নিজেই অচল হয়ে পড়লেন। তাঁর ডানদিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে গেল।

জমিজমা কিছু করতে পারেননি। ব্যাঙ্কে জমার ঘরও শূন্যপ্রায়। আত্মীয়স্বজনও তেমন কেউ নেই। খবর পেয়ে কুসুম সেই যে শ্বশুরবাড়ি থেকে এল, আর কিছুতেই বাপকে ছেড়ে যেতে পারল না। সংসার চালাবার ভার তার ওপরই পড়ল। এখানকার অভিজাত মহলে ঘুরে আমি ওকে কয়েকটা গানের ট্যুইশন জুটিয়ে দিলাম। দুই বোনেরই গানের রেকর্ড করবার ব্যবস্থা কবলাম।

হিন্দু মুসলমান শহবের সকল যুবকেব নজর গিয়ে পড়ল এই দরিদ্র পবিবারটিব ওপর। লোভও বলতে পার। দুই বোনের রূপগুণের খ্যাতি শুনে, দুই বোনেরই চমৎকার সম্বন্ধ আসতে লাগল। কিন্তু কেউ তা কানে তুলল না। তারা তিন জনে মিলে যে দুর্গ রচনা করেছে, তার মধ্যে আব যেন কারো স্থান নেই। পৃথিবীর আব সবাই যেন সেখানে বাহুল্য। বাপ মেয়ে বোনে বোনে এমন অদ্ভুত সম্পর্ক আমি আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু লোকে তা শুনবে কেন, নানারকম নিন্দা অপবাদ বটাতে লাগল।

অতিষ্ঠ হয়ে কুসুম বলল, 'তুই বিয়ে কব বোশেনা। নুরপুবের আতোয়াব সাহেব লোকটি বেশ ভালোই, বিদ্বানও শুনেছি।'

আতোয়ার নুরপুব হাইস্কুলের হেডমাষ্টার।

রোশেনা হেসে বলল, 'এত যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তুমিই কর।'

কুসুম বললে, 'দূর, আমাব হাতে পডলে বেচারা অকালে প্রাণ হারাবে। একবাব তো ক'বে দেখলাম, বছরখানেকও টিকল না। পরের ছেলের ওপর দিয়ে বারবাব এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা ভালো নয়। তোকেই বিয়ে করতে হবে রোশেনা।'

শেষ কথাটায় কুসুমেব একটু আদেশের সুরই বেজে উঠল।

তারপর বিয়ে হয়ে গেলেও আতোযাবকে কেন যে রোশেনার পছন্দ হল না আমি তা জানি না। এইটুকু জানি আর যাই হোক তাব প্রণয়ভাজন এই অভাজন নয়। কুসুম সম্বন্ধেও সেই কথা। ইনিয়ে-বিনিয়ে পায়ে পড়েই কাঁদ, আর জোব ক'রে ছিনিয়েই নাও, সবাইর হৃদয় যে সকলের সামনে খোলে না, একথাটা আতোয়াব বুঝতেও পাবেনি। বিশ্বাসও কবেনি।

কিন্তু ছোট বোন শ্বশুববাড়িতে গেলে কোন দিদিব মনে যে এবকম মৃত্যুশোক উপস্থিত হয় তা আজ আমি এই প্রথম দেখলাম। বাড়িতে গিয়েও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কুসুমের সে কি কান্না!

'তুমি কেন ছেড়ে দিলে। তুমি কেন বাধা দিলে না, যতীশদা।'

যত বলি—আতোয়ার শিক্ষিত, ভদ্ররুচির ছেলে। বোশেনাকে এতদিন পায়নি বলেই সে এমন হিংস্র নির্মম হয়ে উঠেছে; কুসুম ততই ক্ষেপে যায়। বলে, 'ছাই চিনেছ তুমি, ও একটা পশু, একটা জানোয়ার। ও না কবতে পারে এমন কাজ নেই। কোন মেয়ে ওকে কোনদিন ভালোবাসতে পারবে না।'

এরপর আমার আর কি বলার থাকতে পারে। তার সেই রাগ সেই কান্নার দিকে তাকিয়ে তোমাকেও চুপ ক'রে থাকতে হত প্রশান্ত। তুমিও কোন কথা খুঁজে পেতে না।"

এই ঘটনার বছর তিনেক বাদে আরও একবার সেই শহরে আমাকে যেতে হয়েছিল। উপলক্ষ ছিল যতীশের ছেলেব অন্নপ্রাশন। অফিস থেকে ছুটি পাওয়া কষ্ট। কিন্তু যতীশ আর তার মা-বাবার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

শহরের গণ্যমান্যদের মধ্যে অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন দেখলাম। যতীশদের স্বজন বন্ধুরাও

অনেকে এসেছেন। মাছ মাংস পোলাও ওর মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ ক'রে একে একে সবাই বিদায় নিলেন।

যতীশকে বললাম, "রাত্রেও তোমার গেষ্ট আছে নাকি?"

যতীশ বলল, "দুচার জন ক্রিশ্চিয়ান আর মুসলমান বন্ধুবান্ধব আসবেন। অফিসার মহল থেকেও দু'চারজনের আসার কথা আছে।"

রাত্রের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আতোয়ার আর সেই দুই বোনের এক জনকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

অবাক তাদের উপস্থিতিতে হইনি। হয়েছি তাদের চোখমুখের প্রসন্নতায়, চলাফেরার মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাব লক্ষ্য করে। সেদিনের প্রৌঢ় মাতব্বরেরা তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলেন। অবশ্য যতীশের বাড়িতে আতোয়ার এসেছে বলে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম একথা অস্বীকার করব না।

যতীশ স্মিতমুখে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ ক'রে যতীশ বলল, "ইনি মিসেস কুসুম কাজি। আমার ভূতপূর্বা ছাত্রী, আর ইনি ওঁর স্বামী আতোয়ার সাহেব।"

কুসুমের স্বামী আতোয়ার! যতীশ ভুল বলল, না আমিই ভুল শুনলাম, হঠাৎ ঠিক ক'রে উঠতে পারলাম না। আরেকটু হলেই আমার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের কথা বেরিয়ে পড়ত। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করলাম। ওদের সঙ্গে সেলাম বিনিময় করলাম।

আমি পরের দিন চলে যাব শুনে সকালে ওরা আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। কথায় কথায় জানা গেল, ওরাও কাল আটটা নটায় চলে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে নিমন্ত্রণের ভিড় কাটলে যতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা আমার যেন মনে পড়ছে দুই বোনের মধ্যে বড়টিই ছিল কুসুম আর ছোটটি রোশেনা। গোলমালটা তাকে নিয়েই হয়েছিল।"

যতীশ ঠোঁট টিপে হেসে বলল, "হ্যাঁ।"

বললাম, "তাহলে তুমিই ভুল করেছ বল। রোশেনা বলতে গিয়ে কুসুম বলেছ।"

যতীশ বলল, "না, আমি ঠিকই বলেছি। যাকে দেখলে সে কুসুমই, রোশেনা নয়।"

অবাক হয়ে বললাম, "কুসুম! সে কেন বিয়ে করতে যাবে আতোয়ারকে! আর কুসুমই যদি হবে, তাহলে তার কি এই ক'বছরে বয়স একটুও বাড়েনি।"

যতীশ ঠাট্টা ক'রে বলল, "প্রথমে বেড়েছিল। তারপরে ফের কমতে শুরু করেছে। তাছাড়া ও বোধহয় শুধু আর কুসুম নয়, ওর মধ্যে রোশেনাও আছে।"

বললাম, "হেঁয়ালি রাখ। কেন, আসল রোশেনার কি হল?"

যতীশ সিগারেট ধরিয়ে বলল, "মারাত্মক কিছু হয়নি। আতোয়ার তালাক দেওয়ার পর বছরখানেকের মধ্যেই তার আবার বিয়ে হয়েছে। ভালো ঘর, ভালো বর। ভদ্রলোক সরকারি অফিসার, এখন সপরিবারে করাচীতে আছেন।"

বললাম, "কিন্তু কুসুমের এমন মতি হল কেন?"

যতীশ অদ্ভুত একটু হাসল। "মেয়েদের মন, বন্ধু, দেবতারাই জানেন না, আর কুতঃ যতীশঃ! তবু আমাকে ইসারায় কুসুম যতটুকু জানিয়েছে ততটুকু তুমিও শোন।—

মাতব্বরদের বচন সেবার সার্থক হয়নি। রোশেনা সেবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর দু'তিন মাস কাটতে না কাটতেই স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার নানারকম অশান্তি আর অ-বনিবনার খবর আসতে লাগল। এর আগেও রোশেনা দু'একবার স্বামীর ঘরে গিয়েছে কিন্তু মনোমালিন্যটা কোনবার এমন চরমে গিয়ে ওঠেনি; মতান্তর কেবল মনে আর বাক্যেই নয়—আতোয়ারের হাতও নাকি মাঝে মাঝে চলেছে। দু'জনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তালাক দিতে আতোয়ারই এগিয়ে এল। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে দু'পক্ষের মিল হওয়ায় মামলা মোকদ্দমার আর দরকার হল না।

রোশেনা ফিরে এল কুসুমের কাছে। কিন্তু আগের মত সেই দিদি-সর্বস্বতা আর নেই। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে রোশেনা। ঘরের নির্জন কোণে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মাঝে মাঝে অন্যরকম মেজাজও আবার দেখা যায়। দেখা যায় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করছে।

কুসুমকে চিন্তিত দেখা গেল।

বললাম, 'ওর আবার বিয়ে দাও কুসুম।'

আমিনর সাহেবেরও সেই মত।

সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছিল। অপপ্রচারের ফলে কিছু অখ্যাতি অপবাদ এদেব থাকলেও দুবোনেরই শিক্ষা সংস্কৃতি রূপলাবণ্য সেই অপবাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দু'একটা সম্বন্ধ নাকচ করা হল। তারপর এলেন সেই অফিসার। বেশ সুদর্শন চেহারা। মিষ্টি কথাবার্তা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। দেখে রোশেনা খুশি হল। কুসুমও।

আনাগোনা খোঁজখবরে আরও দু'মাস কাটল। তারপর তার সঙ্গে রোশেনার বিয়ে হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'খবরদার ফের যেন কান্নাকাটির কথা না শুনি।'

রোশেনা ঠোঁট টিপে হাসল।

আরও মাসখানেক কাটল। কুসুম ট্যুইশন করে, মক্কেলদের দলিলপত্র বাবাকে পড়ে শোনায়। তাঁর হয়ে মুসবিদা করে। মুহুরিদের সঙ্গে আলাপ করে আর অবসর সময় সেতার বাজায়।

একদিন ট্যুইশন থেকে ফেরার পথে আতোয়ারের সঙ্গে কুসুমের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষী হয়ে আতোয়ার শহরে এসেছিল। ভূতপূর্বা শালীর মুখোমুখি পড়ে যাবে ভাবেনি। প্রথমটায় দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর আতোয়ার বলল :

'আপনার বাবা কেমন আছেন?'

কুসুম লক্ষ্য করল আতোয়ারের চেহারা ভারি খারাপ হয়ে গেছে। রোগাটে মুখ, চুলগুলি উস্কোখুস্কো। শরীরের দিকে কোনরকম নজর নেই। আতোয়ার বলে যেন চেনাই যায় না।

একটু চুপ ক'রে থেকে কুসুম বলল, 'একই রকম আছেন। চলুন না, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।'

আতোয়ার একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'কিন্তু তিনি বিরক্ত হবেন না তো।'

এই কি আতোয়ারেব গলা, আতোয়ারের ব্যবহার?

কুসুম লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, বিরক্ত হবেন কেন? চলুন।'

চৌধুরী সাহেব ভূতপূর্ব জামাইকে দেখে খুশিই হলেন। এত সব কাণ্ডকারখানার পরও যে আতোয়ার তাঁকে দেখতে আসবে, তিনি তা আশা করেননি। আদর ক'রে তিনি আতোয়ারকে পাশে বসতে দিলেন। এত আদর জামাই থাকা কালেও বোধহয় আতোয়ার পায়নি। চৌধুরী সাহেবের আজ আর কোন ক্ষোভ নেই, কোন বিদ্বেষ নেই। কারণ পরের বারের বিয়েতে রোশেনা সুখী হয়েছে।

আতোয়ারের চেহারার দিকে তাঁরও চোখ পড়ল। বললেন, 'কোন অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি? চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে।'

ম্লান হেসে আতোয়ার জবাব দিল, 'না।'

চৌধুরী সাহেব খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর লজ্জার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে টিয়ে করেছ তো?'

এবার আর আতোয়ার হাসল না। মৃদুস্বরে বলল, 'না।'

চৌধুরী সাহেব ছোট একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

কুসুম উঠে যেতে যেতে বলল, 'যাই তোমার জন্য চা নিয়ে আসি বাবা।'

চৌধুরী সাহেবকে চা দিতে এসে আতোয়ারকে লক্ষ্য ক'রে কুসুম বলল, 'কাজী সাহেবের আমাদের হাতে চা খেতে কোন আপত্তি নেই তো?'

চৌধুরী সাহেব মেয়ের দিকে ভ্রূকুটি করলেন। আতোয়ার অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, 'তাই শুনে বুঝি চায়ের ব্যবস্থা হবে?'

কুসুম বলল, 'তা ছাড়া কি! মিছিমিছি ফেলে কি লাভ হবে। তা হলে দয়া ক'রে চলুন ও ঘরে।'

পাশের ঘরে গিয়ে আতোয়ার দেখল কেবল চা-ই নয় ছোট একটু জলখাবারেরও আয়োজন করা হয়েছে।

আতোয়ারকে খেতে দিয়ে কুসুম বলল, 'ভেবেছিলাম নাওয়া খাওয়া বোধহয় আপনি ছেড়েই

দিয়েছেন।'

একটুকরো মিষ্টি ভেঙে মুখে দিতে দিতে আতোয়ার বলল, 'কেন?'

কুসুম বলল, 'কেন কি জানি। বোধহয় বৌয়ের শোকে—' কুসুমের পাতলা ঠোঁটে শাণিত একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

আতোয়ারের মুখ অত্যন্ত করুণ আর বিবর্ণ দেখাল। মনে হল একটা তীর গিয়ে তার বুকে বিঁধেছে। মিষ্টিটুকু কোনরকমে খেয়ে আতোয়ার বলল, 'আপনি সত্যি কথাই বলেছেন।'

কুসুম বলল, 'তাই নাকি। তাহলে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন না।'

আতোয়ার ম্লান মুখে একটু হাসল। তারপর বলল, 'এবার তাহলে চলি।'

কুসুম বলল, 'কোথায় উঠেছেন এখানে?'

আতোয়ার বলল, 'একটা হোটেলে।'

কুসুম বলল, 'হোটেলের চেয়ে এ জায়গাটা কি এতই খারাপ যে, এত তাড়াহুড়া করছেন।'

যে জবাবটা আতোয়ারের মুখে এসেছিল সেটা বেরোতে বেরোতে আটকে গেল।

সে রাত্রে কুসুম আর চৌধুরী সাহেব তাকে ছাড়লেন না। কুসুম নিজে হাতে রান্না ক'রে আতোয়ারকে কাছে বসিয়ে খাওয়াল। আজ তার মনেও কোন ক্ষোভ নেই, আতোয়ারের কাছে তাদের আর আশা করবার কিছু নেই। দুঃখ করবারও আর ভয় নেই। বোধহয় সেইজন্য সৌজন্য আর শিষ্টাচার জামাই-আদরকেও ছাড়িয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আতোয়ারের জন্য কুসুম বিছানা পাতল। সৌজন্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়। বরং বাহুল্য ভাল। যত বেশি লজ্জা দেওয়া যায়। বাটায় ক'রে পান নিয়ে এসে আতোয়ারের বিছানার পাশে দাঁড়াল কুসুম। আতোয়ার এতটা আশা করেনি। আশা না বলে আশঙ্কা বলা যায়। এই আদর যত্নের বাড়াবাড়ির মধ্যে যে গোপন আঘাত লুকিয়ে ছিল, আতোয়ারের বুঝতে তা দেরি হয়নি। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আতোয়ার বলল, 'যত্নটা রোশেনাও জানত।'

কুসুম বলল, 'তার মানে?'

আতোয়ার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মানে আবার কি?'

রোশেনার কথা উঠে পড়ায় কুসুম যেন একটু লজ্জা পেল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি তাকে এখনও ভুলতে পারেননি?'

আতোয়ার বলল, 'ভোলা কি এত সহজ?'

কুসুম বলল, 'কি ভুলতে পারেননি, তার জ্বালা?'

আতোয়ার কোন জবাব দিল না।

রোশেনার জন্যে মনে মনে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ আর গর্ব বোধ করল কুসুম। ত্যাগ ক'রেও আতোয়ার যে তাকে ভুলতে পারেনি বরং নতুন ক'রে তার মূল্য বোধ করতে শুরু করেছে এতে কুসুমদেরই জয়। রোশেনার যাতে সুখ, যাতে আনন্দ, যাতে অহংকার তাতো কেবল রোশেনারই নয়, তাতে কুসুমেরও অংশ আছে যে। আচার আচরণে শিক্ষা-দীক্ষায় রোশেনা যে তাকেই অনুসরণ করেছে। এমন কি সাজসজ্জাটি পর্যন্ত কুসুমের কাছ থেকে শিখেছিল রোশেনা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কুসুম বলল, 'তার কথা থাক কাজী সাহেব, সে এখন পরস্ত্রী।'

আতোয়ার যেন চমকে উঠল। রোশেনা পরস্ত্রী এটা যেন নতুন ক'রে অনুভব করল। যেন নতুন একটা তীর এসে বুকে বিঁধল।

একটু পরে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে আতোয়ার বলল, 'আমাকে মাপ করবেন কুসুম বিবি—।'

কুসুম অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না, না, মাপ করবার কি আছে। কিন্তু আপনি তাকে এত ভালোবাসতেন—'

আতোয়ার বলল, 'সে কথা কাউকে বোঝাতে পারিনি এই দুঃখ রয়ে গেল। নিজেও কি এমন ক'রে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম?'

কুসুম কোন জবাব দিল না কিন্তু আতোয়ারের কথার সুর তার মনের মধ্যে কেমন এক বেদনার সৃষ্টি করল। অথচ দুঃখের কোন কারণই তো আর নেই। রোশেনা তো আজ সম্পূর্ণ সুখী হয়েছে।

আতোয়ার চলে যাওয়ার সময় চৌধুরী সাহেব বললেন, 'আর একদিন এসো বাবা।'

আতোয়ারের মনে হল কেবল মৌখিক ভদ্রতা নয়, ওর মধ্যে কোথায় যেন মনের স্পর্শ রয়েছে। কুসুম মুখে কিছু বলল না বোধহয় বলতে বাধল বলেই।

কিছুদিন বাদে আতোয়ার হঠাৎ আর একদিন এলো।

কুসুম বলল, 'তবু ভালো, আমরা ভাবলাম, বুঝিবা ভুলেই গেলেন।'

যেখানে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, ভুলে যাওয়াই দু'পক্ষের কাম্য সেখানে এ অভিযোগটা নিতান্তই লৌকিক। তবু কুসুমের বলার ধরনে কথাটা সে রকম শোনাল না।

ও কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছেন বোধহয়।'

কুসুম বলল, 'না না, অবাক হব কেন?'

শোবার সময় কুসুমের বাটা থেকে একটা পান তুলে নিয়ে আতোয়ার বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।'

কুসুম বলল, 'বলুন।'

আতোয়ার বলল, 'কেবল এই পান দেওয়াই তো নয়। চলা ফেরা কথাবার্তায় আপনারা দু'বোন একেবারে এক রকম। চেহারার মিল তো সকলেরই চোখে পড়ে, সে কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু আপনাদের স্বভাবেরও খুব মিল আছে।'

কুসুম লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, 'এসব কথা তুলে লাভ কি?'

আতোয়ার বলল, 'কিছু একটা আছে। এখানে এলে মনে হয় তাকে একেবারে হারাইনি।'

কুসুমের বুকের ভিতরটা থর্ থর ক'রে কেঁপে উঠল।

আসা যাওয়ার সময়ের ব্যবধানটা আরও কমতে লাগল। আতোয়ার না এলে কুসুম তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠায়। আলাপটা প্রথমে রোশেনাকে নিয়েই আরম্ভ করা হয়। কুসুম তার ক'খানা চিঠি পেয়েছে। নতুন জায়গায় গিয়ে তারা কেমন আছে। কী রকম সমাজের সঙ্গে তাদের মেলা মেশা। তাদের ঘরকন্নার খুঁটিনাটি সব কুসুম আতোয়ারকে শোনায়। একটি সুখী সংসারের ছবি তার সামনে তুলে ধরে। এর মধ্যে যে কোনরকম নিষ্ঠুরতা আছে কুসুমের তা মনে হয় না। আতোয়ারের চোখ মুখ দেখে বোঝা যায় না যে সে কোনরকম কষ্ট পাচ্ছে।

তারপর দু'জনেই দু'জনকে বুঝতে পারল। মুখে স্বীকার না করলেও কথাটা কারো কাছে গোপন রইল না। আসলে নেপথ্যচারিণী রোশেনা উপলক্ষ, তাদের দু'জনের মধ্যে আলাপের সেতু। সেই সেতুর ওপর দিয়ে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলতে লাগল।

আরও কিছুদিন পরে আতোয়ার একদিন বলল, 'রোশেনার কথা আজ থাক। সে এখন পরস্ত্রী।' কুসুমও তাই চাইছিল। বোনের ছদ্মবেশ পরে থাকতে তার আর ভালো লাগছিল না। আরেকজনের ওড়না সরিয়ে এবার সে নিজের মুখ বার করল।

কুসুমের সঙ্গে আতোয়ারের বিয়ে। সারা শহর এ খবরে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলল, 'ছিঃ ছিঃ এক মেয়ে দিয়েও আমিনর সাহেবের শিক্ষা হয়নি? আবার আরেক মেয়েকে দিচ্ছেন। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।'

কিন্তু এ অপবাদ একেবারে বাজে। কুসুম মোটেই সে টাইপের মেয়ে নয়। ওর মত মেয়ে হয় না।—"

যতীশ তার কাহিনী শেষ করল।

আমি বললাম, "কিন্তু বন্ধু, একটা কথা যে বাকী রইল। এই খণ্ডনাট্যে তোমার ভূমিকাটি কী?"

"আমার আবার কিসের ভূমিকা?' যতীশ হেসে উঠল। "আমি শুধু সূত্রধার।"

যতীশের স্ত্রী যূথিকা চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এল। স্বামীর শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল। আগের কথাগুলিও নিশ্চয়ই আড়ি পেতে শুনেছে।

যূথিকা হাসতে হাসতে বলল, "সূত্রধার না আরো কিছু, আসলে কুসুম জেদ ক'রে এই বিয়ে করছে। তার এক ভীরু মুরোদহীন মাষ্টারমশাইর ওপর রাগ করে।"

"যত সব আজগুবি কল্পনা।" বলতে বলতে যতীশ আরও জোরে হাসতে লাগল।

এত জোর তার কোন দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে কিনা জানি না।

ভাদ্র ১৩৫৩

কেরামত

'ফকির দরবেশকে কিছু খয়রাত করবেন মাঠাকরুন, খোদাতাল্লা সুখে রাখবেন আপনাদের।'

কাঁধে জীর্ণঝুলি, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, খোলা গায়ে বুকভরা কালো কালো লোম, মাথায় ছোট সাদা একটি ময়লা টুপি তেরছা করে পরা---মফিজদ্দি ফকির এসে মজুমদারদের উঠানের ওপর দাঁড়াল। তারপর আর একবার করুণ মোলায়েম কণ্ঠে ডাক দিল, 'মা, ওমা, ও মাঠাকরুণ।'

সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে হবিষ্যান্ন করতে যাচ্ছিলেন হৈমবতী, উঠানে ভিখারীর গলা শুনে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'খয়রাত নেওয়ার তোমার কি একটা সময় অসময় নেই বাছা। এই ভর দুপুরের সময় এসেছ খয়রাত নিতে ?'

চালের বড় মেটে হাঁড়ি থেকে দুমুঠো চাল সরায় তুলে নিয়ে দোর খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন হৈমবতী, যত অসময়েই ভিখারী এসে উপস্থিত হোক্ ভিক্ষা তাকে গৃহস্থের দিতেই হয়।

আষাঢ়ের মেঘভাঙ্গা রোদ বড় চড়া হয়ে উঠেছে। করোগেট টিনে ছাওয়া ঘর। তার কানাচের ছায়ায় এসে সরে দাঁড়িয়ে ঝুলিটি ফাঁক করে ধরল মফিজদ্দি। পৈঠার ওপর দাঁড়িয়ে সরাটি সেই ঝুলির মধ্যে হৈমবতী উপুড় করে দিলেন।

মফিজদ্দি ঝুলির দিকে তাকাল না। ঝরঝর করে চাল পড়বার শব্দটুকু শুনতে শুনতে হৈমবতীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনে কি অশান্তি আছে মা ? বলুন, ফকির দরবেশের কাছে খোলসা করে বলুন, খোদা আসানে রাখবেন।'

হৈমবতীর মুখের দিকে তাকালে তাঁর মনের অশান্তির কথা সহজেই টের পাওয়া যায়। ষাটের কাছাকাছি বয়স। যৌবনে যে সুন্দরী ছিলেন তাঁর গায়ের রঙ আর মুখর গড়ন দেখলে বোঝা যায়। এখনো সেই ক্ষীয়মান সৌন্দর্যের সঙ্গে দুঃখ আর দুশ্চিন্তার ছাপ অদ্ভুত ভাবে মিশে রয়েছে। কোটরগত দুটি চোখে বিবর্ণ নিষ্প্রভ দৃষ্টি। কপালে তিন চারটি বলি রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথায় খাটো শাদা থানের আঁচলের তলায় খাটো করে ছাঁটা কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলগুলির কিছু কিছু রয়েছে খাড়া হয়ে। ফকিরের তীক্ষ্ণ অভ্যস্ত দৃষ্টিতে হৈমবতীর মনের অশান্তি গোপন রইল না।

ফকির দরবেশ শব্দ দুটি শুনে হৈমবতী একটু যেন সমীহর সঙ্গে তাকালেন মফিজদ্দির দিকে। এ তাহলে সাধারণ ভিখারী নয়, গুণিন ফকির দরবেশ। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের রোগাটে সাধারণ একটি মুসলমান। চাপ-দাড়ি সত্ত্বেও গালের তোবড়ানো ভাবটি ধরা যায়। আলকাতরার মত রঙ। গলার নিচে দুটো হাড় জেগে উঠেছে। ডানদিকের কাঁধের ওপর এক খণ্ড দাদ। ভারি কুশ্রী চেহারা। তবু কেমন যেন মায়া হয় দেখলে, বোধ হয় ধরন একটু রোগাটে বলেই। কিন্তু ছোট ছোট চোখ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রক্তাক্ত তার রঙ, দৃষ্টির মধ্যে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা আছে। সেই চোখ দুইটি স্থির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে হৈমবতীর দিকে। একটু যেন শিউরে উঠলেন, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন হৈমবতী। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল এই দুর্বল ক্ষীণপ্রাণ লোকটির মধ্যে কি একটা অলৌকিক শক্তি যেন রয়েছে।

কালো পুরু পুরু ঠোঁটে অভয় দানের ভঙ্গীতে মফিজদ্দি প্রসন্ন ভঙ্গীতে হাসল। সামনের কয়েকটি দাঁত থেকে আভাস এল হলদে রঙের।

মফিজদ্দি বলল, 'বলুন মা, বলুন, কিসের দুঃখ আপনার, কিসের এত চিন্তা ভাবনা। কি ঢুকেছে আপনার ঘরে ? কোন ব্যামোপীড়া না কোন মামলা মোকদ্দমা।'

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হলেন হৈমবতী। সব জানে, এ নিশ্চয়ই সব জানে। হৈমবতী তদ্‌গত ভাবে বললেন, 'যদি জানোই সব, ছল করছ কেন ফকির। আজ দশদিন ধরে কলকাতার হাজতে আছে

আমার ছেলে। অমন শান্ত নিরীহ মানুষ, না জানি কি কষ্টেই দিন কাটছে তার হাজতের মধ্যে। আচ্ছা, পুলিশের কি চোখ নেই সঙ্গে। মানুষকে ধরবার সময় কি তারা মুখের দিকে তাকায় না। মুখের দিকে চাইলেই তো ধরন বোঝা যায়, মানুষের মন বোঝা যায়। বোঝা যায় কে দোষী, কার দোষ নেই!'

মফিজদ্দি বলল, 'আমার মনও সেই কথা বলছিল ঠাকরুন। কর্তা তাহলে আটক আছেন শহরের হাজতে।'

হৈমবতী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, জেলের চেয়েও নাকি সেখানে বেশি কষ্ট। রাস্তায় হ'ল দাঙ্গা হাঙ্গামা, আর জোর করে টেনে নিয়ে গেল তাকে ঘর থেকে। অমন শান্ত মানুষ, তাকে কিনা জড়াল খুনের দায়ে। অবশ্য আমার ছোট ছেলে লিখেছে ভয়ের নাকি কিছু নেই। বড় উকিল দেওয়া হয়েছে। চিন্তা করতে মানা করেছে সে। কিন্তু সে তো লিখেই খালাস। চিন্তা না করে আমি পারি কি করে। আর চিন্তা করেও তো টিকতে পারি না। ভেবে ভেবে মাথার আমার আর কিছু নেই বাপু। এর চেয়ে পাগল হয়ে গেলে বাঁচতাম।'

মফিজদ্দি কানাচ থেকে ঘুরে এসে সব চেয়ে নিচের পইঠার ওপর দাঁড়াল, 'ভাবনা চিন্তার তো কথাই মা। তা উকিল তো লাগিয়েছেন গুণজ্ঞান কিছু করছেন তো সেই সঙ্গে?'

হৈমবতী বললেন, 'করেছি বইকি বাবা। শনি সত্যনারায়ণের পুজো দিয়েছি। পাঁঠা মানত করেছি কালীবাড়িতে। সিন্নি মানত করেছি সোনাপুরের দরগায়। যেখান থেকেই হোক এখন ভগবান যদি একটু মুখ তুলে চান—'

মফিজদ্দি বলল, 'চাইবেন বই কি মা, চাইবেন। খোদা কি কাউকে না দেখে পারেন। কিন্তু আরো কিছু গুণজ্ঞান আপনাকে করতে হবে যে মা। সব নসিবের ফের কি না মা, গুণজ্ঞান তুকতাক কিছু না করলে ফের কাটে না, কষ্ট ঘুচতে চায় না নসিবের।'

হৈমবতী বললেন, 'তাহলে ও সবও তোমার জানা আছে। ছল করোনা বাপু, সত্যি করে বলো। আমার মনে হচ্ছে সব জানো তুমি।'

মফিজদ্দি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভালো একটা দাওয়াই বোধ হয় লেগে গেল এবার। ইদানীং পসার প্রতিপত্তি তার প্রায় নেই বললেই চলে। ভদ্রলোক তো দূরের কথা, অশিক্ষিত গরীব মুসলমান নমঃশূদ্র পাড়ায়ও তার তুকতাক ঝাড়ফুক সহজে কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। রোগ হলে তারা ডাক্তারের কাছে যায়, সাধ্যে না কুলালে এক টাকা ভিজিট দিয়ে দেখায় কম্পাউণ্ডারকে। আর মামলা মোকদ্দমায় শহরে গিয়ে উকিল মুহুরীর বাড়ি ছুটোছুটি করে। ঘটিবাটি জমি জিরাত বিক্রি করে উকিল মোক্তারের হাতে ধরে দেয়। মফিজদ্দির কাছে বড় একটা কেউ আর আসতে চায় না। দিনকাল একেবারে বদলে গেছে। দয়া করে খুদ কুঁড়ো দুএক মুঠো তার ঝুলিতে কেউ কেউ ফেলে দেয়। কিন্তু তার বিনিময়ে মফিজদ্দিরও যে কিছু দেবার আছে তা কেউ স্বীকার করে না। গুণিনগিরির ব্যবসা প্রায় নষ্ট হবার জো হয়েছে। চণ্ডীপুরের মত ব্রাহ্মণ কায়েতের গাঁয়ে রীতিমত সম্পন্ন ভদ্রোলোকের বাড়িতে যে তার এমন বিশ্বাসী ভক্ত একজন এ সময়ে জুটে যাবে মফিজদ্দি তা প্রত্যাশা করেনি।

হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নিগূঢ় রহস্যময় ভঙ্গীতে মফিজদ্দি হাসল, 'জানাশোনা কিছু কিছু আছে বইকি মাঠাকরুন। না হলে খোদা এ সময়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠাবেন কেন। কিন্তু গুণজ্ঞান সব জায়গায় করতে যাওয়া ওস্তাদের নিষেধ আছে মা ঠাকরুন। যেখানে ভক্তি ছেদ্দা আছে, বিশ্বাস আছে, সেখানেই কেবল কাজ করবার হুকুম আছে ওস্তাদের।'

হৈমবতী বলে উঠলেন, 'সব আছে ফকির, বিশ্বাস ভক্তি আমার আছে। আমাকে ভুলিও না আর, দাওয়ায় এসে উঠে বসো। আমার ছেলের যাতে ভালো হয়, ছেলে যাতে নিষ্কৃতি পায় তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা।'

খুশি হয়ে দাওয়ায় উঠে ছোট্ট জলচৌকিখানার ওপর বসতে যাচ্ছে মফিজদ্দি হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কার মিষ্টি গলা শোনা গেল, 'মা! কি শুরু করেছেন আপনি! খেতে আসুন।' কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল মফিজদ্দি।

হৈমবতী ভেজানো দরজার ফাঁকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি আবার শুরু করব। শুনলে তো সব ফকিরের কথা।'

ঘরের ভিতর থেকে জবাব এল, 'শুনেছি। আপনিও যেমন, ওসব বুজরুকিতে আজকাল আবার বিশ্বাস করে নাকি কেউ ? ওসব বিদায় করে দিয়ে এবার খেতে চলুন আপনি। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

রেগে উঠলেন হৈমবতী, 'যাক্। আমি যে কবে ঠাণ্ডা হব,সেই দিন গুণছি এখন। ঘাড়ের উপর এমন যে বিপদ তাতেও তোমার নাওয়া খাওয়া শোয়া ঘুমোনোর একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, কি শান্তিতেই যে আছ তুমি, তা তুমিই জানো। আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখ বউমা, আমার এখন খাওয়া হবে না।'

তারপর মফিজদ্দির দিকে তাকিয়ে হৈমবতী বললেন, 'হ্যাঁ বাপু, এবার কি করতে হবে বলো।'

ঘরের ভিতরের মিষ্টি গলা তখনো কানের মধ্যে বাজছিল মফিজদ্দির। যদিও তার সুরটাই শুধু মধুর কথাগুলি নয়,—তবু মফিজদ্দি একবার সেই দোরের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে হৈমবতীর দিকে চেয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি কিসের মাঠাকরুন, আপনি বরং ততক্ষণ সেবাটি সেরে আসুন, আমি এখানে বসছি। আর বউঠাকরুনকে বলুন দয়া করে এক ছিলিম তামাক আমাকে ফেলে দিতে। একটি দেশলাই, আর একটু নারকেলের ছোবড়া, হুঁকো কলকে তো এখানেই আছে দেখছি। কলকেটা তুলে দিন ঠাকরুন, ও হুঁকো বোধ হয় আমাদের নয়।'

দেয়ালে ঠেস দেওয়া হুঁকোটির দিকে তাকিয়ে হৈমবতী বললেন, 'না ওটি নয়, তোমাদের জন্যও আলাদা হুঁকো আছে ফকির, দিচ্ছি।'

হুঁকো থেকে কলকেটি তুলে নিয়ে ফকিরের সামনে রাখলেন হৈমবতী, তারপর দাওয়ার দক্ষিণ দিকে খুঁটিতে ঠেস দেওয়া মুসলমানদের জন্য রাখা ছোট আর একটি হুঁকো নিয়ে এসে মফিজদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও।'

তারপর ঘরের ভিতর দিকে চেয়ে ডাকলেন, 'বউমা !'

কোন সাড়া এল না।

চটে উঠে হৈমবতী রুক্ষস্বরে বললেন, 'আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না, উত্তরা ? লোক এসে একটু তামাক আগুন চাইলে পাবে না তোমাদের বাড়িতে ? ভালো জ্বালা হয়েছে আমার। এক ছিলিম তামাক ফেলে দিতে পারবে না এখানে, আমায় নিজে উঠে গিয়ে আনতে হবে ?'

উত্তরার শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, 'দিচ্ছি মা, কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, খেতে আসুন এবার।'

একটু বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে এক ছিলিম তামাক আর দেশলাই চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে দাওয়ার মেঝেয় ফেলে দিল উত্তরা। যতটুকু সময় দেখা গেল সেই হাতখানির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল ফকির। গৌরবর্ণ, নিটোল, সুন্দর একখানি হাত। ধবধব করছে সরু একগাছা শাঁখা। তার সঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করছে দুগাছি সোনার চুড়ি।

তামাকটুকু আর দেশলাইটি কুড়িয়ে এনে মফিজদ্দি কলকিতে তামাক সাজতে সাজতে বলল, 'বউঠাকরুন যখন অত করে বলছেন, আপনি খেয়েই আসুন ঠাকরুন।'

হৈমবতী ম্লান একটু হাসলেন, 'আমার খাওয়ার জন্য তোমাদের কাউকে ভাবতে হবেনা ফকির। এই দশদিন ধরে খাওয়া দাওয়া আমার ঘুচে গেছে। ভাতের পাথর নিয়ে কেবল বসি আর উঠি। কিছু রোচে না মুখে। দুচোখের পাতা এক করতে পারি না রাত্রে ! একটু যদি চোখ বুজি যত রাজ্যের হিজিবিজি অনাসৃষ্টি—'

অসহিষ্ণু উত্তরা আবার ডেকে উঠল, 'ঘরে আসুন মা। ভিতরে এসে একবার শুনে যান। দোহাই আপনার।'

বিরক্ত হয়ে হৈমবতী উঠে গেলেন ঘরে, বললেন, 'কি বলছ।'

উত্তরা বলল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ! যাকে দেখবেন তার কাছেই ওসব বলতে শুরু করবেন ? ফকিরে কি করবে এসব ব্যাপারে ? বলে দিন ওকে তামাক খেয়েই যেন ও চলে যায়

এখান থেকে। চাল পেল তামাক পেল আবার কি চায় ও। ওকে বিদায় করে দিয়ে এবার দয়া করে খেতে আসুন আপনি। দেখুন বেলা কোথায় গেছে।'

সব কথা কানে গেল মফিজদ্দির। সে যাতে শুনতে পায়, এবং শুনে চলে যায় সেইজন্যই কথাগুলি একটু জোরে জোবে বলছিল উত্তরা।

মনে মনে রাগ হল মফিজদ্দির, কিন্তু হতাশ হল না। অমন এক ফোঁটা বউকে যদি সে বশ না করতে পারে তো মিথ্যাই তার জারিজুরি। এমন মিষ্টি গলা বউটির কিন্তু কথাগুলি অমন বিষের মত কেন। এত তাচ্ছিল্য তাকে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আজকাল অবশ্য অনেকেই করে কিন্তু অমন চমৎকার যার গলা, শাঁখা চুড়ি পরা অমন সুন্দর যার হাত তার মুখের কটু ভাষা যেন নতুন করে আঘাত করল মফিজদ্দিকে, দ্বিগুণ জ্বালা ধরিয়ে দিল বুকে।

হৈমবতীর গলা শোনা গেল, 'চুপচুপ, ছিঃ! কি তুমি বলছ বউমা! একটুও কি কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমাব! যার স্বামী অমন বিপদেব মধ্যে তার মুখে কি ওসব কথা মানায়? তার কি সাজে কাউকে হেনস্তা অবহেলা কবা? অমন নাস্তিকের মত মতিগতি যদি তোমাদেব না হবে তাহলে আর কপালে এসব ঘটবে কেন? অনেক বলে কয়ে সেধে ভজে ফকিরকে আমি এনে বসিয়েছি। ওকে তুচ্ছ কোবো না, খবরদাব। অমঙ্গলেব তাহলে আব কিছু বাকি থাকবে না।'

বলতে বলতে গাটা যেন শির শির করে উঠল হৈমবতীব।

উত্তরা বলল, 'কেবল আমি কেন আজকাল কেউ ওসব ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে না মা। বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে বিদায় করে দিয়ে আসুন। ভিক্ষা তো পেয়েছে এবার চলে যাক। ওর তুকতাকের কোন দবকাব নেই আমাদের।'

হৈমবতী চড়া গলায় বললেন, 'তোমার না থাক আমার আছে। ছেলেব মঙ্গলের জন্য আমি সব বিশ্বাস করি, সব করতে পারি। দুচাব পাতা বই পড়ে মহাপণ্ডিত হয়েছ কিনা তুমি, আমার কথা তোমার গ্রাহ্য হবে কেন? স্বামীর মঙ্গলামঙ্গলের চেযে নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাসই যখন তোমাব কাছে বড়—'

আবেগে হৈমবতীব গলা রুদ্ধ হয়ে এল, ছল ছল করে উঠল চোখ।

উত্তরা চুপ করে রইল। কিছু দিন ধরে এই রকমই শুরু করেছেন হৈমবতী। তাকে বকছেন, ধমকাচ্ছেন, নালিশ করছেন পাড়াপড়শীর কাছে, স্বামীর বিপদে উত্তরা নাকি তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি, দুশ্চিন্তাব লক্ষণ তাব আচাব আচরণে কথা বার্তায় নাকি কিছু বোঝা যায় না। অতি দুঃখে হাসি পেল উত্তরার। স্বভাবটা তার চাপা ধরনের। নিজের দুঃখ দুশ্চিন্তাব অংশ অন্যকে সহজে সে পৌঁছে দিতে পারে না। নিজের মধ্যে সবটুকু সে ধরে রাখতে চায়। অন্যের কাছে ধরা দেওয়ায় তার সঙ্কোচের অন্ত নেই। বুকের ভার মুখের হাসিতে সে লুকিয়ে রাখে। সেই তার আধুনিক শিক্ষা আব আভিজাত্য। দুঃখ ভোগে কাউকে সে সঙ্গী করতে জানে না, এমন কি শাশুড়ীকেও নয়। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যায় উত্তরা, সেবা করে খুড়শ্বশুরের। নিজেব দুঃখ নিঃশব্দে বহন করে নিজের মধ্যে। আর তার এই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা সব চেয়ে দুঃসহ লাগে হৈমবতীর। সুব্রত তো কেবল উত্তরার স্বামীই নয়, তাঁরও তো ছেলে। তার বিপদ, তার অমঙ্গল তো তাঁদেব দুজনেব বুকেই আঘাত হেনেছে তবু উত্তরা কেন এড়িয়ে যায় তাঁকে, কেন তাঁর চোখের জলে চোখেব জল মিশায় না। দুঃখ যখন দুজনের এক তার প্রকাশ এমন আলাদা আলাদা কেন।

উত্তরা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, ভরসা দেয় কিন্তু তাঁর ব্যাকুলতায় নিজেব ব্যাকুলতা মিশিয়ে দেয় না। মনে হয় যেন মোহমুদগরের শ্লোক দিয়ে গড়া উত্তরা কিন্তু মোহ দিয়ে যে গড়া সংসার, মায়া আর মোহেই যে তার রূপরস।

হৈমবতীর কথার জবাবে উত্তরা এবারও তার সেই অভ্যস্ত যুক্তির আশ্রয় নিল, ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু এ সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর তো তাঁর মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না মা। তাছাড়া আপনার ছেলের মতামতও তো আপনি জানেন। তিনিও তো এ সব বিশ্বাস করেন না। তিনিও তো সহ্য করতে পারেন না ওসব কুসংস্কার।'

হৈমবতী বললেন, 'তাই বলে তার সঙ্গে তোমার তুলনা? পুরুষ মানুষ হয়ে সে যা করবে তুমিও

তাই করতে চাও ? পুরুষে বাইরে কত রকম কি বলে, কত রকম কি করে কিন্তু ঘরের মধ্যে সে সব কথায় কান দিলে চলে মেয়েদের ? বেশ করো তোমার যা ইচ্ছা। তোমার কোন সাহায্যে দরকার নেই আমার। বিদ্যাবুদ্ধির গুমর নিয়ে তুমি থাকো, যা করবার আমিই করতে পারব।'

রাগ করে-ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন হৈমবতী। মনকে যথাসম্ভব শান্ত করবার চেষ্টা করে ফকিরকে বললেন, 'কি কি জিনিসপত্তরের দরকার তোমার বাপু বলো, আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

ব্যবস্থা যে কোন একজন করলেই অবশ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় মফিজদ্দির। ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, তেলপড়া যা হোক একটা কিছু করে পাঁচ সিকে পয়সা, দরগার নামে সোয়া সের চাল হৈমবতীর কাছ থেকেই দিব্যি আদায় করা চলে, কিন্তু উত্তরাকে স্বমতে আনতে না পারলে কিছুতেই চলবে না মফিজদ্দির। তার লেখাপড়া আর বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার না ভাঙতে পারলে শান্তি আসবে না মফিজদ্দির মনে। সোনার চুড়িপরা অমন সুন্দর তুলতুলে নরম যার হাত, অমন মিঠে যার গলা, চোখ জুড়ানো যার গায়ের রঙ, এমন শক্ত তার মন, কঠিন তার হৃদয় যে স্বামীর অমঙ্গলের ভয় দেখিয়েও নিজের বিশ্বাস থেকে তাকে সে টলাতে পারছে না। গুণির্নাগিরির উপর তার অবিশ্বাসই যদি না ঘোচানো গেল তাহলে আর গুণের দাম রইল কি মফিজদ্দির। কেবল পাঁচ সিকের পয়সা আর সোয়া সের চালে কি তার দাম ওঠে, না মন ভরে?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে দেখল মফিজদ্দি কোন আজব, অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করতে পারে এ মেয়েটিকে, তার মনের বিশ্বাস আনতে পারে নিজের জারিজুরির ওপর। কিন্তু তেমন কোন শক্তির কথাই তার মনে পড়ল না। না, ম্যাজিকওয়ালাদের মত কোন ক্ষমতাই নেই তার। না জানে সে তাসের খেলা, না পারে কাগজের টুকরোকে রুপোর টাকা বানাতে, কিংবা ডিমের ভিতর থেকে আস্ত মুরগীর বাচ্চার ডাক শোনাতে। কোন অসাধারণ বিদ্যা তার নেই। তার পড়া লতা হাতে বেঁধে তিন চারজন জ্বরমুক্ত হয়েছে কিন্তু তেইশ চব্বিশ জন ভুগে মরেছে ম্যালেরিয়ায়। তার জলপড়া খেয়ে পেটের অসুখ দুচারজনের সেরেছে কিন্তু সেই সঙ্গে সস্তা দামের হোমিওপ্যাথিক ওষুধও কিনে খেয়েছে তারা। যারা খায়নি তারা রেহাই পায়নি। তার মন্ত্রপড়া শিকড় সুতোয় বেঁধে কোমরে জড়িয়ে একবার করিম শেখের কবিলাকে ফুসলিয়ে ঘরের বার করে এনেছিল মোতালেফ; কিন্তু শাড়ি গয়নার লোভ দেখিয়ে কবিলাকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে করিম। মোকদ্দমা করে জেলে পাঠাবার জো করেছিল মোতালেফকে, হাতে পায়ে ধরে জরিমানা দিয়ে রেহাই পেয়েছে, সবই মফিজদ্দি জানে। নিজের জারিজুরিতে ভিতরে ভিতরে নিজেরই আস্থা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু যেমন করেই হোক আজ এই সুন্দরী বধূটির কাছে নিজের মান তাকে রাখতেই হবে। কিছুতেই সে হার স্বীকার করতে পারবে না, হটে যেতে পারবে না এখান থেকে।

হৈমবতী আবার তাগিদ দিলেন, 'কই বাপু, বললে না তো কি কি লাগবে।'

মফিজদ্দি একটু চমকে উঠল। তারপর তার সেই গূঢ় রহস্যাত্মক গুণিনী হাসি হেসে বলল, 'সেই কথাই ভাবছিলাম মা, কি বলি আপনাকে। জিনিসপত্তরের তো বেশি দরকার নেই মা দরকার ভক্তিছেদ্দার, দরকার বিশ্বাসের। পীরের নামে পাঁচসিকে পয়সা, সোয়া সের চাল, পান সুপুরি এই শুধু আপনার খরচ। আর সরষের তেল দিতে হবে এক বাটি। জিনিস আছে আমার ঝুলির মধ্যে। সেই জিনিস মিশিয়ে মন্তর পড়ে ওই তেল আমি শুদ্ধ করে দেব। কিন্তু মা আর একটি কথা আছে যে।'

হৈমবতী বললেন, 'কি কথা বলো।'

মফিজদ্দি বলল, কাজ তো আপনার দ্বারা হবে না মা, কাজ করতে হবে কর্তার পরিবারের।'

হৈমবতী বললেন, 'পরিবারের!'

মফিজদ্দি বলল, 'হ্যাঁ মা ঠাকরুন, পরিবারকেই সব কাজ করতে হয় যে—তাই নিয়ম। মার মতো আপন জন অবশ্য দুনিয়ায় নেই তবু এ সব গুণজ্ঞান তুকতাক পরিবারকে নিজের হাতে করতে হয় ঠাকরুন, নইলে যে ফল ফলে না।'

ফল ফলে না! মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন হৈমবতী। কি নিষ্ঠুর নিয়ম সংসারের। মার তুল্য

আপন জন নেই। তবু সন্তানের সব কাজ মাকে দিয়ে চলে না। তার শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল দেখতে, সুখ দুঃখের ভাগ নিতে আরেকজনকে ডেকে আনতে হয় পরের ঘর থেকে। গুণজ্ঞান তুকতাকের কাজ সঁপে দিতে হয় সেই পরের মেয়ের হাতে।

একটু চুপ করে থেকে হৈমবতী বললেন, 'তাহলে কি করব বলো।' মফিজদ্দি বলল, 'বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে আসুন বউঠাকরুনকে। পরিষ্কার ধোয়া রঙিন শাড়ি পরুন তিনি, এলো চুল ছড়িয়ে দিন পিঠের ওপর, ভালো করে তেল সিঁদুর পরুন তারপর এক বাটি সরষের তেল হাতে নিয়ে বসুন এসে গুণিনের সামনে। মন্তর পড়ে শোধন করে দেব সেই তেল। তারপর তা গায়ে মুখে মাখবেন দুজনে। মেখে মুখোমুখি বসে কর্তার জন্য দোয়া মাঙবেন খোদার কাছে, কান্নাকাটি করবেন খোদার দুয়ারে। আপন বিপদ সব দূর হয়ে যাবে কর্তার। কোন কিছু তাকে আর কাহিল করতে পারবে না।'

হৈমবতী চুপ করে রইলেন। আবার তাঁকে গিয়ে শরণ নিতে হবে তাহলে সেই অবাধ্য পুত্রবধূর, যে কিছুই গ্রাহ্য করে না, কিছুই বিশ্বাস করে না।

মফিজদ্দি তাঁর মনের ভাব বুঝে বলল, 'যান মা, গোসা করে থাকবেন না, ডেকে আনুন গিয়ে বউ ঠাকরুনকে। বলুন গিয়ে তাঁর সোয়ামীর কাজ তিনি করবেন না তো কি পাড়ার লোকে এসে করে দেবে? আপনাদের ভদ্রলোকের ঘরে কি এই রীতি? বিপদ আপদ যদি দূর হয় কর্তার, তো লাভ হবে কার? হাসি ফুটবে কার মুখে? তেনার পরিবারের না আর কারো? মান সম্মান নিয়ে যদি তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন তো সুখের ঢেউ লাগবে কার অন্তরে? তেনার না পাড়াপড়শীর? আর যদি অমঙ্গল অঘটন কিছু ঘটে—'

হৈমবতী শিউরে উঠে বললেন, 'চুপ করো ফকির, ওসব কথা মুখে এনো না। কোন রকম অমঙ্গল ঘটে না যেন আমার বাছার।'

মফিজদ্দি বলল, 'না মা ঘটবেনা। কথার কথা বলছিলাম। কিন্তু গুণিনের কাজ কর্মকে হেনস্তা করলে ফল তার ভাল হয় না মা, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার, বড় সাংঘাতিক। জেল, ফাঁস, কিসে যে কি হয় তা কি বলা যায় মা ঠাকরুন। আইন আদালতের কারবারই আলাদা। সাঁচামিছায় তফাৎ সেখানে ভারি কম। চড়ুইডাঙির নিবারণ বোসের নাম শুনেছেন তো? ফৌজদারী মামলায় জেল হয়ে গেল তেনার সাড়ে তিন বছর। কত উকিল, মোক্তার, কেউ কিছু করতে পারল না। পারবে কি করে, তেনার পরিবারের এ রকম দেমাক ছিল ঠাকরুন, হেলা হেনস্তা ছিল মনে। অশুদ্ধ কাপড়ে এসেছিল তেল পড়া নিতে।'

হৈমবতী বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব আলোচনা আর কোর না ফকির, আমার গা কাঁপে শুনলে। আমি যাচ্ছি, যেমন করে পারি ডেকে আনছি তাকে।'

মফিজদ্দি বলল, 'যান মা যান, বলুন গিয়ে অমন হেলা হেনস্তা ভাল নয় গেরস্তের বউর। তাতে নসিবে এগোয় না।'

হৈমবতী উঠে গেলেন ঘরে। দোরের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল উত্তরা। ফকিরের কথা শুনে মাঝে মাঝে তার হাসি পাচ্ছিল, কখনো বা রাগে জ্বলে যাচ্ছিল গা, ইচ্ছা হচ্ছিল তখনই গিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেয় বারান্দা থেকে।

হৈমবতী কাছে এসে বললেন, 'শুনলে তো সব?'

উত্তরা বলল,'শুনলুম কিন্তু আপনি ওসব কিছু বিশ্বাস করবেন না মা। আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য যত সব মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে ও। ওর কথায় কান দেবেন না। আজও তো চিঠি পেলাম ঠাকুরপোর। ভাল উকিল দেওয়া হয়েছে তাঁর জন্য। বন্ধুরা সবাই মিলে তাঁর জন্য চেষ্টা করছে। কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, কোন চিন্তা করবেন না। ওকে বিদায় করে দিয়ে আপনি এবার খেতে আসুন।'

কিন্তু হৈমবতী যেন সে সব কথা শুনেও শুনলেন না। এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উত্তরার দিকে, তারপর বললেন, 'বউমা, তোমার জন্য আমি কি শেষে মাথা খুঁড়ে মরব? সুব্রতর মঙ্গল অমঙ্গল কিছু নয়, তোমার জেদটাই সব চেয়ে বড়? আমি তোমার হাতে ধরে বলছি বউমা, আমার কথা শোন, আমার কথা শোন ভাল হবে, মঙ্গল হবে তোমার।' বলতে বলতে হৈমবতীর

চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল।

মুহূর্ত্তকাল সেই দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরা, তারপর স্নিগ্ধ আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'আপনি গিয়ে বসুন মা। আমি ফকিরের কথামত তৈরী হয়ে আসছি।'

মিনিট কয়েক বাদে তেলের বাটি হাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল উত্তরা। ফকির উৎফুল্ল চোখে তার দিকে তাকাল। জয় হয়েছে মফিজদ্দির। তার কথা তা হলে মেনেছে উত্তরা। ধারণাতীত আশাতীত তার এই বশ্যতা। ভিজে চুলের রাশ দেখা যাচ্ছে আঁচলের ফাঁকে। গাঢ় লাল রঙের শাড়ি পরেছে নতুন বউয়ের মত। খাটো ঘোমটার আড়ালে আড়চোখে একবার তাকাল মফিজদ্দি। গৌরবর্ণ সুন্দর ছোট কপালে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা। চোখ দুটি আনত হয়েছে লজ্জায়। ভারি খুবসুরৎ খোদার সৃষ্টি। মফিজদ্দির নির্দেশমত কাঁকন পরা দুখানি হাতে তেলভরা বাটি এগিয়ে ধরল উত্তরা। ঝুলি থেকে কাগজে মোড়া খানিকটা শাদা গুড়ো বের করে মফিজদ্দি সেই তেলের মধ্যে ছড়িয়ে দিল তারপর ফুঁ দিতে লাগল মন্ত্র পড়ে পড়ে।

দোরের ফাঁকে একখানি হাতের কেবল একটু আভাস এসেছিল। এবার শাঁখা বাঁধান অলঙ্কৃত দুখানি হাতই সম্পূর্ণ তার দিকে মেলে ধরেছে উত্তরা। কিন্তু সেই হাতের দিকে আর তাকাল না মফিজদ্দি। এই মেয়েটির চোখে নিজেকে সে ছোট করতে পারবে না, নিজের কৃতিত্বকে সে উজ্জ্বল করে তুলবে। তেলে কানায় কানায় ভরেছে বাটি। তার ওপর চোখ রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মন্ত্র আওড়ে যেতে লাগল। মফিজদ্দি এমন মন দিয়ে জীবনে কখনও মন্ত্র পড়েনি। এমন তন্ময়তার স্বাদ কোন দিন যেন সে অনুভব করেনি জীবনে।

মন্ত্রপড়া শেষ হয়ে গেলে একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে মফিজদ্দি বলল, 'যান ঠাকরুন ঘরে যান, হয়ে গেছে কাজ।'

তারপব হৈমবতীর দিকে চেয়ে বলল, 'ঘরে যান মাঠাকরুন। খোদার নাম করুন গিয়ে। খোদা সবাইকে শান্তিতে রাখুন, দোয়া করুন সবাইকে।'

ডালায় করে চাল ডাল পান সুপুরি আর পাঁচসিকে দক্ষিণা হৈমবতী এনে দিলেন ফকিরকে, বললেন, 'আমাদের কল্যাণে তুমিও একটু ডেকো খোদাকে।'

মফিজদ্দি বলল, 'ডাকব বই কি মাঠাকরুন, এখুনি গিয়ে ডাকব।'

খানিকবাদে বার বাড়ির পুকুরের ঘাটে শাশুড়ীর এঁটো বাসন ধুতে গিয়ে উত্তরা দেখতে পেল বড় আমলকি গাছটির ছায়ায় পশ্চিম দিকে মুখ করে একাগ্র মনে নামাজ পড়ছে মফিজদ্দি। বাসনের পাঁজা হাতে নিয়ে সেই দিকে উত্তরা অপলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, নামাজ পড়বার ভঙ্গীটুকু ভারি সুন্দর লাগল চোখে। মনে পড়ল খানিক আগে যখন তন্ময় হয়ে তেলের বাটির দিকে চেয়ে মন্ত্র পড়ছিল ফকির তখনো বেশ দেখাচ্ছিল তাকে।

নামাজ শেষ করে মফিজদ্দি দোয়া প্রার্থনা করতে লাগল খোদার। 'আমার মন্তরের তো কোন গুণ নেই খোদা, গুণ তোমার নামের। সেই নামের গুণে গুণিন আমি, খাঁটি কর সেই গুণিনগিরি। দোযা কর এই ঠাকরুনের সোয়ামীকে, বিপদ আপদ থেকে রেহাই দাও তারে, আমার গুণিনগিরির মান রাখো।'

সমস্ত দেহমনে অদ্ভুত এক আনন্দের স্বাদ অনুভব করল মফিজদ্দি। কোনদিন কোন উপলক্ষে এমন করে খোদাকে কারো জন্য সে আর ডাকেনি, বুঝি নিজের জন্যও নয়।

আশ্বিন ১৩৫৪

জৈব

"...সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা এবং ঊর্ধ্বতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন-বিন্যাস থেকে সুরু ক'রে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির

কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে⋯"

রেডিওর সুইচটা অফ্ ক'রে দিতে দিতে করবী বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, "নাঃ ফের সেই বক্তৃতা সুরু হ'ল। এতরাত্রে কোথায় দু' একটা ভালো গান-টান দেবে প্রোগ্রামে, তা নয়—"

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমার ডাক্তার বন্ধু বাসব মুখুয্যে চুপচাপ সিগারেট টানছিল করবীর দিকে চেয়ে, হঠাৎ বলে উঠল, "আহাহা বন্ধ করে দিলেন নাকি ?"

করবী বলল, "বন্ধ করব না কি করব, যে সে লোকের যত সব বাজে বক্তৃতা শুনবেন নাকি বসে বসে ?"

বাসব বলল, "বক্তৃতা বাজে কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। কিন্তু লোকটি একেবারে যে সে নয়, ইউনিভার্সিটির স্কলার, এখানকার এক কলেজের প্রফেসর—"

করবী এবার বেশ একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু মুখের জেদ ছাড়ল না ; বলল, "তা হলই বা স্কলার। আর প্রফেসর হলেই যে—"

বাসব বলল, "কেবল তাই নয়, মৃগাঙ্ক মজুমদারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ও আছে !"

করবী বলল, "ও তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি অমন মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন, সত্যি ফোনে রেডিওতে আত্মীয়-স্বজন, চেনা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের গলা আমারও ভারি ভালো লাগে শুনতে।"

রেডিওটা আবার খুলতে যাচ্ছিল করবী, বাসব বাধা দিয়ে বলল, "ওকি, আবার খুলছেন নাকি ? না না, থাক থাক।"

এবার আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "কেন। এই না বললে তোমার কোন প্রফেসর বন্ধুর বক্তৃতা !"

বাসব বলল, "তাই বলে সেই বক্তৃতা যে আগাগোড়া শুনতেই হবে এমন কথা বলিনি। তাছাড়া রেডিওতে বন্ধু-বান্ধবের গলা আমার ভালো লাগে না, আমার কান তো আর তোমার স্ত্রীর কানের মত নয়।"

হেসে বললুম, "তা তো নয়ই। তুমি বড়জোর চামড়ার স্টেথোস্কোপ কানে গুঁজতে পারো, কিন্তু আমার স্ত্রীর মত এমন রত্নখচিত কান তুমি কোথায় পাবে !"

বাসবও হাসল, "সে কথা সত্যি।"

করবী বলল, "তাহলে শুনবেন না আপনার বন্ধুর বক্তৃতা ?"

বাসব মাথা নাড়ল, "না থাক, মৃগাঙ্কবাবুর এসব টক্ আমার ভারি খারাপ লাগে। ওঁর বোঝা উচিত সুদত্তা এতে কত কষ্ট পান, অশান্তি ভোগ করেন। তাঁর মনের ওপর এগুলির প্রতিক্রিয়া—"

শুধু গলায় নয়, চোখেমুখেও কৌতূহল ঝলকে উঠল করবীর, "সুদত্তা কে ?"

বাসবের মুখ দেখে মনে হল কথাগুলি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। একটু গম্ভীর হয়ে বাসব বলল, "সুদত্তা মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী।"

করবী বলল, "তাহ'লে স্বামীর বক্তৃতা শুনতে তাঁর কষ্ট হবে কেন, কি যে বলেন।"

প্রসঙ্গটা একটু হালকা করবার চেষ্টায় আমি বললুম, "তা ঠিক। মাথা মুণ্ড না থাকলেও স্বামীর বক্তৃতা আর তাল মান না থাকলেও স্ত্রীর গান পরস্পরের কানে বোধ হয় সব চেয়ে সুখশ্রাব্য।"

আমার এমন রসিকতাটা মাঠে মারা গেল, কারণ বাসব তেমনি গম্ভীর হয়ে রইল। করবীও আমার কথায় কোন রকম কান না দিয়ে বাসবের দিকে চেয়ে বলল, "বিষয়টা কি বাসববাবু ? অবশ্য খুব গোপনীয় হলে--"

বাসব একটু হেসে বলল, "খুবই গোপনীয়। তবু না হয় খানিকটা কৌতূহল আপনার মেটাতে পারতুম. কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কাছে বলাও মুশকিল।"

করবী বলল, "কিচ্ছু মুশকিল হবে না। আমার নার্ভ আপনাদের কারো চেয়ে কম শক্ত নয়।"

বাসব একটু হাসল, "মেয়েরা প্রথম প্রথম ওই রকমই ভাবে, ওই রকমই বলে, কিন্তু শেষে দেখা যায়—"

করবী অধীর হয়ে বলল, "শেষে যা দেখা যায় তা আমরা না হয় শেষেই দেখব। কিন্তু বলতেই যদি চান গোড়া থেকেই বলুন দয়া ক'রে।"

ছাই-দানিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বাসব, তারপর বলল, "আচ্ছা, তাহলে শুনুন। তবে গোড়া থেকে নয়, মাঝখান থেকে। কেননা গোড়ার ব্যাপারটা আমিও তেমন জানি না।—

দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ডিসপেনসারীতে সেদিন তেমন ভিড় নেই। কারণ আমার বেশীর ভাগ রোগীই মুসলমান, দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলতে থাকায় হিন্দুপাড়ায় তারাও আসতে পারে না, আমারও ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু চাল ডাল তেল নুনের প্রয়োজন তো আর দাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে না। আর তার জন্য টাকারও দরকার হয়। মন মেজাজ ভারি খারাপ। অন্য সময় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশ ভিড় থাকে রোগীর। সেদিন আটটা বাজতে না বাজতেই ডিসপেনসারী খালি হয়ে গেল। পাড়ার দু' চার জন রোগী যা ছিল প্রায়ই খাতিরের। তাদের বিদায় দিয়ে উঠি উঠি করছি। ডিসপেনসারীর সামনে সশব্দে হঠাৎ এক খানা ট্যাক্সী এসে থামল। রোগীর সাড়া পেয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে সোজা হয়ে বসলুম. নিমেষের মধ্যে টেবিলটাকেও গুছিয়ে নিলামএকটু। ততক্ষণে ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হল. একটু ইতস্তত করে বললুম, 'বসুন।'

সাতাশ আঠাশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ভদ্রলোক সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারলেন না। আমরা স্কটিশে বছর দুই একসঙ্গে পড়েছিলুম।'

বললুম, 'ও ঠিক ঠিক, এবার মনে পড়েছে, আপনার নাম বোধ হয়—'

'মৃগাঙ্ক মজুমদার।'

বললুম, 'অনেকদিন পরে দেখা হল।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা হল। দেখুন, আমি খুব একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

মৃগাঙ্কবাবুর দিকে একটু তাকিয়ে নিলুম। বেশ লম্বা-চওড়া সবল চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। চওড়া কপাল। মাথার চুল ব্যাক্‌ব্রাস করা। অস্বাস্থ্যের তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। কিন্তু অসুখ তো আর সব সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এমন কি ডাক্তারের চোখেও নয়।

'বলুন।'

ভদ্রলোক একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়।'

ডিসপেনসারীতে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। পার্টিশনের ওপাশে কম্পাউণ্ডার রমেশ ওষুধের আলমারীর সামনের টুলটায় ঢুলছে। চাকর হরিদাসও কাছাকাছি নেই। কোথাও বোধ হয় মোড়ের পান বিড়ির দোকানটায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বললুম, 'তাহলেও এখানে বলতে পারেন। আর যদি কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে পাশের কেবিনে চলুন।

একবার কেবিনের কাটা দরজার দিকে আর একবার বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সীটার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী রয়েছেন গাড়িতে।'

একজন মহিলা যে গাড়িতে বসে আছেন তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু যেন এইমাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তেমনি ভঙ্গিতে বললুম, 'সে কি, ওঁকে নিয়ে আসুন এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার হলে পরে আনব।'

বললুম, 'আচ্ছা তাহলে কি কেবিনের ভিতর যাবেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার নেই, এখানেই বলছি। She is in family way. But we don't want it. বুঝতে পারছেন?'

বললুম, 'বুঝেছি। কতদিন হল?'

মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'stageটা একটু advanced. চার মাস চলছে।'

বললুম, 'একটু মানে বেশ advanced. এখন কিছুই করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মনে কিছু করবেন না, এসব কথা আপনারা ভাবছেনই বা কেন। আপনাদের আর কি কোন সন্তান আছে?'

'না।'

'তাহলে ? তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে আগে থেকে সাবধান হওয়াই ত ভালো।'

'Precaution আমরা নিতাম।'

'Fail করেছে বুঝি ? কিন্তু দু' একটি সন্তানও হ'তে দেবেন না এই বা কোন্ কথা ? আপনার স্ত্রীর বয়স কত ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তেইশ চব্বিশ।'

বললুম, 'এই বয়সে দুটি একটি সন্তান থাকাই তো ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা জানি কিন্তু আমার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।'

একটু অবাক হয়ে থেকে বললুম, 'মাতৃত্বটা কেন যে মেয়েরা আজকাল পছন্দ করেন না বুঝি না, ওঁকে যদি এখানে আনেন আমি বরং বুঝিয়ে বলতে পারি। তাছাড়া এখন তো কিছুই করা সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান লোকই এতে রাজী হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অন্যান্য ডাক্তাররাও সেই কথা বলেছেন। আচ্ছা আপনিই বরং সুদত্তাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। দেখুন আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। কতখানি বিপদের সম্ভাবনা তা খুবই বুঝতে পারছি। তবু ওকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছি।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে গিয়ে গাড়ি থেকে স্ত্রীকে নামিয়ে আনলেন। লম্বা দোহারা চেহারার ফর্সা সুন্দরী বধূ। বেশ স্বাস্থ্যবতী। এ অবস্থায়ও তেমন কোন অবসাদ কি ক্লান্তির ভাব নেই। অথচ কেন এসব অদ্ভুত খেয়াল এঁদের হচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না।

বললুম, 'পাশের ঘরে চলুন।'

মহিলাটিকে বেশ একটু খুশি মনে হল। যেন আশাপ্রদ খবর কিছু পেয়েছেন।

তিনজনেই ঢুকলুম কেবিনে। গদিআঁটা বেঞ্চটায় পাশাপাশি বসলুম।

আমি কিছু বলবার আগে ভদ্রমহিলাই কথা বললেন, 'আপনি তাহলে রাজী আছেন ? আপনি পারবেন ?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'কেউ পারবে না। এ সব অসম্ভব ব্যাপার আপনারা চিন্তা করছেন কেন বলুন তো ?'

সুদত্তার মুখখানা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু পর মুহূর্তেই আরক্ত মুখে উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, 'দেখুন, আপনার কাছে আমি হিতোপদেশ শুনতে আসিনি। এসব উপদেশ ডাক্তাররা আজ মাস দেড়েক ধরে আমাকে শোনাচ্ছেন। কোন পথ আছে কি না, তাই বলুন, যত টাকা লাগে—'

ভদ্রঘরের এমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার মুখে এসব কথা উচ্চারিত হতে শুনে আহত হয়ে বললুম, 'দেখুন, টাকার প্রশ্ন নয়, বৈধতার প্রশ্নও না-হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আপনার জীবনের যেখানে risk—'

'জীবনের risk !' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন সুদত্তা, 'আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে ; খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন। চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।'

আমি অবাক হয়ে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি স্ত্রীর আধা-হিস্টেরিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছেন।

একটু পরে সুদত্তাই ফের কথা বললেন, 'ওঁকে বল, ওঁকে সব বুঝিয়ে বল। কোন কথা গোপন করবার দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু সব খুলে বললেই তো আর ডাক্তারী শাস্ত্র বদলে যাবে না সুদত্তা, খুলে তো এমন আরো দু'চার জনকে বলেছি।'

'ওঁকেও বল। উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা পথ বলে দিতে পারবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু আমার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে আসতে বললেন। সুদত্তা বসে রইলেন

কেবিনে।

আড়ালে বসে একটু ইতস্তত ক'রে মৃগাঙ্কবাবু সংক্ষেপে আমাকে বললেন, 'উত্তর ভারতে দাঙ্গার সময় আমার স্ত্রী লাহোরে ছিলেন।'

বললুম, 'আত্মীয়ের কাছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেইখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। মাস তিনেক পরে একটি ছোট্ট স্টেট থেকে সুদত্তাকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই ওর ফিরে আসছে না, কেবল ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করাচ্ছে। অথচ আমি বেশ জানি এ অবস্থায় ডাক্তারদের কিছু করবার নেই, করা সঙ্গতও নয়।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, ওঁকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শান্ত রাখাই আমাদের এখন উচিত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। আমি ওকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি। We must wait for the proper time.'

বললুম, 'ওঁকে ওঁর বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিন না কেন। সেখানে হয়তো খানিকটা শান্তিতে থাকবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাপ মা নেই। দূরসম্পর্কের কাকা কাকীমা আছেন। সেখানে জোর করে পাঠিয়েছিলাম। দু'দিন বাদেই ফিরে এসেছে। তাঁরাও তো সব শুনেছেন। এসব ঝক্কি পোহাতে তাঁরাও ভিতরে ভিতরে রাজী নন।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'অকারণে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আপনার ফীজ—'

বললুম, 'ছি ছি ছি, আপনাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুব খুশি হতুম কিন্তু এ অবস্থায়—। পরে যদি কোন দরকার হয়—।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দরকার তো হবেই, ওই সময় কোন হাসপাতাল-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমার তেমন কোন জানাশোনা নেই—'

বললুম, 'সেজন্য কোন অসুবিধে হবে না। কারমাইকেলের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ আছে। সময়মত সেখানেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। একদিন আসুন না আমাদের ওখানে। বিডন স্ট্রীটে আমার বাসা। এলে খুব খুশি হব। সেই সব কলেজী দিনগুলিই ভালো ছিল মশাই।'

বললুম, 'সত্যি।'"

বাসব একটু থেমে করবীর মুখের দিকে তাকাল। করবী একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু শুনবার আগ্রহ যে তেমনি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। বললুম, "তারপর?"

বাসব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, "তারপর পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ হল মৃগাঙ্কবাবুদের সঙ্গে। যত আলাপ পরিচয় হতে লাগল, মৃগাঙ্কবাবুর ওপর আমার তত শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। সত্যি বলতে কি, কলেজের ভালো ছেলেদের সম্বন্ধে আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ফার্স্ট বেঞ্চ আর ফার্স্ট-ক্লাস ওয়ালারা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে সে ধারণা পালটাতে সুরু করল। ওঁর নিজের সাবজেক্ট কেমিষ্ট্রি। কিন্তু রসায়নেই ওর রসের পিপাসা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও বেশ ঔৎসুক্য আছে। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু আমাকে যা আকর্ষণ করল তা ওর পাণ্ডিত্য নয়, মৃগাঙ্কবাবুর অমায়িক ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্টাচারেই আমি বেশি মুগ্ধ হলাম। বিশেষত স্ত্রী সম্বন্ধে যে দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পেরেছেন দেখে আরো ভালো লাগল। যতই বলি আমি নিজে হলে এমন হয়তো পারতাম না।

কথায় কথায় মৃগাঙ্কবাবু একদিন বললেন, 'সেদিন রাত্রের ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন বোধ হয়। আমি জানি ওসব হবার নয়, বিন্দুমাত্র রিস্ক আমি নিতে চাইনে। কিন্তু কি করব বলুন,

সুদত্তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলুম না, ওকে দেখাবার জন্যই—'

বললুম, 'তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। না হলে আপনার মত লোক অমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব—'

আরো এ্যাডভানসড্ স্টেজে পৌঁছে সুদত্তাও ওসব চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনিও বুঝতে পারলেন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়, কেউ তাঁকে কোন রকম সাহায্য করবে না, করতে পারবে না।

কিন্তু বাইরে নিশ্চেষ্ট রইলেন বটে ভিতরে ভিতরে কথাটা প্রায়ই তাঁর মনে খোঁচা দিতে লাগল। একদিন গভীর অভিমানে বললেন, 'আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। ডাক্তারী শাস্ত্রের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে মন সরল না। কারণ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর স্ত্রী যে কত কষ্ট পাচ্ছেন তা মৃগাঙ্কবাবু আমাকে সবই প্রায় খুলে বলেছিলেন। সব সময় একটা অশুচি অপবিত্রতার ভাব সুদত্তা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। এমনকি স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেও সুদত্তা শিউরে উঠতেন, কিংবা আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। স্ত্রীর ভাবভঙ্গি দেখে মৃগাঙ্কবাবুরও যে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা না আসত তা নয়, কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য, অদ্ভুত তাঁর বৈজ্ঞানিক সহিষ্ণুতা। স্ত্রীর স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃগাঙ্কবাবুরও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এর আগে সিনেমা থিয়েটার মৃগাঙ্কবাবু পছন্দ করতেন না। নিজের কাজ কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর বলে মনে করতেন ওগুলিকে। অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সুদত্তা দেখতে যেতেন সিনেমা থিয়েটার। কিন্তু এই ব্যাপারের পর মৃগাঙ্কবাবু নিজে হলেন তাঁর সঙ্গী। সুদত্তা অবশ্য বেশি বাইরে যেতে চাইতেন না। সারা দিন রাত ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চাইতেন। কিন্তু আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম, ওঁকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। বরং এ সময় একটু হাঁটা-চলা করা ভালো, যাতে আলো হাওয়া গায়ে লাগে আর মনটা প্রফুল্ল থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এসব উপদেশ অবশ্য সুদত্তা মোটেই কানে তুলতেন না। বরং এই অবস্থায় শরীরের পক্ষে যত রকম অনিয়ম অত্যাচার করা সম্ভব সবই তিনি করতেন। সময় মত নাইতেন না, খেতেন না, নানাভাবে নিজের শরীরকে নিপীড়ন করতেন। আমরা বুঝতে পারতুম এই নিপীড়নের মূল লক্ষ্য কি।

একদিন সুদত্তা বললেন, 'বাসববাবু, এমন কিছু করা যায় না, ভিতরের জিনিসটা যাতে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়? আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে।'

আমি বুঝতে পারতুম এই সব কথা বলবার জন্যই, এই সব আলোচনার জন্যই সুদত্তা আমাকে তাঁদের বাসায় মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। মৃগাঙ্কবাবুও চাইতেন আমি তাঁদের ওখানে যাই। সুদত্তা এসব কথা আলোচনা করুন আমার সঙ্গে। কারণ এভাবে সুদত্তার মনের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, ওই ধরনের চিন্তা প্রকাশের পথ পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদত্তাও খানিকটা তৃপ্তি আর স্বস্তি বোধ করবেন।

একদিন এক কাণ্ড ঘটল। মৃগাঙ্কবাবুর মুখেই শুনেছিলাম ঘটনাটা। তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসীমা থাকতেন কাশীতে। চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে মৃগাঙ্কবাবুদের বাসায় রইলেন কিছুদিন। আমিই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দুই চোখেই ক্যাটার‍্যাক্ট। অপারেশন করাতে হবে। মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা কেবল যে চোখেই কম দেখেন তা নয়, কানেও কম শোনেন।এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা আর মৃগাঙ্কবাবুদের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর তাঁর কানে যায়নি।

কিন্তু চোখে যতই কম দেখুন, সুদত্তার সন্তান সম্ভাবনাটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না।

'ক'মাস হল? বউয়ের সাধটাধ দিয়েছিস?'

মৃগাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ওসব আমরা মানিনে পিসীমা।'

পিসীমা বললেন, 'তা মানবি কেন। যত সব ম্লেচ্ছ খৃষ্টানের দল। সাধ না দিলে কি হয় জানিস? ছেলে 'ছোঁচা' হবে। সব সময় লালা বেরুবে মুখ দিয়ে। কোলে নিতে পারবি নে, জামা কাপড় সব

নষ্ট হয়ে যাবে। ভালোয় ভালোয় সাধ দে। বউয়ের যা খেতে ইচ্ছা করে এনে এনে খাওয়া। এ খাওয়ানো কেবল পরের মেয়েকে নয়। যে আপন জন পেটের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে, মায়ের মুখ দিয়ে সে-ই এসব ভালো অভালোর স্বাদ নেবে। তা যেমন বাপের ঘরে জন্মেছিস তেমনি তো হবি? যেমন আমার দাদার হাত দিয়ে জল গলে না, তেমনি হয়েছিস তুই, কৃপণের শিরোমণি।'

মৃগাঙ্কবাবুর বাবা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। এদিকে অবস্থা একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়িতে গেছেন। জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি সব সেইখানে। নিজেকেই দেখতে হয়।

দাদার পরিবর্তে তাঁর বোন মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমাই বউয়ের সাধের বন্দোবস্ত করলেন, ভাইপোকে ধমকে ফরমায়েস ক'রে ক'রে আনালেন সব জিনিসপত্র। নিজের হাতে রাঁধলেন মিষ্টান্ন, তৈরী করলেন পিঠে পায়েস। আনালেন নতুন শাড়ি। তারপর সব সাজিয়ে ধরলেন বউয়ের সামনে।

সুদত্তা পিসী শাশুড়ীর অলক্ষ্যে সব নর্দমায় ফেলে দিলেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'পিসীমাই না হয় কিছু জানেন না, কিন্তু তুমি জেনে শুনে আমাকে এমন ক'রে অপমান করছ কেন?'

তারপর বালিশে মুখ চেপে এই কান্না। সুদত্তা নান না, খান না, বেরোন না ঘর থেকে।

অপারেশন শেষ হলেও মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে রইলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'যদি দরকার হয় বল। এ সময় একজন কারো বউয়ের কাছে থাকা উচিত। যদি বলিস আমি থেকে যাই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'না পিসীমা, তোমাকে আর আটকে রাখতে চাইনে, তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি নার্স রেখে দেব।'

পিসীমা একটু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ভালোয় ভালোয় সব হয়ে গেলে একটা খবর দিস। ছেলে না মেয়ে জানাস কিন্তু একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে। আহা, বাবা বিশ্বনাথ করুন ছেলেই যেন হয় তোর ঘরে। পাকা ডালা দেব বাবার মন্দিরে। নাম রাখব বিশ্বেশ্বর।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গাড়ির সময় হল, গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

মৃগাঙ্কবাবুদের বাড়ির একতলায় আর এক ঘর ভাড়াটে থাকে। স্বামী, স্ত্রী আর শাশুড়ী। বউটি নিঃসন্তান। অনেক ডাক্তার কবরেজ দেখান হয়েছে, কালী মন্দিরে তারকেশ্বরে মানত রয়েছে বহু। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলী। বউটি মাঝে মাঝে সুদত্তাকে বলে, 'দিদি, একি মেমসাহেবী ঢং আপনাদের। সাত রাজার ধন মানিক আসছে ঘরে। কোন রকম সাড়া শব্দই নেই। শীত এল। জামা আর মোজা কিছু ক'রে টরে রাখুন। নইলে শেষে কিন্তু ভারি অসুবিধে হবে।'

সুদত্তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলেন, 'ওসব কিছু দরকার হয় না আমাদের।'

বউটি বলে, 'হয় আবার না। দিদি, নিজের পেটেই না হয় কিছু হয়নি। তাই বলে দেখিনি শুনিনি এমন তো নয়। আমার তিন বোনের তেরটি ছেলে মেয়ে। কাঁথা টাথা না ক'রে রাখলে ভারি কষ্ট হয় শেষে। আচ্ছা, আপনার নিজের যদি আলস্য লাগে, আমাকে আনিয়ে দিন উল টুল আমি সব ক'রে দেব, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনাদের। লোকে চেয়ে পায় না, আর আপনারা—'

এত সব কথার পরেও সুদত্তা জিনিসপত্র আনিয়ে দিলেন না দেখে বউটি নিজের স্বামীকে দিয়ে উল আনিয়ে টুপী আর মোজা বুনতে সুরু করল।

সুদত্তা স্বামীকে বললেন, 'আর তো পারিনে। তার চেয়ে ওদের সব খুলে বল। জগৎ সুদ্ধ লোককে জানিয়ে দাও—উঃ, জঘন্য, জঘন্য, আমি আর সহ্য করতে পারব না—'

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু সহ্য করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে কখনো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখিনি।

তারপর শেষ পর্যন্ত সুদত্তার সময় এল। কারমাইকেলে আমি কিছুদিন হাউস সার্জন ছিলাম জানো বোধ হয়। গেলে এখনো সবাই খাতির যত্ন করে। কোন রকম অসুবিধাই হল না। আলাদা একটা কেবিন নেওয়া হল সুদত্তার জন্য। দু'জন নার্স রাখা হল। ওয়ার্ডের ডাক্তার বোসকে আমি বিশেষ ভাবে বলে দিলুম খোঁজ খবর নিতে। তবু মৃগাঙ্কবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনার পক্ষে যদি থাকা সম্ভব হয়, খুব উপকৃত হব—'

হেসে বললুম, 'তাঁর দরকার হবে না। তবু আমি সাধ্য মত খোঁজ খবর নেব। ডেলিভারির পরই যাতে আমাকে ফোনে জানানো হয় তারও ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।'

স্বামীর উদ্বেগ দেখে সুদত্তাও একটু হাসলেন, 'অত ভাবছ কেন তুমি, কিছু ভয় নেই—'

সুদত্তার মুখের এই হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল। বেশ লাগল তাঁর স্বামীকে আশ্বাস দেওয়ার ধরণটুকু। মনে হল তিনি নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছেন। উদ্বেগ অশান্তি অস্বস্তির হাত থেকে এবার মুক্তি। আগেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। ডেলিভারির পর সন্তানটিকে নার্স অন্য ঘরে সরিয়ে নেবে, তারপর মেথর টেথর কেউ যদি নেয় দিয়ে দেওয়া হবে তাকে, আর না হয় কোন আশ্রম টাশ্রমে। সে সব ব্যবস্থাই ওরাই করবে। সেজন্য মৃগাঙ্কবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। এমন কেস্ মাঝে মাঝে আসে এখানে। কি করতে হয় না হয় নার্সরাই সব জানে। ওদের হাতে টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। সে টাকা জলে যায় না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, আমার কিছু ভালো লাগছে না বাসববাবু। জীবনে সজ্ঞানে কোনদিন কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। আর এসব নোংরামির মধ্যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।'

বললুম, 'উপায় কি বলুন।'

সুদত্তা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ওঁর কথায় কান দেবেন না। যা ব্যবস্থা হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

হাসপাতাল থেকে নার্স আমাকে রিং করল সকালে। শেষ রাত্রে ছেলে হয়েছে সুদত্তার। বিশেষ কোন কষ্ট পান নি মিসেস মজুমদার। সন্তানটিও ভালোই আছে। বেশ স্বাস্থ্যবান সন্তানই হয়েছে।

খবরটির প্রথমাংশ ফোনে জানিয়ে দিলুম মৃগাঙ্কবাবুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন একবার দেখে আসি সুদত্তাকে।'

একটু বিরক্ত হলুম মনে মনে; আবার আমাকে কেন টানাটানি করছেন। বললুম, 'আমার তো বেলা একটার আগে অবসর হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ একটাতেই যাব।'

তারপর আমরা দুজনে মিলে উপস্থিত হলুম হাসপাতালে। পর্দা ঠেলে নার্সের সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে মিসেস মজুমদারের কেবিনে। ঢুকেই দুজনে দোরের কাছে একটু থমকে দাঁড়ালুম। একটি নার্স সুদত্তার বেডের কাছে দামী একটি তোয়ালেতে জড়িয়ে শিশুটিকে দু'হাতে মেলে ধরে টুলের ওপর বসেছে। আর সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।

কিন্তু আমাদের দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন সুদত্তা। ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখখানিতে যেন দেহের সমস্ত রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নার্সকে ধমকে উঠলেন, 'যান, যান, নিয়ে যান এখান থেকে। ওকে কে আনতে বলল আপনাকে।'

নার্সটি মুহূর্তের জন্য বুঝি একটু হতভম্ব হয়ে রইল তারপর মুচকে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি সুদত্তার দিকেই তাকিয়েছিলাম। মৃগাঙ্কবাবুর মুখভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি; যখন তাঁর দিকে তাকালুম কোন বিকৃতির ভাব দেখতে পেলুম না।

একটু বাদে স্ত্রীকে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ সুদত্তা!'

প্রকৃতিস্থ হতে একটু সময় লাগল মিসেস মজুমদারের, চোখ নিচু ক'রে বললেন, 'ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার এত ভয় হচ্ছিল।'

সুদত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ভয়ের কি আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু যেন হাসলেন, 'না এবার নিশ্চিন্ত।'

খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা। হঠাৎ মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাসববাবু আগের এ্যারেনজমেণ্ট সব ক্যানসেল করুন; আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সে কি; তা কি ক'রে হবে। মিসেস মজুমদারই বা তাতে রাজী হবেন

কেন। না না না, ও সব করতে যাবেন না মৃগাঙ্কবাবু, জটিলতা বাড়াবেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হাসলেন, 'জটিলতার তো কিছু নেই। মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।'

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম, 'না না না, কি বলছেন আপনি। এখানকার মাতৃত্ব তো অবিমিশ্র নয়। তার সঙ্গে সমাজ, সম্মান, কত রকম কত সংস্কার, সুবিধা-অসুবিধা-বোধ জড়িয়ে আছে। মিসেস মজুমদারের যে বাৎসল্য আপনি দেখলেন, তা হয় তো নিতান্তই ক্ষণিক, নিতান্তই ফিজিক্যাল।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু হাসলেন, 'সবই তো তাই।'

আমার বাধা মানলেন না মৃগাঙ্কবাবু। তখনই নার্সদের সঙ্গে আগের বন্দোবস্ত সব নাকচ ক'রে দিয়ে এলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু মিসেস মজুমদাব—'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি সব ম্যানেজ ক'রে নেব। আপনি ভাববেন না।'

বেশ একটু বিরক্তির সুব মৃগাঙ্কবাবুর গলায়। মনে মনে ভাবলুম, 'আমাব ভাববার কি আছে।'

সপ্তাহখানেক বাদে স্ত্রীপুত্রকে বাড়ি নিয়ে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শুনলুম সুদত্তা খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কান দেন নি। বলেছিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো তুমি। না হয় তোমার মত সুন্দর হয় নি, একটু কালোই হয়েছে, তাই বলে ছেলে কেউ ফেলে দিয়ে যায় নাকি।'

বাড়িতে পৌঁছে ফোনে আমাকে খবর দিলেন মৃগাঙ্কবাবু,'সব ঠিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে যথেষ্ট কষ্ট দিলুম আপনাকে—'

আমি বললুম, 'না না না।'

সেই সময় মজুর শ্রেণীব একটি রোগী আমার ডিসপেনসারীতে বসেছিল। সঙ্গে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটিই বড়। স্ত্রীব চিকিৎসার জন্যই এসেছে। দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে দিলুম। ছোট ছেলেটি মার কোলে উঠেছে দেখে বড়টিও কোলে উঠবার দাবী জানাতে লাগল। স্বামী তাকে নিজে তুলে নিল কোলে।

বললুম, 'ছেলে বুঝি তোমার খুব বাধ্য?'

ও জবাব দিল, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভারি ন্যাওটা।'

মনে মনে হাসলুম। ছেলেটি ওর স্ত্রীর আগের পক্ষের। ও আমার অনেক দিনের পেশেন্ট। ওদের সব খবরই জানি। ওর আগের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বর্তমান স্ত্রীকে সে বিয়ে ক'রে এনেছে। তখন বিধবা মেয়েটির কোলে ছিল এই ছেলেটি। আজ সে তার মার কোল ছেড়ে দিব্যি আমার রোগীর কোলে চড়ে বসেছে। সবই অভ্যাস, সবই সংস্কার। যেমন মনের জোর দেখেছি মৃগাঙ্কবাবুর তাতে তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

তারপর বছরখানেকেব মধ্যে কোন খোঁজ খবর রাখিনি মৃগাঙ্কবাবুর। ওঁরাও খোঁজ নেন নি। আমিও ইচ্ছা করে দূরে সরে রয়েছি। আমার সঙ্গ খুব প্রীতিকব আর বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে ওঁদের পক্ষে।

কিন্তু মাসখানেক আগে মিসেস মজুমদার হঠাৎ সেদিন আমাকে ফোনে ডেকে বললেন, তিনি অসুস্থ। দয়া করে আমি যদি যাই তিনি খুব উপকৃত হবেন।

আমি বললুম, 'আচ্ছা। কিন্তু মিষ্টার মজুমদার কোথায়?'

'তিনি একটু বাইরে গেছেন।'

হরিপাল লেনে আর একটা কল ছিল। শেষ করতে করতে বেলা দেড়টা, তারপর হাজির হলাম মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি।

পুরোন চাকর অমূল্য আমাকে গত বছর থেকেই চেনে ; দেখে হেসে বলল, 'আসুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আসেন না আমাদের এদিকে।'

খুব যে শক্ত অসুখ বিসুখ আছে এ বাড়িতে তার রকমসকম দেখে তা মনে হল না। অমূল্যর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ভাড়াটে বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে থাকেন

মৃগাঙ্কবাবুরা। তার মধ্যে একখানা তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী, আর একখানা বসবার, ভিতরের দিকের সবচেয়ে বড ঘরখানায় সুদত্তার গৃহস্থালী। দেখলুম অন্য দু'খানা ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। অন্দরের ঘরখানার সামনে এসে অমল্য বলল, 'যান, মা আছেন ভিতরে।'

সাড়া পেয়ে সুদত্তাও এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, 'আসুন, ভাবলুম আপনি বুঝি এলেনই না।'

দেখতে আরো যেন সুন্দর হয়েছেন সুদত্তা, প্রথম দিককার সেই উন্মত্ততা কেটে গেছে। প্রশান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু দুই চোখের নিচে কেমন যেন বিষণ্ণতার আভাস।

বললুম, 'কি অসুখ আপনার।

সুদত্তা একটু হাসলেন, 'এসেই অসুখের খোঁজ করছেন—'

বললুম, 'ডাক্তারদের কি কেউ সুখের দিনে ডাকে ?'

সুদত্তা কোন জবাব দিলেন না।

ঘরের মধ্যে দোলনায় বছর খানেকের একটি শিশু ঘুমুচ্ছে, বললুম, 'ছেলে ভালো আছে তো ?'

সুদত্তা বললেন, 'হ্যাঁ, বিশুর কোন অসুখ বিসুখ নেই।'

বললুম, 'বিশু ?'

সুদত্তা একটু আরক্ত হয়ে উঠে বললেন, 'পিসীমার দেওয়া নামই রাখা হয়েছে। বিশ্বেশ্বর।'

গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে বললুম, 'বেশ ভালো নাম হয়েছে। যাক অসুখ বিসুখ কিছু নেই তাহলে। শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। খবর সব ভালো হলেই ভালো। মৃগাঙ্কবাবু বাইরে গেলেন যে হঠাৎ ?'

'হ্যাঁ, নাগপুরে গেছেন একটু। নতুন এক ধরনের গিনীপীগ নাকি দেখা গেছে সেখানে। তার কিছু সংগ্রহ ক'রে আনবেন।'

অবাক হয়ে বললুম, 'গিনীপীগ! গিনীপীগ দিয়ে করবেন কি তিনি ?' সুদত্তা বললেন, 'ক্রসব্রীডিং নিয়ে উনি যে একসপেরিমেণ্ট করছেন তাতে দরকার হবে।'

বললুম, 'ক্রসব্রীডিং ?'

সুদত্তা আমার চোখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, বায়োলজিই তো ওঁর এখন মেইন সাবজেক্ট, হেরিডিটি সম্পর্কে—'

তারপর সুদত্তা হঠাৎ বললেন, 'আমি আর পারছি না ডাক্তারবাবু।'

একটু হাসতে চেষ্টা করে বললুম, 'বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী হলে এমন এক-আধটু উৎপাত—'

সুদত্তা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'উৎপাত! বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী কি মানুষ নয় ডাক্তারবাবু ? সে কি ইঁদুর না গিনীপীগ ?'

তারপর একটু একটু ক'রে সবই খুলে বললেন সুদত্তা। তালা বন্ধ দুটো ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'বায়োলজির বই আর বোতল ভরা পোকা মাকড়ে দুটো ঘরই এখন ভরতি। বোধ হয় বিশুকেও ওর ভিতরে ভরে রাখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এনভিরনমেণ্টের প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বেলায় অতখানি সতর্কতার দরকার হয় না বোধ হয়।'

একটু হতভম্ব হয়ে বললুম 'কি যে বলেন!'

সুদত্তা বলতে লাগলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন বিশুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কিছুতেই রাজী হননি। নিজের জিনিস কি কেউ ছাড়ে ? মৃগাঙ্কবাবুর চোখে বিশু একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। বিশু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান। কিন্তু নিজের চোখে কিছুতে এসব সহ্য করতে পারছেন না সুদত্তা। দামী পোষাক, দামী সব খাদ্য আর খেলনার ব্যবস্থা তিনি করেছেন বিশুর জন্য। দিনের মধ্যে অন্তত তিন চার বার খোঁজ নেন ছেলের, কোলে করে আদর করেন, চুমুও খান। তারপর হঠাৎ বিশুর দিকে চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখেন আর কলম খুলে নোট নেন পকেটবুকে। নিজের চোখে ওই দৃষ্টি কি ক'রে সহ্য করেন সুদত্তা ?

কি বলব হঠাৎ ভেবে পেলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালুম, 'আজ একটু তাড়া আছে সুদত্তা দেবী। আজকের মত—'

সুদত্তা বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর একটু বসুন। আরো কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আবার কি ?'

একটু চুপ করে রইলেন সুদত্তা, মুহূর্তের জন্য বুঝি ইতস্তত করলেন একটু,তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, এবারো আমি— ! এবার আর ওতে এ্যাডভান্সড স্টেজ নয়। এবার আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'কি বলতে চান আপনি ?'

এতক্ষণ মুখ নিচু করে কথা বলছিলেন সুদত্তা, এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। প্রথম দিনের সেই উন্মত্ত দৃষ্টি। যেন আজও তিনি ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। কি একটা অপ্রবৃত্তি আর ঘৃণায় আজও যেন তাঁর সর্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠেছে।

সেদিনের মতই সুদত্তা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি যা চাই তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কম্প্যারেটিভ ষ্টাডির মেটিরিয়াল জোগাতে চাইনে।'"

বাসব থেমে সিগারেট ধরাল। আমি সামান্য একটু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম, করবী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেডিও খুলে দিল। বক্তৃতা নয়, গল্পও নয়, "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।"

অনুরোধের আসর :

করবী বলল, "বাঁচলুম।"

পৌষ ১৩৫৫

ফেরিওয়ালা

'চাই ছিটের কাপড়, সস্তায় সায়া, সেমিজ, ব্লাউসের কাপড়...'

সদর রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা শহরতলীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই দিকে সারে সারে বাড়ি। ছাদে, রেলিঙে নানা রঙের শাড়ি শুকাচ্ছে, স্তব্ধ দুপুর। পুরুষেরা কাজে বেরিয়েছে। মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সুযোগে নিজেরাও ঘুমিয়ে নিচ্ছে একটু। মিষ্টি মোলায়েম সুরে ঘুম-ভাঙানো ডাক দিতে দিতে ফেরিওয়ালা এগিয়ে চলল, 'চাই সস্তায়...'

ডান দিকের পুরোন জীর্ণ পাটকেলে রঙের একতলা বাড়িখানার একটা জানলা খুলে গেল, 'এই ফেরিওয়ালা, শোন। কি দিচ্ছ সস্তায় ?'

বাড়িটা ছাড়িয়ে এসেছিল ফেরিওয়ালা, ফিরে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়ায়,— 'ছিটের কাপড়—সায়া সেমিজ ব্লাউসের...'

'আরে প্রফুল্লদা না ?'

প্রফুল্লও কিছুক্ষণ থেমে রইল, তার পর বলল, 'মল্লিকা তুমি ! তোমরা এদিকে থাকো নাকি ? কত দিন আছ এখানে ?'

মল্লিকা জবাব দিল, 'অনেক দিন। এই ফাল্গুনে দু'বছর হ'ল। কিন্তু তোমাকে তো এর আগে—। কিন্তু তোমার দোকানের কি হ'ল। তোমার দোকান ছিল না বউবাজারের ওদিকে ? তা গেল কোথায় ?'

প্রফুল্ল ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অদ্ভুত একটু হেসে প্রফুল্ল জবাব দিল, 'যাবে আবার কোথায়। দেখতেই তো পাচ্ছ, কাঁধে উঠেছে।'

কথাটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলে মল্লিকাও হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, এবার মুখ টিপে হেসে বলল, 'উঠেছে বেশ হয়েছে। না হলে কি আর দেখা হ'ত। এসো, ভিতরে এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'ভিতরে গিয়ে কি হবে ?'

মল্লিকা বলল, 'আর লজ্জা করতে হবে না, এসো। ভিতরে এসে জিনিস বেচা-কেনা হবে। মা আছে ভিতরে। এসো ভয় নেই।'

মল্লিকা আবার একটু ঠোঁট টিপে হাসল। প্রফুল্ল একটু হেসে তাকিয়ে রইল সেই চাপা পাতলা

ঠোঁটের দিকে। আশ্চর্য, হাসলে এখনো ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। কালো-পেড়ে একখানা আধ-ময়লা শাড়ি মল্লিকার পরনে। কাঁধের কাছে একটু ছিঁড়েও গেছে। ব্লাউসটা আরো পুরোন। হাতে লাল রঙের দু'গাছি প্লাষ্টিকের বালা। গায়ের আর কোথাও গয়না নেই। গলা কান সব খালি। প্রফুল্লর বুঝতে বাকী রইল না আগেকার সেই সামান্য সচ্ছলতাটুকুও আর নেই মল্লিকাদের। ওরা আরো অভাবে পড়েছে। কিন্তু আর একটি অভাব প্রফুল্লর কাছে ভারি সম্ভাব-ব্যঞ্জক বলে মনে হল। সিঁথিতে এখনো সিঁদুর ওঠেনি মল্লিকার। ঘন চুলের মাঝখানে সরু রেখাটুকু এখনো সাদা। মল্লিকা আজও কুমারী।

'দাঁড়িয়েই থাকবে তা হ'লে ?' অভিমানে আরও মিষ্টি শোনাল মল্লিকার গলা। ঠিক পনের-ষোল বছর বয়সে তখন যেমন শোনাত। তার পর আরও সাত বছর কেটেছে। সেই ভরাট মুখ আর নেই মল্লিকার। গাল দু'টোয় একটু ভাঙন ধরেছে। আগের চেয়ে আরো এক-পোঁচ ময়লা হয়েছে রঙ। কিন্তু গলার আওয়াজটুকু যেন ঠিক তেমনি মিঠে আছে বলে মনে হল প্রফুল্লর।

অন্যান্য জায়গা থেকে এমন ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ এলে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে প্রফুল্ল, কিন্তু আজ যেন সঙ্কোচ কাটতে চায় না। ছিটের কাপড়, সাদা লংক্লথ, গোলাপী, আর চাঁপা ফুলের রঙের পপলিনের থান ক'খানা যেন পাথরের মত ভারি মনে হল প্রফুল্লর। এই বেশে কি ভিতরে যাওয়া যায় ?

ছোট মামীর জেঠতুতো ভাইয়ের মেয়ে। সেদিক থেকে কটুম্বিতা দূর-সম্পর্কের। কিন্তু সাত-আট বছর আগে সবটুকু দূরত্বই প্রায় ঘুচবার জো হয়েছিল। নিঃসন্তান বিধবা পিসীর বাড়িতে মাঝে-মাঝে মল্লিকা বেড়াতে আসত। কখনো কখনো থাকতও দু'-এক মাস। আর মল্লিকা এসেছে খবর পেয়েই প্রফুল্ল ছুটত মামা বাড়িতে। পাশাপাশি গ্রাম। ছুটেই যাওয়া যেত। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে শান্ত শিষ্ট গম্ভীর মুখে হাজির হত প্রফুল্ল। পায়ের ধুলো নিত ছোট মামীর। ক্ষেত-খামার সংক্রান্ত বৈষয়িক কথা-বার্তা বলত তাঁর সঙ্গে, যেন সেই জন্যই এসেছে। মল্লিকা বলে তাঁর কোন ভাইঝিকে যেন প্রফুল্ল চেনে না, তার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্যও যেন নেই। ছোট মামী সবই বুঝতেন। কিন্তু বুঝে বুঝতে চাইতেন না, ভারি কড়া ছিলেন এ সব বিষয়ে। তাঁর চোখের পাহারা এড়িয়ে মল্লিকার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ প্রফুল্ল কমই পেত। তবু রাধাগঞ্জের মনোহারী দোকানের এক বাক্স সাবান, চিরুণী, স্নো-পাউডারের কৌটো মাঝে মাঝে মল্লিকার হাতে গিয়ে পৌঁছত। কখনো বা শুধু ছোট-ছোট চিঠির টুকরো আর মামা-বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রফুল্লর সার্টের ঝুল পকেট থেকে বেরুত ফুল-তোলা রুমাল কি বালিসের ঢাকনি।

মামীমা বাইরে যত কড়াই হন, ভিতরে ভিতরে মনটা একটু নরমই ছিল তাঁর। আকারে-ইঙ্গিতে প্রফুল্লর কথাটা পেড়েও ছিলেন জেঠতুতো ভাইয়ের কাছে। কিন্তু মল্লিকার মা-বাবা মাথা পাতেননি। মল্লিকার আরো দুই আইবুড়ো দিদি ছিল তখন। তা ছাড়া তাঁদের নজরও উঁচু ছিল। থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়া মফঃস্বল শহরের পঁচিশ টাকা মাইনের মনোহারী দোকানের কর্মচারী প্রফুল্ল কর তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক নিচে পড়ে ছিল।

কিন্তু সেদিন আর নেই। তার পর সাত বছর কেটেছে। অনেকগুলি দিন হয় সাত বছরে।

ততক্ষণে মল্লিকার মা স্নেহলতাও এসে দাঁড়িয়েছেন জানলায়, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস মল্লী ?'

মল্লিকা জানালার পাশ থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'চাঁদকান্দার সোনা পিসীমার ভাগ্নে। ডিঙামানিকের প্রফুল্ল—প্রফুল্লদা। লজ্জায় আসতে পারছে না ভিতরে।'

স্নেহলতা লক্ষ্য করে বললেন, 'ও মা, তাই তো, সেই প্রফুল্লই তো, তা লজ্জা কিসের ! এসো, এসো, পুরুষ ছেলের আবার লজ্জা কিসের বাবা ! যা তো মল্লিকা, সদরটা খুলে দিয়ে আয়। ও-পাশ দিয়ে ঘুরে এসো প্রফুল্ল।'

মল্লিকার মাকেও মামা-বাড়িতে দেখেছে প্রফুল্ল। সেই মোটা-মোটা চেহারা এখন হাড়-সার হয়েছে। মল্লিকার মা'রও শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর কোন ভূষণ নেই। পরনে পুরুষের পুরোন চুল পেড়ে ধুতি।

সঙ্কোচটা অনেকখানি কমে গেল প্রফুল্লর। ঘুরে এসে দাঁড়াল সদর দরজার কাছে। দোর ততক্ষণ

খুলে গেছে। মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকা।

মুহূর্তকাল চুপ-চাপ কাটল। মল্লিকাও এবার কাছ থেকে আরো ভালো করে দেখে নিল প্রফুল্লকে। গায়ে টুইলের সাদা সার্ট, পরনে ফর্সা কোঁচানো ধুতি, পায়ে ষ্ট্রাইপের স্যাণ্ডাল। বেশে-বাসে এখনো বেশ সৌখীনতা আছে প্রফুল্লর। সাতাশ-আঠাশ বছরের যুবকের স্বাস্থ্য। ঝড়-ঝাপটার পরেও বেশ শক্ত আছে। রঙটা যেন আরো ফর্সা হয়েছে। ব্যাক-ব্রাস করা ঘন কালো চুলগুলি আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। কেবল কাঁধের কাপড়ের থানগুলি বে-মানান। তা ওগুলি নামিয়ে রাখতে কতক্ষণ।

মল্লিকা বলল, 'এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'তোমাব বাবা বুঝি অফিসে বেরিয়েছেন ?'

মল্লিকা একটু থামল, তারপর বলল, 'বেরিয়েছেন, কিন্তু অফিসে নয়।'

'তবে কোথায় ?'

'তুমি বুঝি কিচ্ছু জান না ? জানবেই বা কি করে। পিসীমা মারা যাওয়ার পরে তো আর কোন খোঁজ খবর নেই। কি সব গোলমালে বাবাব সেই অফিসের চাকরি গেছে। অনেক দিন বসে ছিলেন। বছব তিনেক হল গাড়িতে গাডিতে হোড় কোম্পানীর দাঁতের মাজন আর বাতের মালিসের ক্যানভাসিং করেন।'

নিজেদেব পরিবারের এতগুলি কথা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে ফেলে মল্লিকা যেন অপ্রস্তুত হল। তাবপর প্রফুল্লকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু এতদিন পরে দেখা ? মা-বাবার খোঁজ খবর নেওযা ছাড়া আর বুঝি তোমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই ?'

প্রফুল্ল একটু হাসল, 'আছে বই কি, আরো কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে বলেই তো ওসব কথা আগে করে নিচ্ছি। জান তো আমাদের ফেরিওয়ালাদের স্বভাব। কাঁচা বয়সের ঝি-বউদের নিয়ে কারবার, তাই আগে থেকেই আট-ঘাট সব জেনে রাখতে হয়। কোথায় বাবা-মা, কোথায় শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী—'

মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল আবার একটু হাসল। নিজের ব্যবসা নিয়ে এর আগে এমন সুরে, এমন ভঙ্গিতে প্রফুল্ল কোন দিন পরিহাস করতে পারেনি। কাঁধের কাপড়ের থানগুলির ভার যেন আর নেই। পপলিন, মলমলের রঙ যেন কেবল থানেরই নয়, প্রফুল্লর সমস্ত মনে—সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সে রঙের ছোপ লেগেছে মল্লিকার মুখে।

আরক্ত মুখে একটু কাল চুপ করে থেকে ফের মুখ খুলল মল্লিকা। কৃত্রিম সংশয়ে অভিমানে কুঁচকালো যুগল ভ্রূ, বলল, 'তাই বল। এত কাজ থাকতে বেছেবেছে তাই বুঝি এই চাকরি নিয়েছ ? এই স্বভাব হয়েছে বুঝি আজকাল ?'

প্রফুল্ল বলল, 'কি করি বল। অভাবে—'

ঘরের ভিতর থেকেই ডাক ছাড়লেন স্নেহলতা, 'ও মল্লী, প্রফুল্ল কি ফিরে গেল নাকি ? রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা তোদের ? আয়, ভিতরে আয়, ঘরে আয়।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'এসো, ঘরে এসো, তারপর বউ কেমন আছে ?'

জিজ্ঞেস করতে বুকটা একটু দুলে উঠল, গলাটাও যেন একটু কাঁপল মল্লিকার। প্রফুল্ল হেসে উঠল, 'কেবল বউ ? ছেলে-পুলে নাতি-নাতনীব কথা জিজ্ঞেস করলে না ?'

মল্লিকার বুকের পাথর যেন নেমে গেল, তবু একটু সংশয়ের সুরে বলল, 'সত্যি, এখনো বিয়ে করোনি তুমি ?'

প্রফুল্ল বলল, 'ক্ষেপেছ। ফেরিওয়ালাকে মেয়ে দেয় না কি কেউ ?'

মল্লিকা একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, 'দেয় কি না দেয়, দেখা যাবে। এবার এসো, আর দেরী করো না।'

প্রফুল্ল লক্ষ্য করল আগেকার মত লজ্জা-সঙ্কোচ আর নেই মল্লিকার। অনেক প্রগল্‌ভা হয়েছে। অনেক বদলে গেছে। তাতে কি হয়েছে ? প্রফুল্লও কি বদলায়নি ?

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর এক ঘর মাত্র ভাড়াটে থাকে এ বাড়িতে। নতুন স্বামী-স্ত্রী! মাত্র বছর খানেক বিয়ে হয়েছে। অফিস কামাই করে অরুণবাবু ম্যাটিনী শো'তে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছেন বউকে নিয়ে। যেতে যেতে তালাবন্ধ দু'খানা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দু'-এক কথায় অরুণবাবু আর তার বউয়ের কাহিনী প্রফুল্লকে শুনিয়ে দিল মল্লিকা, তার পর ছোট্ট প্যাসেজটুকু পার হয়ে নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল।

মাঝারি ধরনের একখানা ঘর। আধখানা বাজে কাঠের এক জোড়া তক্তপোশে জোড়া। নিচে বাক্স প্যাঁটরা হাঁড়ি-কুঁড়ি গৃহস্থালীর নানা রকম দরকারী আধা দরকারী জিনিস।

স্নেহলতা সস্নেহে আমন্ত্রণ জানালেন, 'এসো প্রফুল্ল, এসো। আহা, জুতো নিয়েই এসো, তাতে দোষ হবে না।'

প্রফুল্ল এসে তক্তাপোশে বসল, নামিয়ে রাখল কাঁধের কাপড়গুলি।

স্নেহলতা বললেন, 'ভালো হয়ে বসো বাবা। ঈস, কি রকম ঘেমে গেছে দেখ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন মল্লিকা, পাখাটা নিয়ে আয়, একটু বাতাস কর।'

তালের পাখাখানা নিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল মল্লিকা।

স্নেহলতা বললেন, 'একটু দোকান-টোকানের মত দিয়ে বসলে হয় না? অবশ্য কিছুতেই কিছু দোষ নেই আজকাল। কত জনে কত কি করে খাচ্ছে। চুরিবাটপাড়ি না করলেই হল, কিন্তু রোদে-রোদে এমন করে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট তো হয়।'

প্রফুল্ল বলল, 'হ্যাঁ। এবার একটু দোকানের মতই দেব ভেবেছি। উল্টাডিঙির ওদিকে একখানা ঘরেরও খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও সব এক রকম ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। এবার একটা ভালো দিন-টিন দেখে—'

'তা তো বটেই। শুভ কাজ কি অদিনে অক্ষণে হয় বাবা? ভালো দিন-টিন নিশ্চয়ই দেখে নিও।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে আর একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'বিয়ে-টিয়ে করেছ নাকি?'

প্রফুল্ল লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ল, 'করলে তো শুনতেই পেতেন।' তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'ওসব কথা ভাববার সময় কই মাসীমা। ভুগে ভুগে দাদা মারা গেলেন। বউদি, তিনটি ভাইপো-ভাইঝি, কাউকেই তো ফেলবার জো নেই। অথচ এ বাজারে—'

'তোমার বাবা আছেন না প্রফুল্ল?'

'আছেন। কিন্তু সে না থাকারই সামিল। চলতে-ফিরতে পারেন না। ভালো করে চোখে দেখতে পান না। সবই আমাকে দেখতে হয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'তুমিই উপযুক্ত ছেলের কাজ করছ বাবা। আর আমি সব শত্রু ধরেছিলাম পেটে। ছেলে একবার খোঁজ খবরও নেয় না, বউ নিয়ে আলাদা হয়ে রয়েছে। নইলে আমার কিসের দুঃখ বল। ছেলেই যদি ছেলের মত হত তা'হলে কি বুড়ো বয়সে ওঁকে অত কষ্ট করতে হয়, না আমার মল্লিকা—'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন স্নেহলতা, মল্লিকা তাড়াতাড়ি প্রফুল্লর মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, 'এই কাঁঠালী চাঁপা রঙের কাপড়টার গজ কত করে?' 'প্রফুল্লদা' কথাটা আর উচ্চারণ করল না মল্লিকা।

প্রফুল্ল বলল, 'কত করে তা জেনে কি হবে? তোমার ক'গজ দরকার তাই বল।'

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, দর-দাম না করে জিনিস কিনব কেন? যদি ঠকিয়ে দাও!'

স্নেহলতা কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন, 'চুপ কর মুখপুড়ী। তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না প্রফুল্ল।'

মল্লিকা মা'র কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর এই আশমানী রঙের পপলিনটা?' দু'হাতে রঙীন কাপড়গুলি ঘাঁটতে লাগল মল্লিকা। মন যেন রঙের সমুদ্রে ডুব-সাঁতার কেটে চলেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'যত সব আদেখলেপণা! ও সব রেখে প্রফুল্লকে একটু চা-টা করে দিবি তো দে।'

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'না না, এত গরমে চা আমি খাই নে। চা'র দরকার নেই।'

কিসের যে দরকার তা জানে মল্লিকা। কাপড়ের থানগুলি সরিয়ে রেখে মল্লিকা উঠে গিয়ে তাক থেকে কাচের গ্লাসটা পেড়ে নিল। চা খাওয়ার জন্য সামান্য একটু চিনি আছে কৌটোয়। উপুড় করে ঢালল গ্লাসের মধ্যে। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই একগ্লাস সরবৎ এনে প্রফুল্লর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রফুল্ল বলল, 'আবার এ সব কেন।'

কিন্তু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিল গ্লাসটা। নেওয়ার সময় আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল। ফিরিয়ে নেওয়ার সময়ও তেমনি।

তারপর প্রফুল্ল বলল, 'পছন্দমত যে কোন কাপড় থেকে দু'গজ কাপড় তুমি রাখ মল্লিকা।'

স্নেহলতা বাধা দিলেন, 'না না, কাপড়ে দরকার নেই প্রফুল্ল। ব্লাউসের অভাব আছে না কি বাক্সে। যত আদেখলেপণা।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভগবান যদি মুখ তুলে চান, যদি নিতে দেন তখন নেব প্রফুল্ল, এখন থাক।' গজ নয়, গজপতির দিকে দৃষ্টি স্নেহলতার। বললেন, 'কবে আসবে?'

প্রফুল্ল বলল, 'আসব এক দিন।'

'এক দিন নয়। এই রবিবারে এসো। দুপুরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। মল্লিকার বাবাকেও থাকতে বলব। দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হবে তাঁর সঙ্গে।'

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়ল। কাপড়ের থানগুলি ফের তুলল ঘাড়ে। আবার যেন ভারি ভারি লাগল জিনিসগুলি।

স্নেহলতা মেয়েকে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস, প্রণাম কর।'

দু'জনেই ভারি কুণ্ঠিত। স্নেহলতা তো জানেন না, অত ঘটা করে প্রণামের রেওয়াজ নেই আজকাল।

তবু একটু মজা করবার জন্য নিচু হয়ে প্রফুল্লর পায়ের ধুলো নিল মল্লিকা। তার পর মাথা তুলতেই প্রফুল্লর ঝুল-পকেটে মাথা ঠুকে গেল। আর খবর-কাগজে মোড়া একটা পুলিন্দা পকেট থেকে ছিটকে এসে মেঝেয় পড়ল।

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, 'এটা কি?'

প্রফুল্ল একটু যেন চমকে উঠল, তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়, একটা শাড়ি।'

'শাড়ি? কার শাড়ি?' আবার কুঞ্চিত হল মল্লিকার ভ্রূ। অবশ্য পরের মুহূর্তেই প্রফুল্লর হাসিতে তার অমূলক আশঙ্কা দূর হল।

প্রফুল্ল বলল, 'খদ্দেরের শাড়ি। বিক্রির জিনিস। যে নেবে তার।'

মল্লিকা বলল, 'দেখি, দেখি, কি রকম জিনিস। খুলব?'

প্রফুল্ল বলল, 'আমি খুলে দেখাচ্ছি।'

তারপর সযত্নে কাগজের মোড়ক খুলল প্রফুল্ল। একটা ভাঁজ খুলে মল্লিকার সামনে ধরে রেখে বলল, 'দেখ।'

দেখবে কি, মল্লিকা অপলকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। গাঢ় লাল, আগুনের রঙের শাড়ি। ছুঁতে সাহস হয় না। রুদ্ধশ্বাসে মল্লিকা বলল, 'কি কাপড় এটা, কত দাম?'

প্রফুল্ল বলল, 'বিষ্ণুপুরী সিল্ক। বাজারে পঁচাত্তরের এক পয়সা কমেও কেউ দেবে না। আমি পঁয়ষট্টিতে দিতে পারি।'

পঁয়ষট্টি! সে যে কতগুলি টাকা! অত টাকার শাড়ি পরবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মল্লিকা। কিন্তু শাড়িখানা যে স্বপ্নের চেয়েও চমৎকার, সিল্কের কাপড়ের কেবল নামই শুনেছে মল্লিকা, ছুঁয়ে দেখেনি, পরে দেখেনি! কি রকম অনুভূতি হয়! কোন আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে!

প্রফুল্ল বলল, 'একেবারে আনকোরা নতুন।' নতুন তো বটেই, কাগজে আঁটা দোকানের নাম

লেখা রয়েছে ইংরেজীতে। মল্লিকা লক্ষ্য করে দেখেছে।

প্রফুল্ল আবার দু'-একটা ভাঁজ খুলে দেখাল, যত খোলে তত যেন চোখ ঝলসে যায়, আগুন লাগে রক্তে।

প্রফুল্ল আবার বলল, 'ঘর থেকে পা বাড়ালেই পঁচাত্তর, তার ওপর সেলট্যাকস্। একটি পয়সা কমে কেউ এ জিনিস দিতে পারে না। আমি পঁয়ষট্টিতে—'

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রফুল্লর। এ সব সে কার কাছে কি বলছে! মল্লিকার মত অনেক মেয়ে, অনেক বউ প্রফুল্লর শাড়ির মহার্ঘতার কথা জেনেছে বলে মল্লিকাকেও কি তাই জানতে হবে?

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি শাড়িখানা ভাঁজ করে কাগজে জড়িয়ে নিল। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'যাই আজ। মহাজনের মাল কি না। না হলে পঁয়ষট্টি হোক, পঁচাত্তর হোক, কিছুতেই পিছ-পা হতাম না।'

মল্লিকাও সহজে পিছ-পা হবে না। প্রফুল্লর পিছনে পিছনে গিয়ে নিচু-গলায় বলল, 'সদরের কাছে একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।'

লুব্ধ এক জোড়া চোখ মল্লিকার দেখতে পেয়েছে প্রফুল্ল। কেবল মল্লিকার নয়, নাম-না-জানা গৃহস্থ-ঘরের আরো কত বউ-ঝি, কিশোরী-প্রৌঢ়ার চোখও এমনি চক্-চক্ করে প্রফুল্লর বিষ্ণুপুরী সিল্কের রঙে। তারপর পঁয়ষট্টি টাকার কথা শুনে মল্লিকার মত অনেকেই চুপসে যায়। আরো কিছু কমে হয় না? কত কম? এই ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে?

প্রফুল্ল হেসে ওঠে। কখনো বা রাগ করে চলে যায়। যেন মহা অপমানিত হয়েছে। কিন্তু রাগ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একটু বাদে ফের এসে দাঁড়ায়। মধুর কণ্ঠে ডাকে, 'কই দিদিমণি, আসুন! যেতে-যেতেও যেতে পারলাম না। আপনারা যদি অমন অবুঝের মত কথা বলেন, একটু বুঝে-শুঝে বলুন। যাতে আপনিও গলে না যান, আর এই গরীবও না মারা যায়। পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিন।'

প্রফুল্ল ফিরে আসায় দিদিমণি কি বউদি রাণীর মুখখানাও বেশ খুশী-খুশী দেখা যায়, 'আরো পাঁচ টাকা কমাও! পঁয়তাল্লিশ টাকায় দিয়ে যাও। তোমাকে সত্যি বলছি এর বেশী আর আমার কাছে নেই। দিয়ে যাও শাড়িখানা, দোহাই তোমার।'

প্রফুল্লর মন গলে যায়, বলে, 'অনেক লোকসান হল, কিন্তু আপনি যখন বলছেন অত করে, যা পারেন তাই দিন।'

বউ-ঝিরা ভয়ে ভয়ে আঁচলের গিঁট খুলে জানালা দিয়ে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোটগুলি গলিয়ে দেয় প্রফুল্লর হাতে। প্রফুল্ল খবরের কাগজে জড়ানো সেই বিষ্ণুপুরের সিল্কের বাণ্ডিলটা তুলে দেয় করপল্লবে। তার পর মধুর হেসে জোড় হাতে নমস্কার করে, 'গাল দেবেন না। মন্দ বলবেন না যেন।'

তারপর দ্রুত-পায়ে জানলার কাছ থেকে সরে যায়। মোড়ের পানওয়ালা, বিড়িওয়ালাকে দু'টো টাকা বখরা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে চলন্ত বাস-ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে।

বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়িখানা কেবল মহাজনের মাল নয়, প্রফুল্লর ব্যবসার মূলধন। এ জিনিস কি করে হাতছাড়া করবে প্রফুল্ল। যদি করতে পারত, তাহ'লে মল্লিকার চেয়ে বেশী যোগ্য, বেশী সুন্দর হাত আর কার ছিল।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই মল্লিকা ফিরে এল। প্রফুল্লর প্রায় বুকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন। মা'র কাছে ছিল দশ টাকা। আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পনের টাকা জমিয়েছিলাম। এই নাও। আমার কাছে আর কিছু নেই।'

প্রফুল্ল ভারি দুঃখিতভাবে বলল, 'কিন্তু মল্লী, ও শাড়ির দাম যে অনেক বেশী।'

আসল দামের চেয়েও যদি বেশী দামী না হ'ত, জিনিসটা যদি দিয়ে দেওয়া যেত, যদি ছেড়ে দেওয়া যেত!

মল্লিকা মুখ-ভার করে বলল, 'ঘর থেকে টাকা যখন বের করেছি, তখন এ টাকা আর ফিরিয়ে নেব না। কাল তুমি আমার জন্য পঁচিশ টাকার যোগ্যাই আর একখানা শাড়ি নিয়ে এসো। মা'র কাছে

আমার মুখ থাকবে।' বলে নোট আর কাঁচা টাকাগুলি প্রফুল্লর সার্টের ঝুল-পকেটে গলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল মল্লিকা।

প্রফুল্ল একবার ডেকে বলল, 'শোন, শোন।'

মল্লিকা শুনল না।

খোলা দরজা দিয়ে গলিতে নেমে পড়ল প্রফুল্ল। চিন্তিত মনে এগুতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। শাড়িটা মল্লিকাকে দিয়ে আসতে পারলেই ভালো হত। অবশ্য দামী শাড়ি, প্রফুল্লর ব্যবসার জিনিস। কিন্তু মল্লিকা কি আরো দামী নয়? আরো দামী নয় দু'জনের সংসার, মধুর গৃহস্থালী? ব্যবসা? এ ব্যবসা ছাড়া কি ব্যবসা নেই?

মোড়ের পানওয়ালার কাছে আসতেই, পানওয়ালা মৃদু হেসে বলল, 'কই বাবু, আসুন, পান নিয়ে যান আপনার।' তার পর এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে কেবল পানই নয়, প্রফুল্লর পকেটের বাড়িগুলের মত আর একটি সমান আকারের সমান ওজনের বাণ্ডিল প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার জিনিস। এবার পানের দামটা—'

প্রফুল্ল কি ভেবে একটি টাকা তুলে দিল পানওয়ালার হাতে।

পানওয়ালা চেঞ্জ না দিয়ে তেমনি হাতের তালু প্রসারিত করে রইল, 'তারপর কালো কালো দাঁত বার করে হেসে বলল, 'ছিঃ দোস্ত! অত কমে কি হয়?'

ম্লান মুখে প্রফুল্ল বলল, 'আজ কিছু হয়নি জনার্দ্দন।'

জনার্দ্দন বলল, 'আজ না হয়েছে কাল হবে। পুলিশ আজও এসে ঘুরে গেছে, সেলামী নিয়ে গেছে। এর কমে আমি কিছুতেই পারব না।'

হাতের পাঁচ আঙুল মেলে ধরল জনার্দ্দন।

ক্ষুণ্ণ মনে মল্লিকার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা জনার্দ্দনকে দিয়ে দিল প্রফুল্ল। তার পর পুলিন্দাটি হাতে করে ফের সরে এল দোকানের কাছ থেকে। আর নয়, আর এ সব নয়। মল্লিকার জিনিস মল্লিকাকেই আজ সে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এ ব্যবসার এখানেই শেষ হয়ে যাক। মল্লিকা শাড়ি পরুক। আর তার সেই শাড়ি পরা রূপ দেখে চোখ ভরুক, মন ভরুক প্রফুল্লর।

বড় রাস্তা থেকে ফের গলিতে ঢুকল প্রফুল্ল, তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মল্লিকা, একবার শোন।'

গলার সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা এসে জানালায় দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি?'

'তোমার শাড়ি নাও তুমি।'

কাগজে মোড়া বাণ্ডিলটা শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিল প্রফুল্ল, 'তোমার জিনিস তুমি নাও।' ভারি অন্যমনস্ক প্রফুল্ল। মুখে বলছে কিন্তু তার হাজার দ্বন্দ্ব, হাজার ওঠা-পড়া, হাজার রাজ্যের ভাবনা।

মল্লিকা বলল, 'না না, সে কি? কাল এনে দেবে, সেই তো কথা ছিল।'

'না না কাল নয়, আজই নাও। কাল হয় তো আর পারব না।' অদ্ভুত আবেগ প্রফুল্লর গলায়।

'ভিতরে আসবে না?'

প্রফুল্ল বলল, 'আজ নয়, আরেক দিন আসব। তাড়াতাড়ি নাও, কেউ দেখে ফেলবে।'

সত্যিই একটি লোক যেন দূর থেকে লক্ষ্য করছিল প্রফুল্লকে। লোকটির মুখ যেন চেনা-চেনা। মল্লিকার হাতে কোন রকমে বাণ্ডিলটা গুঁজে দিয়ে প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে এল। তার পর গলির আর এক মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

গোটা স্টপেজ ছাড়াবার পর হঠাৎ খেয়াল হল প্রফুল্লর। তাই তো, কোন বাণ্ডিলটা দিয়ে এসেছে মল্লিকাকে? তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল। পকেটের বাণ্ডিল পকেটেই আছে। হাতটায় যেন আগুনের ছোঁয়া লাগল। বাস না থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল রাস্তায়।

'কি ব্যাপার, কিছু খোয়া গেছে নাকি?' এক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, খোয়া গেছে, সব খোয়া গেছে প্রফুল্লর।

তবু মনের সংশয় ভাঙবার জন্য বাণ্ডিলের ওপরের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল প্রফুল্ল। কোন

ভুল নেই। সেই আনকোরা নতুন আগুনের রঙের বিষ্ণুপুরী সিল্ক। প্রফুল্লব ভবিষ্যতের সমস্ত রঙ যেন আগুনে ঝলসে গেছে, পুড়ে গেছে ছাই হ'য়ে!

গোটা কয়েক ফিরতি বাস পেল পঁয়ত্রিশ নম্বরের। প্রফুল্ল প্রতিবার ভাবল উঠে পড়ে। কিন্তু আর উঠে লাভ কি! আব কি উঠবার জো আছে?

এতক্ষণে মল্লিকা মোড়কটা নিশ্চয়ই খুলে ফেলেছে। তারপর বাগবাজার শ্যামবাজার বউবাজারের আরো অনেক তন্বী সুন্দরী বউ-ঝি, কুমারী কিশোরীদের মত মল্লিকাও হতভম্ব, নিষ্পলক চোখে মোড়কের ভিতরের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রফুল্লর অপূর্ব ম্যাজিকের বলে মল্লিকার হাতের সেই বিষ্ণুপুরী সিল্কও এক গজ পাটের চটে এতক্ষণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

বৈশাখ ১৩৫৬

বিদ্যুৎলতা

রাণীঘাট শহরের কাপুড়ে পট্টির পিছনে অপরিসর কাণাগলির খোলার বস্তীটি এই গ্রীষ্মের দুপুরে বড় অস্থির, বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই অস্থিরতার কারণ গ্রীষ্মের আধিক্য নয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এ-পাড়ার অধিবাসিনীদের তেমন কাতর করতে পারে না, এ গলিতে বছরের সব সময় ঋতুরাজ বসন্তের আধিপত্য। এখানকার বাসিন্দারা মাঘের রাত্রে সস্তা সূতীর চাদর জড়িয়ে, কেই কেউ বা কেবল আঁচল সম্বল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের কাছে কেরোসিনের ডিবি মিটিমিটি জ্বলে, কারো বা ছোট হ্যারিকেন লণ্ঠন। সলতেটা দেখা যায় কি যায় না, বর্ষার দিনে বৃষ্টির ছাঁটে আঁচল ভেজে, ঘর ভেজে, কারো বা চালের ফুটো দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে বিছানা বালিশ ভিজে যায়। কিন্তু তাই বলে মন আর গলা একটুও আর্দ্র হয় না। দুরন্ত বর্ষায় এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের সঙ্গে দর কষাকষি করবার সময় এদের গলা আরো তীব্র, আরো খটখটে শোনায়। ঠোঁটের বিড়ি আর হৃদয়ের আশা শ্রাবণের মুষলধারার মধ্যেও অনির্বাণ জ্বলতে থাকে।

গ্রীষ্মও এখানে বেশ সহনীয়। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘর। সাধারণ অবস্থায় যে ঘরে একজন অতিথির ঠাঁই হওয়া শক্ত, কোন কোন সময় সে ঘরে হয়তো একই সঙ্গে আট দশজন রসিক পুরুষের আর্বিভাব হয়। বাঁশী বাজে, বাঁয়া-তবলার চাঁটি পড়ে কোন কোন ঘরে রেকর্ডে প্রেমসঙ্গীত চলে। আসে চা, তেলেভাজা, পেঁয়াজের বড়া। একটু বেশী রাত হলে, দেশী বোতল মোড়ের অন্নপূর্ণা হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট থেকে চাঁট, মাছভাজা, ডিম, মাংসের জোগান আসতে থাকে। গরম খাদ্যে ও পানীয়ে ঘরের ভাপসা গরমের কথা টেরই পাওয়া যায় না। সারা গা থেকে দর দর করে ঘাম ছোটে। সে যেন ঘাম নয়, রসস্রোত! শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুই এখানে রমণীয়।

অবশ্য দুপুর বেলাটা এ পাড়ায় অস্থিরতার সময় নয়, দশটা এগারটার মধ্যে নাওয়া খাওয়া সেরে ঘরে ঘরে প্রায় সবাই বিছানায় ঢলে পড়ে। গরমের দিনে অনেকে বিছানা ছেড়ে দোরের কাছে কি বাদাম গাছের ছায়ায় খোলা রোয়াকে ছোট ছোট বিছানা পাতে। শীতলপাটি কি মাদুরের চিলতে, একটা বালিশ আর তালের একখানা হাতপাখা। ডাঁটিটা হাতের মধ্যে দু'চার বার ঘুরতে না ঘুরতে আপনিই খসে পড়ে, রাত জাগা জ্বালা ধরা লালচে চোখগুলি পরম আরামে বুঁজে আসে। ভিজে চুলের রাশ বালিশ ছাড়িয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে। সস্তা তেলের উগ্র গন্ধে মন্থর বাতাস আরো ভারি হয়ে ওঠে। গায়ের কাপড়-চোপর প্রবীণারা ইচ্ছা ক'রে সরিয়ে রাখে, কমবয়সী মেয়েদের ঘুমের ঘোরে সরে যায়।

কিন্তু এ পাড়ার দুপুরের রূপ আজ হঠাৎ বদলে গেছে। অধিবাসিনীদের কারো চোখে আজ আর ঘুম নেই, দোরের কাছে কি রোয়াকে আজ কারো বিছানা পড়েনি, সবই আজ বিছান রয়েছে। সকলের মনই বড় অশান্ত, উত্তেজনায় অধীর। হাতে হাতে একখানা ক'রে কাগজ। কাগজের লেখা কেউ পড়তে জানে না, তাই বলে লেখার মর্ম কারো জানতে বাকি নেই। মিউনিসিপ্যালিটির পিওন

সতীশ এসেছিল বাড়িওয়ালার লোকেব সঙ্গে। সেই কথাগুলি সবাইকে পড়ে শুনিয়ে গেছে। 'এতদ্বাবা জানান যাইতেছে যে—' নোটিশের কাগজ থেকে মুখ তুলে মুচকি হেসে জ্ঞাতব্য তথ্যটুকু প্রাকৃত বাংলায় সতীশ জানিয়ে দিয়েছে, 'আব কি, এবার তল্পী গুটাবাব দিন এল গো, এক মাসের মধ্যে ঘবগুলি খালি ক'বে দিতে হবে। কর্তাদের হুকুম, বুঝলে ?'

জল্পনা কল্পনা কয়েক মাস ধবেই চলছিল। পূর্ববঙ্গেব বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে শহরে পা ফেলবার যো নেই, শহবে তাদেব স্থান দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির পুনর্বসতি সাবকমিটি স্থির কবেছেন, এই পতিতা পল্লীটিকে শহবের মাঝখান থেকে যদি উপড়ে ফেলা যায়, অনেক জায়গা বেরুবে। বহু ভদ্র গৃহস্থ ঘর সংসাব পাততে পাববে এখানে। বস্তীবাড়িগুলিব মালিক প্রাণগোপাল মল্লিক প্রথমে এক আধটু আপত্তি কবেছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি জোর চাপ দিযেছেন। তাছাড়া প্রাণগোলাপকে এ কথাও কমিটি বুঝিযে দিযেছেন, এতে তাব লাভ ছাড়া লোকসান নেই। বস্তীর ঘবগুলির জন্য ওবা যা ভাড়া দেয, বিপাকে পড়ে বাঙালরা তাব চেয়ে বেশী ছাড়া কম ভাড়া দেবে না। ফলে প্রাণগোলালেরও কথাটা যুক্তি সঙ্গত মনে হযেছে। প্রাণগোপালেব গমস্তা গণেশ সরকাব এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, কেউ যেন আর নিশ্চিন্ত হযে চুপচাপ না থাকে, এখন থেকেই যার যাব জায়গা বাসা সবাই দেখে নিক, ইংরেজী মাসেব তিরিশ তারিখে ঘর সবাইকে ছাড়তেই হবে। আগামী মাসেব পয়লা তারিখ থেকে গৃহস্থ ভাড়াটেবা ঘবে ঢুকবে, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়ে গেছে।

ঠাট্টা তামাসাই মনে হযেছিল প্রথমে। বাড়িওয়ালী সুখদা এই নোটিশের কথা শুনে প্রথম তো হেসেই অস্থির হয়েছিল। বলেছিল, 'কালে কালে কত কাণ্ডই দেখব। পঁচিশ বছর ধবেই দেখে আসছি। দিনেব বেলায় যাবা নাক সিটকায়, রাত্রে এসে তাবাই পায়ে ধবে সাধাসাধি কবে। তুলে দেবে! তুলে দেওয়া অমনি চাট্টিখানি কথা কিনা। তা ছাড়া তুলে দিয়ে ওরা নিজেরাই কি একতিল সুস্থ থাকতে পারবে নাকি ? এবেলায তুলে দিলে ওবেলায ফের সেধে ভজে নিয়ে আসবে দেখে নিস,—পুরুষ চিনতে তো আব বাকি নেই।'

কিন্তু সুখদার কথা শ্রুতিসুখকর হলেও কারো কাছে আজ আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল না। তাছাড়া থানাব কনেষ্টবল, জমাদাব, মিউনিসিপ্যালিটির পেয়াদা, পিওন, দু'চাব জন কেরাণী, মুনসেফেব খাস বেয়ারা হীরালাল এবং আবও সব হিতৈষী বন্ধুজনেরা জানিয়ে গেছে, এবারকার খববটা গুজব নয়, সত্যিই খাঁটি। উঠতে সবাইকে এবার হবেই। মাস দুয়েক আগে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছিলেন এ শহবেব কৃষি শিল্প স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে। তিনিও মিউনিসপ্যালিটির পরিকল্পনা সানন্দে সমর্থন ক'র গেছেন, বলে গেছেন, ব্যাপারটা শহরবাসীদের অনেক আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল, শহরের মাঝখানে এমন একটা নোংরা পল্লীর অবস্থান কি শারীরিক, কি নৈতিক কোন স্বাস্থ্যের পক্ষেই অনুকূল নয়। তাছাড়া নীতিবাগীশ পূর্ণেন্দুপ্রসাদ চৌধুরী এবছব ফের মিউনিসিপ্যালিটির সেবা চেযাব দখল করেছেন, সুতবাং এবার আর রেহাই নেই।

বাড়িওয়ালী সুখদার দাওয়ায় জন দশেকে জটলা বেঁধে ছিল। হাতের কাগজ খানার দিকে চোখ বুলিয়ে মালতী উদ্বেগেব সুরে বলল, 'হ্যাঁ মাসী, সত্যিই কি তিরিশ তারিখের মধ্যে ঘর খালি করে দিতে হবে, পুরো মাস খানেকও তো নেই—আর মোটে ছাব্বিশ দিন, কী উপায় হবে তখন ?'

'কী উপায় হবে, তার আমি কি জানিগো।'

বছর পঞ্চাশেক বয়স হয়েছে সুখদার, কালো স্থূল চেহারা, মাথার ওপর চুল চূড়ার মত করে রাখা। উর্দ্ধাঙ্গে আবরেণের বালাই নেই। যে গরম বিনা আবরণেই ঠিক থাকা যায় না, গায়ের চামড়া অবধি তুলে ফেলতে ইচ্ছা হয়, তায় আবার কাপড়-চোপড! সারা গায়ে অনুক্ষণ ঘামাচিতে চিট চিট করে সুখদার। ছোট্ট ঝিনুক দিয়ে গায়ের ঘামাচি মারছিল সুখদা, মালতীর কথায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'ন্যাকী কোথাকার, দশের যা হবে তোরও তাই হবে।'

ধমক খেয়ে মালতীর মুখ চুণ হয়ে গেল।

তার পক্ষ নিয়ে সোহাগী বলল, 'অত রাগ করছ কেন মাসী, ও জিজ্ঞেস করছিল, আর ছাব্বিশ

দিন বাদেই কি আমাদের উঠে যেতে হবে ?'

সুখদা বলল, 'ছাব্বিশ দিন না ছত্রিশ দিন ! কাগজেই তো নিখে দিয়েছে বাপু, আমি কি উকিল মোক্তার, না জজ ম্যাজিস্ট্রার যে কাগজের নেখা তোদের পড়ে শোনাব ; নেখাপড়া জানা পেয়ারের নোক তো সবারই আছে, দরকার হয় পড়িয়ে নিগে যা। আমাকে জ্বালাসনি।'

মালতী সোহাগীর দল এবার সুখদার দাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে মালতী চড়া গলায় বলল, 'মেজাজ দেখলি তোর মাসীর ? বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর। দুদিন বাদে সবাইকেই তো ছত্তরখান হয়ে যেতে হবে। এখন কে আর ওর রাগের ধার ধারে, বল দেখি ভাই।'

কিন্তু নোটিশের লেখাটা আর একবার শুনতে পারলে যেন ভাল হত। অবশ্য ছাব্বিশ দিন যা একমাসও তাই, উঠতে তো হবেই, তবু মেয়াদটা সঠিক করে আর একবার শুনতে সকলেরই ইচ্ছা হ'ল, তর্ক বিতর্কও সুরু হ'ল একটু আধটু। সোহাগী বলল,'ছাব্বিশ দিন নয়, একমাস ছাব্বিশ দিন।'

আলতা বলল, 'হ্যাঁ সেই আশাতেই থাক্, তারপর মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে যখন গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবে তখন দেখিস মজা।'

দলের মধ্যে কেউ লিখতে-পড়তে জানে না। মোড়ের বিড়িওয়ালা ফটিকের দোকানে গেলে হয়, ও-নোটিশটা আবার পড়িয়ে আনা যায়, কিন্তু কে যাবে এই রোদের মধ্যে ? এমন কিছু মধুর সুখবর তো নয় যে শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা করে আসবে। সেই একই খবর, শুনলে জ্বালা কমবে নাকি ?

মোড়ের বিড়িওয়ালা ছাড়াও এ পাড়ার আরো একজন লেখাপড়া জানে। সে দক্ষিণ পূব কোণের কোঠা ঘরের বিদ্যুৎ। কিন্তু এ পাড়ার নয়, দলের হয়েও যেন দল ছাড়া, তবু দলের সকলের হিংসা, দ্বেষ তাকে বিদ্ধ করতে পারে না, রাগের জ্বালায় নিজেরাই জ্বলে।

পাড়ার মধ্যে সেরা পসার বিদ্যুতের। বয়স চব্বিশ পঁচিশ বছরের কম হবে না। কিন্তু রূপে, স্বাস্থ্যে বাড়িওয়ালী সুখদার ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ে সিন্দূরকে পর্যন্ত হার মানায়। এই নিয়ে সুখদার রাগ কি কম। তার মেয়ের দিকে না তাকিয়ে খদ্দেররা বিদ্যুতের জানালার ধারে ঘুর ঘুর করে। অবশ্য ঘুর ঘুর করলেই যে সকলে বিদ্যুতের নাগাল পায় তা নয়, যারা আঁধার রাতে বুঁচী, পাঁচী, ক্ষেন্তী, চাঁপার মুখের কাছে দেশলাইর কাঠি জ্বেলে ধ'রে সৌন্দর্য যাচাই করে নেয়, যারা মালতী সোহাগী কি সিন্দূরের মুখে টর্চের আলো ফেলে, তাদের সাধ্য নেই বিদ্যুতের দিকে হাত বাড়ায়। তা' হলে কেবল হাত নয়, সর্বাঙ্গ পুড়বে।

বিদ্যুতের খদ্দেররা পায়ে হেঁটে আসে না। তাদের কোচম্যান, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়ায়, কোন দিন তারা ওকে তুলে নিয়ে যায়, কোন দিন গভীর রাত্রে প্রমত্ত নাগরকে ঝি চাকরের সাহায্যে বিদ্যুতই তুলে দেয় গাড়িতে। বিদ্যুতের খদ্দেরদের সঙ্গে সোহাগী, মালতীর খদ্দেরদের তুলনা হয় না। বিদ্যুতের সঙ্গে তাদের তেমন প্রতিযোগিতাও নেই, তবু বিদ্যুতের নাম শুনলে প্রত্যেকের গায়েই কেমন যেন একটা জ্বালা ধরে। কদাচিৎ কারো সঙ্গে কথা বলে বিদ্যুৎ। গরবে গুমরে যেন মাটিতে পা পড়ে না। গানবাজনার সঙ্গে বিদ্যুৎ লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে। প্রণয়ীদের মধ্যে কলেজের দু'একজন ছেলেও নাকি আছে তার। তারাই শিখিয়েছে। বিদ্যুৎ চিঠি লিখতে জানে, নভেল পড়তে জানে, এমন কি বেলা আটটার গাড়িতে যখন কলকাতার ডাক এসে পৌঁছয়, হকারের কাছ থেকে চার পয়সা দামের একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত নেয়। কাগজ থেকে খবর অবশ্য সে পড়ে না। পড়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, আইন-আদালতের কাহিনী।

সোহাগী বলল, 'চলনা ভাই আমাদের বিদ্যুৎলতার ঘরে। দেখেই আসিনা কি করছে সে। নোটিশ তো তার ঘরেও পড়েছে। শুনে আসি, সেই বা কী ঠিক করল।'

মল্লিকা বলল, 'মালতীকে আমরা ন্যাকা ন্যাকা বলি, তুই তার চেয়ে কম যাসনে সোহাগী ! সে কি করল না করল তা তোকে বলতে আসবে কি ? আসবে না। তার ভাবনা কি, সে কি আর তোর আমার মত ছাতিমতলায় যাবে। তার সহায় আছে, সম্পদ আছে, এ নোটিশে তার ভালোই হল, বর হল শাপে, বিদ্যুৎ এবার একেবারে জায়গা মত কলকাতার শহরে গিয়ে বাসা বাঁধবে দেখে নিস্। ওর মত মেয়ের ভাবনা কি ?'

কিন্তু মল্লিকার ধমক খেয়ে কেউ ভড়কে গেল না। দেখেই আসা যাক না কি করছে বিদ্যুৎ।

আজ আর ভয় কিসের।

দল বেঁধে সবাই এসে হাজির হল বিদ্যুতের ঘরের কাছে। ঘরের দোর বন্ধ কিন্তু জানলা খোলা। বিদ্যুৎ ঘুমোয়নি। তক্তোপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে সে চুপ করে বসে রয়েছে। ভিজে চুল শুকোচ্ছে পিঠে। একটু লম্বাটে সুন্দর মুখখানা কেমন যেন তার ভার ভার। মনও যেন অন্যমনস্ক।

সোহাগীরা প্রথমে এগিয়ে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, বলল, ওমা, 'তুমি দেখি জেগেই আছ বিদ্যুৎদি। আমরা ভাবলুম পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ।'

বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোহাগীর দিকে তাকাল, তারপর খোঁচা দিয়ে বলল, 'তোরা বুঝি এই ঘুম থেকে উঠে এলি ?'

সোহাগী থতমত খেয়ে বলল, 'না বিদ্যুৎদি ঘুমোবার কি জো আছে : ঘুম কি আর কারো চোখে আজ আসতে চায় ?'

বিদ্যুৎ অল্প একটু হাসল, 'তবে কি গল্প করতে এসেছিস্ নাকি দল বেঁধে।'

মালতী পাশ থেকে বলে উঠল, 'না বিদ্যুৎদি, গল্প করতে আসিনি। গল্পের দিন আর নেই দিদি। আমরা এলুম এই নোটিশটা পড়িয়ে নিতে। আর একবার পড়তো সবটা। কদিন এখনও বাকি আছে হিসাব ক'রে বল তো। নোটিশটা একবার পড়ে শোনাও আমাদের।'

জানলার ফাঁক দিয়ে নোটিশের কাগজটা বিদ্যুতের দিকে বাড়িয়ে দিতে গেল মালতী। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাগজখানা সবাই আর একবার যার যার চোখের সামনে তুলে ধরল। মালতীর গলার প্রতিধ্বনি পিছনের ক্ষেন্তী, ক্ষেমীর, রাধার গলায়ও শোনা গেল, 'হ্যাঁ বিদ্যুৎদি, কি লিখেছে আর একবার পড়। মুখপোড়া সতীশ গড়গড় ক'রে কি যে পড়ে গেল মাথামুণ্ড ভালো ক'রে বুঝতেও পারলুম না। তুমি ধীরে ধীরে পড় একবার।'

বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে বিদ্যুৎ বাইরের দিকে তাকাল। নানাবয়সী ত্রিশ চল্লিশ জন সমব্যবসায়িনীর ভিড়ে ছোট্ট বারান্দা ভরে গেছে। বিদ্যুতের বারান্দায় সব ধরেনি। রূপের স্রোত উপচে পড়েছে উঠানে। আশ্চর্য, এত মেয়ে আছে পাড়ায় তা যেন এতদিন ওর খেয়ালই ছিল না। একে একে সবাই এসে হাজির হয়েছে। সোহাগী তাহলে সত্য কথা বলেনি। বিদ্যুৎ ঘুমিয়েছে কিনা তা তারা দেখতে আসেনি, সে জেগে আছে কিনা তাই দেখতে এসেছে।

মালতী আবার বলল, 'পড়না বিদ্যুৎদি।'

অল্প বয়স। বছর দুই ব্যবসায়ে নেমেছে। এখনও ভারি মোলায়েম গলা, ভারি মোলায়েম মালতীর মুখ।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিদ্যুৎ বলল,'ও ছাই আবার পড়ে কি হবে মালতী। এক মাসের নোটিশ। তার মধ্যে পাঁচ সাত দিন তো কেটেই গেল। এখান থেকে সবাইকে আমাদের উঠে যেতে হবে।'

মালতী বলল, 'আমাদের মানে ? তোমাকেও ?'

বিদ্যুৎ বলল, 'তবে কি ? আমি কি আর তোদের ছাড়া আর একজন নাকি ? মুখুয্যে বাড়ির বউ ?'

কথাটা সোহাগীর কানেও নতুন শোনাল। বিদ্যুৎ তাদের ছাড়া নয়। কিন্তু ও তাদের দলেরই বা কবে ? তাদের ভালো মন্দ সুখ দুঃখের খোঁজ খবর কবে নিয়েছে বিদ্যুৎ।আজ সবাই মিলে তার দোরে ধন্না দিয়েছে বলেই সে কথা বলছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু যাই বলুক ওর গলা বেশ মিষ্টি, ভারি সুরেলা। সেইজন্যই কি অমন দেমাকী গরবিণী মেয়ের কথাও শুনতে ভাল লাগছে সোহাগীদের ?

সিন্দূর বলল, 'উঠে যেতে হবে তো বুঝলুম, কিন্তু উঠে যাব কোন্ চুলোয়, শুনি ?'

তক্তপোশ থেকে উঠে এসে বিদ্যুৎ এবার দোর খুলে বলল, 'এখনকার মত এই চুলোয় তো সব আয়। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবি।'

সবাই তো অবাক। মাঝে মাঝে সোহাগী, মল্লিকা দু'একজন ছাড়া বিদ্যুতের ঘরে আর কেউ ঢোকেনি। কোনদিন কাউকে ঢুকতে বলেনি বিদ্যুৎ, ঢুকতে দেয়নিও। বুঁচী একদিন ঢুকেছিল বলে, পাউডারের কৌটা চুরি গেছে ব'লে বিদ্যুৎ নালিশ করেছিল বাড়িওয়ালী সুখদার কাছে। ভয় দেখিয়েছিল থানা পুলিশের। ইতস্তত করছে ব'লে আজ সেই বুঁচীকে পর্যন্ত হাত ধরে টেনে নিল

বিদ্যুৎ। বলল, 'আয় আয় রাগ কবতে হবেনা।'

নিতান্তই বিনয় ক'রে নিজেব ঘরখানাকে বিদ্যুৎ চুলো বলেছে। কিন্তু বুঁচী খেঁদী দূরের কথা সোহাগী সিন্দুরের কাছেও বিদ্যুতের ঘরকে স্বর্গ বলে মনে হল। পুরু গদীওয়ালা খাট, গদী-আঁটা দু'তিনখানা চেয়ার,মানুষ সমান লম্বা আয়না, এককোণে দামী দামী নানারঙের শাড়ি বোঝাই কাঁচের আলমারী, কিছুরই অভাব নেই বিদ্যুতের। ঐশ্বর্য দেখে আজ ঈর্ষায় সোহাগী মালতীদের বুকটা তেমন যেন আর জ্বালা ক'রে উঠল না। ওর ভদ্রতায় তারা বিস্মিত হ'য়ে গেছে। মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে বিদ্যুৎ বলল, 'বোসো।'

সোহাগী আর সিন্দূব চোখে চোখে তাকাল সাঙ্কেতিক ইসারায়। ব্যাপার কি ? দিনে দুপুরেই আজ মদ গিলেছে নাকি বিদ্যুৎ।

আলতা বলল, 'চুলো আমাদের জন্য ঠিক হয়েই আছে বিদ্যুৎদি। জানোনা বুঝি। কাল রাত্রে মিউনিসিপ্যালিটিব শীতলবাবুব মুখে সবই শুনলুম।'

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে চাকরি করে শীতল কর। কখনো আলতার ওপর তার আকর্ষণ দেখা যায়, কখনো টানের মাত্রাটা সোহাগীর ওপরই বেশী থাকে। সেজন্য সোহাগী আর আলতা কেউ কাউকে দেখতে পারে না। পারতপক্ষে কথা বলে না সোহাগী আলতার সঙ্গে। কিন্তু আজ ভাবি আগ্রহ আর ঔৎসুক্য নিয়েই আলতাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল সোহাগী, 'কি বলছিল শীতল ?'

বক্তা কে তাব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আজ বক্তব্যটাই আসল।

আলতা বলল, 'বলছিল আমাদের জন্য ছাতিমতলা ঠিক হয়ে আছে। দবমার চালা বেঁধে দেবে এখনকাব মত। খুশী হয় সেখানে যাও, খুশী না হয় শহর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাও।'

মালতী বলল, 'ছাতিমতলা! সে আবাব কোথায় ?'

ততক্ষণে ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে বাড়িওয়ালী সুখদাও এসে জুটেছে। সে জোব ধমক দিল মালতীকে, 'ফেব ন্যাকামি করবি তো ছুঁচোল নাক তোর ছেঁচে দেব ছুঁড়ি! ছাতিমতলা কোথায় জানিসনে ?'

মালতী না জানলেও সোহাগী, বুঁচী, বাধা, মল্লিকাদের অনেকের কানেই গেছে ছাতিমতলার বর্ণনা। রাণীঘাট থেকে মাইল খানেক পুবে ধোপাপুকুরের কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, ছাতিমতলা তার নাম। হাট নেই, বাজাব নেই, জনমানব নেই, তবু সেখানে নাকি থাকবাব স্থান ক'রে দেওয়া হচ্ছে এই বাদামতলার বাসিন্দাদের। কলাবাগানের আড়ালে মজাপুকুর আছে একটা। তার চারদিক ঘিবে দবমাব বেড়ার ঘর বেঁধে দেওয়া হবে সোহাগীদের জন্য। সামনে দুরন্ত বর্ষা। মজাপুকুর নিশ্চয়ই আব এমনভাবে শুকিয়ে থাকবে না, ভরে উঠে মজাবে সোহাগী মালতীদের। জল হবে, কাদা হবে। একহাঁটু জলেব মধ্যে নিষ্ফল প্রতীক্ষায় রাতেব পর রাত কাটবে। কল্পনা ক'রে সর্বাঙ্গ শিউবে উঠল সকলের।

সোহাগী বলল, 'যেখানে গরু ছাগল থাকতে পারে না, সেখানে আমরা কি ক'রে থাকব মাসী।'

সুখদা বলল, 'পারবি লো ছুঁড়ী পারবি, তোদেব চামড়া গরু ছাগলেব চাইতে কম পুরু নাকি, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? মজাপুকুর কি মজা পুকুরই থাকবে রে সোহাগী ; দুদিন যেতে না যেতে রসের সমুদ্দুর হয়ে উঠবে দেখেনিস্; আমরা পা দিতে না দিতেই সাবা রাণীঘাট পায়ে পায়ে উঠবে, আমরা যেখানে শহর সেখানে; মধু যেখানে পিঁপড়ে সেখানে।'

সুখদা একটু হাসল, 'তারপর বুদ্ধি যদি থাকে, যদি একটু বুঝে সুঝে চলতে পারিস্, অকালে রোগব্যাধি এসে না ধরে, তাহলে এই সোহাগী মালতী তোরাই একদিন সেখানে কোঠা-বাড়ি তুলবি, রেট করবি দেড়া—মানুষ করবি ভেড়া।'

খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাটা থেকে একটা পান মুখে দিল সুখদা, খানিকটা সাদা তামাক ছিড়ে ফেলে দিল মুখের মধ্যে, তারপর বলল, 'কত দেখলুম এই চল্লিশ বছর বয়সে।'

সোহাগী মাথা নেড়ে বিরক্তির সুরে বলল, 'তোমাব চল্লিশ বছরের কথা এবার থামাও মাসী।'

চল্লিশ বছব ধরে সুখদা কি দেখেছে না দেখেছে সে কাহিনী আজ আর কারো শুনবার স্পৃহা নেই।

মালতী বলল, 'সেখানে গিয়ে টিকবো কি করে বিদ্যুৎদি ?'

বিদ্যুৎ হঠাৎ উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু যাব কেন সেখানে সেই কথার আগে জবাব দে।'

সিন্দুর বলল, 'তুমি না যেতে পার বিদ্যুৎদি, তোমার যাওয়ার ঢের জায়গা আছে—বলতে গেলে সারা কলকাতা শহরটা পড়ে আছে তোমার জন্যে—'

বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে সিন্দুর থেমে গেল। তারপর সোহাগীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাদের গতি কি হবে ?'

বিদ্যুতের এখন পর্যন্ত কোন গতি হয় নি, লোক পাঠিয়ে সে খোঁজ খবর করেছে, কলকাতায় নিজে গিয়ে খুঁজে এসেছে। কোথাও উঠবার জায়গা নেই। গৃহস্থরা এসে তাদের বেশীর ভাগ ঘর বাড়ি দখল করেছে। দু'একখানা ঘরের যদি বা একটু খোঁজ পাওয়া গেছে, চড়া ভাড়া, দশগুণ সেলামী। তাও ঘর এখনো খালি হয় নি, লোক উঠে গেলে তবে যাওয়া। ধারে কাছে কম বেশী সব শহরেরই এই দশা। সোহাগীদের সঙ্গে ছাতিমতলার মশা আর ম্যালেরিয়ারডিপো সেই মজাপুকুরের পাঁকেই বোধ হয় ডুবে মরতে হবে বিদ্যুৎকে।

'যদি না যাই ?' জোর করে ঘাড় বাঁকাল ও সোহাগী আর মালতীর দিকে।

পিছন থেকে ক্ষেন্তী বলল, 'কিন্তু না গিয়ে করব কি বিদ্যুৎদি, ঘাড় ধরে বের করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাবে যে, নিতাই কনেস্টবল বলছিল কাল রাত্রে !'

বিদ্যুৎ বলল, 'তোর নিতাই কনেস্টবলের ঘাড়ে কটা মাথা একবার দেখা যাবে।'

মালতী বলল, 'তোমার কত সহায় সম্পদ বিদ্যুৎদি। কত দারোগা, ইনস্পেকটার, উকিল, মোক্তারের সঙ্গে জানা শোনা। তুমি যদি এঁটে বেঁধে লাগ তা হলে নিশ্চয়ই একটা উপায় হবে।'

বিদ্যুৎ বলল, 'হবেই তো। কিন্তু কেবল আমি, একা আমি আঁটিলে বাঁধলে হবেনা। তোদেরও থাকতে হবে সঙ্গে। জানিস সেদিন কাগজে পড়েছিলুম চড়ুইডাঙ্গার ধোপারা জোট বেঁধে রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গাপুরের ধাঙ্গড় মেথরেরা—'

তা ঠিক। ঘরে আগে টিকে থাকা চাই। অবশ্য বুঁচী, ক্ষেন্তী, মানী, ক্ষেমীদের ঘর সোহাগী মালতীদের ঘরের মত নয়। বিদ্যুতের ঘরের মত তো নয়ই। বর্ষার সময় জল পড়ে, দেয়ালের চূণ বালি ঝরে ঝির ঝির করে। বাড়িওয়ালীকে ভাড়া দিতে গেলে পেটে পুরো খোরাক দেওয়া যায় না। তবু তো নিজের জিনিস। এ ঘর কেউ পেয়েছে মার কাছ থেকে, কেউ পেয়েছে পাতানো মাসীর উত্তরাধিকারিণী হয়ে, কেউ বা এসেছে পরম বিশ্বাসী ঘৃণাভাজনের হাত ধরে। তারপর কতবার হয়ত বদলেছে তার ঠিক নাই। বাসন-কোসন, বাক্স-পেঁটরা তিলে তিলে জমে উঠেছে এই ঘরে। সস্তাদামে সখের জিনিস গ্রাম-গ্রামান্তরের মেলা থেকে কিনে এনে ঘরে ভরেছে। কারো বা মনের মানুষ দিয়েছে সাধ ক'রে। তারপর মন বদলেছে। কিন্তু ঘর বদলায়নি। যদি বা দু'একজন এ ঘর থেকে ও ঘরে উঠেছে, কোন পরিবর্তন চোখে ঠেকেনি।

এখানকার সব ঘরের চেহারাই এক। ছোট ছোট পায়রার খোপ। একটি ক'রে জানলা। তবু ঘর নয়, স্বর্গ। কত দুর্দিন কত বঞ্চনার রাত্রে এই সব ঘর বুঁচী ক্ষেন্তীদের চার দেওয়াল দিয়ে নিবিড় ভাবে ঘিরে রেখেছে। মনোচোরের বেশে ঘরে ঢুকে কত চতুর চূড়ামণি যথাসর্বস্ব নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু ঘর যায়নি, দেয়ালগুলি ঠিক আছে। মাথার ওপর চালা ঝড়ে পড়োপড়ো হয়েছে। কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েনি কত ধেনো মদ খাওয়া বমি, আর যক্ষ্মা রোগের রক্তে চিত্রিত হয়েছে এ সব ঘরের মেঝে আর দেয়াল। দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রণায় কত বুঁচী, ক্ষেন্তী, সিন্দুর সোহাগী এসব দেয়ালে মাথা কুটেছে, তবু ছেড়ে যাওয়ার কথা কারো মনে ওঠেনি। আজ ছাড়িয়ে দেওয়ার কথায় ব্যথায় বুক টন টন ক'রে উঠেছে। যেমন ক'রে পারুক ঘরে তাদের ধ'রে রাখবে বিদ্যুৎ। যেন কেউ ছাড়িয়ে দিতে না পারে, তাড়িয়ে দিতে না পারে। নিজের এই দেহ, আর দেয়াল ঘেরা নিজের এই ঘর। এ ছাড়া তাদের আছে কি ?

কিন্তু জোট বাঁধতে চাইলেই কি জোট বাঁধা যায় ? দেয়াল-ঘেরা ঘর, আর হিংসাদ্বেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘেরা মন। এখানে একজন আর একজনের প্রতিযোগিনী। ছলে বলে কৌশলে

একজনের খদ্দের আর একজনকে ভাগিয়ে নিতে হয়, না হলে পেট শোনেনা, মাসের শেষে বাড়িওয়ালী শোনে না। একজন না খেয়ে থাকলে এখানে আর একজনের জিজ্ঞেস করবার প্রথা নেই, একজনের অসুখে আর একজনের সুখ। জোট বাঁধতে চাইলেই জোট কি ক'রে বাঁধে তারা। কিন্তু একটা যোগসূত্র যেন এতদিনে মিলেছে। সবাইকে তাড়া দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। কাউকেই খাতির করবে না। কিন্তু দল বেঁধে এর বিরুদ্ধে কি তারা করতে পারে ? রোজ জটলা বসে ঘরে। আবার ভাঙে। কি কর্তব্য ঠিক করতে পারে না। বুঁচী-ক্ষেন্তীরাও নয়, মালতী-সোহাগীরাও নয়। বুদ্ধিটা বিদ্যুতেরও ঠিক যেন আসি আসি ক'রে আসতে চায় না।

সুখদা বলে, 'অত ভাবছিস কেন বিদ্যুৎ, তোর তো সেরা জিনিসই রয়েছে। বাঁধাছাদার কথা কি যে তোরা এত বলাবলি করিস বুঝিনে বাপু। আমাদের বুক বাঁধতে হয়না, কাঁচুলী বাঁধতে হয়। বাঁধবি তো বাঁধ। তারপর একটা ক'রে গেঁথে তোল রুই কাতলাদের। থানা, মিউনিসিপ্যালিটি, মুন্সেফের আদালতের কাছ দিয়ে গাড়িতে দিনে দু'তিনবার বেড়িয়ে আয়। বাস, আর কিছুই তোকে করতে হবে না।'

বিদ্যুৎ হাসে, 'ও বিদ্যা কি এই বয়সে আর নতুন ক'রে শিখতে হবে মাসী ?'

তবু পুরোন বিদ্যা দিয়েই শুরু করল বিদ্যুৎ। থানার ইনস্পেক্টর ক্ষিতীশ অধিকারী মাঝে মাঝে আতিথ্য নিতে আসে। সবদিন দোর খোলা পায় না, ফিরে যায়। আজ ঝি সুন্দরীকে দিয়ে বিদ্যুৎ তাকে নিজেই যেচে গোপনে খবর পাঠাল।

গদি আঁটা চেয়ারে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পুরু গোঁফে সরু চিরুণী বুলালো ক্ষিতীশ, তারপর হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, এমন তো বড় একটা হয় না। এতকাল চাতকই আকাশের পানে হাঁ ক'রে রয়েছে, আজ দেখছি মেঘেরই গরজ।'

বিদ্যুৎ এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ছায়া পড়ল আয়নায়। মাথার রেশম মসৃণ চুলের রাশ বেণীবদ্ধ হয়ে হিংস্র সরীসৃপের মত পিঠ বেয়ে নেমে পড়েছে। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ প্রসাধনে সাধিত। কানে দুলছে জমাট রক্তের মত দুটি দুল। নীলাভ বিষ্ণুপুরী সিল্কে তনুদেহ ঘেরা। কাঁচুলী শাসিত তুঙ্গ স্তনের স্তবক আজ যেন বড় উদ্ধত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যুৎ মধুর হেসে বলল, 'মেঘের গরজ চিরকালই আছে ইনস্পেক্টরবাবু। কিন্তু আজকালকার চাতক তো জল চায় না। দিন নেই, রাত নেই কেবল চোর খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।'

ক্ষিতীশ অধিকারী হাসল, 'তা বটে। কিন্তু চোর নয়, চর ভদ্রপুরে একটা ডাকাতির তদন্তে গিয়েছিলাম, সত্যি এমন ডেয়ারিং, এমন ডেয়ারিং—'

বিদ্যুৎ এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ক্ষিতীশের আর এক হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে বলল,'থাক থাক, ওসব শুনতে আমার ভয় করে, ডাকাতিতে যেন তুমিই কারো চেয়ে কম।'

গরম গরম খাদ্যে পানীয়ে আসর যখন সরগরম তখন হঠাৎ কথাটা পেড়ে বসল বিদ্যুৎ, 'হ্যাঁ গো তোমরা কি সত্যই আমাদের তাড়িয়ে দেবে ? নোটিশ ফোটিশ এসব কি।'

ক্ষিতীশ বলল, 'আর বোলো না, বুড়ো পূর্ণ চৌধুরীর জ্বালায় আর পারা গেল না, নিজে যেমন শুকনো কাঠ, সারা দুনিয়াটা বুড়ো তাই মনে করে।'

গ্লাস নিঃশেষ ক'রে টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল ক্ষিতীশ, 'কিন্তু তাতে তোমার কি, চাও তো বর্দ্ধমান শহরে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করে দিই। আমার জানা শোনা আছে।'

বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না বর্দ্ধমান-টর্দ্ধমান নয় ! পূর্ণ চৌধুরীকে তোমরা বাধা দিতে পার না ?'

ক্ষিতীশ বলল, 'ক্ষেপেছ, ক্যাবিনেটে পর্যন্ত বন্ধু আছে পূর্ণবাবুর। তাছাড়া পাবলিক হেলথ দপ্তর সাপোর্ট করেছে তাঁর প্ল্যান। আসলে পাড়াটায় হয় তো একটা সিনেমা হাউস খাড়া হবে। রক্তমাংসের ছবির বদলে নড়াচড়া করবে পটের ছবি। তবু শহরের স্বাস্থ্য আর সৌষ্ঠবের দোহাই পেড়ে কাজ হাঁসিল করা চাই।'

বিদায় নেওয়ার সময় ক্ষিতীশ অধিকারী বলল, 'যাই হোক, আমি অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করবনা। কিন্তু তুমি যে কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো বুঝিনে।'

একে একে সবাই এ কথাই বলল ; মুনসেফ কোর্টের পেসকার সুধীর সোম, উকিল বীরেশ

গাঙ্গুলী, জমিদার কাছারীর ছোট নায়েব শ্রীপদ দত্ত সব এক, সবাই পূর্ণ চৌধুরীকে নিয়ে হাসহাসি করল। সেইসঙ্গে একথাও বলে গেল, পূর্ণবাবু যখন গোঁ ধরেছেন তখন তাকে কেউ ফেরাতে পারবেনা। বলতে গেলে পূর্ণবাবু একাই গোটা বাণীঘাট মিউনিসিপ্যালিটি ! সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জিজ্ঞেস করল বিদ্যুৎ কেন এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এ সব নোটিশে তার কি এসে যায়, তার মত সুন্দরী মেয়ের জন্য পৃথিবীর সমস্ত শহর দোর খুলে দেবে।

কিন্তু আশ্চর্য, তবু মাথা ঘামানো বন্ধ হ'লনা বিদ্যুতের। সে আবিষ্কার করেছে মাথা ঘামানোর মধ্যে যেন অদ্ভুত এক উত্তেজনা আছে। মাথা ধরার যন্ত্রণার সঙ্গে মাথা খাড়া করার সুখ। যারা কথা বলতে সাহস করতনা, যারা এড়িয়ে যেত, হিংসায় জ্বলত, তারা রোজ এসে খবর নেয়, 'কি হল বিদ্যুৎদি ?' মালতী, চাঁপা, সোহাগী, সিন্দূরবা আসে, বুঁচী ক্ষেন্তী ক্ষেমী টগর, আরো অনেকে আসে যাদের এত দিন নাম জানেনি বিদ্যুৎ, জানবার দরকারই বোধ করেনি। কিন্তু এবার বিদ্যুৎ তাদের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে চায় সুখ দুঃখের কথা, দু'একজন অপটু নতুন কিশোরী মেয়েকে বলে দেয় শিকার ধরবার ফিকির। বিলোয় পুরো স্নো পাউডারের কৌটো, আলতার শিশি ! সবাই নেত্রী বলে মেনেছে বিদ্যুৎকে। সুখদার চেয়ে তার খাতির বেশী, সঙ্গিনীদের ভরসা দেয় বিদ্যুৎ, 'কিছু একটা হবেই, ভাবিসনে।'

সোহাগী জিজ্ঞেস করে, 'থানা আর কাছারী থেকে ভরসা পেলে নাকি কিছু কিছু ?'

বিদ্যুৎ বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। না পেলে কি আর বলছি।'

বিদ্যুতের মুখ দেখে আসল কথাটা টের পেতে দেবি হয় না সোহাগীদের। আড়ালে এসে তারা মুখ টিপে হাসে। 'উনি করবেন ছাই, ভরসা না আরো কিছু পেয়েছে।'

সিন্দূর বলল, 'মুঠোয় টাকা তো পাচ্ছে। যাই বলিস ভাই, এই অছিলায় দু'হাতে কামিয়ে নিল যা হোক, কলকাতায় গিয়ে দু'মাস বসে খেতে পাববে।'

মালতী মাথা নাড়ে, 'নারে, বিদ্যুৎদি সত্যই ভাবছে, সত্যই খাটছে আমাদের জন্যে।' দিন কয়েক উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করবার পর ভাবনাটা এড়িয়ে যেতে শুরু করল সোহাগী। যা হবার হবে, না গিয়ে যদি জো নাই থাকে তাহলে আর কথা যাবে কি। হাল ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেকেই ভাবে, দশ জনের যা হবে তারও তাই হবে।

কিন্তু বিদ্যুৎ সেদিন বিকালে নিজে এল সোহাগীর ঘরে, বলল, 'চল যাই ভুবনবাবুর কাছে।'

সোহাগী অবাক হয়ে বলল, 'ভুবনবাবু আবার কে ?'

বিদ্যুৎ বলল,ওমা মনে নেই তোর, ভুবন উকিলের কথা ? বাতাসীর ঘরে যেবার খুন হল সেবার ফাঁসীর হাত থেকে মানদা মাসীকে বাঁচালেন না ভুবনবাবু, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি ?'

ভুলেই গিয়েছিল সোহাগীরা, ফের মনে পড়ল। গয়না-গাঁটি পুঁটুলীতে বেঁধে ভুবনবাবুর দুপা জড়িয়ে ধরেছিল মানদা, বহু টাকা নিয়ে ছিলেন কিন্তু বাঁচিয়ে ছিলেন মানদাকে। কি বক্তৃতা, কি জেরা পুলিসকে। সাক্ষী দিতে বিদ্যুৎ সুখদা মাসীর সঙ্গে গিয়েছিল জেলা শহরে, ফিরে এসে গল্প করেছে। সে সব নিজের চোখে দেখেছে, মানদাকে কি জড়ানোই জড়িয়ে ছিল পুলিশ, ভুবনবাবু সব গিঁট খুলে ফেললেন।

সোহাগী বলল, 'কিন্তু এ তো খুন নয়।'

বিদ্যুৎ জবাব দিল, 'নাই বা হল, খুন নয় খুনের বাড়া। পাড়া থেকে তাড়িয়ে গুষ্টি সবাইকে সাবাড় করার চেষ্টা। খুন ছাড়া কি, টাকা পেলে ভুবনবাবু সব পারবেন। সব বুদ্ধি তাঁর কাছে পাওয়া যাবে, শুনব আমাদের কোন দখল আছে কিনা এসব ঘরে। যদি থাকে টাকা নিয়ে লড়ুন তিনি আমাদের হয়ে।'

সোহাগী অবাক হয়ে বলল, 'বলছ কি বিদ্যুৎদি। ভুববনবাবু দাঁড়াবেন আমাদের পক্ষে ?'

বিদ্যুৎ বলল, 'বলব আবার কি ? বেরিয়ে যাও বললেই বেরিয়ে যাব ? আমাদের কি বিড়াল কুকুর পেয়েছে ? টাকা দিয়ে কিনব ভুবনবাবুকে, ঘরের জিনিসপত্তর বিক্রি ক'রে মামলা করব, ভাবছিস কি, এত সহজে বেদখল করা ?'

সোহাগী-সিন্দূররা কথা বলল না। বুঁচী-ক্ষেন্তীরা বলল, 'করো মামলা, যা পারি, সবাই কিছু কিছু

দেব।'

তখন সোহাগী বলল, 'আমরাও দেব।'

উকিলের সাহায্য নেওয়াই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। সুখদা পরামর্শ দিল, 'দল বেঁধে গিয়ে লাভ কি। যেতে হয় উকিলের কাছে তুই যা। ওরা তো সব মুখখু। দু'চার কথা যা বলবার তুইই বলতে পারবি,—তা ছাড়া যাই বলিস কেবল তোর কথাই উকিলরা কান দিয়ে শুনবে চোখ দিয়ে গিলবে।' সুখদা হেসে উঠল।

ভুবন মহলানবীশ শহরের সেরা উকিল। কাছারী পাড়ায় তাঁর নিজস্ব দোতলা বাড়ি। সাদা ধবধবে বাড়ির রঙ। ঢুকবার পথটি লাল সুড়কি দিয়ে ঢাকা।

ভোর হতে না হ'তে নতুন একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল তার গেটের সামনে। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, গায়ে গরদের চাদর জড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল বিদ্যুৎ, ঝি সুন্দরী নামল পিছনে পিছনে।

নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ার দু'চারজন মহিলা মক্কেল আছেন, খবর পেয়ে ভুবনবাবু ভাবলেন, তাঁদেরই কেউ এসেছেন। ভুঁড়ি সত্ত্বেও প্রৌঢ় ভুবনবাবু দোতলা থেকে চটি পায়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন বৈঠকখানায়। বিদ্যুতের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা! তুমি! তাই বল। ব্যাপার কি। আবার কোন খুনের মামলায় জড়ালে নাকি?'

বিদ্যুৎ সব কথা প্রকাশ করে মিনতির সুরে বলল, 'বাঁচাতেই হবে আমাদের। যত লাগে আমরা দেব, কিন্তু ঘর যেন আমাদের কারো বেদখল না হয়।'

ভুবনবাবু হাসলেন, 'এসব বুদ্ধি কে দিয়েছে তোমাকে, তা কি কখনও হয়?'

হতাশার সুরে বিদ্যুৎ বলল, 'হয় না?'

ভুবনবাবু বললেন, 'না, কারো তো কেনা বাড়ি নয়, কেনা জায়গাও নয়। ভাড়া, লীজ, কেনা জায়গা হলেও আটকাতে পারতে না। বড় জোর কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ পেতে, তাছাড়া অনেক কাল তো নরক গুলজার করেছ, আর কেন!'

মুখ কালো ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল বিদ্যুৎ। কিন্তু ভুবনবাবু আর দাঁড়ালেন না, বিরক্ত হয়ে ফের অন্দরে গিয়ে ঢুকলেন। যেতে যেতে বললেন, 'সদরে রওনা হব আজ। অথচ ভোর বেলাতেই যত সব। দুর্গা দুর্গা। দিনটা কিভাবে কাটবে কে জানে। অবশ্য যাত্রার মন্ত্রে শুভ লক্ষণ বলেই তো উল্লেখ আছে। দ্বিজ নৃপ গণিকা—।' নিজের মনেই একটু হাসলেন ভুবনবাবু।

বিদ্যুৎ বেরিয়ে যাচ্ছিল, দক্ষিণ দিকের ছোট্ট তক্তাপোশ থেকে কালো রোগা মত মাঝবয়সী একটি লোক ডেকে বলল, 'ও ঠাকরুণ! রাগ ক'রে চললেই নাকি? শোন শোন।'

তক্তপোশের ওপর সারে সারে গোটা তিনেক হাতবাক্স। তার একটিকে সামনে নিয়ে বসেছিল মুহুরী বিপিন চক্রবর্তী। বিদ্যুৎকে সে-ই হাতের ইশারায় ফেরাল।

বিদ্যুৎ বলল, 'কি বলছেন।'

বিপিন বিদ্যুতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বলল, 'শুনলুম সব। আরে এরা সব ক্রিমিন্যাল সাইডের উকিল। সিভিল প্রাকটিস সব ভুলে বসে আছে। তুমি এক কাজ করোনা। একেবারে সরাসরি সদরে দরখাস্ত ক'রে দাওনা একখানা।'

বিদ্যুৎ বলল, 'দরখাস্ত? কে লিখে দেবে?'

বিপিন বলল, 'বলোতো আমিই লিখে দিতে পারি। কিন্তু—'

হাতের পাঁচটি আঙুল মেলে ধরল বিপিন।

বিদ্যুৎ তৈরী হয়েই এসেছে। আঁচলের গিঁট খুলে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিল বের করে।

খস খস করে দরখাস্ত লিখে দিল বিপিন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বরাবরেষু। বিদ্যুতদের দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দিয়ে, এত অল্প দিনের নোটিশে ঘর ছেড়ে দেওয়ার অসুবিধার কথা নিবেদন করে, পড়ে শোনাল বিদ্যুৎকে। বলল, 'লিখছেন কারা। রাণীঘাট বারাঙ্গনা বৃন্দ, না পতিতা সমিতি?'

বিদ্যুৎ বলল, 'যা ভাল হয় লিখুন।'

বেরোতে না বেরোতেই পিছনে হো হো হাসির শব্দ শুনতে পেল বিদ্যুৎ। সব তাহলে ঠাট্টা?

আক্রোশের জ্বালায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল দরখাস্ত। ফের যদি লিখতে হয় নিজেই লিখবে। যাবে না আর উকিল মুহুরীর কাছে।

সব শুনে সুখদা বলল, 'নে বাপু থাম, ঢের হয়েছে। যা হবার তাই হবে, না হয় যাব সেই ছাতিমতলায়। তুই যদি সঙ্গে যাস কত মৌমাছি জুটবে গিয়ে সেখানে। কিন্তু তার চিন্তায় ভাবনায় রোদে জলে ছুটোছুটি করে শরীর খোয়াসনি বিদ্যুৎ। আমাদের শরীর গেলে সব গেল।'

কিন্তু যত ঘা খাচ্ছে তত যেন জেদ বেড়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের। সে ছাড়বে না কিছুতে, শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখবে। দিন রাত ভাবে বিদ্যুৎ। এখানে যায় সেখানে যায়। অভ্যাগতদের সঙ্গে এই আলোচনাই করে, ফন্দী আঁটে তাদের সঙ্গে। এ যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে।

সেদিন বসাক কলিয়ারীর ম্যানেজার সুখেন্দু সেন বলল, 'সত্যি বিদ্যুৎ, দিন দিন তুমি আরো সুন্দর হচ্ছ।'

অত্যন্ত অভিমানের সুর বেরিয়ে এল বিদ্যুতের মুখে, 'তাই বুঝি এ-পথ আর মাড়াও না?'

সুখেন্দু বলল, 'ভারি অশান্তিতে আছি কি না।'

বিদ্যুৎ বলল, 'তোমার আবার অশান্তি কিসের? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া চলছে বুঝি?'

সুখেন্দু হেসে মাথা নাড়লো, 'না, ঘরের বউটা বেশ শান্ত, বোকা বোকা, ঝগড়া বিবাদ সে বেশী করতে আসে না। মুস্কিল হয়েছে কুলী বউগুলিকে নিয়ে। ওরা অতিষ্ঠ করে তুলেছে।'

বিদ্যুৎ কৌতূহলী হয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি।'

সুখেন্দু বলল, 'ব্যাপার সামান্যই। এমন প্রায় রোজ তিরিশ দিনই হচ্ছে। বেয়াদবি আর কাজে গাফিলতির জন্যে রামপীরিতের বউ পার্বতীয়াকে কাল একটা চড় মেরেছিলাম, চড় বললেও পার টোকা বললেও পার। ওরা তো তোমার মত নয় যে ফুলের ঘায়েই মূর্চ্ছা যাবে। লোহার মত শক্ত গাল, শক্ত চোয়াল, দু'একটা চড় চাপড়ে কি হয় ওদের বল তো।'

বিদ্যুৎ বলল, 'তার পর।'

'তারপর আর কি? নিমেষ ফেলতে না ফেলতে প্রায় শ'খানেক মেয়েকুলী এসে হাজির, বলে মাফ চাইতে হবে। নইলে ষ্ট্রাইক। এখনকার দিনের মানুষের ধর্মই কেবল ধর্মঘট।'

বিদ্যুৎ বলল, 'দল বেঁধে সবাই এল বুঝি তোমার কাছে?'

সুখেন্দু বলল, 'তবে আর বললুম কি, দু' একজন এলে তো টাকাটা সিকেটা বকশিস্ দিলেই হত, সেই সঙ্গে আদর সোহাগও করে নেওয়া যেত একটু। কিন্তু এ যে একেবারে নারীবাহিনী—'

'খুব জব্দ হয়েছ তাহলে!' বিদ্যুতের গলায় বেশ একটু উল্লাসের সুর ফুটে উঠল। এমন সাধারণত হয় না। এ সব ছোটখাট ধমক শাসন তো দূরের কথা কাগজে নির্মম নারীনির্যাতনের কাহিনীতেও এর আগে অত্যাচারী পুরুষের পক্ষ নিয়েছে বিদ্যুৎ, মনে মনে বলেছে বেশ করেছে। লোকটা অমন করতে পেরেছে বলেই তো তার বিবরণ গল্পের মত লেগেছে কাগজওয়ালাদের, আর তা পড়ে আরাম পাচ্ছে বিদ্যুৎ। কিন্তু আজ যেন তার দল বদল হয়েছে। সুখেন্দু জব্দ হওয়ায় মনে মনে খুশী হল বিদ্যুৎ।

সুখেন্দু বলল, 'হ্যাঁ গুণাগার কিছু দিতে হল বইকি! যা দিন কাল, একটু বুঝে সমঝে চলাই ভালো।'

বিদ্যুতের ঔৎসুক্যের শেষ নেই, কি ভাবে এল কুলী মেয়েরা, কি বলল, কি আদায় করল, নাকে খৎ দিল নাকি সুখেন্দু, সব সে রসিয়ে রসিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। সুখেন্দু যত অন্য কথায় যেতে চায় বিদ্যুৎ তত ঘুরে ফিরে এই কথায় আসে, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বিদায় নিল সুখেন্দু।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আর মাত্র দু' দিন বাকি। সোহাগী সিন্দুররা ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প বাঁধা ছাঁদা শুরু করেছে। বিদ্যুৎ এসে বলল, 'ও সব হবে না, কেউ তোরা এক পাও নড়তে পারবি না এখান থেকে।'

সিন্দুর মুখ টিপে হাসল, কিন্তু 'বিদ্যুৎদি, পুলিশ এসে নড়াবে যে! হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে।'

বিদ্যুৎ বলল, 'পুলিশের বাবারও সাধ্য নেই। আমি ঠিক করেছি, আজ দল বেঁধে যাব মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে।'

সিন্দুর অবাক হয়ে থেকে বলল, 'বলছ কি।'

কথাটা বুঁচী ক্ষেন্তীদেব ঘরে ঘরে গিয়েও বলে এল বিদ্যুৎ। 'সবাই তৈরী হয়ে থাক, দল বেঁধে সকলকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

শুনে সুখদা বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বিদ্যুৎ? না বেশী বেশী টানতে শুরু করেছিস আজকাল। সামলাতে পারছিস নে?'

বিদ্যুৎ বলল, 'কেন মাসী?'

সুখদা বলল, 'তুই যাবি যা, সোহাগী সিন্দুরকেও না হয় সঙ্গে নে। তাতে ওদরে লাভই হবে কিন্তু বুঁচী ক্ষেন্তীদেব চেহারা কি দিনের বেলায় দেখবার মত? দিনে একবার যারা ওদের দেখবে সন্ধ্যার পর কি তারা আর এমুখো হবে?'

কিন্তু সুখদার কথা কেউ মানল না। বিদ্যুতের কথায় সকলের মন নেচে উঠল। এর আগে দেশনেতাদের জেল হওয়ায় তার প্রতিবাদে এ শহরে পুরুষদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়েরাও শোভাযাত্রা করে বহুবার রাস্তায় বেরিয়েছে। মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারণীকে বিনাদোষে বরখাস্ত করায় হাইস্কুলের বয়স্থা ছাত্রীরাও দলে দলে গিয়ে মিটিং করেছে কালীবাড়ির মাঠে। দূব থেকে বুঁচী ক্ষেন্তী সোহাগী সিন্দূরের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখেছে। কিন্তু বিদ্যুতের আজকের প্রস্তাব তাদের ভারি অদ্ভুত লাগল। এবার তাহলে তারাও বেরুবে দল বেঁধে দাবি জানাতে যাবে, পারুক আর না পারুক এক চোট যুজে দেখবে। তারপর আর কিছু না পাবে মিউনিসিপ্যালিটির লোকগুলোকে ও পূর্ণবাবুকে মনেরসাধে মুখখিস্তী করে আসবে, তাতেও যেন গায়ের জ্বালা মিটবে খানিকটা। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই মনের আনন্দে সাজসজ্জা শুরু করল। যেন দিবা অভিসাবে বেরুচ্ছে।

কিন্তু বিদ্যুতেব অদ্ভুত খেয়াল। হুকুম দিল সাজসজ্জা চলবে না। আটপৌবে বেশে যেতে হবে সকলকে।

ক্ষেন্তী ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'তাহলে যে একেবারে বুড়ী বুড়ী দেখাবে।'

বিদ্যুৎ অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা দেখাক। চেয়ারম্যান পূর্ণ চৌধুরী তো বুড়ো। বুড়োকে ভুলাতে না হয় বুড়ীই সাজলি।'

সুখদা বলল, 'কথাটা কিন্তু বলা ঠিক হল না বিদ্যুৎ। একেবারে উল্টো বললি, আমি এই পঁচিশ বছর ধরে দেখে আসছি আমাদেব কাছে যারা আসে তাদের পছন্দটা অন্য রকম। তাদের বুড়োদেব নজর ছুঁড়ীদের ওপর, আর ছোঁড়াদের নজর বুড়ীদের ওপর।'

ওজর আপত্তি সত্বেও বিদ্যুতের সঙ্গেই যখন সবাই যাবে, তার হুকুম না মেনে উপায় কি? তা ছাড়া বিদ্যুতের বুদ্ধি বেশী, কি মতলব ওর মাথায় খেলছে ওই জানে। অবিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা বিশ্বাসও যেন আছে, যদি কিছু হয়, যদি কোন উপায় করতে পারে বিদ্যুৎ।

মোটামুটি ভদ্ররকমের বেশবাসই পরল সবাই। ঠোঁটে আলতা লাগাল না মুখে পাউডার দিল না, চোখে কাজল দিতেও নিষেধ করল বিদ্যুৎ। রঙীন শাড়ির চাইতে সাদা খোলের আটপৌরে শাড়িই বিদ্যুৎ সবাইকে পরতে বলল, যার নেই তার কথা স্বতন্ত্র।

আরো একটা হুকুম মানতে হ'ল বিদ্যুতের, সেটা জুতো সম্বন্ধে। সোহাগী সিন্দূবদের হাই হীল আছে। বুঁচী ক্ষেন্তীদের কেবল স্যাণ্ডাল, পুঁটী পটলদের তাও নেই। বিদ্যুৎ বলল, 'সবাইকেই খালি পায়ে যেতে হবে। একেকজন একেকভাবে বেরুলে চলবে না। মিছিলের ধরণটা এক হওয়া চাই!'

শোন কথা! দুপুরের কড়া রোদে রাস্তায় পীচ গলতে শুরু হয়েছে। পায়ের কিছু থাকবে নাকি তাহলে! ফোস্কা পড়ে যাবে না চামড়ায়।

বিদ্যুৎ বলল, 'আমিও তো খালি পায়েই যাব।'

এর পর আব কথা আছে নাকি!

চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি পরল বিদ্যুৎ। সিঁথিতে সিঁন্দুর দিল, কপালে বড় করে আঁকল ফোঁটা, গয়না গাটি বেশী কিছু বাক্স থেকে বার করল না। গলায় কেবল সরু এক গাছা হার, আর হাতে তিন

গাছা করে চুড়ি। সেই সঙ্গে সরু বাঁশপাতা শাঁখা।

সুখদা বলল, 'আহা ঠিক যেন মুখুয্যে বাড়ির বড় বউয়ের মত দেখাচ্ছে। আইবুড়ো বুড়ো চৌধুরীর আজ আর উপায় নেই।'

তাড়া দিতে দিতে দুটো নাগাদ সাজসজ্জা সারা হল সোহাগীদের। তারপর ঘর তালা বন্ধ করে সবাই বেরুল বাইরে। কেবল সুখদা রইল বাড়িতে পাহারাদার। অত বড় মোটা দেহ নিয়ে নড়াচড়া শক্ত।

গলি ঘুঁজি নয়, শহরের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে চওড়া সড়ক দিয়ে বিদ্যুতের দল এগিয়ে চলল। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছে যারা। মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। কাতারে কাতারে লোক জমতে লাগল বড় রাস্তার দুধারে। এমন মজাদার ঘটনা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। দিনে দুপুরে বেশ্যারা নাকি শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে। দোকানী পয়সা নিতে ভুলে গেল, খদ্দের ভুলল জিনিস। সবাই হা করে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। বিনা পয়সায় এমন মজা কেউ কোন দিন দেখেনি। খবর পেয়ে লাল পাগড়ীওয়ালা পুলিশ বেরুল। বাধা দেবে কি, তারাও হাসছে। কেউ কেউ অশ্লীল মন্তব্য করল দোতলার বারান্দা থেকে, কেউ কেউ ফুল ছুঁড়ল বিদ্যুৎ আর সোহাগী সিন্দূরকে লক্ষ্য করে।

সিন্দুর মুখ খিস্তী করে বললে, 'মর মুখপোড়ারা।'

বিদ্যুৎ ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ সিন্দুর, কথা বলবিনে, তাতে কাজের ক্ষতি।'

মেয়ে স্কুল ছাড়িয়ে, পোষ্টঅফিস ছাড়িয়ে, ব্যাঙ্কপাড়া, কাছারী পাড়া পার হয়ে শহরের দক্ষিণপাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটির লাল রঙের দোতলা বাড়িটির সামনে এসে পৌঁছল বিদ্যুতেব দল। পায়ের তলা পুড়ে যাচ্ছে, মাথা ধরেছে, রোদে পুড়ে আরো কালো হয়েছে মুখের রং। তবু এগিয়ে চলল সোহাগী সিন্দুর বুঁচী ক্ষেন্তীরা। পিছনে পিছনে কৌতুক দেখতে দেখতে চলল রাণীঘাটেব নাগরিকরা।

মিউনিসিপ্যালিটির দারোয়ান মনবাহাদুর পথ আটকে ধরল। 'কেয়া মাংতা?'

বিদ্যুতেরা দেখা করতে চায় চেয়ারম্যানের সঙ্গে। দেখা না করে তারা এক পাও নড়বে না। খবর পেয়ে কেরাণীর দল ছুটে এল, রাণীঘাটের বিদ্যুৎলতাকে কেউ কেউ চেনে। কিন্তু দিনে দুপুরে এ কি ব্যাপার? হুলস্থুল পড়ে গেল সারা অফিসে।

নিভৃত কামরায় দেয়ালে টাঙ্গানো রাণীঘাট শহরের নকসাটার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলেন চেয়ারম্যান পূর্ণ চৌধুরী,—গোলযোগে যেন যোগ ভঙ্গ হল তার। ক্রুদ্ধ হয়ে খাস বেয়ারা হরিপদকে ডেকে বললেন, 'ব্যাপার কি, এত গোলমাল কিসের।'

হরিপদ বলল, 'আজ্ঞে শোভাযাত্রা এসেছে অফিসের সামনে।'

পূর্ণ চৌধুরী ভ্রূ কুঞ্চিত করে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'শোভাযাত্রা! শোভাযাত্রা আবার কিসের? কাদের শোভাযাত্রা?'

হরিপদ বলল, 'আজ্ঞে তাদের নাম আপনার সামনে জিভে আনতে পারিনে।'

পূর্ণবাবু ধমকে উঠে বললেন, 'কেন, কি হয়েছে তোর জিভে?'

আরো বার দুই ধমক খেয়ে হরিপদ শেষ পর্যন্ত খবরটা সরবরাহ করল। 'বাদামতলার তানারা এয়েছেন! তানাদের নাম মুখে আনা যায় না।'

পূর্ণ চৌধুরী গর্জে উঠলেন, 'এখানে তারা এল কি করে? কে আসতে দিল তাদের? কি চায় তারা?'

হরিপদ বলল, 'চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

পূর্ণ চৌধুরী মাথা নাড়লেন, 'অসম্ভব।'

আধ ঘণ্টা কাটল। খবর এল বাদামতলার দল গেটের সামনে দাঁড়িয়েই আছে। পুলিশ ওপর ওপর দু'একবার তাড়া দিয়েছে কিন্তু তাড়িয়ে দেয়নি।

ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন পূর্ণ চৌধুরী। শত হলেও মেয়েছেলে, কিন্তু এরা শহরের ছেলেদের মাথা খারাপ করবার জন্য জন্মেছে। ওদের মূলোৎপাটন করতে না পারলে মঙ্গল নেই

শহরের।

দেয়ালে রাণীঘাটের নকসাটার দিকে আর এক বার তাকালেন পূর্ণবাবু। রাক্ষুসীরা শহরের প্রায় মর্মস্থল জুড়ে বসেছে। বছর দশেক আগে যখন প্রথম চেয়ার‍্যান হন পূর্ণবাবু তখন থেকেই ওদের উৎখাত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। পেরে ওঠেননি, শহরের বিশিষ্ট বাসিন্দারাই প্রত্যক্ষ বাধা দিয়েছে। তাঁর এই পরিকল্পনাকে শুচিবায়ুতা বলে উপহাস করেছে। সহকর্মী বন্ধুদের কেউ কেউ বলছেন, ওদের তাড়িয়ে দেওয়া মানে ভদ্রপাড়ার ঘবে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া। ওদেব যদি মূলোৎপাটন করা হয়, কুলাঙ্গনাদের কুল থাকবে না। শহরের আবর্জনা সরে যাওয়ার জন্য এ ধরণের সাধারণ পয়ঃনালী একটা থাকাই ভালো। কিন্তু বন্ধুদের যুক্তি মনে ধরেনি পূর্ণেন্দুপ্রসাদের, পাড়াটা শহরের একটা ক্ষতস্থল বিশেষ। সারা রাত হৈহল্লায় ধারে কাছে লোক ঘুমোতে পারে না। জুয়ার আড্ডা বসে, গাঁটকাটা পকেটকাটা থেকে শুরু করে দাগী চোর ডাকাতেবা ওদের বস্তীতে ভিড জমায়। এমন বছব যায় না, দু'একটা খুন জখমও পাডায় না হয়। এমন মাস যায় না, দু'একটি মৃত ও অর্দ্ধমৃত শিশু ওপাডাব গলিতে গডাগডি না যায়। ওপাড়াব বাসিন্দারা অবশ্য কীর্তিটা তাদের বলে স্বীকার কবে না। তাবা মুচকি হেসে ভদ্রপল্লীর দিকে আঙ্গুল বাডিয়ে দেয়, লজ্জায় মাথা কাটা যায় পূর্ণেন্দুপ্রসাদের।

ভারি অদ্ভুত জায়গা রাণীঘাট, আজব শহর। এখানে সহজে কিছু করে ওঠার জো নেই। একটা মজা পুকুরের সংস্কাব করেত এখানে তিন বছর কাটে। মেয়েদেব জন্য হাই স্কুল খুলতে লাগে সাত বছর। পছন্দ মত একটা পাবলিক লাইব্রেরী আজও হয়ে উঠল না। ছমাস অন্তর অন্তর হিসাব নিয়ে দেখা যায় লাইব্রেবীর বার আনি বই নেই। খুব বেশী কড়াকড়ি কবলে বই থাকে ত' পাঠক থাকে না।

তবু একটু একটু করে অনেক করেছেনে পূর্ণেন্দুপ্রসাদ। রাণীঘাটের বড় রাস্তাগুলি পীচে মসৃণ হয়ে উঠেছে। দুধারের ঝাউ আবদেবদারুব চারাগুলি মাথায় বাডছে বছর বছব। ছেলেদের খেলবার, বড়দের বেডাবাব জন্য গাছপালা লতাপাতা ঘেরা তিনটি ওয়ার্ডে ছায়াচ্ছন্ন তিনটি নয়নাভিরাম পার্ক হয়েছে। জল এসেছে, বিদ্যুৎ এসেছে। বাণীঘাটেব পথঘাট আজকাল বাত্রেও দিনের মত ঝলমল করে। কিন্তু মনের আঁধার এখনো ঘোচেনি পূর্ণেন্দুবাবুব। এখনো অনেক বাকি, অনেক কবতে হবে।

দূষিত ক্ষতটা বন্ধ কবতে হবে সবচেয়ে আগে। এতদিনে সে পরিকল্পনা বাস্তব হতে চলেছে। সফল হতে চলেছে দশ বছরের চেষ্টা। বাদামতলাব পতিতাদেব সঙ্গে তাঁর কোন কথা থাকতে পারে না। তাদেব দেখা ক-রবাব কোন প্রয়োজন নেই পূর্ণেন্দুবাবুব সঙ্গে।

কিন্তু অফিসেব বাইবে বড গোলমাল হচ্ছে। কালেকসন ডিপার্টমেন্টের নিশীথবাবু এসে বলে গেলেন, 'মেয়েগুলি ভাবি নাছোড়বান্দা। কিছুতেই নডছে না। এদিকে শহরের সব লোক জমেছে অফিসের সামনে। পুলিশ ওপব ওপব শাসাচ্ছে। তাবপর ফেব গোঁফ মুচড়ে শিস দিচ্ছে দূরে দাঁড়িয়ে। এরপর একটা কেলেঙ্কারী হলে অফিসের প্রেষ্টিজ থাকবে না। তার চেয়ে--'

'বেশ।'

রাজী হলেন পূর্ণেন্দুবাবু। কিন্তু একটি সর্ত। দল বল ভেঙে দিয়ে কেবল একজন আসবে পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

উপায় না দেখে তাতেই রাজী হল বিদ্যুৎ। বলল, 'আচ্ছা, আমি একাই যাব। তোরা সব দূরে গিয়ে দাঁড়া।'

বেয়ারার পিছনে পিছনে পূর্ণবাবুব খাসকামবার দিকে এগিয়ে চলল বিদ্যুৎ। পা কাঁপছে, গা কাঁপছে। অথচ জীবনে এমন অনেক জাঁদরেল লোকেব খাসকামরায় ঢুকেছে বিদ্যুৎ দিনদুপুরে। তখন তো সর্বাঙ্গ কাঁপেনি এমন কবে। আজ তার হল কি!

পূর্ণেন্দুবাবু একা নন। মিউনিসিপ্যালিটিব হেড কালেক্টর নিশীথ সান্যাল বসে আছেন উল্টো দিকের চেয়ারে। সাহেবী পোষাকে মোটা সোটা লম্বা চওড়া চেহারা। তবু তাঁকে অতিক্রম করে পূর্ণেন্দুবাবুর দিকেই চোখ পড়ল বিদ্যুতেব। চোখে পলক পড়ল না। এই মানুষের এমন প্রতাপ, এত

তেজ। কালো, রোগা, খর্বাকার চেহারা। পরণে সাদা মোটা খদ্দর। মাথার চুলও সব প্রায় সাদা হয়ে যাওয়ার মধ্যে। রেখাসঙ্কুল মুখ।

পূর্ণেন্দুবাবুও একটুখানি তাকিয়ে রইলেন। বাদামতলা থেকে এমন কুলবধূর মত মূর্তি যেন প্রত্যাশা করেননি তিনি। চশমাটা একটু আলগা হয়ে নেমে পড়েছিল। বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার সাহায্যে ঠিকমত সেটাকে বসিয়ে নিতে নিতে রূঢ়স্বরে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'বসো'।

শত হোক ও মেয়েছেলে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সামনের চেয়ারটা। 'কি চাও, কেন আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ ?'

ধমক খেয়ে সব যেন গুলিয়ে গেল বিদ্যুতের। যত সব চোখা চোখা বুলি ঠিক ক'রে এসেছিল মুখ দিয়ে তা বেরুল না। যুদ্ধ করতে এসে হাতিয়ার যেন হারিয়ে ফেলেছে। গলায় জোর পাচ্ছে না। বাসা থেকে তালিম দেওয়া কথাগুলি ভুল হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তকাল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিদ্যুৎ।

পূর্ণেন্দুবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বিরক্ত হয়ে আরো কর্কশ স্বরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো। যা বলবার বল। আর না হয় বেরিয়ে যাও। আমার সময় নেই।'

বিদ্যুৎ ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। খুঁজে পেয়েছে অস্ত্র। অগ্নিবাণ নয় অগ্নিবাণের পাল্টা জবাব, বরুণ-বান।

টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে বিদ্যুৎ এবার হেঁট হয়ে হঠাৎ চটি সুদ্ধ পা দু'খানা চেপে ধরল পূর্ণবাবুর। তারপর, করুণ, মধুর আর্তস্বরে বলল, 'ওখানে তো আমাদের বসবার জায়গা নয় বাবা, ওখানে আমাদের বসবার অধিকার নেই! আমাদের স্থান এইখানে, আমাদের জায়গা আপনাদের পায়ের তলায়।'

পূর্ণেন্দুবাবু বিব্রত হ'য়ে উঠলেন।

নিশীথ সান্যাল ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আঃ কি হচ্ছে এসব ?'

পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'আহাহা ছাড়ো, পা ছাড়ো।'

বিদ্যুৎ বলল, 'না, আপনার কাছ থেকে কথা না পেলে পা ছাড়বো না।'

পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'কি কথা জানতে চাও।'

বিদ্যুৎ বলল, 'জানতে চাই, এমন ক'রে কেন আমাদের তাড়াচ্ছেন। আপনি সারা শহরের মালিক। আমরা যাই হই, আপনারই তো মেয়ে। আপনি সকলের যেমন সহায়, ভরসা, আমাদেরও তাই। সকলে লাথি মারে, আপনিও মারুন, কিন্তু দূর ক'রে দিলে আমরা যাব কোথায়।'

বিদ্যুৎ একটু চুপ ক'রে থেকে ফের বলতে লাগল, 'অমনিতেই আধপেটা খাই, বছরে ন'মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগি। ডাক্তার দেখাবার পয়সা জোটে না। ঝড় জল বর্ষার দিনে ছাতিমতলার মত মজাপুকুরের পাঁকের মধ্যে কি করে আমরা থাকব, বলে দিন আমাদের।'

কয়েক ফোঁটা জল পায়ের ওপর ঝরে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর।

বিদ্যুৎ বলতে লাগল, 'অবশ্য পাঁকের মধ্যেই তো দিনরাত আছি। মানুষের মত চামড়াটুকু শুধু যা গায়ে জড়িয়ে আছে, তার যে বড় জ্বালা, তাতে রোদ সয়না, জল বৃষ্টি সয়না। সেই একগলা কাদার মধ্যে কি ক'রে আমরা গিয়ে থাকব। হাট নেই, বাজার নেই, জন নেই, মানুষ নেই, বিছানায় পড়ে থাকলে কেউ দেখবার নেই আমাদের। এখানে তবু হাসপাতালের ওষুধটুকু জোটে, রেশনের চাল আটা পাই কিন্তু অত দূরে থেকে—আপনিই বিচার করুন আপনিই বলুন।'

পূর্ণেন্দুবাবু খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। মনে হল সমস্যার কেবল একটা পিঠ দেখেছেন, আর একটা পিঠ দেখেননি। যাদের মানুষের মন নেই, হৃদয় নেই অথচ গায়ে মানুষের চামড়া জড়ানো আছে তাদের সমস্যাটা আজ যেন আরো দুরূহ বলে মনে হল পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে। কি পথ আছে ? চামড়াটাই কি তুলে ছাড়িয়ে নিতে হবে, না হৃদয় মন সুবুদ্ধি ভরে দেওয়া যাবে এই দেহমাত্র ধারিণী, দেহ-জীবীনীদের মধ্যে। অভিভূত হয়ে রইলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

ভাবি উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। যেন এক নতুন ধাঁধায় পড়েছেন। একটু বাদে আস্তে আস্তে

বললেন, 'পা ছাড়ো।'

বিদ্যুৎ তবু কাতরভাবে পা জড়িয়ে রইল।

পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি, বর্ষার মাস ক'টা তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাকবে, ওঠ, সুবন্দোবস্ত না ক'রে অন্য কোথাও তোমাদের পাঠাব না, পা ছাড় মা। ওঠ।'

লজ্জায় জিভ কাটলেন নিশীথ সান্যাল।

মা! গা'টা হঠাৎ শিরশির ক'রে উঠল বিদ্যুতের। এ সম্বোধন এই প্রথম, এ সম্মান এই প্রথম।

এবার আর ছল নয়, যথার্থই ছলছল ক'রে উঠল বিদ্যুতের চোখ, বাইরে গড়িয়ে পড়ল না, অশ্রু চোখের মধ্যেই টলটল করতে লাগল।

সোহাগীর দল ফটকের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বিদ্যুৎকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি, মুখ যে ভারভার। হার হয়েছে তো? আমরা আগেই জানতুম।'

বিদ্যুৎ বলল, 'হার হবে কেন লো, জিৎ হয়েছে আমাদের।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? ওলো জিৎ হয়েছে।'

কলরব ক'রে উঠল মেয়েদের দল।

রাস্তার ওপরই চারদিক থেকে সোহাগী, সিন্দুর, চাঁপা, মালতী, বুঁচী, ক্ষেন্তী, টগরের দল বিদ্যুৎকে সোল্লাসে ঘিরে ধরল। তাদের রোদে পোড়া তামাটে মুখে আবার উল্লাসের রং ফুটেছে, রোল উঠেছে আনন্দের।

বিদ্যুৎ বলল, 'এখানে চেঁচাসনে, বাসায় চল।'

সোহাগী বলল, 'হেঁটে যেতে পারবনা বাবা, গাড়ি ডাক।'

সিন্দুর বলল, 'জিৎই যখন হয়েছে, হেঁটে যাব কোন দুঃখে। গাড়ির মধ্যে চড়ব নাকি ভেবেছ, গাড়ির মাথায় চড়ে যাব। দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে আয় তো ক্ষেন্তী।'

দু'খানা ঘোড়ার গাড়িতেও কি ধরে। গাধা বোঝাই হয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাসায় ফিরে চলল সোহাগীদের দল।

সিন্দুর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার লোকেদের শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় বিদ্যুৎরাণীর জয়।'

বিদ্যুৎ বলল, 'থাম থাম। লোকে কি ভাবছে, ছিঃ।'

কিন্তু সোহাগীদের আজ থামান সহজ নয়।

গাড়ি এসে থামল কাণা গলির মোড়ে। ফূর্তির চোটে সিন্দুর আর সোহাগীই সব ভাড়া মিটিয়ে দিল।

খবর শুনে মোটা শরীর নিয়েও ছুটে এল সুখদা মাসী। 'ওলো, তাই নাকি? কই, কই, বিদ্যুৎরাণী কই, বিদ্যুৎমণি কই। পাড়ার মুখরাখা, মানরাখা সেরা রতন কই আমার।'

উল্লাসে উৎসাহে সুখদা একেবারে জড়িয়ে ধরল বিদ্যুৎকে। তারপর আহ্লাদে গালে আর ঠোঁটে চুমু খেল কয়েকটা। দাঁতে তামাকে মিশি দেয় সুখদা। তার ছোপ লাগল বিদ্যুতের রক্তাভ সুন্দর ঠোঁটে। দুর্গন্ধে বিদ্যুৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আঃ মাসী থাম। কি হচ্ছে সব।'

সুখদা বলল, 'আজ আবার থামাথামি কিসের লো, আজ তুই মান রেখেছিস, মুখ রেখেছিস পাড়ার, তোর মুখে আজ মধু দেব। ধেনো নয় লো ধেনো নয়! একেবারে খাঁটি বিলিতি মাল, ভয় নেই। তোর গাঁটের একটা পয়সাও নেব না, সব আমরা দেব, কেন দেব না লো? তুই সবাইর হয়ে লড়েছিস, সবাইর মান রেখেছিস, সবাইকে ঠাঁই দিয়েছিস ঘরে।'

বুঁচী, ক্ষেন্তী ও টগররাও বিজয় গৌরবে অধীর হয়ে উঠল, তাদের ভাষা সুখদার চেয়েও উচ্ছল। বেশী পসার হয় না বলে এতদিন যা দূরত্ব ছিল, সঙ্কোচ ছিল বিদ্যুৎ তা নিজেই ভেঙ্গে দিয়েছে, কোন ভয় নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, আজ সবাই এসে ঘিরে ধরেছে বিজয়িনী অধিনেত্রীকে।

আপত্তি করবার জো নেই, এই তাদের ভক্তি-প্রীতির ধরণ, এই তাদের কৃতজ্ঞতা ভালোবাসার ভাষা, তবু মনটা বিমুখ হয়ে উঠতে লাগল বিদ্যুতের, কেমন যেন বেখাপ বেখাপ লাগতে লাগল, এমনটি যেন সে চায়নি। বিদ্যুৎ বলতে গেল, 'এই সোহাগী, এই সিন্দুর শোন—

কিন্তু কে শোনে কার কথা, এতদিন বিদ্যুতের কথা তারা শুনেছে। এখন বিদ্যুৎ তাদের কথা শুনুক। সন্ধ্যা হতে না হতেই আটপৌরে বেশ-বাস খুলে ফেলল সবাই, বাক্স থেকে বার করল চড়া রঙের শাড়ি, কড়া প্রসাধনের রঙ লাগাল মুখে। লিপস্টিক মাখল সোহাগী সিন্দুররা, বুঁচী ক্ষেন্তীর দল আলতায় পা রাঙালো, ঠোঁটও রাঙালো।

তারপর সবাই ধরে বসল বিদ্যুৎকে, 'ও ভটচাজ গিন্নি, এবার গরদের শাড়ি খোল। পুন্ন বুড়োর ওতে মন ভুলেছে বলে চ্যাংড়া দলও কি ওতে ভুলবে?'

বিদ্যুৎ বলল, 'তোদের পায়ে ধরি, আমাকে আজ তোরা রেহাই দে। আমার দেহটা ভালো না।'

সোহাগী বলল, 'দেহ ভালো হওয়ার ওষুধ আসছে। কই ও সুখদা মাসী, এসো শিগগির, বিদ্যুৎরাণী আমাদের নেতিয়ে পড়ছে এদিকে।'

'ষাট ষাট, বালাই, বালাই, বিদ্যুৎ আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। অমন অলুক্ষণে কথা বলিসনে তোরা।'

ছুটে এসে বিদ্যুতের মুখে ব্রাণ্ডির বোতল উপুর ক'রে ধরল সুখদা, প্রসাদ পেল সোহাগী সিন্দুর বুঁচী ক্ষেন্তীরা।

আজ দু'হাতে খরচ করছে সুখদা। এতদিনের চিন্তা ভাবনা আজ শেষ হয়েছে, জয় হয়েছে তাদের। মান বেঁচেছে, মুখ রক্ষা হয়েছে। লক্ষ্মী পূজোর চাইতেও আজ মদ মাংসে, ভাজায়-চাটে বেশী টাকা ব্যয় করতে লাগল সুখদা। টাকাটা তার গাঁটি থেকে শেষ পর্যন্ত যাবে না। মেয়েরা চাঁদা ক'রে দেবে। বাবুরা দেবে মেয়েদের। কই তুলে নাকি দিচ্ছে তাদের! এবার তুলুক পকেট থেকে। আক্কেল সেলামী দিয়ে যাক।

কোন ছুটিছাটা নেই, পরব-পার্বন নেই, তবু খদ্দেরদের ভিড় আজ দ্বিগুণ তিনগুণ হল। সকলেই কৌতূহলী। আসল ব্যাপারটা আসল জায়গা থেকে তারা জেনে যেতে চায়! সব চেয়ে মজা—বুড়ো পূর্ণেন্দুবাবুও এতদিনে মজেছেন।

বিদ্যুৎ ঘরে খিল দিয়ে বসেছিল। সিন্দুর আর সোহাগীরা মিলে জোর ক'রে তার বেশবাস খুলিয়েছে। আঁচল থেকে চাবি নিয়ে খুলেছে আলমারী; পরিয়েছে সিঁদুর বর্ণের শাড়ি, আনকোরা নতুন ব্লাউস আর বডিস। মালতী দিয়েছে চুল বেঁধে, মল্লিকা সাজিয়েছে স্নো পাউডার লিপস্টিকে। বুঁচী ক্ষেন্তীরা আলতা পরিয়ে দিয়েছে পায়ে। সকলের জন্য এত ক'রেছে, এত খেটেছে বিদ্যুৎ। রক্ষা করেছে সবাইকে ছাতিমতলার মজাপুকুর থেকে, তার জন্য এটুকুও করবেনা তারা? তাদের কি মায়া-মমতা নেই, না সাধ আহ্লাদ নেই প্রাণে?

ইচ্ছা সত্ত্বেও ফের বেশটা বদলাতে পারেনি বিদ্যুৎ। যেন আর শক্তি নেই দেহে। শরীরে ক্লান্তি, মনে অবসাদ—কিছুই ভালো লাগছে না; বড় খাপছাড়া, বড় বেমানান লাগছে সব কিছু। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ভুবন উকিলের বাড়ির অন্দরমহলের ছবি। বিদ্যুতের বয়সী একটি সুন্দরী বউ একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে জলখাবার দিচ্ছে। বঁটি পেতে তরকারী কুটতে বসেছেন আর একজন বর্ষীয়সী। ভুবন উকিলের বাসা থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছে বিদ্যুৎ। কিন্তু অন্দরের সেই ছবিটুকু যেন তার চোখে লেগে রয়েছে। ভুবন উকিল নিষ্ঠুর। কিন্তু কি রহস্য, কি মাধুর্যই না আছে তার অন্দরে। ফেরার পথে গাড়িতে আসতে আসতে আরো একটি দৃশ্য চোখে পড়েছিল বিদ্যুতের। কয়লার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চলেছে সাঁওতালী মেয়ে। বোঝার ভারে খানিকটা নুয়ে পড়েছে দেহ। কিন্তু খোঁপার লাল ফুল খসে পড়েনি। এরাই কি দল বেঁধে চড়াও করেছিল কলিয়ারীর সুখেন্দু সেনকে? জাঁদরেল পূর্ণ চৌধুরী কি অদ্ভুত লোক। মা-ই বলে ফেললেন তাকে। ছি, ছি, এমন বেফাঁস কথা কেউ তো বলেনি। একা একা ঘরের মধ্যে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল বিদ্যুৎ।

'কনগ্রাচুলেসনস্, বিদ্যুৎ।'

বিদ্যুৎ চমকে উঠল, 'কে?'

থানার ক্ষিতীশ অধিকারী গোঁফের ডানদিকের ঝুলন্ত ডগাটা সস্নেহে একটু দাঁতে কেটে মুচকি হাসল, 'দেখ, চিনতে পার কিনা। আজ তো কেবল রঙ্গিনী নয়, রণ-রঙ্গিনী। আজ কি আমরা আর

পাত্তা পাব ?'

ভিতর থেকে বন্ধ করা সদর দরজার দিকে একবার তাকাল বিদ্যুৎ। তারপর বলল, 'তুমি কেমন ক'রে এলে।'

ক্ষিতীশ বলল, 'আকাশ থেকে চাতক পাখী ডানা ছিঁড়ে পড়েছে। সদর বন্ধ দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম। সুখদা মাসী খিড়কি দেখিয়ে দিল। সেটা খোলা রয়েছে। বুঝলুম এই দ্বারই হৃদয় দ্বার।'

বিদ্যুৎ বলল, 'না না, আজ যাও তুমি। আজ নয়—'

ক্ষিতীশ এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল, 'তুমি যে একেবারে লাজনম্র কুমারীটি হয়ে গেলে। ব্যাপার কি ! আজ এত বড় ভিক্টরী জুবিলী তোমাদের, আমিই যাব, আমিই বাদ যাব। জানো সুখদা আনকোরা একখানা দশটাকার নোট এইমাত্র আদায় ক'রে নিয়েছে আমার কাছ থেকে, উৎসবের চাঁদা—'

বাইরে থেকে চীৎকার আর অশ্লীল ভাষায় গালাগালের শব্দে ক্ষিতীশের গলা ডুবে গেল। খাট থেকে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল বিদ্যুৎ।

গলির মধ্যে ক্ষেন্তী আর বুঁচীতে লড়াই শুরু হয়েছে। ক্ষেন্তী ধরেছে বুঁচীর চুলের গোছা, আর বুঁচী তাকে দমাদম লাথি মারছে, 'হারামজাদী, তুই আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবি ?'

'ছিনিয়ে নেব কেন লো ! ফটকে যেচে এসে আমার গলা ধরল না ? খেঁদী, ধাড়ী, তোর আছে কি লো যে ফটকে যাবে তোর কাছে ?'

বুঁচী জবাব না দিয়ে পর পর ফের দুটো লাথি মারল ক্ষেন্তীকে।

'মলুম গো, মেরে ফেললে গো।' ক্ষেন্তী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

ক্ষিতীশ বলল, 'আঃ জ্বালাতন করে মারলে। জানলাটা বন্ধ ক'রে দাও।'

বিদ্যুৎ জানলার কাছ থেকে সরে এল,কিন্তু জানলা বন্ধ করল না। ক্ষেন্তী-বুঁচীর ঝগড়া সমানে চলতে লাগল।

ক্ষিতীশ বলল, 'তারপর বুড়ো পূর্ণ চৌধুরীর বাসনা বুঝি এতদিনে পূর্ণ করলে। আচ্ছা বাহাদুর মেয়ে বটে বাবা। বিজয়কাহিনীটা গোড়া থেকে বর্ণনা কর শুনি। এত বড় জিৎ —'

ক্ষিতীশ অধিকারীর বুটের উপর হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ল বিদ্যুৎ, 'না ইনস্পেক্টর, জিৎ নয়, হেরে গেছি, একেবারে হেরে গেছি আমরা। আর তোমাদের রাখতে অনুরোধ করব না। তাড়াও, আমাদের তাড়িয়ে দাও। মূল সুদ্ধ উচ্ছেদ ক'রে দাও আমাদের। শুধু রাণীঘাট থেকে নয়, ছাতিমতলার মাঠ থেকে নয়, সারা পৃথিবী থেকে আমাদের একেবারে নিখোঁজ ক'রে ফেল।'

জুতোয় চোখের জল লাগল। ক্ষিতীশ অধিকারীর কি বিপদ।

সস্নেহে ওর ঘনবদ্ধ বড় খোঁপাটার ওপর হাত বুলোতে লাগল ক্ষিতীশ। হারামজাদী সুখদা বোধ হয় হাঁড়িখানেক ধেনো মদ গিলিয়েছে। নইলে সহজে এত মাতলামি করবার মত মেয়ে ও নয়।

বৈশাখ ১৩৫৬

শাল

রাত্রে অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি অনিমেষ। সবে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, তবু এরই মধ্যে বেশ খানিকটা শীত পড়েছে। কিন্তু শীতবস্ত্র এখনও কিছু আসেনি। পাঞ্জাবির ওপর শুধু একটা পুল-ওভার ভরসা। কিন্তু একটা কিছু গায়ে না জড়াতে পারলে যেন কিছুতেই আজ আর শীত মানবে না। অনিমেষ ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বিছানার ওপর থেকে রঙীন সুজনিটা তুলে নিল।

বীথিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল স্বামীর কাণ্ড। বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে !'

অনিমেষ বলল, 'হবে আবার কি ? আজকের রাত্রের মত এই সুজনিই আমার অঙ্গাবরণ। দেখ

তো কি রকম মানিয়েছে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে রাজবেশ। ছাড়। ওটা নিয়ে তোমাকে কিছুতেই আমি বেরুতে দেব না। মানুষের একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তো!'

এগিয়ে এসে সত্যিই সুজনিটা স্বামীর গা থেকে খুলে নিল বীথিকা।

অনিমেষ বলল, 'বেশ, তাহলে ভাণ্ডার খোল, হাতড়ে হাতড়ে দেখ, কোন কিছু মেলে নাকি অন্তত একটা মাফলার টাফলার গলায় জড়িয়ে যেতে পারলেও হয়।'

বীথিকা অভিযোগের সুরে বলল, 'এত ক'রে বলি, রাত্রে যখন প্রতি মাসেই একবার ক'রে বেরুতে হয়, তোমার যা দরকার আগে করে নাও। অন্তত একটা সার্জের পাঞ্জাবি থাকলেও তো হয়। কিন্তু করবার সময় কিছু করবে না, আর বেরুবার সময় বিছানা লেপ বালিস তোষক যা পাও তাই নিয়ে টানাটানি করবে।'

স্ত্রীর গঞ্জনাটা বিনা প্রতিবাদে শুনতে লাগল অনিমেষ। এ কথা বলল না যে, করবার ইচ্ছা থাকলেই সব জিনিস করা যায় না। বাংলা দৈনিক কাগজের অফিসে চাকরি। মাইনে স্বল্প, তাও সুনিয়মিত নয়। যা মেলে তাতে খোরাক আর পোষাক দুইই একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয়ে ওঠে না। তবু তো মাইনে পেয়ে এ মাসে এক জোড়া শাড়ি আর বাবুলের জন্য গরম জামা মোজা কিনে আনতে হয়েছে। কিন্তু বীথিকার ভঙ্গিটুকু ভারি উপভোগ্য। যেন গাফিলতি করেই জিনিসপত্র কিছু করে না অনিমেষ। কেবল স্বামীর কাছে নয়, প্রতিবেশীদের কাছেও এই ভাবটাই বীথিকা বজায় রাখতে চায়। ঘরের দরকারী জিনিসপত্রের অপ্রতুলতার কারণ অর্থাভাব নয়, অনিমেষের অমনোযোগ আর ঔদাসীন্য।

অনিমেষ বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বীথিকা ফের বাধা দিল, 'দাঁড়াও দেখি কিছু আছে নাকি, খালি গায়ে বেরিয়ে বেরিয়ে তুমি একটা শক্ত রকমের কিছু অসুখ বিসুখ না ঘটিয়ে তো আর ছাড়বে না। এত ক'রে বললাম আমার শাড়ি সামনের মাসে হবে, তুমি একটা র‍্যাপার ট্যাপার কিনে নাও আগে। বাবুলেরও পুরোন যা ছিল এ মাস তাতেই চলত, ওর তো আর তোমার মত নাইট ডিউটি নেই।'

দু'বছরের ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ একটু হাসল, তারপর স্ত্রীকে বলল, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাজভাণ্ডার একবার উপুড় করবে তো কর, আর না হলে চলি।'

ছোট ছোট গোটা দুই সুটকেস, আর বীথিকার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া বড় একটা ট্রাঙ্কের স্থান রয়েছে তক্তপোশের তলায়। নিচু হয়ে একটু হামাগুড়ি দিয়ে সেই ট্রাঙ্কটা বীথিকা টেনে বার করল। তারপর স্বামীকে বলল, 'তাকের উপর বার্লির খালি কৌটোটার মধ্যে চাবির রিং রেখেছি, দাও দেখি।'

তাকে বার্লির কৌটো একটা নয়। একটার মুখ খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে চিনি, আর একটার মধ্যে মসলা। তৃতীয় কৌটোটায় হাত দিতে যাচ্ছিল অনিমেষ, বীথিকা এগিয়ে এসে তার পাশের কৌটোর 'মুঠকি' খুলে চাবির রিংটা বের করে নিতে নিতে বলল, 'কোন কাজ যদি হয় তোমাকে দিয়ে!'

অনিমেষ বলল, 'বা রে, তুমি কোথায় কোন জিনিস লুকিয়ে রাখ, আমি পাব কি করে!'

ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে নানা জিনিস বেরুতে লাগল। পুরোন ছেঁড়া ধুতি পাঞ্জাবি, বীথিকার খান দুই পোষাকী শাড়ি, বাবুলের খেলনা, একখণ্ড গীতবিতান, কিন্তু শীতবস্ত্রের সাক্ষাৎ নেই।

অনিমেষ সরে এসে বলল, 'থাক্ থাক্ হয়েছে।' কিন্তু বীথিকা বলল, 'না, পেয়েছি, আমার প্রাণটা আঁৎকে উঠেছিল, গেল কোথায় জিনিসটা। এই নাও।'

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে দেখল বীথিকার হাতে একখানা কাশ্মীরী শাল। পুরোন কিন্তু দামী সৌখীন জিনিস।

একটু চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, 'এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? এ কার?'

বীথিকা একটু কাল মাথা নিচু করে রইল, তারপর স্বামীর দিকে না তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মার কাছে ছিল। বাবার একটা জরুরী দলিল খুঁজতে খুঁজতে আমাদের সেই বড় আলমারীর দেরাজ থেকে বেরিয়েছে। মা বললেন, তোর জিনিস তুই নিয়ে যা।'

অনিমেষ বলল, 'তোর জিনিস মানে ? ও, বিজয়ের—বিজয়বাবুর শাল বুঝি ?'
বীথিকা অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ ।'
তারপর শালটা তক্তপোশের ওপর রেখে সমস্ত জিনিস ফের ট্রাঙ্কের ভিতর ভরতে লাগল ।
অনিমেষ বলল, 'ওটাও তুলে রাখলে পারতে ।'
বীথিকা এবার স্বামীর দিকে তাকাল, 'কেন ?'
অনিমেষ একটু থতমত খেয়ে বলল, 'মানে দামী জিনিস তো । সাধারণ ব্যবহারের জিনিস তো আর নয় ।'
ততক্ষণে বীথিকা ট্রাঙ্ক বন্ধ করে ফেলেছে । উঠে দাঁড়িয়ে শালখানার ভাঁজ ভেঙে স্বামীর কাঁধে রেখে দিয়ে বীথিকা একটু হেসে বলল, 'সাধে কি আর তোমাকে কৃপণ বলি । জিনিস দামী বলে তা কি চিরকাল লোকে বাক্সে তুলে রাখে ? ব্যবহার করে না ? নাও ।'
কথা বলবার ভঙ্গিটুকু বেশ মিষ্টি বীথিকার, আর হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে ।
অনিমেষ আর আপত্তি করতে পারল না, বলল, 'আচ্ছা চলি ।'
তারপর চৌকাঠে পা দিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ চমৎকার জিনিস সত্যি । বিজয়বাবু বেশ সৌখীন পুরুষ ছিলেন ! আমার মত উজবুক ছিলেন না, কি বল বীথি ?'
একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা বিজয়বাবু কত দিয়ে কিনেছিলেন শালটা ? মনে আছে ?'
বীথিকা বলল, 'তা জানি না । দাম টাম আমাকে বলত না । বন্ধুদের সঙ্গে একবার এলাহাবাদে গিয়েছিল বেড়াতে । সেখান থেকে— ।'
অনিমেষ বলল, 'ও, আচ্ছা চললুম । সাবধানে থেক ।'
বীথিকা মৃদু হাসল, 'অসাবধানের কি আছে ? ভালো কথা, বাবুলকে বুঝি তুমি কমলালেবুর লোভ দেখিয়েছিলে । বিকাল থেকে লেবু লেবু করছিল ।'
অনিমেষ বলল, 'আচ্ছা, কাল নিয়ে আসব । আর বাবুলের মার বুঝি কোন কিছুতে লোভ নেই ? একেবারে নিরাসক্ত যোগিনী ?'
বীথিকা বলল, 'আহাহা ! লোভ থাকলেই বা কি ! লোভের বড় জিনিসটিকে ধরেই তো 'সুপ্রভাত' অফিস টান দিয়েছে ।'
অনিমেষ বলল, 'তা ঠিক, নাইট ডিউটির রাতগুলি শুভ-রজনী নয়, কিন্তু ক' ঘণ্টা বিচ্ছেদের পর ভোরগুলি তো সত্যিই সুপ্রভাত ।'
হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ আর দাঁড়াল না । কিন্তু বাসে উঠে লক্ষ্য করল সহযাত্রীদের কেউ কেউ তার শালখানার দিকে একাধিকবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে । অনিমেষ নিজেও আর একবার শালখানার দিকে চোখ ঘোরাল । সত্যি, ভারি দামী আর চমৎকার জিনিস । কিন্তু এর প্রথম অধিকারী আজ আর নেই । বীথিকার সঙ্গে বিজয়ের শালও আজ তার উত্তরাধিকারীর হাতে পড়েছে ।
বিজয়ের সম্বন্ধে আরো দু'টুকরো তথ্য আজ জানল অনিমেষ । বন্ধুদের সঙ্গে এলাহাবাদ বেড়াতে গিয়ে শাল কিনেছিল । আর জিনিসপত্র কিনে স্ত্রীকে তার দাম বলবার মত অভ্যাস ছিল না বিজয়ের ।
বিজয়ের সম্বন্ধে সত্যি বড় বেশি চুপচাপ বীথিকা । মাঝে মাঝে দু' একদিন কৌতূহলী হয়ে এক আধটা কথা জিজ্ঞেস করতে গেছে অনিমেষ, বীথিকার কাছ থেকে তেমন উৎসাহ পায়নি । পর মুহূর্তে নিজেই লজ্জিত হয়েছে । ছিঃ, কি দরকার এ সব কথা পেড়ে ! স্ত্রীর বিগত স্বামী কেমন ছিল তা জানতে যাওয়া অভদ্রতা ছাড়া আর কি, এ যেন বিবাহিতা স্ত্রীর কুমারী জীবন সম্বন্ধে স্বামীর অশোভন অনুসন্ধিৎসা । না, তার চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ । অবশ্য যতদূর জানা যায় বিজয়ের সঙ্গে মোটেই হৃদ্য সম্পর্ক ছিল না বীথিকার । বনিবনাও ছিল না স্বামী-স্ত্রীর ।
বীথিকা যে কুমারী নয়, অধ্যাপক শ্রীবিলাসবাবুর বাড়িতে প্রথম আলাপে অনিমেষ তা মোটেই বুঝতে পারেনি । কি করে বুঝবে । সাধারণ হিন্দুর ঘরে বেশে চালে চেহারায় বিধবার যে লক্ষণ সুনির্দিষ্ট তা বীথিকার মোটেই ছিল না । তখন থেকেই বিজয়ের স্মৃতিকে নতুন কৌমার্যে একেবারে

যেন মুছে ফেলেছিল বীথিকা। পরনে ছিল অনতিপ্রশস্ত কালো-পেড়ে শাড়ি, হাতে একগাছা করে চুড়ি, গলায় সরু হার। বীথিকাকে কুমারী বলেই বহুদিন মনে ভ্রম ছিল অনিমেষের। খুব তাড়াতাড়ি সে ভুল ভাঙবার কেউ তখন চেষ্টা করেননি। না বীথিকার বাবা শ্রীবিলাসবাবু না তার মা মনোরমা। বীথিকাও অনিমেষের সঙ্গে আলাপ করেছে, গল্প করেছে, চায়ের আসরে সাহিত্য রাজনীতির তর্ক তুলেছে, কিন্তু কোনদিন বিজয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি। তোলবার কোন অবকাশ ছিল না। আর সে অবকাশ যে হয়নি তার জন্যে মনে মনে অনিমেষ কৃতজ্ঞ সকলের কাছে। রঙিন শাড়ি কেন বীথিকা পরে না এ প্রশ্ন অনিমেষের মনে একবারও ওঠেনি। কারণ শাড়ির রঙের অভাব মনের রঙে ভরে গিয়েছিল। আভরণের অপ্রাচুর্যকে মনে হয়েছিল রুচির স্বকীয়তা বলে।

তারপর আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে অনিমেষ অবশ্য সবই জানল। যখন জানল তখন আর পেছুনো যায় না, পিছুবার কথা ভাবতে গেলেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া পিছিয়ে আসবার প্রয়োজনই বা কি! বিজয় মুখুজ্যে নামে আর একটি ছেলের সঙ্গে বীথিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে বছর তিনেক ছিল বেঁচে। তারপর কুচবিহার না কোথায় গিয়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় বেচারা মারা গেছে। স্বামীর সঙ্গে বীথিকার মনের মিল ছিল না। বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও তার বনেনি। ফিরে এসেছে অধ্যাপক বাপের কাছে। যে ছাত্রী-জীবনে ছেদ পড়েছিল ফের সংযোগ হয়েছে তার সঙ্গে। বীথিকার জীবনের এই ছোট অধ্যায়টুকু নগণ্য ক'টি তথ্য ছাড়া আর কি। তাই এ সব জেনেও একদিন মেঘলা বিকালে তেতলার ছাতের নিরালা চিলাকোঠায় অনিমেষ বীথিকার হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে অসঙ্কোচে তুলে নিতে পেরেছিল, 'আমি আজ জবাব চাই বীথিকা।'

বীথিকা হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।

জবাবের বদলে মুখ নিচু করে আর একটি ছোট প্রশ্ন শুধু করেছিল, 'তুমি তো সবই শুনেছ। আমি কি তোমাকে সুখী করতে পারব?'

এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব অনিমেষ বিয়ের পর দিয়েছে। নিজেদের দাম্পত্য জীবনই এর যোগ্য জবাব। অবশ্য গোড়ায় ছোটখাট দু' একটি বাধা যে আসেনি তা নয়। বাবা মা নেই, দূর সম্পর্কের কাকার সমর্থন প্রারম্ভে পায়নি অনিমেষ। পরে তিনি একদিন এসে বউ দেখে গেছেন, অন্ন গ্রহণ করেননি। আর বীথিকার যে শ্বশুর বিধবা পুত্রবধূর গায়ের গয়না সুদ্ধ সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিয়েছিলেন, বিয়ের সংবাদে তিনিই আবার ছুটে এসেছিলেন উন্মত্তের মত! অনিমেষকে শাসিয়েছিলেন মামলা করবেন বলে। শেষে বোধ হয় উকিলের পরামর্শে বিরত হয়েছেন।

কিন্তু বাইরের ঝড়-ঝাপটায় দু'জনের নীড়ের কোন ক্ষতি হয়নি। বীথিকার মত মেয়ে হয় না। তার বাবা আর পূর্বতন স্বামীর তুলনায় আর্থিক দিক থেকে অনিমেষ যে অস্বচ্ছল তা সে জানে। কিন্তু তার জন্য বীথিকার মুখ কোন দিন ম্লান দেখা যায়নি, কোন দিন নিরুদ্যম হয়নি বীথিকা। অনিমেষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবকে নিপুণ মিতব্যয়িতায় বীথিকা আড়াল ক'রে রেখেছে। বন্ধুরা যে আসে সেই সুখ্যাতি করে। অনিমেষ শুধু সুন্দরী ভার্যার নয়, সুগৃহিণীর স্বামী।

অফিসে পৌঁছে অনিমেষ সিফট ইনচার্জের চেয়ারে বসতে না বসতেই উল্টোদিকের চেয়ারে কান্তিময় একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল, 'আরে ব্যাপার কি অনিমেষ দা, করেছেন কি?' অনিমেষ ব্যাপারটা টের পেয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, 'করব আবার কি!' কান্তিময় বলল, 'করবেন আবার কি মানে। এই শীতের রাতে এর চেয়ে বড় এ্যাচিভমেন্ট আর কে করতে পেরেছে? রাতারাতি এমন সলভেন্ট হলেন কি করে? এ তো দাদা সাদা বাজারের সাধ্য নয়, একেবারে কুচকুচে কালো বাজার।'

কান্তিময় অনিমেষের কাঁধ থেকে শালখানা নিজের হাতে তুলে নিল, তার পর বলল, 'বাঃ, চমৎকার জিনিস।'

সংবাদ অনুবাদ ফেলে রেখে অন্যান্য সহকর্মীরা ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে। কার্তিক, গৌতম, সুধীন, প্রফুল্ল প্রত্যেকের হাত থেকে হাতে ফিরেছে শাল।

'কত দিয়ে কিনলেন অনিমেষবাবু?'

অনিমেষ পরিবেশনযোগ্য সংবাদ বাছাইয়ের কাজে মন দিতে দিতে বলল, 'কেনা নয়, পুরোন জিনিস, দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

কান্তিময় একটু সুর সংযোগে বলল, 'কে বলে পুরোন হতে নতুন উত্তম। নতুন জ্বরে মাথা ধরে, বিশ্বাস নেই নতুন চাকরে—। সংসারে চিরকাল apprentice-এর চাইতে experienced hand-এর দাম বেশি।'

অনিমেষ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'হয়েছে, এবার কপি ছাড়তে সুরু কর তো। প্রেসের লোক এসে এক্ষুণি তাড়া লাগাবে।'

সুধীন শালখানা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ও তাই বলুন অনিমেষবাবু। স্বোপার্জন নয়, উত্তরাধিকার।'

গৌতম হেসে বলল, 'আরে ভাই সেও তো অর্জন। এমন উত্তরাধিকারের ভাগ্যই বা অনিমেষের মত কজনের হয়।'

অনিমেষ ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারল সহকর্মীদের মধ্যে যারা ব্যাপারটা জানে তাদের সবাই মুখ টিপে হাসছে। শালখানা যে বিজয়ের তা অবশ্য অনিমেষ কাউকে বলেনি, কিন্তু তার কেমন যেন মনে হতে লাগল ওরা সবাই টের পেয়েছে। টের পেলেই বা কি ? একজনের জিনিস কি আর-একজনে ব্যবহার করে না ? মৃত আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহৃত জিনিস যদি ভোগ করা চলে, স্ত্রীর বিগত, মৃত স্বামীর একখানা শাল গায়ে দিতেই বা লজ্জা কিসের ? তবু অযৌক্তিক কুণ্ঠাটা যেতে চায় না ; কোথায় যেন একটু হীনতা আছে এর মধ্যে, আছে নিজের দারিদ্র্যের অগৌরব। কিন্তু রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেশ জোর পড়ল। সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে শালটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে বসে দ্রুত কলম চালাতে লাগল অনিমেষ।

প্রেসের নাইট ইনচার্জকে যথারীতি উপদেশ দিয়ে শুতে শুতে রাত প্রায় তিনটা বাজল অনিমেষের। অন্যান্য সহকর্মীরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'খানা টেবিল জোড়া দিয়ে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে অনিমেষের জন্য শয্যা রচনা করে রেখেছে বেয়ারা বৈকুণ্ঠ। মোটা মোটা তিনখণ্ড ডিকসনারীকে উপাধান ক'রে শালটাকে 'র‍্যাগে'র মত ব্যবহার করল অনিমেষ। পায়ের নখ থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢাকল, ঠোঁট দুটি অনাবৃত রাখল সিগারেটের জন্য। ঘুমুবার আগে আর একবার মনে পড়ল বীথিকার মুখ। কিন্তু জেগে থেকে ওর ঘুমন্ত মুখ দেখতে আরো সুন্দর।

পরদিন ভোরে বেশ একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল অনিমেষের। অনেক রোদ উঠে গেছে। বেলা সাতটা। অন্যান্য দিন আরো সকালে ওঠে। অনিমেষ বাসায় না পৌঁছন পর্যন্ত কিছুতেই চা খায় না বীথিকা। এত ক'রে বলেছে অনিমেষ, তবু না। ওর ওই এক দোষ। বলে 'একা একা চা খেতে ভালো লাগে না।' অনিমেষ জবাব দেয়, 'প্রথম কাপ না হয় একাই খেলে, দ্বিতীয় কাপ দুজনে খাওয়া যাবে।' কিন্তু সকালে প্রথম কাপই শেষ কাপ বীথিকার দ্বিতীয় কাপ ওর সন্ধ্যার জন্য থাকে।

বাস স্ট্যাণ্ডের সামনেই ফল আর রুটির দোকান। বাবুলের কমলালেবুর আবদারের কথা অনিমেষের মনে পড়ল। একটু দর দাম ক'রে লেবু কিনল দুটো। আর একজনের আরও একটু আবদার আছে। কিন্তু তা একেবারে অপ্রকাশিত। চায়ের সঙ্গে আটার রুটির চাইতে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসে বীথিকা। কিন্তু তা তো কোনদিন মুখ ফুটে বলবে না। এসব ব্যাপারে চিরকালই ভারি লাজুক। কুপন সঙ্গে নেই। দু'চার পয়সা বেশি দিয়েই ফিরপোর কোয়ার্টার পাউণ্ড নিল অনিমেষ। পকেটে হাত দিয়ে দেখল বাস ভাড়ার আনিটা ঠিকই আছে।

বাসায় এসে অনিমেষ দেখল স্নান সেরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বীথিকা তার জন্য অপেক্ষা করছে ! ভিজে চুলে পিঠ ঢাকা। সিঁথি আর কপালে সিঁদুরের সুন্দর প্রসাধন। এ সিঁদুর ক বছর আগে আর একজনের জন্য পরত বীথিকা, সে মুছেও দিয়ে গিয়েছিল তা কি এখনও ওর মনে আছে ? মনে পড়ে সিঁদুর পরবার সময় ? নিশ্চয়ই না। কিন্তু ছিঃ, এসব কি ভাবছে অনিমেষ ? এসব শুধু অভদ্রতা নয়, নিষ্ঠুরতা। নিজের ওপরই অনিমেষ যেন একটু রুষ্ট হয়ে উঠল।

ততক্ষণে স্বামীকে দেখে মাথায় অল্প একটু আঁচল তুলে দিয়েছে বীথিকা। ফিকে হলদে রঙের

আঁচল। খুব ফর্সা রঙ বীথিকার। ফলে যে কোন রঙের শাড়িই ওকে মানায়। তবু শাড়ি কিনতে গিয়ে রঙ বাছাই করতে অনেক সময় নেয় অনিমেষ। এক রঙের পর আর এক রঙ। কোন দিন ভুলেও আনে না কালো পাড় কি সাদা খোলের শাড়ি।

অনিমেষ স্মিতমুখে হাতের কাগজখানা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'সুপ্রভাত।'

বীথিকা ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'সুপ্রভাত নয়, বিলম্বিত প্রভাত বল। আজ এত দেরি যে।'

অনিমেষ বলল, 'তোমার শালের দোষ। কাল রাতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়েছে, এমন কোন দিন হয় না। একেবারে অতুলনীয় শীতবস্ত্র। সব কাজে লাগে।'

শীতের পোষাকে ছোট্ট সাহেব বাবুল এসে কোল ঘেঁষে দাঁড়াল, 'বাবন, কমলা।'

পকেট থেকে কমলা বের করে ছেলের দু'হাতে তুলে দিল অনিমেষ, তারপর অয়েল পেপারে মোড়া রুটিটা এগিয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। বীথিকা আবক্ত হয়ে বলল, 'ফের রুটি? তুমি বড় অপব্যয়ী হয়েছ আজকাল।'

অনিমেষ মৃদু হাসল, এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'নাও, রাখো এবার তোমার শাল। সবাই বলছিল, আমাকে নাকি বেশ মানিয়েছে। সত্যি?'

বীথিকা স্মিতমুখে বলল, 'তোমাকে কি না মানায়।'

তারপর স্বামীর কাঁধ থেকে শালটা নামাতে নামাতে হঠাৎ মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদের সুরে বীথিকা বলে উঠল, 'একি?'

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী হ'ল?' শালের একটা কোনা অনিমেষের সামনে মেলে ধরে বীথিকা তীব্র অভিযোগের স্বরে বলল, 'এ দশা হ'ল কি করে?'

এতক্ষণে বুঝতে পারল অনিমেষ। একটু চুপ করে থেকে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'ও। কিন্তু ফুটোটা বোধহয় আগেই ছিল।'

বীথিকা বলল, 'মিথ্যে কথা। সে কখনো সিগারেট খেত না।'

বিজয়ের সম্বন্ধে আর একটি তথ্য। সে সিগারেট খেয়ে কোন দিন গায়ের শাল পোড়ায়নি। কিন্তু এ কি কেবল তথ্যই? বীথিকার আর্তস্বর, তার অভিযোগের তীব্রতা শুধু কি একটুকরো তথ্যকেই প্রকাশ করেছে?

সিগারেটের আগুনে পোড়া শালের ছোট একটু ছিদ্র। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে দুজনের কাছে কি দুটি অদৃষ্টপূর্ব জগতই না উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মাত্র একবার এক পলকের জন্য দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু একটি পলে যেন একটি যুগের ব্যাপ্তি, যুগান্তরের ঝড়। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শালটা তক্তপোশের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বীথিকা। আর নিঃশব্দে জামা কাপড় খুলে অনিমেষ ঢুকল বাথ রুমে।

মিনিট পনের কুড়ি বাদেই অবশ্য চায়ের কাপ আর প্লেট ভরা টোস্ট নিয়ে অন্যান্য দিনের মতই ফের দুজনে বসল মুখোমুখি। লোভী বাবুল কমলা রেখে টোস্টের জন্য হাত বাড়ল। একখানা দিলে চলবে না। বাবাও দেবে মাও দেবে। বীথিকা হেসে ফেলল। অনিমেষ হাসল, 'ঘটোৎকচ'।

তবু দিনটা ঠিক অন্যান্য দিনের মত লাগল না। মুখ নিচু করে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বীথিকা এক সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মাফ কর।'

অনিমেষ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে স্নিগ্ধ একটু হাসল, 'পাগল।'

বীথিকার আনত মুখ লজ্জার আভায় আরক্ত।

আঁজলা ভরে ঠাণ্ডা জল ছিটাবার পর অনিমেষের দু' চোখে সেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গও এখন আর নেই। তার বদলে শুধু অনুকম্পা। নিজের জন্য খানিকটা লজ্জাও, তুচ্ছ কারণে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হয়ে গেছে। নিজের আচরণে বিস্মিত হয়েছে অনিমেষ, কিন্তু তার চেয়েও বড় বিস্ময় বীথিকা। সব ভুলে সব বিলিয়ে দিয়েও একখানা শাল সে আজ অক্ষত নিশ্ছিদ্র রাখতে চায়। মনে রাখতে চায় কে একজন সিগারেট খেত না। শতছিদ্র স্মৃতির ভাণ্ডারে তার এখনো এ কি স্বর্ণরেণু

সঞ্চয়ের সাধ।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

জাল

অভিভাষণ শেষ ক'রে মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন সভাপতি। মণ্ডপ থেকে সোজা বেরুবার পথ ধরলেন। কিন্তু বেরুনো অত সহজ নয়। স্থানীয় সাহিত্যামোদীরা পথ আটকে ধরেছেন। টাকপড়া প্রৌঢ় মত এক ভদ্রলোক অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'যাই বলুন, 'কবি'র মত বই আর আপনার হয়নি। ওই রকম আর একখানা লিখুন না।' তারাশঙ্কর মৃদু হাসলেন, 'ঠিক একখানার মত কি আর একখানা লেখা যায় ? তাতে দু'খানাই নষ্ট।' বাঁ দিক থেকে চশমা-পরা একটি সুদর্শন যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, শুনেছি আপনার বইয়ের বেশির ভাগ চরিত্রই নাকি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। এমন কি আপনাদের লাভপুরে গেলে তাদের অনেককেই নাকি চাক্ষুস দেখা যায় ?'

তারাশঙ্কর যুবকটির দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিলেন, 'দেখা গেলেও চেনা যায় না।'

'কেন ?'

তারাশঙ্কর বললেন, 'দেখা মানুষের মুখের আদল, মুখের ভাষা কলমের মুখে অবিশ্বাস্য রকমে বদলে যায়। চিনবেন কি ক'রে ?'

'তা হ'লে লাভপুরে গিয়ে কোন লাভ নেই ?'

তারাশঙ্কর হাসলেন, 'মোটেই না। গাড়িভাড়াটাই লোকসান।'

একজন পাবলিশার বন্ধু ছিলেন সঙ্গে। তিনি সুযোগটা ছাড়লেন না, বললেন, 'বরং সেই টাকায় বই কিনলে সব পক্ষেরই লাভ আছে।'

আরও একটু এগিয়ে তারাশঙ্কর হঠাৎ বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা এবার বরং আস্তানায় যাও জগদীশ, আমি একটু ঘুরে টুরে আসি।'

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, 'ঘুরতে তো আমরাও জানি শঙ্করদা, দুটো পা তো আমাদের সঙ্গেও আছে।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'সে পা এ পথে হোঁচট খাবে। তার চেয়ে আমাকে এবার একটু ছেড়ে দাও, তোমরা বিশ্রাম কর গিয়ে।'

বন্ধু আরও একটু কাছে ঘেঁষে এসে ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'তাই বল। তা হ'লে এদিকে বিশেষ একজন কেউ জানা শোনা আছেন তোমার, বেশ, বেশ। আমরা আর বাদ সাধব না।'

তারাশঙ্কর স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন। আদিরসে জগদীশের অকৃত্রিম উৎসাহ।

সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রস্তাব শুনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'সে কি ! এই সন্ধ্যার সময় একা একা কোথায় যাবেন আপনি ? মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে একেবারে অজ পাড়া গাঁ, পথঘাট মোটেই ভালো নয়।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'তাতে কি, আমি গাঁয়েরই লোক।'

'কিন্তু চা-টা কিছু খেলেন না—'

বন্ধুর হয়ে জবাব দিলেন জগদীশ, 'জীবন-ভর কেবল চা খেয়ে খেয়ে শঙ্করদা এখন পেটের রোগে ভুগছেন। হাওয়া ছাড়া আজকাল সব খাওয়াই ওঁর বন্ধ।'

সন্ধ্যার দিকটা সাধারণত একটু নিরালা, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেই ভালো বাসেন তারাশঙ্কর, ভালোবাসেন লোকলায়ের বাইরে থেকে লোকযাত্রার দিকে তাকাতে। কিন্তু এখন সে সব কিছু নয়। তিন চার ঘণ্টা ধ'রে সাহিত্যসভায় বক্তৃতা শুনে আর বক্তৃতা দিয়ে মাথাটি দিব্যি ধ'রে রয়েছে। খোলা মাঠের একটু হাওয়া লাগালে যদি ছাড়ে।

কিন্তু শহরের বাইরেই ঠিক ফাঁকা মাঠ মিলল না। প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মত নোংরা শহরতলী। মুচি আর মেথর পাড়া। কাঁচা চামড়ার গন্ধে বাতাস ভারাতুর। আরও একটু এগিয়ে

একটা পুকুর। তাতে জল কতটা আছে বোঝবার জো নেই, পানা আর কচুরির পরিমাণ প্রচুর। এখান থেকে দুটো পথ দুদিকে গেছে। তারাশঙ্কর বামপন্থী হবেন কি দক্ষিণপন্থী ইতস্তত করছেন, পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে একটি লোক প্রায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, 'ও মশাই, শুনুন শুনুন। আপনাকে মা-ঠাকরুণ ডাকছেন।'

তারাশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাম তারাশঙ্করবাবু তো? ওখানকার বাবুরা ব'লে দিলেন আপনি এদিকেই এসেছেন।'

তারাশঙ্কর লোকটির চেহারার দিকে একটু তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, লোকটি ভৃত্য শ্রেণীর, বললেন, 'তা তো এসেছি; কিন্তু তোমার মা-ঠাকরুণটি কে? তাঁকে তো চিনতে পারছি না।'

লোকটি বলল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না, আমি তাঁদের পাশের ডাক্তারবাড়িতে থাকি, নতুন এসেছি। চক্রবর্ত্তীদের মা-ঠাকরুণ আমাকে ডেকে বললেন—'

তারাশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চক্রবর্ত্তী? কি চক্রবর্ত্তী? বাড়িতে পুরুষ ছেলে কেউ আছেন তো? তাঁর নাম কি?'

লোকটি আবার বলল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না, আমি নতুন এসেছি। ও বাড়িতে ভারি অসুখ-বিসুখ।'

এই নবাগতকে নিয়ে তারাশঙ্কর কি করবেন ভেবে পেলেন না। মনে করলেন হয়তো পূর্বপরিচিত কেউ হবেন, কিংবা অনুরক্ত কোন পাঠিকা। কিন্তু ডেকে পাঠালেই কি যাওয়া চলে। তা ছাড়া, এ ধরনের দেখা-সাক্ষাতে লাভই বা কি? হঠাৎ মনে পড়ল একটি মুসলমান তরুণী বধূ তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আগ্রহ জানিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, দিই দিই ক'রে সে চিঠির জবাব দিতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে চিঠি বধূটির কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি। দিন-দুই আগেই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা, তবু এই অঘটনটি তারাশঙ্করের মনে অদ্ভুত একটা ছাপ রেখে গেছে।

একটু ইতস্তত ক'রে তারাশঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা চল।'

মফস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ দু'তিনটি অলিগলি পার হয়ে লোকটি একটা পুরোন একতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এসে বলল, 'এই যে, এখানে।'

'ওরে ও কৈলাস, কোথায় গেলি আবার?'

পাশের বাড়ি থেকে মনিবের গলা শোনা গেল।

কৈলাস তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বলল, 'যাই বাবু। আবার ডাকাডাকি সুরু হয়েছে। একদণ্ড কি একটু বেরুবার জো আছে।'

অবশ্য যাওয়ার আগে কৈলাস ডেকে দিয়ে গেল 'কৈ, মা-ঠাকরুণ, দরজা খুলুন। বাবু এসে গেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। ছোট একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুন্দরী বধূ দোরের সামনে এসে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন, 'এই যে, বাঁড়ুয্যে মশাই, আসুন, এতই মানী জ্ঞানী হয়েছেন যে লোক দিয়ে ডেকে না আনালে আর আসা যায় না!'

কিন্তু হ্যারিকেনটি একটু উঁচু ক'রে ধ'রেই সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে সশব্দে মেঝেয় নামিয়ে রেখে বধূটি বলে উঠলেন, 'ওমা এ কে।'

লজ্জা, বিস্ময় আর আতঙ্ক মেশানো ধ্বনিটুকু তারাশঙ্করের কানে তীরের মত গিয়ে বিঁধল।

বধূটি কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াল না। কোনো কথা না ব'লে মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে গেল।

মুহূর্তকাল তারাশঙ্কর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন, কিছু একটা ভুল হয়েছে। আর যে-ই হোক, তিনি এখানে অভিপ্রেত ন'ন।

তারাশঙ্করও আর অপেক্ষা করলেন না, যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই ফিরে চললেন। কিন্তু দু'চার পা'র বেশি এগুতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ কানে এল, 'কে?

কে ? কে এসে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে ? এই—পালাচ্ছ কেন ? এদিকে এসো, ভালো চাও তো এদিকে এসো শীগগির।'

রুষ্ট, অপমানিত তারাশঙ্কর আবার পিছনে ফিরলেন, দু'পা এগিয়ে এসে বললেন, 'বলছেন কি আপনি ?'

ভদ্রলোক আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একটু কি দেখলেন। গায়ে গরদের চুড়ীদার পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম। সুপুরুষ না হ'লেও সৌখীন পুরুষ, তেমন স্বাস্থ্যবান না হ'লেও চোখে-মুখে একরোখামির ছাপ আছে। গৃহকর্ত্তা সম্বোধনের আর এক ধাপ উঁচুতে উঠলেন, 'আপনি কি-রকম ভদ্রলোক মশাই ?'

তারাশঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে তাকালেন, বয়স বছর চল্লিশের বেশি হবে না, ছিপছিপে লম্বা চেহারা। খোলা গা। দেহে মাংসের চাইতে হাড় আর চামড়ার প্রাচুর্য বেশি। গলায় কালো সুতোর সঙ্গে একটা তামার তাবিজ। এতখানি বিক্রম প্রদর্শনের পর এবার হাঁপাতে সুরু করেছেন।

তারাশঙ্কর বললেন, 'আমিও ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি-রকম ভদ্রলোক ?'

গৃহকর্ত্তা আবার চটে উঠলেন, 'কি-রকম ভদ্রলোক ? কেন, কিসে অভদ্রতা হয়েছে আমার ? আর আপনি যে জানা নেই, শোনা নেই, রাতের বেলায় সেজেগুজে গৃহস্থবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আপনার মতলবটা কি শুনি, কি ভেবেছিলেন আপনি ? সে-সব পাড়া এদিকে নয়।'

তারাশঙ্করের দু' কান ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠল। এ সব কুৎসিত প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা না ক'রে, শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আপনিও যা ভেবেছেন তা ভুল, আপনাদের পাশের বাড়ির চাকর আপনাদের বাড়ির মেয়েছেলের নাম ক'রে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমার নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'

গৃহকর্ত্তা এবার হ্যারিকেন উঁচু ক'রে চেহারাটা আবার একটু দেখে নিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ?'

তারাশঙ্কর এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হ'লেন, এবার নিশ্চয়ই ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় পেয়েছেন। এবার তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা চাইবেন।

কিন্তু ভদ্রলোক যা ব'লে উঠলেন তা অভাবিত। তিনি এবার আর চটলেন না, মৃদু হেসে বললেন, 'দেখুন ধাপ্পা দেওয়ারও একটা সীমা আছে। তারাশঙ্কর বাঁড়ুয্যেকে যদি আমি না চিনতুম, না দেখতুম, তা হ'লে এই চেহারায়ও আপনি চালিয়ে দিতে পারতেন। ওই রকম কালো, খেজুর গাছের মত শুকনো-শুকনো চেহারা নিয়ে তারাশঙ্কর বাঁড়ুয্যে হওয়া যায় না। জানেন, সে আমার মামাতো ভাই, মায়ের আপন খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, দেশসুদ্ধ লোক তাকে চেনে, তার নাম জানে। চমৎকার চমৎকার সব বই লিখেছে।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'কি কি বই লিখেছেন তিনি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই তো মুশকিলে ফেললেন। ও-সব নবেল-টবেল আমার ধাতে সয় না। আমার ওয়াইফ বোধ হয় দু'একখানার নাম জানে। সে পড়েছে। জানেনই তো, ওসব গল্পের বই কেবল ছেলেমানুষ আর মেয়েমানুষের জন্যেই, পুরুষমানুষের অত সময় কই।'

তারাশঙ্কর একটু শুকনো হাসি হাসলেন, 'তাতো বটেই। তবু কি কি লিখেছেন তিনি জানতে পারলে—'

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হ'লেন, 'আঃ বললুম তো, ওসব আমার মনে থাকে না, এখকানা তো সেদিন পর্য্যন্ত দেখেছিলাম আমাদের ঘরে। কি যেন শ্রী—শ্রী—শ্রীমতীই হবে বোধ হয়।'

তারাশঙ্কর ক্ষীণস্বরে বললেন, 'শ্রীময়ী ?' ভদ্রলোক এবার উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীময়ী। আপনি জানলেন কি ক'রে ? আপনার বুঝি বইটই পড়ার খুব অভ্যাস আছে ? চমৎকার লেখে মশাই। কেবল লেখেই না, সভাপতিত্ব-টতিত্বও করে, এইতো আমাদের এই আরামবাগেই সভাপতি সেজে এসেছে।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'তাই নাকি ? তিনি এসেছেন বুঝি ? কি ক'রে জানলেন আপনারা ? তিনি নিজেই বুঝি জানিয়েছেন ?' ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, সে আবার জানাবে,আমরা

তার কাছে আবার একটা মানুষ, আমাদের সঙ্গে তার আবার একটা সম্বন্ধ ! অথচ জানেন ছেলেবেলায় আমার মা নিজের হাতে তাকে খাইয়ে না দিলে তার পেট ভরত না, সেই মানুষ একেবারে আগাগোড়া বদলে গেছে। তা বদলাক, শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তীও বদলাতে জানে মশাই। সভাপতি হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের দেশে সভাপতি অমন গণ্ডায় গণ্ডায় অনেকেই হয়ে থাকে, তাই ব'লে আমি নিজে তাকে সেধে ডাকতে যাব ? কক্ষনো না।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'তা তো বটেই। আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে তিনি চলতে লাগলেন।

আবার সেই একদফা ভ্রান্তিবিলাস। সেই নামসাম্য নিয়ে মর্মান্তিক প্রহসন। মর্মান্তিক ছাড়া কি, অন্য পাঁচজনের কাছে এ ভ্রান্তি হাস্যকর হতে পারে কিন্তু তারাশঙ্কর এতে হাসতে পারেন না, হাসতে পারেন নি। কি ক'রে পারবেন ? কি ক'রে পারবেন ? কেবল নাম-সাম্য দেখে বাংলা দেশের পাঠকেরা যদি 'শ্রীময়ী' আর 'অমানিতা মানবী'র লেখককে 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'র লেখকের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে চায়, এমন কি মাসিক সাপ্তাহিক দু'একজন সমালোচক পর্য্যন্ত প্রশংসাচ্ছলে তারাশঙ্করের নতুন এক্সপেরিমেন্টের দোহাই দেয়, আর যেই পারুক, তারাশঙ্কর অবিচল থাকতে পারেন না, চুপ ক'রে থাকতে পারেন না, চুপ ক'রে তিনি থাকেনও নি। পঞ্চগ্রামের ভূমিকায় তিনি এ ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'শ্রীময়ীর তারাশঙ্কর শ্রীময় হয়েই থাকুন, আমি শ্রী ত্যাগ করলুম।'

স্ত্রী উমারাণী একদিন বলেছিলেন, 'দেখ, আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে। তুমি বড্ড চটে গেছ। তোমার পঞ্চগ্রামের ভূমিকা প'ড়ে লোকে কিন্তু তাই বলাবলি করছে।'

তারাশঙ্কর অপ্রসন্ন মুখে বলেছিলেন, 'তা বলতে পারে।' উমারাণী মুখ টিপে হেসেছিলেন, 'আচ্ছা, সে ভদ্রলোকও যদি তোমার দেখাদেখি শ্রী ত্যাগ করেন তখন তুমি কি করবে ? নিজের নাম থেকেই খানিকটা বাদ দেবে নাকি ? তারপর এই ভাবে যদি পাল্লা চলে—'

তারাশঙ্কর বলেছিলেন, 'হুঁ। যাও, কাজে যাও এবার।'

উমারাণী বললেন, 'যাই। তোমাদের ব্যাপার দেখে আমার ছেলেবেলার একটি গল্প মনে পড়ছে। আমাদের পাড়ার একটি নাপিতের মেয়ে ছিল। বেশ সুন্দরী। গোড়ায় তার সঙ্গে ভারি ঝগড়া ছিল আমার। কিন্তু যেই শুনলুম তার নাম উমা, অমনি তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলুম, ভারি ভালো লাগল। তাছাড়া আমার মেশোমশাই-এর নামের সঙ্গে এক কৈবর্ত্ত চাষীর নামের মিল ছিল। একজন আর-একজনকে 'মিতে' ব'লে ডাকতেন।'

তারাশঙ্কর চটে উঠেছিলেন 'দেখ, এটা তোমাদের মেয়েলী মিতে-মিতিনের ব্যাপার নয়। আচ্ছা, অন্যের ছেলের মা ব'লে যদি তোমাকে চালানো যায় তুমি সহ্য করতে পার ?'

উমারাণী হেসেছিলেন, 'খুব পারি। আমরা তো আত্মসর্বস্ব অহংকারী পুরুষের জাত নয়। অন্যের ছেলে বাবা ব'লে ডাকলে তোমাদের লজ্জা হয়, কিন্তু অন্যের ছেলে মা ব'লে ডাকলে আমাদের গর্ব বাড়ে। প্রাণ ভ'রে ওঠে।'

তারাশঙ্কর অসহিষ্ণুভাবে সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন। উমা বুঝবে না, উমাকে বোঝানো যাবে না। এ কেবল ছেলে নিয়ে ছেলেখেলা নয়, এ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এর নাম শিল্প। এর প্রতিটি শব্দে প্রতিটি অক্ষরে ব্যক্তিসত্তার স্বাক্ষর। অন্যের সৃষ্টি সেখানে অনাসৃষ্টি। ছেলে ! ছেলের জন্য কতটুকু যন্ত্রণা পেতে হয় উমাকে, তার চেয়ে লক্ষগুণ, কোটিগুণ যন্ত্রণা যে আর-একজনকে মুহূর্তে মুহূর্তে দগ্ধ করে তার স্বাদ উমার জানবার কথা নয়। উমা পারে অপছন্দ হ'লে তার ছেলেমেয়েদের টুক্‌রো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে, নিজেকে নিশ্চিহ্ন হ'তে দিতে ? সে সাধ্য উমার নেই। অতখানি নির্মম হবার ক্ষমতা নেই উমার। সৃষ্টির উপর এমন অপার্থিব মমতার অর্থও তাই তার অনধিগম্য।

পথ দিয়ে হাঁটছিলেন না তারাশঙ্কর, চিন্তাস্রোতে ভেসে চলেছিলেন। পিছন থেকে কার ডাকে চমক ভাঙল।

'ও মশাই শুনুন, শুনুন, দয়া ক'রে একটু দাঁড়ান। হাঁপানীর রোগী আমি, আর ছুটতে পারছি না

আপনার সঙ্গে।' হ্যারিকেন হাতে শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী ফের এসে হাজির হয়েছেন।

তারাশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তারাশঙ্কর রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'বলছেন কি আপনি! আপনাব সঙ্গে কেন যাব, কোথায় যাব?'

শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী বললেন, 'রাগ করবেন না মশাই। একবার কেন, আমি হাজারবার স্বীকার করছি আপনি তারাশঙ্কর বাঁড়ুয্যে। আসুন এবার, আমার মার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যান।'

তারাশঙ্কর বললেন, 'সে কি! আপনার মা-কে তো আমি চিনি না।'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'তা তো মশাই আমি মানলুম, আমি বুঝলুম, কিন্তু সে বুড়ীকে বোঝাবে কে। সে কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একেবারে অস্থির ক'রে তুলেছে। তার তারাকে আমিই নাকি ব'কে-ঝকে বাড়ির দোব-গোড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বিপদ দেখুন একবার! একবার এসে দেখা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যান আপনি আমাদের তারাশঙ্কব নন, নইলে আজ আর রক্ষা নেই, অমনি তো বিছানা থেকে উঠতে পারে না, এমন অস্থির হয়ে উঠলে আজ রাত্রেই হার্টফেল করবে।'

তারাশঙ্কর একমুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপব বললেন, 'আচ্ছা চলুন।'

যেতে যেতে শশাঙ্কবাবু বলতে লাগলেন, বলতে নেই মশাই, ছেলে হয়ে মার মৃত্যুকামনা করতে নেই, কিন্তু এখন ভগবান ওঁকে টেনে নিলে উনিও বাঁচতেন, আমরাও রক্ষা পেতাম। চোখ গেছে, কান গেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে, এখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি বলুন। এদিকে আমার নিজের যা অবস্থা। একটি পয়সা আব রোজগার নেই—।'

হ্যারিকেনটা দোরের বাইরে রেখে শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আসুন। ঘরের মধ্যে আবার আলো নেবার উপায় নেই, চোখে সহ্য হয় না।' তারপর শশাঙ্কবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'মা, ওমা, এই দেখ, সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি।'

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল, 'ভদ্দব লোকই তো, তোদের চেয়ে অনেক ভদ্দব। সে কথা আবার বলতে! আয় তারু, এখানে আয়।'

ঘরের মেঝেয় পুব-শিয়রী ক'রে বিছানা পাতা। তারাশঙ্কর জুতো খুলে সেই বিছানার এক পাশে গিয়ে বসলেন।

'হ্যাঁরে, জানিসই তো, তোর শশাঙ্ক-দা ওই রকম বদরাগী মানুষ। রোগেশোকে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে। তাই ব'লে তুই আমার সঙ্গে একটিবার দেখা না ক'রে অমন ক'রে চলে যাচ্ছিলি!'

তারাশ র হঠাৎ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

'চুপ ক'রে রইলি যে, এখনো বুঝি রাগ যায়নি? হ্যাঁরে, পিসীমার ওপরও তোর রাগ?'

তারাশঙ্করের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'না পিসীমা, তেমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই।'

পিসীমা স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'তাই বল্, তাই বল্, আমার ওপর তুই কি রাগ ক'রে থাকতে পারিস? পারবি না, চাইলেও পাববি না।'

পিসীমা তাবাশঙ্কবের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, 'ঈস্, কি রকম রোগা হয়ে গেছিস্! দেহের দেখি কিচ্ছু নেই, গলাটাও কি-বকম ভেঙেছে; সর্দিটর্দি করেছে নাকি? দেহের তো আর কোনো যত্ন নিবি না, দিনরাত কেবল লেখা আর লেখা, ছাইভস্ম ওসব লিকে কি হবে বল্ তো?'

তারাশঙ্কর একটু হাসলেন, 'কিছু না হ'লেও লিখে যেতে হয় পিসীমা, যদি কখনো কিছু হয়।'

কিছু হয় না। একথা কেবল পিসীমা নয়, আর দু'একজন বলেছেন। মনে মনে ভাবলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু আর দশজন আবার বলেছে, 'হয়েছে। খুসি হয়েছি।' তবু সেই দু'চার জনের নেতিবাদ যেন ভোলা যায় না, মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চিত্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এক অপরিচিতা বৃদ্ধার রোগশয্যায় বসে তারাশঙ্করের মনে হল, এই জ্বালার কোনো মানে নেই। তিনি তো জানেন, মানুষের রসবোধকে পীড়া দেওয়া তাকে হাতে ধ'রে মারার চেয়েও বাড়া। সেই পীড়া যদি কেউ পেয়ে থাকে তিনি শুধু দুঃখ বোধ করতে পারেন মাত্র। শুধু ভাবতে পারেন তাঁর সঙ্কেত আর একটি হৃদয়ের কাছে ব্যর্থ হল, একটি হৃদয়ের দ্বার খুলল না! দিতে গিয়ে তিনি দিতে পারলেন না এ দুঃখও যেমন, নিতে গিয়ে সে পেতে জানল না সে দুঃখও তেমনি।

পিসীমা বললেন, 'কি রে, কথা বলছিস না যে ? আচ্ছা, তুই কি তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেলি ? কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান ?'

তারাশঙ্কর বললেন, 'না পিসীমা, অভিমান অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। তবু একটা অবুঝ ছেলেমানুষ মানুষের মধ্যে বোধ হয় চিরকাল থেকে যায় পিসীমা, সে কিছুতেই মরতে চায় না।'

পিসীমা ব'লে উঠলেন, 'বালাই ষাট, ষাট, মরবি কেন, মরবি কেন। মরতে এসেছিস নাকি দুনিয়ায়। আমার মাথায় যত চুল তত পরমায়ু হোক। কথার ছিরি দেখ ছেলের ! ওমা, কথাই বলছি, এদিকে তুই যে শুকনো মুখে বসে আছিস সেদিকে খেয়ালই নেই। অ বউমা, দেখ তো দোভাজা চিঁড়ে আছে কি না ঘরে। আমার তারু চিঁড়ে নারকোল ভারি ভালোবাসে।'

তারাশঙ্কর এতক্ষণে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পেটের যা অবস্থা তাতে চিঁড়ে হজম করা শক্ত।

তারাশঙ্কর বললেন, 'না পিসীমা, চিঁড়ে-টিঁড়ে এখন থাক, পেটটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না ডাক্তারের বারণ আছে।'

পিসীমা একটু হাসলেন, 'হ্যাঁরে, কা'কে তুই কি দিয়ে ভোলাতে চাস্। ডাক্তারের বারণ না ছাই। এখন বড়লোক হয়েছিস, এখন পিসীমার হাতের চিঁড়ে-গুড় পছন্দ হবে কেন ! বেশ, চিঁড়ে না খাস, একটু চা-টা ক'রে দিক। হ্যাঁরে দূরে আছি ব'লে বুড়ো পিসীমাকে এমন ক'রেই দূর ক'রে দিতে হয় ? একবার ডাকা নেই, খোঁজা নেই—।'

তারাশঙ্করের নিজের পিসীমার কথা মনে পড়ল, নিজের দেশের বাড়িতেই আছেন পিসীমা। তারাশঙ্কর তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, চিঠিপত্র দেন, ঠিক এ ধরনের অভিযোগ পিসীমা মুখ ফুটে আর করেন না, কিন্তু তবু তাঁর মনের কথা তো আর বুঝতে বাকি থাকে না তারাশঙ্করের। তাঁর অভিমানও তো মাঝে মাঝে এমনি উত্তাল হয়ে ওঠে, 'এত দূরে স'রে গেলি।'

একথা মানতে চান না, দূরে যেতে হয়, দূরে যেতে দিতে হয়।

পিসীমা বলতে লাগলেন, 'কি-ই বা আছে, কি-ই বা দেবে তোর সামনে। সব আমার কপাল। এ ঘরে আমি ভুগি, ও ঘরে ছেলে, বউটা খেটে খেটে সারা। এমন মেয়ে আর হয় না। ছেলে বলে---বউয়ের নাম পাল্টে রাখ মা, ঘরে অন্ন নেই, বউয়ের নাম অন্নপূর্ণা ! ---আরে হতভাগা, সে দোষ কি বউয়ের ? ও মেয়েমানুষ, ও কি করবে।'

সেই সুন্দরী বধূটির নাম তাহলে অন্নপূর্ণা। ভারি পুরোন নাম। তবু তারাশঙ্কর এ নাম যেন অনেকদিন পরে নতুন ক'রে শুনলেন, কেন যেন অদ্ভুত ভালো লাগল।

কেবল নাম আর রূপ নয়, ভালো লাগল তার যত্ন আর বিনয়টুকুও। পাশের ঘরে হাতে-বোনা আসন পেতে সামনে সত্যি সত্যি দোভাজা চিঁড়ে আর অন্নপূর্ণা ধ'রে দিল না। দিলেও এখন যেন আর আপত্তি ছিল না তারাশঙ্করের। তবু খাবারটুকু তিনি আর নিলেন না, চায়ের কাপটিই শুধু টেনে নিয়ে বললেন, 'সত্যিই শরীরটা ভারি খারাপ।'

বিদায় দেবার সময় শশাঙ্ক চক্রবর্তী কৃতজ্ঞতা জানালেন, 'বাঁচালেন মশাই আপনি। নইলে সারারাত আজ এমনি অনর্থ করত— ? এখন বেশ আফিং খেয়ে ঘুমুবে।'

অন্নপূর্ণা হ্যারিকেন হাতে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্যন্ত এল, তারপর তারাশঙ্করের দিকে চেয়ে লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, 'মাপ করবেন, ভারি অভদ্রতা করেছিলাম, ভারি ভুল হয়েছিল। ঠিক চিনতে পারিনি।'

তারাশঙ্কর নমস্কার জানিয়ে মৃদু হাসলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'আমিই কি পেরেছি ?'

শশাঙ্ক চক্রবর্তী এগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তারাশঙ্কর অনেক ক'রে তাকে নিবৃত্ত ক'রে বললেন, 'কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি রোগী মানুষ, বিশ্রাম করুন গিয়ে, আমি বেশ চলে যেতে পারব। তা ছাড়া, এখন তো বেশ চাঁদ উঠে গেছে।'

খানিকটা গিয়ে আর একবার ফিরে তাকালেন তারাশঙ্কর। আকাশে চাঁদ থাকা সত্ত্বেও চৌকাঠের কাছে হ্যারিকেন হাতে অন্নপূর্ণা তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারাশঙ্কর প্রসন্ন মনে ফের সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। হ্যারিকেনের এই আলো কোন তারাশঙ্করের জন্য তা জেনে লাভ নেই, তা জানবার গরজ নেই তারাশঙ্করের। নাম যাক্, ব্যক্তিসত্তা

মুছে যাক, আলো জ্বললেই হল, আনন্দ পেলেই হল
আষাঢ় ১৩৫৭

ভুবন ডাক্তার

সপ্তাহ খানেক জ্বরে ভুগবার পর অন্নপথ্য করলাম। আর তার পরদিনই মাসীমাকে বললাম, 'আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দাও, আজই কলকাতা পাড়ি দেব।'

মাসীমা অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে, আজই যেতে চাস্, তুই কি ক্ষেপেছিস না কি কল্যাণ!'

বললাম, 'চাকরির ব্যাপার মাসীমা। না গেলেই চলবে না। যে ক'দিন ছুটি ছিল, তার অনেক বেশি কামাই হয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার এসেছেন অফিসে, কি হয় বলা যায় না।'

একথা শুনে মাসীমা নরম হলেন। ভদ্রলোকের ছেলের শরীর একটু দুর্বল থাকে থাক, কিন্তু চাকরিকে দুর্বল করলে চলে না।

মাসীমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাহ'লে আর তোমাকে আটকাব না বাবা। চাকরি-বাকরির যা বাজার শুনি আজকাল। দুর্গা দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড় তাহ'লে। সাবধানমত যেয়ো, আর গিয়েই একটা পৌঁছ-সংবাদ দিয়ো।' তারপর একটু থেমে ফের বললেন, 'ভালো কথা, যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবিনে? বুড়ো তায় বামুন, একটা প্রণাম ক'রে যাওয়াই তো ভালো, আশীর্বাদ করবেন।'

ঠিক। এতক্ষণে একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মাসীমা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা অবশ্যই দরকার। আশীর্বাদের জন্যে নয়, তাঁর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটখানার জন্যে।

ফরিদপুর জেলার এই কাসিমপুর গ্রামে দু'চার বিঘে জমি আমাদের এখনও আছে। তা কোনদিনই ভোগে আসে না। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ভাবছি ছাড়িয়ে দিয়ে আসব। কিন্তু যাই যাই ক'রে আর যাওয়া হয়নি। এবার হাত-টানাটানিটা একটু বেশি হওয়ায় মরিয়া হয়ে ছুটি নিলাম অফিস থেকে। ভাবলাম যা হয় একটা কিছু ক'রে আসব। কিন্তু এসে বিশেষ কিছু লাভ হল না। জমির দর নেই, খদ্দের নেই। তাছাড়া মাসীমার মোটেই ইচ্ছে নেই আমরা জমি বিক্রি করি। তিনি বললেন, 'তাহ'লে আমার আর এখানে থাকা চলে না। জমি তো আর কামড়াচ্ছে না যে, মাটির দরে সোনা বিলিয়ে দিবি। আছে থাক না।'

মাসীমাকে বললাম না, কিসে কামড়াচ্ছে। তবু কোথায় কি আছে না আছে দেখবার জন্যে দু'একদিন বেরুতে হ'ল। ফলে কার্তিক মাসের রোদ লাগল মাথায়। খালের জলটাও সহ্য হ'ল না। তৃতীয় দিনে একেবারে পুরোপুরি বিছানা নিলাম। দিন দুই যাওয়ার পরও যখন জ্বর গেল না, মাসীমা বললেন, 'ও-পাড়ার ভুবন ডাক্তারকেই ডাকি। অবশ্য সাধারণ জ্বর-জ্বারিতে আমাদের মধু কম্পাউণ্ডারও মন্দ নয়। কিন্তু তার দরকার নেই বাপু। শহরের বড় বড় ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া নাড়ী তোমাদের, মধুর ও ওষুধ যদি না ধরে, মুশকিলে পড়ব। বড় ডাক্তার দেখানই ভালো।'

বললাম, 'ভুবন ডাক্তার বুঝি খুব বড় ডাক্তার তোমাদের?'

মাসীমা বললেন, 'বড় না? সেকালকার দিনের এম. বি. পাস। বিলেত যাওয়ার পর্যন্ত কথা উঠেছিল, যাননি। চমৎকার ডাক্তার, ওষুধ একেবারে ধন্বন্তরী। আর গরীব দুঃখীর ওপর খুব টান। নিজের বাড়িতে হাসপাতাল করেছেন। বিনা পয়সায় ওষুধপথ্য দেন। এ-মুল্লুকে এমন লোক নেই যে ভুবন ডাক্তারের নাম না জানে, গুণ না গায়।'

সুতরাং ভুবন ডাক্তারকেই ডাকা হ'ল। জ্বরের ঘোরে দেখলাম একবার চেহারাটা। প্রায় ছ' ফুট লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রং গৌর। গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথার চুল সব পেকে গেছে। কিন্তু দাঁত দু'তিনটির বেশি পড়েছে ব'লে মনে হ'ল না। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। গলায় সাদা ধবধবে পৈতা দেখা যাচ্ছে, ওপরে কুচকুচে কালো স্টেথোস্কোপ।

মাসীমাই রোগের বিবরণ সব বললেন। ডাক্তার খানিকটা শুনলেন, খানিকটা শুনলেন না। একবার নাড়ীটা একটু ধরলেন। তারপর বললেন, 'জিভটা বার করুন তো।' করলাম। দেখে নিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর আচমকা পেটে এক খোঁচা দিয়ে বললেন, 'ব্যথা লাগে?'

পেটে কোন ব্যথা ছিল না, কিন্তু খোঁচায় যে সত্যিই ব্যথা পেয়েছি সেকথা আর তাঁকে বলি কি'রে?

বারান্দায় গিয়ে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভাববেন না। আপনার চাকরকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দেবেন আমার ডিসপেনসারিতে। ওষুধ নিয়ে আসবে।'

খসখস ক'রে একটা কাগজে গোটা কতক ওষুধের নাম আর মাত্রা লিখলেন। তারপর চার টাকা ভিজিট নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিদায় হলেন।

মাঝখানে আরো একদিন এসেছিলেন। সেদিনের বিবরণও ওই আগের দিনের মতই।

মাসীমার চাকরটি মুসলমান। বয়স বছর তের' চৌদ্দ। নাম কলম। নিজে কোনদিন কলম ধরেনি। কিন্তু লগি বৈঠায় খুব ওস্তাদ।

ডিঙি নৌকোয় গেলাম ভুবন ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। আশীর্বাদ সহ মেডিক্যাল সার্টিফিকেটখানা নিয়ে আসব—এও ছিল বাসনা।

ছোট ছোট খাল গেছে এঁকে বেঁকে। একটা থেকে একটা, তার থেকে আর একটা। দুই দিকে ঝোপ। কোথাও বা বাঁশের ঝাড়, সুপারির বাগান, গাব, শ্যাওড়া আর আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ক'রে বাড়ি, ঘরগুলি তালাবন্ধ। কলম হেসে বুঝিয়ে দিল, 'হিন্দুরা ভয় পায়া পলাইয়াছে।'

আমাদের আগে পিছে অনেকগুলি ডিঙি নৌকো। কোনটিতে পাটি, কোনটিতে হোগলা আর কোনটিতে শুধু একখানা কাপড় কি কাঁথা দিয়ে ছইয়ের আব্রু তৈরী করা হয়েছে। ভিতরে রোগিণী, আর গলুইতে লুঙ্গিপরা হুকো হাতে তার বাবা, কি স্বামী, কি ভাই। আর এক হাতে বৈঠা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় চলেছে ওরা?'

কলম বলল, 'আবার কোথায়, ভুবন ডাক্তারের বাড়ি। অনেক দূর দূরগুণা সব রুগীরা আসে।'

খানিক বাদে ভুবন ডাক্তারের বাড়িতে আমরাও পৌঁছলাম, কিন্তু নৌকো ভিড়বার জায়গা নেই ঘাটে। শুধু ঘাট নয়, বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট কালো কালো সব ডিঙি নৌকো। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের গঞ্জগুলিতে যেমন হাট মেলে এও প্রায় তেমনি।

অনেক কষ্টে এক জায়গায় নৌকো ভিড়াল কলম। গলুইর ওপর থেকে একটু লাফিয়ে ডাঙায় নামলাম।

বেশ বড় বাড়ি। উত্তরের ভিটের পুরোন একতলা একটা দালান। আর তিনদিকে ঘিরে আটচালা ছনের ঘর। মাঝামাঝি একটা জায়গায় সাইনবোর্ড আঁটা। লেখা আছে—'নুরুন্নেসা হাসপাতাল'।

মুখুয্যে বাড়ির হাসপাতালের নাম নুরুন্নেসা। ব্যাপারটা কি! পাকিস্তান-সরকারের প্রীতি আর বিশ্বাস অর্জনের জন্যেই কি মুখুয্যে মশাইর এই নাম-নির্বাচন? কিন্তু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার তারিখ দেখছি তেরশ আটত্রিশ সাল। পাকিস্তান হওয়ার প্রায় ষোল বছর আগে। ভুবন ডাক্তারের দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাইরের দিকের একটা ঘরে ভুবনবাবু তাঁর আউট ডোর পেশেণ্টদের দেখছিলেন, আমি গিয়ে হাজির হলাম। ডাক্তারবাবুর লক্ষ্যই নেই। আমি নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ডাক্তারবাবু একবার তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো আছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু ফের তাঁর রোগীদের নিয়ে পড়লেন, রোগ নির্ণয়ের প্রায় একই রকম প্রকরণ। কারো ম্যালেরিয়া, কারো কালাজ্বর, কারো অন্য কিছু।

আধ ঘণ্টাখানেক বসে থেকে, আমি এবার একটু বিরক্ত হলাম। ভালো থাকলেই যে লোকের

আর কোন কথা থাকবে না, তার কি মানে আছে ?

ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একটু চড়া গলায় বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আমি আজ চলে যাচ্ছি।'

আর একজন রোগীর নাড়ী টিপে ধ'রে ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো।'

বললাম, 'আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট খানার জন্যে এসেছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সর্টিফিকেট আবার কিসের ?'

অবাক হলাম। সার্টিফিকেট কিসের মানে ? ভিজিট আর ওষুধের দাম কিছুই তো বাকি রাখিনি ? সার্টিফিকেটের জন্যে কি আরো টাকা আদায় করেন নাকি ইনি ?

অপ্রসন্নভাবে দু'টাকার একখানা পাকিস্তানী নোট ওঁর টেবিলে রাখলাম। যদি আপত্তি করেন, তখন না হয় আরো দুটো টাকা দেওয়া যাবে। কিন্তু আগে না।

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, 'টাকা কিসের ?' বললাম, 'ওষুধের দাম সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এ আপনার সার্টিফিকেটের টাকা। দু'টাকায় হবে, না কি পুরো চার টাকাই লাগবে ?'

হঠাৎ ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি ভেবেছ কি ? আমি টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট দিই ? এত স্পর্ধা তোমার ? আমার বাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে অপমান কর ! তোমার এত সাহস !'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন মুসলমান আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, 'কেডা আপনারে অপমান করবে, ডাক্তারবাবু, মানুষডা কেডা ? মুহের কথাডা খসায়ন আপনে। মাথাডা খসাইয়া থুই।'

ডাক্তারবাবু হাতের ইশারায় তাদের স'রে যেতে বললেন। তারপর আমার দেওয়া নোটখানা জোরে উঠানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, বেরোও এখান থেকে। সার্টিফিকেট আমি দিই না, কাউকে দিই না। যাও, চলে যাও।'

আমি উঠানে নেমে বললাম, 'বেশ না দিতে চান সেটা ভদ্রভাবে বললেই হত। কিন্তু বাড়িব ওপর পেয়ে যে অপমানটা মিছামিছি আপনি করলেন, আমি তা সহজে ভুলব ব'লে মনে করবেন না। যাওয়ার সময় থানায় রিপোর্ট ক'রে যাব। তাতে কিছু না হয় ঢাকা করাচী কোন জায়গা বাদ রাখব না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'যাও, যাও, থানা পুলিশ আমার খুব দেখা আছে।'

কলমকে নিয়ে ফের আমাদের সেই ডিঙি নৌকোয় উঠলাম। মাত্র খানিকটা এগিয়েছি, দু' তিন খানা নৌকো আমাদের ঘিরে ধবল, 'ডাক্তারবাবু নিয়া যাইতে কইছে আপনারে।'

কলম ভয় পেয়ে বলল, 'কাম সারা, কয়েদ কইরা রাখবে। গুম কইরা ফেলবে একেবারে।'

ভয় আমিও যে না পেয়েছি তা নয়, তবু ফিরতেই হ'ল।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ডাক্তারবাবু ঘাটের কাছে হাতজোড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'আমাকে মাফ্ করবেন ! বুড়ো মানুষ, রাগের বশে কি ব'লে ফেলেছি কিছু ঠিক নেই। কিছু মনে করবেন না। আসুন, ওপরে আসনু।'

মনে মনে ভাবলাম থানা পুলিশের কথাটায় কাজ হয়েছে তা'হলে, তাতে না হোক ঢাকা করাচীর দোহাইতে হয়েছে।

বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আজই কলকাতা রওয়ানা হব।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিন্তু আজ তো আপনি আর লঞ্চ ধরতে পারবেন না। আপনাকে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

নৌকো থেকে নামলাম। তিনি আমাকে তাঁব দালানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে তখন বলিনি। সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' গলায় একটু যেন করুণ সুর বাজল।

চুপ করে রইলাম। আমি এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম। ডাক্তারবাবু নিজেই সার্টিফিকেট পান নি। পাড়াগাঁয়ে শুধু হাত-যশেই কাজ চলে যাচ্ছে।

বললাম, 'কটা চান্স নিয়েছিলেন ? একটা, না দুটো ?'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন 'আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাশ করতে পারি নি, তা নয়, পাশ করেছিলাম, ভালো পাশের সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। কিন্তু তা রাখতে পারি নি।'

একটু চুপ ক'রে রইলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হঠাৎ বললেন,'অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনি আমার এখানে আজ এবেলার অতিথি। দুটি ডাল ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি আপত্তি ক'রে বললাম 'না না, সেকি! মাসীমা চিন্তায় থাকবেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না। নাস্তা দিয়ে আমি আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে গিয়ে সব খবর দেবে।'

দালানের ভিতরে ঢুকলাম। অনেক দিনের পুরোন বাড়ি। দরজার উপরে ডাক্তারবাবুর বাবা-মার বাঁধানো ফটো। চেহারার মিল দেখে অনুমান করলাম।

মাঝখানের একটা কামরায় ঢুকে ডাক্তারবাবু স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন, 'ওগো, শোন, এদিকে এসো। আরে, এ আমাদের ছেলের মত। এর কাছে আবার লজ্জা কি! ও পাড়ার বোস-ঠাকরুণের বোনপো। কি যেন নাম বলেছিলেন সেদিন?'

'কল্যাণকুমার রায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ; কল্যাণ, কল্যাণ। আর বলবেন না মশাই, পরম অকল্যাণ ঘটিয়ে ফেলেছিলাম আর একটু হ'লে। মেজাজটা আর ঠিক হ'ল না।'

একটি মহিলা এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন। চওড়াপেড়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি পরনে। গায়ে সামান্য দু' একখানা গয়না। মাথায় আঁচল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। রঙ কালো। মুখের ডৌলও সুন্দর বলা যায় না। তবে ডাক্তারবাবুর তুলনায় বয়স অনেক কম ব'লেই মনে হ'ল। চল্লিশের বেশি হবে না।

মহিলাটি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু আগে অত চেঁচেমেচি করছিলে কেন?' স্বর মৃদু কিন্তু মিষ্টি।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর বলনা, আজ একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। স্বভাবটা আর শোধরাতে পারলাম না।'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটু হাসলেন, 'আর কবে পারবে?'

একথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কল্যাণবাবু আজ আমাদের অতিথি। আমি ওঁকে কেবল তেতো তেতো ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়েছি, তুমি একটু পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা কোরো। আমি যাই, রোগীরা সব বসে আছে।'

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু মশাই আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না! আমার ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে।'

ব'লে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমার সঙ্গে আরো দু' একটা কথা ব'লে ভিতরে চলে গেলেন। আমি ওঁদের বসবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খানিকক্ষণ ডাকের বাসী খবরের কাগজ ওলটালাম। কাচের আলমারী ভরা যে সব বই দেখলাম তার সবই চিকিৎসাশাস্ত্র। ম্যাগাজিনগুলিও তাই।

একটু বাদে ফের এলেন মহিলাটি। নিজেই চা বানিয়ে এনেছেন।

খুশি হয়ে বললাম, 'আপনি নিলেন না?'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমরা নিজেরা কেউ চা খাইনে।'

খানিক বাদে স্নানাহার সেরে নিতে হ'ল। একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল ফের সেই বিকেল পাঁচটায়। ছোট গড়গড়াটা হাতে নিয়ে তিনিই আমাকে ডেকে তুললেন, বললেন, 'উঠুন। কার্তিক মাসের দিনে এত ঘুম ভালো নয়, মাথা ধরবে।'

আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এসে আমার সামনে। হেলান দিয়ে নয়, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে স্থির হয়ে বসলেন। আমি ইঁদারার জলে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। তারপর ফের এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম ওঁর গল্প। ভুবন ডাক্তারের সার্টিফিকেট হারাবার কাহিনী। সে কাহিনী ডাক্তারবাবু নিজের মুখে উত্তমপুরুষে বলেছিলেন, ফরিদপুরের ভাষায়। কিন্তু কলমের মুখে তাঁর

কথাগুলিকে ঠিক ঠিক তুলে দিলে নানা অসুবিধে হবে ভেবে আমি কেবল তাঁর কথিত বস্তুটিকেই ধ'রে দিলাম।

মেডিসিনে গোল্ড মেডাল নিয়ে ভুবনমোহন যখন মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুল তখন তার বয়স ছাব্বিশ। তখনও নামের সঙ্গে চেহারার বেশ মিল। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, টানা টানা নাক চোখ। মাথায় ঘন কালো চুল। ঠোঁটের ওপর সুন্দর সুকৃষ্ণ একটি গোঁফ। কিন্তু মুখে স্বাভাবিক, প্রসন্ন হাসিটুকু নেই। কারণ মাস তিনেক আগে বাবা মারা গেছেন। আর মাত্র অল্প ক'দিনের জন্যে তিনি ভুবনের সাফল্যের খবরটুকু শুনে যেতে পারলেন না। অথচ এই দিনটির জন্যে তিনি ছ' বছর ধ'রে অপেক্ষা করেছেন। শুধু ছ' বছর কেন, ষোল বছরও বলা যায়। ভুবনের স্কুলের গোড়ার ক্লাসগুলি থেকেই তাঁর সেই প্রতীক্ষা। তখন থেকেই তিনি ভুবনকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আচ্ছা বলতো খোকা, বড় হয়ে কি হবে তুমি? জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার—কি হ'তে চাও বল।'

বাবার ইচ্ছে যে ডাক্তার হওয়া, তা তিনি আগেই ব'লে রেখেছিলেন। তবু জজ, ম্যাজিস্ট্রেট শব্দগুলির দিকে মাঝে মাঝে লোভ যেত ভুবনের। রোজই কি আর এক ডাক্তার হ'তে ভালো লাগে!

কিন্তু পরে যখন আরো বড় হল, বাবার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে একেবারে মুদ্রিত হয়ে গেল। না, ডাক্তার ছাড়া ভুবন আর কিছু হবে না। ডাক্তার—বড় ডাক্তার।

জমিদার বাড়ির চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির সাধারণ একজনকম্পাউণ্ডারেরছেলের বড় ডাক্তার হওয়া বড় সোজা ব্যাপার নয়। এই নিয়ে ভুজঙ্গমোহনকে পাড়া-প্রতিবেশী সহকর্মীদের কাছে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। গোড়ার দিকে ভুবনের স্টাইপেণ্ডের টাকায় কিছু কিছু এগিয়ে গেলেও ভুজঙ্গমোহনকে পরে অনেকের কাছে হাত পাততে হয়েছে, অনেক রকম সাহায্য নিতে হয়েছে। ধার-দেনাও কম হয় নি। সে ধার যে শুধু হাতে জুটেছে তা নয়। সামান্য যা কিছু জোত জমি ছিল, যে ক'খানা গয়না ছিল স্ত্রীর গায়ে, সব বন্ধক পড়েছে, সব কিছুর বদলে এই সোনার মেডাল। তবু এই মেডাল দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না ভেবে মনে মনে বিমর্ষ হ'ল ভুবন।

মা লিখেছেন, ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসবে। কিন্তু তার আগে আরো একজনকে মেডালটা দেখিয়ে আসা দরকার। প্রীতিলতাকে। ব্যারিস্টার নগেন বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রীতিলতা। বেথুন কলেজ থেকে গতবার বি. এ. পাস করেছে।

তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে বাবাই এক দিন নিয়ে গিয়েছিলেন ভুবনকে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সে বাড়িতে দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর দরিদ্র ছাত্র হিসাবে ভুবন বছর দুই স্থানও পেয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। তারপর মেডিক্যাল মেসে এসে আশ্রয় নেয় ভুবন। কারণ, তাকে বেশি দিন নিজের বাড়িতে রাখা নগেনবাবু যে পছন্দ করছেন না, তা ভুবন টের পেয়েছিল। আর টের পাওয়ার পর সেখানে থাকাটা নিজের সম্মান-রক্ষার পক্ষে মোটেই তার অনুকূল মনে হয় নি, তবু যাতায়াত দেখাশোনা মাঝে মাঝে, এমন কি, সপ্তাহে সপ্তাহে চলেছে। বাড়ির অন্য সব যুবক আগন্তুকদের তুলনায় ভুবনের ওপরই যে প্রীতির পক্ষপাতিত্ব বেশি, তাও কারো অজানা থাকে নি।

ভুবনের মেডাল দেখে প্রীতির বাবা-মা খুব খুশির ভাব দেখালেন। কিন্তু প্রীতির খুশিটা নিজের চোখে দেখল ভুবন।

একটা নির্জন ঘরে প্রীতি ভুবনকে ইশারা ক'রে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর বলল, 'কই, দেখি কি মেডাল পেয়েছ?'

ভুবন স্মিতমুখে মেডালটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে। প্রীতি তার সুন্দর ছোট মুঠির মধ্যে মেডালটাকে লুকিয়ে বলল, 'যদি আর না দিই?'

ভুবন বলল, 'আমিও তো তা-ই চাই। ওটা তোমার কাছেই থাকুক।'

আলাপে ব্যাঘাত ঘটল। দোর ঠেলে আর একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকল, 'প্রেটি, তুমি এখানে? আর আমি সারা বাড়ি ভ'রে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

অরুণ চক্রবর্তী বিলেত থেকে সদ্য ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এসেছে। হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। কিন্তু

সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা ওর বাবার খান দুই বাড়ি আছে কলকাতা শহরে, আর ব্যাঙ্কে টাকা। প্রীতিদের চাইতে আর্থিক আভিজাত্যে ওরা অনেক বড়। তবু যে প্রীতির ওপর তার হৃদয় এতখানি উন্মুখ হয়ে উঠেছে, প্রীতির বাবার ধারণা, তা শুধু অরুণের সহৃদয়তার জন্যেই। নইলে ওদের সমাজে প্রীতির মত অমন শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের তো অভাব নেই!

ভুবনকে দেখে অরুণ 'সরি' বলে ভদ্রতার ভান ক'রে চলে আসছিল, প্রীতিই তাকে ডাকল, 'দেখ, ভুবন কেমন সুন্দর একখানা মেডাল পেয়েছে।'

অরুণ বলল, 'তাই নাকি! কিন্তু বিষয়টা তোমার কাছে যেমন নতুন লাগছে, আমার কাছে তেমন মনে হচ্ছে না। বছর বছর ছাত্রেরা অমন অনেকগুলি ক'রে মেডাল পায়। ছাত্র বয়েসে আমিও কম পাইনি।'

ব'লে অরুণ বেরিয়ে আসছিল, মেডালটা তাড়াতাড়ি ভুবনের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রীতি বেরিয়ে এল তার পিছনে পিছনে। অরুণকে চটাতে তার সাহস নেই। তাতে বাবা চটবেন।

ভুবন সবই বুঝল। অলক্ষ্যে এক সময় বেরিয়ে এল ব্যারিস্টারের বাড়ি থেকে। এক মুহূর্তও তার আর কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে রইল না।

তবু মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে ফের আসতে হ'ল কলকাতায়। মেডিক্যাল কলেজে হাউস সার্জন থাকতে হবে মাস কয়েক। ছ' মাসের জায়গায় বছর খানেক রইল। আরো ক'বার ঘোরাঘুরি করল ভবানীপুরে। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। প্রীতির বাবা-মা অরুণের পক্ষে। প্রীতির যুক্তি-বুদ্ধির সায়ও সেই দিকে। শুধু অবুঝ মন মাঝে মাঝে একটু কেমন কেমন করে। কিন্তু সেই কেমন করার ওপর আর কতখানি নির্ভর করা যায়!

তবু প্রীতি একদিন ভুবনকে ডেকে বলল, 'তুমি একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পারো না? বাবা বলছিলেন, শুধু এখানকার একটা সার্টিফিকেটের কী মূল্য আছে?'

বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন ভুবনের মনেও ছিল। সরকারী বৃত্তিটা যাতে জোটানো যায়, তার জন্যে চেষ্টা-চরিত্র কম চলছিল না। অধ্যাপকেরা যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন। কিন্তু প্রীতির কথার ভঙ্গিতে ভুবনের মন বেঁকে দাঁড়াল, রূঢ়স্বরে বলল, 'তোমার বাবার মতামতটা আমার কাছে খুব মূল্যবান নয়। তুমি নিজে কি বল?'

প্রীতি বলল, 'কেন, বাবা কি এমন অন্যায় বলেছেন? বাইরের ডিগ্রী ছাড়া প্রেস্টিজ বাড়ে নাকি?'

ভুবন জবাব দিল, 'বাইরে যদি যাই, প্রেস্টিজের লোভে যাব না, শিক্ষার জন্যেই যাব। তোমার বাবাকে ব'লে দিয়ো কথাটা।'

প্রীতি না বললেও কথাটা তার বাবার কানে গেল। তিনি মুখ গম্ভীর ক'রে মনে মনে সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেললেন।

কি একটা কারণে বৃত্তিটা ভুবনের হাত থেকে ফসকে গেল। অরুণের সঙ্গে প্রীতির এনগেজমেন্টের খবরটা যথাকালে ভুবনের কাছে পৌঁছল। এত তাড়াতাড়ি এসব ঘটবার কোন কথা ছিল না। প্রীতির বাবার জেদের জন্যেই যে এমন হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু প্রীতিকেও ভুবন ক্ষমা করতে পারল না। প্রীতির কি বয়স হয়নি, সে কি লেখাপড়া শেখেনি? তার কি কোন স্বাধীন মতামত নেই? সে কি তার বাবার হাতের একটি রঙীন খেলনা? স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মত তাদের ওই ছোট সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াবার জন্যেই কি তার সৃষ্টি? এতদিনের এত প্রতিশ্রুতি, এত আশ্বাস, এত বৈপ্লবিক কল্পনা, বাঁধ ভেঙে বেরুবার এত সাধ—সব এত সহজে মিথ্যে হয়ে গেল? এতদিন ধ'রে প্রীতি কি তার সঙ্গে শুধু ছলনা করেছে? সমস্ত মেয়েজাতটার ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষে মন ভ'রে উঠল ভুবনমোহনের। কলকাতা শহরটাকে মনে হল রসহীন রঙহীন ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া আরব্য মরুভূমি। কোথাও কোন জায়গায় মরুদ্যানের চিহ্নমাত্রই নেই।

আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার বাবার উপদেশের কথা। 'পাশ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে শহরে থেকো না, গাঁয়ে চলে এসো। শহরে তো ডাক্তার কবরেজের অভাব নেই। কিন্তু বিশ পঁচিশ

গ্রাম খুঁজলেও একজন বড় ডাক্তার বের করা যাবে না। সবাই আমার মত কম্পাউণ্ডার, আর না হয় হাতুড়ে। শহরে কে কাকে চেনে? কিন্তু এখানে একবার পশার জমিয়ে বসতে পারলে দেশ সুদ্ধু নাম-যশ ছড়িয়ে পড়বে। লোকে বলবে ভুজঙ্গ মুখুয্যের ছেলে যাচ্ছে। তা ছাড়া গাঁয়ের গরীব-দুঃখীর উপকারও করা হবে। এত কষ্ট এত পরিশ্রম বৃথা যাবে না। ধর্মও হবে, অর্থও হবে। মুখ উজ্জ্বল হবে পিতৃপুরুষের।'

মনে মনে অনুতাপ হ'ল ভুবনের। সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লেই তার ভাগ্যে এই দুঃখ, এই বঞ্চনা। সঙ্কল্পের কথা বন্ধুদের জানাল ভুবন, 'এখানে আর নয়। আমি গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি।'

বন্ধুরা হেসে উঠল—'বল কি হে! পাগল না মাথা খারাপ, শহরে বর্তমান না থাকলেও ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু গ্রামে গেলে যে ভূত হয়ে যাবে। এখানে ব্যারিষ্টার-কন্যা না জুটুক উকিল-মুহুরীর কন্যাদের নেহাত অভাব হবে না। কিন্তু গ্রামে নোলক-পরা পাঁচী-পদী ছাড়া যে কিছু জুটবে না কপালে।'

বন্ধুদের প্রগলভ পরিহাসে কান না দিয়ে মন স্থির ক'রে ফেলল ভুবন। সোজা চলে এল গ্রামে। মাকে বলল, 'আমি এখন থেকে এখানেই থাকব। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে ডিসপেনসারি খুলব, মা। বাবারও সেই ইচ্ছেই ছিল।'

মা বললেন, 'কিন্তু এখানে কি কেউ তোকে ডাকবে? মান মর্যাদা দেবে কেউ? অন্ততঃ একটা মহকুমা শহর টহরে—'

ভুবন মাথা নেড়ে বলল, 'না শহরেও না, মহকুমাতেও নয়। হয় এখানে, না হয় কলকাতায়।'

মা একটু চিন্তা ক'রে বললেন, 'আচ্ছা, তাহ'লে এখানেই বোস। যে কদিন আছি, থাক আমার চোখের সামনে। বড়লোক হওয়া আমাদের কপালে নেই, তা আমরা হবও না। মায়ে পোয়ে কাছাকাছি যদি থাকতে পারি সেই ভালো। এখন দেখে শুনে একটা বিয়ে থা কব।' বিরক্ত হয়ে ভুবন ধমক দিল মাকে, 'ও সব কথা বাদ দাও, ও সব কথা পরে হবে।'

কিন্তু আদর্শের অনুসরণ কল্পনায় যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবে তেমন হ'ল না। পাড়াপড়শীরা, চাটুয্যেরা, বাঁড়ুয্যেরা, দত্তেরা, চৌধুরীরা সবাই কানাঘুষা করতে লাগল—কলকাতায় ডিসপেনসারি দিয়ে বসবার পয়সা জুটছে না বলেই ভুবনের এই দেশপ্রীতি। তা ছাড়া শুধু কি কাগজে কলমে ভালো ছেলে হলেই হয়, ডাক্তারীটা হাতে-কলমের বিদ্যে। পশার জমাতে হ'লে সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, ক্ষমতা চাই আলাদা জাতের।

বছর খানেক কেটে গেল। এর মধ্যে দু' চারটি ছাড়া কল পেল না ভুবন। তাও পুরো ভিজিট আদায় হ'ল না। ও পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তার নন্দ দাস ঠিক আগের মতই আসর জাঁকিয়ে রইল। বন্ধকী জমিগুলি একটার পর একটা বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সবই ভাগ্য! এবার কি একটা চাকরি-বাকরি খুঁজবি! সরকারী হাসপাতালগুলিতে দেখবি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে?'

ভুবন গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখি ভেবে।'

কিন্তু ভাববার অবকাশই কি সব সময় মেলে? রোগীহীন শূন্য ডিসপেনসারিতে ভুবন সেদিন আগাগোড়া ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিল, ফতুয়া গায়ে, কপালে তিলক-কাটা, পাশের গাঁয়ের হরিচরণ কুণ্ডু এসে হাজির হল, 'এই যে বাবাজী, বাড়িতেই আছ দেখছি।'

ভুবন বলল, 'হ্যাঁ, কলে এখনো বেরুই নি। তা কি ব্যাপার কুণ্ডু মশাই? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে না কি?'

হরিচরণ বলল, 'না বাবাজী, মহাপ্রভুর কৃপায় দেহ সকলের সুস্থই আছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই।'

ভুবন বলল, 'কেন বলুন তো?'

হরিচরণ বলল, 'না, বাবাজী, মহাপ্রভুর পত্র একেবারে বন্ধ হয়ে গেল যে। এই তো সেদিন ফতেপুরের কাছে লবণের নৌকোটা অমন ক'রে ডুবে গেল। যাকে বলে একেবারে ঘাট এসে ভরাডুবি। একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি বাবাজী। আমার টাকা ক'টা এবার ফেলে দাও। আর তো দেরি

করতে পারিনে। তা হ'লে উপোস ক'রে মরব।'

তার পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে এই মহাজনের কাছ থেকেও শ' পাঁচেক টাকা ভুবনের বাবা এক সময় ধার নিয়েছিলেন। ভুবনের হিসেব মত তার শ' তিনেক টাকা শোধ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু হরিচরণ বলে, সে সব গেছে সুদের থেকে। আসলটা পুরোপুরিই রয়ে গেছে। টাকাটা তো আর কম দিন ফেলে রাখেনি হরিচরণ! ভুবন বলল, 'আচ্ছা, আজ তো যান আপনি।'

হরিচরণ বলল, 'আজ যাচ্ছি। কাল বাদে পরশু দিনই কিন্তু আমি আবার আসব। তুমি এর মধ্যে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা রেখো। না হ'লে আমি আর পারব না।'

ভুবন বলল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

টেবিলের ওপর পা তুলে আর গালে হাত দিয়ে ফেব ভাবতে বসল ভুবন। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারল না, বিটের পিওন এসে ডেকে তুলল, 'ঘুমুচ্ছেন নাকি ডাক্তার বাবু? চিঠি আছে আপনার।'

খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে রঙীন চিঠিখানা বের করল ভুবন। দার্জিলিং থেকে প্রীতি লিখেছে, 'অরুণকে যত অনুদার ভেবেছিলাম আসলে সে তা নয়। বিয়ের পর থেকে সে প্রায়ই বলছে তোমার কথা। বিশেষ ক'রে এখানে এসে সে রোজই তোমাকে আসতে বলছে। এই চিঠিও তার অনুরোধেই লেখা। সত্যি, ক'দিনের জন্যে এসোনা এখানে? আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে না হয় ক'দিন থাকলেই বা। দোষ কি? যা ঘটে গেছে তা তো ঘটে গেছে। ব্যাপারটাকে Sportsman-এর মত নেওয়াই ভালো। জীবনে খেলার মাঠে গেলে না। এবাব জীবনটাকেই খেলার মাঠ হিসেবে দেখতে শেখ।

আব একটা কথা। গাঁয়ে গিয়ে অমন ক'বে অজ্ঞাতবাস করছ কেন? কেন জীবনটাকে নষ্ট করছ? লোকে বলে নাকি আমার জন্যেই। ছি ছি ছি! আমি লজ্জায় আর বাঁচিনে। পুরুষ মানুষের কি এমন আত্মহত্যা সাজে! সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় যাও। আর তার আগে এসো এই দার্জিলিংএ। দেখ এসে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্যোদয়। মনের সব অন্ধকার ঘুচবে।

কোন রকমে গাড়ি-ভাড়াটা জুটিযে চলে এসো। আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না।'

চিঠিটা মুচড়ে ঘরের কোণে ফেলে দিল ভুবন।

তবু তাব প্রত্যেকটা লাইন যেন ছুঁচ হয়ে বিঁধতে লাগল ভুবনের গায়ে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যুক্তি ক'বে নিশ্চয়ই এই চিঠি লিখেছে। ভুবনকে উপহাস করার জন্য, তাকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই প্রীতিব এই চেষ্টা। আত্মহত্যা! বয়ে গেছে ভুবনের তার জন্যে আত্মহত্যা করতে। বরং প্রীতিকে যদি সে সামনে পেত একবার, নাবীহত্যা ক'বে দেখত হাতেব সুখ মিটিয়ে। হ্যাঁ, প্রীতিকে সামনে পেলে সে নিশ্চয়ই হত্যা কবত। শোধ নিত সব জ্বালার, সব অপমানের।

দুপুর গেল, বিকেল গেল, উতরে গেল সন্ধ্যে; অশান্তি আর অস্বস্তি যেন আর কাটে না ভুবনের। দু'খানা মুখ কখনো পর পর, কখনো পাশাপাশি ভেসে উঠতে লাগল ভুবনের চোখের সামনে। হরিচরণ কুণ্ডু আর প্রীতি। এখন প্রীতিলতা চক্রবর্তী। মুখের আদল একজনের গোল, একজনের লম্বা। কিন্তু ভিতরটা একরকম, দুজনেই শঠ, দুজনেই শয়তান। ওদের দুজনের বিয়ে হ'লে বেশ হত। সেই অপূর্ব মিলনদৃশ্যটা কল্পনা ক'রে নিজের মনেই হেসে উঠল ভুবন ডাক্তার।

আর একটু বাদেই দেখা মিলল তৃতীয় একখানা মুখের। ঘন কালো চাপ দাড়িতে সে মুখ আচ্ছন্ন, তবু তার হিংস্রতা যেন একটুও চাপা পড়েনি। একটা চোখ না থাকায় সে মুখের বীভৎসতা আরো বেড়েছে।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে মেরজাই, হাতে সাধারণ একখানা ছড়ি, সেখপাড়ার জনাব আলী খাঁ এসে ঘরে ঢুকল, 'এই যে ডাক্তারবাবু, নিজে নিজেই হেসে কুটি-পাটি। খোয়াব দেখছেন নাকি? দুনিয়ার কোন্ রঙ্গ তামাসা দেখলেন খোয়াবের মধ্যে?'

ভুবন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আসুন খাঁ সাহেব, বসুন এসে, অসুখ বিসুখ আছে নাকি বাড়িতে? এত রাত্রে যে? ব্যাপার কি?'

এর আগে জনাব আলীই তাকে বার দুই কল্ দিয়েছে। তাই ভুবন খুব খাতির করল জনাবকে।

চেয়ারটা এগিয়ে দিল সামনে।

জনাব আলী চেয়ারটায় বসে বলল, 'অসুখ বিসুখ তো আছেই, বিনা অসুখে কি কেউ ডাক্তারের বাড়ি আসে ? বড় শক্ত ব্যামো ডাক্তার, বড় শক্ত ব্যামো। সারিয়ে দিতে পারলে—' হাতের পাঁচটা আঙুল উঁচু ক'রে দেখাল জনাব ; মুখেও বলল, 'পাঁচ শ' টাকা। তোমাদের মায়ে-পোয়ের সংসার। পুরো একটা বছর পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে ব'সে খাবে। রোজগারের চেষ্টা করতে হবে না।'

ভুবন বলল, 'তা তো বুঝলুম। অসুখটা কি ?'

জনাব আলী বলল, 'বলছি।'

তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'ও মনাই, ঘরে আয়। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলি নাকি ? দুঃখে সরমে ছেলেটা একেবারে মনমরা হয়ে রয়েছে ডাক্তার। কাউকে মুখ দেখাতে চাইছে না, আয় মনাই, ঘরে আয়। ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল।'

জনাই খাঁর ছেলে মনাই খাঁ এল ভিতরে। তাকেও একটা চেয়ার দিল ভুবন। চব্বিশ পঁচিশ হবে মনাইর বয়স। কালো শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখের আদলটা বাপের মত। চাপ দাড়ির বদলে নূর আছে থুতনিতে।

ভুবন ভাবল ওরই কোন গোপন অসুখ বিসুখের কথা হবে বুঝি, ঘরে স্ত্রী থাকলেও বাপ-বেটা দুজনেরই দুশ্চরিত্রতার অপবাদ আছে।

ভুবন বলল, 'কি, তোমার অসুখটা কি মনাই ? এখানে তোমার বা'জানের সামনে বলবে, না ভিতরে যাবে ?'

বাপের ইশারায় মনাই খাঁ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'নুরু আমাকে নাথি মেরেছে ডাক্তারবাবু। এলোপাথাবি নাথি মেরেছে।'

ভুবন বিস্মিত হয়ে বলল, 'নুরু ! নুরু কে ?'

জনাই খাঁ উঠে এসে ভুবনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল, ডাক্তার, তোমার ভিতরের কামরায় চল। আমি সব বলছি। ও এক ফোঁটা ছেলে। ওর কি সব কথা গুছিয়ে বলবার বুদ্ধি হয়েছে !'

জনাই খাঁকে নিয়ে ভুবন উঠে এল পাশের কামরায়, তারপর তার সব কথা মন দিয়ে শুনল।

নুরু মানে নুরুন্নেসা। জনাই খাঁর উনিশ কুড়ি বছরের ভাইঝি। মৃত জমির আলী খাঁর একমাত্র মেয়ে। খাঁ-দের মাঠের এক শ' বিঘা জমির অর্ধেক অংশীদার। এত সম্পত্তির মালিক হয়ে মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে। না হ'লে চাচার কথা অমান্য করে ! যে চাচা কোলে পিঠে ক'রে তাকে মানুষ করেছে, ভালো মন্দ খাইয়েছে পরিয়েছে। জনাই খাঁ ভালো প্রস্তাবই করেছিল, 'আমার মনাইকে তুই সাদি কর নুরু। দুজনে মিলে মিশে বাড়িতে এক ঘরে থাকবি। আমার মাঠের জমিও ভাগ হয়ে অন্যের চাষে যাবে না।'

কিন্তু নুরুন্নেসার সে কথা পছন্দ হল না, সে জিভ কেটে বলল, 'তুমি কও কি চাচা ! মনাইরে আমি তো সে চোখে দেখিনি।'

আরে সম্পর্ক বদলালে চোখ বদলাতে কতক্ষণ লাগে ? কিন্তু মেয়েটা আসলে দজ্জাল ; সব ওর বদমাশি। প্রথমে সাদি বসল হোসেনপুরের আফাজদ্দি সেখের সঙ্গে। সে যতদিন ছিল, মোটেই সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করেনি। দজ্জাল মেয়েটার স্বভাব তো ভালো নয় ; মারপিট ঝগড়াঝাঁটি খুব চলত। তারপর আফাজদ্দি ম'রে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এখন জনাই খাঁ ফের তুলেছে সেই প্রস্তাব। সাদি কর মনাইকে। মনাইর আগের যে বউটা আছে, তাকে তালাক দিতে কতক্ষণ ! ছেলেপুলের ঝামেলা তো কারোরই নেই, মনাইরও না, নুরুন্নেসারও না। তাই এ নিকে সেই প্রথম বয়সের সাদির মতই মধুর হবে। কিন্তু বদমাশ মেয়েটা এবারও গররাজী। বলে, 'না, আমি আর নিকে সাদির মধ্যে নেই।' অথচ ভিন্ গ্রাম থেকে দু' একটি ক'রে বিয়ের সম্বন্ধ ওর আসছেই। আনাগোনা চলছে ঘটকের। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ও নিজেই তাদের সঙ্গে কথা বলছে। ঘুরঘুর করছে সুন্দর সুন্দর সব তরুণের দল। নুরু তাদের অনেকের সঙ্গেই নষ্ট। নিজের চোখের ওপর সব সহ্য করতে হচ্ছে জনাই খাঁকে। মনাইকে পাঠিয়েছিল একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলতে, সাবধান ক'রে দিতে। নুরু তাকে অপমান ক'রে ঘর থেকে বের ক'রে দিয়েছে। মেয়েমানুষের এই বেলেল্লাপনা কি সহ্য করতে হবে ?

ভুবন ডাক্তার কি বলে ? সংসারে যত দুর্গতি, যত দুঃখকষ্টের মূল এই মেয়েমানুষ। এ কথায় কি ভুবন ডাক্তারের সায় নেই ?

ভুবন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু আমি এর কি করতে পারি ?'

করতে পারে বই কি। ডাক্তারের এতে কিছু করবার আছে ব'লেই তো জনাই খাঁ এত রাতে তার কাছে ছুটে এসেছে। কদিন ধ'রে নুরুন্নেসা জ্বরে বড় কাতর। গায়ে পায়ে ব্যথাও আছে। তার জন্যেই দাওয়াই নিতে এসেছে জনাই খাঁ। এমন দাওয়াই কি ডাক্তারের আলমারীতে নেই, যাতে সব দুঃখ, সব জ্বালার শান্তি হয় ? এক সঙ্গে সকলেই জুড়োতে পারে ?

ভুবন শিউরে উঠল, 'তুমি বলছ কি খাঁ সাহেব ?'

জনাই খাঁ বলল, 'আস্তে ডাক্তার, আস্তে। ঠিক কথাই বলছি। দাওয়াই তুমি না দাও, আর কেউ দেবে। কিন্তু তোমাকে আর জীবনে দাওয়াই দিতে হবে না। তোমার দাওয়াই আমিই আজ রাত্রে বাতলে দিয়ে যাব।'

ব'লে জামাটা তুলে ফেলে একখানা ছোবা বার করল জনাই খাঁ। আর একদিক থেকে বার হল এক তাড়া নোট।

তারপর জনাই খাঁ হেসে বলল, 'নাও ডাক্তার, বেছে নাও যা তোমার পছন্দ।'

মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে থেকে ভুবন বলল, 'কিন্তু একথা যদি কেউ জানতে পারে ?'

জনাই খাঁ একটু হাসল, 'ক্ষেপেছে ডাক্তার ? এসব কাজ কি জনাই খাঁর নতুন যে, কেউ জানতে পারবে ? কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না। কাঁচা বয়স থেকে জনাই খাঁ কোনদিন কাঁচা হাতে কাজ করেনি। আর এখন তো হাত পেকে গেছে। তোমাকে কষ্ট দিতাম না ডাক্তার, নিজের হাতেই সব দিতাম শেষ ক'রে। কিন্তু নেহাত কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, তাই। আজ থেকে তুমি আমার ডান হাত হয়ে রইলে ডাক্তার, দোস্ত ব'লে। তোমার কোন ভাবনা নেই আর।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'কত আছে এখানে ?'

জনাই খাঁ বলল, 'পাঁচ শ।'

ভুবন বলল, 'পাঁচ শ'তে কি হবে। আমার ওষুধের দাম পাঁচ হাজার।'

জনাই খাঁ হেসে বলল, 'সাবাস, সাবাস! এই তো ঠিক দোস্তের মত কথা বলছ, কোলাকুলি হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে। তুমি যা চাইছ, তাই দেব ডাক্তার। তবে এক সঙ্গে পারব না। ক্রমে ক্রমে। আজ এই রাখ। কাল আবার ফের পাঁচ শ'। ভালোয় ভালোয় সব চুকে যাক। তোমার সব পাওনা মিটিয়ে দেব, জনাই খাঁর জবান কেউ অবিশ্বাস করে না। সঙ্গী-সাকরেদদের কাউকে এক পয়সা ঠকায় না জনাই খাঁ। তাহ'লে কি কারবার চলে ডাক্তার ?'

ভুবন নোটের তাড়াটা কম্পিত হাতে টেনে নিল। হ্যাঁ, জনাই খাঁর দোস্তই সে হবে, সেই ভালো। এ ছাড়া তার আর কোন গতি নেই।

খানিক বাদে ওষুধের শিশি নিয়ে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ বাড়ি গেল।

যাওয়ার আগে জনাই খাঁ বলল, 'শেষ রাত্রের মধ্যেই সব মিটে যাবে তো ? আমি আর সব ঠিক ক'রে রেখেছি। যত গোলমাল মাটির ওপরে। মাটির তলে আর কোন গোলমাল নেই ডাক্তার। সেখানে সব শান্তি। আজ রাত্রেই সব মিটবে তো ?'

ভুবন ডাক্তার ফের ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'আজ রাত্রেই সব মিটে যাবে।'

রাত্রে খেতে গিয়ে খেতে পারল না ভুবন ডাক্তার, ঘুমুতে গিয়ে ঘুম এল না। সারা রাত এপিঠ-ওপিঠ করতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে মা বললেন, 'তোর কি বায়ুচড়া হয়েছে নাকি ভুবন ? না কি ছারপোকা কামড়াচ্ছে ?'

ছারপোকার চেয়েও যে শক্ত বিষাক্ত পোকায় ভুবনকে কামড়াতে শুরু করেছে, সেকথা আর সে মাকে জানাল না।

পরদিন বেলা ন'টা দশটার সময় সেখ-পাড়ায় গোলমালটা খুব জোর শোনা গেল।

তার অনেকক্ষণ আগেই কবর দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ দুজনেই জল মুছল। বাড়ির মেয়েরাও কাঁদছে উচ্চ চীৎকারে। এই সময় থানা থেকে দারোগা আর কয়েকজন পুলিশ-সেপাইকে নিয়ে এল লতিফ সিকদার। লতিফের সঙ্গেই সম্বন্ধ এসেছিল নুরুন্নেসার। আনাগোনাও চলছিল তার সঙ্গে কিছুদিন ধ'রে। মাত্র ক'দিনের সাধারণ জ্বরে নুরুন্নেসার মত স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে মারা গেছে, একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে অবিশ্বাস করেছে। কাউকে কিছু না ব'লে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটেছে থানায়। ছোটখাট একটি তালুকের মালিক লতিফ সিকদার। সম্পন্ন গৃহস্থ। থানাওয়ালাদের সঙ্গে আনতে তার বেশী বেগ পেতে হ'ল না। জনাই খাঁর বিরুদ্ধে থানার আক্রোশও আগে থেকেই ছিল। গোটাকয়েক যোগাযোগের কথা শোনা গিয়েছিল, তবু জনাই খাঁকে ধরা যায়নি। এই সুযোগ দারোগা সাহেব ছাড়লেন না। এসে জনাই খাঁর বাড়িঘর খানাতল্লাশী করলেন। কিছু পেলেন না। নুরুন্নেসার ঘর আর তার আনাচে কানাচে তল্লাশ ক'রে ভাঙা একটা মিকশ্চারের শিশি মিলল। তিনি সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর সব শুনে জবানবন্দী নিয়ে বললেন, 'এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। কবর খুঁড়ে শব বার করতে হবে।'

জনাই খাঁ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে যে কেউ থানাপুলিশ করবার সাহস করতে পারে, একথা সে ভাবতে পারেনি। লতিফ সিকদারের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, জনাই খাঁ তা সময় মত দেখে নেবে। দারোগা সাহেবের প্রস্তাবে সে জিভ কেটে বলল, 'একি বলছেন আপনি! নিজেও তো আপনি মুসলমান। মুসলমান হয়ে এমন কথা আপনি বললেন কি ক'রে! এমন গুণাহর কাজ আমি করতেই দিতে পারিনে। সমস্ত মুসলমান তাহ'লে দোজখে যাবে।'

দারোগা সাহেব বললেন, 'কিন্তু এর একটা ফয়সালা না করলে আমাকেও দোজখে পচে মরতে হবে। সন্দেহ যখন হয়েছে, কবর না খুঁড়লে চলবে না।'

জনাই খাঁ স্থানীয় মোল্লা-মুন্সী-মৌলবীদের সভা বসাল। তারা সবাই রায় দিল, এমন অশাস্ত্রীয় কাজ চলতেই পারে না। মুসলমানের কবর ভাঙার নিয়ম নেই। যে শান্তিতে ঘুমিয়েছে, তার শান্তিভঙ্গ ক'রে পাপের ভাগী হতে যাবে কোন্ মূর্খ?

কিন্তু লতিফ সিকদার আর একদল মোল্লা-মুন্সীকে এনে হাজির করল, তারা ঠিক উল্টো কথা বলতে লাগল। নজীর দেখাল, সন্দেহস্থলে এমন আরো কোন্ কান্ জায়গায় কবর খুলে ফেলা হয়েছে।

জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দারোগা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি আনিয়ে নিলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় কবর খোঁড়া শুরু হল। বড় একটা চটান জায়গায় খাঁ-দের কবরখানা। পাঁচ সাত জন লোক কোদাল হাতে খুঁড়তে লাগল।

গ্রামের সবাই এসে ভেঙে পড়েছে সেই কবরখানায়. গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়েছে জনাই খাঁ ও মনাই খাঁকে। জনকয়েক পুলিশ-সেপাইর পক্ষে জনতা-নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু খুব যে তেমন একটা গোলমাল হচ্ছে তা নয়, খানকয়েক কোদালের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। রুদ্ধশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করছে কবর থেকে কি ওঠে তাই দেখবার জন্যে।

এদিকে বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথি। সমস্ত মাঠ ঘাট, আশেপাশের গাছপালাগুলির ডাল-পাতা জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে। তাল তাল জ্যোৎস্না জমে রয়েছে নুরুন্নেসার কবরের চারদিকে।

তারপর ধীরে ধীরে তোলা হল শবদেহ। আর একবারের জন্যে শুধু সরিয়ে ফেলা হল নুরুন্নেসার মুখের আবরণ। আকাশের আর একখানা চাঁদ। কিন্তু মরা চাঁদ, ছেঁড়া চাঁদ, বিষে নীল বিবর্ণ চাঁদ।

ভুবন ডাক্তার হঠাৎ অস্ফুট এক আর্তনাদ ক'রে উঠল। তারপর দু'হাতে ঢাকল নিজের চোখ। জ্যোৎস্না-ঘেরা পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গিয়েছে। পৃথিবীর অপরূপ সুন্দর প্রত্যেকটি মুখের ওপর কে যেন একখানা বিষাক্ত হাত দিয়েছে বুলিয়ে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল জনাই খাঁর, কিন্তু যার সবচেয়ে বেশী শাস্তি হওয়ার কথা ছিল—সেই ভুবন ডাক্তারের হল মাত্র সাত বছর। প্রীতির বাবা আর স্বামী দুজনেই যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

অর্থ দিয়ে, বড় বড় আইনজ্ঞ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সবরকম আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কারণ ভুবনের মা তাঁদের কছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল,'এ বিপদে আপনারা ছাড়া আর আমার কেউ নেই।'

প্রীতি কোনদিন ভুবনের সামনে আসেনি, শুধু আড়াল থেকে সাহায্যের প্রেরণা জুগিয়েছে। একবার কেবল এসেছিল। নানা জেল ঘুরে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ভুবন তখন বদলি হয়েছে। একদিন পড়ন্ত বিকেলে ভুবনের মনে হল বড় বড় রড্-দেওয়া দরজার ওপাশে প্রীতিলতা। হালকা চাঁপা ফুলের একখানা শাড়ি পরনে। গা-ভরা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর।

প্রীতি আস্তে আস্তে বলল, 'চিনতে পারছ?'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যাবে, দেখতে পেল ওর মুখের ওপর সেই নুরুন্নেসার মুখ। সেই নিহত নীল বিবর্ণ সৌন্দর্য। চেনা আর হল না, কথা বলা আর হ'ল না। ভুবন দু' হাতে ফের চোখ ঢাকল। খানিক বাদে চোখ যখন খুলল, প্রীতি চলে গেছে। প্রীতি চলে গেল, কিন্তু নুরুন্নেসা গেল না। সে রোজ রাত্রে, গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে পা টিপে টিপে আসে। জেলের এতগুলি প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কি ক'রে যে আসে, সে-ই জানে!

প্রথমে খানিকক্ষণ কোদালের শব্দ হয় ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হয় ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্, কবরের বাঁধ খুলে যায়, হৃদয়ের বাঁধ খুলে যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো রাশ রাশ, চাপ চাপ মাটি দু'পাশে উথলে পড়তে পড়তে পথ খুলে দেয়। আর সেই অতল গভীর সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে আসে পরমা সুন্দরী, যৌবনবতী এক কন্যা। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, কাল নেই, বয়স নেই, নাম নেই, পরিচয় নেই, আছে শুধু অফুরন্ত যৌবন আর পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোৎস্নায় গড়া সৌন্দর্য। ভুবনের সামনে সে এসে দাঁড়ায়, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্য উদ্বেল হয়ে ওঠে। কাজলকালো দুই চোখে ফুটে ওঠে কাতর মিনতি—'কথা বলো, কথা বলো। আমি যে তোমার কথা শোনার জন্যেই এতদূর থেকে এসেছি।'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যায় অমনি দেখে সেই যৌবনবতীর দেহে প্রাণ নেই। তার দেহ শবদেহ। সেই জ্যোৎস্না-ধৌত, স্বর্ণবর্ণ মুখ বিবর্ণ,—নীল, বিষে বিবর্ণ। ভুবন শিউরে চীৎকার ক'রে ওঠে।

কিছুদিন কথা চলেছিল কয়েদীর গারদ থেকে ভুবনকে পাগলা গারদে পাঠাবার। কিন্তু দিনের বেলায় ওর সুস্থ স্বাভাবিক ব্যবহার দেখে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হল, ওর পাগলামিটা আসলে পাগলামির ভান। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রহরীদের প্রহারের মাত্রা দিনকয়েক বেশ বেড়েও গিয়েছিল।

তারপর একদিন খুলে গেল জেলগেট। ছাড়া পেল ভুবন। মা তার আগে মারা গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন দেখে এল মাতৃভূমিকে। বাড়ি-ভরা আগাছার জঙ্গল আর কাঁটা গাছ। আর কোথাও কিছু নেই। শুধু নুরুন্নেসা নয়, জন্মের মত ভুবন ডাক্তারও কবরস্থ হয়েছে।

ফের কিছুদিন ঘুরে বেড়াল এখানে ওখানে ভবঘুরের মত। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, কোথাও পরিত্রাণ নেই নুরুন্নেসার হাত থেকে। কোথাও বিরাম নেই, শেষ নেই তার নৈশাভিসারের।

অবশেষে ভুবন ফের এল গাঁয়ের বাড়িতে। মুখের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভিটের কাঁটা গাছের জঙ্গল ফেলল কেটে। নিজেদের বারান্দায় চুপ-চাপ বসে থাকে, কারো কাছে যায় না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা তার চারপাশে ভিড় ক'রে আসে। এক অলৌকিক রহস্য যেন ঘিরে ধরেছে ভুবন ডাক্তারকে। সে রহস্যের কাছে যাওয়ার কারো সাহস নেই। শুধু দূর থেকেই তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে চলে। আরো অলৌকিক, আরো আজগুবী গল্প বানিয়ে বানিয়ে সেই রহস্যকে আরো বিচিত্র ক'রে তোলা যায়। কিন্তু খুনী ভুবন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় না, তাকে কাছে ডাকা যায় না। কি জানি যদি গলা টিপে ধরে! গলা টিপবারই বা দরকার কি, তার সংস্পর্শই যথেষ্ট। তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ, ডাক্তার বিষসিদ্ধ পুরুষ।

ভুবনের নিজেরও কোন উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই মানুষের সঙ্গে মিশবার, সামাজিক মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্পর্ক রাখবার। গ্রামের প্রান্তে গরীব একঘর বুনো থাকে। তাদের শিকারের সঙ্গী হয় ভুবন। ভাগ পায় অন্নজলের।

এমনি ক'রে প্রায় বছর খানেক কাটাবার পর হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। দিনে নয় রাত্রে। বেশ খানিকটা রাত আছে। অমাবস্যার কাছাকাছি তিথি। নিকষ কালো অন্ধকার সমস্ত গ্রামটায় ছড়িয়ে পড়েছে। আশে-পাশে অতি-পরিচিত গাছপালাগুলির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এক একটা গাছ যেন একটা ভূত আর সেই ভূতলোক ভূতনাথ হয়ে বারান্দায় একটা বেতের মোড়া পেতে চুপচাপ ব'সে আছে ভুবনমোহন. ব'সে ব'সে দেখছে। নিঃশব্দে উপভোগ করছে এই প্রেতলোককে।

হঠাৎ সেই গাছপালার জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি সত্যিকারের প্রেতিনী ছুটে এসে ভুবনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'রক্ষে কর বাবা, রক্ষে কর, আমাকে বাঁচাও।'

ভূতাধীশ হয়েও ভুবন প্রথমটায় ভয় পেল, চমকে উঠল। ব্যাপার কি! প্রেতলোকেও মৃত্যুর ভয়! ঘর থেকে হ্যারিকেন নিয়ে এল ভুবন। এনে ধরল প্রেতিনীর মুখের সামনে। দেখল প্রেতিনী নয়, পাশের বাড়ির হারাণ ভট্টাচার্যের প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রী। কিন্তু প্রেতিনীর সঙ্গে তার বিশেষ তফাতও নেই। রোগা, অস্থিসার চেহারা। পরনে খাটো আধময়লা ছেঁড়া একখানা থান। পিঠে কাঁধে চোখে মুখে শনের নুড়ির মত একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি আবার বললেন, 'আমাকে রক্ষে কর বাবা, আমাকে বাঁচাও।'

ভুবন ডাক্তার মনে মনে বলল, 'বাঁচাবার আমি কে? আমি তো মৃত্যু-সাধক, মৃত্যু-সিদ্ধ। কি করে বাঁচতে হয়, বাঁচাতে হয়, আমি ভুলে গেছি।'

কিন্তু হারাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল অন্য ভাষায়, বলল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'সর্বনাশ হয়েছে বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। আমার নিমি বিষ খেয়েছে। নন্দ ডাক্তার বাড়িতে নেই। আর কেউ নেই তাকে রক্ষা করবার! শুধু তুমি পারো। তুমি পারো তাকে বাঁচাতে। তুমি নাকি অনেক মন্তর তন্তর শিখে এসেছ, অনেক গাছড়া পাথর নিয়ে এসেছ। সেই সব নিয়ে চল। তোমার সব গুণজ্ঞান দিয়ে আমার নিমিকে তুমি বাঁচিয়ে তোল।'

ভুবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

গোটা কয়েক জংলা পরিত্যক্ত ভিটে আর বাঁশঝাড় পার হয়ে ভুবন এসে পৌঁছল হারাণ ভট্টাচার্যের বাড়ি। সে বাড়ি জংলা, সে বাড়িও প্রায় পরিত্যক্ত। শুধু উত্তরের ভিটেয় জীর্ণ একখানা ছনের ঘর পড়োপড়ো হয়েও কোনরকমে আত্মরক্ষা করছে।

ভুবনকে নিয়ে তার ভিতর ঢুকল নিমির মা। আঠার-উনিশ বছরের কালো রোগা কুদর্শনা একটি মেয়ে মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। গাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে, ভুবন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, বিষ খেল কেন?'

নিমির মা বললেন, 'সে কথা বলবার নয় বাবা। চাটুয্যেদের বীরেন বিয়ের লোভ দেখিয়ে ওর সর্বনাশ ক'রে সরে পড়েছে। আমি গোড়া থেকেই সাবধান করেছিলাম। অভাগী শুনল না, মজল তারপর বিষ খেয়ে মরল।'

ভুবন ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে নাড়ী ধরল নির্মলার। এখনো জীবনের স্পন্দন আছে। আশা আছে এখনো। মুখ তুলে বলল, 'শিগ্‌গির লোকজনকে খবর দিন। নন্দ ডাক্তারের বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র আর ওষুধ-টষুধ নিয়ে আসুক, আমি লিখে দিচ্ছি।'

নির্মলার মা অবাক্ হয়ে বললেন, 'তোমার গাছড়া, তোমার পাথর।'

ভুবন ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি তাই করুন আগে।'

খানিক বাদে উঠানে লোক ভেঙ্গে পড়ল। দরকারী জিনিসপত্রগুলিও পৌঁছল এসে। নির্মলার শিরা-উপশিরা থেকে সমস্ত বিষ নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়ার জন্যে তার সব জ্ঞান, সব বিদ্যে-বুদ্ধি প্রয়োগ করল ভুবন ডাক্তার।

শেষ রাত্রের দিকে রোগিণীর জ্ঞান হল, সে কথা বলল। প্রথমেই বলল, 'আমাকে বাঁচালে কেন?'

ভুবন ডাক্তার তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রত্যক্ষ করছিল প্রথম প্রাণসত্তাকে, রোগিণীর কথার জবাবে বলল, 'আমিও বাঁচব ব'লে।'

রোগিণীর মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ডাক্তারের মনে হল, এমুখ তার চেনা, এ মুখ সে দেখেছে, রোজ রাত্রে দেখেছে। এ সেই নুরুন্নেসার পরম সুন্দর মুখ। কিন্তু এখন আর মৃত নয়, বিবর্ণ নয়, প্রাণবন্ত। জীবনের রসে, রঙে রূপময়। সেই রূপ অপলক চোখে ব'সে ব'সে দেখতে লাগল ভুবন ডাক্তার।

তারপর শুধু ওদের ঘরে ব'সে দেখলেই চলল না, নিজের ঘরেও নির্মলাকে নিয়ে আসতে হ'ল।

নির্মলার মা বললেন, 'এত কলঙ্ক-কেলেঙ্কারীর পর এ হতভাগিনীকে আর কে নেবে? তুমি যখন বাঁচিয়েছ, তুমিই ওকে উদ্ধার কর। একা থাকলে অভাগী আবার কি কাণ্ড ঘটাবে কে জানে!'

দ্বিধাগ্রস্ত ভুবন ডাক্তার বলল, 'কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে।'

নির্মলার মা হেসে বললেন, 'পুরুষ মানুষের এ বয়স আবার একটা বয়স নাকি?'

কৃতজ্ঞ নির্মলার চোখেও একথার সানুরাগ সমর্থন মিলল।

জনাই খাঁ ও মনাই খাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে আগেই এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু বেঁচে ছিল লতিফ সিকদার। তখন ঘরে তার দু-দু'জন বিবি, আর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তবু ভুবন ডাক্তারকে সামনে দেখে তার দুই চোখ আরক্ত হয়ে উঠল, রূঢ়স্বরে বলল, 'কি চান আপনি?'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'একটা হাসপাতাল খুলতে চাই। আপনি তার সেক্রেটারী হবেন। যে বিষ তাকে একদিন দিয়েছিলামপ্রত্যেক রুগ্ন স্ত্রী-পুরুষের ভিতর থেকে সেই বিষ প্রাণপণে নিংড়ে বার করব। এ ছাড়া বাকী জীবনে আমার আর কোন কাজ নেই।'

লতিফ সিকদার বলল, 'সাহায্য আমি করতে পারি; কিন্তু সেক্রেটারীর পোস্টটি যেন ঠিক থাকে। শেষে যেন নড়চড় না হয়।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'মোটেই তা হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

লতিফ সিকদার তখন খুশি হয়ে বসতে দিল ভুবন ডাক্তারকে। পান-তামাকের ফরমাশ পাঠাল অন্দরমহলে।

সোনারুপার মেডেলগুলি, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স সবই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেগুলি আর ফিরে এল না। কিন্তু একটু একটু ক'রে আসতে লাগল ভুবন ডাক্তারের খ্যাতি। রোগ-নির্ণয় আর চিকিৎসায় তার অসাধারণ দক্ষতার কথা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। শুধু যশ নয়, অর্থাগমও হ'তে লাগল প্রচুর। বিপদই যে শুধু দল বেঁধে আসে তা নয়, সম্পদও দলবল ভালোবাসে।

কাহিনী শেষ করলেন ভুবন ডাক্তার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নুরুন্নেসাকে এখনও কি স্বপ্নে দেখেন আপনি?'

সাদা মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভুবন ডাক্তার।

দেখেন বইকি। তাকে এখনও মাঝে মাঝে দেখতে পান ভুবন ডাক্তার। সেই স্বপ্নচারিণীর নৈশাভিসার আজও শেষ হয় নি। এখনও মাঝে মাঝে আসে এক একটি জ্যোৎস্না-ধবল রাত। কোদালের কোপে দ্বিধাবিভক্ত মাটি তার সুড়ঙ্গ-পথ খুলে দেয়। আর তার ভিতর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী, পরম রমণীয়া কন্যা। ভুবন ডাক্তারের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ ঢিপ ঢিপ শব্দ হয়। ঘামে ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। শেষে স্ত্রী তাঁকে ডেকে জাগিয়ে তোলেন।

'আমার স্ত্রী বলে কি জানেন?—নুরুন্নেসা আমার সতীন।'

ভুবন ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

আমি হেসে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম আর একখানা হাসি-মুখ দরজার ওপাশ থেকে স'রে গেল।

সারিবদ্ধ কালো কালো তালগাছগুলির পুবদিকে ওপারে সোনালী আভাস দেখা দিয়েছে। এক্ষুণি চাঁদ উঠবে।

ভুবন ডাক্তার বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়েছে।

ভাদ্র ১৩৫৮

অনধিকারিণী

গত ডিসেম্বর মাসে একজন গীতরসিক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটি সঙ্গীত-সম্মেলনে আমাকে সারারাত কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। বন্ধু ভরসা দিয়েছিল উদ্যোক্তারা অনেক গুণিজ্ঞানী গায়ক বাদককে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছেন। এটা খুব সাধারণ জলসা নয়। মার্গসঙ্গীতের বিশেষ রকম ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। শুনে যে আমি খুব আশান্বিত হয়েছিলাম তা নয়। সঙ্গীতমার্গ থেকে আমার অবস্থান অনেক দূরে। গীতবাদ্যে আমার বিদ্যেবুদ্ধি তো নেইই, আগ্রহ ঔৎসুক্যও কম। কিন্তু বহুদিনের আলাপ-পরিচয়ের ফলে গায়ক-বন্ধু প্রমথ সেনের সঙ্গে হৃদ্যতাটা কম নয়। তাই তার অনুরোধ না রেখে পারলাম না।

শহরের পূর্বদিকে ইন্টালী অঞ্চলে একটি নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। এখনো তার নামকরণ হয়নি। অন্তত মুখে মুখে সে নামটা চালু হয়ে ওঠেনি এখনো। সেই রাস্তারই পশ্চিম দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটি প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। তার বৃহৎ আকার আর সামনে গীতানুরাগীদের ভিড় দেখে এটুকু বুঝতে পারলাম যে, অনুষ্ঠানটি খুব ছোটখাট নয়।

ঢুকবার সময় হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বেগের সুরে বললাম, 'প্রমথ, আমাদের বোধহয় খুব দেরি হয়ে পড়ল, সাতটায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, এখন সাড়ে আটটা!'

প্রমথ ভরসা দিয়ে বলল, 'আরে না না, দেরি হয়নি, এসো।'

তার ভরসাটা যে কি সাংঘাতিক, তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

সমস্ত প্যাণ্ডেলটা শ্রোতায় ভরে গেছে। কিন্তু যে সব খ্যাতনামা শিল্পীর নাম নিমন্ত্রণের চিঠিতে আর কাগজের পাতায় ঘোষিত দেখেছিলাম, তাদের একজনেরও দেখা মিলল না। নটা বাজল, সাড়ে নটা বাজল, দশটাও প্রায় বাজে, সমস্ত প্যাণ্ডেলটা অধীর হয়ে উঠল। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে এ-কোণ ও-কোণ থেকে যে সব মন্তব্য শোনা যেতে লাগল তার মধ্যে সুরও নেই, তা শ্রাব্যও নয়। অনুষ্ঠানের সম্পাদক মঞ্চের ওপর উঠে বৃথাই বারবার হাত জোড় করতে লাগলেন, মাইকের ভিতর দিয়ে বহুবার তার অনুনয় শুনলাম, 'আপনারা আর একটুকাল ধৈর্য ধ'রে থাকুন, ওঁরা এলেন বলে।'

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'মশাই, ওরা আসুন আর না আসুন, আপনি আর আসবেন না। আপনাকে দেখলেই এখন গা জ্বালা করছে!'

আশেপাশে যেভাবে সবাই তাঁর কথায় সায় দিয়ে উঠল তাতে মনে হ'ল, তিনি একজন হ'লেও বহুজনের প্রতিনিধি।

এই সময় প্যাণ্ডেলের গেটের সামনে পর পর খান দুই গাড়ি থামার শব্দ হ'ল। দুজন প্রখ্যাত গায়কের নাম শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের গোলমাল একেবারে থেমে গেল। যারা উঠে গিয়েছিল, তারা ফের এসে চেয়ারে চেপে বসল। ক্রমে আরো খানদুই গাড়ি এসে দাঁড়াল! প্রমথ নিজে গেল তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। একটু বাদে ফিরে এসে মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'প্রায় সবাই এসে গেছেন।'

তখন শহরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন সবে শেষ হয়েছে। আর্টিস্টরা সবাই বিদায় নেননি। উদ্যোক্তারা তাঁদের কয়েকজনকে গিয়ে ধরে আনতে পেরেছেন। নামকরা গায়কদের সঙ্গে কৃতী সেতারী, সরোদ-এস্রাজ বাজিয়ে, আর তবলচীরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কেউ প্রথমে আরম্ভ করতে চাইছেন না। সকলেরই দু'এক মিনিট বিশ্রাম ক'রে নেওয়ার ইচ্ছা! কিন্তু শ্রোতাদের এক সেকেণ্ডও আর সবুর সইছে না। কারণ এর আগে পুরো তিন ঘণ্টা তারা সবুর করেছে।

উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্যে কি একটু আলোচনা ক'রে একজন সুদর্শনা গায়িকাকে মঞ্চের ওপর

নিয়ে গেলেন। বেতারে তার নাম আর গলা বহুবার শোনা গেছে। তাঁর দর্শনে শ্রোতারা খুব ক্ষুণ্ণ হ'ল বলে মনে হ'ল না। মাইকের সামনে সুললিত ভঙ্গীতে বসে তিনি একখানা ভজন ধরলেন। শ্রোতারা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। মেয়েটির চেহারার মত স্বরটিও বেশ মিষ্টি। গান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ডেলের এদিক ওদিক থেকে হাততালি পড়ল। রব উঠল, 'আর একখানা হোক, আর একখানা।'

তরুণীটি স্মিত হেসে মাইকের সামনে আর একটু এগিয়ে বসলেন। তবলচীর দিকে ঝুঁকে কি একটু নির্দেশ দিলেন তাঁকে, তারপর আবার শুরু করলেন। এবার একখানা ঠুংরী। কণ্ঠস্বর মিষ্টি। গলার কাজও ভালো। শ্রোতাদের ভিতর থেকে এবারও হাততালি পড়ল।

তিনি উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ এ্যানাউন্সারের কানে কানে গিয়ে কি যেন বলল; এ্যানাউন্সার উদ্যোক্তাদের আরো দু'একজনের সঙ্গে একটু পরামর্শ করলেন, তারপর মাইকের সামনে মুখ নিয়ে বললেন, 'এবার খেয়াল গাইবেন—শ্রীমতী সুলতা দাস। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষক, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সঙ্ঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত প্রমথ সেনের ছাত্রী।'

আমার আশেপাশে এখান ওখান থেকে অসন্তুষ্টির গুঞ্জন শুনলাম—'সুলতা দাস আবার কে! রাত দশটার পরেও সুলতা দাস! এরা ভাবল কি হে! মাগনা আসিনি, রীতিমত টিকেট কিনে এসেছি।'

কে একজন বলল, 'না না, রেডিওতে ওঁর গান শুনেছি। রেকর্ড-টেকর্ড আছে। আরে একেবারে কেউ-কেটা না হ'লে কি আর এখানে আসতে সাহস পায়। শোনই না।'

ততক্ষণে সেই গুরুনামধন্যা তরুণীটি প্যাণ্ডেলের সামনের দিকের দ্বিতীয় সারির একটি চেয়ার থেকে উঠে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেছেন।

তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটির রঙই শুধু কালো নয়, চেহারাটিও খারাপ। একটু যেন আড়ষ্ট ভঙ্গীতে মাইকের সামনে গিয়ে বসলেন। মেয়েটি বিবাহিতা। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। পরনের শাড়িখানা অবশ্য একটু দামী, কিন্তু গায়ের গয়না তার সঙ্গে মানায়নি। প্রমথর বন্ধু হিসাবে আমি একেবারে সামনের সারিতে স্থান পেয়েছিলাম। তাই সবই আমার চোখে পড়ল। শাঁখার সঙ্গে হাতে দু'গাছি চুড়ি ছাড়া মেয়েটির গায়ে আর কোথাও কোন আভরণ দেখলাম না। মোটের ওপর, চেহারা বেশবাস ধরণ-ধারণ কোনটিই আশাপ্রদ নয়। কিন্তু সেইজন্যেই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে বলে আমি বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম। চোখকে মুগ্ধ করার দায়িত্ব গায়ক-গায়িকাদের নেই, কানকে তৃপ্ত করার জন্যেই তাঁরা এসেছেন। রূপ তাঁদের দেহে নয়, গলার স্বরে। তাঁদের চোখে দেখতে হয় না, দেখতে হয় কানে। কান দিয়েও যে দেখা যায়, তার অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিল। আর একটি জলসায় এক জল্লাদের মত চেহারার আর দারোয়ানের মত গোঁফওয়ালা এক ওস্তাদের গলায় আমি ষোড়শীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম। শুনতে শুনতে জল্লাদের সেই বেশটা কখন চোখের সামনে থেকে সরে গেল! মনে হ'ল, ধ্বনিকেও যেন চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই ধ্বনিরূপ গায়কের নিজের রূপকে আড়াল করেছে, অপরূপ করেছে তাঁকে।

ভাবলাম, এবারও তাই হবে। এই সাধারণ-দর্শনা কালো রোগা মেয়েটি গলা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে এক রূপবতী কিন্নরী তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। গায়িকার দিকে না তাকিয়ে, আমি তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ঠুংরী, ভজন, কীর্তন নয়, বেশ একটি জটিল কড়া রাগিণীর গান ধরল মেয়েটি। প্রমথর মুখে পরে শুনেছিলাম দরবারী কানাড়া। হিন্দী ভাষায় কথা তার অল্প। কিন্তু সুর-বিস্তারের যেন আর শেষ নেই, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই মাত্র দু'তিনটি কলি আধঘণ্টা ধরে মেয়েটি গাইল। বুঝতে পারলাম, সে প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কই সেই কিন্নরী তো নেমে এল না! চোখ মেলে একটি কালো কুরূপা মেয়েকেই বার বার আমরা সামনে দেখতে পেলাম।

অবশেষে মেয়েটি থামল। কোন হাততালি নেই, কোন প্রশংসাসূচক ধ্বনি নেই, শ্রোতার দল চুপচাপ উদাসীন। পিছনের সারি থেকে বিরূপ সমালোচনাও কিছু কানে ভেসে আসতে লাগল। তবু

মেয়েটি মিনিটখানেক প্রতীক্ষা করল। ভাবল আর একটা সুযোগ বুঝি সে নিতে পারবে। কিন্তু এ্যানাউন্সার তাঁর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার সেতার বাজাবেন প্রসিদ্ধ সেতারী মন্তাজ আলী খাঁ, আপনারা অধীর হবেন না। শুধু বাংলার নয়, ভারতের নানা জায়গা থেকে ওস্তাদ শিল্পীরা আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। এই ছোট্ট মঞ্চের ওপর একে একে তাঁদের সকলেব সাক্ষাৎ পাবেন। আপনারা অনেক ধৈর্য্য, অনেক সহিষ্ণুতাব পবিচয় দিয়েছেন, অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু আমরা আশা করছি, আপনাদের সমস্ত কষ্ট এবার সার্থক হবে।'

মঞ্চের ওপব থেকে সুলতা দাস আস্তে আস্তে নেমে এল। একবার অতৃপ্তভাবে ওস্তাদদের দিকে তাকাল। সুলতা গান আবম্ভ করবাব সময তাঁদের কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে একবার চেয়েছিলেন। কিন্তু একটু বাদেই তাঁরা ফের চোখ ফিরিয়ে সামনের বাটা থেকে লবঙ্গ এলাচ তুলে মুখে পুরে পরস্পরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

প্রমথ মেয়েটিব দিকে এগিয়ে বলল, 'তুমি কি এখন যাবে?'

সুলতা মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

প্রমথ বলল, 'তাহলে চল।'

চাপা রাগে প্রমথর গলার স্বর রুক্ষ, একটু যেন বিকৃত। ছাত্রীকে সঙ্গে করে প্রমথ গেটেব দিকে এগিয়ে চলল।

আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম তবলচী তবলা ঠিক করাব আগে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে আসি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরুলাম।

দেখলাম, মেয়েটি একা নয়। আর একজন ভদ্রলোকও তাব সঙ্গে উঠে এসেছেন। প্রমথ তাঁর সামনেই মেয়েটিকে ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কোনদিন আমাকে আব ওসব অনুবোধ কোরো না। এমন অপ্রস্তুত, এমন অপদস্থ আমি আব জীবনে হইনি। তোমার জন্যে তাও হ'লাম। আর এখনো তোমাকে বলছি, তুমি ছেড়ে দাও, গান তুমি ছেড়ে দাও সুলতা। সকলেব তো সব জিনিস হয় না। তোমাব ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সে-সব দেখ, গান ছেড়ে দাও।'

মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে রইল। তাব সঙ্গেব ভদ্রলোক নির্বিকার নিশ্চল।

গেটের সামনেই চা আব পান-সিগারেটের দোকান বসে গেছে। আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে বন্ধুকে পিছন থেকে ডেকে বললাম, 'প্রমথ, সিগারেট নাও। আর চল, সেতার আরম্ভ হয়ে গেছে।'

প্রমথ একটু চমকে উঠে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও তুমি! হ্যাঁ, চল। এসো আলাপ করিয়ে দিই, ইনি শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস, সুরসুন্দব বিদ্যাপীঠেব সেকেণ্ড টিচাব। এঁরই স্ত্রী গাইলেন এ[illegible] আগে। আব ইনি আমার বন্ধু কল্যাণ রায়।'

বীরেনবাবু নিশব্দে আমাব সঙ্গে নমস্কাব বিনিময করলেন। তারপর প্রমথর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা তাহলে এবাব যাই, মাস্টারমশাই?'

প্রমথ ঘাড় নাড়ল।

ওঁবা চলতে শুরু করলে আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

প্রমথ বলল, 'সামনে গিয়ে আব কি হবে? এসো, পিছনেই বসি।'

বুঝতে পারলাম, ছাত্রীর অগৌরবে প্রমথ এত বিচলিত হয়েছে, এত অপমানিত বোধ করছে যে, সে আব সামনে যেতে চায় না।

সব চেয়ে পিছনের সারিতে পাশাপাশি দুখানা চেয়াব তখনো খালি পড়ে ছিল। আমরা তাতে বসে সিগারেট ধরালাম।

সেতারী প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সুরের আলাপ কবলেন। সমস্ত প্যাণ্ডেলটি মুগ্ধ হয়ে শুনল। তারপব একের পর এক, কখনো কণ্ঠে, কখনো যন্ত্রে সুব-সৃষ্টি চলতে লাগল। সকলেই কম-বেশি কৃতী গায়ক, প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা করে সময় নিলেন এক একজন। কিন্তু শ্রোতাদের তাতে আপত্তি নেই। এত সূক্ষ্ম তার-যন্ত্রে কোমল রাগিণী আলাপের পরেও একজন খ্যাতনামা তবলচী তবলায় শুধু গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের অনেকক্ষণ ধরে আকৃষ্ট করে রাখলেন।

রাত চারটে বাজল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তাঁদের হাতে এখনো দুজন সেরা গাইয়ে মজুত আছেন। এ্যানাউন্সার তাঁদের একজনের নাম ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, হঠাৎ মাইকটা কি করে যেন বিগড়ে গেল। সেটা ঠিক করতে আর তবলচীর তবলা বেঁধে নিতে গেল আরো আধ ঘণ্টা। দামী আলোয়ান গায়ে প্রখ্যাত গায়কটি মঞ্চের ওপর চুপ করে বসে আছেন। প্রমথ বলল, 'ইনিও সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন। কষ্ট অনেকেই করে, কিন্তু সার্থক না হ'লে তার কাহিনী উল্লেখযোগ্য হয় না। সিদ্ধি ছাড়া সাধনার ইতিহাসের কোন মূল্য নেই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবলাম প্রমথ নিজের কথাই বুঝি বলছে। ওরও আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়নি। কি একটা রোগে ওর গলার স্বর একটু বিকৃত হয়ে গেছে। তাই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও আর হতে পারেনি, হয়েছে শিক্ষক, হয়েছে গীত-শাস্ত্রের পণ্ডিত।

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রমথ বলল, 'আমি ওই মেয়েটির কথা বলছিলাম কল্যাণ। এর আগেও অনেক গাল-মন্দ করেছি, কিন্তু এমন রূঢ় আঘাত সুলতাকে এর আগে কোনদিন করিনি। আমার মেজাজ ঠিক ছিল না কল্যাণ। ওর ব্যর্থতা যে আমারই ব্যর্থতা।'

বললাম, 'মেয়েটিকে কতদিন যাবৎ তুমি গান শেখাচ্ছ ?'

প্রমথ বলল, 'ও সে অনেকদিন, বছর পনের ধরে ওদের সঙ্গে আমার পরিচয়। ও আমার প্রথম ছাত্রী, আর বোধ হয় শেষ ছাত্রীও। ভেবেছি গানের টুইশান আমি ছেড়ে দেব কল্যাণ।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কি বল তো প্রমথ ? কোন কিছু ঘটেছিল নাকি তোমাদের মধ্যে ? তোমাকে তো ঋষি-তপস্বী বলেই জানি।'

আমার কথার ভঙ্গীতে প্রমথ একটু হাসল, 'ঋষি-তপস্বী অবশ্য আমি নই , কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তাও ঠিক নয়। আচ্ছা গোড়া থেকেই বলি তোমাকে। হ্যাঁ এও এক প্রেমের গল্প বলতে পার—প্যাশনের গল্প।'

বললাম, 'গল্পের জাত-বিচার তোমাকে করতে হবে না প্রমথ, তুমি শুধু কাহিনীটি বল। গান আরম্ভ হলেই তো তোমার আবার কথা বন্ধ হবে। এই ফাঁকে ঘটনাটি শুনে নিই।'

আমার আগ্রহ দেখে প্রমথ ফের একটু হাসল, তারপর গোড়া থেকে সুলতা দাসের কাহিনী শোনাল আমাকে।

সুলতা তখন দাস ছিল না, ছিল বসু। শ্যামবাজার স্ট্রীটের ছোট একটি দোতলা ভাড়া-বাড়িতে ওরা থাকত। ওর বাবা নিরঞ্জন কোন কাজ করতেন কি-একটা মার্চেন্ট অফিসে। চোদ্দ-পনের বছর বয়স থেকেই সুলতার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। মেয়ে কালো, দেখতে সুন্দরী নয়, স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি বিদ্যা। দু'তিন হাজার পর্যন্ত পণ দেওয়া যায় তেমন টাকার জোর নেই বাপের। তবু প্রথম মেয়ে। নিরঞ্জনের বড় ইচ্ছা একটু ভালো সম্বন্ধ হয়। কিন্তু ভালো সম্বন্ধ আসে আর ফিরে ফিরে যায়। কারুরই তেমন পছন্দ হয় না। এই সময় কোন এক পাত্রপক্ষ সুলতার গান শুনে মন্তব্য ক'রে গেলেন, 'মেয়েটির গলা তো মন্দ নয়। ওকে কি কোন গানের ইস্কুলে-টিস্কুলে দিয়েছিলেন ?'

নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'না। রেডিও, রেকর্ড শুনে নিজে নিজেই যা কিছু শিখেছে।'

পাত্রপক্ষ হয়তো ভদ্রতা করেই বললেন—'মেয়েটির ভিতরে শক্তি ছিল। ওকে যত্ন করে শেখালে গানটা ওর হ'ত।'

সেই থেকে সুলতার ঝোঁক গেল ও গান শিখবে। গানের মাস্টার রেখে দেওয়ার জন্যে বাপকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল।

মা বললেন, 'হুঁ ! ছেলেদের জন্যে একজন পড়ার মাস্টার রাখতে পারিনে তো আবার গানের মাস্টার !'

কিন্তু বাপ মনে করলেন, কিছুদিন একটু তালিম-টালিম দিয়ে রাখতে পারলে বিয়ের বাজারে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে। সস্তায় গানের মাস্টারের খোঁজ চলতে লাগল। সুলতার মাসতুতো ভাই শ্যামল সরকার পড়ত প্রমথর সঙ্গে। এক কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। সে বলল,

'প্রমথ, তুমি আমার মাসতুতো বোনকে গান শেখাও।'

প্রমথ বলল, 'আমি এমন কি জানি যে, শেখাব?'

শ্যামল বলল, 'আহা অত আর বিনয় করতে হবে না। তোমরা কুমিল্লার ছেলে। তোমরা গান গলায় নিয়ে জন্মাও। অন্য জায়গায় ছেলেরা পেট থেকে পড়ে কাঁদে। আর কুমিল্লার ছেলেরা পেট থেকে পড়ে সা রে গা মা সাধে। তোমাদের সঙ্গীত-প্রতিভা সহজাত। তারপর তুমি তো আবার যত্ন করে গানটান শিখেছ।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তখনকার দিনের কুমিল্লার খ্যাতনামা গায়ক-সুরকারদের সঙ্গে প্রমথর ঘনিষ্ঠতা ছিল। একজনের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল প্রমথ। পড়াশুনোয় যে ওর তেমন মন বসল না, তা এই গানের জন্যে। তখনই ছোটখাট মজলিসে প্রমথ গায়, রেডিওতে প্রোগ্রাম পায়। পরিচিত মহলে তখনই বেশ একটু নাম-টামও হয়েছে।

সহপাঠী বন্ধুর অনুরোধ না রেখে প্রমথ পারল না। শ্যামলের বোনকে গান শেখাতে রাজী হয়ে গেল।

প্রথম দিন শ্যামলই নিয়ে গেল সঙ্গে করে। রাস্তার ধারের দোতলায় ছোট একটি ঘরে পরিচয় হ'ল সুলতার সঙ্গে। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে তার ওপর ফর্সা চাদর বিছানো। তারই এককোণে মেয়েটি এসে জড়সড় হয়ে বসল। কনে দেখতে এলে মেয়েরা যেমন বসে।

প্রমথরও আড়ষ্টতা কম নয়। এর আগে ছাত্র অনেক জুটেছে কিন্তু ছাত্রী এই প্রথম। বলল, 'আপনি একটু গান। আমি শুনে নিই।'

শ্যামল কাছেই বসে ছিল, বলল, 'তা'হলেই হয়েছে। ওইটুকু মেয়েকে আবার আপনি আপনি করছ কেন? তুমি বলবে।'

সুলতার মা বললেন, 'হ্যাঁ, এই ফাল্গুনে এইতো সবে চৌদ্দ উৎরে পনেরয় পড়েছে।'

প্রমথ বুঝতে পারল, মেয়ের মা মেয়ের বছর-দুই বয়স চুরি করেছেন; কিন্তু তার বেশি নয়।

প্রমথর বয়স তখন বছর তেইশ-চব্বিশ। তা হ'লেও অধিকার পেয়ে সতের বছরের ছাত্রীকে সে দিন-দুয়েক পর থেকে তুমি বলতেই শুরু করল। কারণ, দেখতে পেল, বয়সে সতের হ'লে কি হবে, গানে সুলতা সাত বছরের বালিকা। গানের গলা আছে, কিন্তু তাল মান কিছু ঠিক নেই। তবে যে-কোন গান শুনেই ধরতে পারে, অনুকরণে দক্ষতা আছে। ওর গানের খাতাগুলি নেড়ে চেড়ে দেখল প্রমথ। একটা পুরোন মোটা ডায়েরী আর দুখানা বাঁধানো একসারসাইজ বুক। নতুন পুরোন যত রাজ্যের গান আছে, সব সেই তিনখানা খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে টুকে নিয়েছে সুলতা। তার মধ্যে পুরোন রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত আছে, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীত আছে, আবার তখনকার দিনের ঘরে ঘরে গাওয়া সিনেমা-থিয়েটার-রেকর্ডের প্রেম-সঙ্গীতেরও অভাব নেই।

প্রমথ একদিন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এর সব গান জানো?'

সুলতা একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'না, সব গানের সুর জানিনে। তবু রাগ-রাগিণীর নাম-সমেত সব লিখে রেখেছি, যদি কোনদিন কাজে লাগে।'

প্রমথ বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেছে। আরো যদি কয়েক বছর আগে থেকে তুমি আরম্ভ করতে!'

সুলতা তার কালো বড় বড় চোখ দুটি প্রমথর দিকে তুলে ধরল, 'মাস্টারমশাই, এখনো কি হয় না? আমি যদি খুব খাটি, খুব পরিশ্রম করি, তবু কি হয় না?'

প্রমথ ওকে ভরসা দিয়ে বলল, 'কেন হবে না? বিদ্যা আর অর্থ-চিন্তার সময় মানুষকে মনে করতে হয়, সে অমর। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে।'

সুলতা চেষ্টা শুরু করল। দিন নেই, রাত নেই, অন্য কোন আমোদ-প্রমোদ নেই, সে গান আর তার হারমোনিয়াম নিয়েই আছে।

খাবারের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে একদিন সুলতার মা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি ভালো মন্ত্র দিয়ে গেছেন আপনার ছাত্রীর কানে। গানে গানে বাড়ির সবাইকে ও একেবারে অস্থির করে তুলল। কোন কাজকর্মে হাত দেবে না, ভাইবোনগুলির দিকে তাকাবে না, গেরস্থ ঘরের মেয়ের কি অমন

হ'লে চলে ?'

সত্যিই গৃহস্থঘরের মেয়ের অমন হ'লে চলে না। প্রমথ নিজেও একটু অপ্রস্তুত হ'ল। তারপর সুলতার মা চলে গেলে ওকে একটু তিরস্কার করে বলল, 'ঘরের কাজকর্ম করো না কেন ?'

সুলতা বলল, 'অবসর পেলেই করি। মা বাড়িয়ে বলছেন। তবু গানে একটু বেশি সময় দিতে হয়। না দিলে চলবে কি করে ? আমার যে অমনিই দেরি হয়ে গেছে মাস্টারমশাই।'

প্রমথ উপদেশের ভঙ্গীতে বলল, 'তবু এক সময় বেশি চর্চা খারাপ। বেশি গলাসাধাও গলার পক্ষে ভালো নয়।'

প্রত্যেক বুধবার আর শনিবার শ্যামবাজার স্ট্রীটে যেত প্রমথ। সুলতা অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত। যেতে কোনদিন দেরি হয়ে গেলে বলত, 'ভাবলাম, আজ বুঝি আপনি এলেনই না।'

প্রমথ হেসে জবাব দিত, 'না এসে কি আর পারবার জো আছে, তোমার যা গরজ। না এলে তুমি নিজেই হয়তো বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত ছুটে যেতে।'

গানের আগে প্রত্যেক দিন চা-জলখাবারের ব্যবস্থা থাকত। কোনদিন লুচির সঙ্গে মোহনভোগ হালুয়া, কোনদিন ডিম-মাংসের আমিষজাতীয় খাবার।

প্রমথ বলত, 'রোজ রোজ এসব কেন ?' সুলতার মা বলতেন, 'খান : সব আপনার ছাত্রীর তৈরী। অমনি সংসারের কোন কাজ করবে না, কিন্তু—'

সুলতা কৃত্রিম কোপে ধমক দিত, 'মা তুমি যাও তো এ ঘর থেকে।'

মাসে পনের টাকা করে পেত প্রমথ। তখন টাকার তার দরকার ছিল না। মাথার ওপর বাবা ছিলেন, দাদা ছিলেন। সংসারের কোন কিছু প্রমথকে দেখতে হত না। গান গেয়ে আর গান শুনেই দিন কাটত, রাত ভোর হ'ত, বাড়ির সবাই তার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

টাকাটা প্রমথ সুলতাদের কাছ থেকে নিতে চায়নি। কিন্তু সুলতার বাবা ছাড়বেন না, বললেন, 'বিনা গুরুদক্ষিণায় শিক্ষাটা পুরোপুরি হয় না।'

সুলতার মা বললেন, 'আমরা কিই বা দিতে পারি ? এ-তো সামান্য পান-সিগারেটের পয়সা। ট্রাম-বাসের খরচ। না নিলে ভারি অসন্তুষ্ট হব।'

মেয়ের হাত দিয়েই টাকাটা ওঁরা দিতেন। কিন্তু সুলতা তা নিজের হাতে দিত না। গানের খাতার মধ্যে নোট দুখানি ভ'রে খাতাটা সে দেখতে দিত প্রমথকে। একখানি দশ টাকা আর একখানি পাঁচ টাকার নোট সংকোচে খাতার ভিতর থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে থাকত। সে সংকোচ যেন সুলতারই সংকোচ। সে যা পাচ্ছে, টাকা দিয়ে তা নেওয়া যায় না, তবু টাকা দিতে হয়। কিন্তু গানের ছোঁওয়ায় তার সব দোষ কাটুক, তার সব স্থূলতা ঘুচে যাক।

এমনি করে মাস ছয়েক গেল। এর মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়েছিল সুলতা। প্রায় দুটো 'ঠাট' আয়ত্ত করে ফেলেছিল। হঠাৎ ওর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। অনেক সম্বন্ধ আসছিল যাচ্ছিল। কিন্তু বরিশালের এক দাসমশাই ওকে একেবারে পছন্দ করে ফেললেন। বহুদিন ধরেই তিনি তাঁর বি-এ- পাশ ছেলের জন্যে মেয়ে খুঁজছিলেন। কিন্তু রূপ-গুণ, কুল-বংশ, পণ-যৌতুক—সব মেলে তো কোষ্ঠীতে মেলে না। দাস-মশাই নিজে জ্যোতিষ চর্চা করতেন। তিনি সুলতার করকোষ্ঠী পরীক্ষা করলেন। সুলতার ঠিকুজি নিয়ে বিস্তৃত কোষ্ঠী তৈরী করিয়ে উল্লসিত হয়ে বললেন, 'একেবারে রাজযোটক। এ বিয়ে হতেই হবে। এ বিধাতার নির্বন্ধ।'

তিনি মেয়ের বাপের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমার কিছু দাবী-দাওয়া নেই বোস মশাই। আপনি যদি শাঁখা-সিঁদুর দিয়েও দেন, মেয়েটিকে আমার ঘরে নিতেই হবে। মা-লক্ষ্মী যে আমার ঘরে যাওয়ার জন্যেই এসেছেন।'

এমন সুযোগ কোন্ মেয়ের বাপ ছাড়তে পারে। নিরঞ্জন বাবুও ছাড়লেন না। সুলতার বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল।

একদিন গান শেখাতে গিয়ে প্রমথ দেখল, সুলতা হারমোনিয়ামের ওপরে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে। সেদিন আর যত্ন করে চুল বাঁধেনি। এলো খোঁপা পিঠের ওপর ভেঙে পড়েছে।

প্রমথর পায়ের শব্দে চমকে উঠে মুখ তুলল সুলতা। ওর দু' চোখের কোলে জল।

প্রমথ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও কি, কাঁদছ কেন তুমি ! কি হয়েছে ?'
সুলতা বলল, 'কিছু হয়নি !'
প্রমথ বলল, 'তবে ?'
সুলতা বলল, 'বিয়ে করব না আমি, মাস্টারমশাই, আপনি আমার বাবাকে বলুন !'
প্রমথ একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। ছাত্রীকে সে ভালোবাসে। এই গীতানুরাগিণী মেয়েটির ওপর তার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাই বলে ওর বাবাকে কোন কথা বলবার জন্যে তো প্রমথর মন প্রস্তুত হয়নি। এসব কী বলছে সুলতা !
একটু বাদে প্রমথ বলল, 'আমি বলতে যাব কেন বল ?'
সুলতা প্রমথর দিকে তাকাল, 'আপনি না বললে আমার গান শেখা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে মাস্টারমশাই !'
প্রমথ এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল. 'ও, শুধু গান শেখার জন্যে তার বাবাকে অনুরোধ করতে বলছে সুলতা ! অন্য কিছুর জন্যে নয়' এই স্বস্তির মধ্যে কোথায় যেন একটু শূন্যতাও ছিল।
প্রমথ এবার হেসে বলল, 'তা কেন হবে ? যারা গান-বাজনার চর্চা করে, তারা কি আর বিয়ে করে না ?'
সুলতা বলল, 'যাদের ইচ্ছে হয়, তারা করে। কিন্তু আমার যে ওসবে মোটেই ইচ্ছে নেই মাস্টারমশাই। আমি ভেবেছি, সারা জীবন আমি কেবল গান নিয়েই কাটাব, গান নিয়েই থাকব। আমার আর কিচ্ছুতে দরকার নেই। আমি আর কিচ্ছু চাইনে।'
গান প্রমথরও সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তবু গান ছাড়া আর কিচ্ছু চাইনে এ দম্ভোক্তি মেয়েটির মুখে প্রমথর ভালো লাগল না, তা ছাড়া কথাটা তো সত্যিও নয় ! শুধু একটি পরম বস্তুকে নিয়ে কারুরই চলে না, সবাইকেই তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু চাইতে হয়।
প্রমথ বলল, 'বেশ তো, সে-কথা তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল।'
সুলতা বলল, 'আমি বললে তিনি কি আর শুনবেন ?'
প্রমথ হেসে বলল, 'তুমি বড় অদ্ভুত কথা বলছ সুলতা। তোমার বাবা তোমার কথাই যদি না শোনেন, অন্য লোকের কথা শুনবেন কেন ?'
এর পর সুলতা আর তর্ক করল না। কিন্তু সেদিন গানও আর শিখল না, প্রমথ হারমোনিয়মটা টেনে নিতে সুলতা বাধা দিয়ে বলল, 'আজ থাক মাস্টারমশাই !'
সপ্তাহখানেক বাদে সুলতার বিয়ে হয়ে গেল। বাড়ির মাস্টার হিসাবে প্রমথকেও নিরঞ্জনবাবু নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়েছিলেন। প্রমথ ভেবেছিল, নিমন্ত্রণরক্ষা করবে আর গানের একখানা বই-টই উপহার দিয়ে আসবে সুলতাকে। কিন্তু ওই সময় পাটনায় বেশ বড় একটি সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। ভারতের নানা জায়গা থেকে ওস্তাদ শিল্পীরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। নিজের ওস্তাদের সঙ্গে প্রমথকেও যেতে হয়েছিল সেখানে।
সেই উপলক্ষে বহু জায়গা বেড়িয়ে এল প্রমথ, অনেক জনসভায় গান শুনে। কোন কোন জলসায় গাইলও।
প্রমথ একথা অস্বীকার করে না যে, ফিরে এসে কলকাতাটা একটু যেন ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল। বুধবার আর শনিবারের সন্ধ্যাটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইত না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে এক এক সময় বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। বন্ধুরা হয়ত বলত, 'কি হ'ল প্রমথ ? কিছু হারিয়েছে নাকি তোমার ?'
প্রমথ বন্ধুদের সন্দেহ ঘোচাবার জন্যে জবাব দিত, 'হ্যাঁ, পনের টাকার একটা টুইশ্যান ছুটে গেছে।'

বছর দুই বাদে একদিন শ্যামলের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় সুলতার কথা উঠল।
প্রমথ জিজ্ঞেস করল, 'ওদের আর খবর-টবর রাখ নাকি ?'
শ্যামল বলল, 'রাখব না কেন। এই তো কিছু দিন আগে সুলতার ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন

খেয়ে এলাম। যাই বল, ওর শ্বশুরের অন্তঃকরণটা বেশ ভালো, খুব খাইয়েছে-টাইয়েছে। কিন্তু খাওয়ার চেয়েও ষ্টীমাব-জার্নিটা আমার বেশ ভালো লাগল প্রমথ। প্রথমে যেতে চাই নি। মেসোমশাই জোর করে নিয়ে গেলেন। যাক, এই উপলক্ষে বেড়ানোটা হয়ে গেল, কি বল?'

প্রমথ বলল, 'গান-টানের আর চর্চা করে নাকি সুলতা?'

শ্যামল হেসে বলল, 'দূর দূর, তুমিও যেমন? বিয়ের পরে ওসব শখ আর থাকে নাকি মেয়েদের? পড়াশুনোই বল, আব গানই বল, সবই বিবাহেরই কারণং। পার হবার খেয়া। একবার পার হতে পারলে খেয়াঘাটের ডিঙিটার কথা আর কে মনে রাখে?'

প্রমথও হাসল, 'সত্যি বলেছ।'

মনে মনে ভাবল, অথচ এই সুলতাই সেদিন বলেছিল, গান ছাড়া সে আর কিছু চায় না। মেয়েরা মুখে অমন অনেক কথাই বলে। কিন্তু ছেলেদের কথা যে কেবল মুখের কথা নয়, তা প্রমথ প্রমাণ করে ছাড়ল। বাপ-মার অনেক অনুরোধ-উপরোধেও বিয়ে করল না, চাকরি-বাকরি করল না, বছরের পর বছর শুধু সুরেব পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। খ্যাতি আরো বাড়ল, নানা সঙ্গীত-সভায় ওর ডাক পড়ল। তারপর সেবার এক দুর্ঘটনায় ডাকাডাকির পালা প্রায় শেষ হয়ে এল। পূর্ণিয়া জেলার এক জলসা থেকে ফিরে আসবার পথে গাড়িতে জ্বরে ধরল প্রমথকে। কলকাতায় এসে পৌঁছবার পরেও সে জ্বর ছাড়ল না। ডাক্তার বললেন, টাইফয়েড। চার সপ্তাহ পরে জীবনমৃত্যুর সীমান্ত থেকে ফিরে এল প্রমথ। কিন্তু পুরোপুরি আসতে পারল না, এর চেয়ে মৃত্যুও যেন ভালো ছিল। আব কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি হয় নি, শুধু গলাটি গেছে। সেই স্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বর আর নেই। কোত্থেকে একটা অনুনাসিক আর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আওয়াজ এসে জুড়ে বসেছে তার গলায়। এ যেন তাব কণ্ঠ নয়, আর একজনের।

এই দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নিতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল প্রমথর, যথেষ্ট চোখের জল পড়েছিল। অর্থব্যয়ের কোন ত্রুটি হ'ল না। বুড়ো বাপ পর্যন্ত ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে। কিন্তু যা গেছে, তা আর ফিরল না। স্বজন-বন্ধু-ভক্তের দল প্রবোধ দিল, 'কেন, এখনো তো তোমার গান বেশ ভালোই শোনায়।'

প্রমথ একটু হেসে বলল, 'আমার গলাই গেছে, কান তো আর যায় নি!'

'কিন্তু মিষ্ট স্বরটাই কি সব? তোমাব এত পাণ্ডিত্য, এত শিক্ষা-দীক্ষা—'

প্রমথ বলল, 'শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া যায়, গানের প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু গলা গেলে আর গাওয়া যায় না।'

এই দুর্ঘটনার ফলে কিছুদিন পরম নৈরাশ্যবাদী পরম অদৃষ্টবাদী হয়ে রইল প্রমথ। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়াল। ঘুরতে ঘুরতে গেল মাইহারে। মধ্যপ্রদেশের এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য, কিন্তু সেখানকার রাজসভায় যে সেতারী সুরশিল্পী আছেন, তিনি ক্ষুদ্র নন। তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিল প্রমথ। ভাবল, সুরসাধনায় কণ্ঠই তো একমাত্র মাধ্যম নয়। টাইফয়েডের রায়কে সারা জীবনের জন্যে কিছুতেই সে মেনে নেবে না। বছর তিনেক ধরে ওস্তাদের কাছে সে যন্ত্রাভ্যাস করল। কিন্তু আশানুরূপ কিছুই হ'ল না।

ওস্তাদ বললেন, 'বাপু, নিজের গলার ওপর তোমার যতখানি মমতা ছিল, নিজের যন্ত্রের ওপর ততখানি নেই। ক্ষমতা আসবে কোত্থেকে, যার যতটুকু সাধনা, ততটুকুই সিদ্ধি। তার বেশি তো হবার জো নেই। তুমি অন্য পথ দেখ।'

অভিমানে কিছুক্ষণ প্রমথর মুখ থেকে কথা বেরোল না। এমন নিষ্ঠুর, এমন রূঢ় কথা বলতে পারলেন গুরু! নিঃশব্দে প্রণাম জানিয়ে ওস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল প্রমথ।

অন্য পথ! কিন্তু সে পথ কি? সে পথ কোথায়? এতদিন সুরের পথ ছাড়া তো আর কোন পথের সন্ধান জানে নি প্রমথ, সন্ধান নেয় নি। আজ কি সেই পথ ত্যাগ করবার সময় এসেছে? শহরের পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল প্রমথ। মনে শান্তি নেই। গুরু যতই বলুন সুরকে সে ছাড়তে পারবেনা। কিন্তু রাখবেই বা কিভাবে?

এই সময় দেখা হয়ে গেল পুরোন বন্ধু সুধীর গুপ্তর সঙ্গে। শুধু বন্ধু নয়, সতীর্থ। সুরতীর্থের যাত্রী। বালিগঞ্জে সে এক গানের স্কুল খুলেছে। তেমন শিক্ষক জুটছে না, বলল, 'তুইও আয়। যদি ভালো না লাগে, ছেড়ে দিস। জোর করে ধরে রাখব না।'

প্রমথ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা।'

এবার জীবিকার কথাটাও ভাবতে হচ্ছে। বাবা মারা গেছেন। পুত্রকলত্রের চাপে দাদা পিষ্ট। সংসারে সেই সচ্ছলতা আর নেই, কিছু রোজগার না করলে আর চলে না।

কিন্তু গানের স্কুলে শুধু জীবিকারই নয়, জীবনেরও খোঁজ পেয়ে গেল প্রমথ। দেখা গেল গুরুর কাছ থেকে সে আর-কিছু না শিখুক, শিক্ষাদানের বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছে। শিখেছে কি করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। আগে ভেবেছিল, শিল্পীর সঙ্গে শিক্ষকের মূল-গত বিরোধ আছে। এখন মনে হ'ল, সে বিরোধ কাল্পনিক। চক-খড়ির দাগে ছক-কাটা। সে ছক কখন যে মুছে যায়, টের পাওয়া যায় না।

এ অবশ্য আপোষের কথা। কিন্তু আপোষ মানুষকে করতেই হয়। প্রমথও করল। সুধীরের অনুরোধে বিয়ে করল তার বোনকে। মাধুরী দেখতে বেশ সুন্দরী, গান না জানলেও লেখাপড়া জানে। বি-এ পাশ করেছে। প্রমথর মত একজন সামান্য গানের মাস্টারের পক্ষে এ পুরস্কার আশাতীত। বিশেষ করে প্রমথ যখন শুনল, এ কেবল সুধীরেরই অনুরোধ নয়, এ তার বোনেরও সানুরাগ অনুনয়, সে আত্মপ্রসাদ না বোধ করে পারল না। মানুষ সবই চায়, সবই তার দরকার। শুধু সুরের ক্ষুধাই তো আর একমাত্র ক্ষুধা নয়।

তারপর বছর পাঁচেক আগে একদিন বিকালে কাজে বেরোবার আগে দোলনায় ঘুমোন শিশুপুত্রকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে একটু আদর করে নিচ্ছে প্রমথ, তাদের সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। প্রমথ এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিয়ে দেখল, একজোড়া অপরিচিত স্ত্রীপুরুষ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রমথ বিস্মিতভাবে তাঁদের দিকে তাকাতেই মেয়েটি বলে উঠল, 'মাস্টারমশাই, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

প্রমথ অপ্রতিভভাবে একটু হাসল। 'খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় যে—'

মেয়েটির মুখে একটু যেন নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল। খানিক বাদে পূর্ণ আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি সুলতা, আমাকে শ্যামবাজারে আপনি গান শেখাতেন।'

প্রমথ বলল, 'ও, তুমি? তাই বল। কতদিন পরে দেখা!'

সুলতা বলল, 'দশ বছর। আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি, আপনি কিছুই বদলান নি।'

বদলান নি! শুধু চেহারার পরিবর্তনটাই বুঝি সব! এই দশ বছরে কত যে অদল-বদল হয়েছে প্রমথর, তার খোঁজ সুলতা কি করে রাখবে। ভিতরের কথা প্রমথ জানে না, বাইরের দিক থেকে সুলতার চেহারারও কিন্তু বেশ পরিবর্তন হয়েছে। আরো যেন কালো হয়েছে সুলতা, ভরাট গালটা ভেঙে গেছে। আগে সৌন্দর্য না থাক, একটা তীক্ষ্ণতা ছিল। এখন তাও নেই। সিঁথির মোটা সিঁদুরের দাগে, কপালের গোলাকার বড় ফোঁটায় কেমন এক গেঁয়ো গেঁয়ো ভাব। কথায় স্পষ্ট বরিশালী টান। হঠাৎ দেখে পুরোন ছাত্রীকে চিনতে না পারা প্রমথর পক্ষে এমন কিছু মারাত্মক দোষের হয় নি।

সুলতা বলল, 'সেদিন শ্যামলদা-দের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাত্রে রেডিওতে শুনলাম আপনার সরোদ। আঃ কী ভালোই যে লাগল! নাম শুনেই আমার কেমন মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয়ই আপনি, এ প্রমথ সেন আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। শ্যামলদাকে জিজ্ঞেস করতে তিনিও তাই বললেন। তাঁর কাছে শুনলাম—আপনি আজকাল শুধু বাজাচ্ছেন, গাইছেন না!'

একটু চুপ করল সুলতা। প্রমথর গাওয়া আর বাজানোর মধ্যে যে দুঃখের ইতিহাসটুকু আছে, শুধু নীরব থেকে, শুধু প্রমথর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে, সেই ইতিহাসকে সুলতা সহানুভূতি জানাল। একটু বাদে বলল, 'কিন্তু আপনার বাজানোও ভারি চমৎকার। সেদিনের বাজনা আমার কানে এখনো লেগে রয়েছে। সেই থেকেই ওঁকে আমি বলছি, আমাকে নিয়ে চল, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করে আসি। উনি বললেন, তার চেয়ে তোমার মাস্টারমশাইকে নিমন্ত্রণ

করে আনো না কেন ? কিন্তু আমরা যে বাড়িতে থাকি, সে আপনার যাওয়ার মত জায়গা নয়। তা ছাড়া, ডাকলেও আপনি বুঝতে পারতেন না কে ডেকেছে। তাই নিজেই এলাম। কদিন আগেই আসতাম, কিন্তু উনি কিছুতেই সময় পান না।' সুলতার সঙ্গীটি লজ্জিত ভঙ্গীতে কৈফিয়তের সুরে বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে অনেক দিন ধরেই বলছিল। কিন্তু নানা কাজ-কর্মের চাপে আমি আর সময় করে উঠতে পারিনি। আপনার কথা আপনার ছাত্রীর মুখে আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আমার কথা আপনার শোনবার কথা নয়। আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ দাস। একটা স্কুলে সামান্য মাস্টারি করি।'

প্রমথ বলল, 'তাতে কি হয়েছে! আমিও তো মাস্টার। আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।'

সুলতার স্বামীকে বৈঠকখানায় বসিয়ে সুলতাকে একেবারে অন্দর-মহলে নিয়ে গেল প্রমথ। পুরোন ছাত্রী বলায় মাধুরী একটু ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়েছিল, কিন্তু সুলতার চেহারা দেখে সেই কুঞ্চনটা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। সুলতাকে সে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলল, 'আসুন আসুন।'

তারপর অনেক কথাই বলল সুলতা। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওর জীবনের এই দশ বছরের একটানা ইতিহাস প্রায় সবই প্রমথ জেনে ফেলল। এতদিন ধরে গাঁযের শ্বশুরবাড়িতে সুলতা ঘর-সংসার করেছে। শ্বশুর বিয়েব অল্প দিন পরেই মারা যান। সেই সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তিও, অল্পস্বল্প যা ছিল, দেনার দায়ে প্রায় সব শেষ হয়ে আসে। বাকি যেটুকু বা আছে, পাকিস্তান হওয়ায় তাও সব ফেলে আসতে হয়েছে। স্বামী অবশ্য গোড়া থেকে কলকাতাতেই থাকত। কিন্তু থাকলে হবে কি, নিজের স্বভাবের দোষে ভালো চাকরি-বাকরি কিছু যোগাড় করতে পারেনি। কেবল একটা ছেড়েছে, আর একটা ধরেছে। হাঁড়িতে কালি পড়েনি। এখন মাস্টারি আর ট্যুইশনি সম্বল। বাসা করেছে মানিকতলায় ফুলবাগান লেনে। নামেই ফুলবাগান। আসলে ফুলও নেই বাগানও নেই, আছে কতকগুলি বস্তি। ভালোভাবে বাস করার মত বাসা পায়নি সুলতারা। কিন্তু উপায় কি, শহরে ঘর-বাড়ি তো আজকাল আর চাইলেই পাওয়া যায় না।

এ সব প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে মাধুরী বলল, 'ছেলেপুলে হয়নি ?'

'হয়নি আবার ! চারটে হয়েছে—দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে।'

মাধুরী বলল, 'তাদের আনলেন না কেন ?'

সুলতা বলল, 'হ্যাঁ, ওই একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে কি কেউ কারো বাড়ি আসতে পারে ? এক একটি যা অস্থির।'

মাধুরী বলল, 'না না, এ আপনাব ভারি অন্যায়, এর পর যেদিন আসবেন ওদের সবাইকে নিয়ে আসবেন।'

সুলতা হেসে একটু ঘাড় নাড়ল।

চা আর জলযোগের পর খানিক বাদে বিদায় নিল ওরা। ট্রাম-লাইন পর্যন্ত প্রমথ ওদের এগিয়ে দিতে গেল।

বীরেন খানিকটা আগে আগে চলছিল। প্রমথর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুলতা এক সময় বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে। যেজন্যে আসা, সেই আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি।'

প্রমথ বলল, 'বেশ, বল।'

সুলতা প্রমথর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'উঁহু, এখন নয় এখানে নয়। আপনি যাবেন আমাদের বাসায়, তখন বলব। কবে যাবেন, বলুন। খুব জরুরী কথা কিন্তু। কালই আসুন।'

ওর উচ্ছলতা, অত অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলবার ভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেল প্রমথ। ও যেন সত্যিই চারটি সন্তানের মা নয়, তের চোদ্দ বছরের কুমারী কিশোরী। দুজনের মধ্যে এই দশ বছরের অদর্শনের ব্যবধান যেন সত্যিই ছিল না। যেন এতদিন ধ'রে রোজই ওদেব দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে।

প্রমথ মাথা নেড়ে বলল, 'কাল আমি খুবই ব্যস্ত থাকব সুলতা।'

'যত ব্যস্তই থাকুন, যাওয়া চাই। কাল যদি নেহাৎ না-ই পারেন, পরশু অবশ্যই যাবেন। পরশুর ওদিকে গেলে আর হবে না।'

প্রমথ বলল, 'এমন কী কথা, যা এখানে বলতে পার না ?'

সুলতা হাসির ভঙ্গীতে এক গভীর রহস্যের আভাস এনে বলল, 'আছে একটা কথা।'

এত করে যখন বলছে, না যাওয়াটা ভালো দেখায় না। দিন-তিনেক পরে কোন রকমে একটু সময় করে নিয়ে প্রমথ খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হ'ল সুলতাদের ফুলবাগান লেনে।

দুরবস্থার বর্ণনা সুলতা বাড়িয়ে করেনি। সত্যিই একটা বস্তির মধ্যে বাসা। নিচু নিচু ঘর। এক ইটের গাঁথনির দেয়াল। ওপরে টালির চাল, সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। আগের দিনের বৃষ্টির কাদা এখনো শুকোয়নি। নতুন কেনা জুতো-জোড়ার জান বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে প্রমথ এক সময় গিয়ে সুলতাদের দোরের কাছে পৌঁছতে পারল।

কড়া নাড়তেই একটি কৃশা বৃদ্ধা মহিলা বিরক্তির ভঙ্গীতে হুড়কো খুলতে খুলতে বললেন, 'কে রে আবার দোরটা ঠক ঠক করছে। দিন নেই, রাত নেই, বাবারে বাবা, আর পারিনে!'

প্রমথকে দেখে কর্কশস্বরে বললেন, 'কি চান আপনি?'

একটু ইতস্তত করে সুলতার নামটা প্রথমে বলল না প্রমথ, বলল, 'বীরেনবাবু আছেন?'

বৃদ্ধা বললেন, 'না, সে এখনো ফেরে নি। সে আবার এত সকালে কবে ফেরে?'

প্রমথ তখন বলল 'সুলতা আছে?'

'আছে। আপনি ওর বাপের বাড়ির কেউ হন নাকি?'

প্রমথ একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, কিছু হইনে। ওর বাপের বাড়িতে আমি ওকে গান শেখাতাম।'

বৃদ্ধা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, 'ও, গান শেখাতেন।'

ঠিক এই সময় ভিতর থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল সুলতা। ওর মাথায় আঁচল নেই। হাত ময়দায় মাখা। রুটি করতে করতে উঠে এসেছে।

প্রমথকে দেখে সুলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আসুন, ভিতরে আসুন! মা, ইনি আমার মাস্টারমশাই।'

বৃদ্ধা একটু সরে গিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বললেন, 'শুনেছি।'

মেঝেয় মাদুর পেতে প্রমথকে বসতে দিল সুলতা। তারপর বলল, 'কাল আপনার আসবার কথা ছিল। আমি কতবার যে ঘর-বার করেছি তার আর ঠিক নেই, দোরের কাছে একটু শব্দ হ'লেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছি- এই বুঝি এলেন।'

ওর এই উচ্ছলতায় প্রমথ একটু সংকোচ বোধ করল, একটু সন্ত্রস্তও হ'ল। পাশের ছোট্ট ঘরটিতেই ওর শাশুড়ী রয়েছেন। এসব শুনে তিনি কী মনে করবেন! একজন নিঃসম্পর্কীয় মাস্টারের সঙ্গে পুত্রবধূর এত অন্তরঙ্গ আলাপ নিশ্চয়ই তাঁর কানে খুব ভালো শোনাবে না।

প্রমথ সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলল, 'কাল অন্য কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই আসতে পারিনি। তারপর—কি কথা তোমার বল।'

সুলতা বলল, 'বলছি, বসুন একটু।'

ভিতরের দিকে এক চিলতে বারান্দা। সেখানে গুটি দুই উলঙ্গ ছেলেমেয়ে তাল-করা ময়দার থালাটা নিয়ে টানাটানি করছিল। সুলতা যেতেই বলে উঠল, 'মা, খেতে দাও।'

সুলতা বিরক্তি চেপে বলল, 'দিচ্ছি দিচ্ছি; একটু বোস।'

ওদের সামনে মুড়িটুড়ি কিছু এগিয়ে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে সুলতা ফের এসে বসল প্রমথর সামনে। তারপর তেমনি রহস্যময় ভঙ্গীতে বলল, 'আন্দাজ করুন তো কি কথা হতে পারে।'

ঘরের চারিদিকে প্রমথ একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পূর্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা পুরোন ট্রাঙ্ক, তার ওপর একটা ভাঙ্গা স্যুটকেস। একদিকে বিছানা গুটানো। দেয়ালে আটকানো সস্তা আলনায় কতকগুলি ছেঁড়া আধ-ময়লা জামাকাপড়; গোটা দুই তাকে ছেলেমেয়েদের খেলনা, বড় একটা কাঁচের বৈয়মে তলায় পড়ে থাকা খানিকটা চিনি, গোটা দুই হাতলভাঙ্গা চায়ের কাপ।

এর ভেতর থেকে সুলতার মনের কথা আন্দাজ করা প্রমথর পক্ষে সহজসাধ্য হ'ল না।

প্রমথ বলল, 'তোমার কথা আমি কি করে অনুমান করব, বল? আমি তো আর দৈবজ্ঞ নই!'

সুলতা বলল, একজনের মনের কথা জানতে হ'লে কি দৈবজ্ঞ হতে হয় ?'

প্রমথ এ কথার কোন জবাব দিল না।

সুলতা বলল, 'শুনুন, আপনাকে আবার গান শেখাতে হবে।'

প্রমথ বলল, 'কাকে ? তোমার ছেলেমেয়েদের ?'

সুলতা বলল, 'না ছেলেমেয়েদের নয়, আমাকে, আমি ফের আপনার কাছে গান শিখব।'

প্রথমে প্রমথ ভাবল, সুলতা ঠাট্টা করছে। কারণ, ওর বয়স অথবা পারিবারিক পরিবেশ—কোনটাই সুলতার সঙ্গীতচর্চার পক্ষে অনুকূল নয়।

প্রমথ বলল, 'বেশ তো।'

কিন্তু সুলতা প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হাসছেন যে ! আমি কিন্তু সত্যিই বলছি, গান আপনি আমাকে না শিখিয়ে পারবেন না।'

প্রমথ বলল, 'কিন্তু নতুন ক'রে গান শেখার বয়স কি আর তোমার আছে সুলতা ?'

একটু যেন লজ্জার আভাস দেখা দিল সুলতার মুখে।

বলল, 'বয়স ? না, বয়স হয়ত আর নেই। কিন্তু মাস্টারমশাই, দশ বছর আগে আপনিই একদিন বলেছিলেন, বিদ্যার সাধনায় মানুষকে মনে করতে হয় তার জরা নেই, তার মরণ নেই, সে চিরদিন থাকবে। আজ এই দশ বছর বাদে কি সেকথাটা মিথ্যে হয়ে গেল ?'

প্রমথ বলল, 'তা ঠিক নয়, কিন্তু অবস্থা বলেও তো একটা কথা আছে।'

সুলতা বলল, 'আমরা খুব গরীব, সেই কথা বলছেন ?'

প্রমথ বলল, 'না সেকথাও বলছিনে। বলছি তোমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, সংসারের কত দায়িত্ব চেপেছে ঘাড়ে, এখন কি তোমার পক্ষে এসব সম্ভব হবে ?'

সুলতা দৃঢ়স্বরে বলল, 'হবে মাস্টারমশাই, সম্ভব আমি করে তুলব। এতকাল বাদ ফের যখন কলকাতায় আসতে পেরেছি, এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ব না আমি।'

পাশের ঘর থেকে সুলতার শাশুড়ী একটু কাসলেন, 'বউমা, দেখ গিয়ে ওদিকে বিণ্টু আর রিণ্টু বোধ হয় মারামারি ক'রে মরল।'

সুলতা জবাব দিল, 'মরুক, আপনি থামিয়ে রাখুন না খানিকক্ষণ। আমি একটু পরে যাচ্ছি।' তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দেখুন, আমি সব বের করে রেখেছি।'

তাকের ওপর থেকে পুরোন গানের খাতাগুলি সে নামিয়ে আনল, সেই সঙ্গে বেরুল আরো খানদুই খাতা। তাতে প্রমথর নিজের হাতের নোট লেখা, স্বরলিপি লেখা কোন কোন গানের। দু'একটা পাতা উল্টে দেখতে লাগল প্রমথ, ভারি অদ্ভুত লাগল তার। এই দশ বছরে প্রমথর নিজের হাতের লেখার ধাঁচ পাল্টে গেছে, গান সম্বন্ধে থিয়োরীর বদল হয়েছে, তখন যেসব নোট দিয়েছে তার দু' একটা ভুল এখন নিজের চোখেই ধরা পড়ল।

প্রমথ বলল, 'আশ্চর্য, তুমি সব তুলে রেখেছ ?'

সুলতা বলল, 'সব। কিচ্ছু হারাইনি। কেবল বিণ্টু ওই খাতার মলাটটা সেদিন টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। আপনাকে রাজী হতেই হবে মাস্টারমশাই। আপনার উপযুক্ত টাকা তখনো দিতে পারিনি, এখন তো আরো পারব না। কিন্তু তবু আপনার ওপর আমার দাবী আছে।'

প্রমথ বলল, 'টাকার কথা বাদ দাও। কিন্তু সময় করাই যে মুশকিল। সারা সপ্তাহ স্কুল আর টুইশানে ঠাসা।'

সুলতা বলল, 'ওরই মধ্যে একটু সময় আমার জন্যে আপনাকে দিতেই হবে। আমি যে বড় আশা করে আছি মাস্টারমশাই, আমার কথা আপনি কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।'

তারপর এই দশ বছর ধরে প্রতীক্ষার ইতিহাসের কথা বলে গেল সুলতা। বিয়েটা যাতে না হয়, তার জন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। বাবাকে বলেছে, মাকে বলেছে, শ্যামলদাকে বলেছে, কিন্তু কেউ তার কথা শোনেননি। শেষ পর্যন্ত তার বিয়ে হয়েই গেল। বাবা অন্য যৌতুকের মধ্যে হারমোনিয়মটা দিতে দিতে বললেন, 'এটা নিয়ে যা, অবসর মত চর্চা করিস।'

কিন্তু চর্চা করবার মত অবস্থা শ্বশুর-বাড়িতে ছিল না। অজ পাড়াগাঁ। গান-বাজনার কোন চর্চা নেই সেখানে। মাঝে মাঝে শখের যাত্রা-থিয়েটার অবশ্য ছেলেরা করত। আর শ্বশুর ভালোবাসতেন শ্যামাসঙ্গীত। তিনি মাঝে মাঝে গাইতে বলতেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন রইলেন না। বছর দেড়েকের মধ্যেই মারা গেলেন। সংসারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। স্বামী কলকাতা থেকে বছরে দু'একবার ছুটিতে যেতেন বাড়িতে। যখন মন ভাল থাকত, বলতেন, 'তুমি তো গান জানো, গাওনা একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত।' তারপর চলে এলে আবার চুপচাপ। তবু মাঝে মাঝে গানের খাতা আর হারমোনিয়ম নিয়ে বসত সুলতা। কিন্তু তাতেও বাধা পড়তে লাগল। সে গান জানে শুনে সেই সখের থিয়েটারের উনিশ-কুড়ি বছরের একটি বেকার ছেলে এসে জুটল। সুলতা গলা খুললেই সে এসে তাদের তক্তাপোশে বসে দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তাল দিতে দিতে বলে, 'বাঃ চমৎকার গাইছ তো বউদি!'

খালি বাড়িতে তার যাতায়াত শাশুড়ী পছন্দ করলেন না। তা ছাড়া ছেলেটির ভাবভঙ্গীও তাঁর অপছন্দ হল। তার ভয়ে কিছুদিন গান গাওয়া বন্ধ রাখতে হ'ল সুলতাকে। তারপর বছর কয়েক বাদে সে ছেলে যখন চাকরি নিয়ে বিদেশে গেল তখন সুলতার নিজেরই ছেলেপুলে হয়ে গেছে। তাই নিজস্ব ভঙ্গীতে ও গানের চর্চাটা একেবারে অব্যাহত রাখতে পারেনি। ছেড়েছে আর শুরু করেছে, ছেড়েছে আর শুরু করেছে। দু'তিন বছরে একবার করে কলকাতায় এসেছে বাপের বাড়িতে। দু'চারখানা নতুন গান লিখে নিয়ে গেছে। আর খোঁজ করেছে মাস্টারমশাইয়ের। কিন্তু প্রতিবারই শুনেছে তিনি বাইরে গেছেন। কিছুতেই দেখাসাক্ষাৎ যোগাযোগ আর ঘটে ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে আশা ছাড়েনি সুলতা। ফাঁক পেলেই নিজের ধরনে চর্চা করেছে গানের। গলাটা যাতে একেবারে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই ছিল ওর চিন্তা। তা যায়নি। বছরের পর বছর গেছে, তবু সুলতা ভেবেছে, একবার সুযোগ পেলে হয়, একবার কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে হয়, তখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখবে। তারপর রেডিওতে প্রমথর সেদিন বাজনা শুনে মনে আরো উৎসাহ পেয়েছে সুলতা। মাস্টারমশাই যখন এই বয়সে এমন একটা নতুন জিনিস শিখতে পারলেন, সুলতাও কি পারবে না? অনেক অসুবিধা আছে, অনেক বাধাবিঘ্ন আছে! কিন্তু তাতে কি। মাস্টার মশাই সহায় হ'লে সুলতা কিছুতেই আর ভয় পাবে না।

সবশেষে সুলতা বলল, 'দশ বছর আগে আপনি আমার অনুরোধ রাখেননি, আপনি আমাকে বিমুখ করেছেন, এবারও কি তাই করবেন?'

প্রমথ খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, আসব আমি।'

সুলতা উল্লসিত হয়ে বলল, 'কবে, কবে? সেই বুধবার আর শনিবার?'

'না, ও দুদিন আজকাল আমি ভারি ব্যস্ত থাকি। অন্য টুইশ্যন আছে।'

বলেই একটু যেন কষ্ট হ'ল প্রমথর। ভাবল, শেষ কথাটা না বললেই পারত।

সুলতা বলল, 'ও আচ্ছা। আপনার যে দিন সুবিধে হয়।'

একটু ভেবে দিনটা ঠিক ক'রে দিল প্রমথ, বলল, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেকের জন্যে ফাঁক আছে একটু।'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা আমার ওইটুকুই যথেষ্ট।'

প্রমথ বলল, 'তা যেন হ'ল। কিন্তু তোমার স্বামীর মত আছে তো? বীরেনবাবু আবার আপত্তি-টাপত্তি না করেন।'

সুলতা একটু হেসে বলল, 'না না, আপত্তি করবেন কেন? গান তিনি ভালোবাসেন। তাছাড়া এতকাল ঘর-সংসার করে আমার কি নিজের ইচ্ছে মত একটা কিছু করবার অধিকারও নেই? সবই তো ওঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে।

প্রমথ বলল, 'আচ্ছা তাহলে উঠি।'

'না না, বসুন একটু।' বলে উঠে গিয়ে সুলতা চা আর জলখাবার তৈরী করে নিয়ে এল। সেই পুরোন দিনের মত মোহনভোগ। কিন্তু আজ খেতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করল প্রমথ। দরজার আড়াল থেকে শোনা গেল বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলির গলা, 'মা, আমাকে দাও, আমাকে দাও!'

পরের সপ্তাহ থেকে পুরোন ছাত্রীকে ফের গান শেখাতে শুরু করল প্রমথ। প্রায় নতুন করেই শুরু করতে হ'ল। কিন্তু সুলতার কিছুতে সঙ্কোচ নেই। ও গোড়া থেকে আরম্ভ করতে রাজী।

কিন্তু এক ঘণ্টা সময় দেওয়া ওর পক্ষে কঠিন। ছেলেমেয়েদের কান্না, মারামারি; শাশুড়ীর নালিশও মাঝে মাঝে কানে আসে: 'সকলের ঘরেই বউঝি থাকে। কিন্তু এমন ছিষ্টিছাড়া বউও আমি দেখিনি, এমন শখও দেখিনি! ছেলেমেয়েগুলোর কোনটা কোথায় গেল তার ঠিক নেই, উনি গান গাইবেন!'

গান বন্ধ করে সুলতা জবাব দেয়, 'যাবে কেন মা? সবাই তো আপনার সামনেই রয়েছে। আমি তো সবই সেবে-সুরে রেখে এসেছি. একটা ঘণ্টাও কি সবুব করতে পারবেন না?'

শাশুড়ী প্রতিবাদ করেন, 'একটা ঘণ্টা! তুমি তো চব্বিশ ঘণ্টাই গান নিয়ে আছ।'

সুলতা বলে. 'চব্বিশ ঘণ্টা গান নিয়ে থাকলে কি আর আপনার সংসার চলত?'

শাশুড়ী জবাব দেন, 'আমার সংসার না কচু! আমার সংসার হ'লে কি এমন যার যা খুশি সে তাই করতে পারত?'

প্রমথ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, সুলতা বাধা দিয়ে বলল, 'উঠছেন যে? আমাদের এর মধ্যেই কাজ করতে হবে।'

প্রমথ বলল, 'কিন্তু কাজ হচ্ছে কই. তুমি কি গান করবে না ঝগড়া করবে?'

সুলতা লজ্জিত হ'ল। একটু বাদে বলল, 'সত্যি গলাটা যদি কেবল গানের জন্যেই হ'ত. যদি ঝগড়াঝাঁটি কিছু না থাকত দুনিয়ায়।'

মাসখানেক পরে পনের টাকার দু'খানি নোট প্রমথর দিকে এগিয়ে ধরল সুলতা। এবার আর গানের খাতার মধ্যে মাইনের টাকাটা লুকিয়ে রাখেনি। বুঝতে পেরেছে, অত বেশি লজ্জা করবার বয়স আর নেই, সে দিন গেছে। অর্থকে নিরর্থকও বোধ হয় আর বলতে চায় না সুলতা। অর্থের প্রয়োজনটা এতদিনে ও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

প্রমথ বলল, 'ও কি!'

সুলতা বলল, 'কিছু না আপনি যা অন্য জায়গায় পান, তার তুলনায় এ কিছুই না। কিন্তু এর বেশি যে দেব, তার সাধ্যও যে আমার নেই মাস্টারমশাই।'

প্রমথ বলল, 'কিন্তু তোমাকে দিতে কে বলেছে? আমি কি টাকার জন্যে গান শেখাতে এসেছি?'

সুলতা বলল, 'তা যে আসেন নি, তা জানি। তবু কি না দিয়ে পারি মাস্টারমশাই? আপনিই বলুন, একেবারে কিছু না দিলে কি ভালো দেখায়?'

প্রমথ এবার একটু হাসল, 'ভালো দেখানোর কথাটাই বা তুমি এত ক'রে ভাবছ কেন?'

সুলতা বলল. 'ভাবতে হয় বৈ কি মাস্টারমশাই। মেয়েদের অনেক ভেবে-চিন্তে চলতে হয়। কিছু না দিলে উনি কি মনে করবেন।'

চার ছেলের মার এই সতর্কতা দেখে প্রমথ মনে মনে হাসল। বলল, 'তেমন খুঁৎখুঁতে মন নাকি বীরেনবাবুর? তা হ'লে তো আগে থেকে সাবধান হ'তে হয়?'

সুলতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না না, সে সব কিছু না। আমি তা ভেবে বলিনি। এর মধ্যে মান-সম্মানের কথাও আছে কিনা। আমি যদি কেবল আপনার ছাত্রী হতাম, তা হ'লে কোন কথাই ছিল না। তাহ'লে গুরুদক্ষিণা হিসেবে শুধু ভক্তিশ্রদ্ধা দিলেই হ'ত। কিন্তু তা তো আপনি হ'তে দিলেন না।'

সুলতার এই সারল্য প্রমথর ভারি ভালো লাগল। আর কোন তর্ক না ক'রে পনেরটি টাকা ঘড়ির-পকেটে গুঁজে রাখল প্রমথ। ফেরবার পথে গানের কলির মত একটা কথা বারবার কানে বাজতে লাগল, 'আমি যদি কেবল আপনার ছাত্রী হতাম—'

প্রমথর মনে হ'ল, এমন একটি সুরেলা কথা যার মুখ থেকে বের হয়, তার মুখ সুন্দর। সৌন্দর্যের সাধারণ মানদণ্ডে তার বিচার চলে না। যে আপনজন সে সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়, সে অন্তরঙ্গ।

মাসকয়েক বাদে প্রমথ বলল, 'তোমার তো এবার একটি তানপুরার দরকার।'

সুলতা লুব্ধ ভঙ্গীতে বলল, 'দিন না একটি জোগাড় ক'রে। কত দাম পড়বে?'

দাম। প্রমথ বিনা দামেই হয়তো দিতে পারে। কিন্তু সেদিনের পনের টাকার কথাটা ওর মনে পড়ল। বলল, 'আমার চেনা দোকান আছে, ব'লে ক'য়ে টাকা পঁচাত্তরের মধ্যে ক'রে দেওয়া যেতে পারে।'

সুলতা বলল, 'পঁচাত্তর!'

একটু যেন ম্লান বিষণ্ণ দেখাল সুলতার মুখ। একটু বাদে বলল, 'অত টাকা! আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, যদি মাসে মাসে ইনস্টলমেণ্টে দিই?'

প্রমথ বলল, 'তাও বোধ হয় হতে পারে।'

দোকানের সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই করল প্রমথ। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা-শোধের বন্দোবস্ত হ'ল। নিজে দেখে-শুনে ভালো একটি তানপুরা নিয়ে এল প্রমথ। সুলতার উল্লাস ঠিক একটি কিশোরী মেয়ের মত। 'সত্যি মাস্টারমশাই, এমন একটি জিনিস যে আমার হবে, কোনদিন যে তানপুরা আসবে আমার ঘরে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!'

প্রমথ হেসে বলল, 'যাক, এবার তো অভাবিত কিছু হ'ল! গানটায় আরো মন দাও। তেমন কিন্তু এগুচ্ছে না।'

সুলতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি, ক'দিন গান নিয়ে আর বসতেই পারিনি। বড় ছেলের জ্বর। ও একদণ্ড কাছ-ছাড়া করতে চায় না। ভাবি বিরক্ত করে।'

এবার লজ্জিত হওয়ার পালা প্রমথর। সুলতার যে ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, অর্থকৃচ্ছ্র আছে, মাঝে মাঝে সেকথা ভুলে যায় প্রমথ। সপ্তাহের ওই একটি ঘণ্টায় গীতনিষ্ঠ একটি মেয়ের রূপই ওর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। কিন্তু সেই তো ওর একমাত্র সত্তা নয়। ও যে আরো অনেক, আরো অনেক কিছু।

সুলতার সঙ্গে সঙ্গে ওর ছেলের রোগশয্যার পাশে নিজেও এগিয়ে এল প্রমথ, 'কেমন আছ খোকা?'

খোকা অন্যদিকে মুখ ফেরাল, প্রমথর ওপর সে মোটেই প্রসন্ন নয়।

সুলতা ঝুঁকে প'ড়ে ওর কপালে হাত রাখল, 'ছি, মাস্টারমশাই কি বলছেন শোন। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে হয় না বুঝি বিণ্টু? স্কুলে কী পড়াশুনো শিখছ!'

আট ন' বছর বয়স হবে ছেলের। দুরন্ত রাগে সে মার হাত ঠেলে ফেলেদিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এসো না, তুমি আমার কাছে এসো না। তুমি তোমার গান আর গানের মাস্টার নিয়েই থাক। আমার অসুখ করেছে তাতে তোমার কি? মা তো না, বাইজী!'

সুলতা রুগ্ন ছেলের গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিল, 'কি, কি বললি?'

পাশের ঘর থেকে সুলতার শাশুড়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, রোগা ছেলেটাকে এবার মেরে ফেল। সেইটুকুই বাকি আছে।'

'অমন অসভ্য কথা বলবে কেন ও? এ যে কার শিক্ষা, তা আমার বুঝতে বাকি নেই আর। বিণ্টু, ফের যদি অমন কথা বলবি—

বিণ্টুরও জেদ কম নয়। মার খেয়ে সেই জেদ ওর আরো বেড়ে গেছে। বিণ্টু আরো জোরে চেচাঁতে লাগল, 'ইস, বলব না! হাজার বার বলব। মা নয়, বাইজী—মা নয় বাইজী—বাইজী, বাইজী, বাইজী।'

প্রমথ বিব্রত হয়ে বলল, 'সুলতা, আমি আজ চলি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে খানিকটা এগুতেই পিছন থেকে ডাক শুনল, 'মাস্টারমশাই!'

প্রমথ ফিরে তাকাল, 'কি ব্যাপার?'

সুলতা বলল, 'আপনি আর আসবেন না মাস্টারমশাই। গান আমি ছেড়ে দেব।'

প্রমথ কোন কথা বলল না।

সুলতা বলল, 'ছেলের মুখে ওকথা আমি আর শুনতে পারব না, মাস্টারমশাই। ছেলে যে আমার পর হয়ে যাচ্ছে। গানের জন্যে আমার সব যাচ্ছে।'

অন্ধকারে ওর চোখ দেখতে পেল না প্রমথ, শুধু গলাই শুনতে পেল। সে গলা ভিজে।

প্রমথ মনে মনে ভাবল, একদিন এই সুলতাই বলেছিল, গান ছাড়া সে আর কিছুই চায় না। আজ আর সেকথা ওর বলবার জো নেই, আজ ও সব চায়। ছেলের শ্রদ্ধাও চায়, স্বামীর ভালোবাসাও চায়—আর সেই সঙ্গে চায় গানকে। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? শিল্প বড় নিষ্ঠুর। সে অনেক কেড়ে নিয়ে তবে একটু দেয়। তার জন্যে সব ছেড়ে এলে, তবে তার একটু করুণা মেলে। তার অভিসারের পথ যেমন নিঃসঙ্গ তেমনি বন্ধুর।

পর পর গোটা দুই মঙ্গলবার সুলতাদের ওখানে আর গেল না প্রমথ। সারা সন্ধ্যাটা স্ত্রীর সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাল।

মাধুরী ঠাট্টা ক'রে বলল, 'ব্যাপার কি, তোমার ছাত্রী যে পথ চেয়ে বসে থাকবে!'

প্রমথ বলল, 'না, তা থাকবে না। গান সে ছেড়ে দিয়েছে। ওর পক্ষে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

বলে সেদিনের ঘটনাটার কথা স্ত্রীকে শোনাল প্রমথ। শুনে মাধুরী এবার আর ঠাট্টা করল না, নিজের ছেলেকে বুকে চেপে বলল, 'ওইরকমই হয়, ছেলে যে কি, তা তো আর বুঝলে না?'

কিন্তু পরদিনই এক পোস্ট-কার্ড এসে হাজির।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি কি সত্যিই ভাবলেন, আমি গান ছেড়ে দিয়েছি? গান কি আমি ছাড়তে পারি? এতদিনই ছাড়লাম না, এত কাছে পেয়ে, এত সুযোগ পেয়ে ছাড়ব, আপনি তা ভাবলেন কি ক'রে? সামনের মঙ্গলবার অবশ্যই আসবেন। দু'একদিন যদি আগে আসতে পারেন, আরো ভালো হয়। ভয় নেই, বিন্টুর জ্বর ছেড়ে গেছে। আপনার সব লেসন আমি তৈরী ক'রে রেখেছি। জিজ্ঞেস করলে যদি না পারি, আপনি ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন। মাধুরী আর বাচ্চু কেমন আছে? ওদের আমার স্নেহাশিস্ জানাই। ইতি—সুলতা।'

মাধুরী বলল, 'নাও, প্রাণ ঠাণ্ডা হল তো?'

প্রমথ একটু হাসল, 'একজনের ঠাণ্ডা, আর একজনের গরম।'

প্রমথ ভাবল, এবার গিয়ে বুঝিয়ে আসবে সুলতাকে। যেটুকু শিখেছে, তা-ই ওর পক্ষে ঢের। অবস্থায় যা কুলোয়, তার বেশি আকাঙ্ক্ষা করতে নেই, যোদ্ধবেশ কি আর সব সময় চলে? সন্ধি করতে হয় পরিবেশের সঙ্গে। প্রমথও তো করেছে। সেও তো সারাদিন জীবিকার কথা ভাবে। দু'দুটো স্কুলে কাজ করে, গোটা চার পাঁচ টুইশান আছে। আজকাল বাইরের কোন নিমন্ত্রণ এলেও রাখতে পারে না, অন্য পাঁচরকম দায়িত্বের কথা ভাবতে হয়। একটু যে নিজের মনে গাইবে কি বাজাবে, তারও সময় পায় না প্রমথ। যেসব জলসায় কি অনুষ্ঠানে মোটা টাকার দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি থাকে, শুধু সেখানে যায়। একেবারে পেশাদার হয়ে গেছে প্রমথ। গান গেছে, আছে শুধু গানের পেশা। অবস্থার কাছে প্রমথ পুরোপুরি পোষ মেনেছে।

কিন্তু সুলতার ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উল্লাস দেখে মাস্টারের উপদেশটা প্রমথর মুখে আর এল না।

প্রমথকে দেখে সুলতা হাসিমুখে বলল, 'এ মঙ্গলবার বাদ যাবে না, আমি জানতুম।'

সেদিনের কুশ্রীতাকে ভোলাবার জন্যে আজ সযত্নে চেষ্টা করেছে সুলতা। ঘরখানা পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়েছে। মাদুরের ওপর সদ্য-ধোয়া ধবধবে চাদর পেতেছে মেঝেয়। একটু দূরে টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে রেখেছে রজনীগন্ধা। শুধু ঘরই সাজায়নি, নিজেও সেজেছে একটু। বাক্স থেকে বের করে পরেছে রঙীন শাড়ি। যত্ন করে চুল বেঁধেছে। মুখে ক্ষীণ পাউডারের আভাসও লক্ষ্য করা যায়।

সুলতা হেসে আর-একবার অভ্যর্থনা জানাল,. 'আসুন।'

তানপুরাটা তুলে নিয়ে তার সূক্ষ্ম তারে আঙুল রাখল সুলতা, বলল, 'সেই বৃন্দাবনী সারংটা গাইব? প্রথম যেটা শিখিয়েছিলেন?'

প্রমথ বলল, 'গাও না।'

তারে একটু ঝঙ্কার পড়ল।

কিন্তু হঠাৎ তার থেকে ওর আঙুলের দিকে চোখ পড়ল প্রমথর। সূক্ষ্ম তারের উপর কয়েকটি মোটা মোটা চ্যাপ্টা আঙুল। কয়েকটি ক্ষ'য়ে যাওয়া নখ। প্রসাধনে সব ঢেকেছে সুলতা, নখের ক্ষয় ঢাকতে পারেনি, হয়তো সে চেষ্টাও করেনি। কিন্তু ওই ক্ষয়ে-যাওয়া নখ কয়টির মধ্যে এ সংসারের পর্দার আড়ালের অনেক অদৃশ্য ইতিহাস যেন প্রত্যক্ষ করল প্রমথ। অনেক সংগ্রামের কাহিনী, যা সুলতা বলতে চায় না, যা ও গোপন করতে চায়, বৃন্দাবনী সারং-এর কোমল সুর ছাপিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেই প্রচণ্ড স্থূলতা প্রমথর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একটু বাদে গান থামিয়ে সুলতা বলল, 'আপনি কিছুই শুনেছেন না মাস্টারমশাই। তাহ'লে কি ভুল হচ্ছে?'

প্রমথ বলল, 'না, ভুল হবে কেন, গাও।'

'কিন্তু আপনি যে কিছু শুনছেন না।'

প্রমথ বলল, 'আমি দেখছিলাম।'

'কি দেখছিলেন মাস্টারমশাই?'

প্রমথ বলল, 'তোমাকে।'

একবার চোখে চোখে তাকাল সুলতা, তারপর লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল, 'ওকি বলছেন মাস্টার মশাই! আমি কি দেখবার মত?'

প্রমথ বলল, 'আমি তোমার নিষ্ঠা দেখছিলাম। তুমি আমার মত আপোষ করনি, তুমি আমার মত আপোষ করবে না। আমার হয়নি, তোমার হবে। তুমি চেষ্টা করে যাও।'

সুলতা এবারও লজ্জায় মুখ নিচু করল। কিন্তু সে লজ্জার ধরন স্বতন্ত্র, রূপ আলাদা।

তারপর থেকে প্রমথ ওকে আরো বেশি সাহায্য করতে লাগল। গানের তত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক বই জোগাড় করে দিল, ফাঁক পেলে কোন কোন সপ্তাহে একদিনের বেশিও আসতে লাগল। নিজের গরজে বাঁয়াতবলাসুদ্ধ এক তবলচী বন্ধুকে জুটিয়ে আনল প্রমথ। এই নিষ্ঠাবতী মেয়েটিকে সাহায্যের সে ত্রুটি করবে না। নিজের বিদ্যা সবটুকু ওকে প্রমথ দান করবে। দেওয়া যে চাই। না দিলে যে বন্ধ্যা বিদ্যা নিজের কাছেই ভার হয়ে থাকে। যক্ষের ধন আগলে রেখে লাভ নেই। সে ধন বিলিয়ে দিয়ে তবে তৃপ্তি। কিন্তু দিতে চাইলেই তো শুধু হয় না। দানের যোগ্য পাত্রও চাই যে। এতদিন অনেক ছাত্র-ছাত্রীরই তো দেখা মিলল, কিন্তু তেমন পাত্র মিলল কই! যার মধ্যে একটু আধটু প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে নিষ্ঠা পাওয়া যায় না। ছাত্রীদের বেশির ভাগই বিয়ের পরে গানের চর্চা ছেড়ে দেয়, অল্প কিছু শিখতে না শিখতে ছাত্রদের বেশির ভাগেরই লক্ষ্য যায় যশ আর অর্থের দিকে। শুধু সঙ্গীতের ওপর একনিষ্ঠ প্রীতি বড় দুর্লভ। প্রমথর মনে হ'ল সেই নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আছে সুলতার মধ্যে। ওকে সাহায্য করলে তা কাজে লাগবে। অর্থসাহায্য করবার তো সাধ্য নেই প্রমথর, সে সাহায্য সুলতা নেবেও না, কিন্তু সুরের দানে সুলতার অঞ্জলি ভরে দেবে প্রমথ। সেখানে সে কার্পণ্য করবে না।

মাঝখানে আর একটা বাধা পড়ল। একদিন প্রমথ এসে দেখল, তানপুরাটার তারগুলি ছেঁড়া। যন্ত্রটাকে কে যেন আছড়ে দুমড়ে ফেলেছে।

এ সর্বনাশ কে করল! এখনো দোকানের সব টাকা শোধ হয়নি।

প্রমথ দেখল, দেয়ালে মাথা রেখে ঘরের এককোণে আবছা অন্ধকারে চুপ করে বসে রয়েছে সুলতা।

আর একদিনের দৃশ্য প্রমথর চোখের সামনে ভেসে উঠল---যেদিন বিয়ের প্রস্তাবে হারমোনিয়মে মাথা রেখে সুলতা কেঁদেছিল।

প্রমথ বলল, 'হ'ল কি তোমার? ঘরে আলো জ্বালোনি যে!'

সুলতা চমকে উঠল একটু। তাড়াতাড়ি সরে এসে হ্যারিকেন জ্বালতে বসল। বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই।

প্রমথ বলল, 'তানপুরাটা গেল কি করে? ভাঙল কে? বিল্টু বুঝি?'

সুলতা বলল, 'না, বিল্টুর অত সাহস নেই।'

প্রমথর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তবে কে ? বীরেনবাবু ?'

সুলতা একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'না, তিনি নিজের হাতে ভাঙেন নি।'

প্রমথ অদ্ভুত একটু হাসল, 'তবে কার হাত আবার ধার করে আনলেন?'

সুলতা বলল, 'আমিই ভেঙেছি।'

প্রমথ চুপ করে রইল।

সুলতা ছাত্রী হ'লেও ইদানীং প্রায় বান্ধবীর পর্যায়ে উঠে এসেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষার অবসরে অন্য আলাপও চলত। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে রেশনের দোকানে চালের নিকৃষ্টতা আর পরিমাণের অল্পতা থেকে বাজারের মাছের দরও বাদ যেত না। সুলতাও সাংসারিক খুঁটিনাটি অনেক কথা বলত। কিন্তু নিজের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সহজে কোন কথা উল্লেখ করত না। প্রমথও যে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে, তা নয়।

বীরেনের সঙ্গে কদাচিৎ তার দেখা হ'ত। সেও স্কুল আর টুইশ্যান নিয়ে ব্যস্ত, জীবিকার জন্যে ব্যিব্রত। কিন্তু যেদিনই মুখোমুখি হয়েছে, শিষ্টাচার আর মিষ্ট হাসির কোন অভাব দেখেনি।

'এই যে, ভালো তো ?'—বীরেন হেসে জিজ্ঞেস করেছে।

প্রমথও ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঁ, ভালো।'

বীরেন অভিভাবকের ভঙ্গীতে বলেছে, 'ছাত্রীর উন্নতি কেমন হচ্ছে আপনার ?'

'এই এগুচ্ছে একটু একটু।'

বীরেন বলেছে, 'এগুলেই ভালো। শখ যখন হয়েছে, দেখুন চেষ্টাচরিত্র করে। অন্য কোন শখ তো মেটাতে পারিনে ; সাধ্যই বা কি ?'

বলে বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছে বীরেন।

মনে মনে প্রমথ ওর ঔদার্যের প্রশংসাই করেছে। এই কৃচ্ছ্র সংসারে এতখানি উদারতা আর সহানুভূতি সুলভ নয়। তবু মাঝে মাঝে একটু আধটু দাম্পত্য-কলহের আভাস সুলতার চোখে-মুখে ধরা পড়েছে। কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশি উদ্বেগ অস্বস্তি বোধ করেনি প্রমথ। ওটুকু হয়েই থাকে। তাদের মধ্যেও তো হয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটায় প্রমথ বিস্মিত হ'ল। খুব সাধারণ ঝগড়ায় নিজের অত শখের জিনিস তো ভেঙে ফেলেনি সুলতা। নিশ্চয়ই ভিতরে গূঢ় রহস্য কিছু আছে।

একটু ইতস্তত করল প্রমথ, তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'ভিতরের কথা কি, বল তো সুলতা। অনেক দিন ধরেই তুমি আমার কাছে কিছু একটা লুকোচ্ছ। কি একটা অশান্তি আছে তোমাদের মনে, আমি তা বেশ টের পাচ্ছি। ব্যাপারটা কি, বল।'

সুলতা বলল, 'সে আপনার না শোনাই ভালো, মাস্টারমশাই।'

প্রমথ বলল, 'উঁহু, অশান্তির মূল যদি আমি হই তা হ'লে তো আর এখানে আসা চলবে না।'

'না, আপনি নন।'

'তবে ?'

আস্তে আস্তে সুলতা সবই বলল।

বীরেন যে স্কুলে মাস্টারি করে, সকাল বেলায় সেই স্কুলেই মেয়েদের ক্লাস বসে। ওপরের ক্লাসগুলিতে অঙ্ক কষান নীলিমা রায়। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। তবু চেহারা ভালো। এখনো বিয়ে হয় নি, বিয়ে বোধ হয় আর করবেও না। তার সঙ্গে কি করে বীরেনের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বীরেন প্রায়ই এসে বলে, অঙ্কে যে মেয়েদের এমন মাথা হয়, সে আর দেখেনি। বীরেন নিজেও অঙ্কের টীচার। যে বাড়িতে বীরেন ছাত্র পড়াতে যায়, সেই বাড়িতেই থাকে নীলিমা। রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয় ; রোজ কথাবার্তা হয়। হয়তো অঙ্ক নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা চলে। কিন্তু অঙ্কের মধ্যেও তো সঙ্কেত আছে ? এই নিয়ে পাড়ার দু'একজন মেয়ে সুলতাকে ঠাট্টা-তামাসাও করেছে। কিন্তু সব ঠাট্টার মধ্যেই সত্যের একটু আধটু ছিটেফোঁটা থাকে।

তাই সুলতা আজ বলেছিল, 'তুমি অত রাত করে ফিরতে পারবে না।'

'পড়াতে পড়াতে রাত হয়ে যায়।'

'পড়ানো তো ভারি ! রাত যে কিসের জন্যে হয়, তা আমি জানি। নীলিমার সঙ্গে গল্প কর বসে

বসে।'

'করিই তো, আমি তো আর গান জানিনে। তুমি তো অবসর পেলেই গান নিয়ে বস। তানপুরায় গলা সাধো। তোমার যেমন তানপুরা অছে, আমারও তো তেমন কিছু একটা চাই?'

'তাই বলে তোমার একজন মাস্টারনীও চাই নাকি?'

'চাই বৈ কি! মাস্টারের পক্ষে গাযিকার চেয়ে মাস্টারনীই ভালো। দরদ বোঝে।'

এই নিয়ে ঝগড়া! সেই ঝগড়ার তোড়ে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। বীরেন অনেক সহ্য করেছে—বউ-ঝি-এর গানটানের শখ থাকে, মাঝে মাঝে একটু-আধটু চর্চা করে। কিন্তু এমন গান নিয়ে দিন রাত পড়ে থাকে কে? সব কিছুরই একটা সীমা আছে। কিন্তু সুলতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সুলতা বলেছিল, 'আর তুমি বুঝি সীমা ছাড়াচ্ছ না?'

বীরেন জবাব দিয়েছিল, যদি ছাড়িয়েই থাকি, সে তোমার জন্যে, আব তোমার ওই তানপুরাব জন্যে।'

যে তানপুবাব জন্যে এত জ্বালা, তাকে সুলতা আস্ত রাখে কি করে?

সুলতা বলল, 'গান আমি এবাব সত্যিই ছেড়ে দেব মাস্টারমশাই। আমিও মাষ্টারনী হব। অঙ্কের মাস্টারনী। দেখি, তবে যদি ওঁব মন পাই।'

প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখ চেষ্টা করে!'

বাইরে চলে এল প্রমথ। সুলতা আজ আর ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে এল না। প্রমথ মনে মনে হাসল। স্বামীব সামান্য একটু অমনোযোগও সহ্য করতে পারে না সুলতা। ও কেবল স্বামীর স্ত্রী হয়েই খুশি নয়—অদ্বিতীয়া বান্ধবীও হতে চায়। এত যার চুলচেরা হিসেব, তার জন্যে গান নয়, তার পক্ষে অঙ্কই ভালো।

সপ্তাহ তিনেক চুপচাপ কাটল। তারপর স্কুলে একদিন সন্ধ্যায ছাত্রদেব সেতারের ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে আসছে প্রমথ, দেখে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে সুলতা।

প্রমথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ কি, তুমি এখানে।'

সুলতা বলল, 'প্রথমে আপনাব বাসায় গিয়েছিলাম। সেখানে না পেয়ে স্কুলেই চলে এলাম। ভালোই হ'ল, স্কুলটাও দেখা হয়ে গেল।'

প্রমথ বলল, 'তুমি একা একা চলাফেরা করতে পার?'

সুলতা একটু হেসে বলল, 'তা কেন পাবব না? ইচ্ছে কবলে সবই পারি।'

প্রমথ বলল, 'তা না হয় পারলে। কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি?'

সুলতা বলল, 'আপনাকে ডেকে নিতে এসেছি। আজ মঙ্গলবার, সে কথা কি ভুলে গেলেন?'

প্রমথ বলল, 'মঙ্গলবার তো ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকব। তুমিই যা নীলিমা রায়ের কথা ভুললে কি কবে?'

সুলতা একটু হেসে বলল, 'হাজার নীলিমা রায় এলেও আমাকে আব ফেরাতে পারবে না। আমি আমার নিজের মনকে বুঝে দেখেছি।'

'সত্যি?'

ট্রামে উঠে প্রমথর পাশে বসে সুলতা নিজের আরো অনেক সঙ্কল্পের কথা জানাল। স্বামী আর সংসাবের দিকে আরো একটু মন দেবে সুলতা। তাহলে ওসব খোঁটা তাকে আর সহ্য করতে হবে না। কিন্তু তাই বলে গান সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। প্রমথর সাহায্যও তার চাই। নতুন তানপুরা সে আর একটা কিনে নিয়েছে। পুরোন তানপুরার বাকি টাকাটাও সে এবাব শোধ করে দিতে পারবে।

প্রমথ বলল, 'এত টাকা পেলে কোথায়? হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেলে নাকি?'

সুলতা বলল, 'হয়েছিই তো।'

প্রমথ বলল, 'গয়না-টয়না বিক্রী করোনি তো?'

সুলতা প্রমথর দিকে তাকাল, 'আপনার যে আজকাল সব খোঁজ-খবরই দরকার? না, ভালো

গয়না কিছু নয়। গোটা দুই ভাঙা চুড়ি ছিল। ছাড়িয়ে দিলাম।'

প্রমথ বলল, 'বেশ করেছ। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও সুলতা।'

'কেন?'

প্রমথ বলল, 'তোমাকে খেয়াল শেখাবারই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তোমার খামখেয়াল মেটাবার দায় আমার নয়।'

তিরস্কার শুনে সুলতার চোখ ছল ছল করে উঠল। অনুতপ্ত সুরে বলল, মাস্টারমশাই, আর কোনদিন এমন হবে না। আর একবার সুযোগ দিন আমাকে।'

পরের তিনটি বছরে সুলতা সত্যিই তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। আর কোনদিন অমন বেয়াড়া রাগ দেখায় নি। তাই বলে রাগ, দুঃখ, ঝগড়াঝাঁটির কারণ যে শেষ হয়েছে, তা নয়। সেই সংগ্রামও একটানা চলেছে দিনের পর দিন। কখনো দৈন্যের সঙ্গে, কখনো বাৎসল্যের সঙ্গে, কখনো স্বামীর প্রেমের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে সুলতার সঙ্গীতপ্রীতির। সে সংঘর্ষ বাইরের একজন গানের মাস্টারের পক্ষে সবটুকু দেখা সম্ভব নয়, সবটুকু শোনাও চলে না। তবু প্রমথ তা টের পেয়েছে, অনুমান করতে পেরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুলতার অনুরোধ প্রমথ কিছুতেই এড়াতে পারেনি।

একদিন প্রমথর সামনেই দাম্পত্য-কলহ লেগে গেল। বিন্টু ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল করেছে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে সে বিড়ি খাওয়া ধরেছে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে বাপের কাছে।

বীরেন তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে এসে সুলতার গানের আসরে দাঁড় করিয়ে দিল, 'দেখ, ছেলেটা কিভাবে নষ্ট হয়েছে, দেখ। তোমার জন্যে সব যাবে।'

সুলতা স্বামীর দিকে তাকাল, 'আমার জন্যে?'

প্রমথ হারমোনিয়মটা বন্ধ করে ওদের দাম্পত্যালাপ শুনতে লাগল।

বীরেন বলল, 'তোমার জন্যেই তো। আমি দিনরাত টাকার ধান্ধায় থাকি। আর তুমি থাক তোমার গান নিয়ে। ওদের বাপও নেই, মাও নেই। ওরা নষ্ট হবে না তো কি? কিন্তু একথা মনে রেখো, ওদের মানুষ করে তোলাটাই বড় কাজ। ওদের জীবনের দাম তোমার লাখ লাখ গানের চেয়ে ঢের বেশি।'

প্রমথর দিকে ফিরে তাকাল বীরেন, 'কি বলুন 'মাস্টারমশাই, ঠিক বলি নি?'

গানের মাস্টারের কাছে অঙ্কের মাস্টারের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। গানের চেয়ে জীবনের মূল্য তো বেশিই। আবার জীবনও গানের জন্যেই মূল্যবান।

এক একদিন সুলতা অধীরভাবে বলে, 'মাস্টারমশাই, এক-এক সময় আমার ইচ্ছে করে, আমি সব ছেড়ে চলে যাই। শুধু গান নিয়ে থাকি। তা যদি পারতাম!'

প্রমথ বলে, 'তা পারা তো সহজ নয় সুলতা।'

সুলতা বলে, 'কিন্তু না পারা যে আরো বেশি কঠিন, মাস্টারমশাই। একূল ওকূল—দু'কূল রাখা বড় কঠিন।'

'তা তো বটেই।'

তবু দুই কূলই বজায় রেখে চলল সুলতা। তাকে চলতে হ'ল। ক্রমে ক্রমে খানিকটা সয়েও গেল। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠল। নানাভাবে আয়ও কিছু বাড়ল বীরেনের।

প্রমথ সুলতাকে সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করতে লাগল। এমন কি ভালো টুইশ্যান ছেড়ে দিল ওর জন্যে। এই নিষ্ঠার পুরস্কার সুলতাকে সে আদায় করে দেবে। সে দেওয়া যে নিজেকেই দেওয়া।

সুযোগ মত ওকে শহরের নানা জলসায় গান শোনাবার জন্যে নিয়ে গেল প্রমথ। ছোট ছোট জলসায় গাইতেও দিল। কিন্তু সুলতার ইচ্ছা, আরো অনেক বড় আসরে নিজেকে যাচাই করা। প্রমথর ইচ্ছাও তাই।

এই আসরে আসবার আগে অনেক খেটে, অনেক সময় দিয়ে দু'খানা গান সুলতাকে দিয়ে মহড়া দেওয়াল প্রমথ। তার ওই ছোট ঘরে, হ্যারিকেনের আলোয় বেশ গাইল সুলতা। ভারি মধুর

শোনাল ওর গলা। প্রমথ আরো কয়েকজন গীতজ্ঞ বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে, তারাও তারিফ করল।

ভরসা পেয়ে নিজের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে নিষ্ঠাবতী ছাত্রীকে প্রমথ এই গুণিজনের সভায় এনে হাজির করেছিল।

কাহিনী শেষ করে প্রমথ আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তার ফল তো দেখলে?'

আমি সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, 'একদিনেই তো সব বোঝা যায় না। হয়ত ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে।'

প্রমথ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, ঘাবড়ানো-টাবড়ানো কিছু নয়। মাস্টারি করে করে চুল প্রায় পাকতে চলল, কল্যাণ। কার কতটুকু দৌড় তা বুঝতে আমাদের ভুল হয় না। ওর জায়গা ছোট আসরে। যতই শিক্ষা দাও, যতই সুযোগ পাক, বড় আসরে ওর কোনদিন জায়গা হবে না। জাত-শিল্পী ও নয়। তা যদি হ'ত, এখানে অনেক জহুরী আছেন, ওকে চিনতে তাঁদের দেরি হ'ত না। আমারই দেরি হয়েছিল।'

মাইক ঠিক হয়েছিল, তবলচীও তৈরী হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু নাম-করা গায়ক দু'জন গাইতে রাজী হচ্ছিলেন না! অবশেষে একজন একখানা রামকেলী গাইলেন। ভোরের দিকে বেশ জমে উঠল গানখানা।

আর একজনকে যখন অনুরোধ-উপরোধ চলছে, আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'চল প্রমথ, একটু চা খেয়ে আসি।'

প্রমথ বলল, 'চল।'

প্যাণ্ডেলের বাইরেই চায়ের স্টল বসেছে। দু'জনে সেদিকে এগুতেই চোখে পড়ল, গেটের কাছে বেড়ার গা ঘেঁষে একটি মেয়ে আসরের দিকে মুখ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার আগে প্রমথই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি—সুলতা! তুমি বীরেনবাবুর সঙ্গে তখন চলে যাও নি?'

সুলতা লজ্জিতভাবে বলল, 'খানিকটা গিয়ে ফিরে এলাম। ওঁকে বললাম, মাস্টারমশাই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন, তুমি যাও। এসে ভালোই করেছি, না এলে ঠকতাম। একসঙ্গে এত গুণীর গান-বাজনা শোনা তো সব সময় ভাগ্যে হয় না।'

প্রমথ বলল, 'কিন্তু তাই বলে এই শীতের মধ্যে সারারাত তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে! ভিতরে গেলে না কেন?'

সুলতা আস্তে আস্তে বলল, 'ভিতরে আর যেতে পারলাম কই!'

ফাল্গুন ১৩৫৮

চা

লিণ্টন স্ট্রীটের মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল শুভেন্দু, একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীলিমা বাস থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছে, শুভেন্দুকে দেখে থেমে দাঁড়াল, বলল, 'তুমি!'

শুভেন্দু ওই একটি শব্দেরই প্রতিধ্বনি করল, 'তুমি!'

তারপর বলল, 'কতকাল পরে দেখা।'

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কোন না কোন দিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকে।'

শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার পরনে কমদামী শাদা খোলের একখানা মিলের শাড়ি, মণিবন্ধে দুগাছা সরু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে আর কোন আভরণ নেই। বাঁ হাতে স্কুলপাঠ্য একখানা ইতিহাসের বই, আর তার তলায় এক রাশ খাতা। শরীর ভারি রোগা হয়ে গেছে, সেই আগের মত চেহারা আর

নেই। কিন্তু সিঁথিটি আগের মতই শাদা রয়েছে। নীলিমা লক্ষ্য করল শুভেন্দুর পরনে দামী স্যুট। আঙ্গুলে পাথর বসানো দুটি আংটি, একটির রঙ নীল আর একটি গাঢ় রক্তবর্ণ, আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়েছে দেখতে।

শুভেন্দু বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

নীলিমা বলল, 'স্কুলে। নোনাপুকুর বিদ্যাপীঠে মাস্টারি করি। তুমি যাচ্ছ কোথায়, কোন অফিসে ? না কি চাকরি বাকরি আর করতে হয় না।'

শুভেন্দু বলল, 'বাঃ, চাকবি করতে হয় বৈ কি, চাকরি না করলে খাব কি। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ করি।'

নীলিমা বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে বড চাকুরে।' শুভেন্দু বলল, 'কিন্তু আসলে বড় চাকর।'

নীলিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করেছ তো ?'

শুভেন্দু একটু ঢোক গিলে বলল, 'রাম বল। বিয়ে করবার আব সময় পেলাম কই।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম--।'

শুভেন্দু একটু হাসল, 'সে তো আমিও শুনেছিলাম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু দেখছি তো অন্যরকম। দেখার সঙ্গে কি সব সময় শোনার মিল হয় ?'

নীলিমা বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা চলি।'

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি, এতদিন পরে দেখা ! কথাবাতা কিছুই হল না এরই মধ্যে বিদায় নিচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল যে। অমনিতেই আজ একটু লেট হয়েছি, কটা বাজল, এগারটা বেজে গেছে বোধ হয়।'

শুভেন্দু হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সোযা এগার। শোন, আজ আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, আমিও অফিস কামাই করব, এসো গাড়িতে।'

নীলিমা বলল, 'তাবপব।'

শুভেন্দু বলল, 'তারপর আর কি। সারাদিন ছুটে বেড়াব আর মাঝে মাঝে চা খাব। মনে আছে সেই চা খাওয়ার কথা ?'

নীলিমা মৃদু হেসে বলল, 'আছে। কিন্তু স্কুল আমার আজ কামাই করবার জো নেই, জরুরী দরকার।' আজ মাইনের তারিখ, সে কথাটা আর নীলিমা খুলে বলল না। বলল, 'বরং আমাদের বাড়িতে এসো।' শুভেন্দু বলল, 'বেশ, কবে যাব বল।'

নীলিমা বলল, 'কালই এসো সন্ধ্যার পর। বেদিয়া ডাঙা সেকেণ্ড লেন, তেত্রিশ নম্বর বাসে উঠে বণ্ডেল গেটের কাছে নামবে, তারপর বেল লাইন ক্রশ করে,—ওমা তোমার তো গাড়িই আছে।' বেশ একটু অপ্রস্তুত হ'ল নীলিমা।

শুভেন্দু বলল, 'যা ভেবেছ তা নয়, অফিসের গাড়ি। অফিসের কাজেই এদিকে এসেছিলাম। সব পরের ধনে পোদ্দারি।'

নীলিমা বলল, 'আচ্ছা, কাল তা হলে সত্যিই আসছ তো।'

শুভেন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই।' তারপর পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল নীলিমা। যতক্ষণ দেখা যায় শুভেন্দু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ বাস চেহারা দেখে বোঝা যায় অভাবে পড়েছে। সেই আগের দিন আর নেই। কিন্তু দেহের সেই সুন্দর গড়ন এখনো যেন প্রায় তেমনি আছে। শ্যামবর্ণের ওপর ছিপছিপে দোহারা চেহারা। বড় বড় কালো দুটি চোখে রহস্য যেন আরো গভীর হয়েছে।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিল শুভেন্দু। ম্যাঙ্গো লেনে অফিসে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু কাজ কর্মে মন লাগল না। আট নয় বছর আগের একটি মফঃস্বল শহর আর কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল, আর সব ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রইল একটি মেয়ে। ষোল সতের বছর তার বয়স, যেমন চঞ্চল তেমনি প্রগলভ।

কাছারি বাড়ির ঝাউগাছের সারির পিছনে লাল সুড়কির পথ। আর সেই পথের প্রান্তে দোতলা

হলদে রঙের বাড়ি। এই বাড়িটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দুরই এক দূর সম্পর্কের দাদা শিবতোষ। শহরের ফার্ষ্ট মুন্সেফ ভবেশ দত্ত শিবুদার মাসশ্বশুর। দূর থেকে একদিন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিবুদা, তারপর একদিন কলেজ ছুটির পরে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'আয়, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পরিচয় কর। আজকালকার দিনে এত কুনো, মুখচোরা হয়ে থাকলে চলে নাকি দুনিয়ায়?'

তখন ভারি মুখচোরা স্বভাবই ছিল শুভেন্দুর। দু বছর এই শহরে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে বটে কিন্তু দু একজন প্রফেসর আর ক্লাসের দু চারটি ছাত্র ছাড়া কারও সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয় নি। কলেজ হোষ্টেলে তিন সীটওয়ালা একটি ঘরে কোণের দিকের একখানা তক্তপোশে সে থাকে, কারো সঙ্গে বড় একটা মেশে না, ইচ্ছা সত্ত্বেও মিশতে পারেনা। এই নিয়ে সহপাঠী সহকর্মীরা নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। কেউ বলে দেমাকী, কেউ মুখ বাঁকিয়ে বলে গেঁয়ো ভূত। শুভেন্দু বইয়ের আড়ালে চোখ ঢাকে। তাদের মুখভঙ্গীর দিকে তাকায় না, বক্রোক্তির সময় বধির সাজে।

এমনি করেই চলছিল। শিবুদা কলকাতা থেকে গাঁয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে খুলনায় দুদিন রয়ে গেলেন। আর সেবারই পরিচয় করিয়ে দিলেন ভবেশ বাবুদের সঙ্গে। বেশ শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবার। বড় ছেলে কলকাতায় থেকে ল পড়ে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেজোটি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভরতি হয়েছে, তার পরেই সব ফ্রক আর হাফ প্যান্টের দল।

এই বাড়িতে প্রথম দিন এসেই বড় অপ্রস্তুত হয়েছিল শুভেন্দু। শিবুদা শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলেটি পড়াশুনায় বেশ ভালো, কিন্তু বড্ড লাজুক।' শিবুদার মাসী শাশুড়ী বললেন, 'লাজুকই ভালো বাবা, যে ফাজিল ফক্কর ছেলেমেয়ে হয়েছে আজকাল। এদের মধ্যে শান্ত সৌম্য কাউকে দেখলে আমার তো চোখ জুড়ায়, তোমরা যে যাই বল।'

বারান্দায় বেতের টেবিল চেয়ার পেতে সান্ধ্য চায়ের আয়োজন হচ্ছিল। সেখানে ডাক পড়ল শিবতোষ আর শুভেন্দুর। প্লেটে করে ডিমের তৈরী দু তিন রকমের খাবার এগিয়ে দিয়ে বড় একটা কেটলি থেকে প্রত্যেকের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল নীলিমা। খানিক আগে শিবুদা তাঁর এই তরুণ শ্যালিকাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, নমস্কার বিনিময় ছাড়া বাক বিনিময় তখনো হয়নি, কিন্তু তার কাপে চা ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু বলে উঠল, 'আমি তো চা খাইনে।'

নীলিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, 'খান না! ঢেলেছি যখন একটু খান।' কথাবার্তায় ভারি সপ্রতিভ নীলিমা। যেন শুভেন্দুর সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়। শিবুদা হেসে বললেন, 'তবেই হয়েছে, শুভেন্দু আমাদের এযুগের ঋষ্যশৃঙ্গ, এত বড় হলে হবে কি পান সিগারেট চা কোন দিন মুখে তোলেনি। এসব ব্যাপারে রাঙা কাকার ভারি কড়া শাসন।'

নীলিমা বলল, 'তা থাকুক গিয়ে, পান সিগারেটের সঙ্গে চায়ের তুলনা দেবেন না জামাইবাবু, চা-টা পান সিগারেটের মত ন্যাষ্টি নয়। অনেক ভালো, অনেক সুন্দর।'

নীলিমার মা হেসে বললেন, 'তাতো হবেই, যা একটি চায়ের পোকা তুমি, দুধের চেয়েও তোমার কাছে চা ভালো।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা দেখছি তোমার এই মেয়ের জন্যে কোন চা বাগানের ম্যানেজার ট্যানেজার খুঁজতে হবে।'

ভবেশবাবু ভারি মিতভাষী। স্মিত মুখে বললেন, 'হুঁ।' শ্বেতপদ্মের মত চমৎকার কাপটি। তার মধ্যে কানায় কানায় ভরা তাম্রাভ পানীয়, দেখে দেখে ভারি লোভ হ'ল শুভেন্দুর। একবার তাকাল নীলিমার দিকে তারপর নিচু হয়ে আচমকা কাপে চুমুক দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিল শুভেন্দু, তরল পানীয়ের উত্তাপে ঠোঁট দুটি যেন পুড়ে গেছে।

নীলিমা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হওয়ায় মুখে আঁচল চাপা দিল, তবুও কি সুস্থ থাকবার জো আছে। ভিতর থেকে প্রবল এক হাসির বেগ ওর সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করছে। শেষ পর্যন্ত পরিবেশন বন্ধ রেখে ছুটে চলে গেল ঘরে। জানলা দিয়ে শুভেন্দুর চোখে পড়ল তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ে তখনো নীলিমা হাসির গমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেই প্যান্টফ্রকের দল। নীলিমার মাও অতি কষ্টে হাসি চেপে বললেন,

'মুখপুড়ীর কাণ্ড দেখ।'

ভবেশবাবু মেয়ের উদ্দেশে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'না না এসব কি, বয়স তো কম হয় নি, এখনো যদি ম্যানার্স না শেখে—।'

নীলিমার মা বললেন, 'চা যখন তোমার খাওয়া অভ্যাস নেই তখন আর খেয়ে কাজ নেই বাবা। আমি তোমার জন্য সরবৎ করে আনছি।' শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না আমার আর কিছু দরকার নেই।'

এত অপ্রস্তুত আর নাকাল শুভেন্দু জীবনে হয় নি। বাইরে এসে শিবুদাও বললেন, 'তুই একটি আস্ত উজবুক, একটা সিন ক্রিয়েট করে ছাড়লি তো?'

দিন দুই পরে কলেজে ঢুকতে যাচ্ছে পিছন থেকে ডাক শুনল, 'শুনুন।'

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল আরো দু তিনটি মেয়ের সঙ্গে নীলিমাও বেরোচ্ছে। তখন কলেজে সকালে মেয়েদের ক্লাস হ'ত দুপুরে ছেলেদের।

শুভেন্দু ওর দিকে তাকাতে নীলিমা বলল, 'জামাইবাবু কি চলে গেছেন?'

শুভেন্দু জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

ইশারায় সঙ্গিনীদের এগুতে বলে নীলিমা শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিনের ব্যবহারের জন্য বড়ই লজ্জিত হচ্ছি। মা যেতে বলেছেন আপনাকে। তাঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছি। আপনি না গেলে আরো বকবেন।'

শুভেন্দু বলল, 'আমার তো সময় হবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সময় হল। তারপর ঘন ঘনই যাতায়াত শুরু করল শুভেন্দু।

লজিকটা মাথায় ঢোকেনা নীলিমার। এদিকে শুভেন্দু লেটার পেয়েছে ন্যায়শাস্ত্রে। নীলিমা বলল, 'মা, শুভেন্দুদা যদি মাঝে মাঝে আমাকে লজিকটা দেখিয়ে দেন খুব সুবিধে হয়।'

নীলিমার মা বললেন, 'বেশ তো, ওর যদি পড়াশুনোর কোন ক্ষতি না হয়—।'

শুভেন্দুর আপত্তি দেখা গেল না। সে নীলিমাকে লজিক শেখাতে লাগল, আর নীলিমা তাকে চা খাওয়ায় রপ্ত করে তুলল। প্রথম প্রথম অবশ্য চা দিত না নীলিমা। বলত, 'কি দরকার পরের ছেলেকে হনুমান বানিয়ে। ঠাণ্ডা ছেলের পক্ষে সরবতই ভালো।' কিন্তু দিন কয়েক পরেই সরবতের গ্লাসের বদলে চায়ের কাপ জায়গা দখল করল। আর শুভেন্দুর সমস্ত হৃদয় দখল করল এই শ্যামলা চা দাত্রীটি। ন্যায়শাস্ত্রের বিধি রক্ষিত হল কি না বলা যায় না, কিন্তু যা লজিক্যাল তাই ঘটল।

নাটক পঞ্চমাঙ্কে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ভবেশবাবু চাঁটিগায়ে বদলী হয়ে গেলেন। নীলিমা আর শুভেন্দু অনেক মতলব আটল। একবার ভাবল কাউকে না বলে দুজনে মিলে পালায় আর একবার ভাবল সোজাসুজি বাবা মাকে বলে। কিন্তু কাজে কিছুই হল না। চরম কোন পথ নেওয়া কারোরই সাহসে কুলিয়ে উঠল না। তা ছাড়া বি. এ. পরীক্ষার চাপ তখন শুভেন্দুর ঘাড়ে। বেশি হৈ চৈ করবার মত অবস্থা তখন নয়। বিদায়ের সময় সজল চোখে নীলিমা বলল, 'চিঠি দিয়ো।'

আর্দ্রগলায় শুভেন্দু প্রতিধ্বনি করল, 'চিঠি দিয়ো।'

চিঠির আদান প্রদান অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল।

তারপর একসময় স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে গেল। সাড়া এল না নীলিমার কাছ থেকে। শুভেন্দু শুনতে পেল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম খুবই আঘাত লেগেছিল। মনে হয়েছিল এই দাগ, এই ক্ষত চিহ্ন বুঝি কোনদিন মিলাবে না, এই শূন্যতা কোনদিন ভরে উঠবে না। কিন্তু জীবনের নিয়ম অন্যরকম। সেই নিয়মে শুভেন্দু পড়াশুনোর পাট শেষ করে চাকরি সংগ্রহ করল। বাবার অনুরোধে বিয়েও করল। নীলিমার স্মৃতি প্রায় মুছে গেল মন থেকে, কিন্তু চায়ের অভ্যাসটি গেল না। বরং চা রসিক হিসাবে বন্ধু মহলে শুভেন্দুর বেশ খ্যাতি বেড়ে উঠল। চা শুধু খায়ই না শুভেন্দু, বন্ধু বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়ও। সবাই বলে, চায়ের এমন স্বাদ এমন সৌরভ আর কারো বাড়িতে মেলে না। অবশ্য এ কৃতিত্ব শুধু শুভেন্দুর একার নয়, তার স্ত্রী মানসীও এর অর্দ্ধাংশ ভাগিনী।

লাঞ্চের সময় অফিসের বেয়ারা অন্য খাবারের সঙ্গে চাও নিয়ে এল। সেই তরল পানীয়ের মধ্যে পুরোন দিনের অনেক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল শুভেন্দু। কতদিন যে কত জায়গায় নীলিমার সঙ্গে সে

চা খেয়েছে তার ঠিক নেই। কখনো বাগানে, কখনো ছাদের কোণে, কখনো দুপুর রোদে, কখনো বৃষ্টির সময় জানলাটির ধারে বসে দুজনে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে গল্প করেছে। সেই অতীত দিনের মধুর দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে চা খেলে কেমন হয়! নিমন্ত্রণ অবশ্য কাল, কিন্তু একদিন আগে গিয়ে ওকে অবাক করে দেবে।

অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে গেল শুভেন্দু। সিমলা স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকে। ফেরা মাত্র তিন বছরের ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল, 'বাবা আমার জন্যে কি এনেছ।' কিন্তু শুভেন্দু আজ বড় অন্যমনস্ক। মানসীও এগিয়ে এসে বলল, 'আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরেছ।'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি আবার বেরোতে হবে।' অফিসের পোশাক ছেড়ে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরল শুভেন্দু। মনে মনে আগেই ঠিক করেছিল জমকালো বেশে নীলিমার ওখানে যাবেনা, আটপৌরে সাধারণ বেশে গিয়েই উপস্থিত হবে, যেন নীলিমার অবস্থার সঙ্গে ওকে মানায়।

মানসী জিজ্ঞেস করল, 'এত কি তাড়া, চা খেয়ে যাবে না?'

শুভেন্দু বলল, 'না, সময় হবে না। জরুরী দরকার আছে।' আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে প্রথম সান্ধ্য চা খাবে ঠিক করেছে শুভেন্দু।

গাড়ি নিল না, হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরল। সার্কুলার রোডে পড়ে তেত্রিশ নম্বরের বাস ধরল শুভেন্দু। নীলিমা যে বাসে রোজ যাতায়াত করে সেই বাসে। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়, সারাটা রাস্তা প্রায় দাঁড়িয়ে যেতে হল তবু মনে মনে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যও অনুভব করল শুভেন্দু। যেন দুর্গম পথে অভিসারে বেরিয়েছে।

বাস থেকে নেমে নীলিমার দেওয়া ঠিকানা ধরে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল শুভেন্দু। শহরের একেবারে বাইরে জন-মানবহীন অন্ধকার জীর্ণ একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে থামতে হল ওকে। কড়া নাড়তে একটা হ্যারিকেন হাতে নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল। বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি! তোমার না কাল আসবার কথা ছিল!'

শুভেন্দু বলল, 'কালকের সন্ধ্যার চেয়ে আজকের সন্ধ্যা অনেক কাছে।'

নীলিমা বলল, 'এসো, আমিও এই একটু আগে ফিরলাম।' এত দেরি করে কেন ফিরল সে কথাটা অবশ্য আর নীলিমা জানাল না। স্কুলের মাইনে আজ হয় নি, প্রতিবেশীর কাছে গোটা পাঁচেক টাকা ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল পায় নি। নীলিমা বলল, এসো, যা বাড়ি ঘরের অবস্থা তোমার ভারি কষ্ট হবে।'

শুভেন্দু বলল, 'কষ্ট তো তোমারও হচ্ছে। কিন্তু এভাবে অজ্ঞাতবাস করে লাভ কি?'

নীলিমা বলল, 'তোমার কি ধারণা ইচ্ছা করে অজ্ঞাতবাস করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি, এসো।'

ভিতরের একখানা ঘরে গিয়ে নীলিমা শুভেন্দুকে বসতে দিল। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট তক্তপোশ, তাতে ছেঁড়া একটা সতরঞ্চি পাতা। নীলিমা বলল, 'দাঁড়াও, বিছানার চাদরটা পেতে দিই।'

শুভেন্দু সেই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে বলল, 'থাক থাক, আর চাদরের দরকার নেই। তারপর খবর টবর বল। বাড়ির আর সব কোথায়।'

নীলিমা সংক্ষেপে তাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিল। বহু টাকা দেনা রেখে বাবা মারা গেছেন, মাও আজ বছর তিনেক হল নেই। দাদা টি. বি. হাসপাতালে। অসুখের আগে বিয়ে করেছিলেন, দুটি ছেলে মেয়েও হয়েছে। তাদের ভরণ পোষণের ভার নীলিমার ওপর। আগের দিন চেতলা থেকে বউদির কাকা এসে সবাইকে নিয়ে গেছেন। তার খুড়তুতো বোনের বিয়ে।

এসব কথা সেরে নীলিমা একটু ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু এমন দিনেই এলে তোমাকে যে কিছু আনিয়ে দেব তারও জো নেই, কোন দোকানপাট নেই ধারে কাছে, এমনি পাড়া।'

শুভেন্দু বলল, 'হয়েছে। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না। দিতেই যদি হয় এক কাপ চা দাও।'

নীলিমা বলল, 'চা!'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, চা খেতেই তো এলাম।'

হ্যারিকেনের ম্লান আলোতেও শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার মুখের রঙ বদলেছে। চায়ের প্রসঙ্গে, চায়ের অনুষঙ্গে রঙ লেগেছে দুনিয়ায়।

নীলিমা বলল, 'বোসো, আসছি।'

নিস্তব্ধ পাড়া, নির্জন ঘর। বাইরে রাত্রির অন্ধকার। শুভেন্দু মনে মনে ভাবল বহুদিন পরে চা খাওয়ার এক নতুন পরিবেশ জুটেছে। মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নীলিমাকে যদি আজ জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু, 'নীলি, সেই দিনগুলি কি একেবারেই গেছে, তাদের কি আর একটি বারের জন্যও ফিরিয়ে আনা যায় না?' তা হলে কি খুব অন্যায় হবে?

একটু বাদে এক কাপ চা এনে নীলিমা শুভেন্দুর হাতে তুলে দিল। আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল দুজনের।

শুভেন্দু বলল, 'তোমার চা?'

'আনছি।'

বলে নিজের চায়ের কাপটিও নিয়ে এসে সামনে বসল নীলিমা; সেই আগেকার দিন যেন ফিরে এসেছে। বলল, 'শুধু চা-ই কিন্তু দিচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'শুধু চা-ই দাওনি, তা তুমি নিজেও জানো।' বলে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিল শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই মুখ বিকৃত করে কাপটি তক্তপোশের উপর নামিয়ে রাখল। অতি বিশ্রী একটা গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উল্টে আসছে। এত বাজে চা জীবনে শুভেন্দু মুখে দেয় নি।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হ'ল।'

'না কিছু হয় নি।' বলে কাপটি আর একবার হাত বাড়িয়ে নিতে গেল শুভেন্দু। কিন্তু মনের যতখানি উৎসাহ আছে অবাধ্য হাতের যেন ততখানি আগ্রহ নেই। নীলিমা ততক্ষণে সব টের পেয়েছে। বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, এ চা তুমি খেতে পারবে না, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

এই দ্বিতীয় বার অপ্রস্তুত হ'ল শুভেন্দু। ওর মুখে আজও কোন কথা ফুটল না। শুভেন্দুর ইচ্ছা করতে লাগল সেদিনের মত নীলিমা আজও ওর সমস্ত অপটুতা হেসে উড়িয়ে দেয়, সেদিনের মত উচ্ছল হাসির ঢেউয়ে সমস্ত ব্যবধান, অভ্যাস আর অনভ্যাসের সমস্ত বৈষম্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তা হ'ল না। নীলিমার মুখে আজ আর হাসির লেশমাত্র নেই। ক্ষমাহীন কঠিন চোয়ালে সে মুখ যেন আর নীলিমার নয় অন্য কোন অপরিচিতার।

বাইরে ঘন জমাট অন্ধকার। আর সেই দীর্ঘ বিশ্রী পথ, দুদিকে কাঁচা চামড়া আর নর্দমার গন্ধ। শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হ'ল এসব পার হয়ে কতক্ষণে একটি স্বাদু সুরভিত চায়ের কাপ সে মুখে তুলতে পারবে। অনেকক্ষণ সে চা খায় নি।

বৈশাখ ১৩৫৯

নাকুটমণি

সরিৎ কেবল অমিতার মুখের কাছে নিজের মুখ এগিয়ে এনেছে, সদরদরজায় কে ডেকে উঠল, 'দিদিমণি! ও দিদিমণি!'

মেয়েলি গলার সঙ্গে মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ। বিরক্ত হয়ে কান খাড়া করল অমিতা। এই অসময়ে আবার কে এল জ্বালাতে? রবিবারের দুপুর। সাত দিন পরে অবসরের সঙ্গী হিসেবে আজ সে স্বামীকে পেয়েছে। অন্য দিন এ সময় সরিৎ অফিসে কলম পেষে। ছুটির পরেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আসতে পারে, তা নয়, ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হয়ে গেলে কলেজ স্ট্রীটের একটি স্টেশনারী দোকানে হিসাব লেখে। ফিরতে ফিরতে রাত সেই নটা, সাড়ে নটা। বেশীর ভাগ দিনই বিরস আর তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে আসে। কথা ছোঁয়ানো যায় না, যেন কলে-পেষা একখানা আখ। রসটুকু ওর মনিবেরা নিংড়ে রেখে দিয়েছে। শুধু ছোবড়াটুকু পড়েছে অমিতার ভাগে।

কিন্তু রবিবারের চেহারা অন্য রকম। সকাল থেকে ঢিলে-ঢালা মন্থর গতিতে দিন শুরু। সাতটায় চা, আটটায় বাজার। বারোটায় চার-পাঁচ পদ দিয়ে পাশাপাশি বসে ভোজন। তার পর ঢালা বিছানা আর ঢালাও দুপুর। দিন দুপুর। কিন্তু জানলা-দরজা বন্ধ করলে তা প্রায় রাত দুপুরের মতো। এ সময় সরিতের চাপল্য আর উচ্ছলতা দেখলে বছর পাঁচেক আগের বিয়ের সেই প্রথম কটি দিনের কথা অমিতাব মনে পড়ে।

'দিদিমণি!'

সরিৎ বললে, 'যাও, দেখ গিয়ে আমার কোন শ্যালিকা এল আবাব ওখানে।'

অমিতা মৃদু হাসল। 'বোধ হয় ঘুটেওয়ালী। ছ আনা পয়সা বাকি ছিল, নিতে এসেছে। জ্বালাতন করে ছাড়লে।'

খাট থেকে বিবক্ত ভঙ্গিতে অমিতা এবাব নেমে দাঁড়াল তাব পর ঘর থেকে বেবিয়ে সশব্দে সদরের হুড়কো খুলে ফেলে বলল, 'কে?'

মেয়েটি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সামনে এসে বলল, 'আমি দিদিমণি। মাঠের ওই ওপারটায় থাকি।' বলে আঙুল দিয়ে ছোট হিন্দুস্থানী বস্তিটা দেখিয়ে দিল।

না, আধাবয়সী সেই ঘুটেওয়ালী নয়। অমিতারই প্রায় সমবয়সী বাইশ-তেইশ বছরের একটি বধূ। মাথায় সিঁদুর। কপালে টিপ। হাতে গাছচারেক করে কালো রঙের প্লাস্টিকের চুড়ি। পরনে সবুজপাড় মিলের একখানা আটপৌরে আধময়লা শাড়ি। গায়ের রং কালো। কিন্তু গড়নটুকু বেশ। মুখের ঢৌলটুকু ভারি মিষ্টি, লম্বা নাক, টানা-টানা চোখ। পানের রসে লাল পাতলা ঠোঁট দুটিতে চেহারার শ্রী আরও বাড়িয়েছে।

অমিতা তার সদ্য-শেখা রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ করে বলল, 'কেয়া চাহতি হ্যায়? কি চাও? বাংলা বাত সমঝতি?'

বউটি অমিতার হিন্দী উচ্চারণ শুনে হেসে বলল, 'খুব খুব। আমরা বহুৎ দিন এই কলকাতা মুলুকে আছি দিদি। আমার জন্ম থেকে। বাংলা বুঝি, বাংলা বলি। আর আমার আদমী তো বাংলায় চিঠি লেখে। সেই চিঠি পড়াতেই আপনার কাছে এসেছি দিদি।' বলে চিঠিখানা অমিতার সামনে বাড়িয়ে ধরল বউটি।

নীল রঙের একখানা খাম। বাঁ দিকে লেখা 'By Air Mail, Air Letter.'

অমিতা বিস্মিত কৌতূহলে বলল, 'তোমার স্বামী air mailএ চিঠি লিখেছে? মানে হাওয়াই জাহাজে এসেছে তার চিঠি?'

বউটি হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, তাই তো আসে। সে জাহাজে কাজ করে কিনা। তার চিঠি হাওয়াই জাহাজেই আসে।'

ততক্ষণে ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাটাও অমিতা পড়ে ফেলেছে: নাকুটমণি, পটলবাবুর বস্তি---ডিহি শ্রীরামপুর রোড, কলিকাতা।

'তোমার নামই বুঝি নাকুটমণি?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'এস, ভিতরে এস।'

অমিতা তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসে বাইরের বসবার ঘরখানায় ঢুকল। একখানা তক্তপোশ আর দু-তিনখানা চেয়ারে সাজানো বৈঠকখানা। নাকুটমণি মেঝের ওপর বসতে যাচ্ছিল, অমিতা বাধা দিয়ে বলল, 'ও কি, ওখানে কেন, তক্তপোশের ওপর বস।'

তক্তপোশের ওপর একখানা শতরঞ্চি পাতা। নাকুটমণি আলগোছে তার এক কোণায় বসে পড়ে বলল, 'চিঠিটা এবার পড়ুন দিদি।'

কিন্তু ওদিকে পাশের ঘর থেকে ঘন ঘন কাশির শব্দ আসছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে অমিতা বলল, 'পড়ছি, তুমি একটু বস নাকুটমণি, আমি এলাম বলে।'

ঘরে এসে স্বামীর দিকে চেয়ে অমিতা বলল, 'কি ব্যাপার?'

সরিৎ বলল, 'ব্যাপার আবার কি? নতুন বোনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তার ভগ্নীপতিকে

দেখি একেবারে বেমালুম ভুলে গেলে ! বেশ, আমারও বন্ধু-বান্ধবী আছে। আমিও তাদের সঙ্গে আলাপ করতে জানি। দাও, আমার জামাটা দাও।'

অমিতা জামা দিল না, স্বামীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'একটু বস। চিঠিটা পড়ে দিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি। যে-সে চিঠি নয়, Air mail-এর চিঠি। দেখেছ কোনদিন ?'

Air mail-এর গর্বটা যেন অমিতার নিজের।

সরিৎ হেসে বলল, 'কই দেখি ?'

অমিতা বলল, 'উঁহু, এ চিঠি তোমাকে এর চেয়ে বেশী দেখাতে পারব না। ও বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়েছে। যাই, চিঠিটা ওকে শুনিয়ে আসি।'

বাইরের ঘরে এসে একটু ফাঁক রেখে তক্তপোশের ওপরই বসল অমিতা। তারপর চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল. 'প্রিয়তমে নাকুট।' পড়া থামিয়ে অমিতা হেসে বলল, 'ঈস, একেবারে প্রিয়তমে নাকুট!'

তার হাসির কারণটা আন্দাজ করে নাকুটমণি লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওই রকমই লেখে দিদি, ওর কোন শরম নেই। বোঝে না এ চিঠি আমাকে অন্য মানুষ দিয়ে পড়াতে হয়।'

অমিতা বলল, 'তাতে কি হয়েছে। কিন্তু প্রিয়তমে কথাটি বড় সেকেলে। ওকে আজকালকার পাঠ শিখিয়ে দিয়ো।' চিঠিটা অমিতা এবার একটানা পড়ে গেল:

'প্রিয়তমে নাকুট, তোমি আমার শত শত প্রেমচুম্বন জানিও। বাচ্চুকে—আমার বাচ্চুলালকে—আমার বাচ্চুমণিকে শত শত স্নেহ কিসি দিও। শাশুড়ী মাকে আমার প্রণাম জানাইও। নাকুট, তোমাদের জন্যে সদাই আমার প্রাণ কান্দে। মন উদাস হইয়া যায়। কাজ ভালো লাগে না, নাওয়া-খাওয়া ভালো লাগে না, রাত্রে দুই আঁখে ঘুম আসে না। চুপ করিয়া সমুন্দুরের দিকে চাহিয়া থাকি। আমার চোখ জ্বলিয়া যায়, নাকুট, আমার বুক পুড়িয়া যায়। কত দিনে তোমাকে বুকে করিয়া আমার প্রাণ জুড়াইব !

নাকুট, আমাদের জাহাজ এখন কেপটাউনে আসিয়াছে। এক মাস জাহাজ এখানেই থাকিবে। ওপরের ঠিকানায় চিঠি দিও, তবেই পাইব। আগের মতো ঠিকানা ভুল করিও না, চিঠি মারা যাইবে। চিঠি মারা গেলে, নাকুট, আমিও মারা যাইব। তোমার পত্রমত আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, পরে আরও পাঠাইব। এই টাকা হইতে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিও, তোমার শাড়ি কিনিও, বাচ্চুর জামা কিনিও।

পত্র পাইযাই পত্র দিও। তোমার পত্র না পাইলে আমি চিন্তায় থাকি। তোমার পত্র পাইলে আমার মনে শান্তি আসে। তাই বুঝিয়া পত্র দিও। আর তোমার চোখে, তোমার গালে, তোমার ঠোঁটে, তোমার বুকে, তোমার সব জায়গায় আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রেমচুম্বন নিও।

তোমার স্বামী পান্নালাল'

চিঠি শেষ করে অমিতা স্মিতমুখে নাকুটমণির দিকে তাকাল। 'একেবারে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ! কি সাংঘাতিক !'

নাকুটমণি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আর বলবেন না দিদিমণি। কোন শরম নেই। কিন্তু চিঠিটার জবাব যে আপনাকে লিখে দিতে হবে। বহুৎ জরুরী কথা আছে।'

অমিতা বলল, 'আজই লিখতে হবে নাকি ?'

নাকুটমণি বলল, 'হাঁ দিদি, তা হলে বড়ই উপকার হয়।'

অমিতা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আচ্ছা, বস তা হলে, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ঘরে গিয়ে অমিতা স্বামীকে বলল, 'তুমি ততক্ষণ খবরের কাগজটা দেখ। আমি দু কথা লিখে দিয়ে আসি।'

চিঠি লিখবার আগে অমিতা অবশ্য নাকুটমণির সম্বন্ধে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করে নিল। নাকুট আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে যে হিন্দুস্থানী বস্তি, তার একখানা ঘরে তারা থাকে। ভাড়া কম নয়। মাসে মাসে বারো টাকা গুনে দিতে হয়। নাকুটমণির সঙ্গে থাকে তার বুড়ো বিধবা মা আর ছেলে বাচ্চুলাল। বছর পাঁচেক বয়স হয়েছে বাচ্চুর। না, তার পর ওর আর কোন

ভাইবোন হয় নি। নাকুটমণির স্বামী এক বাঙালীবাবুর কাছে থেকে বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল। সেই বাবুই জাহাজে তাকে কাজ জুটিয়ে দেয়। জাহাজে আরও বাঙালীবাবু আছে। তাদের সকলের সঙ্গেই পান্নালালের দোস্তি। লেখাপড়া জানে বলে বাবুরা সবাই তাকে ভালোবাসে। খালাসীদের মধ্যে সে সর্দার। খুব মান-সম্মান আছে জাহাজে। বস্তির মধ্যে আর কেউ বাংলা পড়তে জানে না। না জানায় নাকুটমণির পক্ষে ভালোই হয়েছে। যদি জানত, তার চিঠি ওরা খুলে পড়ত। বস্তির লোকজন ভালো নয়। নাকুটমণির পাশের ঘরে রুক্মিণীর চিঠি প্রায়ই খোয়া যায়। সেদিক থেকে নাকুটমণির ভাগ্য ভালো। তার চিঠি কেউ ছোঁয় না। এত দিন বস্তির লাগা ওই লাল বাড়িটার একটি অল্পবয়সী বউ নাকুটমণিকে চিঠি পড়ে দিত, জবাব লিখে দিত। কিন্তু তার ছেলেপুলে হবে বলে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন। তাঁরা লোক ভালো। কিন্তু তাঁদের দিয়ে তো আর এ-সব চিঠি পড়ানো যায় না, লেখানো যায় না। তাই খুঁজে খুঁজে অমিতাকে বের করেছে নাকুট। আঁচলের খুঁট থেকে একখানা ভাঁজ করা ময়লা কাগজ অমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে নাকুটমণি বলল, 'চিঠিটা এবার লিখে দিন দিদিমণি।'

অমিতা বলল, 'ওই কাগজে চিঠি লেখে নাকি ? কেন আমার ঘরে বুঝি একখানা চিঠি লেখার কাগজও থাকতে নেই ? দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।'

ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একখানা সাদা কাগজ নিয়ে এল অমিতা : 'বল, কি লিখবে ? কি পাঠ লিখবে ? সে তো লিখেছে প্রিয়তমে ! তুমি লিখবে কি ? প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর, না, প্রাণবল্লভ ? কোন্‌টা তোমার পছন্দ ?'

নাকুটমণি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। 'ওসব কিছু লিখতে হবে না দিদি। ওসব সে না লিখলেও বুঝবে। আপনি শুধু কাজের কথাগুলি তাকে গুছিয়ে লিখে দিন। লিখুন—তার টাকা পেয়েছি, কিন্তু পঞ্চাশ টাকায় কি হবে ? গেল মাসে ছেলের অসুখে অনেক দেনা হয়েছে। তা শোধ করতে হবে। আরও যেন টাকা পাঠায়। এদিকে ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ছে। বাড়িওয়ালা বলছে নিজের টাকায় সারিয়ে নিতে। সে এক পয়সাও খরচ করতে পারবে না। বলুন তো দিদি, এ কি আবদার ! বাড়িওয়ালাকে কি বলব সে যেন জানায়।'

অমিতা একটি একটি করে সব কথা লিখে নাকুটমণিকে পড়ে শোনাল। নাকুটমণি বলল, 'বেশ হয়েছে, আপনার মুসাবিদা ভারি ভালো দিদি। এবার লেফাফায় খামের ওপর ইংরেজীতে ঠিকানা লিখে দিন।' বলে একখানা খাম বাড়িয়ে দিল নাকুটমণি।

অমিতা বলল, 'সে কি নাকুট, তোমার স্বামীর অমন সোহাগভরা চিঠির জবাবে তুমি কি শুধু টাকা-পয়সার কথাই লিখবে ? তার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চুম্বনের বদলে তুমি কি একটি চুম্বনও জানাবে না ?'

এ কথায় নাকুটমণি খিলখিল করে হেসে উঠল। হেসে প্রায় কুটি-কুটি হয়ে পড়ল। তার পর বলল, 'কি যে বলেন দিদি ? আচ্ছা, লিখুন আপনি যা ভালো বোঝেন, আপনার মন যা চায় তাই লিখে দিন।'

একটু ভেবে নিয়ে বাকি অংশটুকু লিখে ফেলল অমিতা। তার পর নাকুটমণিকে পড়ে শোনাল, 'প্রিয়তম, আমার জন্যে তোমার যেমন বুক পোড়ে, তোমার জন্যেও আমার তেমন মন পুড়িয়া যায়। কিন্তু তোমার নাওয়া-খাওয়া ঘুম বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমি আরও দুঃখ পাইলাম। তুমি অমন করিও না। দেহকে কষ্ট দিও না। তাহা হইলে আমিও কষ্ট পাইব। বোঝ তো, এক জনের কষ্টে দুই জনের কষ্ট। ক্যাপ্টেনকে বলিয়া ছুটি লইয়া একবার বাড়ি আসিও। তুমি আমার ভালোবাসা আর কোটি কোটি প্রেমচুম্বন জানিও।'

অমিতা বলল, 'কেমন হয়েছে নাকুট ? তোমার মনের কথা লিখতে পেরেছি তো ? পছন্দ হয়েছে ?'

'হয়েছে, দিদি, হয়েছে।' নাকুট আবার হেসে উঠল। তার পর ঠিকানা-লেখা খামখানা আঁচলের তলায় লুকিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সরিৎ অন্য দোর দিয়ে ততক্ষণে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। পান্নালালের

চিঠিখানা নাকুটমণির কাছ থেকে চেয়ে রেখেছে অমিতা। সেই চিঠি বের করে একা-একা আর একবার পড়ল। বেশ চিঠি। অমিতার জবাবটাও মন্দ হয় নি। বছর তিনেকের মধ্যে স্বামীকে চিঠি লেখবার কোন সুযোগ হয় নি অমিতার। ক'বছর ধরে কাছে-কাছেই আছে। মাঝে মাঝে দু-এক সপ্তাহের জন্যে বেহালায় বাপের বাড়ি যায়। তখনও দুজনের মধ্যে চিঠি লেখালেখি হয় না। অমিতার বাবার বন্ধু নিবারণ মুখুয্যের বাড়িতে ফোন আছে। একেবারে পাশাপাশি বাড়ি। সরিৎ অফিস থেকে সেখানে ফোন করলে, নিবারণবাবুব মেয়ে ইলা-নীলারা অমিতাকে ডেকে দেয়। ফোনেই খোঁজখবব দেওয়া-নেওয়া চলে। কিন্তু আজ পান্নালালকে চিঠি লেখার পর অমিতার মনে হল, ফোনের চেয়ে চিঠিই ভালো। আব সে চিঠি প্রিয়জনের কাছ থেকে যত দূরে বসে লেখা যায় ততই মধুর। এদিক থেকে নাকুটমণি খুব ভাগ্যবতী। কত দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তর থেকে তার স্বামী তাকে চিঠি লেখে। আর সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই চিঠি নাকুটমণির হাতে এসে পৌঁছয়। আহা, ভেবেও সুখ। অজানা সমুদ্রে চলন্ত জাহাজে বসে রাতের পর রাত জেগে এক জন আর এক জনকে চিঠি লিখছে। চিঠিতে করে হাজার হাজার চুম্বন পাঠাচ্ছে। খালাসী হলে হবে কি, পান্নালালের মনে রস আছে। চিঠির প্রত্যেকটি লাইনে স্ত্রীকে সোহাগ আর ভালোবাসার কথা জানিয়েছে সে। নামটিও বেশ সুন্দব। পান্নালাল। বেশ গালভবা কথা। শুনলেই একটি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষের মূর্তি যেন চোখেব সামনে ভেসে ওঠে। আর কেপটাউন কথাটিও বেশ সুন্দর। কে জানে, সমুদ্রের তীরে বন্দরটি হয়তো ভারি অপরূপ দেখতে!

অমিতার হঠাৎ কি খেয়াল হল। দোতলার চক্রবর্তীদের ছেলে দিলীপ ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। তার কাছ থেকে নিয়ে এল অ্যাটলাসখানা। আফ্রিকার ম্যাপ বের করে মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ-প্রান্তে দেখে নিল বন্দরটিকে, ম্যাপে অবশ্য ছোট একটি বিন্দু। কিন্তু আসলে না জানি কত রহস্য ওই বিন্দুটুকুর মধ্যে! কত বিচিত্র রকমের মানুষ! কত বিচিত্র তাদের ভাষা, পোশাক আর আচার! দিনের বেলায় পান্নালাল তাদের ভিতব দিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর রাত্রে জাহাজে বসে নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বউকে চিঠি লেখে। সমুদ্রের হাওয়ায় চিঠির পাতা ওড়ে। ঢেউয়ের ছিটে এসে চিঠিব লেখা ভিজিয়ে দেয়। সমুদ্রচারী পান্নালালের চিঠি সমুদ্রের জলহাওয়া বয়ে নিয়ে আসে। ম্যাপে-আঁকা আটলান্টিক মহাসমুদ্রেব দিকে অমিতা কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

স্কুলে পড়বার সময় ভূগোলটা মোটেই ভালো লাগত না অমিতার। কিন্তু আজ ভাবি ভালো লাগতে লাগল। ভাবল, দিলীপের কাছ থেকে প্রবেশিকা-ভূগোলখানা চেয়ে নিয়ে আফ্রিকার বিবরণটা আব একবাব পড়ে নেবে।

দিন দশেক বাদে আবার আর একখানা এয়ার মেলের চিঠি হাতে হাজির হল নাকুটমণি। হেসে বলল, 'আপনাব বহুৎ গুণ আছে দিদি। চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে জবাব এসেছে। এর আগে এত তাড়াতাড়ি কোনদিন সে চিঠি দেয় নি।'

অমিতা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল: 'বাঃ, তোমার স্বামী তোমাকে চিঠি লিখেছে। আর গুণ হল বুঝি আমাব?'

পান্নালাল লিখেছে:

'আমার নাকুটমণি, আমার মুকুটমণি,

এবার তোমার চিঠি পাইয়া বহুৎ আনন্দ হইল। এই চিঠিতে তুমি তোমার দিল খুলিয়া দিয়াছ। বন্ধ দরজার খিল খুলিয়া দিয়াছ। এ চিঠি বিলকুল নতুন রকম হইয়াছে। তুমিও যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছ নাকুট। আমার দুই দোস্ত তোমার চিঠি লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িয়াছে। আফসোস করিয়া বলিয়াছে, তাহাদের বউদের চিঠি এত ভালো হয় না। দুই দোস্তকে চিঠি দেখাইলাম বলিয়া রাগ করিও না। বাহির হইতে তাহারা কতটুকুই বা দেখিবে, কতটুকুই বা বুঝিবে! আমাদের ভিতরের কথা তাহাবা কিছুই টের পাইবে না। আমার নাকুটমণি, তুমি আমাকে যে কোটি কোটি প্রেমচুম্বন পাঠাইয়াছ তাহা আমি লইলাম। হৃদয় পাতিয়া লইলাম। তোমার চুম্বনের সাগরে আমি স্নান করিলাম। আমার সব জ্বালা জুড়াইল।

আমার নাকুটমণি, তুমি আমার অগুনতি প্রেমচুম্বন নিও। আকাশে যত তারা, সাগরে যত ঢেউ, তার চাইতেও বেশী চুম্বন জানিও।'

এর পর সাংসারিক কথা লিখেছে পান্নালাল। ফুরসুৎ পেলেই সে বেশী টাকা পাঠাবে। নাকুটমণি যেন খুব বুঝে-শুঝে হিসেব করে চলে। দিনকাল বড় মাগ্গা। পাড়াপড়শীর সঙ্গে যেন বিবাদ বিসংবাদ না করে নাকুট। বাড়িওয়ালাকে যেন বুঝিয়ে শুঝিয়ে রাখে। পান্নালাল কলকাতায় এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। ছেলেকে স্নেহ আর শাশুড়ীকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করেছে পান্নালাল।

কিন্তু অবৈষয়িক কথাগুলি অমিতার মনে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল। আকাশে যত তারা, সাগরে যত ঢেউ, পান্নালালের চুম্বনের সংখ্যা নাকি তার চাইতেও বেশী! এর উত্তরে নাকুটমণির হয়ে কি লিখবে অমিতা? এ চিঠির জবাব দেওয়া তো বড় সহজ হবে না।

এবার আর সাদা কাগজ নয়, বাক্স খুলে নিজের নীল রঙের প্যাডটা বের করল অমিতা। বিয়ের প্রথম বছর কিনেছিল। এখনও অনেকগুলি পাতা বাকি। বিলেতী এসেন্সের সৌরভে, ন্যাপথলিন আর শাড়ি-ব্লাউজের এক অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধে প্যাডটা মাখামাখি। সেই প্যাডের পাতায় চিঠি লিখতে বসল অমিতা।

নাকুটমণি আপত্তি করে বলল, 'ও কি দিদি, আপনার অত দামী কাগজ কেন খরচ করছেন?'

অমিতা হেসে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। কাগজের কি কোন আলাদা দাম আছে নাকুট, চিঠির দামেই তার দাম।'

নাকুটমণি যদি পান্নালালের সঙ্গে কথায় নাই পেরে ওঠে, প্যাডের দামী রঙীন কাগজ দিয়ে পাল্লা দিক। চিঠির সবটুকুই যদি কেবল কথায় জানাতে হয় তা হলে এ সব আছে কেন?

এক মাস পরে পান্নালালদের জাহাজ লণ্ডন যাত্রা করল। মাঝখানে আফ্রিকা ও ইউরোপের কত যে সাগর উপসাগর শহর বন্দর পার হয়ে এল তার আর সীমা নেই, আর সব বন্দর থেকেই নাকুটমণির নামে চিঠি আসতে লাগল। চিঠির ভাষা প্রায় এক। সব চিঠিতেই সোহাগ জানাবার ধরন প্রায় একই রকমের। কিন্তু তবু যেন তা পুরোন হয় না। ভাষা পুরোন হলেই কি প্রেম পুরোন হয়, মন পুরোন হয়, না, মনের মানুষ পুরোন হয়?

দু-একখানা চিঠিতে অবশ্য পান্নালালকে নানা দেশের বর্ণনার কথা জানাবার জন্যে অনুরোধ করল অমিতা। কিন্তু পান্নালালের যেন সে খেয়ালই নেই। কেবল প্রেম আর প্রেম। বাংলা ভাষার কাছ থেকে কেবল ওই একটি জিনিসই শিখেছে পান্নালাল। স্ত্রীকে প্রেমপত্র কি করে লিখতে হয় তাই শুধু জেনে নিয়েছে। আর যেন কিছু তার জানবার প্রয়োজন নেই। প্রেম ছাড়া আর সব কথাই যেন বাহুল্য, সব কথাই অবান্তর।

অমিতা এক-একদিন স্বামীকেও জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা, ওসব জাহাজে কি কি চালান হয়? কোন্ কোন্ রুট দিয়ে চলে এ জাহাজগুলো?'

সবিৎ বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'কি করে জানব! আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কি দরকার। আমার তো অত সময় নেই যে ঘরে বসে বসে কেবল জাহাজ আর খালাসীর ভাবনা ভাবব। আমাকে কাজকর্ম করে খেতে হয়।'

অমিতা বলেছে, 'আর আমাকে বুঝি কিছু করতে হয় না?'

পান্নালালের জাহাজ লণ্ডনে এসে পৌঁছল। নাকুটমণি এল চিঠি পড়াতে আর চিঠি লেখাতে।

অমিতা বলল, 'লণ্ডন কোথায় জান নাকুটমণি?'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, কি করে জানব?'

আহা বেচারা! ওর স্বামী কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায় আর ও কিছু জানে না। কিন্তু অমিতা জানে। লন্ডন কেপটাউনের মতো অত অচেনা শহর নয়। লণ্ডনের অনেক কথা সে বইতে পড়েছে। এমন কি লণ্ডন-ফেরত একজন বান্ধবীও আছে তার। বিলেত থেকে ডাক্তারী পাস করে এসেছে। তার কাছে শুনেছে সব বিবরণ।

অমিতা বলল, 'দাঁড়াও, তোমাকে লণ্ডন শহর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দিলীপের কাছ থেকে আজ আবার অ্যাটলাসখানা চেয়ে নিয়ে এল অমিতা। তারপর ম্যাপ খুলে

লণ্ডন চেনাতে বসল নাকুটমণিকে।

নাকুটমণি অবাক হয়ে বলল, 'ওই নাকি শহর! ও তো একটা ফোঁটা।'

অমিতা হেসে বলল, 'ফোঁটা নয় নাকুট ; গোটা পৃথিবীর মধ্যে ওটা সব চেয়ে বড় শহর। এখানে এখন থাকে পান্নালাল। এই হল টেমস নদী। এইখানে তাদের জাহাজ ভিড়েছে। বুঝতে পারছ?'

বুঝতে না পারলেও নাকুটমণি ঘাড় কাত করল।

অমিতা বলল, 'নেবে তুমি এই ম্যাপখানা? নিয়ে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখবে। আর রোজ ভোরে উঠে দেখবে কোথায় তোমার স্বামী আছে। ভোরে দেখবে, রাত্রে শোবার সময় ঘুমোবার আগে দেখবে। বেশ হবে, না? তুমি বরং এটা নিয়ে যাও নাকুট। আমি দিলীপকে আর একখানা অ্যাটলাস কিনে দেব।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি। এ ছবি আপনার ঘরেই টাঙানো থাক্। আমি নিয়ে কি করব? আমি তো দেখতে জানি নে, পড়তে জানি নে, চোখ থাকতেও অন্ধ।'

অমিতা একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তোমাকে এর পর থেকে লেখাপড়া শেখাব নাকুট! তুমি নিজেই তোমার স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে পারবে।'

নাকুটমণি অমিতার ছেলেমানুষিতে না হেসে পারল না, 'সে যখন হবে তখন হবে। আজ আপনি তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখে দিন লক্ষ্মী দিদি। ওদিকে আমার মেলা কাজ।'

মাস দুয়েকের মধ্যে আরও চার-পাঁচখানা চিঠি আসা-যাওয়া করল। তার পর একদিন পান্নালালের চিঠি পড়ে অমিতা লাফিয়ে উঠল 'নাকুট, কি খাওয়াবে বল?'

নাকুটমণি বলল, 'কি আবার খাওয়াব দিদি! কেন, হয়েছে কি?'

অমিতা সোল্লাসে বলল, 'পান্নালাল আসছে নাকুট। এই সেপ্টেম্বর মাসে তাদের জাহাজ এসে পৌঁছবে। আনুমানিক একটা তারিখও দিয়েছে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর।'

অমিতা হঠাৎ উঠে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই দেখ নাকুট, এই হল সেপ্টেম্বর মাস। এই হল ছাব্বিশে তারিখ। আজ হল সবে দোসরা। আর চব্বিশটি দিন মোটে বাকি।

ভিতরের ঘর থেকে একটা রঙীন পেনসিল নিয়ে এল অমিতা। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বরের চার দিকে সযত্নে একটা বৃত্ত টানল। তারপর বলল, 'এই দেখ চিহ্ন দিয়ে দিলাম। এই দিন সে আসবে। তুমি এই ক্যালেণ্ডারখানা নিয়ে যাও নাকুট, আর এই পেনসিলটাও নাও। এক-একটা দিন যাবে, আর পেনসিল দিয়ে কেটে কেটে দেবে। তার পর আসল দিনটিকে আর কাটবে না। বেশ হবে, নিয়ে যাও তুমি।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, ওসব আমি পারব না, ওসব আপনিই করুন, পড়ুন তো চিঠিখানা কি লিখেছে?'

অন্য সব কথার পর পান্নালাল লিখেছে, 'আমার প্রিয়তমে নাকুটমণি, মুকুটমণি, এবার সত্যই আমার প্রাণ জুড়াইবে। তোমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া এবার প্রাণ জুড়াইবে। তোমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া এবার আর কলম দিয়া নয়, মুখ দিয়াই তোমার মুখচুম্বন করিতে পারিব। ভাবিতেও আনন্দে গায়ে আমার কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। দুই ঠোঁটের একটি চুম্বন কলমের শত কোটি চুম্বনের চাইতেও বেশী নাকুট।'

জবাব লিখিয়ে নিয়ে নাকুটমণি চলে গেল। চিঠিখানা রইল অমিতার কাছে।

দিন কয়েক পরে ক্যালেণ্ডারখানার দিকে তাকিয়ে সরিৎ অবাক হয়ে গেল : 'ও কি, তারিখগুলিকে অমন করে কেটে দিচ্ছ কেন? আর ছাব্বিশ তারিখটাকেই বা অমন একটা গোলাকার আংটি পরিয়ে রেখেছ কিসের জন্যে?'

অমিতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'নাকুটমণির সুবিধের জন্যে। ওই দিন ওর স্বামী পান্নালাল কলকাতায় আসছে। নাকুট তো ক্যালেণ্ডার দেখতে জানে না, এই দাগ দেখে বুঝবে ক'টা দিন গেল।'

সরিৎ পরিহাসের সুরে বললে, 'হুঁ, আমার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই। ওই খালাসী বেটা

আমার সর্বনাশ করবে দেখছি। দূরে থেকেই অমন করে টানছে, কাছে এলে না জানি—'

অমিতা তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল : 'ছি ছি ছি, তোমার মুখের কোন আগল নেই। যাও, গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধুয়ে এস।'

সরিৎ অফিসে বেরিয়ে গেলে ক্যালেণ্ডারখানা আর বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রাখল না অমিতা, ভিতরে এনে বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখল।

একদিন পাঁচ টাকার একখানা নোট ভাঙাতে এল নাকুটমণি। সঙ্গে ছেলে : নোটের রেজগি দিয়ে অমিতা বলল, 'আর মাত্র দুটি দিন বাকি। স্বামী এলে দেখিয়ে দেবে তো, আলাপ করিয়ে দেবে তো? নাকি ঘরে মধ্যে দিনরাত লুকিয়ে রাখবে?'

নাকুটমণি হেসে বলল, 'বেটাছেলেকে কি সে ভাবে রাখা যায় দিদিমণি? আপনার ভাবনা নেই, এলেই সঙ্গে করে নিয়ে আসব এখানে।'

অমিতা ঘরে গিয়ে জেলি আর বিস্কুট এনে দিল পান্নালালেব ছেলের হাতে, তার পর তাব গাল টিপে দিয়ে বলল, 'বল তো বাচ্চু, কে আসছে?'

বাচ্চু হেসে বলল, 'মেরে বাপজী।'

ছাব্বিশ তারিখে নয়, আবও দু দিন দেরি করে আঠাশ তারিখে গঙ্গার ঘাটে এসে লাগল পান্নালালদের সওদাগরী জাহাজ। নাকুটমণি কথা রাখল। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে নিয়ে এল অমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। সরিৎ তখনও তাব পার্ট টাইম কাজ সেরে আসে নি। অমিতা বাইরের ঘরে ওদের বসতে দিল।

নাকুটমণি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই আমার স্বামী, আর এই আমাদের সেই দিদিমণি। সব চিঠি লিখে দিয়েছেন। ভারি উপকারী মানুষ।'

অমিতা একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। বড় নিরাশ হয়েছে সে। এই কি সেই দূর দেশের নীল সমুদ্রের নাবিক? নাবিকের নীল পোশাক ছেড়ে পান্নালাল অবশ্য নাগরিকের ধুতি পাঞ্জাবি পরেই এসেছে। কিন্তু এ কি চেহাবা! যেমন বেঁটে তেমনি কালো। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স। ঠোঁটের ওপর বিশ্রী ধরনের বাটারফ্লাই গোঁপ। আজকাল অমন গোঁফ কেউ রাখে না। ভাঙা গালে চোয়াল দুটো জেগে উঠেছে। লম্বা জুলপি গালের অনেকখানি পর্যন্ত নামানো। মোটা মোটা কালো কালো ঠোঁট দুটি ঠিক একেবারে জোঁকের মতো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখ-দুটি লালচে। চাউনিও যেন কেমন তেরছা-তেরছা।

পান্নালাল জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্কার দিদিমণি। আপনিই তিনি! আসা অবধি নাকুটমণি বলছে আপনার কথা। তা আপনি তো ভারি রস দিয়ে লিখতে পারেন দিদিমণি! হেঃ হেঃ হেঃ।' কৌতুকে হেসে উঠল পান্নালাল।

আরক্ত মুখে অমিতা ফের ওর দিকে তাকাল। পানের ছোপ-ধরা অসমান কয়েকটি দাঁত। হাসলে কুৎসিত দেখায়।

পান্নালাল তার প্রশস্তি শেষ করল : 'সারা জাহাজ সেই রসের চিঠি পড়ে একেবারে মাতোয়ারা। হেঃ হেঃ হেঃ।'

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না। লজ্জায় অপমানে কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে অমিতার। ঝাঁ-ঝাঁ করছে। উঠে যেতে পারলে বাঁচে।

একটু বাদে সত্যিই উঠে পড়ল অমিতা, নাকুটমণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা বস। আমি চা নিয়ে আসছি।' পান্নালাল বাধা দিয়ে বলল, 'না দিদিমণি, চা এখন থাক্। চা আজ খাব না। তাড়া আছে। একটা পান থাকে তো তাই বরং আনুন।'

অমিতা চা খাওয়ার জন্যে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করল না। শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'পান নেই, পান আমরা কেউ খাই নে।'

পান্নালাল বললে, 'ও! একটু সুপুরি কি মসলা-টসলা দিন, তাতেই হবে।'

অমিতা ঘরে গিয়ে একটা চায়ের প্লেটে করে দুটি লবঙ্গ আর এলাচদানা পান্নালালের সামনে

রাখল। পান্নালাল সেগুলি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল : 'আচ্ছা, আজ চলি দিদিমণি। আর একদিন এসে দাদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করব, চা খাব। সপ্তাহ তিনেক জাহাজ থাকবে এখানে। তারপর ফের নোঙর তুলতে হবে।'

পান্নালালরা চলে গেল।

রাত্রে সরিৎ বলল, 'তোমার দিন গোনার পালা কি শেষ হল ? মহাসমুদ্রের মহারাজ কি এসে পৌঁছেছেন ?'

অমিতা বলল, 'তুমি বড্ড বাজে বক।' তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'লোকটি দেখতে কি বিশ্রী, আর মোটেই রুচি নেই। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না। একটি আস্ত ইতর।'

সরিৎ কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'আহাহা, বড়ই আফসোসের কথা তো। তুমি কোথায় প্রতীক্ষা করছ সপ্তডিঙ্গা মধুকর থেকে নেমে আসবে কন্দর্পকান্তি রূপবান রুচিবান এক রাজপুত্তুর, তা নয়—'

অমিতা বলল, 'থাম। সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।'

পান্নালালের সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই অমিতার। তার কোন খবরও সে শুনতে চায় না। তবু নানা রকম বিশ্রী বিশ্রী সব খবর তার কানে এসে পৌঁছতে লাগল। পান্নালাল রাত্রে মদ খেয়ে এসে বস্তির মধ্যে হল্লা করেছে, বউকে ধরে মেরেছে। ছি ছি ছি, লোকটা এত ইতর ! আর এই লোকই কিনা নাকুটমণিকে অত ভালো ভালো চিঠি লিখত। লক্ষ লক্ষ প্রেমচুম্বন জানাত !

নাকুটমণি আর আসে না। সেদিন বিকেলবেলায় অমিতাদের বাড়ির সামনের গলি দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, অমিতা দেখতে পেয়ে তাকে হাতের ইশারায় ডাকল, 'নাকুটমণি, শোন। আর যে এদিক মাড়াও না ? ব্যাপার কি ?'

নাকুটমণি দোরের কাছে এসে দাঁড়াল : 'সময় পাই নে দিদিমণি।'

অমিতা বলল, 'এস, বস এসে। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করো না।'

নাকুটমণি ঘরে এসে বসল, অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন দিদি, কি বলবেন ?'

অমিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমাদের নতুন ঝি বিমলা তোমাদের ওই বস্তির মধ্যেই থাকে। সে তোমাদের সম্বন্ধে নানারকম কথা বলছিল ; রোজ রাত্রে নাকি তোমরা ঝগড়া-মারামারি কর। তোমাদের জ্বালায় সারা বস্তির লোক নাকি অস্থির হয়ে উঠেছে ? কি ব্যাপার বল তো ? দেড় বছর বাদে ক'টা দিনের জন্যে স্বামী এসেছে ঘরে, এত গোলমাল কিসের তোমাদের ?'

নাকুটমণি একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনি যখন সবই শুনেছেন, আপনার কাছে কিছু গোপন করব না দিদি। আপনি জিজ্ঞেস না করলেও সব আমি বলতাম। আমার ওপর আপনার বহুৎ দরদ আছে। বড় দুঃখে, বড় অশান্তিতে আছি দিদি। আমার আদমী মানুষ না।'

অমিতা বলল, 'সে কি নাকুট ?'

আরও কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করে রইল নাকুটমণি। তার পর বলল, 'বড় শরমের কথা দিদি। বিদেশী বন্দর থেকে এবারও খারাপ রোগ-ব্যামো নিয়ে এসেছে। আমি বলেছি—তুই দাবাইখানায় যা ও ওষুধপত্তর খেয়ে রোগ সারা ; নইলে আমি ছুঁতে দেব না, আমার কাছে শুতে দেব না। কিন্তু ও তা শোনে না, রোজ হামলা করে। ও আমার সর্বনাশ করেছে দিদি। আমার মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাচ্চুর পর তিন-তিনটে বাচ্চা আমার পেটেই মারা গেল। এবার ওকে আমি আর জায়গা দিচ্ছি নে।'

লজ্জায় মুখ আরক্ত হয়ে উঠল অমিতার। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। একটু বাদে বলল, 'এই নিয়ে তোমাকে বুঝি খুব মারে ?'

নাকুটমণি বলল, 'আমিও ছেড়ে দিই নে দিদি, আমিও আচ্ছা করে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিই।'

এবার অমিতার হাসি পেল : 'তুমি পার ওর সঙ্গে ?'

নাকুটমণি বলল, 'পারব না কেন দিদি ! আসলে ও দুবলা। ও আবার একটা মরদ নাকি ?'

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় অমিতার সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। ছি ছি ছি, এমন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত লম্পট, দুশ্চরিত্র পুরুষের কাছে সে নাকুটমণির হয়ে জবাব দিয়েছে ! ভাবতেও মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

রাত্রে স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাল অমিতা : 'শুনেছ পান্নালালের কীর্তি ? লোকটা একেবারে

পাক্কা বদমাস। ছিঃ!'

সরিৎ বিস্মিত না হয়ে বলল, 'এ আর এমন নতুন কি! ওরা তো ওই রকমই হয়, ঘাটে ঘাটে ওদের ঘট! বন্দরে বন্দরে ওদের প্রিয়া। প্রেমের বীজের সঙ্গে রোগের বীজাণুও তারা বিদেশী নাবিক বন্ধুদের উপহার দেয়। বলে, যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব—'

অমিতা বলল, 'থাম থাম, ছিঃ! লোকটা যে এত খারাপ আমি ভাবতেই পারি নি। অথচ কি সুন্দর সুন্দর সব চিঠি! সব মিথ্যে, সব মিথ্যে।'

পান্নালাল যেন শুধু নাকুটমণির সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, অমিতাকেও ঠকিয়েছে।

তিন সপ্তাহ বাদে পান্নালাল চলে গেল। যাওয়ার আগে দেখা কবতে এসেছিল। কিন্তু অসুখেব অছিলায় অমিতা ওর সামনে বেরোয় নি।

আবও মাস দেড়েক কাটল। পান্নালাল আর নাকুটমণির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল অমিতা, কিন্তু সেদিন সকালে কাজ করতে এসে বিমলা খবর দিল, 'ভালো কথা বউদি, নাকুটমণির অসুখ। ওর উঠে এসে দেখা করার সাধ্য নেই। দুপুরবেলায় আপনাকে দয়া করে যেতে বলেছে। ক'দিন ধবেই বলছে, আমার বলতে মনে থাকে না।'

অমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি অসুখ বিমলা?'

বিমলা মুখের অপরূপ ভঙ্গি করে বলল, 'কি জানি বউদি, জ্বর, আরও যেন সব কি কি। ওর সোয়ামী তো মনিষ্যি নয়, এক-একবাব আসে আর যত সব জাহাজী রোগ নামিয়ে দিয়ে যায়।'

অমিতা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে বইল। একবার ভাবল, যাবে কি যাবে না। কিন্তু নাকুটমণিব তো কোন দোষ নেই, যত দোষ সেই লম্পট বদমাসটার। অত কবে যখন বলেছে নাকুটমণি, একবার দেখে আসাই উচিত। তা ছাড়া দূর তো নয়, এই তো পা বাড়ালেই নাকুটমণিদের বস্তি। দেখে আসাই ভালো।

ঝিকে অমিতা বলল, 'বেশ, আজ দুপুরের পবে এসে তুমি আমাকে নিয়ে যেও বিমলা। আমি তো ওদের ঘর চিনি নে।'

বিমলা বলল, 'আচ্ছা, আমি এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বউদি। কিন্তু ও-সব জায়গায় আপনাব না যাওযাই ভালো।'

না। অমিতা যাবে। গিয়ে নাকুটমণিকে বলে আসবে অমন স্বামীকে যেন নাকুট ছেড়ে দেয়। যেন আব একটা বিয়ে করে তাব সঙ্গে ঘর-সংসার করে। তাদের মধ্যে তো ও-সব চলে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিমলা এসে বলল, 'কই বউদি, চলুন।'

যাওযাব সময় দুটি টাকা অমিতা আঁচলে বেঁধে নিল। নাকুটকে ফল-টল খাওয়ার জন্যে দিয়ে আসবে।

ধুঁটে-শুকনো মাঠটার ঠিক উত্তরে ঘিঞ্জি বস্তি। সারি-সারি টালির ঘর। কোন-কোনটির দোরের সামনে চট টাঙানো। দুই সাবির মাঝখানে আধ হাত খানেক চওড়া পথ। কোন কোন জায়গায় ময়লা জল কাদা জমে রয়েছে; মাঝে মাঝে এক-একখানা করে ইট পাতা। তার একটিতে পা দিতেই খানিকটা কাদা-জল ছিটকে অমিতাব শাড়িতে এসে লাগল। আঁকা-বাঁকা এ-গলি সে-গলির ভিতর দিয়ে বিমলার পিছনে পিছনে অমিতা এসে একখানা ঘরেব সামনে দাঁড়াল। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। কবাটে চকখড়ি দিয়ে ইংরেজীতে লেখা পান্নালালের নাম। জাহাজে কাজ করে দু চার অক্ষর ইংরেজীও শিখেছে খালাসীপুঙ্গব। সেই বিদ্যে ফলিয়েছে নিজের জানলা-কবাটের ওপর। মনে মনে ভাবল অমিতা।

বিমলা ডাকল, 'ও নাকুটমণি, ওঠ, দোর খুলে দাও। বউদি এসেছেন।'

একজন প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি নাকুটের মা! ওর বুখার হয়েছে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দা। তার এক পাশে রান্নাবান্নার সরঞ্জাম। আর এক দিকে দু'টি মোরগ আর একটি লোম-ওঠা রোগা নেড়ী কুকুর। বাচ্চু তাদের মাঝখানে বসে খেলছে। অমিতাকে

দেখে কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

ঘরের ভিতর থেকে নাকটুমণি তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই, চুপ। আসুন দিদিমণি, এখানে আসুন।'

ঘরের ভিতরটা কিন্তু বেশী নোংরা নয়। দেয়ালগুলোতে সদ্য চুনকাম করানো হয়েছে। উত্তর দিকে ছোট ছোট দুটি জানলা। তার নীচে একখানা তক্তপোশ পাতা, তার ওপর নাকুটমণি কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে। অমিতাকে দেখে শীর্ণ ঠোঁটে একটু হাসল : 'আসুন দিদি, রোগের জন্যে নিজে যেতে পারলাম না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে আনলাম।'

অমিতা বলল, 'না না, কষ্ট কি! তুমি এখন কেমন আছ নাকুট?'

নাকুটমণি বলল, 'ভাল আছি। মা ডাক্তার ডেকে এনেছিল। তিনি ওষুধ দিয়েছেন, ইনজেকশন করেছেন। বলেছেন, সেরে যাবে। মা, দিদিকে ওই টুলটা দাও বসতে।'

নাকুটমণির মা তক্তপোশের তলা থেকে ছোট একখানা টুল বের করে অমিতার দিকে এগিয়ে দিল।

'বসুন দিদি। আপনাকে একটা কাজের জন্যে ডেকেছি। কাজ আর কি! সেই আগের কাজ!' অমিতার দিকে তাকিয়ে নাকুটমণি একটু হাসল : 'চিঠি লিখে দিতে হবে দিদি। ক'দিন ধরে এসে রয়েছে চিঠিটা। জ্বরে নিজের চৈতন্য ছিল না। শুনতে পারি নি। মা, আমার সেই চিঠিটা কোথায়, দাও তো দিদিকে।'

অমিতা রুক্ষস্বরে বলল, 'থাক্ থাক, ও চিঠি আমার আর দেখবার দরকার নেই, জবাবটাও তুমি আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিও, নাকুটমণি। আমি পারব না।'

নাকুটমণি ফের একটু হাসল : 'দিদির গোসা হয়েছে! অমন গোসা আগে আগে আমারও হত। কিন্তু চিঠি আপনাকেই যে লিখতে হবে দিদি। আর কে লিখবে? আমার জানাশোনা আর তো কেউ নেই।'

কিন্তু চিঠিটা খুঁজে পাওয়া গেল না, তাই নিয়ে নাকুটমণি খানিকক্ষণ মা'র সঙ্গে রাগারাগি বকাবকি করল। তার পর বলল, 'আচ্ছা, মা, তুমি বাইরে গিয়ে বসো। দেখ গিয়ে বাচ্চু কি করছে। দিদিমণির সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মা সরে গেলে নাকুটমণি বলল, 'দিদিমণি, আপনি সেই কলমটা এনেছেন যার থেকে আপনিই কালি বেরোয়? আর সেই নীল রঙের গন্ধমাখা কাগজ?'

অমিতা বলল, 'না। আমি তো জানি নে যে তুমি ফের চিঠি লেখাবে? আর জানলেও আনতাম না।'

নাকুটমণি ম্লান মুখে বলল, 'ও! আচ্ছা দিদি, আপনি বসুন। আমিই আনছি সব যোগাড় ক'রে।'

তক্তপোশ থেকে নাকুটমণি নেমে দাঁড়াল। তারপর বস্তির আর এক ঘর থেকে দোয়াত আর কলম নিয়ে এল সংগ্রহ ক'রে। দোয়াতের কালি একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। কলমটাও একেবারে অচল।

'কাগজ আমার কাছেই আছে দিদি।'

বিছানার তলা থেকে সেই পুরোন, ময়লা, ভাঁজ-করা কাগজখানা বের করল নাকুটমণি। বলল, 'নিন দিদি, এবার লিখুন।'

ক্লান্তদেহে নাকুটমণি আবার শুয়ে পড়ল।

অমিতা বলল, 'দরকারী কথাগুলো চটপট বল। আমার সময় নেই বেশী।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, বেশী লিখতে হবে না আপনার। অল্পই কথা।'

চিঠির গোড়ায় কোন রকম সম্বোধন দিল না অমিতা। নাকুটমণির কথামতো সাংসারিক বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখে তাকে পড়ে শোনাল।

পান্নালাল যে ঘর সারিয়ে গেছে তা খুব ভালোই হয়েছে। চাল দিয়ে আর জল পড়ে না। সে নিজের হাতে দেয়ালগুলিতে যে চুনকাম ক'রে দিয়ে গেছে তারও ভারি খোলতাই হয়েছে। কোন রাজমিস্ত্রীর হাতের কাজ এমন হয় না। আর যে মর-মর নেড়ী কুকুরটাকে রাস্তার নর্দমা থেকে

পান্নালাল তুলে এনেছিল সে মরে নি। একটু একটু ক'রে বেঁচে উঠেছে। লোকজন দেখলে খুব ডাকে। বাচ্চুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। মোরগটা আগের চেয়ে অনেক সেরে উঠেছে। মুরগীটা একদিন অন্তর-অন্তর ডিম পাড়ে। জিনিসপত্রের দাম খুব মাঙ্গা। নিজের খরচ-খরচা বাদে যদি কুলোয় পান্নালাল যেন দু-পাঁচ টাকা আরো বেশী পাঠিয়ে দেয়। সবাই বলছে, এই বস্তি নাকি ভেঙে দেবে। এখানে নাকি বাবুদের বেড়াবার বাগান হবে। তা হলে অন্য বস্তিতে চলে যেতে হবে নাকুটমণিকে। তখন নড়া-চড়ায় অনেক টাকার দরকার পড়বে। তার জন্যে আগে থেকেই যেন তৈরী থাকে পান্নালাল।

চিঠি লেখা শেষ ক'রে কাগজখানা ভাঁজ করল অমিতা। তারপর খামের ভিতরে ভরে রাখতে যাচ্ছে, নাকুটমণি বলল, 'আর কিছু লিখলেন না দিদি?'

অমিতা বলল, 'আর আবার কি লিখব?'

নাকুটমণি বলল, 'ওই সঙ্গে আর দু-একটা কথা লিখে দিন দিদি।'

অমিতা অবাক হয়ে তাকাল, 'ও-সব কথা তুমি ফের লিখতে চাও নাকুট? তার চিঠির ও-সব কথায় তুমি এখনো বিশ্বাস কর?'

নাকুটমণি ম্লান হাসল : 'করি দিদি। বিশ্বাস না করলে টিকব কি ক'রে? তা ছাড়া এ তো নতুন নয়। আমার বাবাও জাহাজে কাজ করত। তাকে নিয়ে মাকেও এই রকম ভুগতে হয়েছে। এই আমাদের নিয়ম। জাহাজের রোজগার যাবা খায় তাদের এ সব সহ্য করতে হয় দিদি। তাকে লিখে দিন আরো দু-একটি কথা। জায়গা আছে তো?'

জায়গা আছে। কিন্তু অমিতার মনে আর কোন কথা যে নেই।

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নাকুটমণি মৃদু হাসল : 'আপনার বুঝি শরম হচ্ছে দিদি? আচ্ছা, আমি বলি আপনি লিখে যান।'

নাকুটমণি খুব আস্তে আস্তে, অমিতাকে লেখবাব সময় দিয়ে ব'লে যেতে লাগল : 'আমার প্রিয়তম, তুমি আমার শত শত প্রেমচুম্বন নিও। তুমি বাড়ি আসিবার পর মাঝে-মাঝে আমাদের যে ঝগড়া হইয়াছে সে কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিও না। বোঝ তো, অসুখ-বিসুখ হইলে সাবধানে থাকিতে হয়। এখন তুমি বড় শহরে আছ। বড় ডাক্তার দেখাইয়া তোমার অসুখ সারাইয়া লইও। আর আমার মা যে কবচটা তোমাকে দিয়াছেন তাহা সব সময় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে রাক্ষুসীরা আর তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না, ডাকিনীরা ফের হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইতে পারিবে না।

'মনে থাকে যেন তুমি আমার মা'র পা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছ, আমার গা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছ, আমাদের ছেলের মাথায় হাত বাখিয়া শপথ করিয়া গিয়াছ। সে শপথ আমি তোমাকে করিতে বলি নাই, তুমি নিজের ইচ্ছায় কবিয়াছ। নিজের মনের জোরে করিয়াছ। তাহা যেন মনে থাকে। যাইবার সময় তুমি আমার বুকের উপব মাথা বাখিয়া কাঁদিয়াছ, সেই কান্না আমার বুকের মধ্যে গিয়া রহিয়াছে। প্রিয়তম, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমার দোষ নয়, লোণা সমুদ্দুরের দোষ। সে-ই মানুষের রক্তকে লোণা করিয়া দেয়। রক্তে তুফান তোলে। কিন্তু তুমি মা-কালীর নাম স্মরণ করিও, সব তুফান থামিয়া যাইবে। তুমি আমার মুখ মনে করিও, সব তুফান থামিয়া যাইবে। তুমি আমার কথা মনে রাখিও, প্রিয়তম, আমি যে কেবল তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি, সেই কথা মনে রাখিও। আর মুখ ভরিয়া, তোমার দুই ঠোঁট ভরিয়া আমার সব প্রেমচুম্বন নিও।'

চিঠি শেষ করে অমিতার দিকে তাকাল নাকুটমণি : 'লিখে নিয়েছ দিদি?'

অমিতা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে নাকুটমণির দিকে তাকাল, তারপর ভাবার্দ্র গলায় বলল, 'হ্যাঁ নিয়েছি, নাকুট। এমন চিঠি স্বামীর কাছে আমিও লিখতে পারতাম না।'

'কি যে বল দিদি!'

বলতে বলতে সেই প্রথম দিনের মতোই আজও নাকুটমণি খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল।

শ্রাবণ, ১৩৫৯

পূর্ণ

সকালবেলায় পারিবারিক চায়ের আসর বসেছিল। শৈলেনের ভগ্নীপতি শীতাংশু থাকে দার্জিলিংয়ে। কাজ করে সেখানকার সিক্কা কোম্পানির ফার্মেসী স্টোরে। সেই পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যাপি ভ্যালির দু পাউণ্ড চা। তার পাউণ্ডখানেক সুষমা কালই বাবাকে উপহার দিয়েছে। তিনিও চা খেতে ভালোবাসেন। সামনের রবিবার শৈলেনের জন দুয়েক বিশিষ্ট বন্ধু আসবার কথা আছে। সুষমা ভেবেছিল, দার্জিলিংয়ের এই দুর্লভ চা তখন থেকেই শুরু করবে। শৈলেনের বন্ধু পরেশবাবু আর প্রিয়তোষবাবু দুজনেই সুষমার হাতের চায়ের খুব প্রশংসা করেন। কিন্তু শৈলেনের আর সবুর সইল না, সে বলল, 'আজই আরম্ভ করে দাও হ্যাপি ভ্যালিকে, রবিবারের তো আরও পুরো দু দিন বাকি। এ দু দিন আনহ্যাপি থেকে লাভ কি।'

সাধারণ চা খাওয়া হয় মিল্ক পাউডার দিয়ে। আজ দার্জিলিং চায়ের সম্মান রাখবার জন্যে ন্যাশনাল ডেয়ারির অধীরবাবুর কাছ থেকে আধ পো দুধ বেশি নিল সুষমা। রোজ রান্নাঘরের সামনে চাটাই পেতে স্বামী বসে চা খায়। কোন প্লেটের কোণা ভাঙা থাকে, কোন কাপের হাতল থাকে না। প্রাণে ধরে আস্ত কাপডিশগুলিকে উঁচু তাক থেকে নামায় না সুষমা। যা দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুটি, ভাঙতে কতক্ষণ! আজ দার্জিলিং চায়ের সৌরভে হ্যাপি ভ্যালির গৌরবে সুষমার মনে দাক্ষিণ্য নেমেছে; আজ আর চাটাই নয়, আজ আর রান্নাঘরের দুয়ারে নয়, ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্যে যে ছোট টেবিলখানা কিনেছে, সেইখানাই শোয়ার ঘরের মাঝখানে টেনে নিল সুষমা। তার ওপর বিছিয়ে দিল নিজের হাতের তৈরি চার কোণায় সবুজ সুতোর ফুলতোলা সাদা টেবিল-ঢাকনি। দুখানা চেয়ার আছে ঘরে। টেবিলের দুই ধারে। তাক থেকে নামাল নীল রঙের দু জোড়া কাপ-প্লেট। সাদা চীনেমাটির কেটলি থেকে তরল তামাটে পানীয়ে তা পূর্ণ হয়ে উঠল।

শৈলেন হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি নাকি?'

সুষমা বলল, 'মনে করলে তাই, মনে করলে রোজই তো ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।'

শৈলেন বলল, 'উঁহু, ইংরেজি ভুল হল। অ্যানিভার্সারিটা বছরে বছরে একবারের বেশি হতে পাবে না। রোজ যেটা হয় তার নাম—'

সুষমা মৃদু হেসে চোখ তুলে তাকাল, 'কি তার নাম?'

শৈলেন বলল, 'তার নাম দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব।'

সুষমা বলল, 'আহা, কেবল দ্বন্দ্বই বুঝি?'

শৈলেন বলল, 'দ্বন্দ্বই তো। দ্বন্দ্বের দুটি মানে আছে, মনে নেই?'

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলে, 'হয়েছে, থাম।'

হাবুল আর বুবুল দুটি ছেলেমেয়ে এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল, মা-বাবার আলাপের সাড়া পেয়ে ওদের ঘুম ভাঙল। বড়টি চার বছরের। তক্তপোষ থেকে নেমে সুষমার টেবিলের তলা দিয়ে গিয়ে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল, 'আমি চা খাব মা।'

ওর চেয়ে দু বছরের ছোট বুবুলও এসে দাদার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'আমিও খাব।'

সুষমা বলল, 'তোমরা দুধ খেয়ো একটু বাদে।'

কিন্তু ছেলে দুটি নাছোড়বান্দা। ওদেরও চা চাই।

শৈলেন বলল, 'দাও না কোয়ার্টার কাপ করে।'

সুষমা ধমক দিয়ে উঠল, 'কি যে বল তুমি! ওইটুকু ছেলেমেয়ের চা খাওয়া ভালো নাকি?'

শৈলেনের পিতৃস্নেহে আজ বান ডেকেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েকেও সে চা খাওয়াবে। অগত্যা

সুষমা ওদের জন্যেও চায়ের ব্যবস্থা করল। দুজনকে দুটি কাপ দিয়ে চা ঢালল তাতে।

কিন্তু শুধু চা হলেই চলবে না হাবুলের। বাবার মতো তার একখানা চেয়ারও চাই। বুবুলকে সুষমা কোলে নিয়ে বসল। শৈলেন ছেলেকে বলল, 'তুমি আমার কোলে বোস এসে।'

হাবুল বাপের কোল চায় না, বাপের মতো কাঠের চেয়ার চায়।

অগত্যা সুষমা উঠে গেল পাশের ঘরে। সরোজ-বীণা তাদের প্রতিবেশী।

সুষমা বীণাকে বলল, 'দাও তো ভাই তোমাদের চেয়ারখানা।' বীণা বলল, 'কেন, আবার চেয়ার দিয়ে কি হবে ? অতিথ-বথিত এসেছে না কি কেউ ?' সুষমা হেসে বলল, 'দুজন অতিথ এসেছে ! হাবুল আর বুবুল।'

বীণা মুচকি হেসে বলল, 'ওরা তো এসে পুরোন হয়ে গেছে। তিন নম্বরের অতিথটি করে আমদানি হচ্ছে তাই বল।'

সুষমা চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সরোজের সামনেই বীণা ও-ধরনের ঠাট্টা করায় সুষমা ভারি লজ্জিত হল। চাপা গলায় বলল, 'যাঃ।' তারপর চেয়ারখানা উঁচু করে তুলে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা রে বাবা, তোমার জ্বালায় যে সুস্থ হয়ে একদিন বসে একটু চা খাব তারও জো নেই।'

হাঙ্গামা চুকিয়ে ফের নিজের চেয়ারে এসে বসল সুষমা। ফের দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে চায়ের কাপে দুজনেই ঠোঁট ছোঁয়াল।

কিন্তু এক চুমুক খেয়েছে কি খায় নি, সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল আর সেই সঙ্গে চড়া সুরে ভারী গলায় আওয়াজ শোনা গেল, 'শৈলেন আছ নাকি ? শৈলেন ?'

শৈলেন মৃদু স্বরে বলল, 'নাঃ, মাটি করলে। কে এই মূর্তিমান রসভঙ্গ ?' স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করল শৈলেন।

সুষমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি জানি, চেনা গলা বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখ গিয়ে, আহা চা-টা খেয়েই যাও না হয়।'

কিন্তু সদর থেকে ফের সেই ভারী গলার আহ্বান : 'শৈলেন আছ নাকি ?'

না থেকে আর উপায় কি, শৈলেন সাড়া দিয়ে বলল, 'আছি।' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদেই ফিরে এল। সঙ্গে বুড়ো ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের এক ভদ্রলোক। বলবার সময় বলতে হয় ভদ্র, কিন্তু বেশে বাসে চেহারায় কোনটিতেই ভদ্রত্বের নামগন্ধ নেই। যেমন জীর্ণ দেহ, তেমনি জীর্ণ জামাকাপড়, গায়ে ঘামে বিবর্ণ ময়লা পাঞ্জাবি। কাঁধের কাছে ছেঁড়া। পায়ে তালি-দেওয়া চটি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেহ সামনের দিকে নুয়ে পড়ায় অনেকটা কুঁজো বলে মনে হয়।

সুষমা অপ্রস্তুত হয়ে মাথায় আঁচল টেনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

শৈলেন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন কাকা, ইনি আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ দে। এক সময় বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন।'

সুষমা একটু নীচু হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল।

পূর্ণবাবু বললেন, 'বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। চা খাচ্ছিলে বুঝি ? আমি এসে বাধা দিলাম !'

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, বাধা কিসের !'

হাবুল আর বুবুলের চা খাওয়ার খেয়াল মিটেছে বহুক্ষণ। বাইরের বারান্দাটুকুতে নেমে গাড়ি-গাড়ি খেলা শুরু করে দিয়েছে তারা।

পূর্ণবাবু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বুঝি ছেলেমেয়ে ? বেশ, বেঁচে থাকুক। বাপ-দাদার নাম রাখুক। বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক।'

হাবুল যে চেয়ারে বসেছিল সেটা পূর্ণবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেন বলল, 'বসুন কাকা, তারপর খবর-টবর সব ভালো তো ?'

পূর্ণবাবু বললেন, 'ভালো আর কই বাবাজী ! সব ছেড়ে কেটে এলাম এখানে। কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থার কথা প্রায় সবই খুলে বললেন পূর্ণবাবু। পাকিস্তানের ভিটেমাটি বিক্রি করে এসেছেন প্রায় বছর খানেক। সঙ্গে টাকাকড়ি যা এনেছিলেন তা সবই শেষ হয়েছে। এখন মানুষগুলি শেষ হবার যোগাড়। ঘরে স্ত্রী আছে। আছে বিয়ের যোগ্য বয়স্থা দুটি মেয়ে। একটির বয়স বছর আঠারো আর একটির পনেরো-ষোল। ওদের পরে ছোট ছোট দুটি ছেলে। টালিগঞ্জে খালের কাছাকাছি বাসা নিয়ে আছেন। সে বাসা বাসের যোগ্য নয়। প্রথমে দুখানি ঘরই নিয়েছিলেন। ভাড়া দিতে না পারায় একখানা ছেড়ে দিয়েছেন। যা অবস্থা তাতে আর একখানাও ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো হয়। দুঃখের কাহিনী আর শেষ হতে চায় না। তবু মিনিট কয়েকের মধ্যে তা শেষ করে পূর্ণবাবু বললেন, 'অনেক খোঁজ-খবরের পর তোমার ঠিকানা পেয়ে আমি এখানে এসেছি শৈলেন। একটা চাকরি আমাকে যোগাড় করে দিতে হবে।'

শৈলেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'এই বয়সে কি চাকরি করবেন আপনি!'

পূর্ণবাবু বললেন, 'কেবল বয়সটাই দেখছ বাবা, অবস্থা দেখছ না। আমার প্রথম বয়সের ছেলে যদি বেঁচে থাকত তা হলে তার বয়স এই তোমার মতো বছর ত্রিবিশেক হত। কিন্তু তা তো রইল না। এখন যদি কিছু না করি, বাকি যেগুলি আছে তাদেরও যে রাখতে পারব না।'

শৈলেন সহানুভূতির স্বরে বলল, 'তা তো ঠিকই। কিন্তু কি চাকরি করবেন আপনি তাই ভাবছি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'ভাবাভাবি নয়, কিছু না কিছু একটা আমাকে জুটিয়ে দিতেই হবে। নিজের মুখে নিজের কথা বলা শোভা পায় না। কিন্তু বাংলা মুসাবিদা যেটুকু জানি তার ওপর কেউ কলম চালাতে পারবে না। বিশ্বাস না হয়, সুরেন দত্ত মশাইয়ের কাছেই চিঠি লিখে জেনে নিয়ো---আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি!'

শৈলেন বলল, 'না না, বিশ্বাস না করবার কি আছে! তবে যা দিনকাল, বুঝতে তো পারছেন। আচ্ছা, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখব।'

শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে জামা গায়ে দিতে লাগল।

পূর্ণবাবু বললেন, 'কোথায় বেরুচ্ছ?'

শৈলেন বলল, 'আপিসে।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'সে কি, এই তো সবে সাতটা!'

সাতটার আগেই অফিস বসে শৈলেনের। জেল-প্রেসে চাকরি করে শৈলেন। কাজটা কেরানীর। সময়টা ফ্যাক্টরির। সকাল থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। মাঝখানে এক ঘণ্টা ছুটি। তার পর ফের সেই সাড়ে চারটে পর্যন্ত কলম পেষা।

পূর্ণবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'তা হলে চল, আমিও বেরোই, যেতে যেতেই সব বলব।'

শৈলেন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, সে কি হয়! কতকাল পরে দেখা! যা হোক একটু চা-টা মুখে দিয়ে যান। শোন, কাকাকে ওই দার্জিলিংয়ের চা একটু করে দাও তো। খুব ভালো চা এসেছে। এখানে পাঁচ-ছ টাকার কমে ও চা বিক্রি হয় না। দেখুন খেয়ে।'

শৈলেনের আর সময় ছিল না। অমনিতেই লেট হয়ে গেছে। স্ত্রীর ওপর পূর্ণবাবুর আপ্যায়নের ভার দিয়ে সে স্যাণ্ডাল পায়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

বুড়োমানুষকে খালি একটু চা তো দেওয়া যায় না। পাশের ঘরের সরোজবাবুকে দিয়ে সুষমা মোড়ের দোকান থেকে কিছু খাবারও আনাল। তার পর সেই নীলপদ্মের মত কাপজোড়ার একটা ধুয়ে পূর্ণবাবুকে সে যত্ন করে চা করে দিল। পূর্ণবাবু বললেন, 'আহা-হা, আবার ওসব কেন মা? চা খাওয়ার আমার তেমন অভ্যেস নেই। আমরা পাড়াগেঁয়ে বুড়ো মানুষ, চা-টা তেমন ভালোও বাসি নে।'

সুষমা হেসে বলল, 'খান একটু, চা-টা সত্যি ভালো।'

বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই চায়ের কাপ শেষ করলেন পূর্ণবাবু।

হেসে বললেন, 'সত্যিই ভালো খেলাম। কিন্তু কেবল চায়ের গুণ নয়, মা-লক্ষ্মীর হাতের গুণও আছে। চা সবাই করতে জানে না মা।'

সুষমা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল।

যাওয়াব সময় পূর্ণবাবু বার বার করে অনুরোধ করে গেলেন সুষমা যেন স্বামীকে তাঁর হয়ে ভালো করে বলে। রোজ যেন একবার করে খোঁচায়। চাকরি একটি না হলে পূর্ণবাবুর আর চলবেই না। ছেলেপুলে সুদ্ধ না খেয়ে মরতে হবে।

সুষমা বলল, 'আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। উনি ওঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। আমিও মনে করিয়ে দেব।'

সকালবেলায় চায়ের আসর সাজাবাব সময় যে সুরটা সুষমার মনে বেজেছিল, তা যেন আর রইল না। কিসের একটা বিরক্তি আর অপ্রসন্নতায় মন ভরে উঠল। সুষমাদের অবস্থাও ভালো নয়। স্বামী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। যা মাইনে পায় তাতে সংসারের খরচ চলে না। দুটো টুইশনের আয় তার সঙ্গে জুড়ে তবে কষ্টে-সৃষ্টে সংসাবযাত্রা চলে। সে টুইশন একেবারেই অস্থায়ী। কখনো থাকে, কখনো থাকে না। কারো কাছ থেকে মাইনে আদায় হয়, কারো কাছ থেকে হয় না। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে একতলা ভাড়াটে বাড়ির একখানা মাত্র ঘর, সঙ্গে একটু রান্নাঘর আছে। এরই ভাড়া গুনতে হয় মাসে মাসে তিরিশ টাকা। ছোট ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো না। অসুখবিসুখ লেগেই আছে। তার জন্যেও পাড়ার ডাক্তারকে মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। ভারি টানাটানির মধ্যেই সংসার চলে। কিন্তু নিজেদের অবস্থার চেয়ে পূর্ণবাবুর পরিবারের কথা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল সুষমার। আহা, কি কষ্টেই না পড়েছেন বুড়ো মানুষটি। অতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে একেবারে বেকার অবস্থায় কি করে দিন কাটাচ্ছেন কে জানে! তা ছাড়া ওঁব মুখেব মা-লক্ষ্মী ডাকটুকুও ভাবি মিষ্টি লাগল সুষমার কানে। এমন ডাক আজকালকার বুড়োরাও যেন ভুলে গেছেন।

রাত্রে স্বামীর কাছে সুষমা আর একবার কথাটা পাড়ল, 'ভদ্রলোক অনেক করে বলে গেলেন। ওঁর জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখো।'

শৈলেন ক্লান্ত স্বরে বলল,'আচ্ছা, দেখব। ওঁকে চা-টা দিয়েছিলে তো?

সুষমা হেসে বলল, 'দিয়েছি গো দিয়েছি, চা কাকে না দিই।'

তা ঠিক। শৈলেনেব বাসায় এলে চা সবাই খায়। শৈলেন নিজেই শুধু চা খেতে ভালোবাসে তাই নয়, বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে চা খাওযানোও ওর একটা বিলাস। শুধু বন্ধু-বান্ধবই বা কেন, আধা-পরিচিত কোন লোক যদি অন্য কোন কাজে আসে আর শৈলেন যদি তখন বাসায় থাকে, স্ত্রীকে অমনি হুকুম করবে 'চা কর।' সময় নেই, অসময় নেই, সকাল-সন্ধ্যায় কতবার যে ভাতের হাঁড়ি আব ডাল-তরকারিব কড়া উনুনের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে সুষমাকে চা করতে বসতে হয়, তার আব ঠিক নেই। তার বাসা থেকে ফালতু অনেক লোক চা খেয়ে যায়। ঠিকে-ঝিটি তো খায়ই, সাইকেলে করে দুধের কেটলি চাপিয়ে আসেন ডেয়ারির অধীরবাবু, তাঁর জন্যেও রোজ এক কাপ চা ববাদ্দ আছে। সপ্তাহে একবার করে উড়ে ধোপা গোবিন্দ আসে কাপড় নিয়ে, শৈলেনের নির্দেশে সেও এক কাপ করে চা পায়। বাড়ির আর সব ভাড়াটেরা শৈলেনের বাসার নাম দিয়েছে 'চা-ভবন'। শৈলেনের বন্ধুরা সুষমাকে বলে 'চা-দাত্রী'।

তার চায়ের খ্যাতিতে শৈলেন আত্মপ্রসাদ বোধ করে, স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বলে, 'অমন কর কেন? আজকাল মানুষকে মানুষ কিই বা দিতে পারে! এক কাপ চা দিয়ে যদি একটু খুশী করা যায় মন্দ কি?'

এমনি কম খবচে কম পরিশ্রমে মানুষকে খুশী করে শৈলেন। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে চা চিনি আর মিল্ক পাউডার আনবার যখন তাগিদ দেয় সুষমা, তখনই শৈলেনের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। ঔদার্যটা আর থাকতে চায় না।

দু দিন বাদে পূর্ণবাবু ফের এলেন সকালবেলা। পকেটে করে বাচ্চা দুটির জন্যে কমলা নিয়ে এসেছেন; বের করে দিলেন তাদের হাতে।

সুষমা আপত্তি করে বলল, 'আবার ওসব কেন এনেছেন আপনি?'

শৈলেন আজও বেরুবার তাগিদে ব্যস্ত, পূর্ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন, চা খান।'

পূর্ণবাবু হেসে বললেন, 'তা তো খাচ্ছি। তুমি সুবিধে-টুবিধে কিছু করতে পারলে নাকি?'

শৈলেন আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দেখছি চেষ্টা করে, বলেছি কজনকে। দেখা যাক কি হয়! চা না খেয়ে যাবেন না যেন।' বলে শৈলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুষমা আজও তাঁকে চা করে দিল। আজ আর সেই দার্জিলিং চা নয়, আজ আর সেই নীল পদ্মের মত বড় কাপ নয়। সাধারণ কাপে আড়াই টাকা দামের ব্রোকেন লিফ। নিত্য যে চা শৈলেনরা ব্যবহার করে তাই। সেই সঙ্গে দুখানা বিস্কিট। সে দুখানা অবশ্য পূর্ণবাবু খেলেন না। সুষমার দুই ছেলের হাতেই দিলেন। তারপর চা খেতে খেতে বললেন, 'সত্যি, তোমার হাতের চা-টুকু কিন্তু বেশ মা-লক্ষ্মী।'

চায়ের জাত বদলেছে, কিন্তু তাই বলে হাত তো আর বদলায় নি। তবু বুড়ো ভদ্রলোকের এই. প্রশংসায় বেশ একটু লজ্জিত হল সুষমা। শৈলেনর বন্ধুরা সবাই তার হাতের চায়ের সুখ্যাতি করে; কেউ কেউ এমন ভাষায় করে যে, সুষমার গাল এখনও আরক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু পূর্ণবাবুর সুখ্যাতি সে ধরনের নয়। তাই বলে তাঁর প্রশস্তি যে একেবারে ব্যঞ্জনাহীন, তাও বলা চলে না। কারণ, সুষমাব চায়ের প্রশংসা করবার পরই পূর্ণবাবু বললেন, 'শৈলেনকে একটু ব'লো মা, বুঝিয়ে ব'লো। কিছু একটা এখন না জুটলে একেবারে মরে যাব। আর পারি নে। এতগুলি মুখ কি দিয়ে যে ভরব. ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারি নে মা। তুমি ওকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে ব'লো।'

সুষমা চোখ নামিয়ে বলে. 'বলব। আমি সেদিনও বলেছি। উনি খুব চেষ্টা করছেন।'

পূর্ণবাবু বললেন. 'তা করবে। শৈলেনের মতো ছেলে আজকাল আর হয় না। গরিবের জন্যে সতিাই ওর প্রাণ কাঁদে। ও যে কি রকমের মানুষ। তুমি আর ওকে কতদিন দেখছ মা, আমি দেখছি ওকে একেবারে ছেলেবেলা থেকে। ও যখন স্কুলের ছাত্র, তখনই কত লোকের কত উপকার করেছে। পরের জন্যে সতিাই ওর প্রাণ কাঁদে। আর তা জানি বলেই তো ওর কাছে এসেছি।'

স্বামীর প্রশংসা শুনে স্মিত লজ্জিত মুখে চুপ করে থাকে সুষমা। পূর্ণবাবু বলে চলেন। দেশ-গাঁয়ের আরও কত পরিচিত লোকের কাছেই তো তিনি যান। কত জনের সঙ্গেই তো দেখাসাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সুযমাদের কাছ থেকে যে সদয় সহৃদয় ব্যবহার তিনি পাচ্ছেন, তা আর কারও কাছ থেকেই পান নি। কেউ বাড়ির ভিতর পর্যন্ত ডেকে আনে না, সদর দরজা থেকেই তাঁকে বিদায় দেয়। কেউ বা বাড়িতে থেকেও বলে, বাসায় নেই। ইচ্ছা করেই দেখা করে না। কিন্তু শৈলেন আর সুষমা আলাদা জাতের মানুষ। এযুগে এমন লোক হয় না।

শৈলেনদের প্রশস্তি শেষ করে আবার দুঃখের কথা পাড়েন পূর্ণবাবু। অভাবে অভাবে তিনি একেবারে সারা হয়ে যাচ্ছেন। ঘরে সরলা আর সুশীলার একখানা আস্ত কাপড়,নেই। অথচ দুজনেরই তো বয়স হয়েছে। বাপ হয়ে তাদের দিকে আর তাকাতে পারেন না পূর্ণবাবু। ছেলে দুটি বকাটে হয়ে যাচ্ছে; স্কুলে দিতে পারেন নি। খোবাকই জোটে না, তার আবার লেখাপড়া! বস্তির খারাপ ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই দিনরাত থাকে। তাদের সঙ্গেই আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। না খেয়ে খেয়ে, নানারকম অখাদ্য খেয়ে খেয়ে ঘরে স্ত্রীর রোগ আর সারে না। সেও এখন বুড়ো হয়েছে। তার দেহেই বা আর কত সয়।

সুষমা এক সময় বলে, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। উনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।'

পূর্ণবাবু একটু আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিয়ে বলেন, 'ও চেষ্টা করলে পারবে। ও তো অনেক দিন ধরে শহরে আছে। কত বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর জানাশোনা!'

একদিন সুষমা স্বামীকে বলল, 'ভদ্রলোক তো রোজ এসে ধন্না দিচ্ছেন, কিছু করতে পারলে নাকি ওঁর জন্যে?'

শৈলেন বলল, 'করা কি অত সহজ? তা ছাড়া এই বুড়ো বয়সে ওঁকে কে কাজ দেবে বল?'

সুষমা জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি করতেন আগে?'

শৈলেন বলল, 'বাবার জুনিয়ার মুহুরী ছিলেন। লেখাপড়াব কাজের চেয়ে বাইরের ফাই-ফরমায়েশই খাটতেন বেশি।'

সুষমা বলল, 'সে কাজ ছাড়লেন কেন?'

শৈলেন বলল, 'বাবার সেরেস্তায় মামলা-মকদ্দমার পরিমাণ কমে গেল। তিনিও আর রাখতে

পারলেন না, ওঁরও পোষাল না।'

সুষমা বলল, 'তারপর কি করলেন ?'

শৈলেন বলল, 'অনেক কিছুই করলেন। দালালি, তশীলদারি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কয়েক বছর ধরে বাড়ির বাঁশ আর গাছ-গাছড়াগুলি বিক্রি করে খাচ্ছিলেন। শুনেছি বাস্তুবাড়িও বন্ধক দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের অছিলায় সব ছেড়ে চলে এসেছেন।'

সুষমা বলল, 'আহা, সেখানে থাকবেনই বা কোন্ সাহসে! বড় বড় দুটি মেয়ে। তুমি একটু ভালো করে চেষ্টা ক'রো ওঁর জন্যে। চোখের ওপর এসব আর সওয়া যায় না। যে ভাবে বলেন শোনা যায় না কান পেতে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ।'

শৈলেন বলল, 'চেষ্টা তো করছি, বলেছি কয়েকজন বন্ধুকে। কিন্তু সবাই বলে এমন লোককে কি চাকরি দেওয়া যায়। সেই তো সমস্যা। উনি বুঝি রোজই আসেন আজকাল ?'

সুষমা বলল, 'হ্যাঁ।'

শৈলেন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'চা-টা দিচ্ছ তো ?'

সুষমা বলল, 'তা দিচ্ছি।'

স্বামীর ক্ষমতার কথা সুষমার অজানা নেই। ভারি মুখচোরা মানুষ। অন্যের জন্যে কিছু করবে কি। নিজের চাকরির চেষ্টাই নিজে করতে পারে নি। বিয়ের পরও বছর দুই বেকার ছিল। সুষমার বাবা বহু চেষ্টাচরিত্র করে ওকে ঢুকিয়েছেন ওই জেল-প্রেসে। তাও তো যে চেয়ারে গিয়ে বসেছিল, সেই চেয়ারেই বসে আছে। প্রমোশন পায় নি, লিফ্ট্ পায় নি। দু বছর অন্তর পাঁচ টাকা করে মাইনে বৃদ্ধি। ওইটুকু ভরসা। সুষমার বাবা মাঝে মাঝে দুঃখ করেন—একেবারে অকেজো, আজকালকার যুগে একেবারে অচল। ওর পরে যারা ঢুকেছে তারা ওপরে উঠে গেল অথচ ও কিছুই করতে পারল না।

চাকরি-বাকরির ব্যাপারে স্বামীর এই অযোগ্যতার জন্যে সুষমার মনে কি দুঃখ কম!

কিন্তু সে কথা তো বাইরের কারও কাছে বলা যায় না। এমন কি পূর্ণবাবুর কাছেও না। নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় জেনেও যেন আশায় বুক বেঁধে থাকে সুষমা, তেমনি পূর্ণবাবুকে আশ্বাস দেয়। হবে বইকি, একদিন নিশ্চয়ই হবে। শৈলেন তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। দু-একজন বন্ধুবান্ধব তাকে নাকি কথাও দিয়েছে। তাদের অফিসে এখন কিছু খালি নেই। খালি হলেই পূর্ণবাবুকে তারা ডাকবে। এ কথা সুষমা একাই বানিয়ে বলে না। তার কাছে বানিয়ে বলে শৈলেন। শৈলেনের কাছে বানায় তার বন্ধুরা। আর প্রত্যেকেই মনে মনে জানে, এসব বানানো কথা, জেনেশুনেও তবু সংসারে কথা না বানালে চলে না। এমন কি সত্য কথার চেয়েও অনেক সময় এ ধরনের বানানো কথায় বেশি কাজ হয়। অপ্রিয় নিষ্ঠুর সত্য কথার চেয়ে এমন অল্প স্বল্প মিথ্যে বলতেও ভালো লাগে, শুনতেও ভালো শোনায়। যে বলে সেও বোঝে, যে শোনে সেও।

তবু পূর্ণবাবু যেন কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না। তিনি আগে যদি বা দু-একদিন বাদে বাদে আসতেন এখন একেবারে রোজ আসা ধরলেন। কোনদিন শৈলেনের সঙ্গে দেখা হয়, বেশির ভাগ দিনই হয় না। ঘরসংসারের কাজ করতে করতে সুষমাকেই পূর্ণবাবুর সংসারের কথা সব শুনে যেতে হয়।

শুনতে শুনতে মাসখানেকের মধ্যেই কথাগুলি যেন একঘেয়ে হয়ে এল সুষমার কাছে। পূর্ণবাবুদের দু বেলা খাওয়া জুটছে না শুনে এমন কি এক বেলা অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে শুনেও সুষমার আর যেন তেমন দুঃখ লাগে না। প্রথম দিন-দুই যেমন ব্যথা লেগেছিল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল, এখন আর তেমন হয় না। স্পর্শকাতর অনুভূতির সেই তীব্রতা যেন মরে গেছে। আধপেটা খাওয়া পূর্ণবাবুদেরও যেমন সয়ে যাচ্ছে, ওদের জন্যে কিছু করতে না পারাও তেমনি সয়ে যাচ্ছে সুষমাদের। না সয়ে উপায় কি!

তা ছাড়া একেবারে কিছু যে না করছে তাও তো নয়। পূর্ণবাবু যখনই আসুন সুষমা এক কাপ করে চা তাঁকে নিয়মিতই দিয়ে যাচ্ছে। তা সে বেলা নটাই হোক, আর দশটাই হোক। উনুনে ভাতই থাকুক, আর তরকারিই থাকুক, মন মেজাজ ভালোই থাকুক আর নাই থাকুক, পূর্ণবাবুর জন্যে এক

কাপ চা সুষমা বরাদ্দ করেছে। চায়ের সঙ্গে বিস্কিট কি অন্য কিছু আজকাল আর সুষমা দেয় না, হাতল-ভাঙা কাপেই ন সিকে আড়াই টাকা পাউণ্ডের চা পরিবেশন করে। তবু করে তো। এইটুকুই বা আজকাল কজনে দিতে পারে, কজনে দেয়! পূর্ণবাবু নিজের মুখেই তো বলেছেন, কেউ দেয় না। চাকরির উমেদারকে রোজ চা কেউ দেয় না দুনিয়ায়।

সুষমা বুঝতে পেরেছে, পূর্ণবাবু ওই এক কাপ চায়ের প্রত্যাশাতেই আসেন। যতক্ষণ চায়ের কাপটি তাঁকে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ চাতকপাখীর মতো বসে থাকেন। ঠিক যে চুপচাপ বসে থাকেন তা নয়, সংসারের দুঃখ-দুর্দশার, সেই আধপেটা খেয়ে থাকার, না খেয়ে থাকার একঘেয়ে বর্ণনা দেন, চায়ের কাপটি শেষ করে তারপর ওঠেন। আজকাল সুষমা তাই আর দেরি করে না। কেটলিতে চা ওঁর জন্যে রোজ রেখে দেয়। খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফের গরম করে। কোনদিন বা তাও করে না।

আজকাল আর মুখে সুষমার চায়ের বেশি প্রশংসা করেন না পূর্ণবাবু। কিন্তু তা না করলেও সুষমা ওঁর মুখ-চোখের ভাব দেখে বুঝতে পারে বুড়োকে মৌতাতে ধরেছে। এই চাটুকু ওঁর কাছে অমৃতের তুল্য। এখানকার এই চায়ের কাপটি ছাড়া ওঁর আর চলবে না। সে কথা টের পেয়ে গেছে সুষমা। যত ঠাণ্ডা, যত খারাপ চা-ই দিক, পূর্ণবাবু তাকে একেবারে নিঃশেষ করে ওঠেন। পারেন তো কাপটিকে সুদ্ধ গিলে ফেলতে চান।

মাঝে মাঝে এখনও পূর্ণবাবুর ওপর মায়া হয় সুষমার। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার বিরক্তিই আসে। নিজেদের টানাটানি আর ফুরোতে চায় না। দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুটি বড় বিরক্ত করে। পেটে যেটি এসেছে সেটিও সুস্থ থাকতে দেয় না। মাসের পর মাস খরচ বেড়ে চলে। আর তাই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে প্রায় খিটিমিটি হয়। তাই এক কাপ চায়ের জন্যে যে সামান্য একটু দাক্ষিণ্যের দরকার তাও যেন মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুষমা এক-একদিন বিরক্ত হয়ে ভাবে, বুড়োকে কতকাল আর চা দিতে হবে! মনের এই অপ্রসন্নতা সব সময় যে চিন্তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তা নয়, অনেক সময় কাজের মধ্যেও তা ফুটে ওঠে। তা প্রকাশ পায় সুষমার মুখের ভাবে, চা দেওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু এসব কিছু যেন পূর্ণবাবুর চোখে পড়ে না। সুষমা বুঝতে পারে, পূর্ণবাবু ইচ্ছা করেই চোখে পড়তে দেন না।

মাস তিনেক বাদে এক রবিবার পূর্ণবাবু ধরে বসলেন শৈলেনকে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, হাতে বড় একটি থলি। ছুটির দিনে বাজারে বেরুচ্ছে শৈলেন, পূর্ণবাবু এসে পথ আটকে ধরলেন, কাতরভাবে বললেন, 'বাবা, এবার একেবারেই মরতে বসেছি, এবার আর বাঁচব না। আমার ভালো চাকরি-বাকরিতে কাজ নেই; তুমি আমার জন্যে একটা বেয়ারাগিরিই ঠিক কর। তিরিশ চল্লিশ টাকা আজকাল তো ছোটখাট অফিসের একটা বেয়ারাতেও পায়, তোমাদের বড় অফিসে আরও বোধ হয় বেশি পাব। তাই ঠিক করে দাও আমাকে।'

শৈলেন জানে বেয়ারাগিরি জোটানোও আজকাল শক্ত। সে-চাকরির জন্যেও অসংখ্য উমেদার। যোল-সতের বছরের মাইনর-পাস একটি ছেলের জন্যে বেয়ারার চাকরির চেষ্টা করেছিল শৈলেন। তিন মাস চেষ্টার পর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেই শ্রীপদর মতো চালাক চতুর চটপটে ছোকরারই বেয়ারাগিরি জুটল না। আর এই বুড়ো অকর্মণ্য লোকটিকে চাকরি দেবে কোন বে-আক্কেল! এর জন্যে সুপারিশ করতে গিয়ে সে কার কাছে মুখ হারাবে!

সংসারের খরচ বাড়িয়ে ফেলেছে বলে খানিকক্ষণ আগে ঝগড়া হয়ে গেছে সুষমার সঙ্গে। মেজাজটা ভালো নেই, কিন্তু অসহায় বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে চেয়ে নিজের অধীরতা অসহিষ্ণুতাকে সংযত করল শৈলেন। খুব ভদ্রভাবে পূর্ণবাবুকে আশ্বাস আর সান্ত্বনা দিয়ে আগের মতোই বলল, 'ছিঃ কাকা, ওসব কি বলছেন! আপনি বেয়ারাগিরি করতে যাবেন কোন্ দুঃখে! আমি যোগ্য কাজের চেষ্টাই করছি আপনার জন্যে।'

পূর্ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কাজের চেষ্টা করছ?'

শৈলেন বলল, 'মুহুরীগিরির। আপনি যে কাজ পারেন, যে কাজ ভালোবাসেন, জীবন ভর যা করেছেন সেই কাজের চেষ্টাই করছি আপনার জন্যে। আমার এক বন্ধু আছে—বিমল গুহ। স্মল

কজ কোর্টে ভালো প্রাকটিস। কালীঘাট মার্কেটের কাছে রসা রোডে থাকে। তাকেও বিশেষ ভাবে বলেছি আপনার কথা। সে খানিকটা ভরসাও দিয়েছে।'

'দিয়েছে?' খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন পূর্ণবাবু।

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ, আর দু-চার দিন সবুর করুন। হয়তো ওখানেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।'

শৈলেন ব্যস্ত হয়ে বাজারের পথে পা বাড়াল, বলল, 'যান একটু চা-টা খেয়ে যান।'

পূর্ণবাবু একটু হেসে বললেন, 'সে তো খাবই বাবা, চা তো রোজই খাই। তোমার বাড়িতে এসে কি আর চা না খেয়ে যাবার জো আছে?'

আজ চায়ের কাপটি বড় অনিচ্ছায় দিল সুষমা। আধ কাপ চা সশব্দে পূর্ণবাবুর সামনে নামিয়ে রেখে রান্নার কাজে গিয়ে বসল।

পূর্ণবাবুর মন আজ বড় খুশী· 'তোমার শরীর খারাপ নাকি মা?'

দুবার জিজ্ঞেস করবার পর সুষমা বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'না।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তবে বুঝি মন খারাপ? ঝগড়া করেছ স্বামী-স্ত্রীতে? ঝগড়ার কথা আর ব'লো না মা। আমাদের তো ঝগড়ায় ঝগড়ায় জীবনটা কাটল। এখনও তাই।'

কিন্তু পূর্ণবাবুর দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে সুষমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, নিজেদের দ্বৈতজীবন নিয়েই সে অস্থির। সুষমা নিঃশব্দে বেশনের চাল থেকে কাঁকর বেছে ফেলতে লাগল।

পূর্ণবাবু বুঝতে পারলেন, আজ আর আলাপ জমবে না, চায়ের কাপটি শেষ করে তিনি এবার উঠে পড়লেন।

পরদিন পূর্ণবাবু আর এলেন না। কেটলির তলায় যে আধ কাপ চা সুষমা তাঁব জন্যে তুলে রেখেছিল তা ফেলে দিতে হল। পবদিনও তাঁর জন্যে রাখা চা নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে কেমন যেন একটু খারাপ লাগতে লাগল সুষমার। এতদিন পূর্ণবাবুকে দেখে তার অস্বস্তি লাগত। বুড়ো কি রাগ করল নাকি? সেদিনকার অনাদরে দুঃখ পেল? কিন্তু অমন অনাদর তো সুষমা তাকে অনেক দিন ধরেই করছে। নিজের দোষের বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল:

'পূর্ণবাবু, আজ কদিন ধরে আসছেন না। ব্যাপার কি বল তো, বুড়ো মানুষ, অসুখ-বিসুখ করল নাকি?

শৈলেন বলল, 'তা করতে পারে।'

সুষমা বলল, 'একবার খোঁজ নিতে পারলে ভালো হত।'

নিতে পারলে তো ভালো হত। কিন্তু নিতে পারে কই শৈলেন! সময়ের অভাবে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরই খোঁজ নিতে পারে না। চাকরি আর টুইশনে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঠাসা। এক মুহূর্তও তার অন্য কথা ভাববার অন্যের কথা ভাববার সময় নেই।

সপ্তাহ কাটল, মাস কাটল, পূর্ণবাবু আর এলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁর না আসাটাও সয়ে গেল সুষমার। প্রায় ভুলেই গেল তাঁর কথা। বন্ধুদের চায়ের নিমন্ত্রণ করার প্রসঙ্গে মাস দেড়েক বাদে হঠাৎ একদিন মনে পড়ে যাওয়ায় স্বামীকে সুষমা জিজ্ঞেস করল, 'ভালো কথা, পূর্ণবাবুর খবর কি বল তো? ভদ্রলোক মরে-টরে গেলেন নাকি?'

শৈলেন বলল, 'না, মরবেন কেন? ট্রাম থেকে একদিন দেখলুম রসা রোড দিয়ে হেঁটে চলেছেন।'

সুষমা বলল, 'তা হলে বোধ হয় চাকরি-বাকরি জুটেছে কিছু একটা।'

শৈলেন বলল, 'এক কাপ চায়ের ব্যবস্থাও হয়তো হয়ে গেছে কোথাও।'

সুষমা একটু হেসে বলল, 'তুমি ভারি দুষ্টু। ভেবেছ সবাই বুঝি তোমার মত চা-পাগল?'

শৈলেন বলল, 'দেখ, চা তো সবাই খায়, কিন্তু চা-পাগল হতে পারে কজনে? তুমি তো একেবারেই পার না। বুঝতে পার প্রহরে প্রহরে চায়ের কাপের স্বাদ বদল হয়, দিনে রাতে কতবার করে তার রঙ বদলায়?'

আজ শৈলেনের মেজাজটি ভালো আছে। অফিস ছুটি, ছাত্র পড়াতেও যেতে হয় নি। তাই এই

কবিতা। সুষমা মৃদু হেসে সায় দিল। না হলে ছন্দ ভঙ্গ হবে। কিন্তু ওর মনে পড়ল পূর্ণবাবু যেদিন শেষ চা খেয়ে যান সেদিন এই চা নিয়েই ঝগড়া করেছিল দুজনে। শৈলেন জিজ্ঞেস করেছিল, 'মাসে ছ পাউণ্ড চা কি করে লাগে ?' সুষমা জবাব দিয়েছিল, 'কি করে আর লাগবে : পাতাগুলো আমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। রাজ্যের লোক ডেকে ডেকে চা খাওয়াও, তখন মনে থাকে না ?'

চায়ের কাপের রঙ বদলায় বইকি। অফিসের ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জকে যখন কোন কোন ছুটির সন্ধ্যায় শৈলেন চায়ের নিমন্ত্রণ করে, ভালো শাড়িখানা পরে মুখে মিষ্টি হাসিটুকু নিয়ে সুষমাকে সামনে দাঁড়াতে হয়, তখন শুধু কাপের দাম, কাপের রঙই বদল হয় না, চায়ের স্বাদ, চায়ের রঙেরও বদল হয়। শুধু যে খায়, তার কাছে নয়। যে খাওয়ায়, তার কাছেও। মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়লে পাড়ার বাড়িওয়ালা যখন নিজে তাগিদ দিতে আসেন আর টাকার বদলে যখন চায়ের কাপ নিয়ে সুষমা হাসিমুখে হাজির হয় তাঁর সামনে কিংবা অধীরবাবুর দুধের বিল বাকি চাইবার সময় তাঁকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে সুষমা যখন বলে, 'অধীরবাবু, এ মাসে কিন্তু টাকাটা সপ্তাহ খানেক দেরি করে দেব, ওর আবার ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা সেদিন দিতে হল কিনা', তখন অধীরবাবুর হাসি-হাসি মুখখানা ভারি গম্ভীর দেখায়, আর সেই কালো মুখের ছায়া পড়ে চায়ের রঙও পলকের মধ্যে বদলে যায় ঋতুতে ঋতুতে স্বাদবৈচিত্র্য হয় বইকি চায়ের

মাস দুয়েক পরে হাসপাতালে যেতে হল সুষমাকে। তার মা এসে কয়েক দিনের জন্যে সংসারের ভার নিলেন। সপ্তাহ খানেক বাদেই মাতৃসদন থেকে ছাড়া পেল সুষমা : ছেলে হয়েছে। তিনটি সন্তানের মধ্যে এই নবজাতটিই সবচেয়ে সুন্দর। যেমন নাক চোখ, তেমনই রঙ। হাসপাতালের দাই আর দারোয়ানকে যথাসাধ্য দরাজ হাতে বিদায় করল শৈলেন, ট্যাক্সি করল একখানা। হাবুল আর বুবুলও সঙ্গে এসেছে মা আর নতুন ভাইকে নিয়ে যেতে। সবাই মিলে উঠে বসল গাড়িতে। শৈলেন বলল, 'জলদি চালাও।'

জোরে চালাতে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়ে ঘটল এক কাণ্ড। এক বুড়ো কুঁজো চানাচুরওয়ালা প্রায় চাপা পড়ে পড়ে আর কি। অতি কষ্টে ব্রেক কষে ড্রাইভার গাল দিয়ে উঠল, 'চোখে দেখতে পাও না বুড়ো! রাস্তা পার হতে গিয়ে যে ভবপার হতে যাচ্ছিলে!'

বুড়ো চানাচুরওয়ালা এবার চোখ তুলে তাকাল। গাড়ির হুড ফেলা ছিল। শৈলেন আর সুষমাও তাকাল তার দিকে।

সুষমা বলে উঠল, 'এ কি! পূর্ণবাবু, আপনি!'

পূর্ণবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ মা, আমিই।'

শৈলেন বলল, 'আসুন, গাড়িতে উঠে আসুন।'

পূর্ণবাবু একটু হাসলেন, 'কি করে উঠে আসি শৈলেন, আমার যে এগুলি বিক্রি করে আসতে হবে।'

সুষমা বলল, 'বেশ, আজ যদি না-ই পারেন কাল আপনাকে নিশ্চয়ই আসতে হবে ! নতুন নাতিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি কাকাবাবু। আপনি তাকে আশীর্বাদ করে আসবেন না!'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তুমি যখন বলছ মা, যাব। কাল সকালে যাব। তবে খুব সকালে পেরে উঠব না। কাজকর্ম আছে। একটু দেরি হবে।'

সুষমা বলল, 'আচ্ছা, আপনার যখন সুবিধে হয় আসবেন। কাল কিন্তু আসা চাই-ই।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'আচ্ছা।'

তারপর চানাচুর আর চীনে বাদামের টিন কাঁধে পূর্ণবাবু হাজরা পার্কের ভিতরে ঢুকলেন।

পরদিন শৈলেন তাঁর জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলল, 'পূর্ণবাবু বোধ হয় আর আসবেন না। ভারি লজ্জা পেয়েছেন। তুমিও যেমন। লোককে এইভাবে লজ্জা দেয়! দেখলে ওই রকম অবস্থা।'

সুষমা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে বসল।

পূর্ণবাবু কিন্তু এলেন। গোটা সাড়ে নয়ের সময় ধীরে ধীরে এসে কড়া নাড়লেন দরজায়।

সুষমা তাঁকে বাড়িব ভিতবে এগিয়ে নিযে এল। ঘরে এসে বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, তাই আসেন নি এতদিন।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'না মা, তা নয়: সময় পেয়ে উঠি না। তা ছাড়া বেঁচে থাকবাব জন্যে কি করতে হচ্ছে তা তো দেখলে?'

সুষমা চুপ করে বইল।

পূর্ণবাবু বললেন, 'কই, ছেলে আন দেখি!'

সুষমা ছেলে এনে সামনে ধবলে পূর্ণবাবু বললেন, 'বেঁচে থাকুক।' তারপব একটি রূপার টাকা বেব করে দিলেন পকেট থেকে।

সুষমা বাধা দিয়ে বলল, 'না না, এসব আবাব কি! এ আপনার ভারি অন্যায়।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'অন্যায় কিসেব! একেবারে খালি হাতে পূর্ণচাঁদকে দেখতে নেই মা।'

ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে বেখে সুষমা চা করতে বসল। পূর্ণবাবু বাব বাব বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব ক'রো না মা। আমার সময় নেই। আমাকে এবাব উঠতে হবে।'

সুষমা তবু নাছোড়বান্দা। সে আজ আবাব সেই নীল রঙের বড় কাপটি নামিয়েছে। কৌটা খুলে বাব করেছে দামী চা, যে চা শুধু শৈলেনেব অফিসের মুরুব্বী এলে বাব কবা হয়। সুজিব তৈবি একটু খাবাব আগেই করে রেখেছিল। ছোট্ট টেবিলটা পূর্ণবাবুব সামনে টেনে নিল সুষমা। তাব ওপর বাখল সেই খাবারের প্লেট আব ধূমায়িত, সুগন্ধি চায়েব কাপ।

কিন্তু পূর্ণবাবু মাথা নাড়লেন, 'না মা, আমাকে মাপ করতে হবে। চা আমি ছেড়ে দিয়েছি। চা আমি কোথাও আব খাই নে।'

সুষমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, কেন ছাড়লেন? চা আপনি এত ভালোবাসতেন খেতে।'

পূর্ণবাবু একটু হাসলেন, 'না মা, আমি চা খেতাম না, তোমাদের চা-ই আমাকে খেত, বোজ চুমুকে শেষ কবত। অনেক কষ্টে তাব হাত ছাড়িয়েছি, আব না।'

সুষমা বলল, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পাবছি নে কাকাবাবু।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'এসব কথা বলবাব আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মেয়ের মতো, তোমাকে বলি। না হলে তুমি অনর্থক মনে দুঃখ পাবে।'

তারপব পূর্ণবাবু আস্তে আস্তে সবই খুলে বললেন। প্রথম প্রথম চাটা তেমন ভালো লাগে নি তাঁর, তারপব লাগতে শুরু কবল। অল্প খরচে ক্ষিধে মাত করবাব মতো এমন ঔষধ আব নেই। বাসায় তাঁদেব চায়েব পাট ছিল না। পয়সা কোথায় যে থাকবে! দু পয়সাব মুড়ি এনে ছোট ছেলে দুটি কাড়াকাড়ি করে খেত। দেখে দেখে অভুক্ত পূর্ণবাবুব মনে হত, ওদেব সবিয়ে তিনিও এক থাবা বসান। স্ত্রী আব মেয়েদের ভয়ে পারতেন না। কিন্তু পেটেব ক্ষিধে নিয়ে আর একজনকে খেতে দেখতে কতক্ষণই বা পাবা যায়! ক্ষিধেয় নাড়ী যখন ছিঁড়ে পড়ে নাড়ীর টান মানুষের কতক্ষণই বা থাকে, অস্থির হয়ে পূর্ণবাবু বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। দুটি একটি পয়সা পকেটে যা যখন থাকত তাই দিয়ে বিড়ি খেতেন, লুকিয়ে লুকিয়ে মুড়ি খেতেন। শুধু নিজে বাঁচতে হবে, শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি ছাড়া দুনিয়ায় যেন আব তাঁব কেউ নেই, স্ত্রী পুত্র কন্যা সব মায়া। শুধু নিজের পেটই সত্য, কিন্তু সে তো দু পয়সা এক পয়সাতে ভরে না। তাতে আরও আগুনে ঘি পড়ে। তা ছাড়া স্ত্রী টের পেলে সেই দু-এক পয়সাও কেড়ে বাখতে লাগল। 'বুড়ো মিনসে কচি বাচ্চাদেব মুখেব অন্ন কেড়ে খাচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার?' না, লজ্জা নেই পূর্ণবাবুব কিন্তু ভয় আছে, কথা না শুনলে স্ত্রী ঝাঁটা নিয়ে আসবে। ছেলেমেয়েবাও ছেড়ে দেবে না।

এই সময় খোঁজ পেয়ে গেলেন তিনি শৈলেনের। সে ভবিষ্যতের চাকরিব ভরসা দিল আর নগদ দিল চায়ের কাপ। চা তো নয়, ক্ষুধাহারী অমৃত। এই এক কাপ চায়ের জন্যে তিনি টালিগঞ্জ থেকে হেঁটে আসতে লাগলেন কালীঘাট। এক কাপ চায়ে দুনো গুণ। আসবার সময় আশায় আশায় আসেন আবার যাওযার সময় মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে যান। তাঁর আর ক্ষিধে কিসের! তিনি তো চা-ই খেয়েছেন। ক্রমে ক্রমে ভাগ্যে ভাঙা কাপ আর তেতো চা জুটতে লাগল। সবই বুঝতে পারলেন পূর্ণবাবু। কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না। হোক তেতো, তবু তো চা। আর চা যত

তেতো হয়, তত ক্ষিধে মাৎ হয় বেশি।

কিন্তু সেদিন ভোরে উঠে পূর্ণবাবু দেখতে পেলেন আট-দশ বছরের দুটি ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন দু দিন ধরে তাদের সকালের মুড়ি উঠে গেছে। শুধু তাই নয়, কাল সারাদিন পেটে একটি দানাও পড়ে নি। বড় মেয়েটি গোপনে গোপনে পাশের বাড়িতে ঝিগিরি করত। বাড়ির প্রৌঢ় কর্তা তিনজনের মধ্যে কাজের উপযুক্ত বলে তাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে দেখায় গিন্নী সরলাকে বাকি মাইনে না দিয়েই বরখাস্ত করেছেন, সেই থেকে সরলা হাঁড়িমুখ করে বসে আছে, রান্নাঘরে আর হাঁড়ি চড়ে নি।

পূর্ণবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন শৈলেনের কাছে। আজ আর তাঁর চা চাই নে। আজ চাই শুধু চাকরি। শৈলেন বলল, চাকরি তাঁর জুটবে—বেয়ারাগিরি নয়, 'ভদ্রলোকের মুহুরীগিরিই। উকিলবাবুর নাম ধাম জানিয়ে শৈলেন বলল অপেক্ষা করতে। উকিলের কাছে যথোচিত সুপারিশ সে আগেই করেছে। শুধু দু-চার দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু দু-চার দিন তো ভালো, দু-চার মিনিটও যে পূর্ণবাবু আর সবুর করতে পারেন না। ভাবলেন, শৈলেন বোধ হয় তাঁর সেই উকিল-বন্ধুকে তেমন করে বুঝিয়ে বলতে পারে নি, তিনি নিজে বলবেন। তিনি তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলবেন, 'আমাকে তোমার সেরেস্তায় আজ থেকেই নিয়ে নাও বাবা।'

বিমল গুহ নাম-করা উকিল। কালীঘাট পার্কের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তার সন্ধান মিলল। দামী স্যুট পরে, চুরুট মুখে বিমল গাড়িতে করে কোর্টে বেরোচ্ছিল। পূর্ণবাবু গিয়ে পথ আটকে ধরলেন, 'বিমলবাবু, আমার নাম পূর্ণচন্দ্র দে। আমি এর আগে বিশ বছর মুহুরীগিরি করেছি। আপনার বন্ধু শৈলেন আমার ছেলের মতো। বড় ভালো ছেলে। তার কাছে আমার দুর্দশার কথা বোধ হয় সবই শুনেছেন।'

বিমল গাড়ির ভিতর থেকে বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি আশ্চর্য, লোকটা পাগল নাকি!'

পূর্ণবাবু বললেন, 'না বিমলবাবু, আমি পাগল নই, আমার নাম পূর্ণ। আমি আপনার মুহুরী হতে চাই। শৈলেনের কাছে তো আমার কথা আপনি সবই শুনেছেন। কিন্তু সব বোধ হয় সে বলতে পারে নি। সে সব জানেও না।'

বিমল বলল, 'কি আশ্চর্য, তার সঙ্গে তো মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার দেখা হয়। পূর্ণ দে'ই হোক, আর পূর্ণচন্দ্র দে'ই হোক, কারও কথা সে আমার কাছে বলে নি।'

পূর্ণবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'বলে নি!'

বিমল বিরক্ত হয়ে বলল, 'না। কি চান আপনি নিজেই বলুন না! কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'আমি সপরিবারে দু দিন ধরে না খেয়ে আছি। আমি আপনার মুহুরী হতে চাই।'

বিমল বলল, 'ভারি দুঃখিত। কিন্তু আমার যে জলজ্যান্ত তিন-তিনটে মুহুরী আগেই রয়েছে। শৈলেনের তো আর মাথা খারাপ হয় নি যে এর পর চতুর্থটির জন্যে সুপারিশ করতে যাবে।'

বিমল গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ক মাস আগের অতীত কাহিনী শেষ করে পূর্ণবাবু একটু দম নিলেন, তারপর সুষমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'তখন আমি টের পেলাম মা, আমি এতদিন ধরে চা খাই নি, আমি বিষ খেয়েছি, আমি ঘুষ খেয়েছি। মা হয়ে কি সেই বিষ তুমি আমার গলায় ফের ঢেলে দিতে চাও?'

সুষমা এবার কোনও জবাব দিল না।

পূর্ণবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাও ছুঁলেন না, খাবারও না। সুষমা আর তাঁকে দ্বিতীয়বার কোন অনুরোধ করল না, নিঃশব্দে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। যাওয়ার সময় পূর্ণবাবু বললেন, 'কিছু মনে ক'রো না মা। আজ আর আমার কারও ওপর রাগ নেই।'

পূর্ণবাবুকে বিদায় দিয়ে সুষমা ঘরে এসে দেখে, ছোট ছেলে দোলনায় ঘুমুচ্ছে। হাবুল আর বুবুল পূর্ণবাবুর সেই আশীর্বাদী টাকাটা নিয়ে দুজনে মিলে লাফালাফি করছে।

হাবুল বলল, 'টাকাটা কত বড়! তাই না মা!'

সুষমা আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, খুব বড়। হারিও না। দাও আমার কাছে।'

ভাদ্র ১৩৫৭

ঘড়ি

অফিসে বেরোবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল অসিতের। বলবার মধ্যে মেয়েকে কেবল বলেছে, 'মিণ্ট অনুদের বাড়ি থেকে দেখে আয় তো কটা বাজল।'

সুপ্রীতি অমনি বলে উঠল, 'না, পারবে না যেতে, সময় নেই অসময় নেই দিনের মধ্যে পনের বার পরের বাড়িতে ঘড়ি দেখতে পাঠানো! লোককে বিরক্ত করে মারা। নিজেদের ঘড়িটা কি আর আনতে হবে না।'

অসিত বলল, 'সরোজ নিজেও তো ঘড়িটা দিয়ে যেতে পারত। তাকে তুমিই তো ডেকে সারাতে দিয়েছ ঘড়ি।'

সুপ্রীতি বলল, 'সারাতে দিয়েছি বলেতো আর দান করে দিইনি। তাঁর যদি দিয়ে যাওয়ার সময় না হয়, তুমি নিজেই না হয় গিয়ে নিয়ে আসতে, তাতেই বা কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।'

অসিত বলল, 'দেখ, দিন রাত কটকট করো না। আমার ঘড়ি আমি যেদিন পারি আনব, তা নিয়ে তোমারই বা অত মাথা ব্যথা কিসের।'

সুপ্রীতি শ্লেষ করে বলল, 'তাতো ঠিকই, তবু যদি নিজের রোজগারের টাকায় কেনা হত জিনিসটা, সংসারে নিজের পয়সায় কোন্ জিনিসটাই বা তুমি এই সাত বছরের মধ্যে করতে পেরেছ? তা যদি করতে, তাহলে আলাদা দরদ থাকত। চোখের ওপর জিনিসগুলি এমন করে নষ্ট হয়ে যেতো না।

'নেওয়ার সময় তো গরীব মানুষের ঘাড়ে চাড়া দিয়ে আদায় করে নিয়েছ। এখন আর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই, থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।' এমন খোটা সুপ্রীতি প্রায়ই দেয়। সংসারের সব আসবাবই সে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। অসিত নিজের হাতে কিছুই করেনি।

'বেশ তা যদি মনে করো তাহলে তাই।' বলে অসিত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অন্যদিন দুজনের মেজাজ যখন ভালো থাকে এমন ঝগড়া করতে করতে বেরোয় না অসিত। ধীরে সুস্থে খেয়ে উঠে, তক্তপোশের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে, স্ত্রীর হাতের পানটি চিবুতে চিবুতে অসিত হেসে স্ত্রীকে দু-একটা সোহাগ আর ঠাট্টা তামাসার কথা বলে। তারপর সারাদিনের মত বিদায় নেয়।

কিন্তু আজকের দিনটা একেবারে অন্যমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল অসিতের। ষষ্ঠীতলার মোড়ে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাসটা ছেড়ে দিল। অসিত হাত বাড়িয়েও গাড়িটাকে এক সেকেণ্ডের জন্য থামাতে পারল না।

আজ নির্ঘাত লেট হবে। এ্যাটেনড্যানস নিয়ে নতুন ম্যানেজার বড় বেশি কড়াকড়ি শুরু করেছে। নিশ্চয়ই কথা শুনতে হবে তাঁর কাছে। খানিকটা আশঙ্কা খানিকটা বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল অসিতের। ঘড়িটা কাছে থাকলে আর এত অসুবিধে হয় না। ঠিক সময় মত বেরোন যায়। সুপ্রীতি সত্যি বলেছে। ঘড়িটা আনিয়ে নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সরোজই বা কি ধরনের মানুষ! ঘড়িটা ও নিজেই গরজ করে নিয়ে গেল, আর দেওয়ার সময় দিয়ে যেতে পারে না। দায়িত্ব বলে কোন বস্তু যদি থাকে সরোজের।

লোকটি চিরকালই ওই রকম। পুরোন বন্ধুর উপর ভারি রাগ হল অসিতের।

রাগের মাত্রাটা বেড়ে গেল অফিসে লেট হয়ে। দ্বিতীয় বাসটাও যাত্রী বোঝাই হয়ে এসেছে, তবু অনেক কষ্টে তার হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অসিত অফিসে পৌঁছল। দেয়াল ঘড়িতে দশটা পনের। হাজিরা খাতা চলে গেছে ম্যানেজারের ঘরে। কাটা দরজা ঠেলে ঘাড় নিচু করে সেখানে

ঢুকতেই ম্যানেজার বললেন, 'কি ব্যাপার মিঃ ব্যানার্জী ?'

অসিত বলল, 'স্যার ঘড়িটা কাছে না থাকায় বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।'

ম্যানেজার বললেন, 'কেন, কি হয়েছে আপনার ঘড়ির।'

অসিত বলল, 'এক বন্ধুকে সারাতে দিয়েছিলাম, এখনো ফেরত পাইনি।'

ম্যানেজার বললেন, 'দেখুন, একেবারে খাস সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন কিনা তিনি। আর এমন দেরি করবেন না।' বলে ম্যানেজার সামনের ফাইলটায় মন দিলেন।

অসিতের পক্ষে এইটুকু তিরস্কারই যথেষ্ট, সিটে এসে গম্ভীর মুখে বসল অসিত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাটা তার মনে পড়তে লাগল। বড় দায়িত্বহীন লোক এই সরোজ। ওকে নিয়ে আর পারবার জো নেই। মাস দুই হয়ে গেল, এর মধ্যে সে ঘড়িটা ফেরত দিয়ে যেতে পারল না।

অবশ্য নেওয়ার সময় কেবল সরোজই গরজ করে নেয়নি, সুপ্রীতিও গরজ করেই দিয়েছিল। চলতে চলতে একদিন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ঝাঁকুনি দিয়েও তাকে না চালাতে পেরে নিঃশব্দে দেরাজটার মধ্যে চালান করে দিল অসিত।

সেই থেকে সুপ্রীতি প্রায় রোজ তাগিদ দেয়, 'ঘড়িটা দেরাজের মধ্যে পড়ে থাকবে নাকি, সারিয়ে আন।'

অসিত বলে, 'আনব।'

সুপ্রীতি বলে, 'তুমি আর এনেছ।'

এসব ব্যাপারে স্বামীর ওপর তেমন ভরসা নেই সুপ্রীতির। কেনাকাটা, সারানো, মেরামতের ব্যাপারে অসিত বড় কুঁড়ে। অনেক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তবে তাকে দিয়ে কাজ করান যায়। হারমোনিয়ামটা তিনমাস ধরে ভেঙ্গে পড়ে ছিল ঘরে, অসিতকে দিয়ে সুপ্রীতি কিছুতেই সেটা সারিয়ে আনতে পারেনি। শরণ নিয়েছে ওর বন্ধু সরোজের, চায়ের কাপ সামনে ধরে দিয়ে হেসে বলেছে, 'সরোজবাবু, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। আপনার বন্ধুকে দিয়ে তো কিছুতেই হ'ল না।'

বলে বিকল হারমোনিয়ামটির একটা গতি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এসব ব্যাপারে সরোজ একপায়ে খাড়া। সেইদিনই রিক্সা করে নিয়ে গেছে হারমোনিয়াম। সারিয়ে এনে দিয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে।

সুপ্রীতি স্বামীকে বলে, 'ভারি করিতকর্মা পুরুষ। অনেক গুণ আছে সরোজবাবুর।'

অসিত হেসে জবাব দেয়, 'কেবল গুণ কেন রূপই বা কম কিসের? আসল পক্ষপাতটা সেইজন্যেই ?'

সরোজ অসিতেরই সমবয়সী, দুজনেরই বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে। কিন্তু বয়েসের মিল থাকলে কি হবে, অসিতের সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতির তেমন মিল নেই সরোজের। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, গায়ের রং ফরসা। চওড়া কপাল, টানা টানা নাক চোখ, ওর সঙ্গে তুলনা করলে কালো আর খানিকটা বেঁটে অসিতকে কুরূপই বলতে হয়। তাই সরোজের ওপর পক্ষপাতের কথা তুলে স্ত্রীকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে অসিত। প্রকৃতির দিক থেকেও সরোজ একটু আলাদা। ভারি স্ফূর্তিবাজ, চালাক চতুর চটপটে।

অসিতের মত এমন মুখ গম্ভীর করে থাকবার লোক সে নয়। তাই স্বামীর এই বন্ধুটিকে ভারি পছন্দ করে সুপ্রীতি। খাটাতে ভালোবাসে, ফরমায়েস করে, নানা রকম কাজকর্ম করিয়ে নেয়।

সরোজ সেদিন বেড়াতে এলে দেরাজ থেকে সুপ্রীতিই ঘড়িটা বের করে তার হাতে তুলে দিয়েছিল, 'দেখুন দেখি কি হল ঘড়িটার।'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সরোজ, 'কি হয়েছে তোমার ঘড়ির ?'

অসিত বলেছিল, 'হবে আবার কি, মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়।' সরোজ একটু হেসে বলেছিল, 'ঠিক একেবারে আমার সংসারের মত।'

বন্ধুর হাসির ধরন দেখে দুঃখ হয়েছিল অসিতের। সরোজের অবস্থা ভালো নয়। একটা স্টেশনারি স্টোর্সে সেলসম্যানের কাজ করত। মাইনে আর ভাতা বাড়াবার দাবীতে একবার জোট পাকিয়েছিল মালিকের বিরুদ্ধে, মালিক সহ্য করেননি। মাস কয়েকের মধ্যে বেশির ভাগ কর্মচারীকে

ছাঁটাই করে গোটা দল সুদ্ধই বদলে ফেলেছেন। সরোজের চাকরি গিয়েছিল প্রথম দফায়। তারপর থেকে সে আর চাকরিতে ঢোকেনি। বলেছে, ব্যবসা করবে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। কিন্তু প্রবচনটা সরোজের বেলায় মোটেই ফলে উঠল না। লক্ষ্মী তার ঘরে ঢোকা তো দূরের কথা, দোরও মাড়ালেন না। অল্প স্বল্প পুঁজি পাটা যা ছিলবছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিঃশেষ হল। সবোজ এখন দশকর্মা।

বাঁধাধরা কাজকর্ম কিছু নেই। যা পায় তাই করে, অনেক সময় কিছু না কবেও থাকতে হয়।

বন্ধুর খেদোক্তি শুনে সহানুভূতিব সুবে অসিত বলেছিল, 'তোমাকে বললাম একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করতে— ।'

সরোজ তেমনি হেসে বলেছিল, 'ক্ষেপেছ, এতদিন ছাড়া থেকে থেকে আর কি গোয়ালে ঢুকতে মন যায়।'

তাবপব রিস্টওয়াচটার ডালাখুলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জাগুলিব পবীক্ষায় মন দিয়েছিল সবোজ। একটু পবে মুখ তুলে বলেছিল, 'না ভাই, আমাব বিদ্যেয় কুলোবে না, মনে হয় হেয়ার স্প্রিংটাই জখম হয়েছে।'

অসিত বলেছিল, 'তা হতে পারে, মাঝে মাঝে আমাব মেয়েও ঘড়িতে দম দেয় কিনা, ঘড়ির ওপর ওব ভারি লোভ।'

ছ বছরের মিণ্টু শান্ত মেয়েব মত বাপের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বাপেব ব্যঙ্গোক্তি বুঝতে তার দেরি হল না। সে ছুটে মাব আড়ালে গিয়ে লুকোল।

সুপ্রীতি মেয়ের বব করা চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল, 'বাঃ, কেবল মেয়ের দোষ দিলে কি হবে, ওঁর নিজেরই যেন যত্ন আছে জিনিসপত্তরেব ওপব, সময়মত চাবিও তো পড়েনা সবদিন ; নষ্ট হবে না ঘড়ি ? কদিন ধবে বলছি ঘড়িটা সাবিয়ে আন, তা কানেও তুলছেন না।'

অসিত বলল, 'সাধে কি আব তুলিনে, পকেটেব কথা ভেবেই কালা হয়ে থাকতে হয়, বুঝলে সরোজ ? এই গত বছবেও তো দশ টাকা দিয়ে অয়েল করিয়েছি। এতদিন গরীবেব ঘোড়াবোগের কথা শুনে এসেছি। ঘড়িরোগটাও গবীবের পক্ষে কম মাবাত্মক নয়, ভাই। শ্বশুরমশাই তো দিয়েই খালাস, এখন এই হাতী পোষে কে ?' বলে স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখটিপে একটু হেসেছিল অসিত। সুপ্রীতি দেখতে একটু পুষ্টাঙ্গী, কিন্তু ফবসা বঙের সঙ্গে তা বেশ মানিয়ে গেছে। মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায় সুপ্রীতিকে।

সরোজের দিকে চেয়ে সুপ্রীতি মুখভাব কবে বলেছিল, শুনলেন আপনার বন্ধুর কথা ?'

সরোজ হেসে বলেছিল, 'আপনাকে বলেনি, ঘড়িটাকে বলেছে। আচ্ছা, এটা আমার কাছে রইল অসিত ! আমি সস্তায় ভালো দোকান থেকে সাবিয়ে দেব , বাজে দোকানে দিলে কাজও খাবাপ করে, তাছাড়া চুবিও যায়।'

সুপ্রীতি বিস্মিত হয়ে বলছিল, 'ওমা, কি আবার চুবি যাবে ?'

সরোজ তাব দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'যা চুরি যাবার জিনিস, জুয়েল।'

লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সুপ্রীতি। তারপর ফের একটু বাদে বলেছিল, 'দরকার নেই সে সব বাজে দোকানে দিয়ে। আপনাব জানাশুনা দোকান থেকে ঘড়িটা সারিয়ে দিন সরোজবাবু, নইলে আপনার বন্ধু ওটাকে দেবাজেই ফেলে রাখবেন।'

সরোজ নিজেব মণিবন্ধে অচল ঘড়িটা পরতে পরতে বলেছিল, 'আচ্ছা।'

সে আজ দুমাস হয়ে গেল, এব মধ্যে ঘড়িটা সরোজ আর ফিরিয়ে দিয়ে যায়নি। দুএকখানা পোষ্টকার্ডও ছাড়া হয়েছে, তবু কোন সাড়া নেই সরোজেব। আচ্ছা বেহুঁশ লোক, মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণীর পক্ষে একদিনও ঘড়ি না হলে চলে।

সুপ্রীতি প্রায় রোজই তাগিদ দিচ্ছিল, 'আচ্ছা, তুমি কি ? জিনিসটা তো তোমার, গবজটা তো তোমার · সবোজবাবুর যদি সময় না থাকে তুমি নিজেই গিয়ে না হয় নিয়ে এস, বেলেঘাটা থেকে বালী উত্তরপাড়া তো আর ন'মাস ছ'মাসের পথ নয়।'

শনিবাব দুটোয় ছুটি হয়ে গেল অফিস। অসিত ঠিক করল যেমন করেই হোক আজই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে ঘড়িব। আর গাফিলতি কববে না। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল অসিত।

প্রথমে ভাবল এখনই বালী চলে যাবে। কিন্তু সরোজের মত ভবঘুরে লোক কি এখন এই দুপুরবেলায় বাড়িতে চুপচাপ বসে আছে ? তার চেয়ে একবার বিজয়া কেবিনে খোঁজ নিয়ে গেলে পারে।

নিউ বড়বাজার স্ট্রীটের এই চায়ের দোকানটির মালিক কালিপদ রায়—সরোজ আর অসিতের কমন ফ্রেণ্ড। তার ওখানে বিনা পয়সায় চা খেতে আর আড্ডা দিতে প্রায়ই আসে সরোজ। অসিত ঘুরে ঘুরে সেই দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল।

কাউন্টারের পিছনে বিরস মুখে বসে আছে কালিপদ। দোকানে খদ্দেরের সংখ্যা কম।

অসিত বলল, 'কি খবর কালিপদ ?'

কালিপদর খবর ভালো নয়। দোকান ভালো চলছে না। তার ওপর সেদিন নিতাই নামে একটা বয় ড্রয়ার ভেঙে সাঁইত্রিশ টাকা তের আনা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কালিপদ বলল, 'দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই, বুঝলে অসিত ?'

অসিত সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'আমাদের সরোজ দাসের খবর কি হে ? শিগগির এসেছিল এখানে ?'

কালিপদ বলল, 'ওই আর একজন, যা ধার নিয়েছে তাতো আর দিলই না, সপ্তাহ খানেক আগে আমার দামী কলমটা সারিয়ে দেবে বলে নিয়ে গেছে তো গেছেই ; ও কলমের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি অসিত।'

অসিতের প্রাণটা চমকে উঠল, বলল, 'কেন ?'

'কেন আবার ? আজকাল ওই সবই তো করছে। তোমার কাছ থেকেও কিছু নিয়েছে নাকি ? বোসো চা খাও।'

অসিত বসল না, বলল, 'না ভাই কাল এসে চা খাব, আজ জরুরী কাজ আছে।' শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে যাওয়া যায়, তাতে কিছু কম পড়ে। কিন্তু কে জানে গাড়ি এখন আছে কি নেই।

অসিত সে চেষ্টা করল না। বাসের দুই সেকশনে ছ গণ্ডা পয়সা ব্যয় করে পুরো একঘণ্টা পর হাজির হল সরোজের উত্তরপাড়ার বাসায়।

সদর রাস্তার ওপরে নয়, সরু একটা কানাগলির মধ্যে সরোজের বাসা। পুরোন নোনাধরা একতলা বাড়ি। দরজার কড়াটায় জোরে জোরে নাড়া দিল অসিত।

'কে ?' কালো, রোগা একটি বউ এসে দরজা খুলে দিল। একটু যেন থমকে গেল প্রথমটায়। তারপর জীর্ণ আধময়লা শাড়ির আধখানা আঁচল মাথায় তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'ও আপনি! আসুন, ভিতরে আসুন।'

অসিত বলল, 'সরোজ আছে ?'

নির্মলা বলল, 'একটু বাদেই আসবে। ঘরে আসুন না।'

ঘরের ভিতরে ঢুকল অসিত। ছোটঘরের প্রায় বারআনি জুড়ে একখানা তক্তপোশ পাতা। একধারে গুটানো বিছানা। মাদুরটা পেতে দিতে দিতে বলল, 'বসুন, তারপর সব ভালোতো ? সুপ্রীতিদি ভালো আছেন ?' অসিত সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ।'

হঠাৎ কোত্থেকে বছর পাঁচেকের একটি ছেলে ছুটে এসে অসিতের প্রায় কোলের কাছে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আজ কি এনেছ কাকাবাবু, লজেন্স না বিস্কুট ?'

এর আগে যতবার এসেছে, বন্ধুর এই সুন্দর ছেলেটির জন্য পকেটভরে লজেন্স, বিস্কুট নিয়ে এসেছে অসিত। কিন্তু আজ মনের সে অবস্থা ছিল না।

অসিত কিছু জবাব দেবার আগেই নির্মলা ছেলেকে ধমকে উঠল, 'ছি ছি, কি হ্যাংলাই তুই হয়েছিস হাবুল ? রোজই লোকে তোর জন্যে বিস্কুট লজেন্স নিয়ে আসবে নাকি ? কেন, ও সব জিনিস কি তুই কোনদিন খাসনে ?'

হাবুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কই খাই ? কিছুই তো কিনে দাও না। জানো কাকাবাবু, কিচ্ছু কিনে দেয় না আমাকে। নিজে শিশি ভরে ওষুধ খায়। আমাকে তাও দেয় না।'

হাসি চেপে নির্মলা ফের ধমক দিল, 'যত পাকাপাকা কথা ছেলের। যাও খেলা কর গিয়ে।'

হাবুল আর কোন কথা না বলে ঘরের কোণে নিজের খেলার জায়গায় চলে গেল। বসবার চাটাই, ভাঙা শ্লেট, আর ছেঁড়া বইয়ের পীজবোর্ডের মলাট দিয়ে সেখানে সে নতুন ঘর তুলেছে। সে ঘর বার বার ভেঙে পড়ছে, তবু তার তোলবার বিরাম নেই।

নির্মলা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বামীর বন্ধুর দিকে তাকাল। 'বসুন চা করি।'

অসিত বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই। সরোজ আসুক তারপর বরং চা খাব। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

নির্মলা একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'করুন না।'

অসিত বলল, 'সারিয়ে দেবে বলে সরোজ আমার ঘড়িটা নিয়ে এসেছিল। আর ফেরত দিয়ে এল না। ঘড়ি কি আজও সারানো হয় নি?'

নির্মলা বলল, 'তাতো জানিনে ঠাকুরপো, আমি তো সে ঘড়ি দেখিনি।' এই আত্মীয় সম্বোধনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল অসিতের। মনে মনে বলল, 'তুমি সব জানো, জেনে শুনেও ন্যাকা সাজছ।'

খানিকবাদে সরোজ এসে উপস্থিত হল। ওর চেহারাটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। চোয়াল-জাগা মুখ, দাড়ি জমেছে দুদিনের। গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবী।

সরোজকে দেখে মনে হল সেও যেন একটু চমকে গেছে।

একটু হেসে বলল, 'তুমি যে, পথ ভুলে।'

অসিত বলল, 'কি করব, তুমি তো আর কোন খোঁজ খবর নিলে না, চিঠি দিলেও জবাব দাওনা; আচ্ছা লোক হয়েছ একজন।'

সরোজ হেসে বলল, 'কি করব বলো? হাতের কাছে পোষ্টকার্ড থাকে না, যখন পোষ্ট অফিসের কাছ দিয়ে যাই তখন আবার পয়সা থাকে না পকেটে।'

অসিত আর বেশি ভূমিকা না করে বলল, 'তারপর আমার ঘড়িটার কি করলে? হয়েছে সারানো?'

সরোজ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না ভাই, রেগুলেট করানোর জন্য এখনও দোকানেই পড়ে রয়েছে।'

অসিত বলল, 'ঢের রেগুলেট করা হয়েছে। আর দরকার নেই আমার, ঘড়িটা এবার আমায় দিয়ে দাও।' সরোজ বলল. 'আচ্ছা দেব, দু-চার দিনের মধ্যেই দিয়ে আসব ঘড়ি।'

অসিত বলল, 'ফের দু-চার দিন? না আজই চল, কোন দোকানে দিয়েছ ঘড়ি আমি দেখতে চাই। এতদিন লাগে একটা ঘড়ি সারাতে?'

সরোজ কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আমি আর খোঁজ নিতে পারিনি ভাই। বড় ঝামেলায় ছিলাম, হাবুলের মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। ও নিজেও যেতে যেতে ফিরে এসেছে। অনেক খরচপত্তর হয়ে গেছে।'

বন্ধুর দুরবস্থার কথায় অসিতের মন ভিজল না। তিক্তস্বরে বলল. 'সেইসঙ্গে আমার ঘড়িটাও গেছে বোধ হয়।' সরোজ হঠাৎ যেন কোন জবাব দিতে পারল না। চোর যেন হাতে হাতে ধরা পড়েছে।

অসিত জ্বালাভরা কণ্ঠে বলতে লাগল, 'ছি ছি ছি, তোমার এমন হীন প্রবৃত্তি হবে ভাবতেও পারিনি। এর চেয়ে তুমি আমার কাছে ধার চাইলে না কেন? নিজের হাতে না থাকত, আর পাঁচজনের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে দিতাম। কত সময় তাও তো দিয়েছি। তুমি তার খুব শোধ নিলে। এমন নেমকহারাম আমি আর জীবনে দেখিনি।'

সরোজের স্ত্রীপুত্রের সামনেই অসিত আরো কড়া কড়া কথা বলতে লাগল বন্ধুকে। নির্মলা মুখ নিচু করে রইল। কেবল হাবুল ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। অসিত বলল, 'কোন্ দোকানে বিক্রি করেছ ঠিকানাটা দাও আমাকে। আমি নিজে টাকা দিয়ে কিনে নেব। একজনের প্রেজেন্ট করা জিনিস। ছি ছি ছি।'

কিন্তু সরোজ কিছুতেই ঠিকানা দিল না। শুধু বলল, 'আমি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসব। তোমার

ঘড়ি যায়নি।'

অসিত বলল, 'তোমার কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই, তুমি যা ফিরিয়ে দেবে তা আমার জানা আছে। চোর, নেমকহারাম, বাটপাড় কোথাকার।'

গালাগালের সমস্ত পুঁজি উজাড় করে দিয়ে অসিত উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে বন্ধুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সরোজ আর তার স্ত্রী নিস্পন্দ ঠাণ্ডা পাথরের মত রইল স্থির হয়ে।

খানিকটা পথ চলে এসেছে হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেল অসিত, 'কাকাবাবু, ও কাকাবাবু।'

অসিত মুখ ফিরিয়ে দেখল সরোজের ছেলে। ঠিক অবিকল তার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পরণে পুরোন একটা প্যান্ট, গায়ে জামা নেই, পা দুটি খালি।

অসিত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কিরে চোরের ব্যাটা চোর, লজেন্স চাই তোমার? বিস্কুট চাই, না? এসো দিচ্ছি।'

কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাবুল অসিতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কাকাবাবু, বাবা বুঝি তোমার ঘড়ি কেড়ে নিয়েছে? তাই রাগ করছ তুমি?'

অসিত বলল, 'নিয়েছেই তো।' হাবুল বলল, 'আমি ঘড়ি নিয়ে এসেছি কাকাবাবু।'

অসিত উল্লসিত হয়ে উঠল, বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ঘড়িটা বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছিল সরোজ। গালাগালি খেয়েচৈতন্য হয়েছে। থানা পুলিশ কেলেঙ্কারির ভয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ছেলের হাতে

অসিত হাত পেতে বলল, 'কই দেখি!'

হাবুল হেসে ছোট্ট মুঠি খুলে সবুজ রংয়ের ছোট্ট একটা জাপানী খেলনা রিস্টওয়াচ বের করে অসিতের হাতে দিয়ে বলল, 'মা সেদিন আমাকে কিনে দিয়েছিল। আমার ঘড়িটা তোমাকে দিয়ে দিলুম কাকাবাবু, তুমি নাও। বাবাকে আর বোকো না, কেমন?'

হাবুলের সুন্দর ছোট্ট মুখখানির দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল অসিত, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না আর বকব না।'

মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপায়ে বড় রাস্তার দিকে চলতে লাগল অসিত, বাস ধরতে হবে। হাবুলের ঘড়িটা ওর হাতের মুঠিতেই রয়ে গেছে। মুঠি খুলে সেই খেলনা ঘড়িটার দিকে আর একবার তাকাল অসিত। তারপর আস্তে আস্তে সেটিকে পকেটে রাখল।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

মহড়া

অন্যদিন খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে ঘুমিয়ে নেয় মানসী, কিন্তু আজ আর ওর চোখে ঘুম নেই। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'খানা চোখের সামনে খোলা। তার থেকে বিড়বিড় ক'রে সুমিত্রার পার্ট মুখস্থ করছে মানসী। শুধু প্রম্প্টারের ভরসায় থাকবার মতো মেয়ে সে নয়। তাতে অভিনয় ভালো হয় না। সময় বেশি নেই। দু-দিন বাদেই স্টেজ-রিহার্সেল আর তৃতীয় দিনেই থিয়েটার। তাছাড়া মানসীর শুধু নিজের পার্ট মুখস্থ করলেই চলবে না। 'তপতী' নাটকে পাড়ার আরো যে-সব মেয়ে অভিনয় করবে তাদেরও শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে। দলের বেশির ভাগ মেয়েই আনাড়ী। এদের দিয়ে যে কি ক'রে জাত-মান রক্ষা করবে সেই হয়েছে মানসীর চিন্তা। পদ্মপুকুর মহিলা সমিতির সে সেক্রেটারী প্রেসিডেন্ট কিছু নয়। এ-পাড়ায় তারা মাত্র বছরখানেক এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সমিতির সবাই মানসীর নেত্রীত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সে না হ'লে সমিতির একদিনও আর চলে না। সামনের ইলেকসনে মানসীর সেক্রেটারীশিপ কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু সব-কিছুই নির্ভর করছে 'তপতী'র ওপর। আর'তপতী' নাটকখানা নির্ভর করছে সুমিত্রার ওপর। মানসী অন্য সব ভাবনা রেখে আবার বইয়ে মন দিল।

'মানসীদি, ও মানসীদি।'

শুধু আহ্বান নয়, সঙ্গে-সঙ্গে কড়াও ন'ড়ে উঠল। নিশ্চয়ই সুষমা। খাটের ওপর থেকে নিজে আর নামল না মানসী। শুয়ে-শুয়েই ডাকল, 'ও নীরজা, নীরজা! কি করছিস তুই?'

'বাচ্চুকে ঘুম পাড়াচ্ছি, বউদি।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা, পরে ঘুম পাড়াবি। দোরটা খুলে দিয়ে আয়।'

খানিক বাদে দরজা খোলার শব্দ পেল। তার একটু পরেই সুষমা এসে সামনে দাঁড়াল। 'এই যে মানসীদি, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?'

মানসী শুয়ে-শুয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছর হবে সুষমার বয়স। মাত্র বছর দুই হল বিয়ে হয়েছে, এখনো ছেলেপুলে কিছু হয় নি। বেশ আঁটসাট গড়ন। স্বাস্থ্যবতী। গায়ের রং শ্যামলা। কিন্তু ওর চেহারার সব চেয়ে বড়ো গুণ হল দৈর্ঘ্য। সেদিন ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছে মানসী। পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি। দলের মধ্যে এমন লম্বা মেয়ে আর নেই। 'বিক্রম' হিসাবে ওকে চমৎকার মানাবে। মানসীর সিলেকসনের কেউ তারিফ না ক'রে পারবে না।

সুষমা একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলল, 'অমন ক'রে কি দেখছেন মানসীদি।'

মানসী এবার খাটের ওপর উঠে বসল, তারপর দু-হাত সুষমার দুই কাঁধে রেখে নাকটীয় ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাকে নাথ, তোমাকে। কিন্তু সুষমা, ফের যদি তুমি অমন মানসীদি মানসীদি করো, তাহ'লে তোমার আর আমি মুখ দেখব না ব'লে দিচ্ছি।'

সুষমা লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'কিন্তু আপনি যে আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড় হবেন মানসীদি। সেদিনই তো বয়সের হিসেব হচ্ছিল।'

মানসী মুখে গাম্ভীর্যের ভঙ্গি এনে বলল, 'সে-হিসেব ছেড়ে দাও। আজ থেকে আমি তোমার শুধু মানসী, মানসীদি নই, একথা মনে রেখো। এখন থেকে থিয়েটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার বিক্রম, আর আমি তোমার সুমিত্রা। স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার এ-ক'দিনের জন্যে সব তোমাকে ভুলে যেতে হবে। নইলে কিচ্ছু হবে না।'

সুষমা বলল, 'সব ভুলে যেতে হবে?'

মানসী বলল, 'নিশ্চয়ই। এখন থেকে তোমার কামনার বস্তু রাজ্য নয়, সম্পদ নয়, শুধু আমি, শুধু তোমার এই সুমিত্রা, বুঝতে পেরেছ?' ব'লে সুষমার গাল দুটি একটু টিপে দিল মানসী।

সুষমা বলল, 'ভুল হ'য়ে গেল কিন্তু মানসীদি। সুমিত্রা আর যা-ই করুক, কক্ষনো, বিক্রমের গাল টিপে দিতে পারে না। বিক্রম তেমন মেয়েলি পুরুষ নয়।'

'ঠিক, ঠিক। এবার একটা কথার মতো কথা বলেছ বটে।' মানসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সুষমাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

একটু বাদে মানসী বলল, 'দাঁড়াও, এক কাপ ক'রে চা খেয়ে নিই। তারপর পুরো দমে আবার রিহার্সেল চালাব। তোমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক ক'রে নিতে না পারলে আমি গেছি। বিক্রম যদি ভালো না হয় সুমিত্রার আর কোন আশা নেই।'

সুষমা আপত্তি করল, 'এই অসময়ে আবার চা কেন?'

মানসী বলল, 'চা আর অ্যাকটিং-এর কোন সময় অসময় নেই। একথা মনে না রাখলে ভালো পার্ট করতে পারবে না। নীরজা, ও নীরজা, এদিকে আয় একবার।'

দরজার ও-পাশ থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। গায়ের রং কালো। কিন্তু বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। লম্বা ছাঁদের মুখের ঢৌলটিও বেশ মিষ্টি। পরনে খয়েরি রঙের পুরোন একখানা তাঁতের শাড়ি। হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর। সুষমা একটুকাল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন একটু করুণ বিষণ্ণতার ছোঁয়াচে মেয়েটির চেহারায় যেন আরো মাধুর্যের ছাপ লেগেছে।

মানসী বলল, 'ও-ঘরে কি করছিলে নীরজা?'

নীরজা বলল, 'চাল বাছছিলাম, বউদি। এবারও বড় কাঁকর।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা, চাল বাছা এখন রেখে হিটারে দু-কাপ চায়ের জল বসাও তো। আচ্ছা না-হয় তিন কাপই করো। গলাটা কেমন যেন ধ'রে আছে। চায়ের জলে ভালো ক'রে না ধুয়ে নিলে

আজকের রিহার্সেলটা জমবে না।'

নীরজা কোন কথা না ব'লে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল।

সুষমা বলল, 'এটি কে, মানসীদি? আপনার কোন ননদ-টনদ নাকি?'

মানসী মৃদু হাসল, 'অনেকেই তাই মনে করে। ঝিকে কেমন ঠাকুরঝি ক'রে তুলেছি দেখেছ? আমার বাহাদুরিটা স্বীকার করো ভাই।'

সুষমা বলল, 'স্বীকার করছি। সত্যি, ঝি ব'লে মোটেই চেনবার জো নেই। আমি ভেবেছিলাম আপনার দূর-সম্পর্কের কোন আত্মীয়-টাত্মীয় বুঝি। চেহারায় আদবকায়দায় ঠিক একেবারে ভদ্রঘরের মেয়ে। আর নামটিও তো বেশ, 'নীরজা'। আমি তো কোন বাড়ির কোন ঝিয়ের এমন নাম শুনি নি।'

মানসীর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল, 'ওর মায়ের দেওয়া নাম কি ছিল জানো? নেপী। চেহারাও ছিল সেই রকম, এই একবছর ধ'রে আমিই ওকে মেজে-ঘ'ষে নীরজা ক'রে তুলেছি।'

সুষমা তারিফ ক'রে বলল, 'আপনার অসাধ্য কাজ নেই, মানসীদি। আপনাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।'

মানসী হেসে বলল, 'বাঃ, এই তো হ'য়ে এসেছে। শুধু গলাটা আর-একটু ভারী হবে, আর-একটু জোরালো হবে। তোমার চেহারার পৌরুষ আমি মেক-আপে এনে দেব, কিন্তু স্বভাবের পৌরুষ তোমাকে চেষ্টা ক'রে আনতে হবে সুষমা।'

সুষমা হেসে বলল, 'আশ্চর্য, আপনি রিহার্সেলের কথা ছাড়া বুঝি কিছু বলবেন না?'

মানসী বলল, 'না বিক্রম, আমার আর-কোন বক্তব্য নেই।'

নীরজা মেঝের ওপর ফোল্ডিং টেবিল পেতে দিল। দু-খানা চেয়ার এনে রেখে দিল দু-দিকে। তারপর প্লেটে ক'রে বিস্কুট আর শ্বেতপদ্মের মতো দুটি চায়ের কাপ এনে রাখল তার ওপর।

সুষমা বলল, 'এত হাঙ্গামার কি দরকার ছিল?'

মানসী বলল, 'হাঙ্গামা আবার কিসের। বিছানায় ব'সে চা খাওয়াটা আমি তেমন পছন্দ করি নে।'

মানসী শুধু নিজেই সুন্দরী নয়, রুচির দিক থেকেও যে শৌখিন তা এই ঘরখানা দেখেই বেশ টের পেয়েছে সুষমা। পুরোন ভাড়াটে বাড়ির একতলার ঘর। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন প্রাসাদের একটি কক্ষ। খাট, ড্রেসিং-টেবিল, দামী কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে কাচের আলমারী, বইয়ের র‍্যাক, সব এই একখানা ঘরে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। দেয়ালে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একটি পুরুষের ফোটো। গৃহকর্তা শ্যামল সেন। এ. জি. বেঙ্গলে সিনিয়র গ্রেডের ক্লার্ক। কিন্তু মানসীকে দেখলে ঠিক কেরানীর স্ত্রী ব'লে মনে হয় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুষমা বলল, 'আপনার ঘরখানা ভারি চমৎকার। আর সুন্দর সাজিয়েছেন। আমি একটা গোটা বাড়ি পেয়েও এমন ভালো ক'রে সাজাতে পারি নি।'

মানসী বলল, 'সাজাবার আর কি আছে। আজকাল অবশ্য নীরজাই সব করে। রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা, সাজানো-গুছানো সব নিজের হাতে নিয়েছে। আমাকে কিছুই দেখতে হয় না।'

সুষমা বলল, 'চমৎকার লোক পেয়েছেন, মানসীদি। আমাকে দিন-না এমন একটি জোগাড় ক'রে। ওকে পেলেন কোথায় বলুন তো?'

মানসী সংক্ষেপে নীরজার এখানে আসার কাহিনীটা বলল।

এর আগের বুড়ী ঝি-টি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে চ'লে যাওয়ায় বড়ই অসুবিধায় প'ড়ে গিয়েছিল মানসী। এক হাতে রান্নাবান্না, জল তোলা, বাসন মাজা, দুরন্ত ছেলেকে সামলানো—একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাকে সামনে পেতো তাকেই বলত, 'একটি ঝি দাও জোগাড় ক'রে।'

শেষপর্যন্ত খোঁজ মিলল। এই রাস্তারই দু-তিনখানা বাড়ি ওদিকে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁর ঠিকে-ঝি মানদা এসে বলল, 'মা, আমার মেয়েটিকে রাখুন।'

মানসী বলল, 'ঠিকে-ঝি দিয়ে আমার দরকার নেই, আমি রাত-দিনের লোক চাই।'

মানদা খুশি হ'য়ে বলল, 'সে রাত-দিনই থাকবে। সোমত্ত মেয়ে, পাঁচবাড়ি কাজ করার চেয়ে একজন জানাশোনা ভদ্দরনোকের বাড়িতে যদি থাকে আমার কোন ভাবনা চিন্তে থাকে না। দু-বেলা দুটো খেতে দেবেন। আর মাইনে খুশি হ'য়ে আপনি যা দেবেন তাই নেবে।'

নেপীকে দেখে খুশি হল মানসী। ওর মাকে জিগ্যেস করল, 'মেয়ে যে দেখছি সধবা। ওকে ওর স্বামীর ঘরে পাঠাও নি?'

মানদা দুঃখ ক'রে বলল, 'কতবার পাঠালাম মা, যত পাঠাই তত পালিয়ে-পালিয়ে আসে। আমার অদেষ্ট মন্দ।'

মন্দ অদৃষ্টের কথা তারপর পুরোপুরিই শুনেছে মানসী। নেপীর স্বামীর কুঞ্জলালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। মদ খায়, গাঁজা খায়। দেহেও নানা ব্যাধি আছে। তাই নিয়ে কিছু বললে নেপীকে ধ'রে মারে। অমন স্বামীর ঘর কিছুতেই আর করবে না নেপী। কুঞ্জলালও তা বুঝতে পেরেছে। নেপীর আশা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের আধবয়সী এক বোষ্টমীকে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে।

মানসী বলল, 'ওর ওই বোষ্টমীর পাদপদ্মই ভালো। তুই থাক আমার কাছে। তোকে আমি লেখাপড়া শেখাব।'

সেই থেকে নেপী মানসীর কাছেই আছে। আগে ছিল একেবারে গেঁয়ো ভূত, কিচ্ছু জানত না। কিন্তু শিখিয়ে-পড়িয়ে মানসী মাত্র বছরখানেকের মধ্যে ওর এই নামান্তর রূপান্তর ঘটিয়েছে। আজকাল নাম ঠিকানা লিখতে পারে নীরজা, সহজ বাংলা বই বেশ পড়তে পারে। সম্প্রতি ওকে ইংরেজিও শেখাতে আরম্ভ করেছে মানসী।

সুষমা আর-একবার বন্ধুর প্রশংসা ক'রে বলল, 'আপনার অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

ওদের চা খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। নীরজা এলো কাপ-প্লেটগুলি তুলে নিতে।

মানসী তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, অমন গোমড়ামুখী হ'য়েই থাকবি নাকি? লোকজন এলে আলাপ-আপ্যায়ন করতে হয় না বুঝি? এ কে জানিস?' সুষমাকে দেখিয়ে মানসী জিজ্ঞেস করল।

নীরজা বলল, 'জানি। আপনার বন্ধু।'

'শুধু বন্ধু নয়রে, আমার বর। তোর দ্বিতীয় দাদাবাবু।' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মানসী।

সুষমা লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না, মানসীদি।

মানসী নীরজার দিকে তাকাল, 'কিরে, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?'

নীরজা এবার একটু মুচকি হাসল, 'মেয়েছেলে কি মেয়েছেলের বর হয় নাকি, বউদি?'

মানসী বলল, 'ওকি আর মেয়েছেলে থাকবে? রাজপোশাকে, রাজমুকুটে ওকে এমন পুরুষসিংহ সাজিয়ে নেব যে, তোরও সাধ যাবে সিংহিনী হ'য়ে ওর পিছনে-পিছনে ছুটতে। ও আমার থিয়েটারের বর, বুঝতে পেরেছিস! ও রাজা, আমি রানী। দ্যাখ না কিরকম মানায়। এসো সুষমা, ড্রেস-রিহার্সেলের নমুনাটা আজই একটু নীরজাকে দেখিয়ে দিই। ওর মোটে বিশ্বাসই হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের নীরজাও তো দর্শকদের একজন।'

আলনা থেকে শ্যামলের একটা পাঞ্জাবি পেড়ে নিয়ে জোর ক'রে সেটা সুষমাকে পরিয়ে দিল মানসী। বিছানার নীল রঙের চাদরটা ওর মাথায় পাগড়ীর মতো ক'রে জড়িয়ে দিল। তারপর নীরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, এবার পছন্দ হয়?'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীরজা এবার ওদের সামনে থেকে স'রে গেল।

মানসী বলল, 'সুষমা, এই বেশে তোমাকে আজ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।'

সুষমা হাতজোড় ক'রে বলল, 'রক্ষে করুন মানসীদি। আমি তা ম'রে গেলেও পারব না।'

খানিক বাদে শাড়ি বদলে, চুল বেঁধে, স্নো-পাউডারে প্রসাধন সেরে, মানসী সুষমার সঙ্গে ড্রামাটিক ক্লাবে চলল। ক্লাব খুব বেশি দূরে নয়। পাড়ার অ্যাডভোকেট বিনয় হালদারের ড্রয়িংরুমেই নাটকের মহড়া চলছে। তাঁর মেজো মেয়ে গীতশ্রী অঞ্জনা করবে বিপাশার পার্ট।

বেরোবার আগে মানসী একবার এগিয়ে ছেলেকে দেখে গেল।

বারান্দায় মাদুরের ওপর তিন বছরের শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাচ্চু তো নয়, একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। যতক্ষণ জেগে থাকে ওর দুষ্টুমির সীমা থাকে না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে একেবারে মোমের পুতুল।

উবু হ'য়ে ব'সে হাঁটুতে থুত্‌নি রেখে একমনে একপাশে নীরজা চাল থেকে কাঁকর বেছে চলেছে। চুলের রাশ পিঠ ভ'রে ছড়ানো। মানসী একটুকাল ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাচ্চু উঠলে ওকে খাওয়াস।'

নীরজা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'আপনার বলতে হবে না, বউদি।'

মানসী যেন এবার একটু লজ্জা পেল। সত্যি, নীরজাকে সংসারের কোন কথাই আজকাল আর ব'লে দিতে হয় না।

হালদার-বাড়ি থেকে রিহার্সেল সেরে ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। সব ক'টি মেয়েই আজ এসেছিল। রিহার্সেলটা বেশ চমৎকার জমেছে। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে মানসীর পার্ট। অঞ্জনার দাদা নিরঞ্জনবাবুও আজ উপস্থিত ছিলেন। নাট্যরসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি সুমিত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মানসীর চোখে পড়ল তাদের বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। কপাটের একটা পাট খোলা, একটা পাট ভেজানো। একজন অপরিচিত সুদর্শন যুবক চেয়ারে ব'সে রয়েছে। আর তার সামনে তক্তপোশের ধার ঘেঁষে নীরজা পা ঝুলিয়ে ব'সে তার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ করছে। বটে! তোমার পেটে-পেটে এত! মানসী মৃদু হেসে একপাশে স'রে দাঁড়াল।

দরজার আড়াল থেকে ঘরের পুরোপুরি দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে এবার। নীরজার পাশে গম্ভীর মুখে ব'সে বাচ্চু। যত্ন ক'রে তাকে জামা প্যাণ্ট পরিয়েছে নীরজা, মাথা আঁচড়ে চোখে কাজল দিয়েছে। নিজেও সেজেছে একটু। ঠিক সাজা বলা চলে না। এ ওর নিত্যকার সান্ধ্য-প্রসাধন। মানসীর দেওয়া পুরোন ফিকে চাঁপা রঙের শাড়িটি ঘুরিয়ে সুন্দর ক'রে পরেছে। চুল বেঁধে, ঠিক মানসীরই ধরনে, সিঁথিতে এঁকেছে সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখা, পাউডারের পাফও একটু বুলিয়েছে মুখে। মাত্র এইটুকু। কিন্তু এই সামান্য মেকআপেই ও যেন একেবারে বদ্‌লে গেছে। বেশ সুন্দরী আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে ওকে।

অপরিচিত যুবকটির চোখে মুগ্ধতা, মুখে সৌজন্যের স্নিগ্ধ হাসি। সামনে উঁচু টিপয়টার ওপর চায়ের কাপ। এর মধ্যে চা দিয়ে আদর-আপ্যায়নও হ'য়ে গেছে, হুঁ। মুখ টিপে হাসল মানসী। বেগুনী রঙের অ্যাসট্রেটায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে যুবকটি এবার মৃদু হাসল, 'শ্যামলবাবুর বোধহয় ফিরতে অনেক দেরি হবে?'

নীরজার ঠোঁটে লজ্জিত মধুর একটু হাসি ফুটে উঠল, 'কি জানি, অন্য দিন তো এর মধ্যে এসে পড়েন। আজ যে কোথায় গেছেন--'

'অফিসে যাওয়ার সময় আপনাকে কিচ্ছু ব'লে যান নি?'

'না তো, আমাকে উনি কিচ্ছু বলেন না।'

'ভারি অন্যায়।' হাতঘড়ির দিকে যুবকটি একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'আর বসবার জো নেই। আমাকে আবার অনেক জায়গায় ছুটতে হবে। আপনি কিন্তু শ্যামলবাবুকে বলবেন মনে ক'রে। বলবেন আমাদের উত্তরসূরীর বৈঠক আবার নতুন ক'রে কাল থেকে চালু হচ্ছে। কাল চারু অ্যাভেনিউতে অমিয়দা-র ওখানে অধিবেশন। এবারকার বৈঠকের একটু নতুনত্ব আছে। বিবাহিত সভ্যরা সব সস্ত্রীক আসবেন। লক্ষ্মীদের হাতের ছোঁয়ায় যদি ভাঙা ক্লাব ফের জোড়া লাগে।'

নীরজা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল।

'আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন।'

নীরজা বলল, 'আমাকে আবার কেন।'

যুবকটি হেসে বলল, 'না না, নিশ্চয়ই যাবেন। স্ত্রী ছাড়া কাল সভ্যদের ক্লাবে প্রবেশ নিষেধ।

শ্যামলবাবুকে বলবেন, কাল এই সুরদাস ঘটক দোরে পাহারা দেবে।'

নমস্কার বিনিময়ের পর সুরদাস বাইরে নামল, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে দ্রুতপায়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তকাল স্তব্ধ আর স্তম্ভিত হ'য়ে রইল মানসী। তার যেন শক্তি নেই কথা বলবার, শক্তি নেই এক পা এগোবার।

তারপর ভিতরের ঘরে যাওয়ার জন্যে নীরজা যেই বাচ্চুকে কোলে নিতে গেছে, ঝড়ের বেগে মানসী ঘরে ঢুকল, তারপর দাঁতে দাঁত ঘ'ষে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেপী, এ-সব কি হচ্ছিল শুনি?'

ভাদ্র ১৩৬০

চিঠি

খাকি-পরা পিওন ঘরের সামনে এসে হাঁক দিল, 'চিঠি আছে।'

ঘরে এক ছটাক চাল কি আটা নেই। মাস শেষ হওয়ার অনেক আগেই হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। রেশন কি ক'রে আনবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বাপ আর ছেলের মধ্যে। পিওনের ডাক তাদের কানে গেল না।

তারাপদ আর হরিপদ রেশনের কথাই বলাবলি করতে লাগল।

তারাপদ বলল, 'একটা টাকাও তোর কাছে নেই?'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না বাবা। থাকলে কি আর—'

তারাপদ বলল, 'তাইতো, তোর কাছেই বা কোত্থেকে থাকবে!'

পিওন এবার বিরক্ত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'বলছি যে চিঠি আছে তা শুনতে পাচ্ছ না? নিজেরা কেবল গল্পই ক'রে যাচ্ছ।'

তারাপদ এবার ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়াল। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা; ভ্রূ'দুটিতেও পাক ধরেছে। সারা মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গালের আর কণ্ঠার সবগুলি হাড় বেরিয়ে এসেছে। সে মুখ এমনিতেই বিকৃত মনে হয়। তবু আরো বাঁকিয়ে আরো খিঁচিয়ে তারাপদ বলল, 'চিঠি এসেছে তো ফেলে দিয়ে যাও না। চেঁচাচ্ছ কেন।'

পিওন বলল, 'ভালো জ্বালা। চেঁচাচ্ছি কি সাধে! একি ফেলে দেওয়ার মত চিঠি! বিনা টিকিটে লেখা। বেয়ারিং হয়ে এসেছে। চার আনার পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নাও।'

'বেয়ারিং! দেখি, কার চিঠি দেখি।' তারাপদ তার শীর্ণ হাতখানা পেতে দিল। চিঠিখানা নিয়ে লেখাটার উপরে ঠিকানাটিতে চোখ বুলাল। হাঁ, তারই চিঠি। শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস—শ্রীচরণ কমলেষু, কাঁচা অসমান পরিচিত অক্ষরগুলি দেখে কার লেখা তা বুঝতে আর বাকি রইল না। আর বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারাপদ, 'হরি ও হরি! এদিকে আয়, দেখ এসে মাগীর কাণ্ড! খাওয়া জোটে না আবার এনভেলপ ফুটিয়েছেন।'

হরিপদ এবার ভিতর থেকে বেরিয়ে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। বছর আঠের হবে বয়স। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ঠোঁটের নীচে কচি গোঁফ। প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কি লাবণ্য কিছুই নেই। খোলা গায়ে হাড়গুলির আভাস দেখা যায়। যৌবনের সঙ্গে অদ্ধাশন অনশনের এক চিরস্থায়ী সংগ্রাম তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। তবু উঠতি বয়স সব বাধা ঠেলে ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

বাপের দিকে তাকিয়ে হরিপদ বলল 'ছিঃ বাবা ও সব কি বলছ।'

তারাপদ তেমনি চেঁচিয়ে উঠল, 'কি আবার বলব? চার আনা দণ্ড দিয়ে এ চিঠি কে রাখবে! তুমি এ চিঠি ফেরত নিয়ে যাও।'

পিওনের দিকে তাকিয়ে তারাপদ আবার বলল, 'যাও, ফেরত নিয়ে যাও চিঠি।'

পিওন বলল, 'বেশ দাও, সেখানে আবার আট আনা লাগবে।'

হরিপদ বলল, 'বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে।'

চিঠিটা অবশ্য নিজের হাতে রেখেই মুখে গালমন্দ চালাচ্ছিল তারাপদ। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি করবি কর। আমার কাছে চার আনা তো ভালো, চারটি পয়সাও নেই।'

স্কুলের বেয়ারা দপ্তরীদের থাকবার জন্য ছোট্ট ঘর। খান দুই টুল জোড়া দিয়ে তারই মধ্যে একটু তক্তপোশের মত করা হয়েছে। তার ওপর পুরোন মাদুর, গোটা দুই বালিশ। আই এস সি ক্লাসের খান কয়েক বই খাতা গুছানো রয়েছে। শিয়রের দিকে একটা ছোট্ট তাক। তাতেও কিছু বই-পত্র, দেয়ালে সস্তা একটা আলনা। তাতে গোটা দুই ছেঁড়া আর ময়লা জামা ঝুলানো। জামা দু'টোর প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে দেখল হরিপদ, মিলল সাত পয়সা, মাদুরের তলা থেকে বেরোল একখানা দু'আনি। কুড়িয়ে নিয়ে তারাপদর হাতে দিয়ে বলল, 'একটা পয়সা কম হচ্ছে বাবা, হবে না তোমার কাছে?'

'জ্বালাতন, এই নাও, বিড়ি খাওয়ার জন্যে রেখেছিলাম', বলে তারাপদ ট্যাঁক থেকে একটা ডবল পয়সাই বের ক'রে দিল।

হেসে একটা পয়সা বাবাকে ফেরত দিল হরিপদ, তারপর পিওনকে চার আনা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে চলে এল।

তারাপদ চিঠিখানা ছেলের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও পড়। ক'দিন ধ'রে চোখে আবার কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। হাসপাতালে গেলেই তো বলে চশমা নাও, কিন্তু চশমার টাকা দেবে কে। নে পড় এবার চিঠিখানা।'

খামের মুখটা এবার ছিঁড়ে ফেলল হরিপদ, কাগজের ভাঁজ খুলল, তারপর পড়তে শুরু করল, 'প্রিয়তম!'

সঙ্গে সঙ্গে একটু জিভ কেটে চিঠিটা উলটে রাখল হরিপদ। লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে বলল, 'তুমি পড় বাবা।'

ভারি অপ্রস্তুত হ'ল হরি। আচ্ছা বোকা তো সে, ছি ছি। বাবার কাছে লেখা মা'র খামের চিঠি কেন খুলতে গেল, কেন পড়তে গেল? এটুকু তার আক্কেল-বুদ্ধি হ'ল না। পোস্ট কার্ডের চিঠি পড়ে বলে স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর খামের চিঠিও কি পড়া যায়?

হরিপদ বলল, 'আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণে চিঠিটা পড়ে নাও।'

হরিপদ উঠে বাইরে যেতে চাচ্ছিল, তারাপদ তাকে হাত ধ'রে থামাল। ছেলের এত লজ্জায় সেও প্রথমে একটু লজ্জিত হয়েছিল। বউটার কাণ্ড দেখ। এতদিন বাদে ফের আবার কি সব লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু লজ্জা পেয়ে ছেলে একেবারে উঠে বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তাকে হাত ধ'রে টেনে বসাল তারাপদ, 'বোস বোস। তোর আর যেতে হবে না। ওতে কি হয়েছে। ও তো শুধু একটা পাঠ। বাকি চিঠিখানা পড়ে ফেল এবার। ও রকম আর কিছু নেই।' হরিপদ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমিই তো পড়তে পার বাবা।'

তারাপদ হেসে বলল, 'আরে পারলে কি আর তোকে বলতাম। আমার চোখ দুটো কি আর আছে রে। এখন তোর চোখই আমার চোখ, পড় তুই।'

আর কোন তর্ক না ক'রে হরিপদ এবার সশব্দে পড়তে শুরু করল। 'পর পর তোমাকে আর হরিকে তিনখানা পোস্ট কার্ড দিয়াছি। টাকা পাঠাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু টাকা পাঠান দূরে থাকুক, তোমরা কেউ একখানা চিঠির উত্তরও দিলে না। এক একখানা পোস্ট কার্ডের তিন পয়সা করিয়া দাম। এই তিনটি পয়সা কত কষ্টে আমাকে জোগাড় করিতে হয়, কত দরকারী জিনিস না কিনিয়া একখানা পোস্ট কার্ড কিনিতে হয়, তা কি তোমরা জান না? এই নয়টি পয়সা এক জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা দিয়া ছোট খুকির সাগুবার্লি কিনিতে পারিতাম। কিন্তু চিঠি না দিয়াই বা পারি কি করিয়া। চিঠি দিলেই কেউ খোঁজ নাও না। আর না দিলে তো একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। ভুলিতে পারিলেই তো বাঁচ। তিনখানা পোস্ট কার্ডের কোন জবাব না পাইয়া আজ বেয়ারিং খামে চিঠি দিতেছি। রাগ করিয়া মজা দেখিবার জন্য না। আমার হাতে একটি পায়সাও নাই যে চিঠি দেই। ধার করিব, কার কাছে ধার করিব। চার দিকেই দেনা। যে দেখে সেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। কাহারও কাছে আমার হাত পাতিবার জো নেই।

তোমরা টাকা পয়সা পাঠান যদি এখন বন্ধ করিয়া দাও, পাঁচ পাঁচটি ছেলে-মেয়ে লইয়া আমি কি করিয়া থাকি। গাছ গাছালি যা ছিল বিক্রি করিয়া খাইয়াছি। আর কুটা গাছটিও নাই। এখন কোন্ পোড়া ছাই খাইব।

তোমার ক্ষমতার দৌড় তো দেখিলাম। হরিপদর পড়া ছাড়াইয়া তাহাকে কাজে ভেজাইয়া দাও। ভাল চাকরি-বাকরি না পায় কুলিগিবি মুটেগিরি করুক। দিন যদি কখনও ফেরে তখন পড়িবে। আর আমকেও কলিকাতায় লইয়া যাও। দেখি পেটেব ভাত জোগাড় করিতে পারি কি না। আর কিছু না পারি ঝি-গিরি তো কবিতে পারিব। যাহার বাছারা দুইবেলা ক্ষিদায় কাঁদিয়া মরে তাহাব আর লজ্জা ভয় রাখিলে চলে না। ইতি, তোমার সরোজিনী।'

চিঠিখানায় অনেক বানান ভুল আছে। অক্ষরগুলিও কাঁচা কাঁচা। কিন্তু মুশাবিদা একেবারে পাকা উকিল মুহুরীব মত।

পড়া হয়ে গেলে ছেলের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারাপদ।

প্রথম যৌবনে বাপ-মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে স্ত্রীকে নিজেই লেখাপড়া শিখিয়েছিল তারাপদ। সরোজিনীব তখন পড়ার দিকে মন ছিল না। কিন্তু তারাপদ নাছোড়বান্দা। একটু আধটু লিখতে পড়তে না জানলে তারাপদযখন বিদেশে বিভুঁয়ে যাবে তখন তাকে চিঠিপত্র লিখবে কি করে সরোজিনী! কেমন করে জানাবে ভালোবাসার কথা বিবহ-বেদনার দুঃখ! কিন্তু আজকাল স্ত্রীর চিঠিপত্রেবধরন দেখে তারাপদর মনে হয় এব চেয়ে সরোজিনীকে নিরক্ষরা কবে রাখাই ঢেব ভালো ছিল। তাহলে অমন শ্রীছাঁদহীন কেঁচোর মত অক্ষরের মধ্যে অত তীব্র সাপের বিষ ভরে পাঠাতে পারত না।

মায়ের লেখা প্রিয়তম কথাটি দেখে প্রথমে হবিপদর যে পরিমাণ লজ্জা হয়েছিল পুরো চিঠিটা পড়বার পর রাগ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হল। জ্বালা ধরে গেল মনে। দূর থেকে এমন চিঠিও কোন মেয়েমানুষ তার প্রিয়তমকে লিখতে পারে। সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে প্রিয় কথা একটিও নেই। স্বামীর জন্য একটু সহানুভূতি, ছেলের জন্য একটু উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। কেবল টাকা আর টাকা, কেবল দাও আর দাও, ক্ষিধের আগুনে মায়ের মায়া মমতা সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রিয়তম পাঠটিব কথাও মনে হল হবিপদর। কথাটি নিশ্চয়ই বাবাকে পরিহাস করে ব্যঙ্গ করে লিখেছে মা। তাছাড়া এ চিঠিতে ও পাঠেব আর কোন অর্থ নেই। কিন্তু ব্যঙ্গ যে করে, মা কি নিজেই জানে না কি অবস্থায় এখানে তার স্বামী-পুত্রের দিন কাটে। ক্ষিধের ধাক্কা কি হবিপদ তারাপদর পেটেও নেই? কিন্তু উপায় কি? দিনেব বেলায় স্কুলের বেয়ারাগিরি করে তারাপদ মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পায়। এখন এই হয়েছে সকলের সম্বল। বাকি টাকা ধার কর্জ ক'বে তোলে। একজনের কাছ থেকে টাকা এনে আর একজনকে শোধ দেয়। তা ছাড়া স্কুলের সেই পঁয়ত্রিশ টাকাই কি সব মাসে জোটে? আগাম নিয়ে নিয়ে বেশির ভাগ টাকাই তারাপদকে খরচ ক'বে ফেলতে হয়। নিজেদের খোরাকীটা পর্যন্ত হাতে থাকে না। মাসের মধ্যে কতদিন যে ছাতু খেয়ে মুড়ি খেয়ে দুই বাপ বেটাকে দিন কাটাতে হয় তাব ঠিক নেই। দু'এক বেলা না খেয়েও কাটে।

বছরখানেক আগেও অবস্থা এত খারাপ ছিল না তারাপদর। এক দৈনিক কাগজের অফিসে রাত্রের চাকরি করত। তাতেও পেত টাকা চল্লিশেক। কিন্তু একটানা ক'বছর করবাব পর শরীরে আর সইল না। অসুখে বিসুখে কেবলই কামাই হতে লাগল। অফিসে গিয়েও ভালো ক'রে কাজ করতে পারত না।

বাবুরা রিপোর্ট কবলেন, 'এর দ্বারা চলবে না।'

হরিপদ বলল, 'আমাব দ্বারা তো চলবে, আমি যাই বাবা।'

তারাপদ তাকে আঁকড়ে ধ'রে বলল, 'না তোকে কিছুতেই যেতে দেব না। তুই পড়। বেয়াবাগিরি তোব জন্য নয়। ভালো ক'রে পবীক্ষা দিলে তুই বৃত্তি পাবি।'

ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট বয় ছিল হরিপদ। কিন্তু পরীক্ষার ফল যা আশা করেছিল তা হয়নি, বৃত্তি পায়নি। শুধু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তারাপদ বলেছে, 'এ পরীক্ষায় না পেলি, পরের পরীক্ষায় পাবি। তুই পড়।

বাপের অনুরোধ এড়াতে পারেনি হরিপদ। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ফ্রীশিপ জোগাড় করেছে। মোটামুটি ভালো কলেজ দেখে ভর্তি হয়েছে আই এস সি'তে। স্কলারশিপ একবার তার পাওয়াই চাই। কিন্তু মায়ের চিঠি পড়ে হরিপদর আজ বার বার মনে হ'তে লাগল কলেজে তার আর ভর্তি না হওয়াই উচিত ছিল। সংসারে যার এই অবস্থা পড়াশুনো তার পক্ষে বিলাসিতা. মা ঠিকই লিখেছে। কি হবে হরিপদর কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের তত্ত্বে। সে কুলী মজুরিই করবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর তারাপদ বলল, শুনলি তো হারামজাদীর চিঠির বয়ান। এখন কি করবি কর।'

হরিপদ রূঢ়ভাবে বলল. 'আমি কি করব। আমি তো তখনই বলেছিলাম আমার আর পড়ে কাজ নেই বাবা। তা তুমি কিছুতেই ছাড়লে না। যদি বল পুরোন ছেঁড়া বই-কখানা কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বিক্রি ক'রে আসি। আর আমার কি করবার আছে।'

তারাপদর দুই চোখ ছল ছল করে উঠল: 'তুই এই কথা বলতে পারলি। বই বিক্রির কথা তুই উচ্চারণ করতে পারলি মুখ দিয়ে।' হরিপদ লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। এসব কথা তার বাবা কোন দিন সহ্য করতে পারে না। সে ছাড়া তারাপদর আর কোন গর্বের সামগ্রীই নেই। সে বিদ্বান হবে, বড় হয়ে অগাধ যশ আর অর্থের অধিকারী হবে. এ ছাড়া তারাপদর আর কোন স্বপ্ন নেই, সাধ নেই মনে। তারাপদ জানে নিজের যা হবার হয়ে গেছে। এখন সমস্ত বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে রেখেছে তারাপদ। সে কথা হরিপদ জানে। স্কুলে যখন সে পড়ত তারাপদ তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট আর প্রাইজের বইগুলি নিয়ে অফিসের বাবুদের দেখিয়ে বেড়াত। তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাইত. বই চাইত। হরিপদ বলত,'ছিঃ বাবা, আমার নাম ক'রে অমন ভিক্ষে করে বেড়াও আমার ভারি লজ্জা করে।'

তারাপদ বলত. 'লজ্জা কিসের রে? বড় হয়ে তুই আবার কতজনকে ভিক্ষা দিবি।'

হরিপদর সংকোচ দেখে, আত্মাভিমান দেখে তারাপদ তাকে বাইরে কারো কাছে হাত পাততে পাঠায় না। ধার কর্জ নিজেই ক'রে আনে। সময়মত শোধ দিতে না পেরে পাওনাদারদের গালমন্দ সহ্য করে। তবু ছেলেকে যাবতপক্ষে অভাবের আগুনের মুখে এগিয়ে দেয় না।

কিন্তু আজ সেই তারাপদই বলল. 'আমি চেষ্টায় বেরোই। তুইও একটু ঘুরে দেখ গোটাকয়েক টাকা জোগাড় করতে পারিস কিনা।'

হরিপদ একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বেরোব?'

তারপর নিজের প্রশ্নের ধরনে নিজেই লজ্জিত হ'ল।

তারাপদ বলল, 'বেরোবিনা কি করবি বল। চিঠিখানা তো নিজেই পড়লি।'

চিঠির কথা মনে পড়ায় হরিপদর বুকের মধ্যে আবার জ্বালা করে উঠল। মা তাকে পড়া ছেড়ে কুলীগিরি ধরতে বলেছে।

হরিপদ বলল, 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু কি করব বল।'

তারাপদ লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'কলেজে তোর বন্ধুবান্ধব প্রফেসাররা তো আছে, তাদের কাছে—'

হরিপদ রুক্ষস্বরে বলল, 'তাদের কাছে আমি হাত পাততে পারব না বাবা। আর হাত পাতলেই বা আমাকে দেবে কে।'

তারাপদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা তাহলে আমিই বেরোই। উল্টাডিঙ্গির আড়তের শ্রীবিলাস কুণ্ডু নাকি আজই দেশে যাবে। তার কাছে গোটাকয়েক টাকা গছিয়ে দিতে পারলে কাজ হত। দু'দিনের মধ্যে টাকাটা তারা পেয়ে যেত। হাতে টাকা আসলেই তো আর মনি-অর্ডার করবার জো নেই। ভেবেছিলাম শ্রীবিলাসের সঙ্গে পাঠাব। কিন্তু টাকার জোগাড়ই হ'ল না। সে নাকি আজই ঢাকা মেলে যাবে।'

হরিপদ বলল, 'যায় যাক। গেলে আর কি করব।'

টাকা হাতে এলেও হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের গোলমালে তা পাঠাবার জো নেই। দুই দেশের মধ্যে মনি-অর্ডারের ব্যবস্থা বন্ধ! ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুর মহকুমার সেই সোনাপুর গ্রামে কি তার

কাছাকাছি কে কখন যাবে অপেক্ষায় থাকতে হয়। সোনাপুরের পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের কুণ্ডুরা উল্টাডিঙ্গিতে তেল আর আলকাতরার ব্যবসা করে। সেই আড়তে মাঝে মাঝে টাকা জমা দেয় তারাপদ। সেখান থেকে লোক মারফৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করে। হরিপদ সবই জানে। তবু জেনে শুনেও চুপ ক'রে ব'সে রইল।

খানিকটা কি ভেবে তারাপদ উঠে দাঁড়াল। চৌদ্দ পয়সা দিয়ে ছেলের কেনা সেই সস্তা আলনাটায় গোটা দুই ছেঁড়া জামা ঝুলানো আছে। তার একটা তুলে নিল। আজকাল আর বাছাবাছির দরকার হয় না। ছেলে বড় হওয়ার পর সুবিধা হয়ে গেছে। তার জামা গায়ে দিয়ে বেরোলেই চলে।

হরিপদ বলল,—'ওকি ওই ছিটের শার্টটা নিলে কেন। ওটা তো কাঁধের কাছে একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। ওই সাদাটা নাও, ওটা অত ছেঁড়েনি। আমার তো আজ আর কলেজ নেই। ভালোটাই নিয়ে যাও তুমি।'

ইচ্ছা ক'রে বেশি ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে কেন বাবা বেরোয় তা হরিপদ জানে। তাদের দুরবস্থাটা লোকের যাতে আরো বেশি করে চোখে পড়ে, যাতে লোকের মনে আরো বেশি রকম অনুকম্পা জাগে সেই চেষ্টা। ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া থাকতে, তা তালিটালি দিয়ে ঠিক ক'রে আনলেও তা ফেলে রেখে ধার-কর্জের সময় খালি পায়েই বেরিয়ে পড়ে তারাপদ। অর্দ্ধাশনে গলা অমনিতেই চিঁ চিঁ করে তবু পাছে কেউ মনে করে ওদের খাওয়া দাওয়া বেশ চলছে তাই আরো নীচু গলায় আরো অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে তারাপদ কথা বলে। বাবার এই কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে হরিপদর লজ্জা হয়। তারা কি যথেষ্ট দরিদ্র নয় যে ভিক্ষার জন্য আরো ভোল চাই।

তারাপদ এগিয়ে এসে বলল, 'চিঠিখানা দে তো। হরিপদ বলল, 'চিঠি, চিঠি দিয়ে তুমি কি করবে।' তারাপদ ছেলের কথার জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করল, আস্তে আস্তে বলল, 'এই নিতাম একটু।'

বাপকে ধমকে উঠল হরিপদ, 'নিতাম একটু। তুমি ভেবেছ ওই চিঠি লোককে দেখিয়ে ধার করবে, ভিক্ষে করবে। তা আমি তোমাকে করতে দেব না বাবা। ও চিঠি আমি কাউকে দেখাতে দেব না।'

ছেলের এই দীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে তারাপদ যেন একটু খুশী হল। এ যেন নিজেরই বিবেকের ধমক, নিজেরই যৌবনের জেদ। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কাউকে দেখাতাম না। আচ্ছা, ও চিঠি তোর কাছেই রাখ তুই।'

সামনে স্কুলের কমপাউণ্ডের মধ্যেই একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। রক্তরঙের ফুল আর ফুল। গাছের পাতা দেখা যায় না। কিন্তু দুই ডালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীলচে রঙের একটি দোতলা বাড়ি। দেখা যায় তার ছাদে নানা রঙের শাড়ি উড়ছে পতাকার মত।

ঘরের বাইরে এসে তারাপদ আর হরিপদ দু'জনেই সেই বাড়িটির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারাপদ বলল, 'হরি, যাব নাকি একবার উকিলবাবুর কাছে? তিনি তো এখন কোর্টে গেছেন, গিন্নীর কাছে আর একবার গোটাকতক টাকা চেয়ে দেখব নাকি?'

হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফের আবার ওখানে যেতে চাইছ? তোমার লজ্জা করল না বাবা? কি করে কথাটা তুমি বললে।'

শেষের দিকে শুধু ধমক নয়, খানিকটা আক্ষেপ আর অনুযোগের সুরও ফুটে উঠল হরিপদর গলায়। বই বিক্রির কথায় তারাপদর যেমন উঠেছিল।

তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা তবে থাক।'

তারাপদ ফুলে ঢাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে স্কুলের বড় গেটটার দিকে এগিয়ে গেল। ডাল থেকে একটা ফুল ঝরে পড়ল তার সেই ছেঁড়া জামার ওপর। অন্যমনস্কের মতই তারাপদ বাঁ হাত দিয়ে সেই ফুলটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

হরিপদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তার বাবা সেই নীলচে রঙের বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

আকাশ রঙের ওই বাড়িটির কাছে থেকে হরিপদরা এক সময় খুব সমাদর পেয়েছিল। আজ সেই সমাদর ঔদাসীন্যে এমন কি অপমানে এসে ঠেকেছে।

তারাপদ যেমন আরো পাঁচজনকে বলে, ওই বাড়ির কর্তা উকিল জগন্ময় সেনকেও তেমনি হরিপদর কৃতিত্বের গল্প শুনিয়েছিল। ক্লাসে হরিপদ ফার্স্ট হয়, সব বিষয়ে বেশি বেশি নম্বর রাখে, অঙ্কে একটি নম্বরও কেউ তার কাটতে পারে না; তারাপদর মুখে এসব গল্প শুনে জগন্ময় বলেছিলেন, 'আচ্ছা নিয়ে এসো একদিন তোমার ছেলেকে, আলাপ করে দেখব।'

তারপর বাপের সঙ্গে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিল জগন্ময়ের ড্রয়িং রুমে। একতলায় সোফা কোচে সাজানো গুছানো ঘর। বড় একখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে জগন্ময় আইনের বইতে চোখ বুলাচ্ছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না।

তারাপদ বলল, 'ছেলেকে নিয়ে এসেছি বাবু।'

'নিয়ে এসেছ? বেশ বেশ, বোসো ওখানে।'

বলে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলেন জগন্ময়। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ তাতে বসে পড়ল। জগন্ময় একটু হেসে তারাপদর দিকে তাকালেন, 'তুমিও বোসো না ওখানে।'

তারাপদ জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না বাবু, ও বসেছে তাতেই আমার হয়েছে। আমি একটু ঘুরে কাজ সেরে আসি। আপনি ওকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করবার করুন।'

জগন্ময়বাবু হেসে বললেন, 'জিজ্ঞাসাবাদ আবার কি করব। ও কি আসামী।'

তারাপদ চলে গেলে অত বড় একজন গম্ভীর মানুষের সামনে বসে থাকতে থাকতে হরিপদ কেমন যেন অসহায় বোধ করল।

বই-এর মধ্যে ফের খানিকক্ষণ ডুবে রইলেন জগন্ময়বাবু। তারপর কি খেয়াল হওয়ায় আবার মুখ তুললেন, 'বেশ বেশ। মনোযোগ দিয়ে পড। ভালো রেজাল্ট কর। দুঃখকষ্টের মধ্যেই মানুষ বড় হয়।'

পাশের ঘর থেকে একটি মিষ্টি গুনগুনানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জগন্ময় সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে ডাকলেন, 'মিলি, এদিকে এসো।'

'কি বাবা।'

আঠার উনিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে ঢুকল। জগন্ময়বাবু হরিপদকে দেখিয়ে বললেন, 'একে চেন?'

মিলি হেসে বলল, 'চিনব না কেন। সামনের স্কুল-বাড়িটায় থাকে।'

জগন্ময়বাবু বললেন, 'সেকথা বলছি না। ছেলেটি খুব ভালো তা জানো? ওই স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ফার্স্ট হয়। অঙ্কে ফুল মার্কস পায়। তোমাদের মত নয়, অঙ্কের নাম শুনলেই তো তোমাদের মাথা ঘোরে।'

মিলি হেসে বলল, 'বাবা, অঙ্কের এলাকা করে পার হয়ে এলাম, তবু তোমার সে আফসোস গেল না?'

জগন্ময়বাবু এবার পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার ছোট মেয়ে। স্কটিশে পড়ছে। থার্ড ইয়ার। ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছে। আমি ম্যাথেমেটিকসটাই ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা কেউ ওদিকে যায়নি। মিলি, ছেলেটিকে একটু মিষ্টি এনে দাও। বলে দাও না রাণীকে।'

হরিপদ অস্ফুট স্বরে বলল, 'না না।' মিলি বলল, 'এদিকে এসো।'

অভিভূতের মত হরিপদ তার পিছনে পিছনে গেল।

ভিতর দিকের একটা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মিলি ডেকে বলল, 'রাণী ওকে একটু জলখাবার আনিয়ে দাও তো। আচ্ছা, আমি এবার যাই। একটু তাড়া আছে। আর একদিন আলাপ হবে।'

জলখাবারে তেমন যেন আর রুচি রইল না হরিপদর। একটু বাদে প্লেটে করে দু'টি রসগোল্লা আর দু'টি সন্দেশ এনে সামনে রাখল আর একটি মেয়ে। বছর ষোল সতের বয়স। কালো হ্যাংলা চেহারা। হরিপদ ওকে চেনে। এ বাড়ির ঝিয়ের কাজ করে মেয়েটি। কখনো কখনো রাঁধেও। জগন্ময়বাবু তাঁদের গ্রাম থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

আসন পেতে খাবার দিয়ে মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'তুমি হাসছ যে।'

রাণী বলল, 'হাসছি তোমার রকম সকম দেখে। জানলা দিয়ে সব আমি দেখছিলাম। কি স্পর্ধা বাপরে বাপ। বাবু বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাঁর ওই সামনের সোফায় বসে পড়লে? একটু লজ্জা হল না, ভয় হল না? কই তোমার বাবা তো সাহস পেল না বসতে। তোমার এত সাহস এলো কোত্থেকে।'

এই মুখরা মেয়েটির সামনে লজ্জায় অপমানে হরিপদ মাথা নীচু করে রইল। মিষ্টিগুলি গলা দিয়ে যেন নামতে চাইল না।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে রাণী।'

মোটাসোটা একটি মহিলা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

রাণী বলল, 'এই হরিপদর সঙ্গে মা। না হয় পড়েই ফার্স্ট ক্লাসে। তবু এত সাহস, বাবুর সামনে সোফায় গিয়ে বসল। কিন্তু বসে থাকতে পারবে কেন, অভ্যেস তো নেই। উসখুস, উসখুস। যেন ছারপোকায় কামড়াচ্ছে।'

মহিলাটি হেসে তাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই যা তো এখান থেকে। আর জ্বালাসনে। ছেলেটাকে তুই কি খেতে দিবিনে?'

মহিলাটি জগন্ময়বাবুর স্ত্রী—মিলিদির মা, হরিপদ তা দেখেই বুঝেছিল।

তিনি সস্নেহে বললেন, 'তুমি খেয়ে নাও বাপু। ওর কথায় কিছু মনে করো না।'

সেই থেকেই পরিবারটির সঙ্গে হরিপদর আলাপ। তারপর যাতায়াতের পথে মিলি তাকে দেখতে পেলেই হেসে কথা বলেছে। পড়াশুনোর খবর জিজ্ঞাসা করেছে। মাঝে মাঝে যেতেও বলেছে তাদের বাড়িতে।'

কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর হরিপদর সঙ্কোচও অনেকখানি কেটে গেছে। মিলি কি মিলির মা তাকে মাঝে মাঝে এটা ওটা দোকান থেকে কিনে আনতে বললে ভারি কৃতার্থ বোধ করেছে হরিপদ। এঁরা যে এত আদর-যত্ন করেন, তার বিনিময়ে কিছু না দিলে যেন স্বস্তি পায় না হরিপদ। কিন্তু মিলিদিকে কি দেওয়ারই বা তার সাধ্য আছে, তার ফুট-ফরমাশ খাটা ছাড়া।

অবশ্য খাটাবার সময়ও খুব ভদ্রতা করে কথা বলে মিলি। মিষ্টি হেসে বলে, 'যাও তো ভাই, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে কিছু ফুল নিয়ে এসো।'

কিংবা 'বিডন স্ট্রীটে আমার একজন বন্ধু থাকেন। ঊর্মিলা সান্যাল। তার কাছ থেকে আমার হিস্ট্রির নোটটা এনে দিতে পারবে? ট্রাম ফেয়ারটা নিয়ে যাও।'

হরিপদ বলল, 'না না, ট্রাম ভাড়া আমার কাছে আছে।'

মিলিদির কাছ থেকে পয়সা না নিয়ে সে হেঁটেই চলে যায় বিডন স্ট্রীট। বাড়িতে এত লোকজন, এত চাকর-বাকর,মিলির পরে ছোট দুই ভাই। তবু এসব শৌখীন কাজে হরিপদকেই তার পছন্দ।

এই পছন্দের সুযোগ নিয়ে তারাপদ ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। কোন মাসে কর্তার কাছে চায়, কোন মাসে গৃহিণীর কাছে, কোন মাসে বা মিলির কাছে হাত পাতে।

হরিপদর এটা পছন্দ নয়। একদিন সে বললে, 'বাবা, আর যাই করো, ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ো না।'

তারাপদ বলল, 'কেন রে।'

হরিপদ বলল, 'আমার ভালো লাগে না।'

তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি তো একেবারে নিই না; ধার নিই, আবার দু'চার টাকা করে শোধও দিয়ে দিই।'

হরিপদ মিলিদের বাড়িতে আসে যায়। রাণীর দিকে তাকায় না, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথাও বলে না। লেখা পড়া শিখে সে যেন মিলিদি আর তার ভাই অমল বিমলদের একজন হয়ে গেছে।

বছর খানেক মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পর হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। মিলির দেওয়া শরৎচন্দ্রের একখণ্ড বাঁধানো গ্রন্থাবলী হাতে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল,

পাশের রান্নাঘর থেকে রাণী বেরিয়ে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল, 'এই শোন, এই হরিপদ শোন।'

হরিপদ থমকে দাঁড়াল, 'কি বলছ।'

রাণী বলল, 'আমাকে ওই মোড়ের দোকানটা থেকে চার আনার হলুদ এনে দাও তো।' হলুদ আনার কথায় হরিপদ ভারি অপমান বোধ করল। মনে রাগ চেপে বলল, 'আমার হলুদ আনার সময় নেই। আর কাউকে বলো।'

রাণী বলল, 'আর আবার কাকে বলব। গণেশ, গোবিন্দ কাউকেই তো দেখছিনে, তুমিই এনে দাও।'

গণেশ গোবিন্দ এ বাড়ির চাকর। তাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল হরিপদর। চড়া গলায় বলল, 'আমি পারব না। আমি কি তোমার চাকর?'

রাণী হেসে বলল, 'আমার চাকর হবে কেন, তুমি কার চাকর তা সবাই জানে।'

হরিপদ যেন গর্জে উঠল, 'কি, কি বললে।'

রাণী বলল, 'মিথ্যে কিছু বলি নি। বেয়ারার বেটাকে চাকর বলেছি।'

কথাটা শেষ হতে পারল না রাণীর। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল হরিপদ।

রাণী চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা গো মেরে ফেলল।'

চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে হরিপদকে ধরে ফেলল। দোতলা থেকে মিলি নেমে এল, এলেন মিলির মা। গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, 'ছোটলোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও। এতবড় স্পর্ধা, আমার বাড়ির ঝি-এর গায়ে হাত তোলে। আমি গোড়াতেই বলেছি মিলি, ওর চালচলন আদবকায়দা ভালো না। ওকে অত আস্কারা দিসনে। বলে কি না লেখাপড়ায় ভালো। আরে লেখাপড়া শিখলেই কি ছোটলোক ভদ্রলোক হয়ে যায়?'

মিলি ফোঁস করে উঠল, 'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন মা, আমি কি আস্কারা দিলুম।'

মিলির মা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক বাপু থাক।'

ঘাড় ধরে কেউ অবশ্য বের করে দিল না। হরিপদ নিজেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল। ক্লাসে ঢি ঢি পড়ে গেল। হরিপদ ভালো ছেলে হলে কি হবে— অভদ্র, মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে। স্কুলের হেডমাস্টার পর্যন্ত ডেকে নিয়ে তাকে শাসন করে দিলেন, 'এমন করলে তোমাকে আমি আর স্কুলে রাখতে পারব না হরিপদ।'

হরিপদ নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'ও আমাকে বাপ তুলে গাল দিয়েছে।'

হেডমাস্টার মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ভারি অন্যায় করেছে। বেয়ারাকে বেয়ারা বলেছে। তাই বলে ওই সোমত্ত মেয়ের গায়ে হাত দিবি?'

জগন্ময়বাবু স্কুল কমিটির বিশিষ্ট সদস্য।

তারাপদ নিজেও ছেলেকে খুব গালমন্দ করল। বলল, 'ওকে তুই মারতে গেলি কেন?'

ছেলের অনুরোধে মাস তিনেকের মধ্যে তারাপদ জগন্ময়বাবুদের সব টাকা শোধ করে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরিপদর আর সে বাড়িতে ডাক পড়ল না। ভেবেছিল মিলিদি অন্তত একবার ডাকবেন, সব কথা শুনতে চাইবেন। কিন্তু তার কাছ থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করল মিলিদির কলেজের প্রফেসর হিরন্ময়বাবু ও বাড়িতে খুব যাতায়াত করছেন, প্রফেসর হলে হবে কি, মিলিদির সঙ্গে তার আলাপ ব্যবহার বন্ধুর মত। গান শোনেন, তাস খেলেন, সিনেমা দেখেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। আরো মাসচারেক পড়ে শোনা গেল মিলিদির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দুজনের বিয়ে হবে।

বেলা আড়াইটা তিনটায় তারাপদ ফিরে এল ঘরে। বৈশাখের কড়া রোদ গেছে মাথার ওপর দিয়ে। চেহারাখানা পুড়ে অঙ্গার। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে হরিপদ। একবার ঘরে ঢুকছে আর একবার বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বাপকে দেখে এগিয়ে গেল কাছে। বলল, 'পেলে কিছু?'

তারাপদ সংক্ষেপে বলল, 'না।'

তারপর বসল গিয়ে ঘরের কোণে—দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে এসেছে এই বৌবাজার পর্যন্ত। এখন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। শক্তি থাকত যদি টাকা আসত হাতে।

তারাপদ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছিলি কিছু?'

হরিপদ খেঁকিয়ে উঠল, 'কি আবার খাব? ঘরে কি কিছু আছে?'

তারাপদ বলল, 'চার আনার পয়সা খরচ করে চিঠিটা না রাখলেই পারতি, কাল-পরশু নিতাম; না হয় ফেরতই যেত।'

হরিপদ চুপ করে রইল—এখন তারও সেই কথা মনে হচ্ছে। চিঠিটা না রাখলেই হ'ত। চার আনা থাকলে দু'জনে চিড়েমুড়ি খেয়ে এবেলা কাটাতে পারত।

হঠাৎ তারাপদ বলল, 'সেখানেও সব শুকিয়ে মরছে! আজই শ্রীবিলাস চলে যাবে। কিছুই করে উঠতে পারলুম না। যার কাছে চাই, সেই বলে মাসের শেষ, পাঁচ সাতদিন পরে এসো দেখবো চেষ্টা করে।'

হরিপদ রেগে উঠে বলল, 'চেষ্টা না ঘোড়ার ডিম করবে।'

তারপর জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল হরিপদ। চিঠিটা পড়েছিল তক্তপোশের ওপর। বুকপকেটে পুরল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললি।'

হরিপদ কোন জবাব দিল না।

হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহের মোড়ে এসে দাঁড়াল। চারদিক থেকে লোকজন আসছে যাচ্ছে। ট্রাম-বাস-ট্যাকসীর শব্দ। এখানে এমন কিছু ঘটে না যে, হরিপদকে কেউ ডেকে নিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেয়। স্টেশনের ভেতর থেকে একজন লোক দু'হাতে দুই স্যুটকেস ঝুলিয়ে বেরোল। হরিপদ তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল। একবার ভাবল, ভদ্রলোকের হাত থেকে স্যুটকেসটা চেয়ে নেয়, বলে, 'বাবু, আমাকে দিন। চার আনার পয়সা দেবেন, যতদূর বলেন, ততদূর বয়ে নিয়ে যাব।'

কিন্তু মনে যা আসে, মুখে কি সব সময় তা বলা যায়—হরিপদ চেষ্টা করেও একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। ভদ্রলোক তার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন। হয়ত ভাবলেন গুণ্ডা কি পকেটমার।

হরিপদ বুঝতে পারল এই মুহূর্তেই কুলীগিরি মজুরিগিরি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাপের মত তাকেও ধারের চেষ্টায় বেরোতে হবে। কিন্তু যায় কার কাছে! টাকা চাওয়ার মত ঘনিষ্ঠ আলাপ কারো সঙ্গেই হয়নি হরিপদর। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল সুবিনয় চাটুয্যের কথা। ওর বাবার রেডিও আর ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকান আছে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর মোড়ে। কলেজে প্রায়ই হরিপদর পাশাপাশি বসে। ভালো ছেলে বলে হরিপকে খাতিরও করে। দু'দিন বাড়িতে ডেকে এনে চা খাইয়েছে। খানিকটা এগিয়ে বৈঠকখানা রোডের মোড়ে তেতলা বাড়িটার সামনে এসে হরিপদ কড়া নাড়ল। প্রথমে বেরিয়ে এল চাকর, বলল, 'খোকাবাবু তো ঘুমুচ্ছেন।'

হরিপদ বলল, 'ডেকে দাও, বল জরুরী দরকার আছে।'

লোকটি হরিপদর চেহারার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন ঘুম ভাঙালে খুব চেঁচেমেচি করবেন। দরকার থাকে বৈঠকখানা ঘরে বসুন। চারটেয় ঘুম ভাঙবে।'

হরিপদর ভাগ্য ভালো। আধ ঘণ্টা খানিক আগেই ঘুম ভাঙল সুবিনয়ের। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বলল, 'কি আশ্চর্য, ফ্যানটাও খুলে দাও নি, এই গরমে মানুষ থাকতে পারে! আমি তো ফ্যানের নীচেও হাঁফিয়ে উঠেছি। কলকাতা থেকে এখন পালাতে পারলে বাঁচি; এই গরমে মানুষ থাকে এখানে?'

হরিপদ একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'তা ঠিক। তোমাদের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল! যাও নি যে।'

সুবিনয় বলল, 'যেতে আর পারলাম কই, কলেজ ছুটি হয়ে গেছে কবে! তবু এখানেই পচে মরছি। বাবার হুকুম বাড়ি আগলাতে হবে। চাকর-বাকরের ওপর বিশ্বাস নেই। একদল গেছেন

কালিম্পং-এ। তাঁরা ফিরে এলে আমি ছুটি পাব। তারপর তোমার কি খবর। তুমি যে এই অসময়ে। ভালো ছেলেরা কি বেড়ায় নাকি? কখনো বই ছেড়ে ওঠে? অবাক কাণ্ড।'

হরিপদ চোখমুখ বুজে বলে ফেলল, 'বড় বিপদে পড়ে এসেছি ভাই, আমাকে গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিতে হবে।'

সুবিনয় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'টাকা! ধার! তুমি কি বলছ হরিপদ।'

কিন্তু হরিপদ মরীয়া হয়ে উঠেছে। বলল, 'আমাকে না দিলেই চলবে না সুবিনয়।'

সুবিনয় বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়।' এই দিন-কয়েক আগেও একশ টাকা পিকনিকে খরচ করে এসেছে কলেজের বন্ধুদের কাছে সেদিন সুবিনয় গল্প করছিল। ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে সে খবরও হরিপদ জানে। এ সব কথা মনে উঠলেও হরিপদ চুপ করে রইল।

সুবিনয় বলল, 'কিছু মনে কোরো না। অত টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কোনদিন বলনি। এই প্রথম মুখ ফুটে চাইলে। আমি যা পারি দিচ্ছি।'

ভিতর থেকে একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এল সুবিনয়, বলল, 'আমি এ সব ধার দেওয়া টেওয়া পছন্দ করিনে হরিপদ। বন্ধুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। বাবাও তাই বলেন। এমনি করে তিনি অনেক বন্ধু হারিয়েছেন। আজকাল আর দেন না। বলেন, না দিয়ে কষ্ট একবার আর দিয়ে কষ্ট একশবার।'

হরিপদ ভাবল নোটটা সুবিনয়কে ফেরত দেয়। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল, দিতে পারল না। কিছু বলতে পারল না। শুধু মনের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল।

সুবিনয় একটু বাদে হেসে বলল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই আমি শুধু আমার প্রিন্সিপলের কথা বললাম। ও টাকা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।'

হরিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই দিতে হবে। আমিও আমার প্রিন্সিপলের কথা বলছি।'

অন্য দিন বাড়িতে এলে চা খাওয়ায় সুবিনয়। কিন্তু আজ আর বোধ হয় ওর সে উৎসাহ নেই। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল হরিপদ। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি জ্বলছে মন। মা'র জন্যই এই অপমান সে সইল। না হলে নিজের জন্য কারো কাছে সে হাত পাতত না। সুবিনয়ের দশ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসত। বুক পকেটে চিঠিটা এখনো আছে। ওর ভিতরের অক্ষরগুলি তো অক্ষর নয়, জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো।

হরিপদ আর দেরি করল না। কোথাও কোন দোকানের সামনে দাঁড়াল না। টাকাটা নিয়ে আপার সার্কুলার রোড ধরে সোজা হেঁটে চলে গেল উল্টাডিঙ্গির সেই কুণ্ডুদের আড়তে। শ্রীবিলাস কুণ্ডু বাঁধা-ছাঁদা শুরু করেছেন। তার হাতে দশ টাকার নোটটা গছিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন। পাকিস্তানী হিসাবে যা পাওনা হয়, মাকে দেবেন।'

শ্রীবিলাস বলল, 'দেব। চিঠিপত্র কিছু দেবে নাকি আমার কাছে?'

হরিপদ বলল, 'না। বলবেন আমরা ভালো আছি। চিঠিতে কিছু লেখার নেই বলেই চিঠি দিলাম না। আর বলবেন যেন কক্ষনো অমন বেয়ারিং চিঠি না দেয়।'

শ্রীবিলাস মৃদু হেসে বলল, 'বলব।'

হরিপদ আড়ত থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে এল। হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুরতে ঘুরতে বাসায় গিয়ে যখন পৌঁছল, সন্ধ্যা উতরে গেছে। তারাপদ তখনও দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো বোজা। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। হরিপদর সাড়া পেয়ে উঠে বসল, বলল, 'হরি এলি।'

'হুঁ।'

'খেয়েছিলি কোথাও কিছু?'

'কোথায় আবার খাব।'

'না বলছিলাম কোন বন্ধু টন্ধুর বাড়িতে যদি—'

'কত বন্ধু আমার জন্যে রাজভোগ সাজিয়ে বসে আছে। দশ টাকা শ্রীবিলাসের হাতে দিয়ে এলাম। মাকে দেওয়ার জন্যে।'

তারাপদ খুশী হয়ে বলল, 'দিতে পেরেছিস তাহলে কিছু ? ওর থেকে ভেঙে আট আনা এক টাকার খেলেই পারতিস।'

হরিপদ রুক্ষ স্বরে বলল, 'ওর থেকে আবার কি খাব। যার পেটে সর্বগ্রাসী ক্ষিদে সেই সব খাক। আমাদের কিছু খেয়ে কাজ নেই।'

কুঁজো থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বাপের দিকে পিছন ফিরে তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ল হরিপদ। তারাপদ সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটুকাল কি দেখল। তারপর উঠে বাইরে চলে গেল।

খানিক বাদে ফিরে এসে ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'হরি, শোন।'

হরিপদ এদিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কি বলছ ?'

তারাপর বলল, 'এবেলা তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করে এলাম।'

হরিপদ এবার সাগ্রহে মুখ ফেরাল, 'কোথায় ?'

তারাপদ বললে, 'ওই উকিলবাবুর বাড়িতে। গিন্নীমাকে বলে এলাম, এবেলা যেন তোর জন্যে—'

হরিপদ আর্তনাদ করে উঠল, 'বাবা ফের তুমি ওই বাড়িতে ঢুকেছ ? তোমার কি মান সম্মান বলতে কিছু নেই ?'

অন্ধকারে তারাপদ আর একবার ছেলের পিঠে হাত রাখল, মাথার চুলে হাত বুলাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না হরি, আর কিছু নেই। বেচবার মত আর কিছু নেই আমার, ঘরে নেই, দেহে নেই। মনের ওই একফোঁটা মান সম্মান, ওই এক ছিটে ধর্ম। তোর প্রাণের চেয়ে কি তার দাম বেশি হরি। না বেশি না। প্রাণটুকু রাখ। তারপর যদি দিন আসে আবার সব ফিরে পাবি।'

হরিপদ আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা।'

তারাপদ বলতে লাগল, 'আমার কাছে আর কিছুর দাম নেই। জানিস আজ শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার কত গয়নার দোকানের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছি। ইচ্ছে হয়েছে চুরি করি, ডাকাতি করি।'

হরিপদর এবার হাসি পেল, 'বাবা, চুরি করবার কি কোন কায়দাকানুন তুমি জানো যে চুরি করবে। গায়ে কি একফোঁটা বল আছে যে, ডাকাতি করবে তুমি।'

তারাপদ বলল, 'তা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে জেলে যেতে তো পারি। সেখানকার চোর ডাকাতের দলে ভিড়ে গেলে ক'দিন আর লাগবে আমার খাঁটি চোর, খাঁটি ডাকাত হতে। আমি সব পারি হরি, কেবল তোর মুখের দিকে চেয়েই কিছু করতে পারিনে।'

হরিপদ বলল, 'ও সবে তোমার কাছ নেই বাবা, ওসব তোমার ভেবে কাজ নেই।'

তারাপদ একটু যেন লজ্জিত হ'ল। খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল, 'কথাটা তোর কাছেই বললাম, আর কারো কাছে বলিনি। কেবল দোকানের সামনেই দাঁড়াইনি। আজ সারাদিনভর চেনা শোনা অফিস আদালতগুলিতেও কি কম ঘোরাঘুরি করেছি। কতজনকে বলেছি, বাবু আমি ভিক্ষে চাইনে, ধার চাইনে কাজ করতে চাই, একমাস আমি না খেয়েও খাটতে পারব। একমাস পরে আমাকে পয়সা দেবেন।'

একটু যেন কৌতূহল বোধ হল হরিপদর, জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলল তারা।'

'কি আবার বলবে। রোজ যা বলে তাই বলল, কাজ নেই, কাজ কোথায়, আর এক বাবু তো হেসেই অস্থির। তিনি বললেন খুড়ো তোমার আর কাজের বয়স নেই, তোমার এখন কথার বয়স। ওই কাঠামোয় আর হবে না। এ জন্মে নয়, আর এক জন্মে এসো।'

হঠাৎ ছেলেকে তারাপদ শক্ত ক'রে ধরল, 'আর এক জন্ম আমার তুই হরি। তোকে আমি কিছুতেই শুকিয়ে মরতে দেব না। মান সম্মান যাক আমি আর কিছু চাইনে, তোর প্রাণটুকু বাঁচুক।'

হরিপদ চুপ করে রইল।

তারাপদ বলল, 'আমি সব বলে এসেছি। তোর মুখ ফুটে কিছুই বলতে হবে না। তুই গিয়ে দাঁড়ালেই সবাই বুঝতে পারবে। ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে খেয়ে আসবি। আজকের রাতটা কাটুক,

কালকের ভাবনা কাল।' তারাপদ জামাটা ফের গায়ে দিতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'আবার কোথায় চললে বাবা।'

তারাপদ বলল, 'যাব একটু পার্কসার্কাসে। সুরেনবাবুর বাসায়। তিনি দেখা করতে বলেছিলেন। দেখি যদি কোন সুবিধে টুবিধে হয়।' সুরেন রায় কলেজের প্রফেসর। সকালে বিকালে রাত্রে সব সময়ই আজকাল কলেজ চলে। সেই কলেজে রাত্রে একটি বেয়ারার কাজের জন্য অনেকদিন থেকেই যে চেষ্টা করছে তারাপদ, হরিপদ তা জানে। আশা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু তারাপদ যাতায়াত ছাড়ছে না।

হরিপদ বলল, 'কিন্তু আজই কেন যাবে?'

তারাপদ বলল, 'যাই গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। সেখানে গেলে তারা খালি চা-ই দেয় না মুড়ি হোক, রুটি হোক, কিছু না কিছু দেয়।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে তারাপদ একটু হাসল।

হরিপদ বলল, 'তবে যাও।'

তারাপদ বেরোবার আগে আর একবার বলে গেল, 'তুই কিন্তু যাস। আমি যা বললাম করিস, আমার কথা শুনিস হরি।'

হরিপদ বলল, 'আচ্ছা।'

তারাপদ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। বাবা তাহলে সব ব্যবস্থা করে এসেছে, গিয়ে বললেই হয়। কিন্তু কি ক'রে যাবে। যে বাড়ির লোক তাকে ঘাড় ধ'রে অমন ক'রে বার ক'রে দিয়েছে সে বাড়িতে অনাহূতভাবে ফের গিয়ে কোন মুখে পাত-পাতবে হরিপদ। তাছাড়া ওদের হেঁসেলের ভার তো সেই রাণীর ওপর। তার কথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ফের জ্বালা করে উঠল হরিপদর। সেই ঘটনার পর আসতে যেতে তাকে অনেকবার দেখেছে হরিপদ। কিন্তু প্রত্যেকবারই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাছে চোখ পড়ে, পাছে বড়লোকের বাড়ির ওই সোহাগী ঝি মেয়েটার চোখে ব্যঙ্গের হাসি, মজা দেখার হাসি দেখতে হয়। না কিছুতেই আর ও বাড়িতে যাওয়া চলে না, কিছুতেই যাবে না হরিপদ।

কিন্তু রাত যত বাড়তে লাগল মনের জ্বালাকে ছাড়িয়ে চলল পেটের জ্বালা। হরিপদ ছটফট করতে লাগল, ঘর-বার করতে লাগল।

উঠানে সেই রাঙা কৃষ্ণ-চূড়ার গাছটা ফুলের রাশ মাথায় ক'রে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ফুলের রঙ কালো রাত্রের অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে। গা-ঢাকা দিয়ে হরিপদও চলে যাবে নাকি আস্তে আস্তে—কে দেখবে। নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আর কোন দিকে তাকাবে না হরিপদ। শুধু ভাতের দিকে ছাড়া।

কিন্তু গলির ওপারে ও-বাড়িতে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সব দেখা যাবে যে। সেই আলোয় আর একজন সব দেখবে। না কিছুতেই যেতে পারে না হরিপদ, কিছুতেই না।

সদরের ফটকের কাছে অনেক বার গেল হরিপদ আবার ফিরে এল। দেউড়িটুকু আর পার হ'তে পারে না। দিনভর কলকাতায় কত জায়গাতেই তো ঘুরে এল কিন্তু গলির এই পথটুকু পার হ'তে হরিপদর পা অবশ হয়ে আসছে।

ক্রমে ও-বাড়ির আলোও নিবে এল। খেয়েদেয়ে সবাই ওপরে চলে গেল। সব অন্ধকার। হরিপদর চোখের সামনে অন্ধকার জগৎটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ফের ঘরে এসে ঢুকল হরিপদ। কুজোটা ধরল মুখের সামনে উপুড় ক'রে। শূন্য, জল ধরার কথা কারোরই মনে নেই।

'ভূতের মত অন্ধকার ঘরে কি করছ?'

'কে?' ঘুরে দাঁড়াল হরিপদ, 'কে তুমি।'

ফিক ক'রে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

'পেত্নী।'

হরিপদ অস্ফুট-স্বরে বলল, 'রাণী?'

'হ্যাঁগো, হ্যাঁ, শুধু রাণী নয়, রাজ-রাণী, মহারাণী, আলো জ্বালো এবার। হাত ভেঙে গেল;

ভাতেব থালাটা কোথায় রাখি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। স্যুইচটা কোথায়।'

হরিপদ বলল, 'স্যুইচটা নষ্ট হয়ে গেছে। মিস্ত্রী ডেকে সারিয়ে নিতে হবে।'

রাণী বলল, 'তবেই হয়েছে। ততক্ষণ বুঝি এই অন্ধকার ঘরে থাকব তোমার সঙ্গে ? লোকে কি বলবে শুনি ?'

হরিপদ বলল, 'শোনাশুনির দরকার কি, ভাতের থালা তুমি নিয়ে যাও। ও-বাড়ির ভাত আমি খাব না।'

'ও-বাড়ির ভাত নয়, আমার ভাগেব ভাত। মানী-পুরুষকে কি আমি যার তার ভাত খাওয়াতে পারি ?'

রাণী ফিক ক'রে ফের একটু হাসল।

খুঁজে খুঁজে চারপয়সা দামের একটা আধপোড়া মোমবাতি হরিপদর বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। দেশলাইও মিলল একটা। একটি কি দু'টি কাঠি এখনো আছে।

আলো জ্বেলে রাণী বসল পাতের কাছে। থালাভরা ভাত আব মাছ তরকারি। ভাত মেখে মুখে দেওয়ার আগে হরিপদ রাণীর চোখেব দিকে তাকাল।

রাণী বলল, 'কি হল, এমন মানী পুরুষ এমন তেজী পুরুষের চোখে জল। ছি ছি ছি।'

হবিপদ বলল, 'তা নয়, আমার মা'র কথা মনে পড়ছে।'

এঁটো বাসন কুড়িয়ে নিয়ে রাণী চলে গেল। আর তার খানিক পবেই ফিরে এল তারাপদ। এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'গিয়েছিলি ? খেয়েছিলি ?'

হরিপদ মুখ নীচু করে বলল, 'যেতে হয়নি বাবা সে নিজেই এসেছিল।'

তারাপদ বলল, 'কে ?'

হবিপদ আরও মুখ নামাল, অস্ফুট লজ্জিতস্বরে বলল, 'রাণী।'

তারাপদ কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই হাড় বের করা ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন হাসিতে কোমল হয়ে উঠেছে। একটু বাদে তাবাপদ বলল, 'চিঠিখানা কি করেছিলিরে হরি।'

হরিপদ বলল, 'আমার কাছে আছে বাবা, দেব ?'

তারাপদ একটু যেন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'দে তো দেখি—চাবগণ্ডা পয়সা দিয়ে রাখলাম, ভালো ক'রে শোনাই হল না।' হরিপদ উঠে গিয়ে বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বেব করে আনল। মোমের যে টুকরোটা পড়ে ছিল সেটা জ্বেলে দিল। তারপব বাপের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলল, 'নাও বাবা পড়।'

তারাপদ একটু হেসে বলল, 'কেনরে, সকালের মত তুই-ই পড়না।'

হরিপদ বলল, 'না বাবা, তুমিই পড়, মনে মনে পড়।'

তারাপদ বলল, 'আচ্ছা দে।'

হবিপদ ঘবের বাইরে চলে যাচ্ছিল তারাপদ তাব হাত ধরে থামাল, সস্নেহে একটু ধমকের সুরে বলল, 'বোস এখানে। ভাবি তো ইয়ে হয়েছে।'

হরিপদ আর কোন কথা না বলে বাপের পাশে বসে পড়ল। ছেলের এক হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আর এক হাতে স্ত্রীর চিঠি খুলে ধরল তারাপদ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, মোমের বাতি নিবু নিবু। যে চিঠির অর্থ দিনের সেই প্রখব আলোয় ভালো করে ধরা পড়েনি এখন এই আধো অন্ধকারে যদি তার রহস্য কিছু বোঝা যায়।

ভাদ্র ১৩৬০

ছাত্রী

মীরার বাবা গণেশ দত্ত ছিলেন আমাদের জেলা স্কুলেব মাষ্টার। আমবা এক পাডাতেই থাকতাম, আমার বাবা ছিলেন জজ কোর্টের উকিল। ওখানে ছোট খাট একটু বাড়িও আমাদের ছিল। কিন্তু গণেশবাবুরা ছিলেন ভাড়াটে বাসায়। অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টেই ছিলেন। মীরা তাঁর মেজো মেয়ে। শামলা বঙ, দোহাবা লম্বাটে গড়ন ; মুখ চোখের শ্রী-ছাঁদ ভালোই। দেখলে পলক পড়ে না এমন অবশ্য নয়, আবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ারও দবকার হয় না। বাস্তার এপারে ওপাবে সামনাসামনি বাড়ি হওয়ায় জানালা দিয়ে ওদের ঘর সংসারের অনেক দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ত। কখনো দেখতাম রুগ্না মায়েব বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে মীবা, কখনো বাপের পিঠে তেল মালিস করছে, ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে ভাইদের, কোনদিন বা ছোট বোনকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়ে তার কান্না থামাচ্ছে—চোখে পড়ত। আবার এই সব কাজের এক ফাঁকে ওকে বইপত্র নিয়ে স্কুলে বেরোতেও দেখতাম। আর সে বইও দু' একখানা বই নয়, একরাশ বই হাতে ও ঘাড় গুঁজে পথ হাঁটত। পাড়ার বকাটে দু' একটি ছোকরা ঠাট্টা করে বলত—'ইস্, পল্লবিনী লতা একেবারে নুয়ে পড়েছে।'

মীরা কারো দিকে তাকাত না, পাড়ার কোন ছেলে আলাপ করতে চাইলে এড়িয়ে যেত। এইজন্যে অনেকেরই রাগ ছিল ওর উপর।

আমার মা কিন্তু বলতেন, 'মেয়েটির গুণ আছে রে। সংসারে এত কাজকর্ম করেও ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। মেয়েটি পড়াশুনোয় ভালো'। পড়াশুনোয় আমিও নেহাৎ খারাপ ছিলাম না। তবু মার মুখে অন্য একটি মেয়ের বিদ্যার প্রশংসা শুনে কেমন যেন আমার একটু হিংসে হত। হেসে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'ক'জনের মধ্যে সেকেণ্ড হয় মা?'

মা বলতেন, 'যতজনই হোক্ দু'জনের চেয়ে বেশী ছাত্রী নিশ্চয়ই ওদের ক্লাসে আছে। কেন, ওর উপর তোর এত রাগ কিসেব রে?' মা হাসতেন।

একটু রাগ ছিল বই কি। মীরা আমার সমবয়সী হয়েও আমার চেয়ে দু' ক্লাস নীচে পড়ে। সেই হিসেবে ওর একটু শ্রদ্ধামনোযোগ আর্কষণের দাবি কি আমার নেই? মীরা আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যে আসে যায় তা আমি জানি। মাব কাছ থেকে গোপনে গোপনে পাঁচ দশ টাকা ধার নেয়, আবার গোপনেই তা শোধ দিয়ে যায়। মা ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই বাড়িতে।

আমি একদিন বললাম, 'মীরা বড অহংকারী, না মা?'

মা হেসে বললেন, 'নারে, মেয়েটি বড় লাজুক, আজকালকার মেয়েদের মত বেটাছেলের সঙ্গে ও বেশী মেলামেশা করতে জানে না।'

কিন্তু এই মীরাই ম্যাট্রিকুলেশনে সেবার ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে শহরের সবাইকে অবাক করে দিল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, মেয়ে বটে একখানা গণেশ দত্তের। এ মেয়ে যে পরীক্ষায় ভাল করবে তা তাঁরা সবাই জানতেন।'

রেজাল্ট বেরোবার পর গণেশবাবু মেয়েকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার বাবা-মাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'ওঁদের প্রণাম কর।'

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। মীরা ওঁদের প্রণাম সেরে উঠতেই গণেশবাবু আমাকেও ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেই উপরি পাওনা প্রণামটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন মা। এক সঙ্গে মীরা আর তার বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ও কি? পরিমল মীরার চেয়ে ছ' মাসের ছোট। ওকে আবার প্রণাম

কিসের। ছি ছি।'

ধমক খেয়ে মীরা একটু পিছিয়ে গেল।

গণেশবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ও, পরিমল বুঝি বয়সে ছোট। কিন্তু তাতে কি হল বউঠান, পরিমল বামুনের ছেলে, মীরার চেয়ে কত বেশী উপরে পড়ে, কত বেশী বিদ্যেবুদ্ধি রাখে। সংসারে বয়সটাই তো আর সব নয়?'

সেইদিন মীরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ও বলল, আমার ইন্টারমিডিয়েটের সব বই আর নোট-ফোটগুলি ওর চাই। আমিও তাই চাইছিলাম। চাইছিলাম, ও আমার কাছ থেকে বইপত্র সব চেয়ে নিক।

মীরা আমাদের কলেজে ভর্তি হল। তার বছর দুই আগে থেকে কলেজে কো-এডুকেশন চলছে। আমার ইচ্ছে ছিল বি এ-টা কলকাতায় এসেই পড়ি। কিন্তু বাবা মা ছাড়ছেন না। প্রফেসাররাও আমাকে আটকে রাখলেন। তাই বছর দুই মীরার সঙ্গে একই কলেজে পড়বার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে ওর নাম ছড়াতে শুরু হয়েছে। শুধু ছাত্রদের কমনরুমেই নয়, প্রফেসারদের ঘরেও ওকে নিয়ে আলোচনা হয়। কলেজ ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ওর প্রবন্ধ বেরোয়। সে রচনার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অধ্যাপক মহল মুখর হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু একটা মাত্র অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে শোনা যায়। মীরা বড় অমিশুক। বই আর পড়াশুনো ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনে ওকে পাওয়া যায় না, কলেজের উৎসব-অনুষ্ঠানে ও গরহাজির থাকে। মীরা একেবারে গতানুগতিক অর্থে ভাল ছাত্রী।

আমি একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাল আমাদের থিয়েটারে এলে না কেন। সবাই যে তোমার নিন্দে করছে। বলছে দাম্ভিক আর অহংকারী।'

মীরার মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ পড়ল, আস্তে আস্তে বলল, 'কি করব বল। মায়ের মাথার অসুখ কাল যে খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমি ছাড়া মাকে যে কেউ সামলাতে পারে না।'

নানা রকম অসুখে ভুগে ভুগে মীরার মার মাথায় ছিট হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কথাটা মীরাদের বাড়ির কেউ প্রকাশ করতে চাইত না। মীরা সেদিনই আমাকে প্রথম সব খুলে বলল।

আই এ'তেও কয়েকটি লেটার আর স্কলারশিপ নিয়ে মীরা থার্ড ইয়ারে উঠল। আর আমি ফিলসফিতে একটি সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স জুটিয়ে কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

ছুটি-ছাটায় যেতাম আমাদের শহরে। আর মীরার সুখ্যাতির কথা শুনতাম। সেবার এসে শুনলাম আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে মীরার বেশ একটু আলাপ হ'য়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর তুলনা করে মীরা কলেজ-ম্যাগাজিনে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। তাই নিয়ে দু-একজন প্রফেসারের আলোচনা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সতীকান্ত ঘোষাল সেটা দেখতে চান। প্রবন্ধটি পড়বার পর মীরাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি তোমার নিজের লেখা! কোত্থেকে টুকেছে তাই বল।'

মীরা নতমুখে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার লেকচার নোটের সাহায্য নিয়ে ওটা আমি নিজেই লিখেছি।'

প্রিন্সিপ্যাল স্থিরদৃষ্টিতে মীরার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা যাও। ক্লাসে যাও।'

এর পর মীরাকে আর একদিন ডেকে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ ওকে ভাল করে পড়াশুনো করে ইংরেজীতে একটি ভাল অনার্স নিয়ে বেরবার জন্যে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়েছেন।

খবরটা আমরা বেশ উপভোগ করলাম। কারণ অধ্যয়নে-অধ্যাপনায় সতীকান্ত ঘোষালের যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে তা আমরা ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর দশেক ধরে বিষয়, আশয়, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিকে তাঁর এমন নজর পড়েছিল যে, কলেজের দিকে মন দেওয়ার তাঁর অবসরও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। সতীকান্ত না আছেন হেন জায়গা নেই। জেলা বোর্ডের পলিটিকসে তিনি রয়েছেন, বেনামীতে কয়েকটি রাস্তা তৈরির কনট্রাক্ট নেওয়ার কাজের মধ্যেও তিনি আছেন।

শহরের 'বাণী প্রেস'টি কিনে নিয়ে তিনি তাঁর স্বত্বাধিকারী হয়েছেন। খুব লাভ হচ্ছে প্রেসের ব্যবসায়। জুনিয়র প্রফেসর, এমন কি ছাত্রদের নিয়ে নোট লিখিয়ে তিনি নিজের নামে তা বাজারে চালাচ্ছেন, তাতেও বেশ পয়সা আসছে। কলকাতার দু-তিনটি নামজাদা প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শোনা যায়, সে সব কারবারে অংশও আছে তাঁর। এ ছাড়া ডুয়ার্সে চা-বাগানের শেয়ার আছে। মাঠে খামার জমির পরিমাণ তাঁর বেড়ে চলেছে। জলায় মাছের ব্যবসায়ে তাঁর টাকা খাটছে।

এই তো গেল সম্পত্তির কথা। এবার প্রতিপত্তির কথাটা বলি। শহরে প্রতিপত্তিরও তাঁর তুলনা নেই। থানা পুলিস থেকে শুরু করে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। তিনি সবাইকে চেনেন। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাও কারো চিনতে বাকি নেই। লোকের উপকার আর অপকারের দু রকম ক্ষমতাই তিনি রাখেন। তাই শহরসুদ্ধ লোকের তাঁর সম্বন্ধে এক চোখে শ্রদ্ধা আর এক চোখে ভয়।

শহরের অভিজাত পাড়া কলেজ রোডে তাঁর বড় দোতলা বসতবাড়ি। এছাড়া আরো খান দুই বাড়ি আছে। সেগুলি তিনি ভাড়া দিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছেলে শুভেন্দু শহরের সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল মৃত্যুঞ্জয় মুখুজ্যের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে নিজেও জজকোর্টে ওকালতি করছে। মেয়ে শুভ্রাকে বিয়ে দিয়েছেন ধনী জমিদারের ঘরে। জামাই নীলাম্বর এম বি পাশ করেছে। ডাক্তারিতে তেমন সুবিধে না হলেও তার ফার্মেসি বেশ জেঁকে উঠেছে। ওষুধ বিক্রি করে খুবই লাভ করছে নীলাম্বর চাটুজ্যে।

আর এই সব ধনসম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রে আছেন সতীকান্তর স্ত্রী হিরণপ্রভা। শোনা যায়, তিনিই স্বামীর এই বৈষয়িক উন্নতির মূলে। তাঁর বাবা ছিলেন গঞ্জের তেল-লবণের কারবারী। হিরণপ্রভা লেখাপড়া বেশী শেখেননি। কিন্তু বিদ্যার অভাব রূপ আর বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করেছেন। তাঁকে দেখলে তাঁর কথাবার্তা শুনলে কিছুতেই মনে করবার জো নেই তিনি কম লেখাপড়া জানেন। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র তাঁর বেয়াইর মুশাবিদাকে হার মানায়।

কিন্তু এমন প্রভাবশালী সতীকান্তরও যে শত্রু নেই তা নয়। তারা আড়ালে আবডালে বলাবলি করে, তাঁর সব ঐশ্বর্যই সহজ পথে আসেনি। অনেকখানি বাঁকাচোরা পথে ঘুরে এসেছে। তারা বলে সতীকান্তর আর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে না থাকাই ভাল। কারণ পড়ানর দিকে তাঁর মোটেই মন নেই। রুটিনে সপ্তাহে দু-তিনটে অনার্স ক্লাস তাঁর থাকে। তাও তিনি সমানে করেন না। প্রফেসর কুণ্ডু, কি প্রফেসর ধরের উপর বরাত দিয়ে অন্য কাজকর্মে তিনি সরে পড়েন। পড়ানর চেয়ে তাঁর অনেক বড় আর জরুরী কাজ আছে। কলেজে ইংরেজী অনার্সের ফল সবচেয়ে খারাপ হয়। ছেলেদের ভাগ্যে দু-একটা কোন বার জোটে, কোন বার জোটেওনা। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কিছু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। বলে লাভ নেই। কারণ গভর্নিং বডি প্রিন্সিপ্যালের হাতের মুঠোয়। শোনা যায়, এই বেসরকারী কলেজের বেশীর ভাগ অংশই সতীকান্ত কিনে রেখেছেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনা করবে কে।

পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে সতীকান্তর। কানের কাছে চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। কিন্তু এখনো বেশ শক্ত জবরদস্ত চেহারা। রীতিমত লম্বা চওড়া। পুরু ঠোঁট, নাকটাও একটু চ্যাপটা। সুপুরুষ না হলেও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। একটু যেন স্থূল রুক্ষ বৈষয়িক ধরনের মুখ। দেখলে প্রফেসার বলে সত্যিই আজকাল আর তাঁকে মনে হয় না। মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার আকারেও বোধ হয় কিছু অদল-বদল হয়। যাই হোক, শহরে যে কয়েকজন লোক লেখাপড়া ভালোবাসতেন সতীকান্তর উপর ভিতরে ভিতরে তাঁদের খুব শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁরা বলতেন, প্রিন্সিপ্যালের জীবনের ধারাই যখন বদলে গেছে ওঁর জীবিকাটাও এবার বদলে নেওয়া উচিৎ।

তাই অনার্সের ছাত্রী মীরাকে ডেকে উৎসাহ দেওয়ার কথা শুনে আমরা বিস্ময় আর কৌতুক বোধ করলাম।

তারপর মীরা একদিন প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে গিয়েও হাজির হল। কদিন ধরে তিনি কলেজে আসেন না। কেউ বলে তিনি সুস্থ, কেউ বলে তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। এদিকে আর একজন

ইংরেজীর প্রফেসারও ছুটিতে। অনার্স ক্লাসগুলি প্রায়ই বন্ধ যাচ্ছে। কোর্স শেষ হওয়ার কোন রকম লক্ষণ নেই, ক্লাসের আরো দুজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মীরা গিয়ে হানা দিল প্রিন্সিপ্যালের দরজায়। কিন্তু সেখানে লাঠি হাতে গোঁফওয়ালা দুজন দারোয়ান। দু'দিন তারা হটিয়ে দিল মীরাদের। একদিন বলল বড়বাবু বাড়িতে নেই, আর একদিন বলল তাঁর বুখার হয়েছে। তৃতীয় দিনে সঙ্গীরা কেউ যেতে চাইল না। বলল, 'আমাদেরও মান সম্মান আছে। আমরা তো আর চাকরির উমেদার নই। বাংলা দেশে কলেজ আরো আছে। সেখানে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু মীরা একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার জেদের ধরনটাও আলাদা। সে যখন সঙ্কল্প করেছে প্রিনিসপ্যালের সঙ্গে দেখা করবে, তখন যেমন করে হোক সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই। তাই সে তৃতীয় দিনেও বিকেল বেলায় এসে উপস্থিত হল। দারোয়ানদের অনুরোধ করে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখল,'শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমাদের অনার্স ক্লাসগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।—জনৈকা ছাত্রী।'

এরপর প্রিন্সিপ্যাল তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটি ঘর। সেখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল চুরুট টানছেন আর গম্ভীর ভাবে-জরুরী একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছেন।

মীরা ঘরে ঢুকে ভীরু পায়ে আরও একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সতীকান্ত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে এই পেনসিলে লেখা চিরকুট পাঠিয়েছ তুমি?'

মীরা সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের ক্লাসগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে।'

সতীকান্ত বললেন, 'সে সব দেখবার জন্য লোক আছে। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আছে, অন্য প্রফেসাররা রয়েছে। তা নিয়ে তোমার কেন এত মাথাব্যথা, আমাকে এসব নিয়ে আর কোনদিন বিরক্ত করতে এস না। সেই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম, যাও এবার।'

মীরা চলে আসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের ঘরের দরজার একটি পাট খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বই বোঝাই কয়েকটা কাঁচের আলমারি দেখা যাচ্ছে।

মীরা বলল, 'আপনার লাইব্রেরিটা একটু দেখে যাব?'

সতীকান্ত এবার অবাক হলেন। এতখানি অপমান করবার পরও যে তার লাইব্রেরি দেখতে চায় সে কিরকমের মেয়ে। একটু নরম হয়ে বললেন, 'যাও দেখে এসো।'

মীরা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। ঘর ভরা আলমারি আর আলমারি ভরা বই, খোলা শেলফের মধ্যেও অনেক বই আছে। সাহিত্য ইতিহাস দর্শনে শেলফগুলি ঠাসা। কিন্তু কেউ কোন একখানা বইতে যে শিগগির হাতে দিয়েছে তা মনে হয় না। দু' একখানা বই টেনে নিয়ে দেখল মীরা। ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মীরা আঁচল দিয়ে খানকয়েক বইয়ের ধুলো মুছতে লাগল। হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মীরা পিছন ফিরে দেখল, কখন সতীকান্ত এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। একটু দূরে থেকে তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টিতে আগের উগ্রভাব আর নেই। বরং কিসের একটা কোমলতা এসেছে। চোখাচোখি হতেই তিনিই বললেন, 'কি করছিলে।'

মীরা চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, 'কিছু না।'

তারপর দুখানা বই ঠিক জায়গায় রেখে দিল মীরা। তৃতীয়খানা রাখতে যেন তার আর মন সরে না। সতীকান্ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'বইটা তুমি নেবে? কি বই ওটা।'

মীরা তেমনি লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমাদের সিলেবাসের রোমিও-জুলিয়েট। মার্জিনে মার্জিনে চমৎকার সব নোট রয়েছে। অনেকদিন আগের পেনসিলের লেখা। তবু বেশ পড়া যায়।'

'কই দেখি।' সতীকান্ত এগিয়ে এসে মীরার হাত থেকে বইখানা তুলে নিয়ে দু একটা পাতা উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'নাও।'

হঠাৎ মীরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই বুঝি আপনার সার্টিফিকেট?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

মীরার মনে হল, তিনি একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

আলমারির মাথার উপরে উঁচুতে সতীকান্তর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে তাঁর প্রথম যৌবনের একখানি ফটো। মীরার চোখে পড়ল দুখানাতেই মাকড়সার ঝুল পড়েছে। সতীকান্তও তা লক্ষ্য করলেন।

একটু বাদে মীরা বেরিয়ে আসছিল, সতীকান্ত বললেন, 'তোমার আরো যদি বইয়ের দরকার হয় পরে এসে নিয়ো। আর এর আগে যা বলেছি তার জন্য কিছু মনে কোরো না। আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি।'

মীরা মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

সতীকান্ত বললেন, 'ভালো করে পড়াশুনো কর, রেজাল্ট খুব ভালো হওয়া চাই।'

মীরা বলল, 'তার জন্যে আপনার সাহায্য দরকার।'

সতীকান্ত বললেন, 'হুঁ।'

এই দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ আমি মীরার কাছ থেকে শুনেছি। ছুটিছাটায় শহরে এসে, সতীকান্তর পরিবর্তন কিছু কিছু চোখেও দেখলাম। অন্য কাজ কর্মের কিছু কিছু ভার তিনি কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে কলেজের উপর বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রায় নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, অন্য ক্লাসগুলিরও খোঁজখবর নেওয়ায় তাঁর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাঁর ভাষা আর ব্যবহার থেকে রূঢ়তা অনেকখানি কমেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য তিনি নিজেও ফের একটু একটু পড়াশুনো শুরু করেছেন। তাঁর ইজিচেয়ারটা আজকাল লাইব্রেরি ঘরেও মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক রাত অবধি সে ঘরে আলো জ্বলে। প্রিন্সিপ্যালের এই পরিবর্তনে সহকর্মীরা আর ছাত্ররা সবাই খুশি হয়ে উঠল। এবার কলেজটার সত্যিই তবে উন্নতি হবে।

মীরার সঙ্গে সতীকান্তর স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূর ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। মেয়ের বয়সী এই দরিদ্র মেয়েটির উপর প্রথমে স্বাভাবিক বাৎসল্যই বোধ করলেন হিরণপ্রভা। আরো যখন শুনলেন মেয়েটি ভালো ছাত্রী, ওকে দিয়ে তাঁর স্বামীর কলেজের সুনাম বৃদ্ধির আশা আছে, তখন মীরার উপর তাঁর আগ্রহ আরো বাড়ল। ইদানীং কলেজের দিক থেকে স্বামীর যশের ঘাটতি নজর এড়ায়নি হিরণপ্রভার। তিনি তাতে খুশি হননি। স্বামীর যশ সব দিক দিয়ে বেড়ে চলুক এই তাঁর কথা। তিনি মীরাকে ডেকে বললেন, 'কি বল, একটা ফার্স্ট ক্লাস পাবে তো?'

মীরা লজ্জিত ভাবে সবিনয়ে বলল, 'পাব একথা কি বলা যায়। আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

হিরণপ্রভা বললেন, 'চেষ্টা কর, খুব ভালো করে চেষ্টা কর। ওঁর মুখ রাখা চাই বুঝেছ?'

তারপর বললেন, 'তোমার নাকি বাড়িতে পড়াশুনোর অসুবিধা। আলাদা ঘটবটর নেই, তা ছাড়া আরো কি সব গোলমাল টোলমালের কথা শুনেছি। ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেও পড়তে পার। এখানে তো ঘরের অভাব নেই। কত ঘর খালি পড়ে আছে।' মীরা বলল, 'সবদিন দরকার নেই। তবে আপনাদের লাইব্রেরিটা যদি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারি খুব ভালো হয়। কলেজের লাইব্রেরিতে ছেলেদের বড় ভিড়।'

হিরণপ্রভা মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তুমি এখানেই এসে পড়ো।'

তাঁর অনুমতি পেয়ে মীরা মাঝে মাঝে আসতে লাগল প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে। সেই নিরালা লাইব্রেরি ঘরটি তার বড় ভালো লাগত। মনে হত এখানে যেন সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

সতীকান্তর মেয়ে শুভ্রা মাঝে মাঝে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসত। আলাপ করতে আসত পুত্রবধূ জয়ন্তী। কিন্তু হিরণপ্রভাই তাদের আগলে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'না না, ওকে পড়তে দাও তোমরা ওর পড়াশুনোর ব্যাঘাত কোরোনা।'

শুভ্রা হেসে বলত, 'বাবা, কি কড়া পাহারা। মা, বাবার চেয়ে তুমি যদি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে আরো বেশী মানাত।'

মীরা ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেল, কলেজের বছর দশেকের ইতিহাসে তা কেউ পায়নি। অন্যান্য রেজাল্টও আগের চেয়ে কলেজের এবার বেশী ভালো হল।

মীরা কলকাতায় গিয়ে এম এ.ক্লাসে ভর্তি হল। সাফল্যের আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারল না। বাসার অবস্থা খারাপ। মায়ের অসুখ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে, আর্থিক অবস্থাও ভালো হচ্ছে না। কয়েকটি অপোগণ্ড ভাইবোন। শুধু একটি মাত্র ভাই বড় হয়ে উঠেছে। সুধীর বি এ পড়ছে।

মীরা বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি না হয় না গেলাম। তোমাদের দেখা শোনা করবে কে।'

গণেশবাবু বললেন, 'সে যা হয় হবে। এত ভালো রেজাল্ট করে তুই পড়া ছেড়ে দিবি তাই কি হয়। তুই আমার বংশের রত্ন।'

মীরা পড়তে গেল কলকাতায়। বাবার কাছ থেকে তো কিছু নিত না। বরং সস্তা হস্টেলে থেকে কম খরচে চালাত। টুইশনের টাকা পাঠাত বাসায়।

নানা কাজে সতীকান্ত কলকাতায় যেতেন। মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে আসতেন মীরাকে, আর কিনে দিতেন বই।

একদিন দেখা হয়ে গেল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। দেখি সতীকান্ত আর মীরা পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে। দুজনেই যেন ছাত্রছাত্রী। দুজনেরই হাতে বই। দুজনেরই মুখে গাম্ভীর্য, চোখে অধ্যয়নের স্পৃহা।

মীরা আমাকে দেখে উঠে এল, বলল, 'ভালো আছ?'

বললাম,'ভালো আর কই। এখনো বেকার। সেকেণ্ড ক্লাস এম এ এর সহজে কি চাকরি হয়। তোমরা বুঝি মাঝে মাঝে আস এখানে?'

মীরা বলল, 'আমরা? ও প্রিন্সিপ্যালের কথা বলছ? হ্যাঁ, উনি কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে আসেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের উপর উনি একটা বই লিখছেন।'

বললাম, 'ভালোইতো।'

কর্মখালিতে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করতে করতে আমি আরামবাগ কলেজে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। মীরার রেজাল্ট এম এ'তে আশানুযায়ী হল না। হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল। কলকাতার কলেজে ওর চাকরি জুটেছিল। কিন্তু এই সময় ওর মা মারা গেলেন। ওকে যেতে হল আমাদের শহরে ফিরে। গণেশবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কাজ কি তোমার বাইরে থেকে। তুমি এই কলেজেই পড়াও। এখানে কলকাতার চেয়ে খরচ কম। তাছাড়া তুমি তো এই কলেজেরই মেয়ে। এর উপর তোমার দরদ বেশী থাকবে।'

গণেশবাবুরও তাই মত। তিনি মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চান না। আরো বছর দুই কাটল। এর মধ্যে গণেশবাবু মারা গেলেন, আর সুধীর বি এ ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে কোর্টে পেশকারের চাকরি নিল। শোনা গেল সতীকান্তবাবুর চেষ্টাতেই এই চাকরি হয়েছে। সেবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আরো কিছু খবর শুনতে পেলাম। সতীকান্তবাবুর পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। প্রায় রোজই ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গেই তাঁর আর বনিবনাও হচ্ছে না।

মা-ই বললেন একথা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন মা?'

মা বললেন, 'যাক বাপু, তোমার এসব নোংরা কথার মধ্যে থেকে কি দরকার।'

কিন্তু ঘুরিয়ে মা-ই জানালেন এসবের মূলে আছে মীরা। ওর জন্যেই পরিবারে অশান্তি। কলেজে মীরাকে চাকরি দেওয়া হয় এতে গোড়া থেকেই হিরণপ্রভার অসম্মতি ছিল। স্বামীর সঙ্গে এই মেয়েটির অনুক্ষণ মেলামেশা তিনি আর পছন্দ করছেন না। সতীকান্ত বই লেখার নামে কি মীরাকে থিসিস লেখায় সাহায্য করার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় কলেজে নয় লাইব্রেরিতে কাটান। তাঁদের আলাপ আলোচনা যেন শেষ হতেই চায় না। সতীকান্তর অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মেলামেশা নিয়ে নানা জায়গায় কথাও উঠেছে, তাও যেন তিনি গ্রাহ্যে আনতে চান না। আসলে লোকটি একগুঁয়ে, বেপরোয়া ধরনের। কিন্তু পুরুষের না হয় অমন একগুঁয়ে হলেও চলে। বিশেষ করে সতীকান্তর মত খ্যাতিমান শক্তিমান পুরুষের। কিন্তু মীরার

আক্কেলখানা কিরকম। কুমারী মেয়ে, ওর তো একটা লজ্জা সরম ভয় ভাবনা থাকা উচিত। এ ধরনের বদনাম রটা কি ভালো। আর যা ইচ্ছা করলে, একটু সাবধান হলেই, এড়িয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে কলেজে, যেখানে পুরুষে মেয়েতে এক সঙ্গে পড়ে, সেখানে এই কাণ্ড। মুখ তো কেউ কারো চেপে রাখতে পারে না। তাই নানা জনে নানা কথা বলছে।

বললাম, 'মীরাকে ডেকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল না। ও একটু সাবধান হোক।'

মা বললেন, 'ইশারা ইঙ্গিতে কি বলিনি? বেশী বলতে আমার লজ্জা করে বাপু! হাজার হলেও পেটের সন্তানের বয়সী।'

কিন্তু যাঁরা বলবার তাঁরা বিনা লজ্জা-সঙ্কোচেই বলেন। মীরাকে একদিন খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন হিরণপ্রভা। তারপর প্রায় বিনা ভূমিকায় বললেন, 'তোমাকে এ কলেজের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল, 'কেন আমি কি দোষ করেছি?'

হিরণপ্রভা বললেন, 'না তুমি দোষ করবে কেন, তুমি গুণের হাঁড়ি। এক মাসের মধ্যে তোমাকে কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল, 'বেশ গভর্নিং বডি যদি বলেন—'

হিরণপ্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গভর্নিং বডি বলুক আর না বলুক, আমি বলছি, সেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ, সেই বডিকে দিয়েই আমি বলাব।'

মীরা বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

শুভেন্দু, শুভ্রা, জয়ন্তী পাশের ঘরেই ছিল। তারাও এবার হিরণপ্রভার সঙ্গে যোগ দিল, 'এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। এক মাস নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে। অত বড় একজন মানী গুণী মানুষ। তুমি তাঁর নামে বদনাম রটাচ্ছ।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বদনাম রটাচ্ছি!'

শুভেন্দু বলল, 'তোমাকে উপলক্ষ করেই তাঁর নামে বদনাম রটছে। এটা কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।'

মীরা বলল, 'সহ্য করতে তো আমি বলিনে।'

শুভ্রা বলল, 'বটে! তুমি ভেবেছ আমরা তোমার বলা না বলার অপেক্ষায় থাকব। দাদা যা বলল, আর একটি সপ্তাহ আমরা দেখব। তারপর—'

মীরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। অন্য কলেজে চাকরির জন্যে ও নিজেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু শুভেন্দুর এই শাসানিতে মীরা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ওরও জেদ বেড়ে গেল। দেখা যাক কি করতে পারে ওরা।

এক সপ্তাহ নয়, সাত আট সপ্তাহই কাটল। এর মধ্যে গরমের ছুটিতে হিরণপ্রভা সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলেন সেই সঙ্গে। কিন্তু সতীকান্ত সপ্তাহ দুই কাটতে না কাটতেই চলে এলেন। সেখানে স্ত্রীর কড়া পাহারা তাঁর সহ্য হল না। হিরণপ্রভা বৈষয়িক অবৈষয়িক স্বামীর নামের সব চিঠিগুলি আগে নিজে খুলে দেখতেন। তাঁকে না দেখিয়ে সতীকান্ত কোন চিঠি ডাকে দিতে পারতেন না। তিনি প্রতিবাদ করলে ছেলেমেয়ে পুত্রবধূর সামনে মীরার কথা তুলে স্বামীকে তিনি অপমান করতেন। সপ্তাহ দুই বাদে সতীকান্ত তাই পালিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিনের গাড়িতে হিরণপ্রভা এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিরহ আর সহ্য হচ্ছিল না, না? তোমার বিরহ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।'

নিজের লাইব্রেরি-ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন সতীকান্ত। বাইরে থেকে তালাচাবি পড়ল। হিরণপ্রভা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ওই ঘরে তার গায়ের গন্ধ আছে। বসে বসে শুঁকতে থাক।'

সতীকান্ত চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার কলেজ খুলে গেছে যে, আমাকে কলেজে যেতে হবে না?'

হিরণপ্রভা বললেন, 'তাকে আগে কলেজ ছাড়াই, তারপর তোমাকে সেখানে পাঠাব।'

সতীকান্ত ভেবে পেলেন না তাঁর হাতের মুঠি এমন আলগা হয়ে গেল কি করে। কি করে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এমন ভাবে হস্তান্তরিত হল। ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর, বেয়ারা-দারোয়ান কেউ তাঁর

পক্ষে নয়। সব হিরণপ্রভার। আর তাঁর চরিত্র সংশোধনের ভার সকলের হাতে। গভর্নিং বডিকে হাত করলেন হিরণপ্রভা। তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিলে কলেজের দুর্নাম বেড়ে যাবে। প্রথমে মীরাকে পদত্যাগ করবার জন্যে অনুরোধ করা হল। কিন্তু সে যে কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রাখবে তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করলেন। আর এখবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতীকান্তও রেজিগনেশন লেটার পাঠালেন। বললেন, শাস্তি একা কেন ভোগ করবে মীরা? তা তাঁরও প্রাপ্য। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করলেন না। কিন্তু সতীকান্ত এরপর থেকে আর কলেজে গেলেন না।

তাঁর এই ব্যবহারে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সতীকান্তকে কলেজে পাঠাবার জন্যে নানারকম চাপ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত বদলালেন না।

হাটে বাজারে শহরের প্রতিটি চায়ের দোকানে, বার-লাইব্রেরিতে এই একটি মাত্র আলোচনা ক'দিন ধ'রে চলতে লাগল, দুষ্টু ছেলেরা ছড়া কাটল, দেয়ালে দেয়ালে প্লাকার্ড পড়ল।

তারপর একদিন ভোরে উঠে শুনলাম, মীরাও নেই, সতীকান্তও নেই। দুইজনেই শহর ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথমে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু হিরণপ্রভা ছেলে আর জামাইকে সঙ্গে করে সেখানেও গেলেন। ফলে কলকাতা থেকেও পালালেন সতীকান্ত।

এরপর বছরখানেক বাদে মার সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলাপ হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। শুনলাম কলেজে নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন, ডক্টর চৌধুরী। সতীকান্তবাবুদের সেই হৈ চৈ এরই মধ্যে শান্ত হয়ে গেছে। মীরার ভাই সুধীর বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

কথায় কথায় মা বললেন, 'মেয়েটা খারাপ ঠিকই। কিন্তু যত খারাপ সবাই বলত তত খারাপ নয়।'

বললাম, 'কি রকম।'

মা বললেন, 'লোকে তো বলত মেয়েটা টাকার লোভেই, সতীকান্তবাবুর সম্পত্তির লোভেই অমন একজন বুড়োকে—'

হেসে বলাম, 'তা যে নয় তা কি করে জানা গেল।'

মা বললেন, 'সতীকান্তবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হিরণপ্রভা আর শুভেন্দুর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। কিছু টাকা কলেজেও দিয়েছেন শুনলাম।'

আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম, 'মা আমার উপনিষদের সেই কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান মনে পড়ছে। কাত্যায়নী রইলেন ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন সম্পদ নিয়ে। আর মৈত্রেয়ী বললেন যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।'

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রীর গল্পটা মার জানা ছিল। তিনি বললেন, 'কাত্যায়নী কে? হিরণপ্রভা?'

বললাম, 'তা ছাড়া আবার কে?'

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না বাপু, তা না। মানুষকে অমন সরাসরিভাবে ভাগ কোরো না। প্রত্যেকের মধ্যেই একজন করে কাত্যায়নী আছে, আর একজন করে মৈত্রেয়ী। সেদিন হিরণদির অসুখের খবর শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। কিসের অসুখ? ডাক্তার বৈদ্য কি সে অসুখ ধরতে পারে? পারি আমরা। মেয়ে মানুষের সে অসুখ আমরা মেয়েমানুষেই বুঝি। হিরণদির সেই শরীর নেই, সেই রূপ নেই, যেন শুকিয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তাঁর সে কি কান্না। সবই আছে। কিন্তু একের বিহনে সব অন্ধকার।' বলতে বলতে মায়ের চোখ দু'টি ছল ছল ক'রে উঠল। হিরণপ্রভার সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

একটু থেমে বললেন, 'আর ছেলেমেয়ে দুটির দিকেই কি তাকান যায়। তারা উপরে যত শক্ত ভাবই দেখাক, ভিতরটা তাদের পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে না? তাদের দুঃখ তাদের লজ্জাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। অতবড় মানী-গুণী বাপ। তিনি আজ থাকতেও নেই। তাদের সামনে বাপের কথা কেউ তুললে এমন ভাব হয় তাদের—।'

তারপর প্রায় বছর দশেক মীরার সঙ্গে আমাদের কারোরই কোন যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি ওরা ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, নানা কলেজে চাকরি করেছে। মাঝে মাঝে দু'একবার কলকাতায়ও যে বেড়াতে না এসেছে তা নয়। কিন্তু পরিচিত কারো সঙ্গেই দেখা করেনি।

কিন্তু এবার গরমের ছুটির মধ্যে হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছি সেগুলি ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে। ওরা এখন নাগপুরে স্থায়ীভাবে আছে। যদি কোন দিন আমি ওদিকে বেড়াতে যাই যেন দেখা-সাক্ষাৎ করি। তাহলে ওরা দুজনেই খুব খুশি হবে।

ছুটিতে কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবছিলাম। মীরার চিঠি পেয়ে ঠিক করলাম নাগপুরেই যাব; যদিও গরমটা ওখানে বেশী, তা হোক।

প্রথমে এক মারাঠা বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। সেখান থেকে দেখা করতে গেলাম মীরার সঙ্গে।

শহরতলির অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা জন-বিরল অঞ্চল ওরা বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছে। বাংলো প্যাটার্নের পাটকিলে রঙের ছোট একটু বাড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। বারান্দার নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মীরা ফুলের চাষ করেছে।

আমাকে দেখে মীরা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসবে আশাই করিনি। বহুকাল চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয় না।'

সতীকান্তবাবুর বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলাম না। তিনি আগের মতই গম্ভীর আর রাশভারী রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছ?'

আমি প্রণাম করে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি। আপনি?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো।'

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো দেখলাম না। মীরার কাছে শুনলাম ব্লাড প্রেশারে খুব ভুগছেন। আর দেখলাম সতীকান্তবাবু অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন। সব চুল পাকা। দাঁতও বেশীর ভাগই পড়ে গেছে। শরীরের সেই বাঁধুনি আর নেই। কি জানি, রোগই হয়ত তাঁকে এমন অশক্ত করে তুলেছে।

সেই তুলনায় মীরার বয়স বেশী বেড়েছে বলে মনে হয় না। সে যেন তিরিশের নিচেই রয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই মীরা খুব কর্মঠ। তার সেই তৎপরতা যেন আরো বেড়েছে! সকালে কলেজে পড়ায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তার বেশীর ভাগ সময় সতীকান্তবাবুর সেবা-শুশ্রূষায় কাটে। তিনিও ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন ছুটি নিয়েছেন।

মীরা আমাকে কিছুতেই মারাঠী বন্ধুর ওখানে ফিরে যেতে দিল না, বলল, 'তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ, আমাদের এখানেই থাকবে।'

বললাম, 'কোন অসুবিধে হবে না তো?'

মীরা হেসে বলল, 'অসুবিধে কিসের?'

দিন পনের ছিলাম ওদের সঙ্গে। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য। দুখানা তক্তপোশ। খান দুইতিন সস্তা ইজিচেয়ার। দু'খানা লিখবার ছোট টেবিল। সামনে দু'খানা হাতলহীন চেয়ার। আর লম্বা লম্বা বইয়ের র‍্যাক। সতীকান্ত তার সেই আগের লাইব্রেরির একখানা বইও নিয়ে আসতে পারেননি, কি আনেননি। কিন্তু এখানে ছোটখাট আর একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে।

খাওয়া দাওয়াও খুব অনাড়ম্বর। ডাল ভাত আর একটা তরকারি; সতীকান্তর জন্যে আধসেরখানেক দুধ। আমার জন্যে মীরা বিশেষ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিলাম।

একদিন বললাম, 'মীরা, এত কষ্ট করে আছ কেন? তোমার রোজগার তো খুব খারাপ নয়।'

মীরা বলল, 'পরের সম্পত্তি সবাই বড় দেখে।'

একটু বাদে ফের বলল, 'বেশী কিছু থাকে না পরিমল। ছোট ভাইবোনদের কিছু কিছু করে পাঠাতে হয়, ওরা তো এখনো সবাই যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সুধীর একা পেরে ওঠে না।'

বললাম, 'তুমি গরীবের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তোমার না হয় এ সবে অভ্যেস আছে। কিন্তু ওর কষ্ট হয় না?'

মীরা বলল, 'না ওঁর ইচ্ছেমত এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু এত কৃচ্ছ্র কি ভাল মনে কর, সবাই যদি তোমার মত হয় জাতির ঐহিক সম্পদ বাড়বে কি ক'রে ?'

মীরা হেসে বলল, 'সবাই আমার মত হবে কেন ? তোমাকে বললাম তো এর চেয়ে বেশী ভাল অবস্থায় থাকবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যতই বল মানুষের মনের উপর বস্তুর প্রাধান্যতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। সম্পদ সৃষ্টির নামে মানুষ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর, বস্তুসর্বস্ব হবে—আর তাই যে সবচেয়ে ভালোএকথা কি ক'রে মানি। তোমার ইদানীংকার প্রবন্ধগুলিতেও এই তর্ক তুলেছ। তাই তোমাকে ডাকলাম।'

একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরলাম। অনেকখানি পথ পার হওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বললাম, 'এসো এখানে একটু বসা যাক।'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। ভারি নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা, যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

বললাম, 'মীরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মীরা আমার দিকে স্মিতমুখে তাকাল, 'করনা।'

বললাম, 'তুমি এমন কাজ করতে পারলে কি করে।'

মীরা হাসল, 'তোমার এতদিন বাদে এ কথা ?'

'এতদিন বাদে না, আমার অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে। তুমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলে না ?'

মীরা হেসে বলল, 'মানুষ অবশ্য হাতের কাছে আরো দু' একজন ছিল।'

বললাম, 'ঠাট্টা রাখ। অমন একজন বুড়ো, তোমার সঙ্গে বয়সের যাঁর অত তফাৎ, যাঁর স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাতনী সব ছিল—। আমার একেক সময় মনে হয় বাইরের লোকের উৎপাতে তুমি বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছ।'

মীরা স্মিতমুখে বলল, 'তাই যদি হবে, তাহলে একাই পালাতাম, ওর সঙ্গে আসতাম না।'

বললাম, 'তুমি তাহলে ভালোবেসেই এসেছ ?'

মীরা কোন জবাব দিল না।

বললাম, 'কিন্তু একি এক ধরনের বিকৃতি নয়, ব্যভিচার নয়, অন্যায় নয় ?'

মীরা এই তিরস্কারের এবারও কোন জবাব দিল না। তেমনি হেসে চুপ করে রইল।

মায়ের কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তুমি একজন পারিবারিক মানুষকে তাঁর পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনেছ। তুমি একটি পরিবারকে অনাথ করেছ।'

মীরা এবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। অনুত্তেজ শান্ত সুরে বলল, 'ওকথা বলো না। তাঁর পারিবারিক বাঁধন ভিতরে ভিতরে অনেক দিন আগে থেকেই খুলে গিয়েছিল। চলে আসবার দিন শেষ রাত্রে তিনি যেভাবে আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তুমি যদি তাঁর সে মূর্তি দেখতে তাহলে আজ অন্য কথা বলতে। আমি তাঁর ডাকে চমকে উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হল যেন ভূত। তারপরে দেখলাম ভূত নয় জেল থেকে পালিয়ে আসা কয়েদী। তেমনি বেশ বাস, তেমনি মুখ চোখ। তিনি বললেন,—মীরা, আমাকে মুক্তি দাও। আমি বুঝতে পারলাম এ-শুধু পরিবারের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নয়, কামনার পীড়ন থেকেও মুক্তি। এঁকে মুক্তি দিতে হলে আগে বাঁধতে হবে।'

মীরা একটু থামল।

আমি বললাম, 'তারপর ?'

মীরা বলল, 'তার আগের কথা একটু শুনে নাও। তার আগে এই কয়েক বছর ধরে কতবার তিনি আমার কাছে গেছেন, কত ছলে আমাকে কাছে ডেকেছেন : আর কত চেষ্টায় আসল বলবার কথাটাকে ঢেকে রেখেছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে না বলে পারা যায়। নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আমি তো না দেখেছি, এমন নয়। তবু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলতেই হল ! প্রথমে একটা তীব্র ঘৃণা হল আমার, তারপর এক গভীর মায়ায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল।

ভাবলাম এই আর্তকে আমার আশ্রয় দিতে হবে। যে বটগাছ ভেঙে পড়ল, তাকে আমার তুলে ধরা চাই। আজ আমার দক্ষিণা দেওয়ার দিন এসেছে।'

আমি বললাম, 'শুধু দক্ষিণা, শুধু দাক্ষিণ্য ?'

আমার কথা বোধ হয় মীরার কানে গেল না। কি ইচ্ছে করেই সে কানে তুলল না। মীরা আগের কথার জের টেনেই বলে চলল, 'তুমি বলছিলে পরিমল, আমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলাম না ? পাওয়ার অবসর পেলাম কই। প্রথম থেকেই এক প্রবল প্রচণ্ড ভালোবাসাকে ঠেকাতে ঠেকাতে—'

আমি বাধা দিয়ে হেসে বললাম, 'এই বুঝি তোমার ঠেকাবার নমুনা ?'

মীরা আমার দিকে তাকাল 'তুমি কি ভেবেছ শুধু দু'হাত দিয়েই ঠেকান যায়, আর কিছু দিয়ে ঠেকান যায় না ?'

বললাম, 'তাহলে তুমি তাকে ঠকিয়েছ বলো।'

মীরা একটু হাসল, 'এবার বুঝি উতোর গাইতে শুরু করলে ? ছিঃ ঠকাব কেন। আমার যা সাধ্য আমি দিয়েছি তিনিও তা প্রসন্ন মনে নিয়েছেন। তাছাড়া একসঙ্গে থাকতে কত অদলবদল হয়, কত নতুন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে—'

এরপর সতীকান্তবাবুর কথা উঠল। বললাম, 'ওঁর রোগটা কি ? তোমার এত সেবাযত্নেও উনি সারছেন না কেন ? তাছাড়া বড় তাড়াতাড়ি যেন বুড়িয়ে পড়েছেন। তরুণী ভার্যা তো মানুষকে আরো তরুণ করে তোলে।'

মীরা লজ্জা পেয়ে বলল, 'তুমি বড় দুষ্টু। হয়ত ততখানি তারুণ্য আমার মধ্যে নেই, যাতে জরাকে জয় করা যায়।'

একটু বাদে মীরা ফের কথা বলল। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া, মুখের কথায় বিষণ্ণতার স্বর।

মীরা বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। ওঁর অসুখ শুধু দেহের নয়। উনি আজকাল বড় বেশী ভাবেন।'

'কি ভাবেন ? যাদের ছেড়ে এসেছেন তাদের কথা কি ওঁর মনে হয় ?'

মীরা বলল, 'মনে হয় বই কি। সরাসরি চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, তাঁরাও কেউ লেখেন না। তবু অন্যভাবে তাঁদের খোঁজখবর আনান। তার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকেন। দেখ বাইরে থেকে এক কথায় একদিনে সব ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু ভিতর থেকে ছাড়তে হয় প্রতিদিনের চেষ্টায়।'

'তোমার হিংসে হয় না ?'

মীরা একটু হেসে বলল, 'হয় বই কি। তবে হিংসেয় একেবারে ফেটে মরিনে। কারণ তিনি শুধু তাঁদের জন্যেই ভাবেন না, আমার জন্যেও ভাবেন।'

'তোমার জন্যে আবার কি ভাবনা ?'

মীরা বলল, 'ভাবনা নেই ? ভাবেন, আমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলেন। শুধু বিদ্যার সাধনায় কি মানুষের সব সাধ মেটে ? মেয়েদের সব সাধ মেটে ?'

মীরা চোখ নামাল।

একটু বাদে আমি বললাম, 'তুমি কি তাহলে সুখী হওনি ?'

মীরা এবার ফের মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হেসে বলল, 'আশ্চর্য, এতক্ষণ আলাপের পর তোমার কি এই মনে হচ্ছে, আমি সুখী হইনি, আমি দুঃখে আছি ?' কথা শেষ ক'রে মীরা আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল।

আর তার সেই হাসি দেখতে দেখতে আমার নতুন করে মনে হল, সুখের আর এক অর্থ দুঃখ বহনের শক্তি।

ভাদ্র ১৩৬১

লেখিকা

এই সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতটি আমার বন্ধু নীলাম্বরের মা সৌদামিনী সেনের। গত ১০ই ভাদ্র একাত্তর বছর বয়সে কলকাতার তালতলা লেনের বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি শোক-সন্তপ্ত বৃদ্ধ স্বামী, দশটি ছেলেমেয়ে, গুটি তিরিশেক নাতি নাতনী রেখে গেছেন। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে আরও দশজন গৃহস্থ বধূর যেভাবে দিন কাটে এই মহিলাটির দীর্ঘ জীবনও সুখে দুঃখে সেই ভাবেই কেটেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মৃত্যুকেও সুখের মরণই বলা যায়। পাকা চুলে সিঁদুর পরে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রদের সামনে তিনি যে চোখ বুজতে পেরেছেন বধূজীবনে এর চেয়ে বড়ভাগ্যের আর কি আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী সবাই এই এক কথাই বলছেন।

ঘটনার দু'দিন পরে শোকার্ত নীলুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমিও তাকে ওই গতানুগতিক ভাষাতেই সান্ত্বনা দিলাম—'তোমাদের সবায়ের সামনে তিনি যে যেতে পেরেছেন'—ইত্যাদি।

নীলাম্বরের গায়ে সাদা চাদর, চুল উস্কোখুস্কো, হাতে একখানি আসন। বাইরের ঘরের তক্তপোশের ওপর সেটুকু পেতে মুখোমুখি বসে নীলাম্বর আমার কথা সমর্থন ক'রে বলল, 'হ্যাঁ তিনিই ভালোই গেছেন।' নীলাম্বরের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। সে তার মায়ের তৃতীয় সন্তান, তার বড় আরো দুই দিদি আছেন, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে নীলাম্বর স্বল্পভাষী স্বভাব-গম্ভীর মানুষ। সুখে দুঃখে ওকে কোনদিন বিচলিত দেখিনি। আজও দেখলাম না।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসীমা কি যাওয়ার সময় কিছু ব'লে যেতে পেরেছেন? কোন শেষ ইচ্ছে-টিচ্ছে। নীলাম্বর মাথা নেড়ে বলল, 'না, সে সব কিছু নয়। তবে একটা ঝাঁপি তিনি রেখে গেছেন কল্যাণ। দেখবে?' বললাম, 'আনাওনা।'

নীলাম্বর তার আটবছরের মেয়েকে ডেকে বলল, 'মায়া, তোর মাকে বল, মা'র সেই ঝাঁপিটা এখানে নিয়ে আসুক। কল্যাণকে দেখাই।'

একটু বাদে সেকেলে বড়ো পুরোন একটা সস্তার ঝাঁপি হাতে নীলাম্বরের স্ত্রী সুরমা এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে নীলাম্বর সুন্দরীভার্যা। গুটি চারেক ছেলেমেয়ের মা হওয়ার পরেও সুরমার লাবণ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। স্বামীর গুরু দশার অংশ নিয়েছে সুরমা। লাল পেড়ে কোরা মিলের শাড়িতেও তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ যেন একটা স্তব্ধ গম্ভীর বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে তার রূপে। হঠাৎ আমার মনে হ'ল মধ্যযৌবনে নীলাম্বরের মাও কি এইরকমই ছিলেন।

একটা টুল টেনে আমাদের সামনে বসল সুরমা। তারপর ঝাঁপিটা তক্তপোশের ওপর রেখে ছোটো একটা চাবি স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খোল।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমিই খুলে দেখাও।'

সুরমা তালা খুলে ঝাঁপির ডালা উঁচু ক'রে তার ভিতর থেকে শাশুড়ীর সম্পত্তি একে একে বার ক'রে দেখাতে লাগল।

প্রথমেই বেরোল চটি একখানি ছাপা কবিতার বই, নাম—'সুরের ছোঁয়া।' তারপর মোটা একখানি খাতা। বিবর্ণ পাতাগুলি ভ'রে কাটাকুটি ভরা অনেকগুলি কবিতা। তারপর বাকি পাতাগুলি একেবারে সাদা। অতি যত্নে নীল রঙের একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে রাখা রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের ছোট একখানি ফটো। একটি নেকড়ায় বাঁধা অনেকগুলি তামার পয়সা, ভিতরের কালি শুকিয়ে যাওয়া একটি দোয়াত, একটি সাধারণ সরু কাঠের হ্যাণ্ডেলের কলম, সাদা খামের মধ্যে একখানি চিঠি।

চিঠিখানির কথা পরে বলব। আগে শ্রীমতী সৌদামিনী সেন প্রণীত সেই চটি কবিতার বইখানির কথা বলে নিই।

ফুল পাখী নদী পর্বত নিয়ে কিছু নিসর্গ কবিতা, দাম্পত্য সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের কথা, পয়ার ছন্দে প্রথম সন্তান লাভের আনন্দ বর্ণনার প্রয়াস, শেষের দিকে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহমূলক কিছু গান—এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে সবই স্থান পেয়েছে। সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষা। মাঝে মাঝে ছন্দের ভুল আছে। ছাপার ভুলও যথেষ্ট, ভাবে ভঙ্গিতে মৌলিকতা বিশেষ কিছু নাই। পঞ্চাশবছর আগের কয়েকজন জনপ্রিয় কবির প্রভাব কবিতার বইখানিতে সুস্পষ্ট।

নেড়েচেড়ে বইটি রেখে দিয়ে নীলাম্বরের দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমার মা লেখিকা ছিলেন, একথা অনেকদিন আগে তুমি একবার আমাকে ব'লেছিলে আমার মনে পড়ছে।'

নীলাম্বর একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক পুরোপুরি লেখিকা বললে হয়তো ঠাট্টা করা হবে। লিখতে আর পারলেন কই। তবে শিল্প সাহিত্যকে মা শেষদিন অবধি ভালোবাসতেন কল্যাণ, আমরা যেটুকু যা পেয়েছি, যা হয়েছি তা আমাদের মা'র জন্যেই।'

নীলাম্বরদের মতো এমন একটি শিল্পী পরিবার সত্যিই খুব কম দেখা যায়। নীলাম্বর নিজে নামকরা প্রাবন্ধিক, ওর মেজো ভাই সরোজ সেতারে সুদক্ষ, সেজো ভাই গায়ক, তার পরের এক ভাই চিত্রশিল্পী; বোনদের মধ্যেও দুজন গায়িকা আছেন। অবশ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই যে সমান কৃতী তা নয়। কয়েক ভাই এই শিল্পের ধারা থেকে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কি চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রেও ছিটকে পড়েছে, কিন্তু শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে প্রত্যেকেরই সহজাত রুচি আর আগ্রহ উৎসাহ রয়ে গেছে।

পরিবারটির এই বিশিষ্টতা আজ যেন আমার নতুন ক'রে চোখে পড়ল। এত শিল্পানুরাগ তা হ'লে ওরা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। একি শুধু বংশানুক্রমিক ফল, না ওদের মা হাতে ধরে ওদের শিখিয়েছেন, এক একটি ছেলে-মেয়েকে শিল্পের বিভিন্নরূপে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, জানবার ভারি কৌতূহল হ'ল আমার। খুব যে সদুত্তর পেলাম তা নয়। এই শিল্পপ্রীতি আর অনুশীলনের প্রবৃত্তি ওদের মধ্যে নানা কারণে এসে থাকবে। নীলাম্বরদের বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ কুমিল্লা শহরে কাটে, শহরটি তখনকার দিনে শিল্প সাহিত্যচর্চার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। বিশেষ ক'রে সঙ্গীত চর্চার তো বটেই। নীলাম্বরের স্কুল কলেজের মাস্টারমশাইদের, কি ওর সহপাঠী সমবয়সীদের মধ্যেও সাহিত্য, সঙ্গীতের অনুশীলন তখন প্রচুরভাবে চলত; সেই পরিবেশ থেকেও ওরা প্রেরণা পেয়ে থাকবে। শুধু মা নয়, মাতৃভূমিও ওদের মনে শিল্পরস জুগিয়েছে, সৃষ্টি প্রবৃত্তির সহায়তা ক'রেছে। সৌদামিনী সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়ে, গুনগুন ক'রে এক আধটু গান গাইতেও জানতেন; ছেলে মেয়েদের হাতে ধ'রে শেখাবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর ছিল না। কিন্তু ছেলে মেয়েদের উৎসাহ দিতেন প্রচুর একথা ঠিক। অর্থ, বিষয়-আশয় এমনকি স্কুল-কলেজের সার্থক ছাত্রজীবনের চেয়েও ছেলেদের এই শিল্পবোধ আর শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বেশি মূল্য দিতেন।

এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর নিত্য বিরোধ লেগে থাকত।

হরিমোহন রাগ ক'রে বলতেন, 'তুমিই ছেলেগুলির মাথা খেলে। তোমার কি ইচ্ছে ওরা যাত্রার দলের, কবির দলের দোহার আর বেহালা বাজিয়ে হোক?'

সৌদামিনী জবাব দিতেন 'আমাকে মিথ্যে দোষারোপ করছো। ওরা ওদের ইচ্ছানুযায়ী চলে, যাতে আনন্দ পায় তাই করে। ওরা যদি হ'তে না চায় তুমি শত চেষ্টা করলেও কি ওদের জজ ম্যাজিস্ট্রেট বানাতে পারবে?'

হরিমোহন বলতেন, 'জজ ম্যাজিস্ট্রেট না হোক লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি-বাকরি ক'রে খাক। দশজন ভদ্রলোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে বসতে শিখুক। কিন্তু তুমি যা ওদের ক'রে তুলছো তাতে সব বাবরি রেখে লুঙ্গি পরে বিড়ি টানবে আর পাড়াময় শিস দিতে দিতে তেরছা চোখে তাকাবে পরের ঘরের মেয়ে-ছেলেদের দিকে। এ জীবনে রসের সাধক কম দেখলাম না। পরিণাম তো ওই। বেদের ঘরের ছেলে। ছি ছি ছি—আমার বংশ থেকে একটা ডাক্তার বেরোল না, উকিল বেরোল

না। এর জন্যে তুমিই দায়ী বড় বউ।'

সৌদামিনী প্রতিবাদ করতেন 'আমিই দায়ী ! আমার বুঝি ইচ্ছে করেনা ওরা ভালো হোক, বড়ো হোক ? ওরা কি আমার পেটের ছেলে না আমার সতীনের পেটের ?' তারপর খোঁটা দিয়ে বলতেন, 'ডাক্তারী ওকালতী পড়াতে পয়সা লাগে।'

নীলাম্বরেব বাবা ছিলেন জজ কোর্টের পেশকার। প্রথম জীবনে পয়সা নেহাৎ কম রোজগার করেননি। শেষের দিকে সন্তান বাহুল্যে বেশি বিব্রত হয়ে পড়লেও দু'একজনকে ডাক্তার মোক্তার করবার সামর্থ্য তাঁর ছিল। কিন্তু কোন ছেলেরই সেদিকে ঝোঁক গেল না। এই নিয়ে আফসোসের তাঁর অন্ত ছিল না। শেষ বয়স অবধি স্ত্রীর সঙ্গে এ জন্যে তিনি ঝগড়া করেছেন। সে ঝগড়া নীলাম্বব তো বটেই তার ছোট ভাই বোনরা পর্যন্ত বড়ো হয়ে শুনেছে। কতদিন যে হরিমোহন রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেবিয়ে গেছেন, আর সৌদামিনী উপোস ক'রে রয়েছেন তার ঠিক নেই ?

নীলাম্বর তার বাল্য কৈশোরের স্মৃতিভাণ্ডাব থেকে মায়ের কথা তুলে আনতে লাগল। স্বল্পভাষী নীলু আজ বড়ো মুখব হ'য়ে উঠেছে। সুরমাও এ বাড়ীতে বউ হ'য়ে এসে অবধি শাশুড়ীর জীবনেব যেটুকু দেখেছে শুনেছে তাব থেকে কিছু কিছু তথ্য জোগাল।

আমি এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওঁব লেখার ঝোঁকটা কি ক'রে এসেছিল আর তা উনি ছাড়লেনই বা কেন।'

লেখার ঝোঁক কি ক'রে যে আসে তা বলা বড়ো সহজ নয়। নিজেব কথাই বলা যায না আর তো অন্যের। মায়ের লেখাব প্রবৃত্তি কি ক'রে এল তা নীলাম্বর ভালো ক'রে জানে না। নীলাম্ববের দূর সম্পর্কেব এক মামার লেখার অভ্যাস ছিল। নিজের লেখা বই ছাড়াও তিনি তখনকাব দিনেব বিখ্যাত লেখকদেব কাব্য উপন্যাস সৌদামিনীকে উপহাব দিতেন। সৌদামিনী তাঁব সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে অবসর সময়ে সেগুলি পড়তেন। সেগুলি ফুবিয়ে গেলে পাড়া-পড়শীদের কাছে নতুন বইয়েব খোঁজ করতেন। যখন পেতেন না, পুবোন বইগুলিই ফের নতুন ক'রে পড়া শুরু কবতেন। এমনিভাবেই বোধ হয় তাঁব একদিন লেখাব শখ হ'ল। পড়াব সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখতেও আরম্ভ কবলেন। কখনো বা লক্ষ্মীব আমলের পিতলেব দীপেব কাছে বসে, কখনো বা স্বামী যখন পাড়ায় কবিরাজ বাড়ীতে দাবা খেলায় মত্ত সেই ফাঁকে হ্যারিকেন জ্বেলে ছন্দ মেলাতে বসতেন সৌদামিনী। যে মিল সংসাবে স্বামীব মনের সঙ্গে হ'ল না সেই মিল যদি ছন্দে গেঁথে তোলা যায়। কোনদিন ঢেঁকিশালায়, কোনদিন রান্নাঘবে, উনুনেব কাছে সৌদামিনীব কাব্যসাধনা চলত।

একদিন খেতে বসে হবিমোহন হেসে বললেন, 'বড় বউ আজ ডালে ঝোলে কোনটাতেই নুন লঙ্কা দাওনি, তোমাব লেখা পদ্যেব গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছো। কিন্তু তাতে তো আব ঝোলের স্বাদ মেলে না। গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যাব বিদ্যায়। এই বিদ্যাবতী স্ত্রীকে আমি যে কোথায় রাখি কাঁধে না পিঠে, তা আব ভেবে পাইনে।'

ভারি লজ্জা পেলেন সৌদামিনী। অনুতাপের সুবে বললেন, 'আর কোনদিন এমন হবে না, আমাকে মাপ কবো।'

কিছুদিনেব জন্য কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা বইল।

সেবার পুজোর ছুটিব আগে একজন শাঁসালো মক্কেলের কাছ থেকে হরিমোহনেব কিছু উপরি টাকা হাতে এল। খুশী হ'য়ে স্ত্রীকে বললেন, 'বড় বউ এসো তোমাকে এক ছড়া হাব গড়িয়ে দিই, কি বকম হাব তোমাব পছন্দ বলো। নাজিবের বউয়েব মতো বিছে হাব নেবে ?'

আঁচলটা মাথাব ওপর একটু তুলে দিয়ে স্বামীর দিকে হেসে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমাব একটা কথা রাখবে ?'

'বলো।'

সৌদামিনী লজ্জায় কুণ্ঠায় আবাব একটু হাসলেন, তারপর বলেই ফেললেন কথাটি, 'আমি হার চাইনে।

'তবে কি চাও ?'

'আমার কবিতাব বইখানা তোমাদের ওই শ্রীনাথ প্রেস থেকে ছেপে দাও।'

হরিমোহন ঠিক এক কথায় রাজি হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। তবে 'সুরের ছোঁয়া' পুজোর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। যে প্রেস থেকে নীলাম ইস্তাহার আর দাখিলা ছাপা হয় সেই প্রেস থেকে প্রথম কাব্য গ্রন্থ বেরিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলেন স্বামীকেই উৎসর্গ করবেন বইখানি। কিন্তু শেষে কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। ছি ছি ছি, বাপ মার হাতে গিয়েওতো এ বই পড়বে। তাঁরা কি ভাববেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই লেখক দাদা নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেই বইখানা উৎসর্গ করলেন সৌদামিনী। হরিমোহন এতে খুশী হ'লেন না, স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'তবে যে বলেছিলে আমাকে দেবে। টাকা দিলাম আমি আর বই উৎসর্গ করলে সেই পাতানো দাদার নামে। আমার চেয়ে নগেন বাবুই তোমাব কাছে বড়ো হলেন?' সৌদামিনী বললেন, 'ছি ছি ছি, ওসব কি বলছো। আমার চেয়ে বইখানাই তোমার কাছে বড়ো হ'ল। নিজেকে তো কোন জন্মে তোমার কাছে উৎসর্গ ক'রে রেখেছি।'

আবার জোয়াব লাগল কাব্যচর্চায়। নতুন বই প্রকাশ করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সৌদামিনী। শহরের অনেকেই তাঁব বইয়েব প্রশংসা করেছেন। এমন কি কলকাতার কয়েটি কাগজে পর্যন্ত সুখ্যাতি বেবিয়েছে। দ্বিতীয় বইখানি যাতে আরো পাকা হয় তার জন্যে নতুন উৎসাহে লেখা শুরু করলেন সৌদামিনী।

কিন্তু ততোদিনে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে কোলে এসেছে তাঁব। তাদেব মধ্যে একটি শুধু মাঝে মাঝে কোলে থাকে, গুটি তিনেক পিঠেব কাছে বিবক্ত করে, আর একটি হামাগুড়ি দিয়ে ঘর আব বারান্দা চযে বেড়ায়। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই যে--। একটি চাকর অবশ্য আছে। আদালতের পিওন। সে বাজারটুকু সেরে কর্তাব আগে আগেই কাজে বেরিয়ে যায়। সারাদিন সব এক হাতেই কবতে হয় সৌদামিনীকে। রান্না, খাওয়া, ঘর-সংসার গুছনো, ছেলে-মেয়েদের নাওয়ানো ঘুমপাড়ানো--দ্বিভূজা সৌদামিনীব দশভূজা হ'তে পারলে যেন ভালো হয়। আর সেই ফাঁকে ফাঁকে চলে কাব্য রচনা। তার জন্যে দশ হাত নয়--শুধু একটি হাতের দরকার আর একটিমাত্র মন---একাগ্র একনিষ্ঠ। দশদিকেব দশরকমেব চিন্তা কোথায় তলিয়ে যায়, ছেলে-মেয়ে স্বামী, সংসারেব বাঁধন কখন যে আলগা হয়ে খসে পড়ে তা টের পান না সৌদামিনী। শুধু একটিমাত্র চেষ্টায় তন্ময় হয়ে থাকেন। কি ক'রে মনের কথাকে ছন্দের বাঁধনে বাঁধবেন। কানের মধ্যে যা গুনগুন করে, মনের মধ্যে যা গুনগুন করে, কি ক'রে সেই গুনগুনানিটুকু কলমেব মুখে ভ'রে দেবেন।

একদিন সেই তন্ময়তার মুহূর্তে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। দেড় বছরেব মেয়ে হৈম হামাগুড়ি দিতে দিতে একেবারে গরম দুধের কড়ার মধ্যে গিয়ে পড়ল। চীৎকার শুনে কাগজ কলম ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন সৌদামিনী। মেয়েকে তুলে নিলেন কোলে। লবণ দিয়ে পোড়া জায়গাগুলি ঢেকে দিলেন। দুধ বেশি গরম ছিল না এই যা রক্ষা। তবু শিশুর হাত পায়ের খানিকটা খানিকটা পুড়ে ফোস্কা পড়ে গেল।

হরিমোহন বাড়ী ফিরে সবই জানতে পারলেন। তাঁব কাছে কোন কথা গোপন রইল না। কিছু গোপন করবার চেষ্টাও করলেন না সৌদামিনী। সব কথা স্বামীকে জানাবার পর বললেন, 'যা দুরন্ত হয়েছে ওরা।'

হরিমোহন গম্ভীরভাবে পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একজন একজন ক'রে পুড়িয়ে মারতে সময় লাগবে বড় বউ। তার চেয়ে এক কাজ করো। বাড়ীতে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দাও। এক সঙ্গে আমরা সবাই পুড়ে মরবো। তোমার পদ্য লেখার আর কোন বাধা থাকবে না।'

পাড়াব সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল। কেউ হাসল, কেউ টিটকিরি দিল। হৈমর পোড়া ঘা দিন পনেরোর মধ্যে শুকিয় গেল। কিন্তু সৌদামিনীব মনের ঘা কিছুতেই শুকোতে দিলেন না হরিমোহন। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ঠাট্টায় পরিহাসে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তা কেবল বাড়াতেই লাগলেন। সৌদামিনী একদিন শেষে আর না থাকতে পেরে বললেন, 'তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কবিতা লিখব না। তুমি আমাকে রেহাই দাও।'

তারপর আরও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে হ'ল সৌদামিনীর। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর বেরোল না।

রিটায়ার করবার পর কুমিল্লার বাসা তুলে দিয়ে হরিমোহন কলকাতায় চলে এলেন। ছেলেদের কর্মক্ষেত্র সেখানে, জামাই-মেয়েরাও বেশির ভাগ কলকাতায় থাকে।

লেখা ছাড়লেন সৌদামিনী, কিন্তু পড়া ছাড়লেন না। এখন আর তাঁর ভাবনা কি। ছেলে-মেয়েরাই তাঁর বই জোগায়। শুধু কাব্য, উপন্যাস, গল্প নাটক নয় ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী—হাতের কাছে যা পান তাই পড়েন। মাঝে মাঝে নীলাম্বর তাঁকে ইংরেজী উপন্যাস বাংলা ক'রে শোনায়। বড়ো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তিনি উপন্যাস নাটকের আখ্যান আর চরিত্র নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন। এক নতুন মহাকাব্যের, এক নতুন রসের রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন সৌদামিনী। সেই রাজ্যের বাইরে দাঁড়িয়ে হরিমোহন একা একা জ্বলতে থাকেন। এক একদিন বলেন, 'তুমি আমার ওপর শোধ নিচ্ছ বড় বউ, তাই না?'

সৌদামিনী হেসে বলেন, 'ওমা এর মধ্যে আবার শোধ নেওয়ার কি দেখলে? তুমিও এসোনা, বসোনা আমাদের সঙ্গে।'

হরিমোহন বলেন, 'থাক থাক।'

ছেলে মেয়েরা বড়ো হ'ল, পুত্রবধূরা এল জামাইরা এল, নাতিনাতনী হওয়া শুরু করল তবু ওঁদের মধ্যে ঝগড়ার শেষ হ'ল না। রুচির ব্যবধান, মতের ব্যবধান বেড়েই চলল। এখন আর কাব্য লেখা নিয়ে নয় অতি তুচ্ছ সামান্য কারণ নিয়ে, সাধারণ সাংসারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নীলাম্বর মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে। কখনো মাকে ধমকায়, কখনো বাবাকে। বলে, 'তোমরা তোমাদের নাতিনাতনীদের চেয়েও অবুঝ হয়ে উঠলে দেখছি। বাজার থেকে আজ আলু না এনে পটল আনা হয়েছে। তাই নিয়ে তোমাদের এতো ঝগড়া?'

আসলে বিষয়টা উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'ল কলহ। দাম্পত্য জীবনের তাই এখন ওঁদের একমাত্র যোগসূত্র।

মাঝে মাঝে পুরোপুরি অসহযোগ চলে। ছোট নাতিনাতনী নিয়ে আলাদা ঘরে থাকেন সৌদামিনী। ভিন্ন ঘরে হরিমোহনের ঘুম আসে না। বার বার ওঠেন, তামাক সাজেন আর তামাক খান। তার হুঁকো টানার শব্দ শেষ রাত অবধি শোনা যায়। আর বাইরে থেকে সৌদামিনীর ঘরে দেখা যায় ক্ষীণ আলোর রশ্মি। নাতিনাতনীদের ঘুম পাড়িয়ে তিনি মৃদু দীপের আলোয় রাতের পর রাত বই পড়ে কাটাচ্ছেন।

কিন্তু এই বই পড়াতেও একদিন ব্যাঘাত ঘটল, দুটি চোখেই ছানি পড়ল সৌদামিনীর। নীলাম্বর হাসপাতালে পাঠিয়ে অপারেশন করিয়ে আনলো। কিন্তু কি এক চিকিৎসা বিভ্রাটে দু'চোখের দৃষ্টিশক্তিই হারালেন সৌদামিনী।

হরিমোহন বললেন, 'বেশ হয়েছে। খুব মজা দেখছি আমি। এবার দেখবো কতো বই পড়তে পারো।'

মা'র জন্যে যখন তাঁর দোতলার সেই কোণের ঘরটায় বিছানা পাতবার ব্যবস্থা করছিল নীলাম্বর, চটি পায়ে হরিমোহন এসে সামনে দাঁড়ালেন, সুরমাকে ডেকে বললেন, 'বড় বউমা, বড় বউয়ের বিছানা একতলায় আমার ঘরে দাও।'

সুরমা একটু হেসে বলল, 'কিন্তু বাবা, আপনারা যে এক জায়গায় হলেই ঝগড়া করবেন।'

হরিমোহন বললেন, 'করি ক'রবো। তুমি ওকে একতলায় নামিয়ে দাও।'

সৌদামিনীর মত জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বললেন যে, তাঁর আপত্তি নেই, অন্ধের পক্ষে একতলার ঘরেই সুবিধে, বেশি ওঠা-নামা করতে হয় না।

অনেক দিন—অনেক বছর বাদে হরিমোহন আর সৌদামিনীর বিছানা একই ঘরে পাশাপাশি পড়ল, আগে নাতিনাতনীরা সৌদামিনীর কাছে থাকতো। এখন আর তারা রাত্রে তাঁর কাছে থাকতে চায় না। অন্ধ ঠাকুরমাকে দেখে তাদের ভয় হয়। হরিমোহনের কাছেও কেউ থাকে না, বুড়ো ঠাকুরদার মুখে তামাকের গন্ধ। গা থেকেও কি রকম একটা বোটকা গন্ধ বেরোয়। এতোদিন বাদে ফের দু'জনে কাছাকাছি হয়েছেন। মাঝখানে আর কেউ নেই, একজন আর একজনের একমাত্র

সঙ্গী। শেষের ছ'বছর সৌদামিনী এমনি অন্ধ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। হরিমোহনের শরীরও ভালো যায় না, জরা তো আছেই, মাঝে মাঝে জবজ্বারিও হয়। একদিন কলতলায় পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে তিনিও শয্যা নিলেন। দু'জনেই অসুস্থ, দু'জনেই অশক্ত, তবু ওবই মধ্যে একজন আর একজনের সেবা করেন। সৌদামিনী স্বামীর কোমরে তেল মালিশ ক'রে দেন, চোখে না দেখলেও দিব্যি পান ছেঁচেন, তামাক সাজেন। আর হরিমোহন জীবনে যা কোনদিন করেন নি — বই পড়েন, পড়ে শোনান স্ত্রীকে। সেই ছেলেবেলায় পড়া বই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত।

মাঝে মাঝে সংসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ লাগে। ভাইতে ভাইতে ঝগড়া হয়, জায়েতে জায়েতে কথা কাটাকাটি চলে। পুত্র পুত্রবধূর মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। দু'জনে শুয়ে শুয়েই মিটমাটের চেষ্টা করেন, এক আধটু ধমক দেন। কিন্তু কেউ শোনে না: আজ আর ওরা সংসার সমুদ্রের মাঝখানে নেই, তীরে এসে বসেছেন, সেখান থেকে বসে বসে দেখেন কতো ঢেউ ওঠে, কতো ঢেউ পড়ে, কতোজনে সাঁতরায়, কতোজনে হাবুডুবু খায়।

একটা শক্ত জ্বর থেকে ওঠার পর কানে ভারি খাটো হয়ে পড়েছেন হরিমোহন: জোরে চেঁচিয়ে না বললে কারও কথা শুনতে পান না। সৌদামিনী চেঁচান না, স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলেন: তিনি তো দেখতে পান না। কিন্তু ষোড়শী সপ্তদশী সব তরুণী নাতনীরা জানলা দিয়ে আড়চোখে দেখে আর মুখে রঙীন শাড়ীর আঁচল চেপে সরে যায়।

একদিন হরিমোহন বললেন, 'বড় বউ, তুমি আবার লেখ, পদ্য লেখ।'

সৌদামিনী হাসলেন, 'শোনো কথা, কি ক'রে লিখব। আমার কি চোখ আছে?'

হরিমোহন বললেন, 'আমার তো দু'টো চোখ আছে বড় বউ। নিকেলের চশমা জোড়া পরলে আমি এখনও দিব্যি দেখতে পাই। আমি তোমার কলম, আমি তোমার মুহুরী। তুমি বলে যাও আমি লিখে নিচ্ছি।'

সৌদামিনীর দু'টি দৃষ্টিহীন চোখ থেকে জলের ধারা বেরোয়।

হরিমোহন ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'তুমি কাঁদছো কেন বড় বউ।'

সৌদামিনী বলেন, 'এ আমার দুঃখের কান্না নয় গো তুমি যে কবিতা আমাকে শোনালে তার চেয়ে ভালো কবিতা আমি কোনোদিন লিখতে পারি নি।'

হরিমোহন বললেন, 'তুমি দু'লাইন দু'লাইন ক'রে মিলিয়ে বলো, আগে তো পারতে।'

সৌদামিনী মাথা নেড়ে বললেন, 'এখন আর পারি না। চোখ যখন ছিলো গোপনে গোপনে অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, লেখা আর আসে না, কেবল কাটাকুটি, কেবল কাটাকুটি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে আর পদ্য মেলাতে বলো না।'

মৃত্যুর দু'দিন আগে সৌদামিনী স্বামীকে ডেকে বললেন, 'ওগো, সেই যে লেখার কথা বলেছিলে, লিখবে নাকি আজ?'

হরিমোহন কাগজ কলম নিয়ে জরাতুরা স্ত্রীর বিছানায় এসে বসলেন, ছেলেরা বউয়েরা নাতিরা নাতনীরা সবাই দোরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে গেল সৌদামিনী বলছেন, আর হরিমোহন লিখে নিচ্ছেন, দুদিনের মধ্যে বলাও ফুরোল না, লেখাও শেষ হ'ল না। দু'দিন পরে সব শেষ হল।

সৌদামিনীর শেষ লেখা কবিতায় নয়, গদ্যে। অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীর কম্পিত হাতের জড়ানো জড়ানো অসমান দুর্বোধ্যপ্রায় অক্ষরগুলির মধ্যে নিজের শেষ মনোভাব ব্যক্ত ক'রে গেছেন সৌদামিনী। তিনি লিখেছেন:

আমার কল্যাণীয়, কল্যাণীয়াগণ,

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। সে জন্য তোমরা কেউ দুঃখ করিওনা, একথা বলিব না। দুঃখ তো পাইবেই। ছাড়িয়া যাইতে দুঃখ আমিও তো কম পাইতেছি না। নিজের চোখের জলের ভিতর দিয়া তোমাদের সেই কচি কচি মুখগুলি আমি ফের দেখিতে পাইতেছি। যে মুহূর্তে আমি চলিয়া যাইব জলভরা চোখে তোমরাও আমাকে নতুন করিয়া দেখিবে, নতুন করিয়া পাইবে। দুঃখের ভিতর দিয়া, ব্যাথার ভিতর দিয়া শৈশবের কৈশোরের কত মধুর কথাই না

তোমাদের মনে পড়িবে। মনে পড়িবে আবার মন হইতে মিলাইয়াও যাইবে। ইহাই নিয়ম।

এ যাওয়া আমার বড় সুখের। সিঁথিতে স্বামীর সোহাগের সিঁদুর পরিয়া তোমাদের সুস্থ সবল কর্মরত দেখিয়া যাইতেছি। এমন যাওয়া সংসারে কয়জন যাইতে পারে। আমার কোন সাধই অপূর্ণ নাই। ছেলেবেলা হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, সুর ভালবাসিতাম, রং ভালবাসিতাম। তোমরা এক একজন আমার এক এক সাধ মিটাইয়াছ। আমি তো নিজে কিছুই হইতে পারি নাই, করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি আমার নীলুর কলম দিয়া লিখিয়াছি, বিলুর আঙ্গুলে সুর সৃষ্টি করিয়াছি, দিলুর তুলি দিয়া ছবি আঁকিয়াছি, বেলা রমার কণ্ঠে গান গাহিয়াছি। তোমাদের সকলের ভিতর দিয়া আমি সব হইয়াছি, সব পাইয়াছি। কিন্তু যাওয়ার আগে আর একটি কথা যদি না বলিয়া যাই আমার সব অব্যক্ত থাকিবে। সে কথা আমি স্বামীর কাছেও গোপন করি নাই, তোমাদের কাছেও গোপন করিব না। সে এক হতভাগিনী বন্ধ্যা নারীর কথা, লেখিকা সৌদামিনীর কথা। যে তোমাদের ভিতর দিয়া সব পাইয়াছে সে তোমাদের মা। সে সেই সৌদামিনী নয়— যে একখানি কাঁচা বয়সের অপটু হাতের কবিতার বই রাখিয়া গেল, আর কিছুই দিয়া যাইতে পারিল না, আর কিছুই পাইয়া যাইতে পারিল না, তাহার দুঃখের শেষ নাই। তাহার দুঃখ কে ঘুচাইবে। স্বামীর প্রেমে যাহার পাওয়া হয় না, কৃতী সন্তানের সফলতায় যাহার ফললাভ হয় না, যাহাকে কেবল অক্ষর ধরিয়া ধরিয়া অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া পাইতে হয় তাহার না পাওয়ার দুঃখ কে মিটাইবে বল।

তাই আমি বড় দুঃখ লইয়া যাইতেছি। এ যাওয়া আমার বড় দুঃখের যাওয়া। শুধু সান্ত্বনা এই তোমরা প্রত্যেকেই শিল্পী, তোমরা প্রত্যেকেই এ দুঃখ বুঝিবে, আর যশ অর্থ যতই পাও শিল্পে যখন স্বাদ জন্মিয়াছে হাজার পাওয়ার মধ্যে জীবনে ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের না পাওয়ার দুঃখ পাইতে হইবে। কিন্তু সেই দুঃখকে ভয় করিও না। ভয় করিয়া আর এক দুঃখিনীর মত নিজের পথ ছাড়িয়া দিও না।

ইতি
আশীর্বাদিকা
শ্রীসৌদামিনী সেন

ভাদ্র ১৩৬১

মলাটের রঙ

হেদুয়ার কাছে সেদিন দেখা হয়ে গেল পুরোন সহপাঠী বন্ধু যতীশ দত্তর সঙ্গে। সেও আমাকে দেখে থেমে দাঁড়াল, বলল, "আরে কল্যাণ তুমিও যে এদিকে?"

বললাম, "এই হরতকীবাগান লেনের একটা প্রেসে এসেছিলাম। সে থাকগে, কিন্তু তোমার বয়স কি কমছে না বাড়ছে?"

যতীশ হেসে বলল, "কেন বলতো!"

বললাম, "এই দশ বছরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। ঠিক পঁচিশ বছরের সেই ছিমছাম যুবকটি রয়ে গেছ।"

যতীশ খুসি হয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল, "ঠিক তা নয়। অনেক বদলেছি হে। এর মধ্যে কত রকমের কত পরিবর্তন হল। বিয়ে বা ছেলেপুলে—হিসেব দিতে বললে একটা লম্বা ফিরিস্তি হয়ে যায়। তবে আমাদের পরিবর্তনটা তো ঠিক মেয়েদের পরিবর্তনের মত নয়। আমাদের রূপান্তর ওদের মত অমন বেশে বাসে ধরা পড়ে না।"

সামনের একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে উঠলাম। বন্ধু চা সিগারেটে আমাকে আপ্যায়িত করল।

বললাম, "কথায় কথায় মেয়েদের তুলনা টেনে আনার অভ্যাসটিও তোমার সেই আগের মতই আছে দেখছি।"

যতীশ স্বীকার ক'রে বলল, "তা আছে, মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল যেদিন যাবে সে দিন তো

একেবারে মরে যাব হে। বয়স হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে গিন্নীটিও ভারি কড়া। বাইরের অন্য কোন মেয়ের কাছে ঘেঁষতে আর বড় একটা সাহস পাইনে। এখন শুধু চোখ দিয়ে দেখি, আর মুখে তাদের রূপগুণ কীর্তন করি।"

একটু বেশি জোরে কথা বলে যতীশ। আশপাশের টেবিলের ভদ্রলোকেরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কখন কি বেফাঁস বলে ফেলে। ওকে নিয়ে বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকা নিরাপদ নয়।তাই বেরিয়ে পার্কের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম।

রাত প্রায় আটটা বাজে। বায়ুসেবীদের ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে আলোর প্রতিবিম্ব। পুরোন বন্ধুকে পাশে রেখে কর্মব্যস্ত জীবনের এমন কয়েকটি থেমে থাকা মুহূর্তের স্বাদ মাঝে মাঝে বেশ নতুন লাগে।

এক সময় বন্ধুকে বললাম, "হ্যাঁ, মেয়েদের বেশবাস আর রূপান্তরের কথা কি বলছিলে।"

যতীশ হেসে বলল, "খুব সাধুপুরুষ! কথাটি বুঝি তোমার মাথার মধ্যে এখনো ঘুরছে। আমাদের অফিসের অঞ্জলির কথা বলছিলাম। তুমিতো দশ বছরের মধ্যে আমার কোন পরিবর্তনই দেখলে না, আর আমি এই চার পাঁচ বছরে তার কতরূপ কত রূপান্তরই না দেখলাম।"

কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বললাম, "ব্যাপারটা কি।"

যতীশ হেসে বলল, "ভারি গরজ যে। তেমন জমকালো কোন গল্প নেই। তোমার কোন পুজো সংখ্যার কাজে লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি শুধু চোখে দেখা কয়েকটি ছবির কথা বলব, গল্প বলব না।"

আমি অধীর হয়ে বললাম, "আচ্ছা বলহে বল, যা দেখেছ তাই বলে যাও, গৌরচন্দ্রিকা আর বাড়িয়ো না।"

ধমক খেয়ে যতীশ এবার সুরু করল: "আমাদের ম্যাঙ্গো লেনের পাবলিসিটি ব্যুরোর ছোট্ট অফিসটায় তুমি তো আর বছর পাঁচ ছয়ের মধ্যে যাওনি। যাবে কেন, বড় বড় অফিসের সঙ্গে তোমার আজকাল দহরম, মহরম। কিন্তু দয়া করে যদি আমাদের গরীবদের সেই ছোট অফিসটায় মাঝে মাঝে যেতে ছবিগুলি তোমারও চোখে পড়ত। মনে আছে বোধ হয় পাটকেলে রঙের ফ্ল্যাটবাড়িটার দোতলায় পশ্চিম দিকের দেড়খানা ঘর নিয়ে আমাদের সেই অফিস। আধখানায় থাকেন আমাদের মনিব রামশঙ্কর রায়। একাধারে তিনিই কোম্পানীর সেক্রেটারী, ম্যানেজার আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। আর বড় ঘরটায় বসি আমরা পাঁচজন কেরাণী। দু'জন বিজ্ঞাপনের কপি লিখি একজন স্কেচ আঁকি, একজন টাকা আনা পাইয়ের হিসাব মেলাই, আর একজন চিঠিপত্র টাইপ করি, বড়বাবুর ডিকটেশান নিই। পাঁচ বছর আগে এই শেষের কাজটা ছিল সতীশ সমাদ্দারের। মোটা সোটা নাদুস নুদুস চেহারা। বড়বাবুর ঘর থেকে ডাক এলে সে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ত। চার পাঁচখানা চেয়ার টেবিলে ডিঙ্গিয়ে কাঠের পার্টিসনের ওধারে বড়বাবুর ঘরে যেতে তার বড় কষ্ট হত। তার মেদবাহুল্যের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসতাম। বলতাম, 'কি খেয়ে এত মোটা হচ্ছ হে সতীশ। উপুরি টপুরি মিলছে না কি কিছু?'

যাহোক কিছুদিন বাদে তার কষ্টের অবসান হল। ক্লাইভ রোয়ের বড় বড় হলওয়ালা এক অফিসে সে চান্স পেয়ে চলে গেল। তার জায়গায় এসে বসল একটি রোগা ছিপছিপে মেয়ে। অঞ্জলি! অঞ্জলি সেন। আমাদের রামশঙ্কর বাবুরই নাকি ছেলে বেলার কোন এক মাস্টারমশাইর মেয়ে। আই এ পর্যন্ত পড়েছে। কলেজ ষ্ট্রীটের কোন একটা কমার্শিয়েল স্কুল থেকে ছ'মাসের কোর্সে টাইপরাইটিং শিখেছে। মাষ্টার মশাই নাকি তাঁর পুরোন ছাত্রের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন মেয়ের জন্যে এই চাকরীটুকু জোগাড় করতে।

যাই হোক, অঞ্জলি এসে বসল আমাদের সামনের টেবিলে, পশ্চিমের জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। আমরা ওর দিকে তাকাই না। যে যার কাজ কর্ম নিয়ে থাকি। তবু চার জোড়া চোখের কোন না কোন একটি জোড়া ওর ওপর গিয়ে পড়ে। চোখাচোখি হবার ভয়ে অঞ্জলি প্রায় সব সময় মাথা নীচু করেই থাকে। ওদিকে তাকালেই সবচেয়ে চোখে পড়ে ওর কালো চুলের মাঝখানে সরু একটি সাদা সিঁথি। পরণে সস্তাদামের একখানি ফিকে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ী। তা গায়ের রঙ ফর্সা থাকায়

মন্দ মানায়নি। গলায় এক চিলতে সরু হার, হাতেএকগাছি করে লাল রঙের প্ল্যাষ্টিকের'
কোথাও কোন আভরণ নেই। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া জীর্ণ। অঞ্জলির আপাদকমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ওর বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাটা দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। তার জন্যে আন্দাজ অনুমানের দরকার হয় না।

অঞ্জলির টাইপরইটারে খটাখট্ শব্দ হয়। ওর মুখে কোন শব্দ নেই। চুপচাপ কাজ ক'রে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বড়বাবুর ডাক পড়লে চেয়ার ছেড়ে তড়াক ক'রে উঠে একেবারে হরিণীর মত ছুটে যায়।

আমার পাশের পরেশ বাঁড়ুজ্যে আমার গা টিপে দিয়ে বলে, 'দেখেছ প্রভুভক্তি। এ মেয়ে চাকরিতে উন্নতি করতে পারবে।'

আর্টিষ্ট সুরেন সিং এখনো বিয়ে থা করে নি, ওর বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে। প্রভুর ওপর হিংসেটা তারই একটু বেশি। —'ওঘরে অতই যদি ঘন ঘন দরকার তাহ'লে চেয়ার খানা একেবারে স্থায়ীভাবে ওখানে নিয়ে পাতলেই হয়।'

কপি লিখতে লিখতে পরেশ বাঁড়ুজ্যে জবাব দেয়, 'আরে ভাই, একটু আড়াল না রাখলে কি চলে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আসন পেচকদের পিঠে, শুধু সিংহাসন নারায়ণের গোলকে।'

অঞ্জলির বয়স একুশ বাইশের বেশি নয়, আর রামশঙ্করবাবু চল্লিশের ওপরে। বিবাহিত! চার পাঁচটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তবু তাঁর সঙ্গে অঞ্জলির নাম জড়িয়ে আমরা ওর অসাক্ষাতে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করি। কিন্তু ওর সেই মাথা নীচু করা মূর্তিটির দিকে যখন আমরা তাকাই, আমাদের মুখে আর কথা সরে না। নিজেদের বাচালতায় আমরা নিজেরাই লজ্জা পাই।

মাইনে পেয়ে আমরা কেউ নতুন গেঞ্জি কিনেছি, কারো বা জুতো কেনবার সামর্থ্যও হয়েছে। কিন্তু ওর পারিবারিক চাপ কি এতই বেশি যে সেই পুরোন শাড়ী আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়াও বদলাতে পারল না।

ক্রমে আমাদের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় হল।

এক সঙ্গে কাজ করতে করতে যেমন হয় তেমনি। পরেশ একদিন বলল, 'আপনার কোন অসুবিধে হলে বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

অঞ্জলি আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'লজ্জার কি আছে। আপনারা আমার দাদার মত। আপনারা আমাকে আপনি আপনি বলেন তাতেই বরং লজ্জা পাই। আপনারা আমার নাম ধরে ডাকবেন, তুমি বলবেন।'

আমরা সবাই থ'। এক সঙ্গে এত কথা অঞ্জলি এর আগে বলেনি। টিফিনের সময় বাথরুমের সামনে পরেশের সঙ্গে দেখা, হেসে বললাম, 'আরে ভাবনা কি, তুমি বলবার অনুমতি তো পেয়েই গেলে।'

পরেশ বলল, 'আরে দূর। অমন একতরফা তুমি বলায় কি কোন সুখ আছে? আমি যাকে তুমি বলি, তাকে তুমি বলাই।'

বললাম, 'কিন্তু এখানে তেমন দোতরফার সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। বড় শক্ত ঠাঁই।'

পরেশ বলল, 'তুমি দেখি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠেছ। আর তোমাকে তো বাদ দিয়ে বলেনি, তোমাকেও দাদা বলেছে।'

বললাম, 'বলুক ভাই, বলুক। তরুণী মেয়েদের মুখে এখনো যে কাকুবাবু, মামাবাবু শুনতে হচ্ছে না এতেই আমি খুসি।'

এ্যাকাউনটাণ্ট শশাঙ্ক সরকারের লক্ষ্য টাকা আনা পাইয়ের দিকে। মাথায় টাক পড়েছে, পাঞ্জাবী উঁচু হয়ে উঠে নোয়াপাতি ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি গেছে বয়স। অঞ্জলি তাকে দাদাই বলুক আর পিসেমশাই বলুক তার কিছুতে আপত্তি নেই। কোন বিলের কোন তহবিলের টাকা আগাম খরচ করে ফেললে বেশি জবাবদিহি করতে হবে না, শশাঙ্ক সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমি, পরেশ আর সুরেন তো তার মত কাঞ্চনের ছোঁয়া পাইনি, তাই আমরা বে-হিসেবী কিছু করতে পারি না পারি, বোল-চালটা খুব ঝাড়ি।

সুরেনের বেলায় কিন্তু সম্বোধন পাল্টাল না। অঞ্জলি তাকে সুরেনবাবু বলে। তাকে নাম ধরে ডাকে না, একটি সর্বনামে ডাকে, আপনি।

কথাবার্তার ধরণে মনে হয় সে যেন অঞ্জলিব সবচেয়ে আপন। এই পক্ষপাতটা স্বাভাবিক হলেও আমার আর পরেশের কাছে সুখকব মনে হয় না।

যাই হোক, তৃতীয় চতুর্থ মাসের মাইনে পাওয়ার পর অঞ্জলি চাঁপা রঙের একখানা নতুন শাড়ী কিনল, স্যাণ্ডেল জোড়াও পাল্টে নিল। আরো মাস কয়েকে বাদে সে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল। আজকাল বড়বাবু ডাকলে হরিণীর গতিতে ছোটে না, মরালের গতিতে চলে। আমাদের সঙ্গে হেসে একটু রসিকতাও করে। পরেশকে একদিন বলল, 'বউদি কেমন আছেন? কই একদিন তো যেতেও বললেন না, আলাপও করিয়ে দিলেন না তার সঙ্গে।'

বললাম, 'পরেশের সে সাহস নেই।'

অঞ্জলি বলল, 'কেন, এত ভয় কিসেব পবেশদা।'

পবেশ বলল, 'ভয় যে কিসের তা তুমি বুঝবে না অঞ্জলি। তোমাকে যদি বাড়ীতে নিয়ে যাই, আব বলি তুমি আমাদেব অফিসে কাজ কব, তাহলে এ অফিসে তোমাব বউদি আর আমাকে আসতে দেবে না, গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে মরলেও না।'

অঞ্জলি বলল, 'আপনাকে না আসতে দেওয়াই উচিত।'

বলে মুখ নীচু করে হাসতে লাগল।

আমরা তো অবাক। ও যে পরেশেব ঠাট্টায় যোগ দেবে তা আশা করিনি। হ'ল কি অঞ্জলির।

আরো দেখলাম চিঠিপত্র টাইপ করবাব ফাঁকে ফাঁকে ও আজকাল অফিসে বসেই নভেল পড়ে। তোমাদেব মত লেখকদেরই সব আধুনিক উপন্যাস। কি সব বস্তু তাতে থাকে তার নমুনা আমাব জানা আছে। পরেশও জানে। নভেলের মধ্যে গোলাপী রঙের দু' একখানি টিকিট গোঁজা থাকে। পড়া আর অপড়া অংশের সীমানা।

পরেশ আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'সাহস দেখেছ মেয়েটার?'

অফিসে বসে নভেল পড়বাব কথা আমরা কি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পেরেছি! যদি কেউ রিপোর্ট করে, একটুও ভয় নেই।'

হেসে বললাম, 'ওব বিরুদ্ধে কে রিপোর্ট করবে বলো? তুমি নও আমি নই, সুরেন তো নয়ই, এমন কি শশাঙ্ক সরকারেরও সে প্রবৃত্তি হবে না ও তা জানে, আর আমাদের বেয়ারা নিতাই ছোকরার কাণ্ড দেখছ? আমরা কেউ বাইরে থেকে পান সিগারেট আনতে বললে ও কি রকম গজ গজ করে। আর অঞ্জলি কিছু বললে হাসতে হাসতে চলে যায়।'

পরেশ বলল, 'আরে ভাই, সুন্দর মুখ শুধু চাকর বেয়ারা কেন, কুকুর বেড়ালেও চেনে। আমার তো মনে হয় এ অফিসের টেবিল-চেয়ারগুলিব পর্যন্ত অঞ্জলির ওপর পক্ষপাত আছে?'

পবেশ একদিন সুরেনকে সরাসরি চার্জ করে বলল, 'ওহে ছোকরা, অঞ্জলির হাতে ওসব অশ্লীল নভেল কে এনে দেয়? নিশ্চয়ই তুমি।'

সুরেন তুলি রেখে জোড় হাত করে বলল, 'না দাদা। আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। যদি হতো আপনার ঐ ধমক দেওয়া মুখে সন্দেশ গুঁজে দিতাম।'

আমাদের বিশ্বাস হয় না। সুরেন ভারি চালাক। চেহারাটিও কালোর ওপর বেশ চোখা। ও ডুবে ডুবে জল খায় কিনা কে জানে।

আর একদিন আমাদের চোখে পড়ল অঞ্জলির বইয়ের মধ্যেই শুধু গোলাপী রঙের টিকিট গোঁজা নয়, ওর খোঁপার মধ্যেও একটি গোলাপ গোঁজা রয়েছে। তার রং একেবারে টকটকে লাল। হৃদয়ের রস না মিশলে গোলাপের অমন রঙ হয় না।

আমরা আবার গিয়ে চেপে ধরলাম সুরেন সিংকে বললাম, 'সুরেন, ও নিশ্চয়ই তোমার গোলাপ।'

সুরেন বলল, 'না দাদা, আমার ভাগ্যে শুধু আপনাদের কথার কাঁটা। গোলাপ টোলাপ এই চার আঙুলের মধ্যে নেই।'

বলে কপালে হাত রাখল সুরেন।

আমাদের চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের হাসি অঞ্জলি লক্ষ্য করে থাকতো। ও এক ফাঁকে গোলাপটা খুলে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

বছর ঘুরে গেল। তারপর হঠাৎ দেখি একদিন আমাদের প্রত্যেকের টেবিলের ওপর অঞ্জলি একখানা করে চিঠি রেখে দিচ্ছে। সে চিঠির রঙও গোলাপী। ওপরে শঙ্খ আঁকা।

–বললাম, 'কি ব্যাপার।'

অঞ্জলি মৃদু হেসে চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, 'বাবা নিজে এসে বলতে পারলেন না। বুড়ো মানুষ। আপনারা কিন্তু সবাই যাবেন। দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন।'

আমরা চিঠিখানা পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। না, সুরেন সিং নয়। কোন একজন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে অঞ্জলির শুভপরিণয়টা হচ্ছে বাইশে আষাঢ় তেত্রিশ নং মলঙ্গা লেনে। আমাদের সবান্ধবে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করেছেন অঞ্জলির বাবা বিনোদচন্দ্র সেন।

বললাম, 'বেশ সুখবর। আগে থেকেই একটু জানা শোনা ছিল নাকি অঞ্জলি ? আমরা যেন তার আভাস পাচ্ছিলাম।'

অঞ্জলি হেসে মুখ নীচু করে রইল। কোন জবাব দিল না।

ছুটি নেওয়ার দিন অনুরোধ করে গেল, 'যাবেন। যাবেন কিন্তু সুরেনবাবু।'

আমরা অঞ্জলির অনুরোধ রক্ষা করলাম। বিয়ের দিন সন্ধ্যার পর গিয়ে পেট পুরে লুচি, তরকারী, মিষ্টি, দই খেয়ে এলাম। উপহারও দিলাম এক একজন এক একখানা করে বই। বন্ধুকৃত্য করেছিলাম। পয়সা দিয়ে তোমার বই কিনে দিয়েছিলাম হে। ভিতরে কি আছে মোটেই কিছু আছে কিনা দেখিনি। তবে খুব রঙ চঙে মলাট। ঠিক একেবারে অঞ্জলির শাড়ীর রঙের মত।

খেয়ে দেয়ে চেলি পরা, চন্দনের ফোঁটা কাটা অঞ্জলির সঙ্গে আমরা দেখা করে এলাম। বিশ্বাসই হতে চায় না, আমাদের অফিসের সেই টাইপিষ্ট মেয়েটি। ওর বরকেও দূর থেকে দেখলাম। তা দেখতে টেকতে ভালোই। বেশ লম্বা টম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলে। বয়স আমাদের সুরেনেরই মত। শুনলাম বি-এ, পাশ করেছে, চাকরী পেয়েছে কর্পোরেশনে।

ভাবলাম হয়ে গেল। আবার কোন সতীশ সমাদ্দার এসে বসবে অঞ্জলির চেয়ারে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে কোন লোক নেওয়া হল না। শশাঙ্ক সরকারের ওপরেই হুকুম হল টাইপের কাজটা চালিয়ে নিতে। তারপর পনের দিন বাদে দেখি অঞ্জলি এসে হাজির। ও অফিস থেকে বিদায় নেয়নি, শুধু পনের দিনের ছুটি নিয়েছিল।

আমরা একটু অবাক হয়ে বললাম, 'একি ব্যাপার। শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে তুমি আবার এই অফিস বাড়ীতে কেন!'

অঞ্জলি হেসে বলল, 'এলাম। আপনাদের মায়া কাটানো সোজা নাকি।'

চেয়ে দেখলাম তার শুধু গোত্রান্তর হয়নি, একেবারে রূপান্তর ঘটেছে। ওর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা কপালে ছোট একটা ফোঁটা, ঠোঁট দুটি রক্তাক্ত, লিপষ্টিকে নয়, পানের রসেই, কানে দুল, গলায় নতুন ডিজাইনের হার, হাতে চারগাছি করে চুড়ি সেই সঙ্গে সাদা সরু শাঁখাও আছে এক গাছি, রোজ না হলেও সপ্তাহে তিনবার ক'রে শাড়ী পালটায় অঞ্জলি, কোনদিন ফিকে হলদে, কোনদিন সবুজ কোনদিন গাঢ় লালরঙের শাড়ী পরে আসে অঞ্জলি। স্যাণ্ডেলের বদলে হাইহীল জুতো কিনেছে, লতাপাতা আঁকা শান্তিনিকেতনী ভ্যানিটি ব্যাগ আনে হাতে ঝুলিয়ে, কোনদিন বা বগলে চেপে।

টাইপরাইটারের পিছনে একটি নরম মনোহর নতুন মূর্তি আমরা বসে বসে দেখি। রূপ যৌবনে এক পরিপূর্ণ নারী। সংসার রহস্যরাজ্যের দুয়ার খুলে গেছে তার কাছে। রূপ রসের নতুন স্বাদ পেয়েছে। সেই আস্বাদনের আনন্দ আর পরিতৃপ্তি আমরা ওর চোখে মুখে দেখি। ওর চলায় বলায় হাসায় চাওয়ায় প্রত্যক্ষ করি।

পরেশ আর আমার মধ্যে এখনো মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। পরেশ বলে,' দেখেছ রূপ ? যাকে বলে ভাদ্রে ভরা নদী। জল একেবারে দুকূল ছাপিয়ে পড়েছে। আমাদের অফিস টফিস এবার ভেসে যাবে।'

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বলি, 'আঃ কি হচ্ছে পরেশ। ও এখন পরস্ত্রী-- ।'

পরেশ আমাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'থাম থাম। পর ছাড়া ও আমাদের আপন ছিল কবে। তখন ছিল পরকন্যা এখন পরস্ত্রী। কিন্তু চোখ দুটি তো আমার নিজের বিয়ের ছ'মাস যে'তে না যেতে কি রকম হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে দেখছ। মেয়েরা বলে বিয়ের জল। জল নয়, জমাট জল। বেচারা সুরেন।'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ওর শ্বশুরবাড়ীর খোঁজ খবর নিই। শ্বশুর নেই শাশুড়ী আছেন ছোট ননদ একটি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। মনোহর পুকুর রোডের দু'খানা কামরার একটি ফ্ল্যাটবাড়ীতে ওরা থাকে স্বামী খুব সৌখীন,

পরেশ বিড়ি ধরিয়ে মন্তব্য করে, 'সৌখীন যে ও' আমাদের বুঝতে বাকি নেই

অঞ্জলি লজ্জা পেয়ে চোখ নামায়। একটু পরে মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বলে 'দেখুন পরেশদা কি রকম মানুষ দেখুন। এত করে ব... নাম তো আর কারো বিয়ে অন্নপ্রাসনের নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না, অফিসেই যাচ্ছি। তা কিছুতেই শুনবে না। সাজসজ্জা নিজেও খুব ভালবাসে আবার —'

বাকি কথাটুকু না সেরে হেসে চুপ করে থাকে অঞ্জলি। পরেশ বলে ভায়াকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ জানাই। তার বিবেচনা আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ের পর চাকরী করতে দিতে তোমার শাশুড়ী আপত্তি করেন নি ?

অঞ্জলি বলল, একটু আধটু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে বুঝিয়ে বলায় শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন। আমিও খুব কাকুতি মিনতি করেছি না ক'রে করব কি বলুন। বাবাকে এখনো কিছু কিছু সাহায্য করতে হয়। অনেকগুলি ভাইবোন—

বছর ঘুরে এল। অঞ্জলি হঠাৎ একদিন বলল 'আজ কি খাবেন বলুন।

অবশ্য এর আগেও টিফিনের সময় আমাদের চা টোষ্ট খাইয়েছে অঞ্জলি। তবে এমন ঘটা ক'রে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করেনি।

পরেশ বলল ব্যাপার খানা কি। কোন উপলক্ষ টক্ষ আছে নাকি ?

অঞ্জলি মুখ নীচু ক'রে বলল না, উপলক্ষ আবার কিসের।

আমি বললাম পরেশ, ক্যালেণ্ডারটা ভাল ক'রে দেখ দেখি। আজ নিশ্চয়ই বাইশে আষাঢ়।

অঞ্জলি হেসে বলল যতীশদা আপনি কি ক'রে জানলেন ?'

বললাম, ওসব দিন তো আমাদেরও গেছে।

অঞ্জলি প্রতিবাদ করে বলল মোটেই যায়নি। এখনো পুরোপুরি আছে। আপনাদের দিন কোনদিন যাবে না।

পরেশ আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'শুধু জীবন থেকে রাতগুলি বাদ যাবে।'

সেদিন অঞ্জলির পয়সায় পেটভরে আমরা চা কাটলেট খেলাম।

পরেশ বাইরে এসে বলল, 'শুধু বিবাহবার্ষিকী নয় হে, আরো ব্যাপার আছে।

বললাম আর আবার কি ব্যাপার।

পরেশ বলল ওর ছেলেপুলে হবে

হেসে বললাম 'তোমার চোখ কিছুই এড়ায় না

পরেশও হাসল, একি এড়াবার জিনিষ। দেখ গোপনে গোপনে পাড়ার মেয়ের প্রেমিক যখন আসে কেউ টের পায় কেউ পায় না কিন্তু সন্তান আসে ঢাক ঢোল পেটাতে পেটাতে—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম থামো থামো।

অঞ্জলির সন্তানের আবির্ভাবের আভাস মাসের পর মাস পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। ওর হাঁটায় চলায় আবার একটা ধীর মন্থরতা এসেছে আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে ও আজকাল মুখ নামিয়ে নেয়। ভাবি লজ্জা অঞ্জলির। অথচ বিষয়টা গৌরবের। সেই গৌরবকে ও লুকিয়ে রাখতে পারে না বোধহয় চায়ওনা। ওর সংকোচের ভিতর থেকে সেই অপূর্ব সুখ আর সমৃদ্ধি ফুটে বেরোয়। প্রথম মা হওয়ার সময় তরুণী মেয়ের যে রূপ সে রূপের তুলনা নেই।

টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝে হাই তোলে অঞ্জলি। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোয়।

পরেশ ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ মুচকি হাসে। শুধু হাসা নয় সে একদিন আর একটু বাড়াবাড়ি করে বসল। টিফিনের সময় নীল রঙের ছোট একটি বার্লির কৌটা পকেট থেকে বার করে অঞ্জলির টাইপরাইটারের সামনে রাখল।

অঞ্জলি বলল, 'কি ব্যাপার। কৌটায় কি আছে পরেশদা।'

পরেশ বলল, 'খুলে দেখ তোমার বউদি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মুখ খুলে দেখা গেল ঠাসা এক কৌটা কুলের আচার। অঞ্জলির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছেন আপনি। দাঁড়ান বউদির কাছে আমি যদি নালিশ না করি—'

স্ত্রীর নাম করে দিলেও আচারটা বৈঠকখানার বাজার থেকে পরেশ নিজেই কিনে এনেছিল।

অঞ্জলি বেরিয়ে গেলে সুরেন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছি ছি এসব কি কাণ্ড করছেন আপনারা।'

পরেশ বলল, 'কাণ্ডের এখনই কি দেখলে সুরেন। এই অফিসের মধ্যে ওর আমরা সাধ দেব। মিষ্টির খরচটা আমার আর শশাঙ্কর। শাড়ীখানা চাঁদা করে সুরেন যতীশ কিনে দিয়ো। না কি সুরেন একাই দেবে?'

বলে এক চোখে তাকালে পরেশ বাঁড়ুজ্যে।

সুরেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

অঞ্জলির বিয়ের আগে ওর সঙ্গে সুরেন আলাপ-টালাপ করেছে: মাঝে মাঝে দু'জনকে গল্পও করতে দেখেছি। চিঠির ঠিকানা টাইপ করানো কি এমনি দু' একটা টুকটাক কাজ অঞ্জলিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার খুব উৎসাহ দেখতাম সুরেনের। কিন্তু ওর বিয়ের পর থেকে সুরেন ওসব ছেড়ে দিয়েছে। সে আজকাল তার কোণের টেবিলে তুলি, রঙের বাক্স আর ডিজাইন টিজাইন নিয়েই পড়ে থাকে। কথাবার্তা বেশি বলে না। পরেশ বলে, 'হিংসে হয়েছে ছোঁড়ার।'

আমি বলি, 'দূর তা নয়। সুরেন লজ্জা পেয়েছে। ওর বয়সে কোন সমবয়সী বিবাহিতা মেয়ের কাছে ঘেঁষতে অবিবাহিত ছেলের একটু স্বাভাবিক লজ্জা হয়।'

আমি লক্ষ্য করি অঞ্জলি মাঝে মাঝে সুরেনকে একথা ওকথা জিজ্ঞেস করলে ও কি রকম আরক্ত হয়ে ওঠে। আগে ওর এমন সঙ্কোচ ছিল না। অফিসের মধ্যে বিবাহিতা এমন কি অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে থাকায় লজ্জা যেন সবচেয়ে সুরেনেরই বেশি। ও অঞ্জলির দিকে তাকায় না। সে কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ নীচু করে জবাব দেয়।

ওর ভাব ভঙ্গী দেখে অঞ্জলিও হাসে। ওর অসাক্ষাতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, 'সুরেনবাবু ভারী লাজুক।'

আমি বলি, 'তোমার বিয়ের পর ওর লজ্জাটা বেড়েছে।'

অঞ্জলি এবার লজ্জিত হয়ে বলে, 'আহা, সবাই তো আর আপনাদের মত নয়।'

বলি, 'সবাই একরকম হবে কেন। কেউ মুখপোড়া কেউ মুখচোরা।'

আমাদের কথাবার্তায়, ইসারা ইঙ্গিতে শালীনতার অভাব সুরেন সহ্য করতে পারে না। প্রতিবাদ করে বলে, 'ছি ছি একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে কি করছেন আপনারা।'

পরেশ সংক্ষেপে মন্তব্য করে, 'আর কিছু করবার নেই।'

সাত মাসে সাধ দেওয়ার চক্রান্ত পরেশের সফল হল না। তার আগেই অঞ্জলি অফিসে আসা বন্ধ করল। এবারো ওর চেয়ারে নতুন লোক কেউ এল না। গোঁফওয়ালা শশাঙ্ক সরকারই গিয়ে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে টাইপিষ্টের চেয়ারে গিয়ে বসতে লাগল। শুনলুম অঞ্জলি কাজ ছেড়ে দিয়ে যায়নি, শুধু তিন মাসের ছুটি নিয়েছে।

অঞ্জলি নেই। তবু তার নাম করে পরেশ ঠাট্টা করতে ছাড়তো না। শশাঙ্ক সরকারকে বলে, 'তুমি যে ও চেয়ার ছেড়ে উঠতে চাও না শশাঙ্ক? ওখানে বসেও সুখ না?'

কোনদিন বলে, 'দেখব ড্রয়ারের মধ্যে চুলের কাঁটা টাঁটা কিছু রেখে গেছে নাকি?'

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, 'কাঁটা কেন তোমার জন্য প্রেম পত্তর রেখে গেছে। এসো,

দেখবে এসো।'

তিনমাস নয় চার মাস পরে ফিরে এল অঞ্জলি। কিন্তু একি বেশ। একি চেহারা। পরনে ধবধবে সাদা থান। সিঁথি সাদা। কান, গলা, হাত সব একেবারে শূন্য। অঞ্জলি সোজা গিয়ে বসল টাইপিষ্টের চেয়ারে। খুলে ফেলল টাইপরাইটারের কালো ঢাকনাটা। ছোট মেসিনটির পিছনে একটি স্তব্ধ শান্ত শ্বেত পাথরের মূর্তি। একেক সময় মনে হয় নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ।

আমরা ভালো করে ওর দিকে তাকাতে পারিনি। কথা বলা তো দূরের কথা। বাচাল পরেশ একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

দুপুরের পরে আমি এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ দুর্ঘটনা কবে ঘটলো অঞ্জলি ? আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।'

অঞ্জলি বলল, 'রামশঙ্করবাবুকে জানিয়েছিলাম। এক মাস হল—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছিল ?'

'ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া।'

একটু বাদে বললাম, 'তোমার তো ছেলে হয়েছে শুনেছি। কেমন আছে সে ?'

অঞ্জলি উদাসীন নিস্পৃহভাবে বলল, 'সে আছে।'

তারপর রামশঙ্করবাবুর লেখা কাটা-কুটি করা চিঠির ড্রাফট টাইপ করতে সুরু করল।

একদিন বললাম, 'তুমি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নাও।'

অঞ্জলি বলল, 'আর ছুটি নিয়ে কি করব যতীশদা। আমি অফিসেই ভালো থাকি।'

সে ভালো থাকে কিন্তু আমরা তো ভালো থাকিনে। আমাদের মনে হয় এক শূন্য শ্মশানে বসে আছি। হাসি নেই, কৌতুক নেই, জীবনের সাড়া নেই, এক নিষ্প্রাণ মরুভূমি আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

নীচের সস্তা রেষ্টুরেন্ট থেকে পরেশ টিফিনের সময় মাঝে মাঝে চা কাটলেট এনে খেত, খাওয়াত। আজকাল সব বন্ধ হয়ে গেছে। চপ কাটলেট তো দূরের কথা, সামান্য চা টোষ্টটা খেতে পর্যন্ত আমাদের কেমন কেমন লাগে। কারণ অঞ্জলি কিছু খায় না, অনুরোধ করলেও না। আস্তে বলে, 'আপনারা খান।'

আমরা বাইরে গিয়ে যাহোক কিছু খেয়ে আসি।

টিফিনের সময়ও নিজের চেয়ার ছেড়ে নড়েনা অঞ্জলি। শুধু মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে সেই নয়নে ? বোধহয় কিছুই দেখে না। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। বিকেলের রোদ নরম হয়ে আসতে আসতে রাঙা হয়। তারপর সন্ধ্যার কালো ছায়া নামে। অঞ্জলি তাকিয়েই থাকে।

এমনি করে মাস গেল, বছর গেল, দ্বিতীয় বছরও যায় যায়। হঠাৎ একটু নতুন দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের। অঞ্জলির ফিতেপেড়ে শাড়ী পাড়ের রঙ আর কালো নেই, সবুজ হয়ে উঠেছে। শাশুড়ীর অনুরোধে থান ছেড়ে ও প্রথমে কালো চুল পেড়ে তারপরে ফিতে পেড়ে শাড়ী পরে আসছিল। গলায় সেই সরু চিলতে হার, আর দু'হাতে 'একগাছি করে' সরু সোনার চুড়িও পরছিল ক'মাস ধরে। কিন্তু পাড়ের রঙ সবুজ এর আগে আর দেখিনি। আর দেখলাম ওর হাতে মোটা একখানা রবীন্দ্র রচনাবলী। তার ভিতরে সেই গোলাপী রঙের ট্রামের টিকিটের পতাকা। বইখানি যে সুরেনের তা কাউকে বলে দিতে হয় না। চামড়ায় বাঁধানো বইটির পুটের একেবারে নীচে সোনার জলে সুরেনের নাম লেখা আছে।

সেদিন দুজনে একটু বাদে বাদে অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি আর পরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

পরেশ বলল, 'ভালো, এ ভালো। আগে থেকে কোন সাড়া শব্দ দিয়ো না হে। চুপচাপ থাকো।'

আমি বললাম, 'তুমি সাবধান।'

ভালোই তো। অঞ্জলির ওই টিকিটের গোলাপী রঙ যদি এসে ওর শাড়ীতে লাগে, ওর দুটি গালে

যদি সেই রঙের আভাস পাওয়া যায়, আর সেই আগেকার মত যদি একটি গাঢ় রক্ত রঙের ফুল ফের ওর কালো খোঁপায় ফুটে ওঠে আমরা খুসিই হব। সেই অসাধ্য সাধন আমাদের সুরেন যদি করতে পারে আমরা খুবই খুসি হব। ওতো এখনো বিয়ে করেনি।"

যতীশ কথা থামিয়ে সেই ভবিষ্যৎ ছবির কল্পনায় একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর বলল, "চল এবার উঠি। রাত অনেক হয়ে গেল।" বন্ধুর হাতের মধ্যে হাত রেখে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়লাম।"

ভাদ্র ১৩৬১

সন্ধান

ছত্রিশ বৎসর বয়সে চিত্রশিল্পী অজয় সরকারের ভারি সাধ হল তার মায়ের একখানা প্রতিকৃতি আঁকবে। ভবানীপুরের শিল্পীবন্ধু সুবিমল চাটুয্যের বাড়িতে তার মায়ের পোর্ট্রেটখানা দেখে এসেই অবশ্য এই প্রেরণাটা পেয়েছে অজয়। দামী ফ্রেমে বাঁধানো বড় একখানা অয়েল পেইন্টিং নিচের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে সুবিমল। স্বচ্ছন্দ পরিবারের রূপবতী ভদ্রমহিলা। তাঁরই মাঝবয়সের একটি প্রতিকৃতি। প্রসন্ন পরিপূর্ণতায় একেবারে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি। যে দেখেছে সেই সুখ্যাতি করছে। সুবিমলের নিজের মায়ের এই পোর্ট্রেট তার সব সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে। পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দর উঠেছে এই ছবির। কিন্তু সুবিমল এ ছবি কিছুতেই বিক্রি করবে না। বিভিন্ন একজিবিশনে নিশ্চয়ই পাঠাবে। কিন্তু দর্শকেরা এ ছবি শুধু চোখ দিয়ে দেখবে, টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না।

সুবিমলের বাবা মা দুজনেই বেঁচে। তার মায়ের বয়স এখন পঞ্চান্ন ছাপান্নর কম হবে না। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন মাত্র চল্লিশ পেরিয়েছেন। সত্যি এই বয়সে এত লাবণ্য সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বড় ঘরের মেয়ে বড় ঘরের বউ। শুধু রূপ লাবণ্য নয়, শিক্ষা, রুচি, সৌজন্য শিষ্টাচারেরও তিনি অধিকারিণী। তা ছাড়া অগাধ বাৎসল্য তাঁর মনে। ছেলের বন্ধুদের তিনি নিজের ছেলের মতো দেখেন, আদর যত্ন করেন। সুবিমলের এই পোর্ট্রেট আঁকা উপলক্ষ করে তিনি একদিন ছেলের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। বেশির ভাগ তরকারিই তিনি নিজে রেঁধেছেন। নিজেই পরিবেশন করলেন। পরনে চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। মোজেইককরা ঘরের মেঝেয় সারি সারি ফুলকাটা আসন পড়ল। আমিশ-নিরামিষ পঞ্চদশ ব্যঞ্জন পরিবেশ করতে করতে ছেলের বন্ধুদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্না কেমন হয়েছে, বাবা।'

সুবিমলের অন্যতম বন্ধু হীরক সেন জবাব দিল, 'চমৎকার। এমন মায়ের ছেলে হলে আমরা যশস্বী হতাম মাসীমা।'

মাসীমা মৃদু হেসে বললেন, 'পাগল ছেলের কথা শোনো। সব মা-ই মা, সব মা-ই সমান।'

ভোজের আসর থেকে বাসে করে ফিরে আসতে আসতে অজয় সরকার সংকল্প করল সেও নিজের মার একখানা ছবি আঁকবে।

বাসায় এসে স্ত্রী বেলাকে নিজের সংকল্পের কথা জানাল অজয়। বেলা একটু হেসে বলল, 'সুবিমলবাবু পেরেছেন বলে তুমি কেন পারবে? মা তো শুনেছি তোমার আড়াই বছর বয়সের সময় মারা গেছেন। তাঁর কথা কি তোমার কিছু মনে আছে?'

অজয় বলল, 'তোমার ধারণা স্মৃতি ছাড়া আর্টিস্টদের কোন সম্বল নেই, না? কল্পনা বলে একটা কথা আছে তা শুনেছ? আমার মাকে আমি সেই কল্পনার রঙে ফুটিয়ে তুলব তুমি দেখে নিয়ো।'

বেলা বলল, 'তা যদি পারো তো, ভালো কথা।'

সত্যি কল্পনা ছাড়া আর কিছুর ওপর নির্ভর করবার উপায় নেই। অজয়ের মার একখানা ফোটো পর্যন্ত নেই ঘরে। এই ফোটোর জন্যে কয়েকবারই খোঁজ-খবর হয়েছে। গাঁয়ের বাড়িতে তাদের একান্নবর্তী পরিবারের একটি গ্রুপ ফোটো আছে, তাতে বাবা, কাকা, জেঠীমা প্রায় সবাই রয়েছেন। নেই শুধু অজয়ের মা। এর কারণ অজয় একবার জানতে চেয়েছিল। পিসীমা বলেছিলেন, 'ফোটো

যখন তোলা হয় তখন মেজো বউ এখানে ছিল না, বাপের বাড়ি গিয়েছিল।' জেঠীমা এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আপনার তাহলে ভালো করে মনে নেই, ঠাকুরঝি। নির্মলা তখন এখানেই ছিল। ঠাকুরপো তার চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করাতে সেই যে ঘরের কোণে গিয়ে লুকোল, এত সাধাসাধি এত টানাটানি কিছুতেই তাকে আর ক্যামেরার সামনে এনে বসাতে পারলাম না। ফোটোগ্রাফার তারক দত্ত বলল আর একদিন এসে মেজো বউয়ের ফোটো তুলবে। সে সুযোগ আর আসেনি।'

বিধবা প্রৌঢ়া জেঠীমা এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। সে কথা শুনে বাবার ওপর রাগ হয়েছিল অজয়ের। বাবা কেন মার চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করত গেলেন। তা না করলে তো মার একখানা ফোটো অজয়ের হাতে এসে পৌঁছত।

অথচ জেঠীমা, পিসীমা, কাকীদের কাছে অজয় যতটা শুনেছে মা অসুন্দরী ছিলেন না। গায়ের রঙ অবশ্য একটু কালো ছিল। কিন্তু টানা টানা বড় বড় চোখ পাতলা ঠোঁটে যে মুখশ্রীটুকু ফুটে উঠত তা নাকি বাড়ির আর কোন বউয়ের ছিল না। আর ছিল মাথা-ভরা কালো এক-রাশ চুল। তেমন কেশবতী মেঘবতী কন্যা সবকার বাড়িতে বা গাঁয়ের আর কোন বাড়িতে কেউ দেখেনি। ছেলেবেলায় পিসীমাদের কাছে এ গল্প শুনেছে অজয়। অত অল্প বয়সে বাড়ির যে বউ মারা গেছে তার রূপগুণেরবর্ণনায়হয়তো একটু অতিশয়োক্তির অলংকার এসে মিশেছিল। তবু মোটামুটি মায়ের চেহারার একটা আন্দাজ তাদের বর্ণনা থেকে পেয়েছিল অজয়। সেই সব বর্ণনার ওপরে নির্ভর করেই সে কাগজ পেনসিল নিয়ে স্কেচ করতে বসল।

কিন্তু খানিকটা চেষ্টা-চরিত্রের পর নিজেই বুঝতে পারল কিছুই হচ্ছে না। মানে যা হচ্ছে মনঃপূত হচ্ছে না অজয়ের। অথচ ছেলেবেলায় এই মাকে সে কতবার যে স্বপ্নে দেখেছে তার ঠিক নেই। জেঠীমা, পিসীমারা যেমন বলতেন ঠিক তেমনটি। তিনি এসে অজয়ের শিয়রের কাছে বসেছেন। আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বিশেষ করে জ্বরজারি হলে এই স্বপ্ন আরো বেশি করে দেখত অজয়। জেঠীমা সে কথা শুনে আঁতকে উঠতেন, 'সর্বনাশী মায়ার বাঁধন কাটাতে পারেনি। কাটানো কি সহজ। ঠাকুরপোকে বলতে হবে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসুক। তুই ভয় পেয়েছিলি নাকিরে অজু।'

অজয় বলত, 'না জেঠীমা ভয় কেন পাব।'

জেঠীমা তবু ভরসা পেতেন না। অজয়ের কোমরে একটা কালো তাগার সঙ্গে লোহার চাবি বেঁধে রাখতেন। তাছাড়া হাতে গলায় নানারকম তাবিজ কবচও পরতে হত। তবু এসব রক্ষা কবচের বেড়ি ডিঙিয়েও মা প্রায়ই আসতেন অজয়ের কাছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখন আর কিছুতেই আসছেন না। অজয়ের স্মৃতিপট থেকে তিনি কি একেবারেই মুছে গেলেন।

আট বছরের মেয়ে মিণ্টু পা টিপে কাছে এসে দাঁড়াল, 'বাবা, তুমি নাকি স্বর্গের ঠাকুমার ছবি আঁকছ ?'

অজয় মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোকে কে বলল ?'

মিণ্টুর ছোট ভাই ঝুণ্টু কথাটা ফাঁস করে দিল, 'মা বলেছে।'

মিণ্টু বলল, 'আচ্ছা বাবা, ঠাকুরমা তো এতদিন স্বর্গে বসে বসে বুড়ী হয়ে গেছে না ?'

ঝুণ্টু নিঃসংশয়ে বলল, 'হ্যাঁরে হ্যাঁ। ঠিক ও বাড়ির বিশুদের দিদিমার মতো। চুল পাকা, দাঁত নেই। এই ভাবে হাঁটে।' বলে ঝুণ্টু কুঁজো হয়ে বিশুর দিদিমার হাঁটবার ভঙ্গির অনুকরণ করে দেখাল।

অজয় হাসি চেপে ছেলেকে মেয়েকে তাড়া দিয়ে বলল, 'যাও এখান থেকে, যাও শিগগির।'

অজয় মনে মনে ভাবল, না,তার মা কখনো বুড়ো হবেন না। তার মা চিরযৌবনা। একুশ বছর বয়সে দুটি মাত্র সন্তান রেখে তিনি মারা গেছেন। তারপর আর তাঁর বয়স বাড়েনি।

বাবার কাছ থেকে মায়ের কথা বিশেষ কিছু জানতে পারেনি অজয়। বাবা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি মানুষ। পরিবারের কর্তা। বিষয়কর্মে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে ছেলেবেলায় ভয় করে চলত, এড়িয়ে চলত অজয়। তারপর বড় হয়ে পড়াশুনার জন্যে গাঁয়ের বাইরে আসতে হল। বোর্ডিঙে, হোস্টেলে, মেসে, হোটেলে দীর্ঘ কাল কেটে গেল অজয়ের।

আর সেই ফাঁকে দুজন একজন করে গুরুজনেরা প্রায় সবাই বিদায় নিলেন।

বাড়ির ভিতরকার চেঁচামেচিতে হঠাৎ চিন্তাধারা ছিন্ন হয়ে গেল অজয়ের। 'আঃ বড় গোলমাল হচ্ছে'—স্ত্রীকে ঘরে ডেকে পাঠাল অজয়, 'উঠোনে অমন করে বক বক করছে কে?'

বেলা বলল, 'কে আবার। আমাদের সবলা। কারা কাজ করিয়ে মাইনে দেয়নি, কাপড় দেবে বলে কবুল করে একখানা গামছা দিয়ে বিদায় করেছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছে।'

অজয় বলল, 'একটু আস্তে আস্তে দিতে বল। ওর বকবকানিতে এখানে বসে কাজ করতে পারিনে।' বেলা গিয়ে কি বলায় সবলা থেমে গেল। দত্ত-বাগানের বস্তিতে থাকে। কয়েক বাড়িতে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে সংসার চালায়। কাজকর্ম ভালোই করে তবে বক বক করে বেশি।

মুড নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাগজ পেনসিল ছেড়ে উঠে পড়ল অজয়। তাছাড়া আপিসের বেলাও হয়ে গেছে। শুধু বিশুদ্ধ শিল্পচর্চায় সংসারের সব খরচ কুলিয়ে যাবে ছবি বেচে অত আয় হয় না অজয়ের। তাই মার্চেন্ট আপিসের শরণ নিতে হয়েছে। তুলির কাজ অবসর সময়ের জন্যে তোলা থাকে।

দিন কয়েক বাদে বেলা একদিন বলল, 'দেখ, ওইভাবে তুমি মায়ের ছবি ঠিক এঁকে তুলতে পারবে না। সামনে কিছু না থাকলে মানুষ আন্দাজে পোর্ট্রেট আঁকতে পারে আমি তো কোথাও শুনিনি। তার চেয়ে এক কাজ কর। খুঁজে দেখ কোথাও ওঁর ফোটো-টোটো পাওয়া যায় কিনা। শুনেছি মায়ের মামা সেই ভুবন ধর নাকি আজকাল বেলেঘাটার শ্রীধর দাস লেনে থাকেন। দেখ না গিয়ে তাঁর কাছে। যদি কোন খোঁজ খবর পাও।'

কথাটা মন্দ বলেনি বেলা। ভুবন ধর অজয়ের মায়ের সম্পর্কিত মামা। তিনিই বাপ-মা-মরা ভাগ্নীকে নিজের মেয়ের মতো লালন-পালন করে বড় করে তুলেছিলেন, বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মায়ের ছেলেবেলার একখানা ফোটো হয়তো থাকতেও পারে।

এতদিন তো খোঁজ করেনি অজয়, তাহলে আগেই পেত। বহুকাল ধরে মা আর মাতৃস্থানীয়াদের অজয় ভুলে ছিল। বরং যে মেয়ের মধ্যে মাতৃভাবের আধিক্য দেখত অজয় তার ওপর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠত। জীবনে এতকাল নানাবয়সী নারীর মধ্যে অজয় যাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে মা নয়, সে মনোরমা। কলালক্ষ্মীর মতোই চিরচঞ্চলা, ধরা দিয়েও সে ধরা দেয় না, আয়ত্তের মধ্যে এসেও সে ছুটে পালায়। আজ এতকাল বাদে মায়ের কথা মনে পড়ছে অজয়ের। মা তার শিল্পী সত্তাকে স্পর্শ করেছেন। তার সৃষ্টিশালার দ্বারের কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁর রূপ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না অজয়। তাঁর চারদিকে আঁধারের আবরণ। তুলির রঙে কল্পনার রসে সে আঁধার কি মিলিয়ে যাবে না? বিস্মৃতির অতল সমুদ্র থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসবে না সেই মহিমাময় মাতৃমূর্তি?

অজয় আঁকে আর মোছে। পছন্দ আর হয় না। শুধু স্কেচ নয়, রঙিন ছবিও কয়েকখানা এঁকে দেখল। নিজেরই মনঃপূত হল না। শুধু সেই শিল্পী বন্ধুর মায়ের প্রতিকৃতির কথা মনে পড়ে। কিন্তু অজয় অপর কারো অনুকরণ করবে না, অনুসরণও না। সে নিজের মনের মতো করে নিজের মায়ের ছবি আঁকবে।

দিনকয়েক বাদে বেলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। স্বামীর কাছে এসে বলল, 'কেবল যে ছেলেমানুষের মতো ছবি আঁকছ আর নষ্ট করছ, এমন করে কি দিন কাটবে। খরচ আছে না সংসারের।' অজয় স্বীকার করল, 'তা আছে।'

তারপর একদিন ছুটির দিনে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল অজয়। যতগুলি স্কেচ করেছিল রঙিন ব্যাগটায় ভরে নিল। সেই সঙ্গে নিল পেনসিল আর নতুন কাগজ। কি ভেবে তুলি আর রঙের বাকসটাও সঙ্গে রাখল অজয়। যদি আইডিয়া এসে যায় তাহলে পার্কে হোক, রেস্তোরাঁয় হোক এক জায়গায় বসে পড়বে। ছবি শেষ না করে বাড়ি ফিরবে না।

অজয়ের খুড়ো জেঠীমা এখনো বেঁচে আছেন। বেনেপুকুরে জেঠতুতো ভাইয়ের ছেলেরা বাসা করেছে। তাদের সঙ্গেই আছেন তিনি। অজয় প্রথমে গিয়ে হাজির হল তাঁর কাছে।

সরু গলির মধ্যে পুরোন একটা দোতলা বাড়ির একতলার দুখানা ঘর নিয়ে আছে অজয়ের জ্ঞাতি

ভাইপোরা। তাদের কারো সঙ্গে দেখা হল না। একজন বেরিয়েছে কাজে ; আর একজন কাজের চেষ্টায়। বউদের একজন হাসপাতালে গেছে—ছেলেপুলে হবে। আর একজন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আর কাউকে আজ দরকার নেই অজয়ের। সে জেঠীমার সামনে পিঁড়ি পেতে বসে বলল, 'তোমার কাছেই এসেছি জেঠীমা।'

জেঠীমা বললেন, 'তবু ভালো। এতোকাল বাদে তোমার মনে পড়েছে ; দেড় বছরের মধ্যে তো আর এমুখো হওনি। খোঁজও নাওনি বুড়ী আছে কি মরেছে।'

অজয় বলল, 'সময় পেয়ে উঠিনে জেঠীমা।'

জেঠীমা বললেন, 'যাক এসেছ যখন আমার একটা কথা তোমাকে শুনতে হবে।'

হাত বাড়িয়ে অজয়ের হাত ধরলেন জেঠীমা। চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। হাতের শিরাগুলি বেরিয়ে পড়েছে। মাথায় ছোট ছোট করে কদম-ছাঁটা একরাশ পাকা চুল। দাঁতগুলি পড়ে গেছে, ভারি জীর্ণ হয়ে গেছেন জেঠীমা।

'কী কথা তোমার বলো।'

'আমাকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে চোখ দেখাবার জন্যে। কোনটাতেই ভালো দেখতে পাইনে, দুটোতেই ছানি পড়েছে। আমার চোখের চিকিৎসাটা তুই করে দে বাবা। ওরা কেউ আমার কথা শোনে না। বলে বুড়ো মানুষের আবার চোখের দরকার কি। আরে আমাকে তো নড়ে চড়ে খেতে হবে।'

অজয় বলল, 'আচ্ছা, শিগগিরই একদিন এসে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। তুমি ভেব না। আজ আমি তোমার কাছে আমার মায়ের গল্প শুনতে এসেছি জেঠীমা।'

জেঠীমা অবাক হয়ে বললেন, 'কোন মা।'

'আমার মা। যিনি আমার ছেলেবেলায় মারা গেছেন।'

'মারা গেছে না বেঁচে গেছে। তার কথা শুনে এখন কি করবি তুই।'

'ভেবেছি তাঁর একখানা ছবি আঁকব। তুমি বল না আমার সেই মায়ের কথা। শুনতে শুনতে যদি একটা ধারণা মনে আসে। ছেলেবেলায় তাঁর অনেক গল্প শুনেছি তোমার কাছে। কিন্তু সবই প্রায় ভুলে গেছি। আবার নতুন করে বল না জেঠীমা।'

জেঠীমা বললেন, 'হায়রে কপাল, যে বেঁচে আছে ছ মাস ন-মাসেও তার একবার খোঁজ করবার নাম নেই। যে মরে গেছে তাকে নিয়ে টানাটানি। তোর মা তো কেবল পেট থেকে নামিয়ে দিয়েই খালাস। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে এই জেঠীই।'

অজয় বলল, 'তোমার ছবিও আঁকব জেঠীমা।'

'আমার ছবি এঁকে তোমার কাজ নেই বাপু। আমার চোখ দুটি তুমি সারিয়ে দাও।'

'দেব জেঠীমা, বললাম তো দেব। তুমি এবার আমার মায়ের কথা বল।'

অনুরোধ-উপরোধে জেঠীমা বলতে শুরু করলেন। অজয় ছেলেবেলায় যে সব গল্প শুনেছে প্রায় সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন জেঠিমা। কিন্তু এখনকার বলায় সেই তখনকার রস আর নেই। তার বলার এই ভঙ্গী শিল্পীর মনে কোন অনুপ্রেরণা যোগায় না। তার কল্পনেত্রের সামনে কোন মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। অজয়ের মার কথা বলতে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথাই বলতে লাগলেন জেঠীমা। এখানে তাঁর বড় কষ্ট। খাওয়ায় কষ্ট, নাওয়ায় কষ্ট। বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বাঁচতে তিনি আর চান না। কিন্তু মানুষের তো ইচ্ছামৃত্যু নেই। সে বর শুধু ভীষ্মই পেয়েছিলেন। শুনতে শুনতে এক সময় উঠে পড়ল অজয়। পকেট থেকে একটি টাকা বার করে জেঠীমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'দুধ কিনে খেয়ো। মাসের শেষ বেশি কিছু দিতে পারলাম না।'

জেঠীমা বললেন, 'সে যখন পারো দিয়ো। আমার চোখের কথা যেন মনে থাকে।'

তাঁকে প্রণাম করে বেলেঘাটার দিকে রওনা হল অজয়। খুঁজে খুজে বার করল শ্রীধর দাস লেনের ভুবন ধরের বাসা।

অজয়ের মায়ের মামা ভুবন ধর একেবারে শয্যা নিয়েছেন। পুত্র পুত্রবধূরা সেবা শুশ্রূষা করে। তাদের সঙ্গে দু-চার কথা বলে অজয় বিরাশি বছরের বৃদ্ধ ভুবন ধরের সঙ্গে আলাপ শুরু করল।

কুশল প্রশ্নাদির পরে বলল, 'আমার মায়ের ছেলেবেলার কথা বলুন দাদু।'

ভুবন ধর বললেন, 'হতভাগা, এতদিন বাদে তার কথা তোর মনে পড়েছে। কেন নিমির কথা শুনে কি করবি তুই।'

অজয় বলল, 'আমি তাঁর একখানা ছবি আঁকব।' নিজের আঁকা স্কেচগুলি ভুবন ধরকে দেখাল অজয়। তাঁর চশমা সুতোয় বাঁধা। সেই সুতো কানে জড়িয়ে চশমাটা নাকের ডগায় রেখে তিনি ভালো করে অজয়ের আঁকা স্কেচগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'উঁহু, হয়নি দাদু।'

অজয় বলল, 'একখানাও হয়নি?'

ভুবন ধর তাঁর টাক মাথাটি নেড়ে বললেন, 'না। নিমি মোটেই অত সুন্দরী ছিল না। অমন টানা টানা চোখ, অমন চোখা নাক ছিল না তার। তোমার এ সব ছবি দেখে আমি আমাদের সেই নিমিকে চিনতে পারছিনে দাদু। তবে তোমার দোষ নেই। তুমি তো আর তাকে দেখনি। আর দেখলেই বা কি। আমি তো দেখেছি, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। তার মুখ আমারই ভালো করে মনে পড়ে না এখন। সব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে।'

অজয় বলল, 'আচ্ছা দাদু, মায়ের ফোটো-টোটো কোথাও কিছু নেই।'

বুড়ো ভুবন ধর ফোকলা দাঁতে হাসলেন, 'তখন কি আর ওসব পাট ছিল? আমাদের কাসিমপুরে ফোটো তোলার অত রেওয়াজই ছিল না।'

অজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'থাকগে ফোটোর কথা। আপনি আমার মায়ের গল্প বলুন তো দাদু। আমি আপনার কাছ থেকে তাঁর কথা শুনব।'

যেন ছত্রিশ বছর বয়স্ক পুরুষ নয়, ছ-বছরের এক বালক এই প্রথম মায়ের অভাব টের পেয়েছে। মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দুনিয়া ভরে।

বৃদ্ধ ভুবন ধর পরম স্নেহে হাত রাখলেন অজয়ের পিঠে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'তার কথা আর কি শুনবে দাদু। সে এক দুঃখিনী অভাগিনীর কথা। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গেছে। আত্মীয়-স্বজন ধারে-কাছে কেউ ছিল না, পড়ল এসে আমার ঘাড়ে। আমার ঘাড়ও তো শক্ত নয়। লিকলিক করে। অল্প বয়সে বিয়ে করেছি। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। কি করে তাদের মানুষ করব, মেয়েগুলির বিয়ে-থা দেব, সেই চিন্তায় অস্থির। এর ওপর আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি।'

তিনি থামলেন।

অজয় সাগ্রহে বলল, 'তারপর দাদু?'

ভুবন ধর বলতে লাগলেন, 'তা মিথ্যে বলব না, নিমির আমার বুদ্ধিবিবেচনা ছিল। ও যে গরীব মামার সংসারে আছে সে কথা ও সব সময় মনে রাখত। মামাতো বোনদের হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে নিজে করত। আমার ছোট ছেলেমেয়েগুলি তো ওর কোলে কোলেই থাকত। ওরই মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আবার লেখাপড়াও একটু শিখেছিল। রামায়ণ মহাভারতখানা পড়তে পারত। চিঠিখানা পত্তরখানা এলে ওই নিমিই পড়ত। লিখতেও শিখেছিল। হাতের অক্ষরের ছাঁদ মন্দ ছিল না।'

'বলে যান দাদু।'

ভুবন ধর বললেন, 'বেশি বলবার কি আছে। কতটুকুই বা জীবন। আর কিই বা তার কথা। ভিতরটা ভালো হলে কি হবে, বাইরে থেকে তো লোকে কুচ্ছিতই দেখত। তাছাড়া আমার অবস্থাও তেমন নয়, পাঠশালায় মাষ্টারি করি, দিন আনি দিন খাই। ভালো ঘর বর জোটাব কোত্থেকে। তাই দোজবরে বেশি-বয়সী স্বামীর হাতেই দিতে হল নিমিকে। বললাম, মা, কিছু মনে করিসনে। এর বেশি তো আমার সাধ্য নেই। নিমি মুখ নিচু করে বলল, মামা আপনি দুঃখ করবেন না। ভাগ্যে থাকলে আমার ওখানেই সুখ হবে। অথচ আমি জানতাম আমার অল্পবয়সী বড় জামাই মেজো জামাইয়ের মতো বরের সাধ ওরও ছিল।'

অজয় বলল, 'তারপর দাদু?'

দাদু বললেন, 'তা মিথ্যে বলব না। তোমার বাবা আমার নিমিকে অনাদর-অযত্ন করেনি। তবে তোমাদের সংসারের অবস্থাও তো তখন ভালো ছিল না। বহু গুষ্টি। অভাব-অনটন ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই ছিল। তোমার মার পক্ষ নিয়ে তোমার বাবা কিছু বলতে গেলে বাড়ির সবাই এক বাক্যে বলত, দ্বিতীয় পক্ষের বউ মাথায় উঠেছে। বাড়ির কর্তার পক্ষে এ তো বড় লজ্জা বড় কলঙ্কের কথা। গিরীন সেই খোঁটাকে ভয় করত, আর সেই ভয়েই স্ত্রীকে মাঝে মাঝে কড়া কথা, কটু কথা বলত। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না, খুঁটিনাটি আমার মনে নেই। বাড়ির ময়লা কাপড় কাচা নিয়েই বোধহয় ঝগড়াটা লেগেছিল। তোমার বাবাও দু-কথা বলে থাকবে।'

ভুবন ধর একটু থামলেন।

অজয় সাগ্রহে বলল, 'আপনি বলে যান দাদু, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না।'

দাদু বললেন, 'না ভাই, লুকোবার কি আছে। তা আমার নিমিও তো কম জেদী ছিল না। জ্বর গায়ে বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে সারা বাড়ির ময়লা কাপড় কেচে সন্ধ্যার সময় নেয়ে ধুয়ে এল। কারো মানা শুনল না। এত রাগ স্বামী সহ্য করতে পারে, শরীরে সইবে কেন দাদা। প্রথমে জ্বর জ্বর, তারপরে একেবারে ডবল নিউমনিয়া। চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। গঞ্জের বড় ডাক্তারকে তোমার বাবা এনেছিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। মরবার কদিন আগে থেকে সে নাকি সকলের কাছে মিনতি করত, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমি আমার সোনাদের ফেলে, সুখের সংসার ফেলে যেতে চাইনে।'

'তারপর ?'

দাদু বললেন, 'তারপর আর কি। আমি খবর পেলাম সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর। গিয়ে আর দেখতে পাইনি।' এতকাল বাদেও দাদু কোঁচার খুঁটে ভিজে চোখ মুছলেন। অজয় মুছল না। ওর দু-চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ভুবন ধর বাধা দিলেন না, ভাবলেন মায়ের জন্যে ছেলে তো কোনদিন কাঁদেনি, আজ কাঁদুক।

খানিকক্ষণ বাদে উঠে পড়ল অজয়। বেলেঘাটা থেকে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে পাইকপাড়ার বাস ধরল। ভাবতে ভাবতে এল নিজের মায়ের কথা। তাঁর স্বল্প সংক্ষিপ্ত আখ্যান থেকে কোন্ অংশটুকু সে তুলিতে ফুটিয়ে তুলবে। আঁকবে কি তাঁর বাল্যের-কৈশোরের ছবি, না শ্বশুরবাড়ির একটি তরুণী বধূকে। না কি রোগশয্যায় শায়িতা একটু বধূর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাকে সে মূর্ত করে তুলবে। এবার সে পারবে, এবার সে নিশ্চয়ই আঁকতে পারবে। বিষয়ের আভাস সে পেয়েছে। শুধু চেহারা আর মুখের আদলটি ঠিক আসি আসি করেও আসছে না। চোখের জলে বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক অজয় নিজের বাসা ছাড়িয়ে কখন চলে এসেছে। রানী রোডের মোড়ে বাস এসে থামতে তার খেয়াল হল। নেমে ফের উল্টো দিকে চলতে শুরু করল অজয়। ভাদ্রের কড়া রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে সে খেয়াল নেই। অসতর্কভাবে চলার জন্য একটা বাসের ড্রাইভার তাকে গালাগালি দিয়ে চলে গেল সে খেয়াল নেই। অজয় খুঁজছে, নিজের মনে মাকে খুঁজছে।

'দাদাবাবু যে। এই ভরদুপুরে ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন ?' চমকে উঠে মুখ তুলল অজয়। তাদের ঠিকে ঝি সরলা। পাড়ার আরো তিনচার বাড়িতে কাজ করে। মণীন্দ্র রোডের গলি থেকে বেরিয়ে বোধ হয় বস্তির বাসার দিকেই যাচ্ছে। তার ডাকে অজয় মুখ তুলল, চোখ তুলে তাকাল। ঝি সরলা, বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়স। কালো রোগাটে চেহারা। পরনে সেলাই-করা ময়লা একখানা খয়েরী পাড়ের শাড়ি। বছর-পাঁচেকের একটি উলঙ্গ ছেলে তার আঁচল ধরেছে। কোলের দু-বছর আড়াই বছরের মেয়েটি পথের মধ্যেই মায়ের স্তনে মুখ দিয়েছে। আর এক হাতে পুঁটলিতে বাঁধা ভাত তরকারি। আস্তে আস্তে চলছে সরলা। ওর আবারও ছেলেপুলে হবে।

'কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু ?'

সরলা আবার হেসে জিজ্ঞাসা করল।

অজয় বলল, 'এই একটু ওদিকে। তুমি কোত্থেকে আসছ।'

সরলা বলল, 'চক্কোত্তিরা খেতে বলেছিলেন। তাঁর ছেলের আজ মুখেভাত কিনা। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে দুটি চেয়ে নিয়ে গেলাম। সে তো নড়তে পারে না।'

অজয় বলল, 'বেশ তো।'

চলে যাওয়ার আগে আর একটু ইতস্তত করে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু, এই ইংরেজি মাস শেষ হতে আর ক'দিন বাকি?'

অজয় বলল, 'কেন রে?'

সরলা মৃদুস্বরে বলল, 'এ মাস শেষ হলে সে ছাড়া পাবে দাদাবাবু।'

অজয়ের মনে পড়ল চুরির দায়ে ওর স্বামী গোকুল দাসের তিন মাসের জেল হয়েছিল।

আর একবার তাকিয়ে বাকিটুকু দেখে নিল অজয়। সরলার সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে মোটা শাঁখা। ঠোঁটে লজ্জিত হাসি।

অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সরলা বলল, 'রোদে রোদে আর না ঘুরে একটু বাড়ি যান দাদাবাবু। ইস্ মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।' অজয় মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এবার সে বাড়িতেই ফিরবে। সে পেয়েছে, এবার সে পেয়েছে।

আশ্বিন ১৩৬১

আকিঞ্চন

চিঠিখানা লেখা শেষ করে বিপিনবাবু নিজে একবার মনে মনে পড়ে নিলেন তারপর স্ত্রী আর ছেলেকে' ডেকে শোনালেন

"পরম কল্যাণীয়েষু,

বাবা পরিতোষ, সেদিন তোমার কলেজ হইতে মনে বড় আনন্দ লইয়া ফিরিয়াছি। যাহাকে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়াইয়াছি, নিজের হাতে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছি, অসতর্কতা, অমনোযোগিতার জন্য কত তিরস্কার ভর্ৎসনা করিয়াছি, আবার যাহার ঐকান্তিক বিদ্যানুশীলনের গর্বে বুক ভরিয়া উঠিয়াছে, যাহার অনন্যসাধারণ কৃতকার্যতায় অপার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছি, আমার সেই পরিতোষ আজ কলিকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক; এ যে আমার কত গর্ব তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে। কৃতীছাত্রের মুখ দেখিলে হৃদয়ে যে কি আনন্দ, সুখের উদয় হয় তাহা তো তোমার না জানিবার কথা নয় বাবা। কারণ তুমিও তো শিক্ষকের বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছ। প্রতি বৎসর শত শত সহস্র সহস্র ছাত্র ছাত্রী তোমাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। সে গৌরবে আমারও অংশ আছে।

তোমার অধ্যাপনার খ্যাতি আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি। তোমাদের কলেজে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম কি উদ্দেশ্যে জান? ভাবিয়াছিলাম গোপনে গোপনে তোমার কোন একটি ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসিয়া, তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়া তোমার লেকচার শুনিব। প্রথম বয়সে শিক্ষকের আসনে বসিয়া যাহাকে উপদেশ দিয়াছি আজ এই শেষ জীবনে ছাত্রের আসন হইতে তাহার সাহিত্যালোচনা শুনিতে বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাথাভরা পাকা চুল, আর মুখভরা সাদা দাড়ি গোঁপ লইয়া সেই জাতমাত্র শ্মশ্রু তরুণদের মধ্যে গিয়া বসিতে সাহস হইল না। তাহা ছাড়া এমন আশঙ্কাও হইল, তুমি হয়ত অপ্রস্তুত হইবে, আমাকে ওই অবস্থায় দেখিলে তুমি হয়ত লজ্জা পাইবে। তাই মনের সাধ অপূর্ণই রহিল। উপায় কি পরিতোষ, দরিদ্র শিক্ষকের জীবনে এমন কত সাধ কত আশা আকাঙ্ক্ষাই তো অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া হইবে কি। পিতৃপিতামহের ভিটা ছাড়িয়া আসিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া এই জবর দখল কলোনীতে কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে দিন কাটাইতেছি তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয় বাবা। তবু কিছু কিছু সেদিন বলিয়াছি। যাহা বলি নাই তাহা তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করিয়া লইয়াছ। সেই কার্তিকপুরের হাইস্কুল ছাড়িয়া আসিয়া বহুদিন কর্মহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। বর্তমানে কর্ম একটি জুটিয়াছে। এই কলোনীরই একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি। বেতন যৎসামান্য তাহাও নিয়মিত পাই না। তবু এরই মধ্যে একটি মেয়ের বিবাহ কোনক্রমে দিয়াছি। কিন্তু ছেলেটিকে আশানুরূপ লেখাপড়া শিক্ষা

দিতে পারি নাই। তাই তাহার কর্মের সংস্থানও হইয়া উঠিতেছে না। এসকল কথা তোমাকে সেদিনও বলিয়াছি। সেই একই দুঃখের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি বলিয়া বিরক্ত হইও না। সেদিন তোমার ক্লাসে যাইবার খুব তাড়া ছিল, সেই ব্যস্ততার মধ্যে যদি সব কথা তোমার ভাল করিয়া শুনিবার অবকাশ না হইয়া থাকে তাই নিজের সেই পুরাতন দুঃখের কথাগুলিই আর একবার বলিয়া লইলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করিব এমন সাধ্য কি, আমার কপাল মন্দ। তাই তোমার মত একজন স্নেহভাজনের কোমল হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি। কি করিব বাবা, অসুখ বিসুখ লইয়া এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে আর কূল কিনারা পাইতেছি না। নাবালক তিনটি পুত্র কন্যাই শয্যাশায়ী, গৃহিণীর কথা বলিয়া আর কাজ নাই। মৃত্যুর পূর্বে তাহার শয্যা লইবার অবসর হইবে না। গরীবের সংসারে অমনিতেই সুখের সীমা নাই তারপর আবার যদি অসুখ আসিয়া দেখা দেয় তাহা হইলে কি অবস্থা হয় তাহা অনুমান করিতে পার। তাই বড় সংকোচের সঙ্গে একটি কথা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি। আবার ভাবি তুমি পুত্রস্থানীয়, তোমার কাছে বলিতে সংকোচই বা কিসের। মাসের শেষে হাত বড় টানাটানি যাইতেছে পরিতোষ। ঔষধপত্রের জন্য গোটা পঁচিশেক টাকার বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমার পুত্র শ্রীমান বিজনকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তুমি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিও। আগামী মাসে যদি নাও পারিয়া উঠি পরবর্তী দুই এক মাসের মধ্যেই আমি ইহা পরিশোধ করিয়া দিব। আর এক কথা: শ্রীমান বিজনের জন্য যদি কোন একটা কাজ-কর্মের সুবিধা করিয়া দিতে পার তাহা হইলে বড়ই উপকার হয় বাবা। তুমি আমার একজন কৃতী ছাত্র। শুধু গর্বের নয়, ভরসারও স্থল। আমি জানি কত দরিদ্র ছাত্র তোমার আনুকূল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বাল্যকালের একজন নিঃস্ব শিক্ষকও যে তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। আশীর্বাদ করি বিদ্যার সঙ্গে, ধনের সঙ্গে তোমার হৃদয়-সম্পদেরও দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, তুমি সুখী হও।

আশা করি বউমা ও শ্রীমান শ্রীমতীদের লইয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছ। তাহাদের সঙ্গে তোমাকেও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

ইতি--

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী।'

পড়া হয়ে গেলে স্ত্রী আর ছেলের দিকে তাকিয়ে বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হয়েছে?'

অন্নপূর্ণা গালে হাত দিয়ে এতক্ষণ স্বামীর মুসাবিদা শুনছিলেন। এবার মৃদু স্বরে মন্তব্য করলেন, মন্দ হয়নি। তবে অত কথা কেন লিখতে গেলে? অত ইনিয়ে বিনিয়ে লিখবারই বা কি দরকার ছিল? দু'চার লাইনে লিখে দিলেই হ'ত।'

বিজনও বলল, 'সত্যি! মাত্র পঁচিশটি টাকার জন্যে অত বড় লম্বা চিঠি--'

বিপিনবাবু চটে উঠলেন, 'পঁচিশ টাকা কম হ'ল বুঝি? যদি বলি পঁচিশটি পয়সা নিয়ে আয় জোগাড় ক'রে, আনতে পারবি নিজের চেষ্টায়? তোমার ক্ষমতার যে কি দৌড় তা আমার আর জানতে বাকি নেই।'

অন্নপূর্ণা ছেলের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'আঃ ওকে কেন অত বকছ। ওর কি দোষ। টিউশনি ফিউশনি যখন ছিল তখন বিজুও তো পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাসে মাসে রোজগার করেছে। আর সব টাকাই তোমার হাতে এনে দিয়েছে। ওর কি সাধ কাজ কর্ম না করে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায়? চাকরি বাকরি না জুটলে ও কি করবে। ওকে দুষলে লাভ নেই, দোষ আমাদের কপালের।'

বিপিনবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, 'হুঁ।'

বিজন এই সুযোগে ফের প্রতিবাদ জানাল, 'তাছাড়া তাঁরা কাজের মানুষ। অত বড় চিঠি পড়বার সময় আছে নাকি তাঁদের? চিঠিটা একটু সংক্ষেপে লিখলে তাঁদের পক্ষে সুবিধে হয়।'

বিপিনবাবু বললেন, 'থাক বাপু থাক। তাঁদের সুবিধে তোমাকে আর দেখতে হবে না। নিজেদের সুবিধে কিসে হয় তাই দেখ! এখন সন্ধ্যের আগে আগে ভালোয় ভালোয় কলকাতায় রওনা হয়ে পড়। টাকা ক'টা আদায় করে না আনতে পারলে তো কাল থেকে আর হাঁড়ি চড়বে না উনুনে।'

মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে কলকেতে তামাক ভরতে লাগলেন বিপিনবাবু।

অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি, এই খোলা মাঠের মধ্যে বিকেলের দিকে বেশ শীত পড়ে। বাক্স পেঁটরা ঘেঁটে অন্নপূর্ণা কোত্থেকে বহুদিনের পুরোন একটা সোয়েটার বের ক'রে দিয়েছেন বিবিপিনবাবুকে। ক'দিন ধ'রে তাই গায়ে দিচ্ছেন তিনি। কয়েকটা জায়গায় বড় বড় ফুটো হ'য়ে গেছে সোয়েটারটার। তার ভিতর দিয়ে ময়লা গেঞ্জিটা চোখে পড়ছে। খাটো কাপড়খানা হাঁটুর নিচে আর নামেনি। মুখে দু'তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমেছে। মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে সাদা হ'য়ে গেছে। বিজনের মনে পড়ল সেদিন বয়সের হিসেব ওঠায় বাবা বলেছিলেন তাঁর বয়স একষট্টি। কিন্তু দেখায় যেন আজকাল আরো বছর দশেক বেশি। অভাব অনটন আর জরার ভারে নুয়ে পড়া বাবার সেই জীর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন মমতা বোধ করল বিজন।

আস্তে আস্তে ডাকল, 'বাবা।'

বিনিপবাবু মালসা থেকে ছোট একটা চিমটের সাহায্যে কল্কেতে ঘুটের আগুন তুলছিলেন, ছেলের ডাক শুনে তার দিকে তাকালেন, 'কি বলছিস।'

বিজন বলল, 'আমি তাহলে রওনা হই। বেলা তো আর বেশি নেই, গোটা চারেক বাজে।'

বিপিনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তা বাজে বোধহয়। হুঁকোটা দে তো এগিয়ে।'

একটু দূরে বাঁশের খুঁটিতে ছোট্ট হুঁকোটি ঠেস দেওয়া রয়েছে। বিজন সেটি এগিয়ে দিতেই বিপিনবাবু বললেন, 'চিঠিটা একটু লম্বা হয়ে গেছে নারে? খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে ফের লিখে দেব?'

বিজন বলল, 'না বাবা তাতে দেরি হ'য়ে যাবে। থাক না, যা আছে বেশ আছে।'

হুঁকোয় দু'একটি টান দিয়ে বিপিনবাবু দাঁত বার ক'রে হাসলেন, বললেন, 'বেশ আছে? সত্যি বলছিস?'

সাদা ঝকঝকে সুন্দর দু'পাটি দাঁত। অমন তোবড়ানো মুখে এমন তাজা সব দাঁত কেমন যেন একটু বিসদৃশ লাগে। এ দাঁতগুলি বিপিনবাবুর নিজস্ব নয়। তাঁর আর একজন প্রাক্তন ছাত্রের দান। ডেন্টিস্ট অনিমেষ রায় ভূতপূর্ব শিক্ষকের ক্ষয়ে যাওয়া নড়বড়ে দাঁতগুলি তুলে ফেলে এই নতুন দাঁতের সেট বসিয়ে দিয়েছে। এই দাঁত দিয়ে বিপিনবাবু সজনের ডাঁটা আর মাছের কাঁটা সবই চিবুতে পারেন, স্ত্রীপুত্রের ওপর রাগ হ'লে প্রায় আগের মতই কিড়মিড় ক'রে দাঁতে দাঁত ঘষতেও পারেন, আবার কদাচিৎ মন যখন প্রসন্ন হয়ে ওঠে বাঁধানো দাঁতের সাহায্যে হাসতেও কোন অসুবিধে হয় না।

কিন্তু শুধু বাঁধানো দাঁত বলেই নয় আজ বাবার মুখের এই হাসি অন্য কারণেও বিসদৃশ লাগল বিজনের। কালকের খাবারের সংস্থান যাঁর ঘরে নেই তিনি আজ এমন ক'রে হাসেন কোন্ মুখে, কোন আক্কেলে? ছেলের গম্ভীর মুখ দেখেও বিপিনবাবু ফের একটু হাসলেন, বললেন, 'জানিস বিজু, আমার সেই পুরোন ছাত্রদের কাছে যখন চিঠি লিখি আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে যাই। লেখার সময় এ কথা মনেই হয় না আমি সামান্য টাকার জন্যে দয়া ভিক্ষা ক'রে তাদের কাছে চিঠি লিখতে বসেছি। জানিস, স্কুলে কলেজে পড়বার সময় আমারও একটু একটু লেখার শখ ছিল। চিঠি লেখার সময় সেই নেশা যেন আমাকে ফের পেয়ে বসে।'

অন্নপূর্ণা বিকালের কাজে হাত দিয়েছিলেন, ঘর ঝাঁট দিয়ে হ্যারিকেনটা পরিষ্কার করে তাতে তেল ভরলেন। তারপর একফাঁকে স্বামীকে এসে তাড়া দিয়ে বললেন, 'আর বক বক্ না ক'রে ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দাও। ও চলে যাক। যাদবপুর থেকে সেই মানিকতলা, রাস্তা তো কম নয়। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তারপর আজ যদি কিছু জোগাড়-টোগাড় ক'রে না আনতে পারে তাহ'লে কাল—'

বিজন বলল, 'তুমি ভেব না মা, কালকের অবস্থা যে কি হবে তা তো নিজেই জেনে গেলাম। বেরোচ্ছি যখন, কিছু না কিছু জোগাড় না করে আর ফিরব না।'

বিপিনবাবুও আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি ভেব না বিজুর মা, আমার চেয়ে ছেলে আরো ওস্তাদ। মানুষের মনের মধ্যে কি করে ঢুকতে হয় সে বিদ্যা ওকে শিখিয়ে দিয়েছি। বুড়ো মানুষ, আমাকে

দেখলে তাদের মনে যতটা দয়া না হয় বিজুকে দেখলে, ওর কথা শুনলে—'

বিজন বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক বাবা।'

বিপিনবাবু আবার একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাহ'লে থাক।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলে লজ্জা পাচ্ছে। ও বয়সে আমিও ওইরকমই ছিলাম। কিছু ভাবিসনে বাবা। তোকে নিজের মুখে বেশি কিছু বলতে হবে না। চিঠিটা এমন ভাবে লিখেছি যে, তা যে পড়বে তারই চোখ দিয়ে জল বেরোবে।'

বিজন আর কোন কথা না বলে চিঠিখানা হাতে নিল। ওপরের পিঠে পরিষ্কার করে বিপিনবাবু পরিতোষ রায়ের নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেটে রাখল চিঠিটা। তারপর বারান্দা থেকে উঠানে নামল।

এই জবরদখল কলোনীর চার কাঠা জমি ভাগে পড়েছে বিজনদের। আশেপাশের প্রতিবেশীরা ওই জমিতেই কেউ কেউ দু'তিনখানা ঘর তুলেছে। কিন্তু বিপিনবাবুর একখানার বেশি ঘর তোলবার সামর্থ্য হয়নি। উঠানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সেই জমিতে মুলো-বেগুনের চাষ করেছেন বিপিনবাবু। ফলন যে বেশি হয়েছে তা নয়। তবে ঘরে যখন আর কিছুই থাকে না দুটো মুলো তুলে নিয়ে অন্নপূর্ণা ভাতে দেন, কি একটা বেগুন পুড়িয়ে দেন ছেলেমেয়েদের পাতে। মাছ তরকারি কেনবার মত পয়সা প্রায়ই থাকে না। কোন রকম দুটি চালের সংস্থান করতে পারলে তরকারির জন্যে আর ভাবেন না অন্নপূর্ণা।

উঠানে নেমে সেই মুলোর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বিজন হঠাৎ বলল, 'মা, গোটাচারেক মুলো আমার এই রুমালখানায় বেঁধে দাও দেখি।' অন্নপূর্ণা অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা চার চারটে মুলো দিয়ে কি করবি তুই?'

বিজন বলল, 'পরিতোষবাবুর জন্য নিয়ে যাবো। বলব আপনার বুড়ো মাস্টারমশাই, তাঁর নিজের ক্ষেতের মুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বিপিনবাবু খুশী হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখেছ ছেলের বুদ্ধি? মুলোর কথাটা তো আমার মনেই হয় নি। দাও বিজুর মা দিয়ে দাও। আর ভয় নেই, বিজু আমার পারবে। কি করে বড়লোকের মন ভেজাতে হয় ও তা শিখে ফেলেছে।'

অন্নপূর্ণা বললেন, 'আমার হাত আটকা, তুই নিজেই তুলে নে।'

বিজন ক্ষেত থেকে বেছে বেছে চারটে মুলো তুলে নিল। তারপর রুমালে ভালো করে সেগুলিকে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাকা ধারের চেষ্টায়।

কলোনীর বাইরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় বিজনের হাফপ্যান্ট-পরা দুই ভাই শিবু আর নবু আর ফ্রকপরা বার তের বছরের বোন লীলা সমবয়সীদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলছিল, বিজনকে দেখে কাছে এগিয়ে এল, 'কোথায় যাচ্ছ দাদা?'

লীলা বলল, 'দাদা শহরে যাচ্ছ বুঝি? আমার জন্য একগজ কাপড় এনো।'

বিজন সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'তোরা এবার ঘরে যা, ঠাণ্ডা লাগবে।' শীত পড়েছে, কিন্তু শীতবস্ত্র ওদের গায়ে ওঠে নি, পুরোন পাতলা জামা। তাও ছিঁড়ে গেছে।

খানিকটা পথ হেঁটে বিজন গিয়ে বাসে উঠল, আজ যে ভাবেই হোক পরিতোষবাবুর কাছ থেকে টাকা তাকে সংগ্রহ ক'রে আনতেই হবে। পুরো পঁচিশ টাকা না হোক দশ পনের যা তিনি দেন তাই নিয়ে আসবে বিজন। নইলে কাল আর সংসার চলবে না।

বছরখানেক ধরে এই ভাবেই চলেছে বিজনদের। কলোনীর প্রতিবেশীদের কাছে হাত পাতলে আর কিছু মেলে না, আত্মীয়স্বজন চেনাজানা বন্ধুবান্ধব কারো কাছ থেকেই যখন নতুন কিছু আর প্রত্যাশা করবার নেই সেই সময় গড়িয়াহাটার মোড়ে পুরোন ছাত্র নিরঞ্জন সেনগুপ্তর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল বিপিনবাবুর। বিজন সেদিনও বাবার সঙ্গেই ছিল। দূর সম্পর্কের আত্মীয় অমিয় মুখুয্যে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। থাকেন রাসবিহারী এভিনিয়ুতে। ছেলের চাকরির উমেদারির জন্যে বিপিনবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি চা-টা খাইয়ে আপ্যায়ন করে তারপর

বললেন, 'কি যে বলেন বিপিনদা, কত বি এ পাশ এম এ পাশ ছেলে চাকরি চাকরি করে হায়রান হয়ে যাচ্ছে আর একটি আই এ ফেল ক্যাণ্ডিডেটের জন্যে আমি কোথায় কাকে ধরব ।যার কাছে যাব সে-ই তো বলবে—তার চেয়ে আমি বলি কি, ও আবার কলেজে ভর্তি হোক । ডিগ্রীটি নিয়ে যদি বেরোতে পারে তখন— ।'

বিপিনবাবু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'সে আর সম্ভব নয় ভাই । ছেলেকে ফের কলেজে পড়াব আমার সে সঙ্গতি কোথায়— ।'

অমিয়বাবু বলেছিলেন, 'বেশ তাহলে টেকনিক্যাল কিছু শিখুক, কি কোন একটা দোকানপাট দিয়ে বসুক ।'

চাকরি ছাড়া আরো নানারকম জীবিকার সন্ধান অমিয়বাবু বিজনকে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সাধ্যমত সাহায্য করবার কথাও বলেছিলেন তিনি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আর হয়ে ওঠে নি ।

বিমর্ষমুখে অবসন্ন মনে ছেলেকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলছিলেন বিপিনবাবু, হঠাৎ সুট-পরা সুদর্শন সাতাশ আটাশ বছরের এক যুবককে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে আমাদের নিরু না ? নিরঞ্জন, ও নিরঞ্জন ।'

যুবকটি রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ডাক শুনে ফিরে তাকাল, তারপর খানিকটা এগিয়ে এসে বিপিনবাবুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে হেসে বলল, 'ও আমাদের মাস্টারমশাই ।'

মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নেওয়ার ভঙ্গি করল নিরঞ্জন, তারপর ফের সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'চেহারা টেহারা একেবারে বদলে গেছে যে মাস্টারমশাই, প্রথমে দেখে তো চিনতেই পারিনি । এত বুড়ো হ'য়ে গেলেন কি করে ?' বিপিনবাবু বললেন, 'আর বাবা বুড়ো হব তাতে আর বিচিত্র কি । যা ঝড় ঝাপটা যাচ্ছে, তাতে এখন পর্যন্ত টিকে যে আছি—'

নিরঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'কি যে বলেন মাস্টারমশাই, আপনি এখনো অনেককাল বাঁচবেন । এমন কি আর বয়স হয়েছে আপনার, চুলটা একটু বেশি পেকে গেছে অবশ্য । কিন্তু তাতে কি এসে যায় । সবচেয়ে বড় কথা হ'ল দাঁত । দাঁতগুলি যদি বাঁধিয়ে নেন, আর যদি ভালো করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারেন তা'হলে দেখবেন দু'মাসের মধ্যে আপনার চেহারা ফিরে গেছে ।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তা তো বুঝলুম । কিন্তু কোত্থেকে দাঁত বাঁধাব বাবা, জানাশোনা তো কেউ নেই-- ।

নিরঞ্জন বলল 'আজ্ঞে এই রাসবিহারী এভিনিয়ুতে আমারই চেম্বার আছে । যদি বলেন আমিই সব ঠিক ঠাক ক'রে দিতে পারি ।'

বিপিনবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'তাহ'লে তো বাপু ভালোই হয় । গরীব মাস্টাররের দাঁতগুলি তুমি যদি বাঁধিয়ে দাও তাহ'লে তো বেঁচে যাই বাবা । সকলের মুখে শুনি দাঁতের মধ্যেই আজকাল জীবন । দাঁত খারাপ থাকলে নানারকমের রোগব্যাধি এসে ধরে । তুমি নিজে দাঁতের কারবারী তুমি সবই জান । তবে খরচপত্তর আমি কিন্তু তেমন কিছু দিতে পারব না নিরু । যদি কিছু কর গরীব মাস্টারের ওপর দয়াধর্ম করেই তোমাকে করতে হবে ।'

একথা শোনার পর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ডেন্টিস্টের মুখ । তবে মুহূর্তকাল বাদেই সেই অপ্রসন্ন মুখে হাসি টেনে নিরঞ্জন বলেছিল, 'আচ্ছা তা নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না আপনাকে । কাল আসবেন, আমার চেম্বারে ।'

বিপিনবাবু একা পথ চিনে যেতে পারবেন না । তাছাড়া দাঁত তোলার ব্যাপারে তাঁর ভয়ও আছে । তাই বিজনই বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল । দু'দিন একদিন নয়, দিন পনেরই লেগেছিল সবসুদ্ধ । টুইশনের সময় বাঁচিয়ে বাবাকে রোজ তাঁর সেই ডেন্টিস্ট ছাত্রের চেম্বারে নিয়ে যেত বিজন । নড়ে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া অবশিষ্ট দাঁতগুলি তুলে ফেলে নিরঞ্জন মাস্টারমশাইর দু'পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে দিল । বিপিনবাবু কোঁচার খুঁট খুলে একখানি দশ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর বেশি আমার সাধ্য নেই বাবা, তুমি যদি দয়া করে—'

নিরঞ্জন হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'ওর দরকার নেই মাস্টারমশাই ; ও আপনি রেখে দিন । ছেলেবেলায় আপনার কাছে লেখাপড়া শিখেছি--- ।'

বিপিনবাবু অভিভূত হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'তা তো হাজার হাজার ছাত্রই শিখেছে বাবা। কিন্তু তোমার মত ক'জন ছেলে সেকথা মনে রাখে। ক'জনে এমন করে গুরুদক্ষিণা দিতে জানে। ক'জনের এতবড় হৃদয় আছে। এ যুগে যে দৃষ্টান্ত তুমি দেখালে বাবা—।'

নিরঞ্জনের সব রকমের সমৃদ্ধি কামনা করে বিপিনবাবু ছেলেকে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সেই দাঁত থেকেই শুরু। নিরঞ্জনের কাছ থেকে আরো কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের ঠিকানা পেলেন বিপিনবাবু। তাদের মধ্যে দাঁতের ডাক্তার অবশ্য আর কেউ হয়নি। তবে সবাই চাকরি বাকরি নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু'একজন উকিল প্রফেসর মোটা মাইনের সরকারী চাকুরেও তাদের ভিতর থেকে বেরোল। আর ছেলের হাত ধরে পুরোন ছাত্রদের কাছে গিয়ে হানা দিতে লাগলেন বিপিনবাবু। প্রত্যেকের কাছে যান, সেই পুরোন স্কুলের গল্প করেন। তারপর দাঁত বার করে দেখান একজন ভক্তিমান কৃতজ্ঞ ছাত্র কিভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। প্রথম দিন তিনি আর কোন দাক্ষিণ্য দাবী করেন না। শুধু বিজনের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দেন আর বলেন, 'তোমার এই দাদাদের মত হও। যেপথে এরা বড় হয়েছে সেই পথে চল। ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার চেয়ে সংসারে যে বড় কিছু আর নেই তা এদের কাছ থেকে শিখে নাও।'

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন দেখা ক'রে বিজনের জন্যে একটি চাকরি প্রার্থনা করেন বিপিনবাবু। তারপর থেকে নিজে আর আসেন না। ডবল ট্রাম বাসের ভাড়া দিয়ে আর লাভ কি। বিজনই বাবার লেখা হাত চিঠি নিয়ে তার পুরোন ছাত্রদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। কারো কাছে চাকরির উমেদারী, কারো কাছে বিশ পঁচিশ টাকা ধারের জন্যে আবেদন, কারো কাছে বা আরো পাঁচজন ছাত্রের ঠিকানা চেয়ে চিঠি লেখেন বিপিনবাবু। সব জায়গায় সমান সাড়া পাওয়া যায় না। অনেক ছাত্রই পত্রপাঠ বিদায় করে। কি বড়জোর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। নগদ বিদায় অনেকের কাছ থেকেই মেলে না। আবার কারো কারো কাছ থেকে মেলেও। সেই দুর্লভ গুরুভক্তদের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াতে হয় বিজনকে। তাছাড়া আর উপায় কি।

প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা করত, ভারি সংকোচ হ'ত বিজনের। কিন্তু এখন আর হয় না। এখন নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত ক'রে বলবার ক্ষমতা বাবার চেয়েও বিজনের বেড়ে গেছে। অবশ্য দিনের পর দিন যা অবস্থা হ'চ্ছে তাতে আর অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। সত্যকথা বললেই বিপিনবাবুর ছাত্ররা তাকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করে। অবশ্য ধার চাইলে কারো কারো কাছ থেকে যে দু'পাঁচ টাকা না মেলে তা নয়। কিন্তু যার কাছ থেকে বিজনরা নেয় ফের আর তার কাছে যেতে পারে না। কারণ ধার আর শোধ দেওয়া হয় না। কিন্তু বিপিনবাবুর সহৃদয় প্রাক্তন ছাত্ররা তো আর অসংখ্য নয়। তাই তাদের সংখ্যাও একদিন স্বাভাবিক ভাবে কমে আসে। তবু নানা অজুহাতে বিজন গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে। বাবা মা ই ঠেলে পাঠিয়ে দেন। কাকে দিয়ে কোন উপকার হবে বলা যায় না। বাড়ি বসে থেকে কি হবে। বরং যারা চাকরি বাকরি করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে দেখাসাক্ষাৎ করলে একটা হদিশ এক সময় মিলেও যেতে পারে। নিদেনপক্ষে দু'একটা টুইশন জুটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বিজনও সেই আশায় ঘোরাঘুরি করে। বাবার পুরোন ছাত্রদের কারো বা বাসায় কারো বা অফিসে গিয়ে দেখা ক'রে বলে, হাত ঠেকা বলে ধারের টাকাটা বিপিনবাবু এমাসে শোধ দিতে পারলেন না, সেজন্য ছাত্রের কাছে তিনি বড়ই লজ্জিত হ'য়ে রয়েছেন।

উত্তমর্ণ ছাত্ররা মুখে সৌজন্য দেখিয়ে বলে, 'তাতে কি হয়েছে। মাস্টারমশাইকে বলো তিনি যেন ও নিয়ে কিছু মনে না করেন, সামান্য টাকা, যখন সুবিধে হয় দেবেন।'

মনে মনে তারা বোধহয় এই ভেবে আশ্বস্ত হয়, আগের টাকা শোধ না দিয়ে বিজনরা দ্বিতীয়বার ধার চাইতে পারবে না, যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করা ছেড়ে ভবিষ্যতে বিজনদের জন্যে যে আর কিছু যাবে না সেই ভেবেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। এই বছর দেড়েকের মধ্যে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছে বিজন। কে কি প্রকৃতির মানুষ, কার কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে না যাবে তা দু'চার মিনিটের মধ্যেই সে বুঝতে পারে।

প্রত্যাশা ক্ষীণ হয়ে এলেও বিজন তাদের কাছে মাঝে মাঝে যায়। হবে না জেনেও চাকরির জন্যে অনুরোধ করে। বাবার কোন পুরোন ছাত্র হয়ত ভদ্রতা ক'রে এক কাপ চা খাওয়ায়, আবার কেউ বা শুধু সংক্ষেপে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই নিজের ফাইল পত্রে মধ্যে ডুবে যায়। বিজন চালাক হয়ে গেছে। সে ইঙ্গিত যেন সে বুঝেও বোঝে না। টিফিনের সময়ের জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে। তারপর অনিচ্ছুক দাতার চা আর খাবারে ভাগ বসায়। ভাবখানা যেন এই, 'যে স্বেচ্ছায় দেবে না তার কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার কেড়ে নাও। বেশি কাড়বার ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু যেটুকু তোমার প্রাপ্য সেটুকুও যে না কাড়লে পাবে না।'

এমনি করে কারো কাছ থেকে এক কাপ চা কারো কাছ থেকে একটি সিগারেট, কারো অফিস থেকে একটা ফোন করবার সুবিধে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যখন বিজনের চলেছে, বাবা তাঁর আর একটি কৃতী ছাত্রের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

পরিতোষ এতদিন মেদিনীপুরের এক মফঃস্বল কলেজে পড়াত, চেষ্টাচরিত্র ক'রে কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছে। তার ঠিকানা পেয়ে বিপিনবাবু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তার কলেজে দেখা করতে গেলেন। বিপিনবাবুর প্রথম জীবনের ছাত্র পরিতোষ রায়, তার বয়সও বছর পঁয়তাল্লিশ হয়েছে। সৌম্যদর্শন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। বিপিনবাবুকে দেখেই চিনতে পারল পরিতোষ। নিজের একদল ছাত্রের সামনেই হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বিপিনবাবুর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে দেখে দুঃখ জানাল। বিজনের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করল। এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে জেনে সহানুভূতি প্রকাশ করল পরিতোষ। নিজেই এক সময় প্রস্তাব করল, 'তুমি ফের কলেজে ভর্তি হয়ে যাও না। প্রিন্সিপালকে ধ'রে যতটা সম্ভব সুবিধে সুযোগ ক'রে দেওয় যায় তার চেষ্টা করব।'

বিপিনবাবু হেসে বললেন, 'বাবা তুমি যখন এখানে রয়েছ সুবিধের জন্যে আমার ভাবনা কি। কিন্তু পড়বে যে, কি খেয়ে পড়বে। যদি দিনের বেলায় একটা কাজকর্ম কিছু জুটত তাহ'লে রাত্রে নিশ্চিন্তে এসে ক্লাস করতে পারত। তুমি তেমন কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পার কিনা সেই চেষ্টা করে দেখ।' একথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল পরিতোষ, বলেছিল, 'বড় কঠিন সমস্যা মাস্টার মশাই। আজকাল অনেকেই এসে কাজ কর্মের কথা বলেন। কিন্তু কারো জন্যই কিছু ক'রে উঠতে পারি নে। আমাদের কতটুকুই বা সাধ্য কতটুকুই বা শক্তি। তবু জানা রইল। যদি খোঁজ খবর কোথাও পাই, নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব।'

বিপিনবাবুরা বিদায় নেওয়ার আগে পরিতোষ কলেজের বেয়ারাকে ডেকে বড এক ঠোঙা মিষ্টি আনাল। সিঙ্গারা, নিমকি, রসগোল্লা, সন্দেশ।

বিপিনবাবু মনে মনে খুশী হলেন, কিন্তু মুখে একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এসব আবার কি, দেখ দেখি কাণ্ড।'

কলেজ কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে বিপিনবাবু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরিতোষকে তোর কেমন মনে হ'ল রে।'

বিজন বলল, 'ভালোই তো।'

বিপিনবাবু বললেন, 'ছেলেটি ভাল, উপকার টুপকার পাওয়া যাবে কি বলিস?'

মনুষ্যচরিত্র বিশেষজ্ঞ বিজন বলল, 'হ্যাঁ, দু'দশ টাকা ধার চাইলে মিলতে পারে।'

এই ধার চাওয়ার উপলক্ষ আরো আগেই কয়েকবার এসেছিল। কিন্তু সবাই মিলে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। হাত পাতবার মত ওই একটি মাত্র স্থান, একটি মাত্র পাত্রই যখন আছে, সহজে তা নষ্ট করা যায় না। কিন্তু এমাসে প্রায় সপ্তাহখানেক ধ'রে বিজন আরো বহু জায়গায় চেষ্টা করেছে, বাবার পুরোন বহু ছাত্রের কাছে গেছে। নিজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছেও ঘোরাঘুরি করেছে, কোথাও কোন সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি। আজ তাই পরিতোষ রায়ই একমাত্র সম্বল। যেমন করেই হোক বাবার চিঠি দেখিয়ে নিজেদের দুঃখদুর্দশা আর বানানো অসুখ বিসুখের সকরুণ বর্ণনা করে পরিতোষবাবুর কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা তার আদায় ক'রে নিয়ে যেতেই হবে। বিজন একবার ভাবল বাবার চিঠিতে যেখানে পঁচিশ লেখা আছে সেটা কেটে ওখানে পঞ্চাশ টাকা বসিয়ে দেবে কি

না। কারণ যা নেওয়ার তাতো একবারই নেবে। বাবাব অন্যান্য ছাত্রদের বেলায় যা হয়েছে এখানেও তাই হবে। ধারের টাকা শোধ দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয়বার এসে কিছু চাইতেও পাববে না বিজন। কিন্তু টাকার অঙ্কটাকে দ্বিগুণ করতে শেষ পর্যন্ত আর সাহস হল না বিজনের। মাসেব এই তৃতীয় সপ্তাহে যদি অত টাকা না দেন পরিতোষবাবু। তাছাড়া দান তো শুধু দাতার ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে না, পাত্রের যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্নও সে ক্ষেত্রে আছে। বিজনদের চেহারা দেখে আর অবস্থার কথা শুনে পঞ্চাশ টাকা ধার দেওয়ার মত সাহস কি কারো হবে? তাই ও লোভ সম্বরণ করাই ভালো।

মাণিকতলার মোড়ে এসে স্টেট-বাসের ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল বিজন। পকেট ডায়েরি খুলে রাস্তার নাম নম্বর দেখে নিল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। পুবমুখে ব্রীজের দিকে খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকের ফুটপাতে গোলাপী রঙের দোতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা চোখে পড়ল। গায়ে আঁটা নম্বরটাও। সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাস্তার দু'দিকের বাড়িগুলির জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায়। সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল বিজন। তারপর পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টেপার শব্দ হল, শব্দ হ'ল খিল খোলার তারপর শোনা গেল মধুর একটু কণ্ঠ, 'কে?'

একটি তন্বী, শ্যামবর্ণা মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স সতের আঠের হবে। বিজন চেয়ে দেখল, শুধু গলার স্বরই মিষ্টি নয়, চেহারাটিও মিষ্টি। কালো চোখ আর কোমল চিবুক যেন লাবণ্যে মাখা, বিজন মৃদু স্বরে বলল, 'পরিতোষবাবু আছেন?'

'বাবা? না উনি তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

মেয়েটির চোখে কৌতূহল। সে কৌতূহলে জীবনের উচ্ছলতা।

বিজন একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'অনেক দূর থেকে। কোথায় গেছেন আপনার বাবা?'

'বেশি দূর নয় কাছেই। সিমলায় আমার পিসেমশাইর বাড়ি, সেখানে গেছেন। বাবা মা দু'জনেই বেরিয়েছেন। বেশি দেরি হবে না। ন'টার মধ্যেই ফিরবেন। আসুন না, ভিতরে আসুন।'

এমন সৌজন্য বিজন আর কোথাও দেখে নি, আশ্চর্য, কথা এমন মধুর হয় কি করে।

দ্বিতীয় বারের অনুরোধে মেয়েটির পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে ঢুকল বিজন। অনুগামী হওয়ায় যে এত সুখ তা এতদিন কল্পনারও বাইরে ছিল। সদর দরজা আলগোছে ভেজিয়ে দিয়ে সরু প্যাসেজ পার হয়ে মেয়েটি বাঁ দিকের একটি ঘরে ঢুকল। তারপর একখানা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

ছোট্ট সাজানো সুন্দর একটি ড্রইংরুম। খান কয়েক নিচু চেয়ার। একটি সোফা। খোলা র‍্যাক আর দু'টি তালাবন্ধ আলমারি বইতে একেবারে ঠাসা। দেয়ালে দু'খানি মাত্র ফটো। একখানা রবীন্দ্রনাথের আর একখানা গান্ধীজীর। ডান দিকে ছোট একটি টেবিল। তাতে ফুল তোলা ফিকে নীল রঙের টেবিল ঢাকনি। কালো মলাটের বাঁধানো একখানি বই উপুড় করা। বেশ বোঝা যায় মেয়েটি এতক্ষণ এখানে বসে পড়ছিল। একটু বাদে মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'রুমালে বাঁধা আপনার হাতে ওটা কি। দিন না আমি রেখে দিচ্ছি।'

বিজন লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না আমিই রাখছি।'

পুঁটলিটা নামিয়ে রাখবার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না বিজনের, এবার সে পায়ের কাছে মুলোর পুঁটলিটা রেখে দিল।

মেয়েটি এগিয়ে এসে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে বলল, 'আহা ওখানে রাখলেন কেন? কি এর মধ্যে? বড় বড় পাতা দেখা যাচ্ছে।'

বিজন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ও কিছু নয়। সামান্য কয়েকটা মুলো আমাদের ক্ষেতের।'

মেয়েটি প্রসন্ন সুরে বলল, 'মুলো? দেখাচ্ছিল কিন্তু সাদা সাদা ফুলের মত।'

বিজন ভাবল ফুল হলেই ভাল হ'ত।

মেয়েটি বলে চলল, 'আপনাদের নিজেদের ক্ষেতের, না? জানেন আমারও মাঝে মাঝে ক্ষেতে

ফুল ফলের চাষ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এখানে ক্ষেত কোথায় পাব বলুন? টবেই সাধ মেটাতে হয়। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি আমার বাবার ছাত্র?'

বিজন একটু হাসল, 'না, আপনার বাবাই বরং আমার বাবার ছাত্র ছিলেন।'

'ও। ভাবতে কি অদ্ভুত লাগে আমার বাবাও একদিন ছাত্র ছিলেন,' বলে মেয়েটি হাসল। সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট দাঁত।

একটু বাদে সে আবো বলল, 'আপনি বসুন। র‍্যাক থেকে বই টই নিয়ে দেখুন বরং। আমার আবার সামনেই পরীক্ষা। প্রি টেস্ট। পড়াশুনো কিচ্ছু হয়নি। সেইজন্যেই বাবা সঙ্গে নিলেন না।'

মেয়েটি টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কিন্তু কেউ চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো কারো চলে যাওয়ার ছন্দ থেকে যায়। ঘরের মধ্যে চুলের গন্ধ, শাড়ির গন্ধ, গায়ের গন্ধ ভাসতে থাকে।

বিজন চুপ ক'রে চেয়ারটায় বসে রইল। সময় কাটাবার জন্যে র‍্যাক থেকে কোন বই তুলে নিতে তার ইচ্ছা হ'ল না। এই ছন্দে ভরা গন্ধে ভরা কয়েকটি মুহূর্ত শেষ হয়ে ফুরিয়ে যাক তা যেন বিজন চায় না। ভারি স্নিগ্ধ মেয়েটির স্বভাব, ভারি মধুর ওর কথা বলবার ভঙ্গি। আর সে আছে ওই পাশের ঘরেই, একটি বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে শুধু বিজন আর একটি অপরিচিতা মেয়ে। অপরিচিতা, কিন্তু সেই অপরিচয়ের ব্যবধান দুস্তর নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপে তারা পরস্পরের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কেউ কারো নাম জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। বাবার পুরোন ছাত্রদের সকলের নামইতো বিজনের মুখস্থ। কিন্তু শুধু নাম জানলে কতটুকুই বা জানা যায়। আবার নাম না জানলেও কতটুকুই বা জানতে বাকি থাকে।

পাশের ঘরের দরজায় সবুজ রঙের পর্দা দুলছে। সবখানি ঢাকা নয়, একপাশে ফাঁক আছে একটু। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে খানিকটা দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে। পরীক্ষার্থিনীর হাতে বই, কিন্তু মন যে বইতে নেই তা তার দ্রুত পাতা ওলটাবার ধরন দেখেই বুঝতে পারছে বিজন। পাশের ঘর থেকে একটি ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ভারি অদ্ভুত লাগছে বিজনের। চাকরির উমেদারী আর টাকা ধারের জন্যে বাবার ছাত্রদের খোঁজ ক'রে ক'রে টালা থেকে টালীগঞ্জ আর বালী থেকে বেলেঘাটা কত জায়গাতেই না ঘুরে বেড়িয়েছে বিজন। কিন্তু এমন একটি রঙিন মধুর অপূর্ব সন্ধ্যা জীবনে কই আর তো কোন দিন আসে নি।

একটু বাদে মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল, 'আপনার একা একা ব'সে থাকতে ভারি অসুবিধে হচ্ছে, না?'

বিজন বলল, 'ওরা যে কত দেরি করবেন তা কে জানে?'

'আপনাকে তখন বলিনি, ওদের একটু বেশি দেরিই বোধ হয় হবে।'

বিজন বলল, 'কেন?'

মেয়েটি একটু হাসল, আমার পিসতুতো বোনের বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। আজই পাকাপাকি হওয়ার কথা তাই পিসেমশাই ওদের খবর দিয়েছেন।'

বিজন বলল, 'ও।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'দেখুন কাণ্ড, আপনি এতক্ষণ ধ'রে বসে আছেন এক কাপ চা পর্যন্ত করে দেইনি। মা শুনলে আচ্ছা বকুনি লাগাবেন।'

বিজন বলল, 'না না চা থাক। আপনার মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে।'

মেয়েটি বলল, 'কিছু নষ্ট হবে না। এক কাপ চা করতে আর কতটুকু সময় লাগবে। আপনি বসুন। এক্ষুনি আসছি আমি।'

খানিক বাদে সাদা সুন্দর একটি কাপে চা ক'রে নিয়ে এল মেয়েটি। দামী চা, স্বাদে এবং সৌরভে অপর্ব। একি চায়ের স্বাদ, না একটি মনোরম সন্ধ্যার স্বাদ, না পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ, বাইশ বছরের তরুণ বিজনের পক্ষে তা স্থির করা দুঃসাধ্য হল। কখন মেয়েটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে। সে বিজনের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আপনার বোধহয় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, না? কিন্তু ওঁরা এক্ষুনি এসে পড়বেন। ন'টা বাজল, বাবা এসে পড়বেন। ন'টার কথাই

তিনি বলে গেছেন। তিনি খুব পাংচুয়াল।' কিন্তু একথা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজন উঠে দাঁড়াল। যেন হঠাৎ তার কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি –'

বিজন বলল, 'আমি এবার চলি। আমার বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে।'

মেয়েটি একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলল, 'ওদিককার বাস এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় নাকি। কিন্তু কতদূর থেকে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন বলে এলেন, অথচ দেখা হ'ল না –'

'আপনার সঙ্গে তো দেখা হ'ল।' কথাটা মনে মনে বলল বিজন। তাকে দোরের বাইরে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে মেয়েটি বলল,'কি দরকারে এসেছিলেন তা তো কিছু বলে গেলেন না। বাবাকে কি বলব।'

বিজন জবাব দিল, 'বলবেন, অমনি দেখা করতে এসেছিলাম। আমার নাম বিজন, বিজন চক্রবর্তী।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল 'আর তো কেউ নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের ইনট্রডিউস ক'রিয়ে দিই। আমার নাম সুনন্দা, সুনন্দা রায়। আর একদিন আসবেন, বাবাকে বলে রাখব।'

বিজন মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর দ্রুতপায়ে একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বাবার চিঠিটা এখনো পকেটের মধ্যে ভাঁজ হয়ে রয়েছে। রাত পোহালে একসের চাল কিনবার মত পয়সা নেই ঘরে। যত দেরিই হোক পরিতোষবাবুর জন্যে অপেক্ষা করে তারপর তাঁর হাতে বাবার চিঠি পৌঁছে দিয়ে পুরো পচিশ না হোক দশ পাঁচ যা পাওয়া যায় তাই ধার ক'রে নিয়ে যাওয়াই বিজনের উচিত ছিল।

কিন্তু সব সময় সব উচিত কাজে কি মন সায় দেয়। সারা শহরের মধ্যে একটিমাত্র ঘর একটিমাত্র পরিবারও কি তার জানা থাকবে না যেখানে বিজন চাকরির উমেদার হয়ে আসবে না, যেখানে সে ধারের টাকার জন্য হাত পাতবে না, শুধু মাঝে মাঝে একটি কি দু'টি গন্ধঘন আলোজ্বলা সন্ধ্যা বিনা দরকারে এসে কাটিয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে সার্কুলার রোডের দিকে এগুতে লাগল বিজন। আর কোন উপায়ই কি নেই? এই পৃথিবীভরা মরুভূমির মধ্যে এক ছিটে স্নিগ্ধ শ্যামল ওয়েসিসকে বাঁচিয়ে রাখবার মত আর কোন উপায়ই কি বিজন খুঁজে বার করতে পারবে না?

অগ্রহায়ণ ১৩৬১

পুনশ্চ

শীতে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শনের পর সুধাময়ী বললেন, 'আর ভালো লাগছে না জগু। চল কলকাতায় ফিরে যাই।' জগদীশ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি মা, এখনো তো তোমার ত্রিতীর্থ হল না। এরইমধ্যে ফেরার কথা ভাবছ! কেন এবার সবতীর্থ সেরে যাও না।' সুধাময়ী ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না বাবা। তীর্থ করবার সাধ আমার মিটেছে। তীর্থে গিয়ে কি দেখব? মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাই, আমার সেই শত্তুরদের মুখ ঠাকুরের মুখকে ঢেকে দেয়। দেবদেবীর মুখ কোথাও তো দেখতে পেলাম না। মিছামিছি তোর একরাশ টাকা নষ্ট হ'ল। আরো নষ্ট ক'রে লাভ কি।'

জগদীশ বিষণ্ণভাবে হাসলেন, 'টাকা রেখেই বা আর লাভ হবে কি মা। টাকা কার জন্যে রাখব! সেকথা যাক। তুমি এখন কি করতে চাও বল। কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?' সুধাময়ী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমাকে সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

জগদীশ মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যাব না। কাশী থেকে কত লোক রোজ কলকাতায় যাতায়াত করছে। তোমাকে সঙ্গী ধরিয়ে দিচ্ছি, টাকা দিচ্ছি, তুমি তাদের কারো সঙ্গে কলকাতায়

চলে যাও, আমি আরো ঘুরব।'

সুধাময়ী যেন ছেলের কথাগুলি প্রথমে ভালো ক'রে বুঝতে পারলেন না, অপলকে তাকিয়ে রইলেন জগদীশের মুখের দিকে। তারপর ছেলের দুহাত জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে, তুই কি এমনই নিষ্ঠুর। তুই আমাকে সেই শূন্য পুরীতে একা পাঠিয়ে দিতে চাস ? ওরে, তুই সঙ্গে না থাকলে আমি কি ক'রে সেখানে থাকব ? এ সংসারে তুই ছাড়া আমার আর কে আছে ?'

বাঙ্গালীটোলার ঘিঞ্জি পল্লী। গায়ে গায়ে ঘর। সুধাময়ীর কান্না শুনে ছেলে বুড়ো, নানাবয়সী স্ত্রীপুরুষ এসে জগদীশকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ বা কৌতুকে কেউ বা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ? উনি অমন ক'রে কাঁদছেন কেন ?'

জগদীশ আরো বিরক্ত আরো উত্যক্ত হয়ে উঠলেন, একটু রূঢ় ভাষায় জবাব দিলেন 'কিছু হয়নি, উনি অমনিই কাঁদছেন। আপনারা আসুন এবার।'

তারপর জোর ক'রে মাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন জগদীশ, চাপা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'মা, তুমি যদি কথায় কথায় অমন করে কাঁদ, সত্যি বলছি, আমি কোথাও পালিয়ে যাব।'

সুধাময়ী আরও শিউরে উঠলেন, ভয় পেয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন ছেলের হাত, 'ওরে জগু, কি বললি, তুইও পালাবি। আমার ভাগ্যে বোধহয় এখন তাই-ই আছে। ওরে শেষে তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি।' তারপর আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

এর ফলে নরম গলায় মিষ্টি ভাষায় মাকে ফের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন জগদীশ। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন সেই ভাষার মধ্যে প্রাণ নেই, আন্তরিকতা নেই। মাতৃবৎসল ছেলের ভূমিকায় নিজেকে বড়ই বেমানান মনে হ'তে লাগল জগদীশের। করুণরসের এমনই তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় যে, নিজের কাছেই তা হাস্যকর মনে হল।

তবু জগদীশ বললেন, 'না মা, কোথায় যাব আমি। তোমাকে ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি। আমি কালই তোমাকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় নিয়ে যাব। দিনরাত কাছে থাকব তোমার।'

সুধাময়ী এবার একটু শান্ত হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখের কোলে তখনো দু'ফোঁটা জল টলটল করছে।

মায়ের বয়স চুয়াত্তর, ছেলের বয়স ঊনষাট। কিন্তু দু'জনকে এখন প্রায় একবয়সীই দেখায়। বয়েসের তুলনায় সুধাময়ী বরং একটু বেশি শক্ত আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সবই অবশ্য পেকে সাদা হয়ে গেছে। চোখে এখনো চশমা নিতে হয়নি, শুধু মাড়ির দিকের তিনচারটে দাঁতই পড়ে গেছে কিন্তু সামনের দাঁতগুলি সবই অনড় আছে এখনো। বেঁটে ছোটখাট শরীর। তাই এত বার্ধক্যেও সামনের দিকে নুয়ে পড়েনি। এখনো বেশ খাড়া সোজা হয়ে চলেন সুধাময়ী। গায়ের চামড়া অবশ্য কুঁচকে গেছে, তবু যৌবনের রঙের ঔজ্জ্বল্য এখনো টের পাওয়া যায়।

আর ঊনষাটের তুলনায় জগদীশকে বেশি বয়স্ক মনে হয়। তাঁর শুধু মাথার চুলই পেকে সাদা হয়ে যায়নি, জরার আঘাতে দাঁতগুলিও জখম হয়েছে। সামনের দু'তিনটি দাঁত নেই। বাকি যেগুলি আছে, সেগুলিও নড়বড় করে, মাঝে মাঝে ভারি যন্ত্রণা দেয়। চলা ফেরায় বেশ শক্ত থাকলেও হাঁটবার সময় পৌনে ছ'ফুট দীর্ঘ দেহ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জগদীশের।

তাই মা আর ছেলেকে আজকাল সমবয়সীই দেখায়। সমবয়সী কেন বরং সুধাময়ীর চেয়ে জগদীশের বয়সই দু'চার বছর বেশি বলে মনে হয়। যাঁরা ওঁদের প্রকৃত সম্বন্ধ জানে না তারা হঠাৎ দেখলে ভাবে ভাই বোন। কেউ বা অন্যরকমও মনে করে। কিন্তু যে, যে রকম সম্বন্ধের কথাই ভাবুক এখন এঁরা পরস্পরের একমাত্র বন্ধন। দু'বছর আগে আসানসোল মোটর দুর্ঘটনায় আর সব শেষ হয়ে গেছে।

সে মোটরে ছিল জগদীশের স্ত্রী শৈলরাণী, ছেলে সুব্রত, মেয়ে সুলেখা, আর ছিল জগদীশের ছোট ভাই পৃথ্বীশ, তার স্ত্রী অনিমা, দুই ছেলে শুভেন্দু আর বিমলেন্দু। ড্রাইভ করে পৃথ্বীশই আসছিল কলকাতার দিকে। কিন্তু এসে আর পৌঁছানো হয়নি।

পৃথ্বীশ জগদীশেরই ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন। একই স্কুলে কলেজে পড়েছেন, শ্যামবাজারের পৈতৃক বাড়িতে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে নিয়ে একান্নভুক্তভাবে

কাটিয়েছেন। তবু ক্ষতির কথা মনে হলে নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যার কথাই আগে মনে পড়ে জগদীশের। আর সুধাময়ী কাঁদবার সময় পৃথ্বীশ আর তার দুই ছেলের নাম ধরেই বেশি কাঁদেন। শুভেন্দু আর বিমলেন্দুর বয়স অল্প ছিল, তারা ঠাকুরমার কাছে থাকত হয়ত সেইজন্যেই। তবু জগদীশ এটা লক্ষ্য না করে পারেন না যে এই প্রচণ্ড মৃত্যুশোকও যেন মা আর ছেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেন দু'জনে দুই আত্মীয়গোষ্ঠীকে হারিয়েছেন তাঁরা।

সুধাময়ীর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত জগদীশকে পরদিন কলকাতার দিকে রওনা হ'তে হ'ল। শ্যামপুকুরের সেই পুরোন দোতলা বাড়িতেই ফিরে এলেন তিনি। ফিরে আসবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। অন্তত বছরখানেক সারা ভারত ঘুরে বেড়াবেন সেই সঙ্কল্প আর সঞ্চয় নিয়েই তিনি বেরিয়েছিলেন। তাঁর তীর্থে বিশ্বাস নেই, দেবদেবীতেও নয়। তিনি বেরিয়েছিলেন শুধু পথের জন্যে, বেরিয়েছিলেন, ঘরে আর থাকতে পারছিলেন না বলে। 'হে ভবেশ ' হে শঙ্কর! সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।

কিন্তু সুধাময়ী সেই পথটুকুও কেড়ে নিলেন। তাঁর ঘর না হলে চলে না। কিন্তু সে ঘর তো শূন্য: সে ঘর তো শ্মশান। সেই শ্মশানে বসে দু'বছর তো দিনরাত বুক চাপড়ে মা আর ছেলে কেঁদেছেন, অনবরত চোখের জল ফেলেছেন, আর কেন।

এমন যে হবে, মা যে তীর্থে গিয়েও শান্তি পাবেন না, দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন, অতিষ্ঠ করে তুলবেন তা অবশ্য গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলেন জগদীশ। তাই মাকে তিনি সঙ্গে নিতে চাননি। কিন্তু সুধাময়ী ছেলের সঙ্গ ছাড়লেন না। তাঁর কেবল এক কথা, 'আমি একা থাকতে পারব না।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'একা থাকবে কেন। রেণুর কাছে গিয়ে থাক না।'

রেণু তাঁর দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন। ভবানীপুরের হালদারদের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে।

সুধাময়ী মাথা নাড়ায়, জগদীশ আরো দু'একজন আত্মীয় কুটুম্বের নাম করলেন।

তখন সুধাময়ী বলতে শুরু করলেন, 'আমি তোকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

তাই মাকে বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিতে হয়েছিল জগদীশের। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর এ ভুল করবেন না। এবার যখন বেরোবেন, না বলে না জানিয়েই বেরোবেন। এমন প্রচণ্ড শোকই যখন সুধাময়ী এই বৃদ্ধবয়সে সহ্য করতে পেরেছেন, জগদীশের মাসকয়েকের বিচ্ছেদও তাঁর সইবে।

গলির ভিতরের দিকে সেই দোতলা লালচে রঙের বাড়িটা। ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর এবাড়িকে কেউ পুরোন বলতে পারে না। তিন বছর আগে এবাড়িকে ভেঙে প্রায় নতুন ক'রে গড়েছিলেন দু'ভাই। আগে ঘরের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ছেলেরা বিয়ে-থা করলে আরো বেশি ঘরের দরকার হবে সে কথা ভেবে দু'ভাই আরো তিনখানা ঘর বাড়িয়েছিলেন। দু'এক বছর বাদে তিনতলার কাজ শুরু করবারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জল্পনা-কল্পনা আসানসোলের রাস্তার ধারের খানার মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে।

বাড়ির আর সব ঘর তালাবন্ধ ছিল, তালাবন্ধই রইল। শুধু দোতলায় নিজের পড়বার ঘরখানি খুলে নিলেন জগদীশ। আর একতলায় কোণের দিকে খোলা রইল দ্বিতীয় ঘরখানা। সেখানে সুধাময়ী থাকেন।

আজ নয়, সেই দুর্ঘটনার দিনকয়েক বাদেই এই ব্যবস্থা করেছেন জগদীশ।

সুধাময়ী অনেক আপত্তি করেছিলেন, 'কেন, তুই তোর বড় ঘরে থাক না। ওখানে তো খাট বিছানা টেবিল আলমারী সবই আছে।'

তা আছে। প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে একই খাটে ঘুমোতেন জগদীশ। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার পর ছোট ছোট দু'খানা আলাদা খাট ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রে শৈলরাণী যখন চুপি চুপি জগদীশের খাটে উঠে আসতেন তখন স্ত্রীকে আর প্রৌঢ়া বলে মনে হ'ত না। মনে হ'ত আলতাপরা নবোঢ়া কিশোরীই যেন ফুলশয্যার দিকে এগিয়ে আসছে। বড় শোবার ঘরখানায় আজও সেই জোড়া খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল, আর দামী শাড়ী ব্লাউজভরা কাঁচের আলমারী রয়েছে, তার হাতের ছোঁয়ালাগা সবগুলি আসবাব, কিন্তু যার জন্যে এই ঘর সাজিয়েছিলেন জগদীশ সে তো আর

নেই। ও ঘরে একা একা তিনি কি ক'রে থাকবেন।

ছেলের মনের কথা অনুমান করে সুধাময়ী বলেছিলেন, 'তোর যদি ও ঘরে একা থাকতে ভয় করে বল, আমি এসে থাকি।'

জগদীশ মাথা নেড়েছিলেন, 'না মা তোমার ও ঘরে থাকতে হবে না, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক।'

সুধাময়ী ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'কিন্তু একা একা নিচের ঘরে থাকতে আমারও তো ভয় করতে পারে।'

জগদীশ মার দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিলেন, 'তোমারও ভয়! তাহলে রেণুর ছোট ছেলেকে এনে তোমার কাছে রাখ।'

সুধাময়ী গভীর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, 'না, আমার আর কারো ছেলেকেই কাছে এনে দরকার নেই।'

মার সঙ্গে একঘরে থাকবার প্রস্তাবই যে জগদীশ নাকচ করেছিলেন তাই নয়, সুধাময়ী পাশের ঘরে এসে থাকবেন এ ব্যবস্থাও তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সুধাময়ী ছেলের এই বিদ্বেষ দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিলেন জগু কি সত্যিই বিশ্বাস করে সুধাময়ী বেশি-বয়স অবধি বেঁচে রয়েছেন বলে আর সবাই অকালে চলে গেছে। তিনিই সবাইকে খেয়েছেন? ছেলের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে সুধাময়ী একদিন এসে সত্যিই কেঁদে পড়লেন, 'ওরে জগু, তাই যদি তোর ধারণা—আমার জন্যেই যদি তোর এই সর্বনাশ হয়ে থাকে, আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল। কিছু আমাকে এনে দে, আমি তাই খেয়ে মরি।'

জগদীশ পরম নির্লিপ্ত শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'আশ্চর্য, তুমি কি ক্ষেপে গেলে মা, তোমার জন্যে কেন হবে? তোমার সঙ্গে সে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক। যাও, ঘরে যাও।'

সুধাময়ী সেখান থেকে চলে গেলে জগদীশ গুনগুন করে গান ধরেছিলেন, 'শ্মশান করেছি হৃদি, সেখানে নাচুক শ্যামা।'

সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর কিছু দিন ধ'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। দেখা করতে এসেছেন জগদীশের কলেজের সহকর্মী আর ছাত্রের দল। সবাই তাঁকে অনুরোধ করেছে তাঁদের বাড়িতে যেতে, মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে। কিন্তু জগদীশ কারো কথা কানে তোলেননি। ইচ্ছা করে যে তোলেননি তা নয়। কেন যেন আগ্রহ বোধ করেননি, সাধ্য হয়নি মানুষের সঙ্গে আর সংযোগ রাখবার। কি ক'রে হবে। মৃত্যুর স্পর্শে তাঁর হৃদয় একেবারে পাথর হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার কোন স্পর্শ অনুভূত হয় না।

সরকারী কলেজের অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন জগদীশ রায়। না নিয়ে পারেননি। পড়াতে আর ভালো লাগে না। তরুণ ছাত্রদের সঙ্গ দুঃসহ মনে হয়। শুধু ছাত্র নয় মানুষমাত্রকেই মনে হয় হাত পা চোখ কান বিশিষ্ট একটা যন্ত্র। তার ভালোমন্দ সুখ দুঃখে জগদীশের কিছু এসে যায় না। যন্ত্রণাবোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আসলে তিনি নিজেই যন্ত্র হয়ে গেছেন। যে দুর্ঘটনায় তাঁর সব গেছে তার কোন ব্যাখ্যা নেই, প্রতিকারের সম্ভাবনা নেই, কারো ওপরই কোন প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাঁর নিজের ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃত অসতর্কতার জন্যে তাঁর সমস্ত প্রিয়জন প্রাণ হারিয়েছে। এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু ওই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি সব শোকের সান্ত্বনা মেলে? কার্যকারণের সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়? হয় না বলে নিজের মধ্যেই যেন অসঙ্গতির অনুশীলন করছেন জগদীশ। তাঁর আচরণ চালচলনের মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

সুধাময়ী বলেছিলেন, 'এতগুলি ঘর দিয়ে কি হবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে, তবু মানুষজন এসে থাকুক।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'কেন ভাড়া দেব? টাকার জন্যে? আমার আর টাকার কি দরকার? যা আছে তাতেই বাকি ক'টা দিন চলে যাবে।'

পাড়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে ধরেছিল, 'জ্যেঠামশাই ঘরগুলি আমাদের সমিতিকে দিন। আমরা একটা নাইট স্কুল আর লাইব্রেরী চালাব। আপনিই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।' জগদীশ জবাব

দিয়েছিলেন, 'আর দুটো দিন সবুর করো। আমি মরবার আগে উইল করে তোমাদের সব দিয়ে যাব। সে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে। ততদিন তোমাদের সম্পত্তি যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।' ছেলেরা আড়ালে গিয়ে গাল দিয়েছিল, 'বুড়োর ভীমরতি ধরেছে?'

বাড়ির অনেকদিনের পুরোন চাকর ছিল গোবিন্দ। সেও একদিন বিদায় নিল। অকারণে বড় গালমন্দ করতেন, মারতে আসতেন, শুধু সেইজন্যেই নয়। গভীর রাত্রে তার ঘরের সমুখ দিয়ে ভূতের পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। শুধু তার ঘরের কাছেই নয়, সারা বাড়ি ভরেই সেই ভূতের আনাগোনা।

গোবিন্দ সুধাময়ীর কাছে কাঁদো কাঁদো ভাবে বিদায় নিয়ে বলল, 'আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বুড়ো মা। কিন্তু থাকতে আর সাহস হয় না।'

সুধাময়ী নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোকে আমি আর থাকতে বলিওনে গোবিন্দ, তুই যা। এই শ্মশানে তোর আর থেকে কাজ নেই।'

তিন মাসের মাইনে বেশি দিয়ে গোবিন্দকে বিদায় করলেন তিনি।

তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে জগু তোর এ কি কাণ্ড, শেষপর্যন্ত ভূত সেজে গোবিন্দকে তাড়ালি তুই।'

জগদীশ বললেন, 'ভূত আমাকে সাজতে হয়নি মা। তাদের সাতজনের ভূত আমার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। আমি নিজে কিছু করিনে। তারাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

জগদীশের ভাবভঙ্গি দেখে বাড়ির রাঁধুনী বালবিধবা সুশীলাও চোখের জল ফেলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সুধাময়ী বললেন, 'সবাইকে তাড়ালি এবার আমাকেও তাড়িয়ে দে। আমি যে আর টিকতে পারছিনে জগু।'

কিন্তু লোকজন সব বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর জগদীশ যেন খানিকটা শান্ত হলেন। খানিকটা স্বাভাবিকতা এল তাঁর মধ্যে। লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বই হাতে আগের মতই এসে বসেন। মাঝে মাঝে পুরোন দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেও বেরোন।

আর কাউকে রাখবার চেষ্টা করলেন না সুধাময়ী। নিজেই হেঁশেলের ভার নিলেন। ভারি তো হেঁশেল। একবেলা দু'জনের জন্যে রাঁধতে হয়। অনেকদিন থেকেই রাত্রে ভাত খান না জগদীশ। দুধ খই, মিষ্টি, ফলমূল হলেই চলে।

কলকাতার বাইরে থেকে কিছুদিন ঘুরে আসবার পরেও জগদীশের অভ্যস্ত দিনযাত্রা বদলাল না। লাইব্রেরী ঘরেই ক্যাম্পখাট বিছিয়ে রাত্রে নিজের শোবার ব্যবস্থা করলেন। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে বারান্দার ইজিচেয়ারে। চুপচাপ বসে থাকেন, কখনো বা করিডোর দিয়ে পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে রেলিং-এ ভর করে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধা মার ঘরকন্নার কাজ দেখেন। ঠিকে ঝি অবশ্য একটি আছে। দু'বেলার সব কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যার পর নিজের বাসায় চলে যায় মেনকা।

জগদীশ ওপর থেকে লক্ষ্য করেন কখনো কখনো সেই আধবয়সী ঝি মেনকার কাছে বসে কাঁদেন সুধাময়ী। সহানুভূতি জানাবার জন্যে কখনো বা পাড়ার দু'একটি বউও তাঁর কাছে আসে। তিনি পুরোন দিনের কথা, ছেলে বউ নাতি নাতনীদের কথা বসে বসে বলতে থাকেন। আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। দেখে দেখে কেমন যেন একটা বিদ্বেষ বোধ করেন জগদীশ। কই তিনি তো এমন ক'রে পাড়ার পাঁচজনের কাছে শোক প্রকাশ করেন না, চোখের জল ফেলতে পারেন না, চোখের জল মুছতে পারেন না, শুধু বুকের মধ্যে একটা ভারি পাথরের দুঃসহ চাপ অনুভব করেন। মাঝেসাঝে সেই পাথর অগ্নিগোলক হয়ে জ্বলতে থাকে। তবু নিজের জ্বালা নিয়ে নিজেই বেশ থাকতে পারতেন জগদীশ। কিন্তু সুধাময়ী আবার তাঁকে নতুন করে জ্বালাতে লাগলেন। জগদীশের অপরাধ ঠাণ্ডা লেগে তাঁর একটু সর্দিজ্বর হয়েছিল। দাঁতের যন্ত্রনাটাও বেড়েছিল সেই সঙ্গে। আর রক্ষা নেই। পাড়ার লোকজন আর ডাক্তার ডেকে হৈ চৈ করে সুধাময়ী সারা বাড়ি মাথায় করে তুললেন।

জ্বর অবশ্য দু'তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে গেল, কিন্তু সুধাময়ী ছেলেকে সহজে ছাড়লেন না। তিনি জগদীশকে বলতে লাগলেন, 'শরীরের ওপর অনিয়ম ক'রেই তুমি এই কাণ্ড ঘটিয়েছ। আর আমি তোমাকে অমন নিজের খেয়ালে চলতে দেব না। তুমি সময় মত চান করবে, খাবে, ঘুমুবে। দেখি তোমার শরীর কি ক'রে খারাপ হয়।'

শুধু কথায় শাসন ক'রেই সুধাময়ী ক্ষান্ত হলেন না। কাজেও জগদীশের সর্বদা খবরদারি করতে শুরু করলেন।

জগদীশ হয়ত দর্শনের ভাববাদ আর বস্তুবাদের তুলনামূলক সমালোচনা পাঠে নিমগ্ন, সুধাময়ী ছোট একটু তেলের বাটি হাতে পা টিপে টিপে দোতলায় তাঁর ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন, 'ও জগু, দেখ ঘড়িতে ক'টা বাজল। চান করবি কখন।'

জগদীশ বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এইতো সবে দশটা। আমি বারটার আগে কোনদিন নাইতে যাই না। তুমি আবার কেন কষ্ট ক'রে এখানে এলে। ডাকলে আমিই তো নিচে যেতে পারতাম।'

সুধাময়ী একটু হাসলেন, 'হুঁ, তুমি আমার সেই ছেলেই কিনা। ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেললেও তো একটু টু শব্দ করিসনে তুই। আয় আমি তোকে তেল মাখিয়ে দিই। তুই অমন ছটফট করছিস কেন। তুই বসে বসে পড় না। আমি তোর পিঠে তেল দিয়ে দিই।'

জগদীশের পিঠে সুধাময়ী সত্যিই তেল লাগাতে শুরু করে দেন। প্রথমে কেমন একটু সুড়সুড়ি বোধ হয়, তারপর রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন জগদীশ। দু' এক মিনিট যেতে না যেতেই উত্যক্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'সরো সরো, তোমাকে আর তেল মালিশ করতে হবে না, যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'কেন জগু, খারাপ লাগছে তোর।'

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ানক খারাপ লাগছে। তুমি যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু বউমা তো তোকে রোজ তেল মাখিয়ে দিত। সে যেদিন পারত না, তোর মেয়ে সুলু এসে বসত তেলের বাটি নিয়ে। তখন তো তুই এমন করতিনে।'

স্ত্রী কন্যার উল্লেখে বুকে যেন নতুন ক'রে ঘা লাগল। তাদের অভাব আবার নতুন ক'রে অনুভব করলেন জগদীশ। অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, 'তাদের কথা তুল না মা, তাদের নাম আর মুখে এন না। আশ্চর্য, তারা মরে গিয়েও তোমার হিংসের হাত থেকে রক্ষা পেল না?'

সুধাময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, কি, কি বললি। তাদের আমি হিংসে করি, তাদের আমি হিংসে করতাম! ওরে, আমার পরম শত্তুরও যে একথা বলতে পারত না! আর তুই আমার পেটের ছেলে হয়ে এই কথা বললি! ভগবান তুমিই সাক্ষী। এখনো দিনরাত হয়। এখনো আকাশে চাঁদ সূর্য উঠে। ভগবান--'

জগদীশের আর সহ্য হ'ল না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তর্জনী বাড়িয়ে বললেন, 'যাও, চলে যাও, নিচে যাও বলছি।'

সুধাময়ী কেঁদে কেঁদে বললেন, 'তাতো যাবই। আজ আমার বাতাস তোর সহ্য হয় না। আজ আমি হাত দিলে তোর গায়ে বিছুটি লাগে। কিন্তু চিরকালই এমন ছিল না, চিরকালই মাগ আর মেয়ের হাতে তুই মানুষ হসনি। এমন দিনও ছিল যখন আমি না নাইয়ে দিলে তোর নাওয়া হ'ত না, আমি না খাইয়ে দিলে তোর পেট ভরত না, আমার বুকের সঙ্গে মিশে থাকতে না পারলে ঘুম আসত না তোর —'

জগদীশ আবেগহীন নিস্পৃহ সুরে বললেন, 'আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি তোমার ঘরে যাও মা।'

সুধাময়ী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নিচে নেমে গেলেন। সেখান থেকে তাঁর কান্না শোনা যেতে লাগল, 'ওরে আমার ছোটনবে, তুই আমাকে ফেলে কোথায় গেলিরে বাবা। সবাইকে নিয়ে গেলি যদি, আমাকেও নিলিনে কেন!'

পৃথ্বীশের ডাক নাম ছিল ছোটন।

জগদীশ বই বন্ধ ক'রে ভাবতে লাগলেন একথা সত্যি মায়ের কোলেই প্রথম জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। একান্ত ভাবে মায়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। বাবা থাকতেন দূরে দূরে বাইরে বাইরে। জগদীশ আর তার মার মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। কিন্তু সংসারের নিয়মে সেদিনের বদল হল। বাবা চলে গেলেন কিন্তু একে একে অনেকে এল। কত বিচিত্র সম্পর্ক. আর তার বিচিত্র স্বাদে জীবন ভরে উঠল। স্বভাবের নিয়মে মা রইলেন এক পাশে সরে. এক পাশে পড়ে। জগদীশের মনোলোক থেকে চিরনির্বাসন ঘটল তাঁর। আজ আবার সব মুছে গেছে, আজ আবার তাঁদের মাঝখান থেকে ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়েছে। দূরের অবজ্ঞাত কোণ থেকে আজ ফের মা আবার জগদীশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'চেয়ে দেখ, আমি আছি। আয় আবার আমি তোর সব হই, তুই আমার সব হয়ে ওঠ।'

কিন্তু তাই কি হয়? একমাত্র অতি শৈশব ছাড়া মা কি মানুষের সব হ'তে পারে! ভাই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একাধারে সকলের স্থান নেওয়া কি সম্ভব? জগদীশের মনে হয় মা সব হ'তে তো পারেনই না, এমন কি পুরোপুরি ছেলেবেলার সেই মা থাকাও আর তাঁর পক্ষে সাধ্য নয়। যেতে যেতে, ভাঙতে ভাঙতে একটুখানি মাত্র থাকে। সেইটুকু হয়েই কেন খুশী থাকেন না সুধাময়ী। কেন আরো বেশি হ'তে চান, আরো বেশি দিতে চান, আরো বেশি পেতে চান? জগদীশ ভাবেন, মা আর তাঁর মাঝখানে যারা এসেছিল তারা তো সত্যিই ব্যবধান হয়েছিল না, তারা ছিল সেতু। তারা ছিল জগদীশের বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র। মায়ের সঙ্গেও সংযোগের মাধ্যম, মধ্যমণি। সেই সুতো ছিঁড়ে গেছে। কারো সঙ্গেই জগদীশের কোন বন্ধন নেই।

আরো কিছুদিন কাটল। জগদীশ ফের পালাই পালাই করতে লাগলেন। মায়ের এই অতি বাৎসল্যের হাত থেকে মুক্তি নেবেন, অতিরিক্ত দান আর অতিরিক্ত দাবির বন্ধন থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও মুক্ত থাকবেন।

দূর সম্পর্কের সেই বোন আর ভাগ্নের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ক'রে বৈষয়িক ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললেন জগদীশ। মাকে না জানিয়েই তিনি এবার বেরিয়ে পড়বেন। এবার আর শুধু ভারত নয়, ভূভারত। সুধাময়ীকে দেখাশোনা করবার জন্যে বেণুর নিঃসন্তান খুড়শ্বশুর আর খুড়ি শাশুড়ী এ বাড়িতে এসে নিচের একটা ঘর নিয়ে থাকবেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত শেষ। পোশাকপরিচ্ছদ বিছানা বালিশের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যাত্রার আর দু'দিন মাত্র বাকি, এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। ভোরে উঠে নিচে একটা শোরগোল শুনতে পেলেন জগদীশ।

মেনকা ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'কর্তাবাবু, দেখুন এসে ব্যাপার।'

জগদীশ নিচে নেমে এসে দেখলেন, তাঁর বাড়ির দোর গোড়ায় একটা রক্তমাখা পুঁটলি পড়ে রয়েছে। প্রথমে ভাবলেন কুকুরে কোন নর্দমার ধার থেকে মাংসের নেকড়া টেকড়া মুখে ক'রে এনে থাকবে। কিন্তু মেনকা একটা কাঠি দিয়ে পুঁটলিটা নাড়তেই সকলের ভুল ভাঙল। রুগ্ন, বিবর্ণ, মৃতপ্রায় সদ্যোজাত এক মানবশিশুকে কে যেন এই কবরখানায় ফেলে রেখে গেছে।

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কুকুর নয়, এ নিশ্চয়ই সেই তরুণ সঙ্ঘের কুকুরদের কীর্তি। আমি তাদের ঘর ছেড়ে দিইনি ব'লে তারা আমার ওপর এমন ক'রে শোধ নিয়েছে। কিন্তু আমার নামও জগদীশ রায়। পাজী বদমাস ছাত্র আমি কম চড়াইনি। তাদের কি ক'রে সোজা করতে হয় তা আমি জানি। আমি এক্ষুণি থানায় খবর দিচ্ছি। ওদের সবগুলির নামে ডায়েরি করব।'

সুধাময়ী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, এবার এগিয়ে এসে শান্তভাবে বললেন, 'জগু, অত চেঁচাসনে! ব্যাপারটা কি দেখতে দে আগে। ওরে মেনকা ভালো ক'রে দেখ দেখি এখনো বেঁচে আছে না মরে গেছে।'

মেনকা একটু নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'এখনো বেঁচে আছে বুড়ো মা।'

'আছে?' উল্লসিত হয়ে উঠলেন সুধাময়ী, 'এই শ্মশানের বাতাস লেগেও এতক্ষণ প্রাণ রয়েছে? নিয়ে আয় মেনকা, ওকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে আয়। ও আমার সেই কাশীর বাবা

ভোলানাথ,বাবা বিশ্বনাথ। নিয়ে আয় ওকে।'

কিন্তু জগদীশ রুখে দাঁড়ালেন, 'মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? এসব ছেলে কোত্থেকে হয়, কিভাবে হয় তা তুমি জান না ?'

সুধাময়ী বললেন, 'জানব না কেন। সবই জানি জগু। কিন্তু তা'তে তোবই বা কি, আমারই বা কি। আমরা দু'জনেই এখন সমাজ সংসারের বাইরে। আহা দেখ, কিরকম নীল হয়ে গেছে শীতে।'

জগদীশ বললেন, 'দেখেছি-- দয়া করতে চাও, আমি টাকা দিচ্ছি, লোক দিচ্ছি একটা অনাথ আশ্রম টাশ্রমের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি--।'

সুধাময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'ওরে ক্ষ্যাপা, এই বাড়িও তো এক মস্ত অনাথ আশ্রম। তুই এক অনাথ, আমি এক অনাথ। মেনকা আর দিক করিসনে বাছা, ওকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।'

জগদীশ দু'পা এগিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'না। আমি বলছি, না। এ বাড়ি আমার। আমার অমতে এ বাড়িতে কিচ্ছু করা চলবে না।'

সুধাময়ীও ছেলের দিকে এগিয়ে এলেন, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল, তারপর মুখের বিকৃত ভঙ্গি ক'রে তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, 'কি বললে জগু রায়, এ বাড়ি একা তোমার ? এতে আমার কোন অংশ নেই ? কিন্তু এ আমার সোয়ামীর হাতের গড়া বাড়ি, এ আমার সোয়ামীর হাতের পোতা ইট। আমি যতক্ষণ আছি আমার জীবনস্বত্ব আছে। যাও উকিলের কাছে যাও, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও, ছোট আদালত বড় আদালত যা খুশী তাই কর গিয়ে। তারা যদি আমাকে বেদখল করে তখন বলতে এসো।'

জগদীশ একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আর কিচ্ছু বলতে চাইনে। তুমি থাক তোমার দখল নিয়ে, আমি চললুম।'

কিন্তু চললুম বললেই কি আর চলা যায়। বেশীদূর যেতে পারলেন না। যেতে যেতে নিজের ঘরে গিয়েই ঢুকলেন জগদীশ। জাতজন্মের সংস্কার তিনিও মানেন না। এসব ব্যাপারে জগদীশ যথেষ্ট উদার। কিন্তু আর কিছু না মানেন, আর কাউকে না মানেন নিজেকে তো মানেন জগদীশ। সুধাময়ীর আচরণ তাঁর অহংবোধকে বার বার পীড়া দিতে লাগল। তাঁর মতের বিরুদ্ধে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুধাময়ী রাস্তার একটা অবৈধ অবাঞ্ছিত ছেলেকে কুড়িয়ে ঘরে তুলে নিলেন, এতে রাগে আর বিদ্বেষে জগদীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। অন্য সময় হলে তিনি হয়ত বিস্মিত হতেন। এই ধর্মভীরু, আচারসর্বস্ব স্বল্পাক্ষরা ব্রাহ্মণ বিধবা কি ক'রে এমন কাজ করতে পারলেন, সর্বত্যাগিনী না হ'লে তাঁর পক্ষে এই গ্রহণ সম্ভব ছিল কিনা সে প্রশ্ন জগদীশের অন্তত একবারও মনে পড়ত। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু জ্বালা আর অপমানবোধ ছাড়া সব তাঁর অনুভূতির বাইরে পড়ে রইল।

জগদীশ ভবঘুরে হওয়ার সঙ্কল্প আপাতত ত্যাগ করলেন। এ গলি ও গলি ঘুরে শেষ এসে ঢুকলেন নিজের ঘরে। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে তিনি এখান থেকে নড়বেন না।

কিন্তু কি হেস্তনেস্ত করবেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না জগদীশ। নিজেদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বাইরের কাউকে সালিস মানবার অভ্যাস তাঁর কোনদিনই ছিল না। বরং অন্যসব আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের বিরোধে তিনি মধ্যস্থতা করেছেন। আর আজ যদি মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এই ষাট বছর বয়সে তিনি প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হন তাহ'লে লোকে কি বলবে। না, মস্তিষ্কের অতখানি বিকৃতি তাঁর আজও ঘটেনি। প্রতিকারের অন্য উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন জগদীশ।

এদিকে সুধাময়ী সেই কুড়োন ছেলেকে ঘরে তুলে নিয়েছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন, মেনকার সাহায্যে শিশুর খাবারের জন্যে মধু আর মিছরির জলের ব্যবস্থা করেছেন। ঝিনুক-বাটি, কাঁথাবালিশ আগন্তুকের ভোজন-শয়নের সব উপকরণই একে একে সংগৃহীত হচ্ছে। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই টের পেতে লাগলেন জগদীশ, সবই দেখতে লাগলেন। সুধাময়ীর ঘর যেন এক তরুণী মায়ের আঁতুড়ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সুধাময়ী শুধু নতুন জীবনই পাননি, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর চলাফেরা ছুটোছুটির বিরাম নেই। নানা বয়সী বউ ঝিরা তাঁর ঘরের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। সুধাময়ী তাদের একজনকে বোঝাচ্ছেন, 'জানো বউ আমর ছোটনও ঠিক এইরকমই হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যে মাই টানেনি। দেখে কেউ বলেনি যে বাঁচবে।'

শুনতে শুনতে এই বৃদ্ধ বয়সেও এক অদ্ভুত ঈর্ষা বোধ করেন জগদীশ। ছাপান্ন বছর আগে ছোট ভাইকে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে দেখে ঈর্ষা হয়েছিল এ যেন সেই ঈর্ষা। চটি পায়ে জগদীশ নিচে নেমে এসে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার সেই নতুন আঁতুড়ঘর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'মা, ওকে তাহ'লে তুমি সত্যিই বাইরে কোথাও পাঠাতে দেবে না?'

সুধাময়ী অবাক হয়ে বলেন, 'তুই কি বলছিস জগু, এ অবস্থায় বাইরে পাঠালে ও বাঁচবে?'

জগদীশ বলেন, 'কেন বাঁচবে না? আমি খুব ভালো হাসপাতাল ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সেখানে বেশ যত্ন ক'রে রাখবে।'

সুধাময়ী বললেন, 'অবাক করলি তুই। তোরা কোন হাসপাতালের যত্নে বেঁচেছিলি শুনি? তোমাদেরও ছেলেপুলে যা হয়েছে সব আমার কাছে, না হয় তাদের বাপের বাড়িতে। কেউ কি অযত্নে ছিল?'

জগদীশ এবার রুক্ষ স্বরে বললেন, 'তাহ'লে তুমি আমার কথা শুনবে না মা?'

সুধাময়ী স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'না আমি তোমার কোন অন্যায় কথা শুনতে চাইনে বাপু।'

জগদীশ আর কিছু না ব'লে ওপরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় শিশুর ক্ষীণ কান্না তাঁর কানে গেল। কিন্তু প্রাণে গিয়ে পৌঁছল না। এই পরিত্যক্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একান্তভাবেই সুধাময়ীর স্নেহ আর খেয়ালের সামগ্রী। ওর সঙ্গে জগদীশের কোন সম্পর্ক নেই।

পঁচাত্তর বছরের নির্বোধ বৃদ্ধার এই জেদের কি প্রতিকার করা যায় তাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল জগদীশের। একবার ভাবলেন, মাকে জোর ক'রে এই বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন। আর একবার ভাবলেন, নিজেই চ'লে যাবেন এখান থেকে। তৃতীয়বার মতলব আঁটলেন, টাকা দিয়ে গুণ্ডা ঠিক করবেন। একদিন গভীর রাত্রে সে ওই ছেলেটাকে অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যে অসঙ্গত সুড়ঙ্গপথে ও এসেছিল সেই পথেই চলে যাবে।

কিন্তু কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না জগদীশের। রাত্রের ভাবনা দিনের আলোয় অবাস্তব লাগতে লাগল। সুধাময়ী রাত্রে ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোন। আদর ক'রে ডাকেন, 'বিশু আমার বিশু। আমার বারাণসীর বিশ্বনাথ।'

মাঝে মাঝে জগদীশকেও ডাকেন সুধাময়ী, 'ও জগু, দেখ এসে কেমন হাসছে। এত দুষ্টু হয়েছে এরই মধ্যে।'

জগদীশ মার ডাকে সাড়া দেন না। সুধাময়ীর সোহাগের বাড়াবাড়ি দেখে রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়। মানবশিশুর মুখে এই কি প্রথম হাসি দেখলেন সুধাময়ী? জীবনে আর কোনদিন দেখেননি? না কি সব স্মৃতি ইচ্ছা ক'রে ভুলে গিয়েছেন?

সুধাময়ীর জপতপ ধ্যানধারণা সব গেছে। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময়ই তাঁর এখন বিশুকে নিয়ে কাটে। যতবার মার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন জগদীশ, শুনতে পান সুধাময়ী বিশুর সঙ্গে কথা বলেছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার মানিক। বলি এত কান্না কিসের তোমার। হয়েছে গেছে আর অত ঠোঁট ফুলিয়ে তোমাকে কাঁদতে হবে না।'

জানলার ফাঁক দিয়ে জগদীশ দেখতে পান, লোল চর্মের ঝুলে পড়া দুটি স্তনের মধ্যে শিশুকে চেপে ধরেছেন সুধাময়ী। জগদীশকে দেখতে পেলে মাঝে মাঝে তিনি কাছে ডাকেন, 'ও জগু, পালাচ্ছিস কেন আয়, আয় না এ ঘরে। লজ্জা কি।'

জগদীশ সাড়া না দিয়ে সরে আসেন।

একদিন বিশুর একটু সর্দি আরজ্বরেরমত হ'ল। তার পরিচর্যা নিয়ে সুধাময়ী এমন মেতে রইলেন যে, একটা বেজে গেল জগদীশ ভাত পেলেন না। তাঁর আর সহ্য হ'ল না। সুধাময়ীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি মা। তুমি এমনই ক'রে আমাকে বন্ধ করতে চাও।'

সুধাময়ী একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ছেলেটার অসুখ তাই রান্না করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। তুই পিঁড়ি পেতে বস। আমি এক্ষুণি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।'

জগদীশ বললেন, 'না, তোমার আর আমার জন্য রেঁধেও দরকার নেই, বেড়েও দরকার নেই।

তোমার হাতের রান্না খাওয়া এই আমার শেষ।'

রাগ ক'রে জগদীশ সেদিন এক হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেন। পরদিন স্টোভ, হাঁড়ি ডেকচি, রান্নাবান্নার সব সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এলেন। আনলেন চাল ডাল তেল কয়লা, ঘি মশলা। তারপর নিজেই রাঁধতে বসে গেলেন।

সুধাময়ী এসে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুই আমার সঙ্গে পৃথক্ হয়ে যাবি?'

জগদীশ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমার আর পোষাবে না।'

সুধাময়ী অনেক চেঁচামেচি করলেন, কাঁদাকাটি করলেন। কিন্তু জগদীশ কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়লেন না। মনে মনে ভাবলেন, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার আচ্ছা জব্দ হয়েছে মা। এতদিনে প্রতিকারের মোক্ষম উপায়টি জগদীশ বের করতে পেরেছেন।

তিনদিনের দিনও জগদীশ যখন অনুরোধ শুনলেন না, আলাদা ভাবে রান্না ক'রেই খেতে লাগলেন, সুধাময়ী তখন অতি কষ্টে ওপরে উঠে এসে ছেলেকে অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ, বেঁধে খাও, হোটেলে গিয়ে খাও, তোমার যা খুশী তাই কর। কিন্তু তোমার মত বুড়ো ছেলের অন্যায় আব্দার পালতে গিয়ে আমি ওই দুধের বাচ্চাকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারব না। তা তুমি জেনে রেখ।'

জগদীশের মনে হ'ল সুধাময়ী যেন তাঁর মা নন, শরিক মাত্র।

সুধাময়ী ছেলেকে আর খাওয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। মা আর ছেলে আলাদা রান্না ক'রে খেতে লাগলেন।

সেদিন স্ত্রীপুত্রের জন্যে নতুন ক'রে শোক অনুভব করলেন জগদীশ। ঘরের কোণে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সব হারাবার পর প্রথম ক'দিন যেভাবে কেঁদেছিলেন ঠিক তেমনি।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। সুধাময়ী অবশ্য আপোস করবার জন্যে বারকয়েক এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু জগদীশ সাড়া দেননি। সাধাসাধির পর সুধাময়ী শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছেন।

জগদীশ আবার ঘর আর বারান্দায় নিজেকে বন্দী করলেন। কাচের আলমারীগুলি খুলে ফেললেন। দেশবিদেশের সাহিত্য দর্শন ইতিহাসের বই ঘরে ঘরে সাজানো। সব পড়েছেন। একাধিকবার পড়েছেন। আরো একবার পড়বার জন্যে প্রিয় দু' একখানা বই টেনে নিলেন। কিন্তু আগের মত পড়ায় আর মন বসে না। আগে এই বই পড়বার জন্যে স্ত্রীর কত খোঁটা সইতে হয়েছে! ছেলেমেয়ের কোলাহলের মধ্যেও বইয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পেরেছেন জগদীশ। কিন্তু আজকাল আর কোন গোলমাল নেই, কোন ব্যাঘাত নেই, শান্ত স্তব্ধ ঘর। তবু পড়ায় মন বসে না জগদীশের। নিচে দু' একবার দিনের মধ্যে যেতেই হয়। যাতায়াতের পথে সুধাময়ীর গলা শুনতে পান, 'ও আমার সোনা, ও আমার মানিক। আর হাসির খই ছড়াতে হবে না তোমাকে। আমার ঘর যে ভরে গেল।'

জগদীশ ঘরে ফিরে এসে বই বন্ধ ক'রে নিজের মনে ভাবতে থাকেন—সুধাময়ীর ঘর ভ'রে উঠেছে কিন্তু তাঁর নিজের ঘর শূন্য। বিশুকে পেয়ে সুধাময়ী সব ভুলেছেন, সব পেয়েছেন। মেয়েমানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হয়, এমন অল্পেই ভোলে বটে। কিন্তু জগদীশ তেমন নন। তিনি কিছুই ভোলেননি, কাউকে ভোলেননি। ভোলেননি যে নিজের কাছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যেই যেন তিনি বন্ধ ঘরগুলির তালা খুলে ফেললেন। তাদের শোয়ার ঘর, সুব্রতর ঘর, সুলেখার ঘর, তাঁর ভাই ভ্রাতৃবধূ আর তাঁর দুই ছেলের ঘর। সবগুলি ঘরে একবার ক'রে যান জগদীশ আর কিছুক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি ঘর যেন এক একখানি যাদুঘর, স্মৃতির সমুদ্র, তাদের ব্যবহারের সব জিনিস, চেয়ার টেবিল খাট আলমারী এমনকি আলনায় ঝুলানো জামাগুলি পর্যন্ত আছে, শুধু তারা নেই। কে বলে যে নেই। জগদীশ তাদের সবাইকে যাদুঘরে বন্দী করে রেখেছেন। কিন্তু হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে যায় জগদীশের। নিচে সুধাময়ী কার সঙ্গে কথা বলছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার যাদু—।'

চমকে ওঠেন জগদীশ। সুধাময়ীর গলা কি এত ওপরে এসে পৌঁছায় ? না খানিকক্ষণ আগে বাথরুমে যাওয়ার সময় সুধাময়ীকে আদর করতে শুনে এসেছিলেন জগদীশ। মনের দেয়ালে দেয়ালে সেই প্রতিধ্বনিই এখন ধাক্কা খাচ্ছে। কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়েন জগদীশ। তাঁর মত সুধাময়ীও তাহ'লে যাদুঘর খুঁজে পেয়েছেন। অনেকগুলি ঘর নয়, একখানি মাত্র ঘর। স্মৃতি সম্বল যাদুঘর নয়, তাঁর সোনাজাদুর ঘর।

হঠাৎ জগদীশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এক দুঃসহ অস্থিরতা বোধ করলেন শিরায় শিরায়। সুধাময়ী জিতে গেছেন। জগদীশের চেয়ে বেশি বুড়ো হয়েও জগদীশের মত সব হারিয়েও শুধু মেয়েমানুষ হওয়ার ফলে সুধাময়ী আবার সব পেয়েছেন। কিন্তু জগদীশ তাঁকে জিততে দেবেন না। তিনি তাঁর শত্রুকে, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপে মেরে ফেলে সুধাময়ীকে তাঁরই মত ফের নিঃস্ব রিক্ত ক'রে দেবেন।

ক্ষিপ্তের মত, পানাসক্তের মত সিঁড়ি ডিঙিয়ে স্খলিত পায়ে জগদীশ মায়ের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

সুধাময়ী তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করলেন না। কারণ তাঁর চোখ ছিল বিশুর ওপর; দশ মাসের শিশু তক্তপোশের ওপর জোড়াসনে বসেছে। সুধাময়ী সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আয় জগু, তোকে আমিই ডাকব ভেবেছিলাম। দেখ, কেমন সুন্দর বসতে শিখেছে বিশু। তুমি কিন্তু ওই বয়সে অমন ক'রে বসতে পারতে না বাপু। তোমার সবই দেরিতে দেরিতে হয়েছিল।'

জগদীশ জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সুধাময়ী নিজের মুখ বলে যান, 'জানিস, এরই মধ্যে তিনটি দাঁত উঠেছে। সোনা, তোমার দাঁতগুলি দেখাও দেখি, দাঁত দেখাও।'

বিশু সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটি সাদা ছোট দাঁত বার করে।

জগদীশ কঠিন মুখে গম্ভীর হয়ে থাকেন।

সুধাময়ী বলে চলেন, 'জানিস, এরই মধ্যে আবার বোলও ফুটেছে। বেশ কথা বলতে পারে শয়তানটা। বিশু, সোনা আমার, মানিক ডাক দেখি। ডাক, ডাক।'

একটুকাল গম্ভীর হয়ে থাকবার পর বিশু সুধাময়ীর অনুরোধ রক্ষা ক'রে ডেকে ওঠে, 'মা মা, মা মা।'

সুধাময়ী খিল খিল ক'রে হেসে ওঠেন, 'দূর বোকা ছেলে। কাল তোকে কি শেখালুম। মা নয় রে, বল ঠামা ঠামা। বল। বাবা বা বা বা। ওই তো পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছিস নে ? বল, আবার বল বা বা বা বা।'

বিশু হাসিমুখে কলকণ্ঠে প্রতিধ্বনি ক'রে, 'বা বা বা বা।'

জগদীশের দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি এগিয়ে এসে সুধাময়ীকে বুকে চেপে ধরে শিশুর মতই ডেকে ওঠেন, 'মা মা।'

অগ্রহায়ণ ১৩৬১

ভিন্নপথ

সব দুঃখ মানুষকে মহৎ করে না। কোন কোন আঘাত মনুষ্যত্বকে চূর্ণ করে দেয়।

পাশের ঘর থেকে সুলতার একঘেয়ে চাপা কান্নার শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল। আর তার চার বছরের মেয়ে রিনার গলা, 'মা, বাবা কোথায় গেল ? বাবা ?'

নিজের ঘর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছিল শ্যামল। সবই কানে আসছিল। কিন্তু কান পর্যন্তই। নারীর কান্না আর শিশুর কাতরোক্তি তাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারছিল না। জানলার ধারে বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঠের চেয়ারটায় নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ দারুমূর্তির মতই বসে ছিল শ্যামল সেন। রিনার বাবা হেমন্ত কোথায় গেছে তা সে জানে না, কিন্তু কাকে নিয়ে গেছে তা

জানে। হেমন্ত একা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেনি। শ্যামলের স্ত্রী গোপাকে সঙ্গে নিয়েছে। পাছে শ্যামল তাদের দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থানা আর হাসপাতালে ছুটোছুটি করে, তাই গোপা এক টুকরো চিঠিতে খবরটুকু জানিয়ে গেছে, 'আমরা চললুম, খোঁজাখুঁজি করতে যেয়ো না, তাতে লাভ নেই।'

চিঠিটা পাওয়া গেছে বালিশের তলায়। হেমন্তও না জানিয়ে যায় নি। স্ত্রীর জন্যে ছাইদানী চাপা দিয়ে ঘরের কোণে একখানি চিঠি রেখে গেছে। ভাব আর ভাষা প্রায় একই। হাতের লেখা শুধু আলাদা। সারাটা বিকেল সন্ধ্যা অনিশ্চিত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাবার পর রাত গোটা দশেকের সময় প্রায় একই সঙ্গে সেই দুটো চিঠির টুকরো হাতে পড়েছে দুজনের। শ্যামল আর সুলতার। তারপর এই একই বাড়িতে তাদের আরো দু'দিন দু'রাত কেটেছে। এই তিন দিনের মধ্যে পরানুরক্তা গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর জন্য শ্যামল মুখে একটুও হা-হুতাশ করেনি। সমস্ত দুঃখ ক্ষোভ জ্বালা আর অপমান নিজের বুকের মধ্যেই জমিয়ে রেখেছে। কিন্তু সুলতার আচরণ একেবারে আলাদা। সে কখনো চুপে চুপে কখনো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেছে। কটু প্রায় অশ্লীল ভাষায় গোপাকে গাল দিয়েছে, স্বামীকে শাপান্ত করেছে, এমনকি শ্যামলকেও বাদ দেয়নি। বলতে কি আক্রোশটা যেন শ্যামলের উপরেই সুলতার বেশী। এই অঘটনের জন্যে শ্যামলই যেন সবচেয়ে দায়ী। সে যদি সাবধান হত, বুদ্ধিমান হত, পুরুষের মত পুরুষ হত, তাহলে কি আর তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কেউ পালিয়ে যেতে পারে? সুলতার বিলাপের সঙ্গে মেশা এ-অভিযোগও কানে গেছে শ্যামলের। সে অবশ্য পালটা নালিশ করেনি যে, সুলতাও যদি নারীর মত নারী হত তা হলে তার স্বামীর দৃষ্টি অন্য কোন মেয়ের উপর পড়ত না। এ অভিযোগ করার মত সঙ্গত কারণ থাকলেও শ্যামল তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারেনি। তার রুচিতে বেধেছে। একজন মেয়ে যেসব কথা বলতে পারে একজন পুরুষের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। সুলতার কটূক্তির জবাবে একটি কথাও শ্যামলের মুখ থেকে বেরোয়নি। কিন্তু তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে সমস্ত মন তিক্ত হয়ে উঠেছে শ্যামলের। যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে তার চেয়েও শ্যামলের বেশী রাগ যেন এই মুখরা দুর্ভাষিণী পরস্ত্রীর উপর। কে জানে, ওর জিভের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই হয়ত ঘর ছেড়েছে হেমন্ত লাহিড়ী।

দাম্পত্য কলহের কথা বন্ধুর কাছে হেমন্ত আগেও বলত। তখনও শ্যামল বিয়ে করেনি। এম-এ পাশ করে মফঃস্বলের এক নতুন কলেজে অস্থায়ী লেকচারারের চাকরি পেয়েছে। ছুটিছাটায় কলকাতায় এসে হেমন্তর বাসায় দেখা করতে যেত। তখন নিউ বউবাজারে বাসা ছিল হেমন্তর। ঘরসংসারের গল্প করতে করতে হেমন্ত বলত, 'ভাই শ্যামল, দেখে শিখো, ঠেকে শিখো না। আর যাই করো বিয়ে কোনদিন কোরো না।'

সুলতাকে সাক্ষী মানত শ্যামল, 'শুনেছেন আমার বন্ধুর পরামর্শ?'

সুলতা গম্ভীরভাবে বলত, 'অমন পরামর্শ উনি সবাইকেই দেন। কিন্তু পারলে নিজে আরো দু'তিনটে বিয়ে করেন।'

হেমন্ত বলত, 'কেবল দু'তিনটে? সুলতার ধারণা শহরের অন্তত দু'তিন শো মেয়ে আমার জন্যে পাগল।'

শ্যামলও হাসত। হেমন্তর যেসব রূপগুণ আছে তাতে ওর উপর মেয়েদের একটু পক্ষপাত থাকা স্বাভাবিক। এম-এ পাশ করে হেমন্ত ঢুকেছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে। চাকরিটা ভালোই। শ্যামলের চেয়ে মাইনেও বেশী। কিন্তু বেশী মাইনের চাকরিই হেমন্তর একমাত্র পরিচয় নয়। গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারা হেমন্তর। অফিসের স্যুট পরলে যেমন ওকে মানায়, আটপৌরে ধুতি-পাঞ্জাবিতেও তেমনি। খোলা গায়ে নীল কি সবুজ রঙের লুঙ্গিতে যেন ওর রূপ আরো বেশী খোলে।

শ্যামল প্রায়ই বলত, 'হেম, তোমার জামার দরকার হয় না। তুমি খালি গায়ে থাকলেও মনে হয় রাঙন জামা পরে রয়েছ।'

হেমন্ত হাসত, 'শ্যামল, তুমি দেখি মেয়েদেরও বাড়া। আমার রূপের প্রশস্তি তাদের চোখে দেখেছি, কিন্তু ঠিক মুখের ভাষায় এমন করে শুনিনি। তুমি যদি মেয়ে হতে আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।'

শ্যামল লজ্জিত হত, 'কি যে বল, তোমার মুখে কিছুই আটকায় না।'

হেমন্ত বলত, 'আমার মুখ ওইরকমই। কোন মেয়ে এসে হাত চাপা দিয়ে এ মুখ বন্ধ না করে দিলে আগ্নেয়গিরি থেকে অনর্গল লাভাস্রোত বেরোয়। সে স্রোতে তোমাদের সমাজ সংসার সব ভেসে যায়।'

শ্যামল জবাব দিত, 'সে স্রোত আটকাবার জন্য তো বউদিই আছেন।'

হেমন্ত ধমকে উঠত, 'দেখ শ্যামল, বউদি বউদি কোরো না। কানে বড় বিশ্রী লাগে। আমি তোমার দাদা নই, বন্ধু। আর আমার স্ত্রী আমার বন্ধন, কিন্তু তোমার বন্ধুনী। ওকে তুমি নাম ধরে ডাকবে। হ্যাঁ, আটকাবার কথা বলছিলে। দাম্পত্য সম্পর্ক মানেই তো তাই। একজন আর একজনকে আটকে রাখবে। আমি কিন্তু আটকাইনে, ছেড়ে দিই।'

বন্ধুর বাকপটুতায় শ্যামল হাসত।

কিন্তু হেমন্ত শুধু যে রূপবান, শুধু যে বাকপটু, তাই নয়, ওর আরো অনেক গুণ আছে। হেমন্ত মেয়েদের সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যেতে ভালোবাসে, যতক্ষণ না তাদের জিনিস পছন্দ হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করবার মত অসীম ধৈর্য ওর আছে। ফটো তোলা, তাস খেলা, হাঁসের মাংস রাঁধতে পারা, কোন গুণ না আছে হেমন্তর। সিনেমায় যেসব ছবি দেখতে বসে পাঁচ দশ মিনিটে শ্যামল বিরক্ত হয়ে ওঠে, সে সব ছবি অক্লান্তভাবে হেমন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে যেতে পারে, অবশ্য কোন তরুণী মেয়ে ওর পাশে থাকা চাই। বন্ধুর সব কিছুই যে শ্যামলের পছন্দ হত তা নয়। মাঝে মাঝে মনে হত, হেমন্তর অনেক কথাই হয় স্থূল, না হয় ভঙ্গিসর্বস্ব। তার মধ্যে অর্থগৌরব নেই। তবু হেমন্তকে তার ভালো লাগত। ওর মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে, আছে যৌবনের উচ্ছলতা। নিজের মধ্যে যার অসদ্ভাব, বন্ধুর মধ্যে তা মাত্রাতিরিক্ত। শ্যামল বলত, 'আমরা দুজনে মিলে— একজন।' হেমন্ত বলত, 'বাঃ, দিব্যি কূজনের মত শোনাচ্ছে। তুমি যদি মেয়ে হতে তা হলে আর কথা ছিল না। আমি কি চাই জানো? নারীদেহের মধ্যে পুরুষের মন আর পুরুষের বুদ্ধি। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য, বোধহয় অপ্রাপ্য।' শ্যামল বলত, 'তাতো বটেই। আমি তেমন কোন ছদ্মবেশিনীকে চাইনে। যে ভিতরেও মেয়ে বাইরেও মেয়ে যদি বিয়ে করি আমি তেমন একজনকেই বিয়ে করব।'

কিন্তু বিয়ে তো শ্যামল করল না বিয়ে তার বাবা দিলেন। গরিবের ঘরের মেয়ে গোপা। গা-ভরা গয়না নিয়ে এল না। রূপ নিয়ে এল। স্কুল পড়া বিদ্যা, মাত্র ম্যাট্রিকের সিঁড়ি ডিঙিয়েছে। কিন্তু বাকচাতুর্যে চারটে পাশওয়ালা পেশাদার বক্তা শ্যামল তার কাছে হার মানে। তার অল্পে তুষ্টি নেই, বস্তুর বিরলতায় অপরিতৃপ্তি। তার দু'চোখের দৃষ্টিতে শুধু যেন একটিমাত্র কথা, 'আরো চাই'। শ্যামলের বাবা বললেন, 'এইরকমই ভালো। দুজনে একরকম হলে সংসার অচল হয়।'

বন্ধুদের মধ্যে বউ দেখে হেমন্ত সবচেয়ে বেশী খুশী হল। বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে, তুমি তার আর একবার প্রমাণ দিলে।'

শ্যামল লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমি কী দেখে এত প্রশংসা করছ।'

হেমন্ত অসঙ্কোচে জবাব দিল, 'রূপ দেখে। মেয়েরা পুরুষের ঠিক উল্টো। তাদের রূপটাই গুণ।'

শ্যামল তর্ক করল না। বন্ধুর উল্টোপাল্টা কথা বলার অভ্যাস আছে তা সে জানে। তার এখনকার কথার সঙ্গে তখনকার কথার মিল নেই।

কিন্তু দেখা গেল শ্যামলের স্ত্রীর সঙ্গে হেমন্তর বেশ মিল হয়েছে। দুজনকেই দুজনের বেশ পছন্দ। শ্যামল এতে খুশীই হল। অন্যের স্বীকৃতি না পেলে কি স্ত্রীর মূল্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়?

কলকাতার কলেজে চাকরি নিয়ে এল শ্যামল। তার আগেই দেশের বাড়িতে বাবা মারা গেলেন। মা তারও আগে থেকে ছিলেন না। পিসিমা দেওরের কাছে ফিরে গেলেন। শ্যামল তালতলায় বাসা নিল। কিছুদিন বাদেই গোপা গেল হাসপাতালে। কিন্তু ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে আসতে পারল না।

শ্যামল বন্ধুর অফিসে গিয়ে বলল, 'সেই থেকে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে, তুমি যেয়ো মাঝে

মাঝে।'

হেমন্ত বলল, 'তুমি বললেই যেতে পারি। পাছে মনে কর বড় ঘনঘন যাচ্ছি সেই ভয়েই যাইনে।'

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'তোমার মত লোকেরই এখন দরকার, ওকে স্ফূর্তিতে রাখতে চাই।'

হেমন্ত বলল, 'কি করে রাখবে? তুমি কি হাসতে জানো, না হাসাতে জানো?'

পরদিন তালতলার বাসায় এল হেমন্ত। গোপার শিয়রের পাশে বসে বলল, 'এ করেছ কি, শুধু মন নয় দেহটুকুও যে খোয়াতে বসেছ গোপা। ছেলে এবার হয়নি, আবার হবে। কিন্তু দেহ গেলে থাকবে কি।'

গোপা একটু হেসে বলল, 'আর কিছু না থাক, আপনাদের আপসোস তো থাকবে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না, আপনার বন্ধুকে দিন।'

হেমন্ত বলল, 'ও শুধু আজকের নয়, চিরকালের শোকার্ত। ওকে সান্ত্বনা দেব, এমন আমার শক্তি নেই। তোমাকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলতে পারলেই আমি বাঁচি।'

আরো কিছুদিন বাদে হেমন্তই নিয়ে এল প্রস্তাব। তার এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু ছোট একটি বাড়ি করেছে অশোক পার্কে। কিন্তু গৃহপ্রবেশের পর এক মাসও যায়নি, দিল্লীতে বড় সরকারী চাকরি পেয়ে গেছে। এখন বাড়ি আগলাবে না চাকরি আগলাবে। বলা বাহুল্য চাকরিটাই আগে। বাড়িটি সে ভাড়া দিয়ে যেতে চায়। হেমন্ত সস্ত্রীক গিয়ে সে বাড়ি দেখে এসেছে। চমৎকার জায়গা, চমৎকার বাড়ি। ভাড়া সেই চমৎকারিত্বের তুলনায় এমন কিছু বেশী নয়। মাত্র পঁচাশি। কিন্তু হেমন্তর একার পক্ষে মাত্রাটা বেশী। শ্যামল কি রাজী আছে হেমন্তর অংশীদার হতে?

শ্যামল বলল, 'নিশ্চয়ই। তালতলার এই একতলায় দুখানা ঘরের জন্যে পঞ্চাশ টাকা করে গুনি। তোমার অশোক পার্কে হিসেবমত এর চেয়ে সস্তা পড়বে।'

হেমন্ত বলল, 'সেদিক থেকে বেশী সস্তা হয়ত পড়বে না। টালীগঞ্জ ছাড়িয়ে শহরের একেবারে বাইরে। অত দূর থেকে শিয়ালদয় আসতে তোমার ট্রাম-বাসের খরচা বাড়বে, সময়ও কম লাগবে না।'

গোপা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা লাগুক গিয়ে। ফাঁকা জায়গায় আলো হাওয়া তো পাওয়া যাবে।'

হেমন্ত বলল, 'তা যাবে। সেখানে আলো হাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। তবে ধারে কাছে জনমানুষ কিন্তু পাবে না।'

গোপা বলল, 'কেন, আপনি আর সুলতাদি?'

হেমন্ত হেসে বলল, 'আমরা তো থাকবই। তোমাদের একমাত্র প্রতিবেশী।'

গোপা খুশী হয়ে বলল, 'একজনের বেশী প্রতিবেশীতে দরকার কি! আপনি একাই একশ।'

হেমন্ত বলল, 'আর তুমি একা এক সহস্র।'

বস্তুবাদী, বিত্তবান ইঞ্জিনীয়ার মনে মনে কবি। বাড়ির নাম দিয়েছেন 'স্বপ্ননীড়'। বাড়ির রং সাদা, সামনের উঠোনটুকুর রং সবুজ। তার চারপাশ ফুলের চারায় ঘেরা। সে ফুলের কোনটির রং লাল, কোনটির নীল, কোনটির বেগুনী।

দেখে গোপা তো মহাখুশী। হেমন্তকে ডেকে বলল, 'মনে হয়, এবাড়ি আমাদের জন্যেই বিপুলবাবু তৈরি করে গিয়েছেন।'

হেমন্ত বলল, 'নিশ্চয়ই, আমাদের জন্যই তো।'

বাড়িটি একটি পরিবারের থাকবার মত। একটিমাত্র বাথরুম, একটি রান্নাঘর, মাঝখানে একটি ড্রয়িংরুম। দু'খানা শোয়ার ঘর ছাড়া কোণের দিকে ছোটমত আর একখানা ঘর আছে।

হেমন্ত বলল, 'শ্যামল, আমি ওঘরের ভাগ চাইনে। ওখানা তোমার একার। কোণের ঘরে তুমি নিজের মন নিয়ে থাকবে সেই জন্যে।'

শ্যামল বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু তুমি সারা দুনিয়া নিতে হয় নাও। আমি মনের মত একখানা ঘর পেলে সত্যি খুশী হই।'

হেমন্ত বলল, 'শুধু ঘর? ঘরনীর দরকার নেই?'

গোপা উত্তর দিল, 'ওর কথা বলবেন না। ওর সবই উল্টো। গৃহই ওর গৃহিণী।'

হেমন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শ্যামল, তুমিই হয়ত সুখী। কিন্তু সব সুখ সকলের জন্যে নয়। কেউ কেউ দুঃখও পেতে চায়।'

গোপা হেসে উঠল, 'ছোঁয়াচ লাগল বুঝি? আমি কিন্তু দুঃখ পেতে চাইনে।'

গোপার কথার ভঙ্গি দেখে হেমন্ত হেসে বলল, 'আমিও না। তোমার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিল আছে।'

গোপা বলল, 'বাঃ চাওয়ার মিল কোথায় দেখলেন? আপাতত না-চাওয়ার সঙ্গে না চাওয়ার মিল।'

হেমন্তর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্যামল বন্ধুর সঙ্গে ঠিক একান্নবর্তী হতে রাজী হল না। একই রান্নাঘরে দুটি উনুন জ্বলল। ঝি অবশ্য একজনই রইল। ঠিকে নয়, স্থায়ী। তবে যশোদার সাহায্য সুলতার চেয়ে গোপারই বেশী দরকার হয়। ঘরকন্না সম্বন্ধে সুলতা নিজেও গোপাকে অনেক উপদেশ নির্দেশ দেয়।

শ্যামল বলল, 'আপনি পাকা গৃহিণী। আপনার কাছ থেকে তালিম পেলে গোপার অনেক উপকার হবে। সত্যি আপনার অনেক গুণ।'

সুলতা বলে, 'এ গুণের কি কোন দাম আছে শ্যামলবাবু?'

শ্যামল সুলতার দিকে তাকায়। হেমন্তর স্ত্রী কুরূপা নয়। গায়ের রং স্নিগ্ধ শ্যাম। মুখের ডৌলটিও মিষ্টি। তবে চেহারাটা বেশী পুষ্ট হওয়ায় বয়স কিছু বেশী দেখায়। বয়সের তুলনায় স্থিরতা ধীরতা যেন আরো বেশী। চালচলনটা মন্থর। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভারী সাদাসিধে ধরনের একটি বউ। যেন গাঁয়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ পানা ঢাকা পুকুর। লক্ষ্মীশ্রী ওর মুখে যতটা নেই, হাতের কাজে তার চেয়ে বেশী আছে।

সুলতা চমৎকার রাঁধে। নিপুণ করে ঘর গুছোয়, পরিপাটি করে বিছানা পাতে। তবু শ্যামলের মাঝে মাঝে মনে হয়, সে শয্যা বেশীর ভাগ রাত্রেই সুখশয্যা হয় না। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তেমন নেই শ্যামলের। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির অবস্থা কেমন ছিল সেই ইতিহাস নিয়ে সে ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মৌলিক গবেষণা সে পেশ করবে। তারই উদ্যোগ আয়োজনে তার দিন কাটে, রাত গভীর হয়।

রিনা মার চেয়ে নতুন মাসীর বেশী ভক্ত। গোপা তেমন করে ঘর গুছোতে না জানলে কি হয়, মেয়েকে সাজাতে জানে। তার বিনুনী বাঁধে, কাজল পরায়, ফ্রকের নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করে। তাছাড়া প্রায়ই বেড়াতে বেরোয় তাকে নিয়ে।

রিনা বলে, 'বাবা, তুমিও চল।'

কে জানে গোপা তাকে শিখিয়ে দেয় কিনা। আর এমন সময় ওদের বেড়াবার শখ হয় যখন হাতে কাজ থাকে সুলতার। তা ছাড়া আরো নানা দরকারে গোপাকে ঘর থেকে বেরোতে হয়। সে সময় অবশ্য হেমন্ত অফিসে থাকে। শ্যামলও কলেজে চলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো তারও চোখে পড়ে, হেমন্ত আর গোপা একসঙ্গে ফিরছে।

কৈফিয়তের দরকার নেই তবু হেমন্ত বলে, 'বাসে দেখা হয়ে গেল। বাসায়-দেখা গোপার সঙ্গে বাসে-দেখা গোপার বেশ একটু তফাৎ আছে। তা কি লক্ষ্য করেছ শ্যামল?'

শ্যামল জবাব দেয়, 'না। তত লক্ষ্য করবার আমার সময় নেই, চোখই বা কই।'

কিন্তু শ্যামল অস্বীকার করলে কি হবে, তার দু'চোখ ছাড়াও তৃতীয় নয়ন আছে। সে নয়ন অনুভূতির। তাতে সব ধরা পড়ে। হেমন্ত আর গোপার অন্তরঙ্গতার মাত্রা যে বেড়ে চলেছে তা তার উপর স্ত্রীর সোহাগের আধিক্য দেখেই সে টের পায়। হেমন্তর সান্নিধ্যে গোপার যেন রঙ বদলায়, রূপ বদলায়, হেমন্তর নাম উচ্চারণ করতে গোপার কণ্ঠ আরো মধুর হয়ে ওঠে। দু'জনে মিলে কথা কাটাকাটি করতে ওরা যে অদ্ভুত আনন্দ পায় তা বুঝতে তার বাকি থাকে না। তবু শ্যামল চুপ করে থাকে। মনের গোপন আশঙ্কাকে স্বীকার করতে লজ্জা পায়, উচ্চারণ করতে অপমান বোধ করে। মনকে চোখ রাঙায়, যা হয়ত বন্ধুত্ব, একান্তই সঙ্গ-প্রীতি তাকে ঘুলিয়ে তোলা ঠিক নয়। তলায় যা

আছে থাক। উপরের স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয়। তাই ভদ্রতা, সভ্যতা তারই নাম।

তাছাড়া লঘু হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-পরিহাস ছাড়া কিছু তো শ্যামল দেখতে পায়নি যে আপত্তি করবে। বিনা প্রমাণে অভিযোগ তুললে তারই কি মান থাকবে। সেও কি ওদের কাছে ছোট হয়ে যাবেনা?

শ্যামলের মাঝে মাঝে কানে যায় সুলতার সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে হেমন্তর প্রায়ই ঝগড়া বাধে। দাম্পত্য কলহ শুধু রাত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দিনেও চলে। শুধু স্বামীর সঙ্গে নয়, সবচেয়ে যা লজ্জার গোপার সঙ্গেও সুলতার বনিবনাও হয় না, প্রায়ই কথা কাটাকাটি চলে। তার বিষয় সামান্য, উপলক্ষ অকিঞ্চিৎকর।

শ্যামল মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ধমক দেয়, 'তোমরা যদি এমন কর, আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।'

কিন্তু বিবাদ মিটমাট করতে হেমন্ত আর গোপারই গরজ বেশী। তারা দল বেঁধে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করে, পিকনিকের আয়োজন করে। জোর করে শ্যামল আর সুলতাকে ধরে এনে তাসের আসরে বসিয়ে দেয়।

হেমন্ত বলে, 'তাস-ঘরে কিন্তু খাস-ঘরের পার্টনার বদলে নিতে হয়। এ-ঘরে তাই গোপা হৈমন্তী, আর সুলতা শ্যামলী।'

সুলতা হঠাৎ বলে ওঠে, 'তা জানি। এই অদল বদলের জন্যেই তো খেলতে বসা।'

কথাটা যতখানি ঠাট্টার সুরে বলতে যায়, ততটা ঠাট্টার মত শোনায় না।

খানিক বাদে সুলতা তাস ফেলে উঠে পড়ে। বলে, 'আর ভালো লাগে না, ঘুম পাচ্ছে।'

গোপা হেসে জবাব দেয়, 'ঘুম নয়, লজ্জা। আসলে হেরে যাচ্ছ, তাই আর খেলতে চাইছ না।'

সুলতা বলে, 'শ্যামলবাবু খেলতে জানেন না, তাই হারতে হচ্ছে। নইলে আমাদেরই জিতবার কথা ছিল।'

তারপর একদিন গভীর রাত্রে সুলতা এসে শ্যামলের সেই ছোট ঘরের সামনে দাঁড়াল, বলল, 'অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি। এতদিন বলতে লজ্জা করেছে। আজ আর লজ্জার সময় নেই।'

শ্যামল বলল, 'কেন হয়েছে কি। ওরা কোথায়?'

সুলতা বলল, 'ছাদে বসে গল্প করছিল।'

শ্যামল বলল, 'সেখানে তো বিনা আছে।'

সুলতা বলল, 'সে ঘুমিয়ে আছে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ভেবেছিল আমিও বুঝি ঘুমে।'

শ্যামল বলল, 'তারপর?'

সুলতা বলল, 'তারপর আমি যা দেখলাম তা আপনার কাছে বলা যায় না। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ হয়ে যা সইতে পারছিনে, আপনি পুরুষ হয়ে তা সইছেন কি করে? আপনি সইছেন বলেই তো ওরা এত সাহস পেল। আপনি যদি মানুষ হতেন—'

শ্যামল বলল, 'আপনি বলছেন কি এসব?'

সুলতা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, হেমন্ত এসে পিছনে দাঁড়াল, বলল, 'শ্যামল, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

শ্যামল চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এল, অনুচ্চ কিন্তু তীব্র ঘৃণাভরা গলায় বলল, 'চুপ কর হেমন্ত। তুমি লম্পট আমি জানতাম, কিন্তু এত বড় যে পশু তা ধারণাও করতে পারিনি।'

হেমন্ত কি একটা কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিল, শ্যামল তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমার চমৎকার কথা অনেক শুনেছি, আর নয়। কাল থেকে হয় তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না হয় আমরা ছাড়ব। এভাবে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হবে না।'

হেমন্ত স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

সুলতা আর হেমন্ত চলে গেলে গোপা এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'শোন, সুলতা আমাদের নামে বানিয়ে বানিয়ে যা বলবে তাই তুমি বিশ্বাস করবে?'

শ্যামল ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ, নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে। সুলতা তোমার চেয়ে বেশী বানাতে পাবে না, তা আমি জানি।'

পাতা বিছানা পড়ে রইল। কেউ তা স্পর্শও করল না। রান্নাঘরে ভাত তরকারি পড়ে রইল, তা ছুঁয়েও দেখল না কেউ। যশোদা মিথ্যেই ঘরে ঘরে খাওয়ার জন্যে সবাইকে সাধাসাধি করল।

ভোরে উঠে শ্যামল চা-টা না খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। নতুন বাসা সে খুঁজে বার করবেই। দুপুরের পর ফিরে এল। নাওয়া খাওয়া হয়নি। চুল উস্কো খুস্কো। বাসার খোঁজ মেলেনি। আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা হোটেল ঠিক করে এসেছে।

কিন্তু গোপা ঘরে নেই।

'সে কোথায়?' সুলতাকে জিজ্ঞাসা করল শ্যামল।

সুলতা জবাব দিল, 'গোপা চেতলা গেছে।'

চেতলায় ওর মামার বাড়ি।

'আর হেমন্ত?'

সুলতা বলল, 'তাকে আমিই পাঠিয়েছি। অন্য বাসা খুঁজে বার করতে। এখানে এভাবে আর থাকা উচিত নয়।'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু আমিই যে আগে হোটেল ঠিক করে এসেছি। গোপাকে যেতে দিলেন কেন?'

সুলতা বলল, 'তাকে আটকে রাখবার মালিক কি আমি?'

শ্যামল তখনই ছুটল চেতলায়। কিন্তু সেখানে গোপা যায়নি। তার মামা ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি বাবাজী, ঝগড়া ঝাটি হয়েছে নাকি তোমাদের? যাবে আর কোথায়, দেখ গিয়ে বাসাতেই আছে।'

মামী-শাশুড়ী খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু শ্যামল তাঁর কথায় কান দিল না।

বাসায় এসে দেখল গোপা তখনও ফেরেনি, হেমন্তও না।

সারা দিনভর আরও কয়েক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত শ্যামল ঘরেই এসে তাদের খোঁজ পেল—চিঠির টুকরোয়।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, এতই নাটকীয় যে প্রথমে নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি শ্যামলের। আশ্চর্য, ওরা যে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছিল তা কি বাসা বদলালেও নিতে পারত না? কিন্তু সঙ্গকামনা বোধ হয় ওদের এতই বেড়েছে যে, ওরা আর কোন বাধা, কোন ব্যবধান মানতে রাজী হয়নি। কারো শাসন, কারো অনুশাসন মানতে আর ইচ্ছে হয়নি ওদের।

কিন্তু হেমন্তকে যতই তরুণ দেখাক, সে তো শ্যামলেরই সমবয়সী। বছর তিরিশেক তারও বয়স হয়েছে। এই বয়সে নিজের স্ত্রী-কন্যা ছেড়ে পরস্ত্রীকে নিয়ে সে যে পালিয়ে গেল, একবার কি ভেবেও দেখল না এর পরিণামটা কি। সমাজে কোথায় তাদের স্থান হবে, স্বজন বন্ধুরা কী চোখে তাদের দেখবে।

শ্যামলের মনে পড়ল হেমন্ত একদিন বলেছিল, 'দেখ শ্যামল, লুকোচুরি করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। চুরি নয়, জীবনে আমি অন্তত একবার ডাকাতি করতে চাই। দু একটা আঙুলের ডগা পুড়িয়ে দেখেছি। তাতে পুড়ে মরবার সুখ হয় না। ভেবেছি একবার সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দেখব।'

ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে বন্ধুর ঘরেও আগুন দিতে হল হেমন্তকে। শ্যামল হাসল। কিন্তু হেমন্ত কি জানে না, ঝাঁপ দেওয়ার পর এ সব আগুনের নিবে যেতে বেশী দেরি লাগে না; তখন দুই আধপোড়া অঙ্গার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিদ্বেষে জ্বলে, আর তাদের বাকি আধখানা পুড়ে পুড়ে খাক হয়?

যশোদা এসে তাড়া দিল, 'দাদাবাবু, এভাবে বসে থেকে করবেন কি? এবার নেয়ে খেয়ে নিন। কলেজ নেই আপনার?'

'না, ছুটি নিয়েছি।'

যশোদা বলল, 'সেই ভালো হয়েছে। এবার নেয়ে খেয়ে ফের একটু খোঁজখবর করে দেখুন। আমার মনে হয় তারা এখনো কলকাতার মধ্যেই আছে।'

শ্যামল ধমক দিয়ে উঠল, 'তুমি যাও এখান থেকে। তোমার কী মনে হয় আমি তা তোমাকে বলতে ডাকিনি।'

বকুনি খেয়ে যশোদা সেখান থেকে সরে গেল। তারপর শ্যামল বিনা অনুরোধেই উঠে স্নানাহার শেষ করল। এই দৈনন্দিন শারীরিক অভ্যাসগুলিই শুধু বিনা চিন্তায় সারা যায়।

খানিক বাদে শ্যামল বেরোতে যাচ্ছিল, সুলতা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, 'আপনি বাইরে যাচ্ছেন?'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ।'

সুলতা বলল, 'কোন খোঁজ-খবর পেলেন?'

'না।'

সুলতা বলল, 'ঘরে বসে কি খোঁজ পাওয়া যায়? আপনি আসলে কোন চেষ্টা করছেন না।'

শ্যামল রুক্ষ স্বরে বলল, 'আমি কি করছি না করছি তার হিসেব আপনার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই।'

সুলতা বলল, 'নিশ্চয়ই বাধ্য। আপনিই তো অশান্তির গোড়া, যত অনর্থের মূল। আপনি যদি অমন জেগে জেগে না ঘুমোতেন—'

আক্রোশে, বিদ্বেষে কুঁদুলে সুলতাকে ভারি কুশ্রী দেখাতে লাগল।

শ্যামল বলল, 'সে কথা তো হাজার বার বলেছেন। আর বলে লাভ কি। এবার যান এখান থেকে।'

সুলতা বলল, 'যাবই তো। আর যাই করি, আপনার মত পুরুষের সাহায্য নিতে যাব না।'

কথা শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেল সুলতা।

একই তীরে বিদ্ধ দুজন। কিন্তু কেউ কারো কাছে আসতে পারছে না। দুজনেই আলাদা আলাদা ছটফট করছে। কারো জন্যে কারো এক ফোঁটা সহানুভূতি নেই।

সুলতা যত এগিয়ে আসছে, শ্যামল ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। বাঁধন যখন ছিঁড়লই, সে আর কারো সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না। কারো সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কও নয়, শত্রুতার সম্পর্কও নয়।

সুলতা একবার এসে বলেছিল, 'আমাকে শ্যামবাজারে আমার দাদার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসুন।'

অনুরোধ নয়, যেন হুকুম।

শ্যামল বলেছিল, 'আপনি নিজে যান, কি আপনার দাদাকে খবর দিন। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না।' সুলতার দাদার সঙ্গে দেখা হলে তিনি যে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেই অপ্রীতিকর অবস্থাটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই শ্যামল ও প্রস্তাবে রাজী হয়নি।
কিন্তু সুলতা বুঝেছে অন্য রকম। সে একটু হেসে শ্লেষ-মেশানো গলায় বলেছে, 'কেন, আমাকে সঙ্গে নিলে কি আপনার জাত যাবে? ভয় নেই, সঙ্গে গেলেই আপনার ঘাড়ে চেপে বসতে চাইব না, আমি গোপা নই।'

দুঃসহ ঘৃণায় শ্যামলের সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠেছে, জ্বালাভরা গলায় সেও জবাব দিয়েছে, 'আমিও হেমন্ত নই, সে কথা মনে রাখবেন। আপনি চাপতে চাইলেই আমি কাঁধ এগিয়ে দেব, তা ভাববেন না।'

বার কয়েক সুলতা রাস্তার মোড় অবধি গিয়েছে, আবার কি ভেবে ফিরে এসেছে। নিজের ঘরে গিয়ে ফের কান্না আর বিলাপ শুরু করেছে। শুনে শুনে দুঃসহ লেগেছে শ্যামলের। মনে মনে ঠিক করেছে, সুলতা যদি নিজে থেকে চলে না যায়, যদি কোন আত্মীয়স্বজন তার এসে না পড়ে তাহলে শ্যামলকেই অন্য পথ দেখতে হবে। সেই চলে যাবে এখান থেকে। এই ঝগড়াটে স্ত্রীলোকটির ওপর তার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। হেমন্তর চলে যাওয়ার পর থেকে সে কেবল শ্যামলকে বারবার

গালাগাল করছে, অপমান করছে, একবারও মমতার চোখে তাকায়নি, সাধারণ ভদ্রতা শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখায়নি। তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক শ্যামলের? তাছাড়া হেমন্ত যে শত্রুতা করে গেছে তার সঙ্গে তার শোধ একমাত্র তার স্ত্রী কন্যার ওপর নির্মম হয়েই শ্যামল নিতে পারে। প্রতিশোধ নেওয়ার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর শ্যামল ফের ঘরে এসে বসল। কোথাও মন টেঁকে না। কোথাও যাওয়া তো ভালো, যাওয়ার কথা ভাবতেও ভয় হয়। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন যারা আছে, বন্ধুবান্ধব যারা রয়েছে তাদের কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে শ্যামল! মুখ ফুটে কি করেই বা এই কলঙ্কের কথা বলবে। তাছাড়া নালিশ জানিয়ে লাভই বা কি হবে শ্যামলের। থানা পুলিশ মামলা মোকদ্দমা করে যে-গোপাকে সে ফিরে পাবে তাকে পাওয়ার কি আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকবে? তাদের দুষ্কৃতির শাস্তি! না, তার জন্যে সময় অর্থ ব্যয় না করে নিজের কাজে মন দিতে পারলে শ্যামল অনেক শান্তি পাবে। কিন্তু সেই নিজের কাজই বা করতে পারছে কই। এই ক'দিনের মধ্যে একবারও তো সে বইপত্র ছুঁয়ে দেখতে পারেনি। আজ আর ইতিহাস নেই। কে যেন তাকে অতীত থেকে বর্তমানের অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

আশ্চর্য, এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, কিন্তু বাইরের কেউ এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা জানে না। এ-অঞ্চলে এখনো তেমন করে বসতি হয়নি। দূরে দূরে দু'একটা বাগানবাড়ি আছে। বেশীর ভাগ সময় মালী ছাড়া সেখানে কেউ থাকে না। আর দু'একটা উদ্বাস্তু-কলোনি আছে। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ নেই শ্যামলের। হেমন্তদের থাকলেও থাকতে পারে। শনিবার কি রবিবারের আগে কলকাতা থেকে কোন বন্ধুবান্ধবের এখানে আসবার কথা নেই। হেমন্তরা যদি ভুল বুঝে এর মধ্যে ফিরে আসে তা হলে ব্যাপারটার কথা কেউ আর জানতে পারবে না। ফিরে এলেও অবশ্য গোপাকে আর আগের মত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না শ্যামল। শুধু কেলেঙ্কারিটা কিছুদিনের জন্যে ঢাকা থাকবে। ততদিনে বিষয়টা আগাগোড়া ভেবে দেখবার সময় পাবে শ্যামল, কর্তব্যও স্থির করতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে শ্যামল ফের বাড়িতে ফিরে এল। সুলতার সঙ্গে কে যেন কথা বলছে। পুরুষের গলা। তবে কি হেমন্তরা ফিরে এসেছে? না, গলাটা অচেনা শ্যামলের। একটু বাদে মাঝবয়সী মোটাসোটা এক ভদ্রলোক শ্যামলের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমার নাম শীতাংশু সান্যাল। আমি সুলতার দাদা। আগেও বার দুই এখানে এসেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। তাই সময়মত ওর চিঠি পাইনি। এখানে এসে সব শুনলাম।'

শীতাংশুবাবু একটু থামলেন। শ্যামল নিরুত্তর দেখে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি থানায় ডায়েরি করেছেন?'

শ্যামল বলল, 'না।'

শীতাংশুবাবু বললেন, 'আপনি না করলেও আমরা করব। আমরা অত সহজে ছেড়ে দেব না।'

শ্যামল বলল, 'আপনারা যা খুশী তাই করতে পারেন। সে কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি।'

শীতাংশুবাবু একটুকাল অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি।'

খানিক বাদে ভদ্রলোক নিজেই গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। গোটা দুই স্যুটকেস ট্রাঙ্ক আর ছোট খাট জিনিসপত্র ড্রাইভারের সাহায্যে তুলে নিলেন গাড়িতে।

একটু বাদে মেয়েকে নিয়ে সুলতাও গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ির ভিতর থেকেই রিনা চেঁচিয়ে বলল, 'কাকাবাবু, আমরা চললুম।'

কে জানে সুলতা শিখিয়ে দিল কি না, নাকি রিনা নিজের বুদ্ধিতেই এই বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগে আগে যশোদা এসে বলল, 'দাদাবাবু, আমাকে আজকের মত ছুটি দিতে হবে।'

শ্যামল বলল, 'তোমাকে চিরকালের মত ছুটি দিলাম।'

যশোদা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আমার বোনপোর বড় অসুখ। ওই কলোনির মধ্যেই তারা থাকে। একবার যাই, দেখে আসি গিয়ে।'

শ্যামল বলল, 'আচ্ছা।'

যশোদা বলল, 'ওঁরা তো ঘরে তালা দিয়েই গেছেন। রান্নাঘরে আপনার ভাত ঢাকা রইল। খেয়ে দেয়ে শিকলটা তুলে দেবেন।'

শ্যামল বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে আর তোমার উপদেশ দিতে হবে না। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।'

যশোদা তবু আর একবার বলে গেল, 'একা একা ভয় করবে নাকি দাদাবাবু? ভয় কি, আপনি পুরুষ মানুষ। দোরে ভালো করে খিলটিল দিয়ে শোবেন।'

অধীর হয়ে শ্যামল তাড়া দিয়ে উঠল, 'যাও বলছি।'

যশোদা এবার আর দাঁড়াল না।

শ্যামল মনে মনে ভাবল, আধবয়সী বিধবা যশোদা বোধ হয় নিজেই ভয় পেয়েছে। নাকি সুলতার মত যশোদাও তার সঙ্গে পরিহাস করছে? সহানুভূতির ছলে ব্যঙ্গ করছে তার পৌরুষকে?

সন্ধ্যা উতরে গেল। রাত বেড়ে চলল আস্তে আস্তে। সারা 'স্বপ্ননীড়'-এর মধ্যে শ্যামল আজ একা। স্বপ্নও নেই, নীড়ও নেই। শুধু সেই আছে। দেয়ালে ঝুলনো হাত-ঘড়িটার চিক চিক শব্দ কানে আসছে। এই স্তব্ধতার রাজ্যে আর কোথাও কোন সাড়া নেই, পৃথিবী অসাড় হয়ে গেছে।

শ্যামলও যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা ঘুম ভাঙবার পরে টের পেল। মনে হল পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে। আজ দু'রাত ধরে এই চাপা কান্না শুনে আসছে শ্যামল। এ কি সেই সুলতারই কান্না? তারা তো চলে গেছে। এ কি তার মনের ভুল? না কি এ তার নিজেরই কান্নার শব্দ? আশ্চর্য, তার কান্নার সঙ্গে সুলতার কান্নার তো অদ্ভুত মিল আছে। দুজনের কান্নার ভাষা আলাদা, প্রকাশ আলাদা। কিন্তু গভীর রাত্রে কান পেতে থাকলে চেনা যায়, সুর এক। পৃথিবীর সব কান্নারই সুর এক। শ্যামলের মন এক অননুভূত মমতা আর বেদনায় ভরে উঠল। সেই প্রতারিতা বঞ্চিতা নারী তার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, পুরুষ হয়ে শ্যামলের তা ক্ষমা করা একান্তই কি অসম্ভব ছিল? পৌরুষের এই দ্বিতীয় কিন্তু উচ্চতর পরীক্ষাতেও কি সে ফেল করে বসল? সমস্ত রুক্ষতা রূঢ়তার আড়ালে সুলতার বেদনার ফল্গুধারাকে শ্যামল কি আবিষ্কার করতে পারত না? তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্যামল কি একবারও বলতে পারত না, 'আমাদের দুঃখ এক, আঘাত এক, বেদনা এক। আমরা আলাদা নই!' কিন্তু শ্যামল তা পারেনি। সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি শেষ হবার পর, আরও ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা পার হবার পর সুলতাকে সেকথা বলা শ্যামলের পক্ষে কোনদিনই কি আর সম্ভব হবে?

ফাল্গুন ১৩৬১

সুপুরুষ

একেবারে রাস্তার ওপরেই বাড়ি। জানলা দিয়ে লোক চলাচল দেখা যায়। পায়ে হাঁটা মানুষ আর চলন্ত বাসে বসে যাওয়া যাত্রী—জানলায় দাঁড়ালে সবই চোখে পড়ে। সংসারের কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে মণিকা প্রায়ই এসে এই জানলার কাছে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের চলাচল দেখে। কত চেনা-অচেনা মানুষ এই পথ দিয়ে যায় আসে। চলন্ত বাসের ভিতরে কেবল কতকগুলি মাথা দেখা যায়। কালো চুলের মাথা, পাকা চুলের মাথা, বিনা চুলের মাথা—কত রকমের মাথাই যে আছে সংসারে, আর কত রকমের মুখ, কত রকমের চেহারা। দেখতে বেশ লাগে। একবার দেখবার নেশা মনের মধ্যে জন্মিয়ে নিতে পারলে, দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। মণিকার মনে হয় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। সারা জীবন না হোক, সারা যৌবন তো কেটেই গেল।

মাঝে মাঝে মণিকার মা কুমুদিনী এসে মেয়ের কাছে দাঁড়ান, 'অমন করে কি দেখছিস মণি!'

মণিকা ফিরে না তাকিয়েই বলে, 'কি আবার দেখব।'

কুমুদিনী বলেন, 'দেখছিস না তো অমন করে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন। তোর পা ভেঙে আসে না?'

মণিকা সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'না।'

কুমুদিনী বলেন, 'আশ্চর্য, একপায়ে তুই অতক্ষণ একটানা কি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস তাই ভাবি।'

মণিকা এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে, 'ভাববার কি আছে মা। আমি তো এই এক পা নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকিনে, হাঁটি চলি কাজকর্ম করি। এ তো ছেলেবেলা থেকেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

কুমুদিনী বলেন, 'তা হয়ে গেছে অবিশ্যি, কিন্তু যাই বলিস তোর ভাব ভঙ্গি দেখে মাঝে মাঝে আমার ভারি ভয় হয় বাপু।'

মণিকা জবাব দেয়, 'অবাক করলে মা। আমার ভাব ভঙ্গির মধ্যে ভয়ের কি দেখলে।'

কুমুদিনী যেতে যেতে বলেন, 'ভয় নয় দুঃখ। কি যে দুঃখ তা তুই বুঝবিনে। তোকে তো আর মা হতে হয়নি।'

মণিকা অদ্ভুত একটু হাসে, 'তা ঠিক। এজন্মে শুধু পুরোপুরি মেয়ে হয়ে থাকার সুখই ভোগ করে গেলাম। কারো মা বউ হওয়ার দুঃখ আর পেতে হল না। সেই এক সান্ত্বনা।'

কুমুদিনী আর সেখানে দাঁড়ালেন না। ঘরের কাজকর্ম পড়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে তাঁর চলে না।

পাড়ার নন্দ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে দাবা খেলা সেরে অনেক রাত্রে ফিরে আসেন পেনসনভোগী পান্নালাল রায়। তিনি এসে প্রায়ই দেখতে পান মণিকা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁরও ভালো লাগে না। অসন্তোষের ভঙ্গিতেই বলেন, 'এত রাত্রেও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলি মণি।'

মণিকা জবাব দেয়, 'কি আবার করব বাবা। অমনি দাঁড়িয়েছিলাম।'

পান্নালাল বলেন, 'অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে তোর কষ্ট হয় না?'

মণিকা জবাব দেয়, 'বসে থাকতে আরো কষ্ট হয় বাবা।'

পান্নালাল বলেন, 'শুধু বসে থাকবি কেন। বইটই পড়বি। তোর জন্যেই তো লাইব্রেরী থেকে দুখানা করে বই আনি।'

মণিকা জবাব দেয়, 'অবসর মত বইতো পড়ি বাবা।'

পান্নালাল বলেন, 'তারপর দক্ষিণ দিকে যে একটু ফুলের বাগান করেছি, সেখানেও কাজ করতে পারিস। সবাই বলে গার্ডেনিং খুব চমৎকার হবি।'

মণিকা মৃদুস্বরে বলে, 'বাগানেও যাই বাবা।'

পান্নালাল সে কথা স্বীকার করে বলেন, 'তা অবশ্য যাস। বাগানের ওপর তোর যত্ন আছে। না হলে বছর ভরে অত ফুল ফুটত না।'

মণিকা বলে, 'এবার হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা, চল তোমার ভাত বেড়ে দিই।'

পান্নালাল বলেন, 'হ্যাঁ চল। কিন্তু তুই যদি দাবা খেলাটা আমার কাছ থেকে শিখে নিতিস মণি তাহলে আমাকে আর সঙ্গী জোটাবার জন্যে পাড়া ভরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না, বাপ মেয়ে দুজনে মিলে দাবা খেলেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। দাবা কি যে মজার খেলা মা, তাতো তুই আর বুঝলিনে।'

মণিকা হাসে, 'না বাবা, ও মজাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকল না। চেষ্টা করে তো তুমিও দেখলে আমিও দেখলাম। এক মজা সকলের জন্যে নয়।'

পান্নালাল তখনকার মত আর কোন কথা বলেন না। কিন্তু খেয়ে দেয়ে শুতে যাওয়ার আগে মেয়েকে ডেকে ফের একটু উপদেশ দেন, 'কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস মণি, এক মজা সকলের জন্যে নয়। তুই অবশ্য মজার জন্যে জানলায় দাঁড়াসনে তা আমি জানি। তবে পাড়ার সকলেই কিন্তু ওতে ভারি মজা পায়। তারা নানা কথা বলাবলি করে।'

মণিকা শান্তভাবে বলে, 'করুক না। তাতে কি আমাদের কিছু এসে যায়! ওদের কথায় কান দেওয়ার বয়স আমি অনেক দিন পার হয়ে এসেছি বাবা।'

পান্নালাল বললেন, 'কিন্তু লোকে যে হাসাহাসি করে মা।'

মণিকা বলে, 'করুক না বাবা, আমাকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেও লোকে প্রথম প্রথম খুব হাসত। এখন তো আর হাসে না। দেখতে দেখতে আজকের হাসাহাসিও ওদের একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি ভেব না।'

পান্নালাল ব্যথা পান। তাঁর মুখের ভাবে সেই ব্যথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা দেখেও তাঁকে কোমল কথায় সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টা না করে মণিকা নিজের ঘরে চলে যায়। যে বাপ মা জন্ম দুর্ভাগিনী মেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে পরের কথা কানে তোলেন তাঁরা যদি দুঃখ পান সে দুঃখ মণিকা ঘুচাতে পারবে না।

মণিকার দুঃখই কি কেউ কোনদিন ঘুচাতে পেরেছে। জীবনটা যে নিতান্তই দুঃখময় সে বোধ মণিকার চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই হয়েছিল। আরো অল্প বয়সে টাইফয়েডে তার কোমর থেকে শুরু করে বাঁ পা-টা একেবারেই শুকিয়ে যায়। এই যাওয়াটা যে কি তা যত বয়স বাড়তে লাগল ততই বেশি করে টের পেতে লাগল মণিকা। সঙ্গী-সাথীদেব সঙ্গে সে হাঁটতে পারেনা. ছুটতে পারেনা। তাকে চলতে হয় আস্তে আস্তে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পাড়াব সবাই তাকে নেংড়ী বলে ডাকে।

মণিকার পৃথিবী তখন থেকেই দুঃখে ভরা। সেই দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল ছোট বোন অনীতা। মণিকার চেয়ে সে বছর তিনেকের ছোট। কিন্তু যেমন সুন্দরী তেমনি স্বাস্থ্যবতী। অনি যে শুধু বাপ-মা'রই নয়নের মণি তাই নয়, দিদিরও আনন্দের নিধি। দুই বোনে ভারি ভাব। মণিকাকে কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলে অনীতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে যায়। দিদির দুঃখ সে যেমন বোঝে তেমন আর কেউ নয়।

পান্নালাল বাবু মণিকার চিকিৎসাব জন্যে টাকা খরচ কম করেননি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। তারপর চেষ্টা করলেন মণিকার বিয়ের। জামাইকে বিলাত পাঠাবার কি বাড়ি গাড়ি করে দেওয়ার মত ক্ষমতা অবশ্য পান্নালালেব ছিল না। সামান্য পোষ্টমাষ্টারের চাকরি। অত টাকা কোথায় পাবেন। তবু দু'হাজাব টাকা পর্যন্ত পণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একখানা পায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ অত সামান্য টাকা নিয়ে মণিকার স্বামীর পদ গ্রহণ করতে কেউ রাজী হয়নি। যারা মণিকাকে দেখতে এসেছে তারা অনীতাকে পছন্দ করে তার সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব করে গেছে। শেষ পর্যন্ত অনীতা নিজেকে লুকিয়ে রাখত। যারা কনে দেখতে আসত তারা অনীতার দেখা পেত না। তবু একদিন দেখা দিতেই হল। ম্যাট্রিকুলেশনের বেশি বাপ মা তাকে আর পড়ালেন না। আঠের বছরের বেশি আব তাকে অনূঢ়া থাকতে দিলেন না। জোর কবেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের আগে অনীতার সে কি কান্না। 'দিদি তোব কি হবে।' মণিকা বলেছিল, 'আমার কিছুই হবে না অনি। কিন্তু তোর অনেক হবে। স্বামী, ছেলেমেয়ে। তোর পাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমি পাব।'

কিন্তু মণিকার আশা পূরণ হয়নি। অনীতার বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু দশ বছরের মধ্যে একটিও ছেলেমেয়ে হয়নি আর বোধ হয় হবেও না। তার স্বামী প্রভাত বোস তেমন মিশুক নয়। শ্বশুরবাড়িব লোকজন পছন্দ করে না। আরো অপছন্দ করে বাংলাদেশকে। সরকারী চাকরি। ইচ্ছা করে দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজে বদলি হয়। কলকাতার দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথম প্রথম অনীতা দিদিকে দুঃখ জানিয়ে চিঠিপত্র লিখত। আস্তে আস্তে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জীবনের সঙ্গে আপোয করেছে অনীতা। আর প্রভাত সেই সন্ধির শর্ত হিসেবে বছর বছর স্ত্রীব শাড়ি গয়নার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। বাড়িগাড়ির জন্যে টাকা জমাচ্ছে।

কিন্তু বিয়ের পরে যাই ঘটুক না কেন ছোটবোনের এই বিয়ে মণিকার জীবনে প্রথম বড় ঘটনা। এত বড় উৎসব এ বাড়িতে আব হয়নি, হবেও না। পাড়াগাঁয়ের ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা এই ভাঙা বাড়ির ঘরে ঘরে সেদিন আলো জ্বলেছিল। সানাই বেজেছিল, শাঁখ বেজেছিল। এখনো স্পষ্ট মনে আছে মণিকার। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে সারি সারি গাড়ি দাঁড়াল। আর সেই গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বর আর বরযাত্রীর দল। সেই দলের মধ্যেই ছিল প্রভাতের মাসতুতো ভাই

সঞ্জয়। বয়স প্রভাতের মতই সাতাশ আঠাশ। কিন্তু প্রভাতের মত রং তার কালো নয়, উজ্জ্বল গৌর। প্রভাতকে বেঁটে বলা চলে না, কিন্তু সঞ্জয়ের মত অমন ছ'ফুট লম্বা সে নয়। মাথায় অমন কোঁকড়ানো চুল তার নেই। নেই অমন মুখ চোখের শ্রী।

এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ মণিকা আর দেখেনি। তার দীপ্তিতে প্রভাত নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। শুধু রূপই নয়, রঙও আছে মানুষটির মনে। সেই মনের রঙ তার মুখের কথায় মাখামাখি। প্রভাত ভারি রাশভারি গুরুগম্ভীর মানুষ। কথা বলে কম। কিন্তু সঞ্জয় একেবারে তার উল্টো। সে সব সময় সবাক। মণিকাকে ডেকে খুঁজে সেই বার করেছিল—'কই, আমাদেব বেয়ান কই। আসুন আলাপ করি।'

লজ্জা সংকোচ বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি মণিকা। সঞ্জয়ের কথার জবাবে কথা বলতেই হয়েছে। ঠাট্টা তামাসার উত্তর প্রায় জোর করেই আদায় করে নিয়েছে সঞ্জয়। বলেছে, 'দুটি না, চারটি না, আপনি প্রভাতেব একটি মাত্র শালী, আমাদের একটি মাত্র বেয়ান। আপনার অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আমাদের খোঁজ-খবব যত্ন-আত্তির সব ভাব নিতে হবে। যতবার ডাকব ছুটে ছুটে আসবেন।'

মণিকা হেসে বলেছে, 'খোঁড়া পা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে কি করে অত ছুটোছুটি করি বলুন।'

আর কেউ হলে আহাহা করে সহানুভূতি জানাত। কিন্তু সঞ্জয় সে ধার দিয়েও গেলনা। হেসে বলল, 'কানা হোন, খোঁড়া হোন বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের ছুটতেই হয়। তাছাড়া মানুষ কি কেবল পায়ে চলে, পায়ে ছোটে?'

মণিকা জিজ্ঞাসা করেছে, 'তবে?'

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে, 'ছুটতে হলে চাই মন। ব্যোমযানটা হালের আমদানী, মনোযানটা চিরকালের। পা না থাকে নাই থাকল, মনটা তো আছে।'

মণিকা হেসে বলেছে, 'আছে নাকি? কি করে টের পেলেন?'

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে, 'আপনার চোখ দেখে। মনের কথা পুরুষের মুখে ফোটে, মেয়েদের চোখে।

কথাটা অবশ্য নিচু গলাতেই বলেছিল সঞ্জয়। কিন্তু আশে পাশে আরো যে সব মেয়ে ছিল সে কথা তাদের কারোরই কানে যেতে বাকি রইল না।

মণিকা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে। কিন্তু বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারল না। সঞ্জয়ের চা চাই, পান চাই, আর সবই মণিকার নিজে হাতে করে দেওয়া চাই। আর কারো দেওয়া পছন্দ হবে না সঞ্জয়ের।

বিয়ের পরদিন ভোরে বরযাত্রীরা সকলেই চলে গেল। গেলনা কেবল সঞ্জয়। সে বর কনের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত রইল। সারাটা দিন হৈ চৈ আমোদ ফুর্তি করে কাটাল। বেশির ভাগ ফুর্তিই তার মণিকার সঙ্গে। তার তামাসাগুলি অনেকেরই কানে লাগে, বাড়াবাড়িটা চোখে বাজে। কিন্তু কেউ মুখ ফটে কিছু বলতে পারেনা। শত হলেও বিয়েবাড়ি। রঙরসের ছড়াছড়ি তো হবেই।

অনীতাই অবশ্য পরদিন মণিকাকে সাবধান করে দিল, 'দিদি, সঞ্জয় বাবুর সঙ্গে বেশি মিশিসনে। লোকটি ভালো না।'

'কেন রে।'

'ওর কাছে শুনলুম সঞ্জয় বাবু পাঁড় মাতাল। মদ ছাড়া এক মিনিটও ওর চলে না। বিয়ে বাড়িতেও মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে এসেছে।'

'ওমা, তাই নাকি। কথা বলার সময় বিশ্রি একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল, সে কি মদের গন্ধ।'

'তা ছাড়া কি। আর চোখ দুটো কি রকম লালচে দেখেছিস তো?'

মণিকা গম্ভীর ভাবে বলল, 'দেখেছি।'

কিন্তু এত সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও মণিকাকে সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে অনীতা অবাক হয়ে গেল। একটু তিরস্কারের সুরেই বলল, 'দিদি তুই কী। সঞ্জয় বাবুর ভাব চরিত্র দেখে কোন

মেয়ে ওর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তুই যাচ্ছিস কি করে? মাতালকে তোর ভয় নেই?'
মণিকা হেসে বলল, 'না অনি, মাতাল দাঁতাল কাউকেই আমি ভয় করিনে। আমি যে খোঁড়া তা সবারই চোখে পড়ে।'
সঞ্জয়ের নেশার কথা সকলেই জানতে পারল। পেশার কথাটাও অজানা রইল না। সঞ্জয় অভিনেতা। থিয়েটার সিনেমায় এ্যাক্ট করে। নিকট আত্মীয় কেউ নেই। মেসে হোটেলে যখন যেখানে খুশি থাকে। এম-এ পর্যন্ত নাকি পড়েছিল। কিন্তু অত পড়াশুনো বিশেষ কাজে লাগেনি। অভিনেতা হিসেবেও তেমন খ্যাতি হয়নি সঞ্জয়ের, অথচ মদ্যপ বলে অখ্যাতি যথেষ্ট আছে। কোন দিক থেকেই লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়। তবু তাকে মণিকার ভালো লেগে গেল। দুজনে ঠিকানা বিনিময় করল। এমন কি চিঠি-পত্রের বিনিময়ও চলতে লাগল। ভারি চমৎকার চিঠি লেখে সঞ্জয়, মুখের কথাকে কলমের মুখে বসিয়ে দিতে জানে।
অনীতা তা দেখে সাবধান করে দিল, 'দিদি তুই ওর ছলনায় ভুলসনে। লোকটা ভালো না। ও নাকি সব মেয়েকেই একই ভাষায় চিঠি লেখে, সব মেয়ের সঙ্গে একই ধরণে কথা বলে।'
মণিকা জবাব দিল, 'তা বললই বা, খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ও যে মন খুলে কথা বলে, চোখ তুলে তাকায় সেই তো ওর মহত্ত্ব।'
অনীতা প্রতিবাদ করে, 'মোটেই মহত্ত্ব নয়, মহত্ত্বের ভাণ। উনি বলেন সারা দুনিয়াটাই ওর কাছে ষ্টেজ আর মেয়ে মাত্রই নায়িকা।'
মণিকা ভাবে না হয় ষ্টেজের নায়িকাই সে হল। অনির মত বাসর ঘরের নায়িকা তো জীবনে কোন দিন তার হওয়ার আশা নেই। কিন্তু সঞ্জয় সেনের সবই যে অভিনয় তা মণিকার মনে হয় না। সঞ্জয় তাকে চিঠি লেখে, তার অভিনয় দেখবার জন্য কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠায়। খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলে সত্যি এসে হাজির হয়, রাত্রে থাকে। আর সারাক্ষণ মণিকার সঙ্গে গল্প-গুজব হাসি ঠাট্টা করে। বাড়ির মধ্যে কোণের দিকে ছোট একটা অন্ধকার ঘর সে বেছে নিয়েছে। সেইখানেই তার থাকবার জায়গা করে দেয় মণিকা। সারা রাত সে মদের নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে থাকে। অনেক বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়।
একেকবার সে মণিকাকে ডেকে বলে, 'যাই বল, তোমার এই ডেরাটি ভারি সুন্দর। মনে হয় যেন কবরের মধ্যে পরম আরামে শুয়ে রয়েছি। এমন জায়গা সারা কলকাতা শহরে আর নেই।'
মণিকা বলে, 'সেইজন্যই বুঝি এখানে আসেন।'
সঞ্জয় তার রাঙা চোখ মেলে মণিকার দিকে তাকায়, 'শুধু সেই জন্যেই নয়। তোমার জন্যেও আমাকে এখানে আসতে হয়।'
মণিকা বলে, 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'
সঞ্জয় বলে, 'না ঠাট্টা কেন করব। আচ্ছা মণি, আমি তোমাকে তুমি বলছি, কিন্তু তুমি সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেবল আপনিই চালিয়ে যাচ্ছ। তুমিও আমাকে তুমি বলে ডাকনা কেন।'
মণিকা বলে, 'বলব। আপনি যখন মাতলামি করবেন না, অভিনয় করবেন না, সহজ স্বাভাবিক ভাবে তুমি বলবেন তখন আমিও বলব।'
সঞ্জয় হেসে ওঠে, 'ও সব বাজে কথা তোমাকে কে বলেছে। কোন ভাবই দুনিয়ায় সহজ ভাব নয়। খানিকটা মাতলামি, খানিকটা ভালোলাগা, আর খানিকটা তার অভিনয়—এই নিয়ে প্রণয়।'
মণিকা বলে, 'আপনি বসে বসে বক বক করুন, আমি যাই।'
সঞ্জয় বলে, 'না না যেওনা। তোমাকে দেখে দেখে আমার কি মনে হয় জানো? ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আস্ত এক দেবী মূর্তি। তোমার সামনে দাঁড়ালে স্তব আমার মুখে আপনি বেরিয়ে আসে, পিছন থেকে কাউকে প্রম্পট করে দিতে হয় না।'
মণিকার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। দুরু দুরু করে বুক।
মণিকা বলে, 'কিন্তু আমার মত একটি খোঁড়া, সামান্য মেয়ের মধ্যে আপনি কি পেলেন?'
সঞ্জয় বলে, 'পেয়েছি হৃদয়। মণি, তুমি হৃদয় ধনে ধনী।' মাতাল এবার গুণ গুণিয়ে গান ধরে,—'প্রাণের মণি, তুমি আমার হৃদয় ধনে ধনী।'

মণি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালায়।

পান্নালাল বাবু বাইরে থেকে ডাকেন, 'মণি, মণি!'

মণি সাড়া দিয়ে বলে, 'যাই বাবা।'

মা আর বাবা দুজনে মিলে এক সঙ্গে তাকে তিরস্কার করতে থাকেন, 'ছি ছি ছি ওই মাতালটার সঙ্গে তুই কি কাণ্ড শুরু করলি বলতো? তোর ভয় করে না, লজ্জা করে না?'

কুমুদিনী বলেন, 'কুটুম্ব বলে অনেক সয়েছি। কিন্তু যত সইছি, ততই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

পান্নালাল বলেন, 'রাস্তায় বেরোতে পারি না। লোকে যা তা বলে। ওই মাতালটাকে তুই কেন অত সেবা যত্ন করবি শুনি? ও আমাদের কে?'

মণি জবাব দেয়, 'কেউ না বাবা, ও একজন রোগী। আমি সেই রোগের সেবা করতে যাই।'

কুমুদিনী বললেন, 'অবাক করলি তুই। যারা আজ সাধ করে রোগী হতে চায় তারা হোক। কিন্তু গেরস্থ ঘরের মেয়ে হয়ে তুই অমন সাধ করে মাতালের সেবা করতে পারবিনে। ওকে যেতে বলে দে।'

মাঝে মাঝে দু-একটি বিয়ের সম্বন্ধ এখনো আসে মণিকার। পাত্র হয় বোবা না হয় অন্ধ, না হয় প্রৌঢ় বিপত্নীক একপাল ছেলে মেয়ের বাপ।

মণিকা প্রাণপণে বাধা দেয়, 'ফের যদি আমাকে বিরক্ত কর মা, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

কুমুদিনী বলেন, 'মুখপুড়ী, তাই তোকে একদিন মরতে হবে। ওদের তোর পছন্দ হয় না, তোর জন্যে কোন রাজপুত্তুর বসে তপস্যা করছে শুনি?'

মণিকা মনে মনে বলে, 'রাজপুত্তুর আমার জন্য তপস্যা করবে কেন, আমিই রাজপুত্তুরের জন্যে তপস্যা করছি, চিরজীবন করব।'

পান্নালাল বলেন, 'তাছাড়া ওই মাতাল বদমাসটার মধ্যে তুই কি দেখলি বল তো। ওর শুধু গায়ের চামড়াটাই সাদা, ভিতরটা কালো কুৎসিৎ।'

মণিকা বলে, 'আমি তা জানি বাবা।'

মনে মনে ভাবে ওর ভিতর বাহির যাতে সমান সুন্দর হয় সেই জন্যেই তো মণিকার তপস্যা, তার সাধনা। সে তো আধা সুন্দরকে চায় না, পুরো সুন্দরকে চায়।

মাস ছয়েক বাদে আবার এক শীতের সন্ধ্যায় এসে হাজির হল সঞ্জয়। গায়ে একটা দামী কাশ্মীরী শাল জড়ানো। কিন্তু তা যেমন নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধে ভরা। সার্জের পাঞ্জাবির দুটো পকেট অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। তা যে কিসে ভারি তা বুঝতে মণিকার মোটেই দেরি হল না।

টলতে টলতে সঞ্জয় কোণের ছোট ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল। তারপর খালি তক্তাপোশখানার উপর টান হয় শুয়ে পড়ল।

মণিকা বলল, 'ওকি উঠুন বিছানা পেতে দিই।'

সঞ্জয় বলল, 'সুন্দরী, এইতো আমার রাজশয্যা। আবার বিছানায় কি প্রয়োজন।'

মণিকা রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি আবার আপনি ওই সব খেয়ে এসেছেন?'

সঞ্জয় হেসে উঠল, 'মণিমালা, ওই সব খেয়ে আসিনে, আসবার জন্যেই খাই।'

এইটাই ওর একমাত্র সত্য কথা। বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ল মণিকার। একটু কাল তাকিয়ে থেকে মণি রূঢ় স্বরে বলল, 'না খেলে যদি আসতে না পারেন তা হলে আর এখানে আসবেন না।'

সঞ্জয় আবার হেসে উঠল, 'আমার মণি, আমার সোনা, তোমার মুখে কি কেবল না না না না। কিন্তু আমার মন যে মানে না মানা। মানে না না না না না।'

কথায় এবার সুর বসাল সঞ্জয়।

পান্নালাল চড়া গলায় ডাকলেন, 'মণি?'

'কি বলছ বাবা', মণি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'তুই ওই মাতালটাকে ফের এ বাড়িতে ঢুকতে দিলি কোন সাহসে! এ বাড়ি তোর না আমার?'

'তোমারই বাড়ি বাবা।'

'তাহলে এক্ষুণি ওকে বের করে দে।'

মণিকা বলল, রাতটা যাক কাল সকালে বের করে দেব। আর কোন দিন ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেব না বাবা, তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

পান্নালাল বললেন, 'মাতালের সঙ্গে তুই মাতালনী হয়েছিস। তোর আবার একটা কথা।'

খেয়ে দেয়ে তাঁরা দুজন নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'খবরদার, ওকে আজ আর কিছু খেতে দিতে পারবিনে। যত্ন পেয়ে পেয়ে ওর লোভ বেড়ে গেছে। যে মাতাল যে বদমাস তার সঙ্গে আবার কুটুম্বিতা কিসের, ভদ্রতা কিসের। ঢের সয়েছি, আর না।'

মণিকাও সে রাত্রে কিছু খেলনা। বাবা মার অনুরোধ উপরোধে কান না দিয়ে ঘরে গিয়ে খিল দিল। কিন্তু খিল দিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। সঞ্জয়কে কিছু তারা খেতে না দিয়েছে না হয় নাই দিল, কিন্তু এই কনকনে শীতের মধ্যে লোকটিকে অন্তত লেপ কাঁথা কিছু একটা দিয়ে আসা দরকার।

মণিকার ঘরে লেপ একখানা মাত্রই আছে, আর ছেঁড়া রাগ্ আছে একটা। রাগ্‌টা রেখে নিজের গায়ের লেপখানাই মণিকা নিয়ে চলল সঞ্জয়ের জন্যে।

লোকটির ক্ষিধে তেষ্টা বলতে কি কিছুই নেই? শাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছেই।

মণিকা তাকে ডেকে তুলল, 'উঠুন বিছানা পেতে দিই।'

সঞ্জয় বলল, 'আগেই বিছানা পাতবে কেন। কিছু খেতে দেবেনা?'

মণিকা বলল, 'কেন, যা খাচ্ছেন তাতে পেট ভরে না?'

সঞ্জয় বলল, 'তাতে পেটও ভরে না, মনও ভরে না। ও তো ভরবার জন্যে নয় মণি, খালি করে দেওয়ার জন্যে।'

মণিকা বলল, 'এও যদি জানেন তবে ও ছাইভস্ম খান কেন। ছেড়ে দিতে পারেন না? প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিন।'

সঞ্জয় বলল, 'প্রতিজ্ঞা রোজ করি, রোজ ভাঙিও। কিন্তু এই ভাঙা গড়ার খেলা রোজ ভালো লাগে না।'

মণিকা কাতর স্বরে বলে, 'আর ভাঙবেন না। এবার আমার গা ছুঁয়ে শপথ করে যান। আপনার এত রূপ, এত গুণ। কিন্তু এক দোষে সব যেতে বসেছে। আপনার খুঁত তো আমার খুঁতের মত নয়। একটু চেষ্টা করলেই আপনি নিখুঁত হতে পারেন।'

'পারি? তুমি সত্যি বলছ, পারি?'

'পারেন বই কি।'

সঞ্জয় কি বুঝল কে জানে, তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে এসে মণিকাকে হঠাৎ সে বুকে চেপে ধরল। তারপর গালে আর ঠোঁটে ঘন ঘন চুম্বন করতে করতে বলল, 'তুমি সত্যি বলছ আমি পারি?'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মণিকা, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সঞ্জয়কে ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'ছাড়ুন ছাড়ুন। কি বিশ্রী গন্ধ আপনার মুখে। ছি ছি ছি, ছাড়ুন ছেড়ে দিন।'

মাতাল তবুও ছাড়ে না। মণিকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে এবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তাকে ছাড়িয়ে নিলেন পান্নালাল নিজে এসে। চেঁচামেচি শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন সঞ্জয়কে। তখন রাত প্রায় বারটা। মধ্যমগ্রামের পথে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। লোক চলাচলও আর নেই।

তারপর থেকে সঞ্জয় আর আসেনি। কিন্তু রোজ মণিকা জানলার কাছে একবার করে আসে। ঘরের কাজ সেরে, বাগানের কাজ সেরে, বই পড়া সেরে, এখানে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকবার যথেষ্ট সময় হয় তার। শুকনো পা-টা দিনের পর দিন আরো যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন একেবারেই একটা পা সম্বল। তবু এই এক পা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে তার মোটেই কষ্ট হয় না। এখান থেকে সারা দিন পথের অনেক খানি দেখা যায়, পথের মানুষ দেখা যায়। দুই পা-ওয়ালা চলন্ত মানুষ, আর ছুটন্ত বাস। ছুটতে ছুটতে সেই বাস কি একবারও ঐ মোড়ের মাথায় থামবে না।

একবারও নেমে আসবেনা সেই মানুষটি যার কোন জায়গায় কোন খুঁৎ নেই, যে পুরোপুরি সুপুরুষ !

মণিকা তার কাছে আর কিছু চায়না, শুধু একটি বারের জন্যে তাকে দেখতে চায় । একটি বারের জন্যে শুধু তার একটি মাত্র কথা শুনতে চায় যে কথার মধ্যে মত্ততা নেই, ছলনা নেই, যে কথার মধ্যে সব আছে ।

চৈত্র ১৩৬১

গোঁয়ার

ঘাড় গুঁজে ইংরেজি টেলিগ্রাফ বাংলায় তর্জমা করছিলাম । হঠাৎ কাঁধে চাপড় পড়ায় চমকে উঠলাম । দেখি আমার ছেলেবেলার সেই স্কুলের সহপাঠী রাজেশ্বর চক্রবর্তী ।

কিন্তু যত পুরোন বন্ধুই হোক, আর যত দীর্ঘ দিন বাদেই দেখা হোক না কেন, অফিসের মধ্যে তার এমন অভব্যতায় আমি একটু অপ্রসন্ন হলাম । সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসো ।'

রাজেশ্বর চেয়ারটায় বসতে-বসতে বলল, 'আরে, এসেছি যখন তুমি বললেও ব'সব, না বললেও ব'সব । সামনে বন্ধুকে পেয়ে খুব তো আদর-আপ্যায়ন ক'রছ, কিন্তু নিজে থেকে বারো বছরেও একবার খবর নাও না রইলাম কি মরলাম ।'

হেসে বললাম, 'মরবে কেন ! আমরা কি মরবার জন্যে জন্মেছি নাকি !' রাজেশ্বর খুশি হ'য়ে বলল, 'তা বটে, তা বটে, এতক্ষণে একটা ওরিজিন্যাল কথা বলেছ বটে, সেই যে পীর সেক্সপীয়ার লিখে গেছেন Cowards die many times before their deaths—মনে আছে ইংরেজির টিচার নিশিবাবু আমাদের আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন—'

আমার সহকর্মীরা আড়চোখে তার দিকে বার-বার তাকাচ্ছিল আর মুখ মুচকে হাসছিল । আমি একটু লজ্জিত হ'য়ে গলা নামিয়ে বললাম, 'আস্তে রাজু, একটু আস্তে কথা বলো । ওঁরা সব কাজ করছেন কিনা ।'

রাজেশ্বর যে তেমন অপ্রস্তুত হয়েছে তা তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'ল না । তবু কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ভাই এ-ব্যাপারে আমাকে মাপ করতে হবে । আমি তোমাদের মতো মানুষও মিহি নই গলাও মিহি কবতে পারি নি । তুমি তো তুমি, বিয়ের পর মশারির মধ্যে বউয়ের সঙ্গে যখন কথা বলতাম, সে ভাবতো ঝগড়া করছি । অনেকদিন পরে তার জ্ঞান হ'ল আমার স্বাভাবিক গলাই ওই রকম । মেয়েমানুষ সব ব্যাপারই একটু দেরিতে বোঝে, জানোই তো ।'

রাজেশ্বর সশব্দে হেসে উঠল ।

লক্ষ্য করলাম প্রায় বিশ বছর কলকাতায় থাকবার প.রেও রাজেশ্বরের গেঁয়োভাব মোটেই বদলায় নি । ও যেন জোর ক'রে বদলাতে দিচ্ছে না । ওর বেশ-বাস পোশাক-আশাকও প্রায় তেমনি রয়েছে । গায়ে একটা ছিটের হাফসার্ট, বুকপকেটে একখানা ডায়েরি আর একরাশ কাগজপত্রের সঙ্গে সস্তা মোটা একটা ফাউন্টেনপেন । চওড়া কব্জিতে বড়ো একটা ঘড়ি বাঁধা । ঘড়িটা সেই বিয়ের সময় পেয়েছিল রাজেশ্বর, আমি দেখেই চিনতে পারলাম । লম্বায় প্রায় পৌনে ছ-ফুট, চওড়াটাও সেই তুলনায় বেমানান নয় । সুপুরুষ বলা যায় না রাজেশ্বরকে । পুরু ঠোঁট, চ্যাপটা নাক । সামনের দিকের চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা আরো চওড়া হয়েছে । তবু এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সেও ওর এই স্থূল চেহারার মধ্যে কিসের একটু লাবণ্য যেন এখনো সঞ্চিত রয়েছে ।

রাজেশ্বর বলল, 'তারপর তোমার খবর কি বলো ।'

'ব্যক্তিগত খবর দেওয়ার মতো আর কি আছে । কাগজের খবর চাও তো বলতে পারি ।'

রাজেশ্বর বলল, 'আরে, কাগজের খবর তো কাগজ থেকেই প'ড়ে নিতে পারব । তোমাকে আর তা কষ্ট ক'রে বলতে হবে কেন । নিজের খবরটাই বলো শুনি । বউ ছেলে কেমন আছে ? চাকরি-বাকরি তো অনেকদিন ধ'রেই ক'রছ, জায়গা-জমি বাড়িঘর, মাথা গুঁজবার মতো ঠাঁই কিছু

কবলে, না কি মাসের পর মাস বাড়িওয়ালাব পকেট ভারী ক'রে যাচ্ছ ?'

বললাম, 'শেষের আন্দাজটাই ঠিক। কিছুই করতে পারি নি। তোমার কি খবর ? বাসা কোথায় ? তুমি কি সেই উল্টোডাঙ্গাতেই আছ ?'

রাজেশ্বর এবার আত্মতৃপ্তিতে হাসল, 'না ভাই, এবার একটু সিধে ডাঙায় ওঠবার চেষ্টা করছি। সাতগাছিতে জায়গা কিনেছি খানিকটা। কিনে চুপচাপ ব'সে থাকি নি। ইটও ফেলতে সুরু করেছি।' রাজেশ্বরের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল।

আমি বললাম, 'তাহ'লে তো কাজ বেশ গুছিয়ে এনেছ। এত টাকা পেলে কোথায় ? ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু ক'রছ নাকি ?'

রাজেশ্বর বলল, 'আরে না, না, ব্যবসা করবার মতো ক্যাপিটাল কই ! পরের ব্যবসার চাকা ঘুরিয়ে বেড়াই। বেঙ্গল রেডিও স্টোর্সে আছি এখন। তোমাদের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। ওহে, তুমি তো চাকরি করো এখানে। রেট সম্বন্ধে কিছু সুবিধে ক'রে দিতে পারো নাকি ? তাহ'লে আমার কর্তাদের কাছে নিজেব কেরামতিটা থাকে।'

হেসে বললাম, 'না, ও-সব নিয়ম এখানে নেই।

বেযাবাকে ডেকে চা সিগারেট আনালাম। রাজেশ্বর খুব আপ্যায়িত হয়ে বলল, 'যেয়ো। আমাদেব জায়গাটা একবার দেখে এসো। তোমার পছন্দ হবে। আর যদি কাঠা কয়েক রাখতে চাও ওখানে আমি সুবিধে মতো দেখে-শুনে দিতে পারব। সেই ভালো। চল আমাদের সাতগাছিতে। দুই বন্ধু বেশ পাশাপাশি থাকব, কি বলো ?'

'আচ্ছা, সে-সব পবে হবে। তাহ'লে মোটামুটি ভালোই আছ ? ছেলেপুলে সব ভালো ?'

টেবিলে টেলিগ্রাফের তাড়ার দিকে একবাব চোখ বুলিয়ে আমি রাজেশ্বরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে ব্যস্ত হ'যে উঠে দাঁড়ালাম।

বাজেশ্বব আমাব কথাব পরে বলল, 'না ভাই, সব আব ভালো বলি কি ক'রে ! ছেলেটা গেছে।'

'সে কি, কোথায় গেছে ?' বুঝতে পেরেও কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজেশ্বর অদ্ভুত একটু হাসল, 'কোথায গেছে তা তোমরা কবি দার্শনিকবাই বলতে পারো। মারা গেছে।'

বললাম, 'আহাহা ! কি হয়েছিল ?'

'সর্দিগর্মি—সান স্ট্রোক। ভারি চালাক-চতুর হয়েছিল ছেলেটা। একটু ডানপিটে আর একগুঁয়ে। বাপকা বেটা বলতে পারো ; রইল না। যাক, যে যাবাব সে যাবেই ভাই।' রাজেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাসচাপল। তাবপর হাতঘড়িব দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি উঠি, কল্যাণ। আবার অফিসে যেতে হবে। তুমি কিন্তু একদিন যেয়ো। অবশ্য যেযো।'

বাজেশ্বর খুব ব্যস্তভাবেই ঘর থেকে বেবিযে গেল। আমার যেন মনে হ'ল অফিসের কাজের জন্যে নয়, ছেলের শোকে ভাবাবেগ গোপন করবার জন্যেই বাজেশ্বর তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে স'রে গেল।

তারপব থেকে রাজেশ্বর সপ্তাহে দু-বার একবার ক'রে ফোনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'কবে আসছ ?'

আমি বিব্রত হ'য়ে জবাব দিতে লাগলাম, 'যাব, যাব। সময় ক'রে যাব একদিন। এক কাজ করো না, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো-না আমাদের বাসায়।'

রাজেশ্বর বলল, 'উঁহু, আগে তুমি আসবে, তাব পরে আমি। তোমাদের শহুরে ভদ্রতার কথা জানি নে, কিন্তু আমি যখন আগে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি, তোমারই তা আগে রাখা উচিত।'

আব-একদিন অভিমান শ্লেষ আর বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, 'কি হে, একবার পায়ের ধুলোই দিতে পারলে না ? তোমরা লেখকবা কি সভাসমিতি, অভ্যর্থনা আর মানপত্র ছাড়া আটপৌরে ভাবে কোন বন্ধুর বাড়িতে আসো না ? তা যদি হয় তাহ'লে বলো, আমাদের ওখানে ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে একটা সাহিত্য-সভার আয়োজন করি। কলাগাছের তোরণ আর ফুলের মালা—'

হেসে বললাম, 'না হে, সভা-সমিতিকে আমি যমের মতোই ভয় করি। ও-সব তোমায় করতে হবে না। আমি অমনিই একদিন যাব। জানোই তো আমি তোমার মতো কর্মবীর নই, কুঁড়ে মানুষ। নড়তে-চড়তেই আঠেরো মাস।'

রাজেশ্বর বলল, 'থাক থাক, নিজের কুঁড়েমির বড়াই আর করতে হবে না। একদিন দয়া ক'রে এসে পড়ো। তোমরা শহুরে সাহিত্যিকরা নিজেদের গুণের জয়ঢাক পিটিয়ে ক্ষান্ত থাকো না, দোষ নিয়েও বেশ ভনিতা করতে জানো। যেন সেও এক শিল্পকর্ম।'

ছেলেবেলা থেকেই রাজেশ্বর খুব স্পষ্টবাদী। রূঢ় কথা বলতে মোটেই ইতস্তত করে না। দেখলাম স্বভাবটা ঠিক আগের মতোই আছে। আর-একবার কথা দিলাম, 'যাব।'

না-যাওয়ার পিছনে আলস্য আর কুঁড়েমি ছিল। তাছাড়া ভিতর থেকে একটা তাগিদের অভাবও বোধ করছিলাম। স্কুলের এই সহপাঠী বন্ধুটির সঙ্গে আমার মতামত চালচলন জীবনযাত্রার কিছুই মিল নেই। শুধু আমার সঙ্গে কেন এখনকার দিনের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গেই ওর অমিল। রাজেশ্বর স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, শহর আর শহরের সভ্যতা ওর দু-চোখের বিষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বস্তু। ওর ধারণা, বৈজ্ঞানিক যুগ মানুষকে আরামপ্রিয়, যন্ত্রপ্রিয় আর যান্ত্রিক ক'রে তুলেছে। এই অতিরিক্ত যান্ত্রিকতা তান্ত্রিক ব্যভিচারের মতোই সমাজ-সংস্কৃতির পক্ষে অমঙ্গলকর। যন্ত্রকে বাদ দিতে গিয়ে তাই ও একেবারে উল্টোদিকে হাঁটতে সুরু করেছে। এই শহর নয়, শহুরে সভ্যতা নয়। মরা ইঁট কাঠ, লোহা ইস্পাত ছেড়ে আজ পশুপক্ষী, গাছপালা, নদীনালার কাছে চলো। পায়ে কাঁচামাটির ছোঁয়া লাগলে হৃদয় নরম হবে, সরস হবে। অবশ্য হৃদয় নরম হোক তা আমরাও চাই, কিন্তু তার সঙ্গে সনাতন গোঁড়ামির কি যোগসূত্র আছে তা খুঁজে পাই নে। রাজেশ্বর নিজের মতটাকে খুব জোর গলায় প্রচার করে আর আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই অন্তত আধঘণ্টা ধ'রে আধুনিক কাল, আধুনিক মানুষের হালচাল আর আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে ভালোবাসে। আমি মিনিট কয়েক কৌতুকরস উপভোগ করি, কিন্তু তার পরেই অসহ্য লাগে। কারণ রাজেশ্বরের মধ্যেও কোন মৌলিকতা নেই। সে-ও ধার-করা বুলি আওড়ায়। একদিন আরেক দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে।

ওর সঙ্গে বাল্যকৈশোরের পরিচয়ের যে-উত্তাপ তা দীর্ঘদিন আগেই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। তবু সে-কথা ওর সামনে স্বীকার করতে লজ্জা পাই। কারণ এক-এক সময় মনে হয়, রাজেশ্বরের হৃদয়ের তাপ অতটা শীতল হয় নি। আবার কখনো ভাবি, এ আমারই দুর্বলতা। যে-তাপ ওর দেখি তা ওর হৃদয়ের নয়, তর্কশক্তির। আমাকে চায় ও ডুয়েল লড়বার জন্যে। কিন্তু আমি তাতে অরাজী, আমি তাতে অপটু।

দু-বার দিন-তারিখ ঠিক ক'রেও যেতে পারলাম না। কিন্তু রাজেশ্বরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অনুযোগ-অভিযোগে অস্থির হ'য়ে তৃতীয় বার কথা খেলাপ করতে আর সাহস পেলাম না। এক রবিবারের বিকেলে খুঁজে-খুঁজে হাজির হলাম রাজেশ্বরের আস্তানায়।

বাস থেকে নেমে বড়ো রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে দশ-বারো মিনিট দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হয়। বাজার স্কুল গ্রামের বসতি ছাড়িয়ে এ কোথায় এসেছে রাজেশ্বর! আগাছার জঙ্গল, ভাঙা পোড়ো শিবমন্দির, মজা পানাপুকুর ছাড়া কি ভারতীয় ঐতিহ্য সে আর কোথাও খুঁজে পায় নি! আরও খানিকটা এগিয়ে একটা ফাটল-ধরা, শেওলা-গজানো পুরোন পাতকুয়া চোখে পড়ল। তার দু-দিকেই রাস্তা। কোন দিকে যাব, ভাবছি, দেখি, রাজেশ্বর নিজেই এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখে মুখে ওর হাসি ফুটল। বলল, 'এসো, এসো। আমি দু-দু'বার রাস্তার মোড় থেকে ফিরে এসেছি। আজও তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কথাশিল্পী মানেই মিথ্যে কথার শিল্পী। যারা দিনরাত বানিয়ে-বানিয়ে অত মিথ্যে কথা লেখে তারা চেষ্টা করলেও কি আর সত্যি কথা বলতে পারে? চলো, এই কাছেই আমার বাড়ি?' ডান-হাতে বিড়ি টানতে-টানতে বাঁ-হাতে আমাকে সাদরে জড়িয়ে ধ'রল রাজেশ্বর। বোধহয় কোন পরিশ্রমের কাজ করছিল। ওর খালি গা ঘামে ভিজে উঠেছে। রোমশ বুকের মধ্যে ঘাম জমেছে বিন্দু-বিন্দু। আমার সদ্য-পাট-ভাঙা জামায় তার ছাপ লাগল। আপত্তি করবার উপায় নেই। ওর হৃদয়ের ছোঁয়া পেতে হ'লে বুকের এই ঘামটুকু বাদ দিলে চলবে না।

দু-পা এগোতেই জীর্ণ অতিপুরোন একটা একতলা বাড়ি চোখে পড়ল।

রাজেশ্বর বলল, 'আপাতত ওর মধ্যেই আছি। বাড়ির দশা দেখেছ ? তবু এরই জন্যে মাস-মাস পনেরো টাকা ক'রে ভাড়া গুনতে হয়। কিন্তু সামনেই আমার নিজের জায়গা। কনস্ট্রাক্সন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। কাছাকাছি থাকলে তদারকের সুবিধে হয়, মিস্ত্রীরা ফাঁকি দিতে পারে না। তাই আছি।'

আমাদের দেখে পাঁচ-ছয় বছরের একটি রঙচঙে ফ্রক-পরা মেয়ে ছুটে এলো। রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই সেই কল্যাণকাকা, না বাবা ? আমি দেখেই চিনতে পেরেছি।'

রাজেশ্বর বলল, 'তুমি না পারো কি। আমাদের বুড়ী। ও যে কিরকম কথার তুবড়ি তা তুমি দু-এক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারবে।'

এই ভাঙা বাড়ির লাগা পুবদিকে সত্যিই রাজেশ্বরের নতুন বাড়ি উঠছে। একদিকে ইঁট-সুরকির স্তূপ। খানিকটা জুড়ে গাঁথনিও শুরু হয়েছে। তবে বেশি দূর এগোয় নি কাজ। দেয়াল মাত্র হাত-দেড়েক উঁচুতে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিস্ত্রীরা কাজে আসে নি আজ ?'

রাজেশ্বর বলল, 'না। ক'দিন ধ'রেই ওদের দেখা নেই। মজুরী নিয়ে বড়ো গোলমাল করছে। নতুন মিস্ত্রী লাগাতে হবে। অফিসে রোজ যেতে হয়, পরের চাকরি। কামাই করবার জো নেই। নইলে ফাঁকে-ফাঁকে আমিই নিজে দু'খানা ঘর গেঁথে তুলতে পারতাম। ভারি তো কাজ। জিনিসগুলো নষ্ট হচ্ছে, তাই আজ নিজেই হাত লাগিয়েছিলাম।'

হেসে বললাম, 'বলো কি ! তুমি কি রাজমিস্ত্রীর কাজও জানো নাকি ?'

রাজেশ্বর বলল, 'আরে, না জানলেও শিখে নিতে কতক্ষণ লাগে। গাঁয়ের ছেলে না আমরা ? ষোলো-সতেরো বছর গাঁয়ে কাটিয়ে আসি নি ? সেখানে কি ইতর-ভদ্রে এত ভেদ ছিল ? সেখানে আমরা জেলের সঙ্গে জেলে, চাষীর সঙ্গে চাষী, মিস্ত্রীর সঙ্গে মিস্ত্রী। সেখানে একজন আর-একজনের জোগানদার। কিন্তু এখানে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা কলমধারী বাবু নেহাৎই একজন আনাড়ী বাবু। আর কারো সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ নেই।'

আমি ভীত হ'য়ে উঠছিলাম। রাজেশ্বরেব বক্তৃতা একবার আরম্ভ হ'লে আর সহজে থামে না, তাই আত্মরক্ষার চেষ্টা আমার নিজেকেই করতে হ'ল। রাজেশ্বরের ঘরের দিকে একটু এগিযে গিয়ে হাঁক দিলাম, 'কই বউদি, আছেন কেমন ? সাড়া-শব্দই পাচ্ছিনে যে।'

রাজেশ্বরও স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হ'য়ে ধমকের সুরে বলল, 'আরে, কল্যাণ ডাকছে যে তোমাকে। এসো এদিকে। তোমার যত কাজকর্মের কথা বুঝি এখন মনে পড়ল ?'

এবার রাজেশ্বরের স্ত্রী হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। আটপৌরে খয়েরি পাড়ের একখানা মিলের শাড়ি পরা। হাতে দু-গাছি শাঁখা আর কানে দুটি লালপাথব-বসানো-ফুল ছাড়া অন্য কোন আভরণ নেই। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। চেহারায় ভালো-মন্দ কোন বৈশিষ্ট্যই চট ক'রে চোখে পড়ে না। শুধু অনুভব করা যায়, বউটিকে সংসারে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। ভিতরে-বাইরে তার সংগ্রামের যেন আর শেষ নেই। কিন্তু সৌজন্যের জন্যেই হোক, কি যে-জন্যেই হোক, রেণু যখন হাসল ভারি সুন্দরই দেখাল তাকে। পরিষ্কার সুগঠিত দাঁত, পাতলা ঠোঁট---হাসবার ভঙ্গিটি বেশ মিষ্টি।

রেণু বলল, 'সাড়া-শব্দ পাবেন কি ক'রে ? গরিব ব'লে আমাদের বুঝি রাগ দুঃখ কিছু থাকতে পারে না ! চড়কডাঙার বাসায়, উল্টোডাঙার বাসায় তবু বছরে দু-একবার আসতেন। কিন্তু এখানে এসেছি পর এই দু-বছরের মধ্যে আপনার আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আপনি আমাদের কথা ভুলেই গেছেন।'

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললাম, 'ভুলব কেন। সময় পেয়ে উঠি নে।'

নিজেই হাতে ক'রে ভিতর থেকে দু-খানা জলচৌকি নিয়ে এল রেণু। বলল, 'এখানেই বসুন। ভিতরে বড় গরম।'

হেসে বললাম, 'গরম ব'লে না কি অব্রাহ্মণ ব'লে ভিতরে ঢুকতে দিলেন না কে জানে। রাজেশ্বরের চোখে তো বামুনরা ছাড়া সবাই আমরা শূদ্র।'

খোঁচা দিয়ে রাজেশ্বরের দিকে আড়চোখে তাকালাম। মনে ভয়, ও আবার বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শুরু না করে। কিন্তু রাজেশ্বর এবার আর চটল না। হেসে বলল, 'আমাকে কি অতই গোঁড়া মনে করো? ছেলেবেলায় তোমাদের রান্নাঘরে ব'সে পান্তাভাত খাই নি?'

বললাম, 'তখন খেয়েছ। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এখন তুমি যেভাবে পিছু হাঁটছ তাতে কবে যে বনে গিয়ে মুনি ঋষি হ'য়ে পড়ো তার ঠিক নেই।' রেণুর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, 'আপনাদের তখন বাকল প'রে আশ্রমবাসিনী হ'তে হবে।'

রেণু বলল, 'হ্যাঁ, তাই এখন বাকি।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজেশ্বর চ'টে উঠল, 'তাই এখন বাকি? কেন, কোন অসুবিধেটায় রয়েছ শুনি, কোন কষ্টে আছ? আমি কোন মহা অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে? জানো কল্যাণ, বড়ো অকৃতজ্ঞ, বড়ো নেমকহারাম এই মেয়েমানুষ জাত। আমরা মাথার ঘাম পেয়ে ফেলে খোরাক জোগাব, পোশাক জোগাব, আর ওরা পায়ের উপর পা তুলে ব'সে শুধু খাবে আর খোঁটা দেবে।'

রেণু চ'লে যাচ্ছিল, রাজেশ্বর তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, গেলে চলবেনা। বলো, কি কষ্টে কি অশান্তিতে আছ, বলো, কল্যাণের সামনেই বলো।'

রেণু যেতে-যেতে ফিরে তাকাল, 'না, কষ্ট আর কি? তোমার হাতে প'ড়ে আমার সুখের সীমা নেই। আমি রানীর চেয়েও সুখে আছি।'

পাশের ঘর থেকে আর-একজন পুরুষের গলা শুনতে পেলাম, 'বলি ও রেণু, তোরা কি হ'লি বল দেখি। বাইরের লোকজনের সামনেও তোরা ঝগড়া করবি? তোদের কি লজ্জা-সরম বলতে কিছু নেই?'

রেণু আর কোন কথা না ব'লে ভিতরে চ'লে গেল। আমি রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কে?'

রাজেশ্বর বলল, 'আমার বুড়ো শ্বশুর। সব খুইয়েছেন। চোখ দুটি গেছে। এখন আমার ঘাড়েই আছেন। বুড়োরও কোন কৃতজ্ঞতা নেই। আমার খাচ্ছেন, আমার পরছেন, তবু সব সময় মেয়ের পক্ষ টেনে কথা বলছেন।'

আরো কি বলতে যাচ্ছিল রাজেশ্বর, তার মেয়ে বুড়ী এসে বলল, 'বাবা, মা ডাকছে তোমাকে। বাজারে যেতে হবে না? তুমি তো কেবল বকবকই ক'রছ। কল্যাণকাকা খাবে কি?'

রাজেশ্বর এবার চটল না, মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কেন, তোমার রাঁধা ভাত-তরকারি কি সব ফুরিয়ে গেছে?' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'জানো কল্যাণ, এই বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে। বুড়ীও আমাকে ধমকায়। আমি এক শত্রুপুরীতে আছি।'

রাজেশ্বর চ'লে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'রাজু, বাজার-টাজারে যাওয়ার কোন দরকার নেই। আমি এককাপ চা ছাড়া কিচ্ছু খাব না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' বলতে-বলতে রাজেশ্বর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চাপা গলায় খানিকক্ষণ ধ'রে বচসা চলল শুনতে পেলাম। তারপর একটু বাদে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে রাজেশ্বর বেরিয়ে এল, হাতে ছোটো একটা থলি। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি জামা খুলে ফ্যালো কল্যাণ। হাত-মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও। আমি এলাম ব'লে।'

আমি আবারও বাধা দিলাম। কিন্তু রাজেশ্বর মোটেই তাতে কান দিল না।

বাপ চ'লে যাওয়ার পর মেয়ে এবার নির্ভয়ে নিঃসংকোচে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'এর আগে দু-বার ঘি, চিনি, সুজি তোমার জন্যে বাবা সব এনে রেখেছিল। কিন্তু তুমি তো এলে না, আমরা বাড়ির লোক সব খেয়ে ফেললাম। দাদুই বেশি খেয়েছে। বুড়ো মানুষ কিনা, খুব লোভী। বাবা তাই নিয়ে মাকে আজও বকছিল। বকলে কি হবে। ঘরে থাকলে জিনিস নষ্ট হ'য়ে যায় না?'

মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী। ফর্সা ফুটফুটে রং। নাক-চোখও সব মায়েরই পেয়েছে। রাজেশ্বরের মতো হ'লে আর রক্ষা ছিল না।

হেসে বুড়ীকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'তা তো ঠিকই।'

বুড়ী আবার বলল, 'বাবা বড়ো কঞ্জুস। সব বাড়ির পেছনে খরচ করবে। কারো খাওয়া-পরা দেখতে পারে না। মা বলে কি জানো, আমরা যদি না-খেয়ে শুকিয়ে মরি তোমার ওই ইমারতে থাকবে কে। ইমারত মানে কি বলো দেখি কল্যাণকাকু? ইমারত মানে বাড়ি, বড়ো পাকা বাড়ি। তুমি জানতে?'

হেসে বললাম, 'না তো। তোমার কাছ থেকে কথাটার মানে এই প্রথম শিখে নিলাম। আচ্ছা বুড়ী, তুমি কোন স্কুলে পড়? কোন ক্লাসে?'

বুড়ী বলল, 'এখানে আবার স্কুল কোথায়। আমি মা-র কাছে পড়ি, বাবাও পড়ায়। আর-একটু বড়ো হ'লে স্কুলে যাব।'

বললাম, 'সেই ভালো। কি-কি বই পড় তুমি?'

বুড়ী আঙুল গুনতে গুনতে বলল, 'পাঁচখানা বই। বাবা পড়ায় বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ, মা পড়ায় রবিঠাকুরের সহজপাঠ। আর আছে গণিত সোপান, ধারাপাত, ছোটোদের রামায়ণ। বাবা বলেছে আমাকে বড়োদের মহাভারত কিনে দেবে, তাতে নাকি অনেক ছবি আছে। দাদু তো অন্ধ, কিছু দেখতে পায় না। আমি তাকে প'ড়ে শোনাব। দাদা থাকলে আমি আর দাদা দু-জনে পড়তাম। আমার দাদা ছিল, জানো? জ্বর হ'য়ে মারা গেছে। আজ এক বছর হ'য়ে গেল, বাবার দোষেই সে মরল। বাবা তাকে একদিন এমন মার মেরেছিল তাতেই তো জ্বর হ'ল।'

বললাম, 'তাই নাকি?'

বুড়ী বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো। দাদু বলে, বাবা একটা গোঁয়ার, একটা খুনী। ও আমাদের সবাইকে খুন ক'রে তবে ছাড়বে।'

'কাকা-ভাইঝিতে কি আলাপ হচ্ছে শুনি?'

রেণু এসে সামনে দাঁড়াল। এরই মধ্যে সে গা ধুয়ে একখানা ছাপা শাড়ি প'রে চুল বেঁধে বেশ-একটু পরিপাটি হ'য়ে নিয়েছে। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার হাত-মুখ ধুয়ে নিন। না কি আগে একটু চা ক'রে দেব? উনি ততক্ষণে বাজার থেকে এসে পড়বেন।'

বললাম, 'না, না, চায়ের এখন দরকার নেই। রাজেশ্বর আসুক আগে। বুড়ীর সঙ্গে বেশ গল্প করছিলাম।'

রেণু হেসে বলল, 'ওর কথা আর বলবেন না। ও যা বকবক করতে পারে, উনি তো এক-এক সময় রাগ ক'রে বলেন, আয় তোর মুখ সেলাই ক'রে রাখি। বাপের সব কীর্তিকাহিনী পাছে ফাঁস ক'রে দেয়, সে-ভয়ও আছে কিনা।'

'ওরেণু, ভদ্রলোককে আমার এখানে একটু নিয়ে আয় না।'

ঘরের ভিতর থেকে রাজেশ্বরের শ্বশুরমশাইয়ের আর একবার গলা শোনা গেল।

রেণু বলল, 'বাবা ডাকছেন আপনাকে। ওঁকে আপনি আগেও দু-একবার দেখেছেন। চলুন, একটু আলাপ ক'রে আসবেন।'

রেণু আর বুড়ীর পিছনে-পিছনে কোণের ঘরে ঢুকলাম। আধা অন্ধকার ঘর। মেঝেয় পাতা বিছানা। তার ওপর সত্তর-পঁচাত্তর বছরের একজন রুগ্নদেহ বৃদ্ধ ব'সে রয়েছে। মাথায় টাক, কিন্তু প্রায় বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ি নেমেছে। আমার সাড়া পেয়ে তিনি বললেন, 'আসুন, আসুন, মানুষ জনের মুখ দেখতে পাই নে এখানে। কারো সঙ্গে যে দুটো কথা বলব, সে উপায় নেই।'

বারান্দার জলচৌকিখানা আবার এখানে এনে পেতে দিল রেণু, আমি তাতে ব'সে বললাম, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

তিনি বললেন, 'শরীর? শরীরের কথা আর বলো না বাবা। তুমিই বলছি, কিছু মনে করো না, তুমি রাজেশ্বরের বন্ধু, আমার ছেলের মতো। শরীর! শরীর দিয়ে আর কি হবে? চোখই যার গেছে তার আর রইল কি, এখন চিতায় উঠতে পারলে হাড় ক'খানা জুড়োয়।'

বললাম, 'না, না, ওকি বলছেন, জামাই-মেয়ের কাছে আছেন—'

বৃদ্ধ অভিমানের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ খুবই সুখে আছি বাবা, রাজেশ্বর আমাকে খুবই সুখে

রেখেছে। জামাইয়ের ভাত খাওয়া যে কি তা হাড়েহাড়ে টের পেয়ে গেলাম। ছানি কাটাতে গিয়ে চোখ দুটো গেছে। আর সেও তো ওরই দোষে, ওরই গাফিলতির জন্যে গেল। একটা সস্তা বাজে হাসপাতালে আমকে ভর্তি ক'রে দিয়ে আমার চোখ দুটো নষ্ট ক'রে ফেলল। তা ফেলেছে, ফেলেছে। আমি মেয়েকে বলি, তুই আমাকে পথেই ছেড়ে দিয়ে আয় রেণু। অন্ধকে দেখলে দু-চারটে পয়সা সবাই দেবে। আমি ভিক্ষে ক'রেই খাব ; তবু এমন চণ্ডাল জামাইয়েব ভাত খেয়ে আমার কাজ নেই।'

ভদ্রতার জন্যে একটু সায় দিতে হ'ল, 'সত্যি, রাজেশ্বরের কথাবার্তা—'

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'কথাবার্তা : তোমাকে বললাম কি বাপু, চণ্ডাল, আস্ত চণ্ডাল। বামুনের ঘরে যে এমন চণ্ডাল জন্মায় তা আমি আব কোথাও দেখি নি। আর ওর চাল-চলন দেখলে কে বলবে যে লেখাপড়া শিখেছিল, ম্যাট্রিক পাস ক'রে দু-বছর পড়েছিল কলেজে। সব চিহ্ন ও ধুয়ে-মুছে ফেলেছে। ভগবান চোখ দুটো নিয়েছেন ; কিছু দেখতে পাই নে, কিন্তু শুনতে তো পাই। মেয়েটার দুঃখে আমার বুকের ভিতরটা জ্ব'লে পু'ড়ে যায়। কীই-বা এমন বয়স হয়েছে, কিন্তু এই বয়সেই সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, শুধু দুটি খাওযা আর পরা। কিন্তু তার জন্যে এত দুর্ভোগ কেউ সইতে পারে ?'

রেণু বলল, 'বাবা, তুমি থামো, ও-সব কথা ব'লে আর লাভ কি। কল্যাণবাবু কতদিন পরে এলেন। এসে তো শুধু আমাদের দুঃখ-কষ্টের ফিরিস্তিই শুনছেন।'

রেণুর বাবা বললেন, 'তা শুনলেনই বা, মানুষের কাছেই মানুষ দুঃখ জানায় ; না কি গাছের সঙ্গে গিয়ে কথা বলে। তুমি রাজেশ্বরের বন্ধু, তাই বলছি। যদি ব'লে-ক'য়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এখনো ওকে কিছু শোধরাতে পারো। জীবন-ভর কি গোঁয়ার্তুমি ক'রেই কাটবে ? ও গোঁয়ার্তুমি করে আর তার খেসারৎ জোগায় আমার এই মেয়ে। এত বয়স হ'ল তবু হাঁড়িতে কালি পড়ল না। আজ এ-চাকরি, কাল সে চাকরি। যেখানে যাবে সেখানেই ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে আর মেজাজ দেখাবে। চাকরি থাকবে কেন বলো। মনিবকে চোখ রাঙিয়ে কেউ চাকরি রাখতে পারে ?'

তারপর এখানে এসে রাজেশ্বরের জায়গা কেনা আর বাড়ি করার কথা উঠল। তার শ্বশুরমশাই এই খেয়ালেরও খুব নিন্দা করলেন। পাকিস্তানের ঘর-বাড়ি বিক্রি ক'রে জমির টাকা জুটিয়েছে রাজেশ্বর। যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে-কাচিয়ে সব নিয়েছে। স্ত্রীর গায়ের একখানা গয়নাও বাকি রাখে নি, যা গেছে তা কি আর ফিরে আসবে ; তারপর এই জংলা পোড়ো জায়গা ; রাজেশ্বরের শ্বশুর অবশ্য জায়াটা চোখে দেখেন নি, কিন্তু শুনেছেন তো সবই। এমন জমি পয়সা দিয়ে মানুষ কেনে ? কিন্তু বললে কি হবে। ও কি কারো কথা শোনে, না কারো পরামর্শ নেয়। নিজেকেই সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিমান মনে করে রাজেশ্বর।

কথায়-কথায় রাজেশ্বরের ছেলে মারা যাওয়ার প্রসঙ্গও তুললেন চাটুজ্যেমশাই। 'আর বলো না বাবা, একেবারে হাতে ধ'রে মেরে ফেললে ছেলেটাকে। বছর দশেক বয়স হয়েছিল। বেঁচে থাকলে মেয়েটার একটা সম্বল হ'তো, দুঃখ বোঝবার, মুখের দিকে তাকাবার একজন থাকতো। ও চণ্ডালের মনে তো কোন মায়া-দয়া নেই। বংশে কেউ থাকে ওর তা সইবে কেন। স্কুলের কোন এক হতচ্ছাড়া আহাম্মক মাস্টার বুঝি নালিশ করেছিল ছেলেটার নামে। শিবু রোজ স্কুলে যায় না। প্রায়ই কামাই করে। ওর চেয়ে বযসে বড়ো ছেলেদের সঙ্গে মেশে, আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরে, বিড়ি খায়। আচ্ছা, বলো তো বাবা, ও-বয়সে এক-আধটু ডানপিটে কোন ছেলেটা না থাকে ?'

বললাম, 'তা তো ঠিকই।'

'আর তোর ছেলে অমন হবে না তো হবে কার ? তুই কোন রূপের কার্তিক, তুই কোন গুণের নিধি শুনি ? কিন্তু নালিশ শুনে গোঁয়ারটা করলে কি জানো ? কোত্থেকে কান ধ'রে ছেলেটাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল। তারপর বাঁখারি দিয়ে এই মার। সে-দৃশ্য ভগবান আমাকে দেখতে দেন নি বাবা, চোখ দুটো আগেই দয়া ক'রে কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু কান দুটো যে কেন নেন নি তিনিই জানেন। ছেলেটার কান্না আর চিৎকার শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না বাবা। মেয়েকে ডেকে বললাম, ওরে রেণু, আর তো সইতে পারি নে। তোরা আমার হাতে দা কি বঁটি-টটি

একটা-কিছু এনে দে। আমি ওই পাঁঠাটাকে এক কোপে শেষ ক'রে দিয়ে আসি। তোর আর সধবা থেকে কাজ নেই। তুই বিধবা হ'য়ে থাক, সাতজন্ম বিধবা হ'য়ে থাক, তবু শান্তিতে থাকতে পারবি।'

চাটুজ্যেমশাই একটু থেমে ফের বলতে শুরু করলেন। এবার তাঁর গলা করুণ, শোকার্দ্র হ'য়ে উঠেছে। তিনি বললেন, 'তারপর আর বলব কি বাবা। বলবার কিছু নেই, যেমন বাপ তেমনি ছেলে। রাজেশ্বর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা কোন্ ফাঁকে আবার পালাল। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, রোদে-রোদে মাঠে-মাঠে সারাদিন ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যার পর বাজারের মুদি নিতাই সাধুখাঁ ছেলেটাকে যখন ধ'রে নিয়ে এল, তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তবু প্রথমেই যদি শহরের বড়ো ডাক্তার-টাক্তার কাউকে আনতো ছেলেটা হয়তো বাঁচতো। কিন্তু ওরা আনল এখানকার কম্পাউণ্ডারি-পাস শীতল ডাক্তারকে। তিনদিন ধ'রে সে কি চিকিৎসা করল সে-ই জানে। সব একেবারে শীতল করে দিয়ে গেল। শহরের বড়ো ডাক্তার যখন এলেন তখন আর তাঁর কিছু করবার নেই।'

চাটুজ্যেমশাই একটু চুপ ক'রে থেকে ফের বললেন, 'বছর ঘুরে এল, তবু আজও আমার হাত নিসপিস করে বাবা। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো আমি সেই মাস্টার আর ওই মোষ—দুটোকেই এক সঙ্গে ফাঁসিতে লটকাতাম।'

'ঈশ্, লটকালেই হ'ল। আসুন-না, লটকান এসে দেখি, বুঝি কতখানি ক্ষমতা।' পিছন থেকে রাজেশ্বর গ'র্জে উঠল. বাজার সেরে সে যে কখন দোরের পাশে চোরের মতো এসে দাঁড়িয়েছে তা আমরা কেউ লক্ষ্য করি নি।

রাজেশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'রোজ এক কথা, রোজ এক কান্না আমার আর সহ্য হয় না। শুনে-শুনে কান প'চে গেল। আমার ছেলেকে আমি মেরেছি, তাতে কার বাপের কি। আমি জন্ম দিয়েছি, যতদিন ছিল খাইয়েছি পরিয়েছি, আবার নিজের হাতে শেষ ক'রে দিয়েছি। দিয়ে থাকি তো বেশ করেছি, বেশ করেছি।'

মেঝেতে বার দুই পা ঠুকল রাজেশ্বর।

চাটুজ্যেমশাই বিদ্রূপের ভঙ্গিতে টিপ্পনি কাটলেন, 'শোনো একবার কথা, শোনো তোমরা। এক দেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে তোমরা কি কেউ চর্মচক্ষে দেখেছ? না দেখে থাকলে দ্যাখো, চোখ ভ'রে দেখে নাও।'

এই বিদ্রূপের অশুভ পরিণামের কথা আশঙ্কা ক'রে রেণু অসহায় কাতরভাবে ব'লে উঠল, 'থামো বাবা থামো, তুমি কি আবার একটা খুনোখুনি বাধাবে? তোমরা কি একমুহূর্তও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না!'

রেণুর আশঙ্কা মিথ্যা নয়, রাজেশ্বর দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে শ্বশুরের দিকে রুখে এল, 'বে-আক্কেলে বুড়ো, ঘরের মধ্য আছ কিনা, গা উশখুশ করছে, গাছতলায় ব'সে ভিক্ষে না করতে পারলে তোমার আর সুখ হচ্ছে না। দাঁড়াও, তোমাকে আমি তাই করিয়ে তবে ছাড়ব। নেমকহারাম কোথাকার!'

রাজেশ্বরকে আমি প্রায় টানতে-টানতে বাইরে নিয়ে এলাম, 'তুমি এতটা ইতর হয়েছ রাজু, ছি ছি ছি। গাঁজা-টাজাও ধরেছ নাকি, আগে জানলে আমি এখানে আসতাম না। আমি এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি।'

রাজেশ্বর নরম হ'য়ে বলল, 'আরে না না! চলো, চলো, তোমাকে এবার আমার জমি আর বাড়ির প্ল্যানটা দেখিয়ে আনি, এসো। কোন ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার লাগে নি, আমি নিজেই সব করেছি। এসো, দেখবে এসো।'

ময়লা হাতটা রাজেশ্বর আমার কাঁধে রাখল. তারপর প্রায় ধাক্কা দিতে-দিতে আমাকে সামনের দিকে নিয়ে চলল।

জমির পুব-দক্ষিণ দু-দিকেই জঙ্গল। এখনো ভালো পরিষ্কার করা হয় নি। যে-দু'কাঠা জমির ওপর বাড়ি তুলছে রাজেশ্বর তাই আগে ঘুরে-ঘুরে দেখাল। রাজেশ্বর বলল যে বাড়ির ভিত সে শক্ত করেই গেঁথেছে। অনায়াসে এর ওপর দোতলা তোলা যাবে। রাজেশ্বর যদি নিজে সবটা না-ও

পারে ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা নিজেদের গরজে ক'রে নেবে। বলতে-বলতে একটু যেন বিষণ্ণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল রাজেশ্বর। জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটো নারকেল গাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। অনেক নারকেল হয়েছে গাছ দুটোয়। তাদের পুব দিকে একটা ঝাপ্‌টানো আমগাছ। বোলে পাতাগুলি প্রায় ঢেকে গেছে। রাজেশ্বর সেই গাছগুলির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'পুত্র-সন্তান আর হবে কি না কে জানে। না হয় সেই ভালো। আর কিছু না হয় সেই ভালো। মেয়েটা আছে, বেঁচে থাকলে জামাই একজন পাব। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরের যে-সম্পর্ক তার সঙ্গেও সেই সম্পর্ক হবে কিনা কে জানে।'

বললাম, 'এতই যদি বোঝ, কেন অমন ব্যবহার করো ওঁর সঙ্গে। ছিঃ, বুড়োমানুষ, তাতে আবার চোখ দুটি হারিয়েছেন।'

রাজেশ্বর বলল, 'কিন্তু আমি কি হারিয়েছি তা তো উনি বুঝতে চান না কল্যাণ। তাই বার-বার সে-কথা তোলেন, খোঁটা দেন, আর আমার রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। ছেলেটা আম ভারি ভালোবাসতো, বুঝলে কল্যাণ। গতবারের চেয়ে এবার ফলন আরো বেশি হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কিন্তু বউমা আর ছেলেপুলেদের নিয়ে একদিন এসো। সবাই মিলে আম খাওয়া যাবে।'

তারপর বাড়ির প্ল্যান সম্বন্ধে অনেক কথা বলল রাজেশ্বর। কোথায় বৈঠকখানা, কোথায় রান্নাঘর, কোথায় বাথরুম থাকবে, সব সে আমাকে নক্সা এঁকে বুঝিয়ে দিল। একটু বাদে বলল, 'পুব-দক্ষিণ কোণে তোমার জন্যেও একটা ঘর রেখে দেব, বুঝলে! যখন ইচ্ছে হবে চ'লে আসবে। এসে ব'সে-ব'সে লিখবে, কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না, আমি কথা দিচ্ছি। আচ্ছা কল্যাণ, তুমিও এদিকে খানিকটা জমি নাও-না। জমি নিয়ে বাড়ি তোল। বসত-বাড়ি না হোক বাংলো-গোছের একটা বাড়ি-টারি ক'রে রাখো। নাম দেবে নিরালা কি নির্জনী। বেশ হবে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু টাকাটা আমার হাতে দেবে। বাকি ভার সব আমার ওপর।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সে-সব প্ল্যান আর-একদিন এসে করব। আজ আর সময় নেই। চলো, আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসবে।'

রাজেশ্বরের মেয়ে বুড়ী এলো ছুটতে-ছুটতে। 'বাবা, মা তোমাদের ডাকছে। এসো, খাবে এসো। কত খাবার করেছে মা। কল্যাণকাকু, তুমি রোজ আসবে আমাদের বাড়ি। তুমি এলে বাবা এমনি বাজার ক'রে আনবে, আর মা ভালো-ভালো খাবার করবে। আমরা সবাই মিলে মজা ক'রে খাব।'

সস্নেহে মেয়ের গাল টিপে দিল রাজেশ্বর, তারপর হেসে বললে, 'দুষ্টু, অমনিতে তুমি বুঝি কিচ্ছু খাও না? তোমরা সবাই মিলে আমার বদনাম গাইবে এমনি ক'রে?'

ছোট একগাছি চেন-হার বুড়ীর গলায়। সে তা বার-বার খুলছিল আর পরছিল। রাজেশ্বর তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, বুড়ী, অমন করো না। হারটা একদিন তুমি হারিয়ে তবে ছাড়বে।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মা সাধ ক'রে গড়িয়ে দিয়েছে মেয়েকে। মানে সোনাটুকু অক্ষয় ক'রে রেখেছে। ভেবেছে, মেয়ের গা থেকে তো সোনা আর আমি কেড়ে নিতে পারব না। চালাকিটা একবার দেখে নাও।'

এসে দেখলাম ওদের বড়ো ঘরের মেঝেয় পাশাপাশি দু-খানা আসন পেতে আমাদের খাবার জায়গা ক'রে দিয়েছে রেণু। লুচি, হালুয়া, দু-তিন রকমের তরকারি, বাজার থেকে আনা দই, মিষ্টি, কোন উপকরণের আর অভাব নেই।

আমি রাগ ক'রে বললাম, 'এ-ধরনের ভদ্রতা যদি করো রাজু তাহ'লে তোমার বাড়িতে আর আসা চলবে না। কেন মিছিমিছি এ-সব করতে গেলে।'

রাজেশ্বর অপ্রতিভভাবে হাসল, 'আরে, খাও, খাও। বুড়ীর কথা তো শুনলে। তুমি এসেছ এই উপলক্ষে আমরাও দুটো—হে-হে-হে।'

উচ্চ হাসিতে বাকি কৈফিয়ৎ শেষ করল রাজেশ্বর।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আচ্ছা কল্যাণ, খেতে দেওয়ার সময় যদি বাঁধুনী দেবী মুখখানা হাঁড়ি ক'রে থাকে তাহ'লে কি খেয়ে সুখ হয়, না কি রান্নার কোন স্বাদ পাওয়া যায়। তুমি

তো লেখক মানুষ, তুমিই বলো। মেয়েদের মন তোমরা নাকি তাদের মুখের মতোই স্পষ্ট দেখতে পাও। তোমার কাছেই শুনে নিই কথাটা কি এমন হয়েছে যে—'

রেণুর মুখখানা সত্যি খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমার সামনে রাজু যে শ্বশুরকে অপমান করেছে এটা তার পছন্দ হবার কথা নয়, যে-বিষয় নিয়ে ঝগড়া, সেই ছেলের মৃত্যুর কথাও হয়তো রেণুর মনে প'ড়ে থাকবে।

খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে আমি যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। কিন্তু রাজেশ্বর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সে বলল, 'আরে বসো, বসো। এ-লাইনে বাস সেই রাত দশটা অবধি চলে। দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যাবে। দুই বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে ব'সে গল্প করতে-করতে খাব।'

অনেক কষ্টে রাজেশ্বরের হাত এড়ালাম। বললাম, 'আর-একদিন এসে খাব রাজু।'

রাজেশ্বর বলল, 'তুমি আর এসেছ। আমি কিন্তু আর সাধ্য-সাধনা করতে পারব না।'

হেসে বললাম, 'তোমাকে বলতে হবে না। আমি নিজেই আসব।'

চাটুজ্যেমশাই, রেণু, বুড়ী সবাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াচ্ছি, দেখি কোত্থেকে গোটা পাঁচ-ছয় কাগজি লেবু নিয়ে এসে হাজির হয়েছে রাজেশ্বর। লেবুগুলি সে আমার ঝুল-পকেটে ভ'রে দিতে-দিতে বলল, 'নিয়ে যাও ভাই। এ আমার নিজে হাতে লাগানো গাছ, সেই গাছের লেবু। আশ্চর্য গন্ধ, কল্যাণ। এমন গন্ধ তুমি আর কোন লেবুতে পাবে না। এখানকার মাটির গুণ।'

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। অন্ধকার পথ। রাজেশ্বর আমার সঙ্গে টর্চ নিয়ে চলল। বুড়ীর ইচ্ছা সে-ও যায়। অস্ফুট স্বরে দু-একবার সে-কথা জানাল ও।

রাজেশ্বর বলল, 'আচ্ছা, চল।'

রেণু বলল, 'কি দরকার মেয়েটাকে এই অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে।'

রাজেশ্বর বলল, 'আরে আমি তো সঙ্গে আছি। টর্চও হাতে আছে একটা। অন্ধকারে কি করবে।'

বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই রাজেশ্বরের টর্চের আলো সেই পাতকুয়োটার ওপর গিয়ে পড়ল।

বললাম, 'রাস্তার মাঝখানে এই কুয়োটা কেন, রাজেশ্বর ? পাড়টা তো তেমন উঁচু নয়। ছেলেমেয়ে কেউ প'ড়ে-ট'বে যেতে পারে।'

রাজেশ্বর বলল, 'কেউ পড়ে না। ওদের সব অভ্যাস হ'য়ে গেছে। সামনের খোলা জায়গাটায় ওরা সবাই খেলতে আসে। কিন্তু কুয়োর ধারে কাছে কেউ যায় না। অনেক কালের কুয়ো। আগে এর জল খেয়ে সারা গাঁয়ের লোক বাঁচতো। এখন জলটা নষ্ট হ'য়ে গেছে। গাঁয়ের লোকগুলি এমন কুঁড়ে, এটাকে যে সবাই মিলে পরিষ্কার করিয়ে নেবে তা নেবে না। কেবল ঝগড়া, দলাদলি, কারো সঙ্গে কারো সদ্ভাব নেই।'

আর-একটু এগিয়ে হঠাৎ মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে রাজেশ্বর বলল, 'আচ্ছা, তুই এখান থেকে ফিরেই যা বুড়ী। আমার ফিরতে দেরি হবে। আমি মিস্ত্রীদের বাসা হ'য়ে আসব।'

বললাম 'এ কি বলছ রাজেশ্বর ! ও কি একা-একা যেতে পারবে !'

রাজেশ্বর বলল, 'খুব পারবে। চেনা পথ। আচ্ছা, টর্চটা তুই নিয়ে যা। আমি চাই গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সাহসী হোক, ডানপিটে হোক। ভীতু তুতুবুতু এক-পাল মেষ-শাবক নিয়ে কি হবে দেশের।'

টর্চ পেয়ে বুড়ী খুব খুশি।

রাজেশ্বর বলল, 'কি রে, পারবি তো ?'

বুড়ী বলল, 'পারব বাবা, এক-ছুটে চ'লে যাব।'

বললাম, 'ও তো যাবে। কিন্তু তোমার ফিরতে অসুবিধে হবে না ?'

রাজেশ্বর বলল, 'আরে না না, গাঁয়ের ছেলে না আমরা ? চোখের তারাও আছে, আকাশের তারাও আছে। অন্ধকারে কি করবে। তোমার বুঝি হাঁটতে একটু ভয়-ভয় করছে, কল্যাণ ? শহুরে

বাবু হ'য়ে পড়েছ। এসো, আমার পিছনে-পিছনে এসো। ভয় নেই তোমার।'

সারাটা পথ শহর আর গ্রামের তুলনামূলক সমালোচনা করতে-করতে চলল রাজেশ্বর। গ্রাম আর গ্রামের সভ্যতা যে কত উন্নত পর্যায়ের ছিল তা প্রমাণের জন্যে সে নানা দৃষ্টান্ত দিল। কিন্তু আমি কোন বিতর্কে যোগ দিলাম না। এই পথটুকু পার হ'তে পারলে রাজেশ্বরের হাত থেকে এ-যাত্রার মতো বেঁচে যাই।

বাস-স্টপের কাছে এসে রাজেশ্বর হঠাৎ বলল, 'ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। এই পাঁচটা টাকা তুমি রাখো তো কল্যাণ। আমার জন্যে একখানা মহাভারত কিনে দেবে। পাবলিশারদের সঙ্গে তো তোমার জানাশোনা আছে। তুমি কিনলে দু-টাকা কমিশনে কিনতে পারবে। তাই তোমার হাত দিয়েই কেনাব।'

বললাম, 'মহাভারত দিয়ে কি হবে? তুমি পড়বে নাকি?'

রাজেশ্বর হাসল, 'আরে না ভাই, না। তুমিও যেমন। এই কর্মময় জীবনে অত বড়ো বই পড়বার সময় আছে না কি? পড়াশুনো ছেলেমানুষের জন্যে, বুড়ো মানুষের জন্যে। জোয়ান পুরুষ মানুষের জন্যে নয় ভাই। তাদের জন্যে কাজ। মেয়েটা ছবির বই ছবির বই করে। ভাবলাম মহাভারতই একখানা কিনে দিই। নাতনী আর দাদু দু-জনেরই কাজ চলবে। একজন পড়বে, একজন শুনবে। বুড়ো সব খেয়ে ধৃতরাষ্ট্র হ'য়ে ব'সে আছে। ওঁকে এখন শান্তিপর্ব শোনানো দরকার।'

বলেছিলাম, 'টাকাটা থাক-না। আমি তোমাকে মহাভারত একখানা সংগ্রহ ক'রে দেব।'

কিন্তু রাজেশ্বর সে-কথা শোনে নি। সে জোর ক'রেই পাঁচ টাকার নোটখানা আমার পকেটে গুঁজে দিল।

এর পরের ঘটনাটা একান্তই আকস্মিক। সপ্তাহ দুই যেতে না-যেতেই খবরটা পেলাম। আমাদের কাগজেই ছাপা হ'ল খবর। নিজস্ব সংবাদদাতা বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। সাতগাছিতে কুয়োর মধ্যে গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে রাজেশ্বর চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। তার নাবালিকা কন্যা অসতর্কভাবে গলার হার কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। রাজেশ্বর প্রথমে ক্রুদ্ধ হ'য়ে স্ত্রী-কন্যাকে নিদারুণ প্রহার করে, তার পরে জেদের বশে নিজেই সেই উদ্ধারের জন্যে মইয়ের সাহায্যে কুয়োর মধ্যে নেমে যায়। ঘণ্টাখানেক পরেও তাকে উঠে আসতে না দেখে গাঁয়ের লোকের সন্দেহ জন্মায়। ডাকাডাকি ক'রেও তার সাড়া না পাওয়ায় ওরা পুলিশ খবর দেয়। দমকলের কর্মীরাও আসে। সকলের সাহায্যে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটিতে ও-অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদটি আরো-পাঁচটি মফঃস্বল সংবাদের সঙ্গে ছাপা হ'তে যাচ্ছিল। আমি তুলে নিয়ে একটু বড়ো টাইপের শিরোনামা দিয়ে বিশেষ জায়গায় ছাপবার ব্যবস্থা ক'রে একসঙ্গে সাংবাদিক আর বন্ধুর কৃত্য শেষ করলাম। তারপর খানিকক্ষণ ব'সে রইলাম স্তম্ভিত হ'য়ে। ভাবলাম, রাজেশ্বরের মতো লোকের এমন অপঘাত মৃত্যুই তো স্বাভাবিক। ও যে এতদিন কি ক'রে বেঁচে ছিল সেই তো আশ্চর্য।

যত তাড়াতাড়ি রেণুর সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম তা হ'ল না। একটা-না-একটা বাধা ঘটতে লাগল। আসলে সে-বাধা হয়তো আমার নিজেরই সৃষ্টি। নিজেরই ভীরুতার ফল। সহায়সম্বলহীন এক অন্ধ বৃদ্ধ, প্রায় নিরক্ষরা একজন স্ত্রীলোক আর একটি শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে আমি কী বলব কী সান্ত্বনা দেব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। চিঠি দিয়ে সমবেদনা জানাতেও বাধল। রাজেশ্বরের সঙ্গে অতটা দূরের সম্পর্ক তো সত্যিই ছিল না।

শেষপর্যন্ত স্ত্রীর গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে মাসখানেক বাদে মহাভারতখানা হাতে নিয়ে একদিন বিকেল বেলায় আবার হাজির হলাম রাজেশ্বরের সাতগাছির বাড়িতে।

পথে সেই কুয়োটার কাছে একবার থেমে দাঁড়ালাম। খানিকটা টিন দিয়ে এবার ওর সেই হাঁ-করা-মুখটা ঢেকে রাখা হয়েছে। একবার ভাবলাম কুয়োটার কাছে এগিয়ে যাই। ঢাকনি সরিয়ে একবার দেখি ভিতরটা। পরমুহূর্তে এই ছেলেমানুষী কৌতূহলে নিজেরই হাসি পেল। ওখানে আর

কি দেখবার আছে।

পথটুকু পার হ'য়ে রাজেশ্বরের উঠোনের ওপর এসে দাঁড়ালাম। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সারা বাড়িটাই হতশ্রী শ্মশানের মতো স্তব্ধ। একটু ইতস্তত ক'রে ডাকলাম, 'বুড়ী, ও বুড়ী।'

রাজেশ্বরের মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ছুটে এসে অমাকে জড়িয়ে ধরল একেবারে। বলল, 'কল্যাণকাকু, তুমি আবার এসেছ। তোমার হাতে ওখানা কি? সেই মহাভারত? আমাকে দাও, আমি ছবি দেখব।'

সাড়া পেয়ে রেণুও বাইরে এল। পরনে শাদা থান। শাদা রং যে কত বীভৎস হ'তে পারে সদ্যবিধবাকে না দেখলে তা বোঝা যায় না।

একমুহূর্ত দু-জনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'আর কী দেখতে এসেছেন?' ব'লে রেণু মুখ নামিয়ে নিল। চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল টের পেলাম। একটু বাদে সে মৃদুস্বরে বলল, 'চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন।'

দ্রুতপায়ে নিজেই ভিতরে চ'লে গেল রেণু। শিগগির আর বেরোল না।

'কে, কল্যাণ? এ-ঘরে এসো বাবা, এ-ঘরে এসো।'

চাটুজ্যেমশাই তাঁর ঘরের ভিতর থেকে ডাকলেন। আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম। তবু আস্তে-আস্তে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। বইখানা তাঁর দিকেএগিয়ে দিয়ে বললাম, 'রাজেশ্বর এই মহাভারতখানা আপনার জন্যে কিনে রেখে গেছে।'

বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, 'আমাকে রাজা করেছে! উঃ, কী শত্রুই যে ছিল। যা ব'লে গেল তাই ক'রে ছাড়ল। ঝুলি হাতে আমাকে গাছতলাতেই বসিয়ে দিয়ে গেল বাবা। ভিক্ষে করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। কিন্তু ভিক্ষে ক'রেও কি তিনটে পেট বাঁচাতে পারব? উঃ, এতবড়ো গোঁয়ার! ভরিখানেক সোনার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করল! শুনেছ বোধহয় ব্যাপারটা।'

চাটুজ্যেমশাই গোড়া থেকে সেদিনকার ঘটনার বর্ণনা শুরু করলেন। কিন্তু আমার আর কোন কৌতূহল ছিল না। আমি আস্তে-আস্তে এক ফাঁকে উঠে পড়লাম। পা টিপে-টিপে বাইরে নামলাম। চাটুজ্যেমশাই ডাকলেন, 'ও বাবা, চ'লে গেলে না কি, শোনো, শোনো।'

রেণু তখনো ঘর থেকে বেরোয় নি। বোধহয় সামলাবার জন্যে সময় নিচ্ছে। কিন্তু বুড়ী এগিয়ে এল কাছে। আমি তার কচি হাতখানা মুঠির মধ্যে ধ'রে পুবের দিকে এগুতে লাগলাম। সামনেই রাজেশ্বরের সেই অসমাপ্ত নতুন বাড়ি। তার কত কল্পনা, কত পরিকল্পনা।

বুড়ীকে পাশে নিয়ে সেই ইঁটের স্তূপের ওপর ব'সে পড়লাম। আজ আর সেদিনের মতো কৃষ্ণপক্ষ নয়। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথি। সন্ধ্যা হ'তে না-হ'তেই চাঁদ উঠেছে আকাশে। বাঁশঝাড় নারকেল আর আম-বাগানের ফাঁক দিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না রাজেশ্বরের এই অসম্পূর্ণ বাড়িটার গায়ে এসে পড়েছে। কোত্থেকে বুনো ফুলের গন্ধ আসছে একটা। এর সঙ্গে রাজেশ্বরের সেই লেবুর গন্ধও মিশে আছে কি না কে জানে। ছেলেবেলার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। স্কুল কামাই করবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে সেই নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া, ছাত্রদের চক্ষুশূল দ্বিজেন মাস্টারকে মারবার ষড়যন্ত্র—রাজেশ্বর কোন ব্যাপারের মধ্যেই বা না থাকতো!

'কল্যাণকাকু।'

বুড়ীর ডাক শুনে চমকে উঠলাম।

ও যে আমার পাশেই ব'সে আছে এতক্ষণ যেন খেয়ালই ছিল না। ওকে আর-একটু কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম, 'কি বুড়ী?'

বুড়ী বললো, 'জানো, আমার মা একটা চাকরি পাবে?'

বললাম, 'তাই নাকি! কোথায়? কোন স্কুলে বুঝি?'

'না, না, স্কুল না। ও-পাড়ার সাধুখাঁদের বাড়িতে। দু-বেলা রেঁধে দেবে। তারা কুড়ি টাকা ক'রে মাইনে দেবে মাকে। সাধুখাঁরা অনেক বড়লোক কিনা। তাদের ধানকল আছে, মুদি দোকান আছে, জানো?'

ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম, এর মধ্যে বুড়ী তার বাবার কথাটা একবারও তোলে নি। বোধহয় ভুলেই

গেছে। শিশুদের মন! ওরা এমনই তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়। শুধু শিশুই বা কেন? মৃতকে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে এই শিশুধর্ম বয়স্ক মানুষের মধ্যেও কি কম।

খানিক বাদে বুড়ী বলল, 'জানো কল্যাণকাকু, আমাদের বাড়িটা আর হবে না। রাজমিস্ত্রীরা আর আসে না। বাবা তো নেই, আমাদের বাড়ি আর কে তুলবে বলো।'

চট ক'রে এ-কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। এ-বাড়ি শেষ হবার সত্যিই কোন সম্ভাবনা আর নেই। যতদূর জানি, রাজেশ্বর কিছুই রেখে যেতে পারে নি। একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স পর্যন্ত নয়। শুধু আছে এই জমি আর ইঁটের পাঁজা। এগুলি বিক্রি ক'রে এখান থেকে চ'লে যাওয়াই রেণুর পক্ষে বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। খুব সম্ভব তাই করবে রেণু। আমিও সেই পরামর্শই দেব।

বুড়ী এবার বিরক্ত হ'য়ে আমাকে একটা ধাক্কা দিল। বলল, 'তুমি আমার কথা মোটেই শুনছ না কল্যাণকাকু।'

বললাম, 'শুনছি, শুনছি। বলো।'

বুড়ী সেই আগের প্রশ্নই করল, 'বলো তো আমাদের বাড়ির বাকিটা কে এসে তুলবে?'

এবার আর ওর কথায় কোন বিষাদের স্পর্শ নেই। বরং ওর গলার স্বর খানিকটা চটুল হ'য়ে উঠেছে। যেন ও কোন কঠিন ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করেছে আমাকে।

বুড়ী এবার হাসল, 'বলো না কল্যাণকাকু বলো না তুমি পারলে না তো? মা কিন্তু পেরেছে, মা-ই ব'লে দিয়েছে আমাকে।'

বললাম, 'কী বলেছে?'

বুড়ী বলল, 'বলেছে, তোর বর এসে করবে।' ব'লেই বেশ একটু লজ্জিত হ'য়ে উঠল বুড়ী।

আমি হেসে বললাম, 'তাই তো। আমার ঠিক মনে ছিল না। তোমার বর এসেই এ-বাড়ির বাকিটা তুলে নেবে। ঠিক, ঠিক।'

বুড়ী বলল, বড়ো হ'লেই বর আসবে আমার আর আমি খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হ'য়ে উঠব। আমার বর কার মতো হবে বলো দেখি কল্যাণকাকু?'

'কার মতো?'

'তুমি কিচ্ছু জানো না। তুমি একটা বোকা।' বলতে-বলতে বুড়ী আদর ক'রে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে-আস্তে বলল, 'আমার বাবার মতো।'

আমি ওর দিকে তাকাতেই বুড়ী লজ্জায় আমার কোলের মধ্যে মুখ লুকোল।

বৈশাখ ১৩৬২

অপরাহ্ণ

দুই বন্ধুর মধ্যে সুখ দুঃখের কথা হচ্ছিল। দুজনেই ছিল প্রবীণ, দুজনেই পদস্থ। অফিসে মোটা মাইনে না হোক মোটামুটি মাইনে পান। সংসারে স্ত্রী-পুত্র কন্যা এমন কি মেয়ের ঘরে একজনের নাতি-নাতনিও হয়েছে। বয়সও অনেকটা একরকম। শৈলেশ্বর দাশগুপ্তর পঞ্চাশের এধারে, দু'তিন বছর কম। আর উমাপদ লাহিড়ীর পঞ্চাশের কিছু ওধারে, দু'এক বছর বেশি। শৈলেশ্বর খ্যাত এক ইনসিওরেন্স অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর উমাপদর চাকরি কর্পোরেশনের কালেকশান ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু চাকরিই এঁদের বড় পরিচয় নয়। যৌবনে দু'জনেই রাজনীতি করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছেন। তারপর অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কেউ আর রাখতে পারেননি, কি রাখেননি। কিন্তু তা না রাখলেও অফিস আর সংসারের মধ্যে তাঁরা একেবারে আটকে থাকেননি। একটু ফাঁক রেখেছেন। শৈলেশ্বর গেছেন সংগঠন সমাজগঠনের দিকে। টালিগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর হাই স্কুল আছে, নাইট স্কুল আছে, লাইব্রেরী আর শিল্পাশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। আর উমাপদ গেছেন জ্ঞানচর্চার দিকে। জীবনভর শুধু বই কিনেছেন আর বই

পড়েছেন। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস দর্শনে এখনো তাঁর সমান আগ্রহ রয়েছে। এত পড়াশুনো থাকলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। অভিমান যাতে না জন্মে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে। দু'চারজন বন্ধু এবং গুণগ্রাহী ছাড়া তাঁর পড়াশুনোর খবর কেউ রাখে না। আত্মপ্রচারে তাঁর কুণ্ঠা আছে। কদাচিৎ সভাসমিতিতে যান। কিন্তু সেখানেও শ্রোতার আসন ছেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে বড় একটা উঠতে চান না। যদি বা উঠেন সেখানে তাঁর যোগ্যতার পূর্ণ পরিচয় তেমন মেলে না, যেমন মেলে বন্ধুদের বৈঠকে।

শৈলেশ্বরের বাসা টালিগঞ্জে আর উমাপদ থাকেন ইন্টালী অঞ্চলে। দু'জনের মধ্যে আজকাল কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়। ব্যস্ত শৈলেশ্বর তাঁর স্কুল, লাইব্রেরী আর মহিলাশ্রমের কাজে সারা শহর ঘোরাঘুরি করেন আর উমাপদ অফিসঘর থেকে নিজের পড়বার ঘরে ইজি চেয়ারে এসে বসেন। অনেক দিন বাদে আজ শৈলেশ্বর নিজে বন্ধুর খোঁজ নিতে এসেছেন। রবিবারের বিকেল। উমাপদর স্ত্রী স্বামীর পুরোন বন্ধুকে চা জলখাবারে আপ্যায়িত করে ফের ঘরকন্নার কাজ দেখতে চলে গেছেন। ছেলে-মেয়েরা কেউ খেলার মাঠে কেউ সিনেমায় গেছে। কেউ প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে গল্প করছে। কেউ কারো খোঁজ খবর নেন না বলে প্রথমে দু'জনের মধ্যে খানিকক্ষণ অনুযোগ অভিযোগের পালা চলল। তারপর উঠল ঘর সংসারের গল্প। সংসারের জ্বালার কথা দুজনেই স্বীকার করলেন।

শৈলেশ্বর বললেন, "তুমিই ভালো আছ হে উমাপদ, ঘরের বাইরের পা বাড়াও না। আমার তো স্ত্রীর খোটা শুনতে শুনতে জীবন গেল। আমি নাকি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। আর এতই যদি দেশের কাজ করছি—মন্ত্রী উপমন্ত্রী, সহকারী-মন্ত্রী, নিদেনপক্ষে বিধানসভার একজন সদস্যও হতে পারছিনে কেন, আমার স্ত্রীর মনে এই হল সব চেয়ে বড় আক্ষেপ। এদিক থেকে তুমি বেশ ভাল আছ। নিষ্কাম জ্ঞান-পন্থিকে স্ত্রী বোধ হয় খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে।"

উমাপদ হাসলেন, "শ্রদ্ধা তো বটেই তবে প্রায়ই সেই শ্রদ্ধা শ্রাদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায়।"

ভেজানো দরজার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উমাপদ বললেন, "কতদিন যে আমার এই বইয়ের র‍্যাকে আর আলমারিতে নুড়ো জ্বেলে দিতে এসেছে তাতো তুমি আর জানো না।"

শৈলেশ্বর তখন একটু কৌতুক বোধ করে বললেন, "তাই নাকি? তোমার ঘরেও ঝড় ওঠে! কি কর তুমি তখন?"

উমাপদ বললেন, "কি আর করব। তৃণাদপি নিচু হয়ে থাকি, ঝড় মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কখনো বা ঘরের দেওয়াল হয়ে থাকি। চার দেয়ালের সঙ্গে পঞ্চম দেয়াল। না হয় ছোট মেয়ের খেলার পুতুল!—তার চোখ আছে দেখতে পায় না, কান আছে শুনতে পায় না।"

শৈলেশ্বর হেসে বললেন," তুমি ভাই বেশ আছ। কিন্তু আমি দাস্যভাবের ভজনপূজন শিখিনি। আমাদের যখন লাগে লাঠালাঠি ফাটাফাটি হয়ে যায়।"

উমাপদ স্মিতমুখে বললেন, "তাতে লাভ কি বল। ছেলেমেয়েদের কাছে লজ্জিত হতে হয়। তাছাড়া সংযম একবার হারিয়ে ফেললে কি কাণ্ড যে ঘটতে পারে তার কি কিছু ঠিক আছে। তখন শিক্ষা বল, সংস্কৃতি বল, কিছুই সেই প্রলয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কাম, ক্রোধ এই দুই রিপু প্রায়ই আসন বদলায়। বিশেষ ক'রে শেষ বয়সে দ্বিতীয়ই হয় অদ্বিতীয়।"

বন্ধুর কথা শুনে শৈলেশ্বর বেশ আন্দাজ ক'রে নিলেন যে, সব সময় উমাপদ তৃণ হয়ে থাকতে পারে না; কামের পীড়নে না হোক ক্রোধের পীড়নে তাকেও জ্বলতে হয়, পুড়তে হয়। কর্তৃপদেই জ্বলুক আর কর্মপদেই জ্বলুক।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ শৈলেশ্বর বললেন, "আচ্ছা উমাপদ, সেক্স সম্বন্ধে তোমার আজকাল কি মনোভাব। মানে আমাদের মত বয়সে, আমাদের মত লোকের জীবনে সেক্সের প্রভাবটা কি ধরণে পড়ে, কি ধরণে পড়া উচিত—"

উমাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল বিস্মিত হ'য়ে রইলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, "শৈলেশ, একে ভূতের মুখে রাম নাম বলব না রামের মুখে ভূতের নাম বলব ঠিক ভেবে পাচ্ছিনে।

সেক্স সম্বন্ধে তোমার এই আগ্রহ ঔৎসুক্য তো কোন কালে দেখিনি। হঠাৎ হল কি তোমার।"

শৈলেশ্বর একটু অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু হয়নি। তুমি আমার কথার জবাব দাও।"

উমাপদ বললেন, "তোমার প্রশ্নটা এত অবছা যে তার জবাবটাও ধোঁয়াটে হ'তে বাধ্য। তবু জবাব আমি দেব, কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিই। তোমার এই যৌন-জিজ্ঞাসার মূলে সেই হেডমিস্ট্রেসের কোন হাত-টাত আছে নাকি হে।"

খোঁচা খেয়ে শৈলেশ্বর চটে উঠলেন, "কোন হেডমিস্ট্রেসের কথা বলছ? সেই সব বাজে গুজব কি তোমারও কানে গেছে নাকি?"

উমাপদ কৌতুকের সুরে বললেন, "সবটা যায় নি। আমি দু'কানে আঙুল দিয়ে রয়েছি। কিন্তু কথাটা যখন উঠল, তোমার কাছ থেকেই সব শুনি। দোহাই তোমার বাদসাদ দিয়ো না, ছাটকাট করো না, যা ঘটেছে তাই বল।"

অমনিতে উমাপদ ভারি রাশভারি মানুষ। বয়সের তুলনায় মাথার চুল বেশি পেকে যাওয়ায় তাঁর প্রবীণত্ব আরো বেড়েছে। এমন গুরুগম্ভীর বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুকে হঠাৎ এতো প্রগলভ হ'তে দেখে শৈলেশ্বরেরও বুকের ভার ও বয়সের ভার যেন অনেকখানি নেমে গেল। তিনি ফের প্রথম তারুণ্যের স্বাদ পেলেন। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ্বর হেসে বললেন, "না বাদসাদ দেব না, সবই বলব। আমার গল্প এতই ছোট এতই কাটছাঁট্টা যে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। আমার বলা হয়ে গেলে তুমি বরং খানিকটা প্রাচীন কাব্যের রস আর আজকালকার ছোকরা লেখকদের দেহবাদের কথা আমার গল্পের মধ্যে যত খুশী মিশিয়ে নিয়ো আমি আপত্তি করব না।——

তুমি তো জানো রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে আমি তোমার মত অহিংসা নিয়ে নামিনি, হিংসার পথই বেছে নিয়েছিলাম। সে পথে আমাদের ক্রোধের তেজে কাম পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। **'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী'**, এ জিজ্ঞাসা যে আমাদের জীবনে আসেনি তা নয়, তবে অনেক পরে এসেছে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক আর নারীকে আমরা বাধা বলে এক পাশে অনায়াসে সরিয়ে রেখেছিলাম। স্কুলের সেই ফোর্থ ক্লাস থার্ড ক্লাস থেকে এমন শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, ওসব ব্যাপারকে আমরা অব্যাপার বলেই জেনেছি। কোনদিন উৎসাহ আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু এসব কথা তোমার জানা। কি করে হিংসা ছেড়ে অহিংসা ধরলাম, তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গৃহস্থ হলাম সে কথাও তুমি অনেকবার শুনেছ। তবু যে এত সব **পুরোন** কথা তুললাম সে আমাদের পিছনকার ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যেই। কমলিকে তো ছাড়লাম ভাই কিন্তু কমলি যে ছাড়ে না। অফিস থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে অফিস। ঘরের এই চার দেয়ালের মধ্যে—দ্বিগুণ করলে দুই ঘরের এই আট দেয়ালের মধ্যে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠল। কি ক'রে মানুষ যে এত ছোট জায়গার মধ্যে এমন করে হাত পা গুটিয়ে থাকতে পারে আমি তো ভেবে পাই না উমাপদ। তোমার কথা বলছিনে, তুমি তো পুঁথির মধ্যে বিশ্বরূপ দেখতে পাও—তোমার কথা আলাদা। কিন্তু যারা কেবল স্ত্রী পুত্রের মধ্যে দুনিয়াটাকে পকেট সংস্করণ ক'রে রাখে আমি তাদের কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। এ যেন মেয়েদের রান্নাঘর আর শোয়ার ঘর। তবু তো তারা ফি বছরে কি দু'বছরে একবার করে আঁতুড় ঘরে যায়। আমাদের কি গতি? শুধু কি ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়ে জনকত্বের সাধ মেটে? তোমার কি হয়েছে জানিনে, আমার তো মেটেনি। তাই ওই পাঠশালা, তাই ওই পাঠাগার, আর অনাথ আশ্রম। অবশ্য এসব ছোট ছোট ব্যাপার তুমিও পছন্দ করনি। তুমিও হিতৈষী বন্ধু হিসেবে চেয়েছ যদি কিছু করিই, যেন বড় কিছু করি। গ্রাম নয়, গঞ্জ নয়, সারা দেশ আমার কর্মভূমি হোক, বিদেশে আমার কীর্তি ছড়িয়ে পড়ুক—এমন স্বপ্ন অল্প বয়সে আমিও অনেক দেখেছি। কিন্তু বয়স বাড়বার পর নিজের মুরোদ যারা বুঝতে না পারে তাদের মত হতভাগা আর নেই। ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জ্বালায় তারা জ্বলে মরে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বলুনির চেয়ে সে জ্বলুনি বড় কম নয় উমাপদ। কিন্তু আমি অনেক আগে থেকেই টের পেয়েছিলাম মোল্লার দৌড় কোন মসজিদ পর্যন্ত। নিজের সম্বন্ধে আমার কোন মোহ ছিল না, তাই মোহভঙ্গও হয়নি। কারণ আত্ম-পরিচয়ের মুগুরের ঘায়ে তাকে আমি বহু আগে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে গল্প

শোনাতে গিয়ে বক্তৃতা শোনাচ্ছি। কি করব বল স্বভাব যায় না মলে। আর 'Habit is the second nature'—অভ্যাসে অভ্যাসেই আমাদের স্বভাব গড়ে ওঠে। তুমি তো ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকে রেহাই পেয়েছ। কিন্তু মাঠে-ঘাটে—এমন জায়গা নেই যেখানে আমাকে গলাবাজি না করতে হয়।

যাকগে, ভোজবাজির মত, এবার আমার গল্পের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ি। হৃদয় তো ভেঙেছেই না হয় হাঁটু দুটোও ভাঙবে, কি বল। হ্যাঁ সেই হেডমিস্ট্রেস। বছর পাঁচেক আগে জয়ন্তী বোস আমাদের স্কুলে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়েই এসেছিল। অর্ডিনারি গ্রাজুয়েট। এর চেয়ে বড় চাকরি কি করেই বা পাবে! ইন্টারভিউর সময় আমি ছিলাম। দেখলাম মেয়েটির চেহারা-টেহারা ভালো। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আর কথাবার্তায় নম্রতা আছে। হাতের লেখাটি সুন্দর। বয়স বছর তেইশ চব্বিশের মধ্যে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাসে অঙ্ক কষাতে পারবেন তো, যদি দরকার হয়?'

জয়ন্তী আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'পারব। আমি অঙ্ক নিয়েই পাশ করেছি।'

ওর কতখানি সাহস তাই পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম, 'আর যদি ইংরেজী পড়াতে দিই?'

মেয়েটি ঘাবড়াল না, বলল, 'তাও পারব।'

পারুক না পারুক ওর নির্ভীকতা দেখে আমি খুশী হলাম। চাকরি দিলাম জয়ন্তীকে। বোর্ডে আরো দুজন মেম্বার ছিলেন। তাঁরা বললেন, 'একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখলেন না শৈলেশবাবু?'

আমি বললাম, 'ছ' মাস ধরেই তো ট্রায়াল দেব। ওকে তো অস্থায়ীভাবেই নিলাম। যদি ভালো না পড়াতে পারে, ওর কাজ দেখে আপনারা যদি খুশী না হন তাহলে ছ' মাস পরে ছাড়িয়ে দিলেই হবে।'

আমার সহকর্মীরা প্রসন্ন হলেন না। তাঁদের এক একজন ক'রে আলাদা ক্যাণ্ডিডেট ছিল। আমি দেখলাম সেই দুইটি মেয়ের চেয়ে জয়ন্তীর যোগত্যা বেশি। তাঁরা ভাবলেন, তুলনায় জয়ন্তীর বয়স কম আর রূপ বেশি বলেই আমার এই পক্ষপাত। কিন্তু তাঁরা যাই ভাবুন, আর আমার আড়ালে যাই বলাবলি করুন, স্কুল সম্বন্ধে আমার কথার ওপর কথা বলবার, আমার ডিসিশনের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য কমিটিতে কারোই ছিল না। কারণ এই বনমালী বিদ্যাপীঠ যখন উঠে যাবার জো হয়েছিল, তখন আমি প্রথম ও পাড়ায় যাই। তারপর দিনরাত আপ্রাণ পরিশ্রম করে স্কুলটাকে আমি ঢেলে সাজাই। সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা ফের আনিয়ে নিই। স্কুলের ফাণ্ড বলে কোন জিনিস ছিল না। আমার আমলে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়তে থাকে। প্রত্যেকটি পাই ফার্দিং-এর হিসেব, প্রত্যেকটি মাস্টার ছাত্রের চরিত্রের আমি খোঁজ-খবর রাখি। নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করছি বলে কিছু মনে করো না। যা সত্যি ঘটনা তাই বলছি, যাতে ব্যাপারটা তুমি ভালো ক'রে বুঝতে পার।

যা হোক জয়ন্তী আমার মান রাখলে। মাস দুয়েকের মধ্যে টিচার হিসেবে ওর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার হেডমিস্ট্রেস মিসেস সেনগুপ্ত নিজে থেকে একদিন ওর প্রশংসা করলেন। জয়ন্তী ভালো পড়ায়, খেটে পড়ায়, কোনদিন এক মিনিট লেট হয় না, একদিনও কামাই করে না। অবশ্য তখন পর্যন্ত ওকে ওপরের ক্লাসে নিয়মিত পড়াতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু নিচের ক্লাসের মেয়েদের কাছে জয়ন্তীদি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্লাস ম্যানেজ করায় ওর অসাধারণ দক্ষতা। শুনে আমি খুব খুশি হলাম। অবশ্য বয়েজ সেকশনেরই বল আর গার্লস সেকশনেরই বল প্রায় সব টিচারকেই তো আমি চাকরি দিয়েছি, আমি দেখে শুনে বেছে টেছে নিয়েছি। তাদের সকলের গৌরবেই আমার গৌরব। তবু ওই মেয়েটির প্রশংসায় আমার মনটা যে একটু বেশি প্রসন্ন হয়ে উঠল তার কারণ আমি অন্য দুজনের অমতে ওকে চাকরি দিয়েছি। ও যদি অযোগ্য বলে গণ্য হয়, আমার মাথা নিচু হ'য়ে যায়। যা হোক ছ' মাস বাদে ওকে আমরা নিশ্চিন্ত মনেই পার্মানেন্ট করে নিলাম।

তারপর কি একটা ছুটির দিনে এমনি এক বিকেল বেলায় জয়ন্তী আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। ধোপা কাপড় নিয়ে এসেছে। আমার স্ত্রী সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চা মেয়েটি পুতুল খেলছে। ছেলে দুটি বল নিয়ে পাড়ার মাঠে বেরিয়েছে। আর আমি বারান্দায় ফুলগাছের টবের মাটি খুঁচিয়ে দিচ্ছি। আমার মত কাঠখোট্টা মানুষেরও কিছু পুষ্পপ্রীতি আছে তা তুমি জানো। ফুল আমি

কিনতে ভালোবাসি, পেতে ভালোবাসি, দিতে ভালোবাসি। আমার ভাড়াটে বাসায় এক ফোঁটা মাটি না থাকলেও টবে তার চাষ করতে ভালোবাসি। আমাদের স্কুলের মাধবীবিতান আর কম্পাউণ্ডের মধ্যে হাস্নাহানার ঝাড় নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। ওসব আমারই করা। আগেকার স্কুল কম্পাউণ্ড ছিল মরুভূমির মত। তাতে ফুলপাতার কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ফুলের কথা তোমার কাছে ফলাও করে বলতে ভয় হয়। তুমি মনস্তত্ত্বপড়া পণ্ডিত। নিশ্চয়ই মনে মনে ভেবে নেবে আমার এই পুষ্পপ্রীতিও পুষ্পধনুরই কারসাজি।

যা হোক, সদরে কড়া নাড়ার শব্দে হাত ধুয়ে গায়ে একটা গেঞ্জি চড়িয়ে আমি নিজেই গিয়ে দরজার খিল খুলে দিলাম। জয়ন্তীকে দেখে বললাম 'কি ব্যাপার, আপনি যে এখানে!'

ততক্ষণে মনোরমা—আমার স্ত্রী ধোপার হিসেব স্থগিত রেখে দরজার কাছে চলে এসেছে। বললাম, 'কি দরকার বলুন।'

আমার স্ত্রী একটু ধমকের সুরে বলল, 'আগে ওঁকে ভিতরে আসতে দাও। দরকার অদরকার পরে শুনবে। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলবে নাকি।'

মনোরমা মৃদু হেসে তাকে প্রথমে বাইরের ঘরে এসে বসাল।

জয়ন্তীর এই প্রথম দিনের আসাটা আমি তেমন পছন্দ করিনি। স্কুলের ছাত্র হোক, শিক্ষক হোক, শিক্ষয়িত্রী হোক, কোন কাজের জন্যে কেউ আমার বাসায় আসতে পারবে না, এইরকম একটা নিয়ম আমি বেঁধে দিয়েছিলাম। অফিসের কেরানিগিরিতেই ঘণ্টা সাতেক কাটে। তারপর আছে আমার স্ত্রীর ভাষায় মোষ চরাবার ক্ষেত্র। এরপর যদি হাটের ভিড় ঘরের মধ্যে টেনে আনি তবে ঘরণীর প্রাণ বাঁচে না সে বিবেচনা আমার ছিল। স্কুলের একটা রুম আমি নিজের জন্যে ঠিক করে নিয়েছি। সকালে হোক, সন্ধ্যায় হোক, যখনই সময় পাই সেখানে গিয়ে বসি। নিজে কাজকর্ম করি, অন্যের কাজকর্মের হিসাব নিই, একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের নালিশ শুনি, বিচার করি, বিবাদ মিটাই। তাই কোন দরকার নিয়ে, দরবার নিয়ে আমার বাড়িতে আসা সকলের পক্ষেই নিষেধ ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। শুধু দুর্নামের ভয়ে নয়! ওদের একবার পথ ছেড়ে দিলে তুমি নিজে আর পথ পাবে না।

কিন্তু আমি হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করলে কি হবে, মনোরমা তাকে একেবারে আত্মীয়কুটুম্বের মত ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যতক্ষণ না স্বার্থে আঘাত লাগে ততক্ষণ মেয়েদের মত মেয়ে-প্রেমিক আর কেউ নেই। দুটি মেয়ের মধ্যে এক মিনিটে যে বন্ধুত্ব জন্মে দুজন পুরুষের সেখানে পৌঁছাতে এক যুগ চলে যায়।

জয়ন্তীর আসবার কারণটা আমি মনোরমার মুখেই সবিস্তারে শুনলাম। জয়ন্তী আশ্রয় চায়। ওর বাপ মা অনেক আগেই মারা গেছেন। নিকট সম্পর্কের খুড়ো, জ্যেঠা, মামা, মেসো কেউ নেই। দূর সম্পর্কের এক দাদার কাছে এতদিন ছিল। কিন্তু সেখানে বউদির বাপের বাড়ির লোকজন এসে পড়ায় আর জায়গায় কুলোচ্ছে না। তাই জয়ন্তীর অবিলম্বে ও বাসা ছেড়ে আসা দরকার।

আমি বললাম, 'এর জন্যে এত কষ্ট ক'রে আপনি এখানে আসতে গেলেন কেন। আপনাদের স্কুলের টিচারদের মধ্যে সবাই তো আর নিজেদের বাড়ি থেকে আসেন না। কেউ কেউ হোস্টেল বোর্ডিং থেকেও আসেন, আপনি তাঁদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারতেন।'

জয়ন্তী বলল, 'নিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও কোন সিট খালি নেই। সবাই বলল আপনাকে বলতে, আপনি চেষ্টা করলে—'

হেসে বললাম, 'যেখানে সিট নেই আমার চেষ্টায় সেখানে সিট তৈরী হবে, আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারী হলেও অমন অসাধারণ ক্ষমতা আমার নেই। নিজের সাধ্যের সীমা আমি জানি।'

জয়ন্তী আমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। আমার কাছ থেকে এতখানি রূঢ়তা ও যেন আশা করেনি। হাসিমুখে কথাগুলি বললেও আমি যে খুশী হইনি তা ও বুঝেছে, আমিও বুঝাতে চেয়েছি।

কিন্তু পরমুহূর্তে জয়ন্তী ফের মুখ তুলল, 'এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটা প্রস্তাব ছিল।'

বললাম, 'বলুন।'

জয়ন্তী বলল, 'একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যদি মেয়েদের জন্যে একটা হোস্টেল ক'রে দেন, আমরা কয়েকজন টিচার ছাত্রী মিলে সেখানে থাকতে পারি।'

হেসে বললাম, 'অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়ার মত অবস্থা আমাদের স্কুলের নয়। বেশির ভাগ গরীব ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে পড়তে আসে। টিচাররাও সেই রকম। মাইনে যা পান, ঘরসংসারের জন্যে খরচ করেন। সব টাকা নিজের জন্যে ব্যয় করতে পারেন এমন আর ক'জন ?'

জয়ন্তী বলল, 'সবই নিজের জন্যে খরচ করতে কেউ কি চায় ? তা যারা করে নেহাৎই বাধ্য হয়ে করে।'

ওর স্পষ্ট কথা বলবার ধরণ দেখে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু না, ঔদ্ধত্য নয়, দম্ভ নয়, ওর কথার মধ্যে বরং একটু করুণ সুর ছিল। ওর যে সংসারে কেউ নেই সে কথা আমার ফের মনে পড়ে গেল। খোঁচা দেওয়াটা সঙ্গত হয়নি সেকথা নিজের কাছে নিজে স্বীকার করলাম। একটু লজ্জাও যে না পেলাম তা নয়।

একটু বাদে জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল. বলল, 'আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করলাম। এবার যাই।'

কিন্তু মনোরমা তাকে অত সহজে যেতে দিল না। জোর করে বাড়ির ভিতরে ধরে নিয়ে গেল। খাবার আর চা করে খাওয়াল।

খানিক পরে ও যখন বাইরে এল দেখি, একটি রক্ত গোলাপ ওর হাতে।

মনোরমা আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'জয়ন্তী তোমার টবের বড় বড় গোলাপগুলির খুব প্রশংসা করেছিল। একটা দিলাম ওকে।'

জয়ন্তী মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি তো দিলেন বউদি, কিন্তু শৈলেশদা হয়ত মনে মনে খুব রাগ করছেন।'

মনোরমা বলল, 'রাগ যদি করে থাকেন সেটা বাইরের। মনে মনে নিশ্চয়ই রাগের উল্টোটাই হচ্ছে।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কি যা তা বকছ।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্তী বিদায় নিল। আমি ভরসা দিয়ে বললাম, 'আপনার সিটের জন্য চেষ্টা করে দেখব।'

জয়ন্তী বলল, 'না না আপনি আর আমার জন্যে সময় নষ্ট করতে যাবেন না। আপনার সময়ের দাম অনেক। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম বলে ভারি লজ্জা হচ্ছে।'

জয়ন্তী চলে গেলে আমি স্ত্রীকে বললাম, 'মাঝে মাঝে তুমি বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যাও। আমি সেক্রেটারী আর ও আমার স্কুলের সাধারণ একজন টিচার। ওর সামনে ঠাট্টা তামাসা করা কি ভালো। তাছাড়া আমাদের টবের গোলাপ ওকে কেন দিতে গেলে।'

মনোরমা মুখটিপে হাসল, আহা তাতে কি আর হয়েছে। তুমি তো আর দাওনি। আমিই দিয়েছি। তুমি নিজের হাতে দিতে পারলে বোধ হয় আরো ভালো লাগত।'

আমি রাগ করে বললাম, 'দেখ রমা তোমাকে হাজার দিন বলেছি, স্কুলের টিচারদের নিয়ে ও ধরনের বাজে রসিকতা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আমার সে ধাত নয়।'

মনোরমা বলল, 'আহা চটছ কেন ? আমার কি পাঁচজন দেওর আছে না ননদ আছে যে তাদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করব। ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রও তুমি আবার ঠাট্টা তামাশার পাত্রও তুমি। যাই বল, তোমার পছন্দ আছে। জয়ন্তী সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ফর্সা রঙ, দোহারা গড়ন, মুখ খানা লক্ষ্মী-প্রতিমার মত। মাথায়ও একগোছা চুল আছে।'

হেসে বললাম, 'তুমি দেখি ওর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে!'

মনোরমা বলল, 'আহা, পঞ্চমুখ হতে বুঝি কেবল তোমরাই জানো, আমরা জানিনে। দেখ, নিজে কালো কুচ্ছিৎ বলে কি হবে, সুন্দরী কোন মেয়েকে দেখলে আমারও ভালো লাগে ; তোমাকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি আমার তাতে হিংসেও হয় না, ঈর্ষাও হয় না। শুধু একটু আফসোস হয়—'

আমি বললাম, 'বাজে কথা রেখে এক কাপ চা করে আন তো।'

তুমি আমার স্ত্রীকে অনেকবার দেখেছ উমাপদ। তার চেহারা খারাপ একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু গায়ের রঙ নয়, শুধু নাক মুখের চ্যাপটা গড়ন নয়—কয়েক বছরের মধ্যে ও বেমানান রকমের মোটা হয়ে পড়েছে। ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও কিছু করতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর রূপের অভাব নিয়ে আমাকে কি কোন দিন হায় হায় করতে শুনেছ? আজই না হয় বয়স গেছে কিন্তু বয়স যখন ছিল স্ত্রীর কুরূপ নিয়ে আমি তখনও কোনও আফসোস করিনি। আমি নিজেও তো কন্দর্পকান্তি নই। রূপ থাকা না থাকাটা নেহাৎই আকস্মিক ব্যাপার। তার ওপর আমার যেমন হাত নেই, আমার স্ত্রীরও তেমনি। তাছাড়া স্ত্রীর কুরূপ প্রথমেই দু'চারদিন যা চোখে লাগে। তারপর সব সয়ে যায়। তার দোষগুণ, শ্রী আর কুশ্রীতা সব আমরা মেনে নিই। যেমন বাপ, মা, মাসী, পিসীর চেহারা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনে, তাঁদের গায়ের রঙ কি মুখের গড়ন নিয়ে নালিশ করিনে, স্ত্রীর বেলায়ও আমাদের তেমনি একটা সহনশীলতা জন্মে। কয়েক বছর একটানা বউ নিয়ে ঘর করার পর মনে হয় তাকেও যেন জন্মসূত্রেই পেয়েছি। তাই মনোরমা যে সত্যিই মনোরমা নয় তা আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম, ভুলেই যেতাম। কিন্তু সে নিজেই বার বার আমাকে মনে করিয়ে দেয়। মেয়েদের যেমন হাতের লেখা নিয়ে লজ্জা জানানোর অভ্যাস আছে, মনোরমারও তেমনি নিজের চেহারা নিয়ে বিনয় করবার অভ্যাস বড় বেশি। অন্যদিন আমি তাতে বড় একটা কান দিইনে, কিন্তু সেদিন তফাৎটা বড় চোখে পড়ল। মনোরমা আর জয়ন্তী যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল আমার অবাধ্য চোখ বারবার জয়ন্তীর মুখের উপর গিয়েই পড়ছিল। তোমারও পড়ত, এটা রূপের সহজ আকর্ষণী শক্তি। জানা শোনা একটা হস্টেলে জয়ন্তীর জন্যে সিট শেষ পর্যন্ত আমিই ঠিক ক'রে দিলাম। সেদিন একটি নিরাশ্রয়, আত্মীয় স্বজনহীন মেয়ের ওপর আমি বিনা কারণে রূঢ় হয়ে উঠেছিলাম, এ যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত। ভবানীপুর অঞ্চলে ছোট একটি মেয়েদের হস্টেল। জন আট দশ মেয়ে সেখানে থাকে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিসেস চ্যাটার্জীকে বোধহয় তুমিও চিনবে। কংগ্রেস মহলে নাম আছে। একসময় খুব কাজকর্ম করেছেন। আমি জয়ন্তীর কথা বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

জয়ন্তীও থাকবার জায়গা পেয়ে খুব খুশী। স্কুলে আমার সেই অফিসরুমে এসে বলল, 'আপনি আমাকে বড় একটা দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করলেন। এত কষ্ট কেউ কারো জন্যে করে না।'

ওর কৃতজ্ঞতা জানাবার ভঙ্গিতে একটু আতিশয্য একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার আগ্রহ ছিল। আমি তা আমল না দিয়ে সেক্রেটারী সুলভ গম্ভীর গলায় বললাম, 'স্কুলের ইন্টারেস্টে আমাকে এসব করতে হয়।'

জয়ন্তী আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'আমি তা জানি। আপনি যা করেন, স্কুলের জন্যেই করেন।'

ও চলে যাওয়ার পর আমি ভাবলাম, ওর কথার মধ্যে কেমন একটু অভিমানের সুর মিশে আছে। আর রূপবতী তরুণী মেয়ের অভিমান বড়ই সুন্দর। কথাটা যদি একটু ঘুরিয়ে বলতাম, 'আপনারা আমার স্কুলের টিচার, আপনাদের জন্যে করব না তো কাদের জন্য করব,' তাহলে সেক্রেটারীর মর্যাদা থাকত, আবার মেয়েটিকে খুশী করা হ'ত। আর তাতে মহাভারতও এমন কিছু অশুদ্ধ হত না। আমি তো দেখেছি একটু হাসি মুখে কথা বললে, মাঝে মাঝে ডেকে একটু উৎসাহ দিলে পুরুষ টিচারই হোক আর মেয়ে টিচারই হোক সবাইকে দিয়েই কাজ বেশি আদায় হয়।

কাজকর্মে জয়ন্তীর সুনাম আরও বাড়তে লাগল। আমার বিনা সুপারিশেই হেডমিস্ট্রেস মিসেস সেনগুপ্ত ওকে ওপরের ক্লাসগুলিতে পড়াতে দিলেন। যেমন নিচে, তেমনি ওপরে সব জায়গায় জয়ন্তীর জয় জয়কার। শুধু পড়ানো নয়, স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আর ফাউণ্ডেশন ডে—এই দুদিনের ফাংশনের নেতৃত্ব প্রায় জয়ন্তীই করল। ঘর সাজানো থেকে শুরু করে মেয়েদের দিয়ে গান আবৃত্তি আর নাট্যাভিনয় সব ব্যাপারেই জয়ন্তীর পরিকল্পনা, জয়ন্তীর হাত রইল। প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'শৈলেশবাবু, আপনাদের স্কুলে আমি আগেও তো এসেছি। কিন্তু এবারকার মত এত সুন্দর ফাংশন কখনও হয়নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনাদের এখানে নতুন কেউ এসেছে, সবাইর মধ্যে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার লেগেছে।'

আমাদের স্কুল কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মধুবাবু তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক এমনই জোয়ার লেগেছিল শৈলেশবাবু যখন এই স্কুলটা নিজের হাতে নেন, সেই জোয়ারের জোর এবার আরো বাড়ল। আপনি বাইরে থেকে খেটেছেন, এবার ভিতর থেকে কাজ করবার একজন এসেছেন শৈলেশবাবু। এমনি যদি চলতে থাকে দু'বছরেব মধ্যে আমরা স্কুলটাকে কলেজ করে ফেলতে পারব।'

হেসে বললাম, 'আপনাদের উৎসাহ থাকলে তাতো পারাই যায়।'

ফাংশনের দু'তিনদিন পরে জয়ন্তী ফের আমাদের বাসায় দেখা করতে এল। আমি এবার আব গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে নয় হাসিমুখেই ওকে অভ্যর্থনা জানালাম। বললাম, 'সব জায়গাতেই আপনার সুখ্যাতি শুনতে পাচ্ছি।'

জয়ন্তী আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছেন বউদি অন্যের মুখে শুনেছেন তবু উনি নিজের মুখে কোন প্রশংসা করছেন না। ভয় আছে পাছে মাইনে বাড়াবার দাবি করি।'

সাধারণত কোন টিচার আমার সামনে অমন চটুল ভঙ্গিতে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু জয়ন্তীর এই প্রগলভতায় আমি অখুশী হলাম না বরং ভালোই লাগল। মনে হ'ল আজকালকার মেয়েরা তো ভারি চমৎকার ক'রে কথা বলতে জানে। সেবার জেলে বসে তোমাদেরই যেন কোন এক লেখকের গল্পে পড়েছিলাম, মাতৃভাষা আরো মধুর হয়ে ওঠে প্রিয়ার মুখে। নতুন নতুন ব্যঞ্জনা পায় প্রিয়ার ভাষায়। লেখকের সেই প্রিয়া প্রশস্তিকে তখন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ যেন করতে ইচ্ছে হল।

সেদিনও ছুটির দিন। জয়ন্তী সারাদিন আমাদের ওখানে রইল। আমার ছেলে ঝণ্টু রণ্টুকে ডেকে আলাপ করল, আমার মেয়ে মঞ্জুব সঙ্গে বসে লুডো খেলল। আমার স্ত্রীর সাথে রান্নাঘরে গিয়ে জোগান দিতে লাগল, এমন কি দু'এক পদ রেঁধেও নামাল।

অনাথ আশ্রমেব ব্যাপারে আমার বেরোবাব কথা ছিল। কিন্তু ভাবলাম, 'একটা দিন না হয় একটু বিশ্রামই নিই। তাওতো শরীরের পক্ষে দরকার। তাছাড়া শুধু ছুটোছুটি করলেই কি কাজ হয়। চিন্তা ও পরিকল্পনার জন্যে মাঝে মাঝে এক জায়গায় দাঁড়ানো দরকার, বসা দরকার।

আশ্রমের জন্যে নতুন একটা এইড কি করে আনানো যায় বসে বসে তাই ভাবছি, জয়ন্তী এসে উপস্থিত। স্নান সেবে চাঁপা ফুলের বঙেব একখানা শাড়ি পরেছে। পিঠে ভিজে চুলের রাশ। এসেই টিপ ক'রে আমাকে এক প্রণাম। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একি, একি!'

মনোরমা সঙ্গেই ছিল। জয়ন্তী মৃদু হেসে তার দিকে তাকাল।

মনোরমা বলল, 'আজকে জয়ন্তীব জন্মদিন, তাই—'

আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, 'তাই নাকি! কথাটা আগে বলতে হয়।'

মনোরমা হেসে বলল, 'আগে বললে, এর চেয়ে বেশি সমারোহটা কি করতে শুনি। বাদ্য আনতে না বাজি পোড়াতে? আমি ভালো বাজার করিয়েছি, ভালো করে রেঁধেছি, জয়ন্তীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি। তুমি কি কি করতে বল না।'

আমাকে নিরুত্তর করে দিয়ে মনোরমা ঘর থেকে চলে গেল।

জয়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'সভাসমিতিতে যত বক্তৃতাই দিন, বউদির সঙ্গে কথায় পেরে উঠবেন না।'

বললাম, 'কার সঙ্গেই বা পারি।'

জয়ন্তী আমার দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। আমার এই পরাভব স্বীকারে ও খুশী হয়েছে।

জয়ন্তী হেসে বলল, 'আজ কিন্তু একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমার চেয়ে নেওয়ার আছে।'

আমি শুকনো মুখে বললাম, 'বলুন।'

তোমার কাছে গোপন করব না উমাপদ, ও যত হাসে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার মুখ তত শুকোয়, বুক তত কাঁপে।

জয়ন্তী বলল, 'ভয় নেই। ইনক্রিমেণ্টও নয়, প্রমোশনও নয়! আপনি আজ থেকে আমাকে

'তুমি' বলে ডাকবেন। আপনার মুখে আপনি কথাটা বড় বিশ্রী লাগে। আপনি বয়সে কত বড়।'

কথাটা আমার ভালো লাগল না। কত বড় মানেই, কত বুড়ো। কিন্তু আমি কি সত্যিই বুড়ো হয়েছি। আমার কাজ-কর্ম দেখে কেউ তো সে কথা বলে না, চেহারা দেখেও না। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'তা ঠিক। কিন্তু এখানে বয়সটাই তো একমাত্র কথা নয়। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের।'

জয়ন্তী বললে, 'অঙ্কের হিসেবটাই বুঝি সব। আমার কিন্তু মনে হয় অনেকদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা। বউদি তো একদিনেই আমাকে আপন ক'রে নিয়েছেন, আপনার ক'বছর লাগবে শৈলেশদা?'

হেসে বললাম, 'একশও হ'তে পারে, হাজারও হ'তে পারে।'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ, আমি ততদিন অপেক্ষা করে থাকব। ভেবেছেন কি? তাই বলে 'তুমি' কিন্তু আপনাকে আজ থেকেই বলতে হবে! 'আপনি' কথাটার মধ্যে কেবল ভদ্রতা আছে। আত্মীয়তাও নেই, আপনত্বও নেই। কেবল পর পর দূর দূর ভাব। শব্দটাই আমাদের ভাষা থেকে তুলে দেওয়া উচিত।'

বললাম, 'না, একেবারে তুলে দিলে অসুবিধে আছে। আচ্ছা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম।'

জয়ন্তী বলল, 'আজকের জন্মদিনে এই আমার বড় উপহার।'

মনোরমা রান্নাঘর থেকে এ ঘরে এল। হেসে বলল, 'জয়ন্তী কেবল উপহারেই কি আজ পেট ভরবে? বলি, নাওয়া-খাওয়া কি কিছু হবে না?'

বিকেল বেলায় জয়ন্তী যাওয়ার উদ্যোগ করল। সেই এলোচুলের রাশ বড় একটি খোঁপা করে বেঁধেছে। তাতে গুঁজে দিয়েছে সবুজ পাতা সুদ্ধ একটি রক্তগোলাপ। আমার টবের গোলাপ। আজ বোধ হয় মনোরামর কাছে না চেয়েই নিয়েছে, না বলেই ছিঁড়েছে। একবার ওর সেই খোঁপার দিকে চোখ পড়তেই আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তবু সেই গোলাপ-সুদ্ধ খোঁপাটি অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখে লেগে রইল, বলতে পারো বিঁধে রইল। আমি যেন নতুন ক'রে দেখলাম মেয়েদেব চুলের রঙ অন্ধকারের মত কালো, আর গোলাপের রঙ রক্তের মত লাল। কিন্তু অন্ধকারে যদি রক্ত ঝরে তবে কি কেউ দেখতে পায়?

জয়ন্তী যাওয়ার আগে আমাদের কাছে বলে গেল, হস্টেলের জীবন তার কাছে মোটেই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে কোন পরিবারের মধ্যে না আসতে পারলে তার মনে হয় জীবনটা যেন শুকিয়ে গেছে। আর আমাদের মত এমন একটি ভালো পরিবার, সুন্দর সুখী পরিবার জয়ন্তী কোন দিন দেখেনি।

মনোরমা বলল, 'বেশ তো তুমি মাঝে মাঝে এস। এসেই যেতে পারবে না, থাকতে হবে কিন্তু।'

তারপর অনেকদিনের মধ্যে কিছু ঘটল না। তোমাকে আগেই বলেছি উমাপদ, আমার এই গল্পে বাইরের রটনা যত বেশি, ঘটনা তাব তুলনায় অনেক—অনেক কম, বলতে গেলে কিছুই নয়। মাঝে মাঝে জয়ন্তীকে ডেকে স্কুল সম্বন্ধে দু'একটা পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছে যে আমার না হ'ল তা নয়, কিন্তু আমি জোর ক'রে তা চেপে রাখলাম। কি জানি মেয়েটি যদি প্রশ্রয় পায়, কি জানি যদি কোন কথা ওঠে। জয়ন্তী আমাদের বাসায় যাতায়াত করে সেইজন্যে এরই মধ্যে স্কুলে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। আমার তা কানে গেলেও আমি তাতে কান পাতিনি। কিন্তু নিজের সুনাম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল। নিজের ওই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সুনামটুকু ছাড়া আমাদের আর কি সম্বল আছে বল। আমার বিদ্যে কম, বুদ্ধি কম, শক্তি-সামর্থ্য কিছু নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে সেটুকু ওই কর্তব্যবোধ। আমি কাউকে ঠকাব না, সমাজের যেটুকু সেবা করব, তার বিনিময়ে একটি পয়সাও প্রত্যাশা করব না, এটুকু প্রশংসাও চাইব না—এই ছিল আমার সঙ্কল্প। দেখলাম মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। আমার কারবার যাদের সঙ্গে তারা সংখ্যায় বেশি নয়। কিন্তু তাই বলে তাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যে কম, দাম যে কম, তা বলি কি ক'রে!

জয়ন্তীকে নিয়ে গুঞ্জন যতই উঠুক দুদিনেই তা মিলিয়ে গেল। পাড়ার আরো পাঁচজনের ম ছে

ধমক খেলেন পরশ্রীকাতর কয়েকজন মিস্ট্রেস, আর ছোকরা কয়েকটি মাস্টার। কমিটির সেই দুজন মেম্বার ইলেকশনে এবার আর দাঁড়াতেই পারলেন না। কারণ ও অঞ্চলের সবাই আমাকে চেনে। আমি তো নেতা নই যে দূরে দূরে থাকব। আমি সকলের সঙ্গে মিশি, ছোট বড় সকলের ঘরে যাই, যতটুকু সাধ্য করি। আমি কর্মী, আমি স্বেচ্ছাসেবক। সেকালেও যেমন ছিলাম, একালেও তেমনি।

আমি গেলাম না, জয়ন্তী নিজেই এল এক আবেদন নিয়ে। বি টি পড়বে। স্কুল থেকে, ছুটি চায়, সুবিধে চায়। বললাম, 'বেশ তো পড়। টিচিং লাইনে যদি থাকতে চাও, বি টি-টা পাশ করে নেওয়াই তো ভালো।'

জয়ন্তী বলল, 'বাংলায় এম-এ টাও দিয়ে দেব ভেবেছি। মোটামুটি তৈরী আছে। কোনটা আগে দেব বলুন। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

হেসে বললাম, 'আমি কি করে বলব। নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে।'

জয়ন্তী বলল, 'তা নয়, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই আমাকে দিয়ে করাবেন। আপনাকে যখন পেয়েছি সহজে ছাড়ব না, আপনি যত রাগই করুন।'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে বি-টি-টাই আগে পড়ে নাও। এখন কোন টিচার ছুটিতে নেই। তোমাকে ছুটি দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। তা ছাড়া যা শক্ত যা নীরস সেই কাজই আগে সেরে রাখা ভালো।'

জয়ন্তী বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। নিজে যা ভাবি আর একজনেও যখন সেই কথাই বলেন তখন কি যে ভালো লাগে, আপনাকে তা বোঝাতে পারব না। আপনি তো আমার মত এমন আত্মীয়স্বজনহীন হয়ে একা একা থাকেননি।'

একবার ভাবলাম বলি, 'তুমিই বা কেন একা একা আছ জয়ন্তী। তোমারও তো বিয়ে থা করবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।' কিন্তু বললাম না। জয়ন্তী এগোতে পারে, কিন্তু আমি এগোব না। উঁচু আসনের বেদীতে আমাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। একজন সামান্য টিচারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল প্রকাশ করা চলবে না।

তারপর দু'বছর কি আড়াই বছরের মধ্যে জয়ন্তী বি-টি পাশ করল, এম এ পাশ করল। দুটোতেই ভালো রেজাল্ট হ'ল ওর। বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পেল। আশে পাশের স্কুল থেকে এমন কি দু' একটা কলেজ থেকে ওর ডাক এল। এল বেশি মাইনের প্রলোভন।

বললাম, 'জয়ন্তী, তোমার উন্নতির পথে আমি বাধা দিতে চাইনে। তুমি যদি ভালো চাকরি পাও, চলে যেতে পার। এখানে তো বেশি মাইনে তোমাকে দিতে পারিনে।'

জয়ন্তী বলল, 'শৈলেশদা, মাইনেটাই কি সব। এ স্কুলে আমি নিজের ইচ্ছে মত, নিজের খুশী মত কাজ করতে পারছি। অন্য স্কুলে এমন সুবিধে পাব না। তাছাড়া দশ বিশ টাকা বেশি পেয়ে কিই বা আমার এমন লাভ। টাকা দিয়ে আমি করব কি। যা পাচ্ছি তাতে আমার হস্টেলের খরচ চলে গিয়েও কিছু বাঁচে।'

বললাম, 'সেইটাই কি সব চেয়ে বড় কথা?'

জয়ন্তী বলল, 'না তার চেয়েও বড় কথা আছে। যেটা আপনার এই স্কুলের আদর্শ। আপনার স্কুল আরো পাঁচটা স্কুলের মত ব্যবসার জায়গা নয়। শিক্ষা এখানে দান, শিক্ষা এখানে ব্রত। এতদিনে আমি আমার কাজের ক্ষেত্র পেয়ে গেছি। আপনি তাড়ালেও আমি যাব না।'

জয়ন্তী গেল না। কিন্তু হেডমিস্ট্রেস অণিমা সেনগুপ্ত গেলেন। তিনি আরো বড় স্কুলে বেশি টাকার চাকরি পেয়েই গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় আমার দুর্নাম করতে ছাড়লেন না। আমি নাকি তাঁকে বাদ দিয়ে জয়ন্তীর পরামর্শেই স্কুল চালাচ্ছি। স্কুলের লাইব্রেরীটি জয়ন্তীর হাতে তুলে দিয়েছি, বাইরেরও ভিজিটর কেউ এলে তাকেই আগে এগিয়ে দিচ্ছি। সব জায়গায় জয়ন্তীর সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছি, মিসেস সেনগুপ্তর, কোন কৃতিত্বের কথা তুলছিনে। তাঁর কথাগুলি অসত্য নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটা অসত্য, ইঙ্গিতটা অসত্য। আমি জয়ন্তীর ওপর পক্ষপাত করিনি, যোগ্যতাকেই মর্যাদা দিয়েছি। এ সব কানাঘুষোয় আমার রোখ বেড়ে গেল, জেদ বেড়ে গেল। মিসেস সেনগুপ্ত চলে গেলে আমি কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিয়ে হেডমিস্ট্রেস হিসেবে জয়ন্তীর নাম সুপারিশ করলাম।

দু-একজন মৃদু আপত্তি করলেন। একজন বললেন, 'শত হলেও বাংলায় এম-এ।' আর একজন বললেন, 'সবে মাত্র পাশ করেছে।' আমি বললাম, 'পাশ করবার চেয়েও বড় কাজ করবার যোগ্যতা আর আন্তরিকতা। জয়ন্তীর এই দুইই আছে।' কমিটিতে আমার দলের লোকই বেশি। তাই বিপক্ষেরা তেমন সুবিধে করে উঠতে পারলেন না।

চার্জ বুঝে নেওয়ার আগে জয়ন্তী বলল, 'এ কি ভালো হল?'

বললাম, 'খুবই ভালো হল। তুমি কোন দ্বিধা বোধ না। শুধু ভালো ক'রে কাজ করে যাও।'

দুর্ণামকে ভয় করি। কিন্তু যা কর্তব্য বলে মনে করি তা করব না! মিথ্যে অপবাদের ভয়ে যদি পিছু হটতে শুরু করি তাহলে তো ইঁদুরের গর্তে ঢুকেও রেহাই পাব না।

এ ব্যাপারে মনোরমা কিন্তু মোটেই খুশী হল না। একদিন রাত্রে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোলে আমাদের মধ্যে এই নিয়ে কথান্তর শুরু হল। মনোরমা বলল, 'ওকে তুমি আটকে রেখেছ কেন।'

আমি বললাম, 'আটকে রেখেছি, না জয়ন্তী নিজেই এই স্কুলে রয়ে গেছে।'

মনোরমা বলল, 'থাকবেই তো। পুরোন হেডমিস্ট্রেসকে সরিয়ে ওকে কর্ত্রী বানিয়ে দিয়েছ, এবার পুরোন স্ত্রীকে সরিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে এলেই হয়।'

হেসেই কথাগুলি বলল মনোরমা; কিন্তু সে হাসিতে মনের জ্বালা ঢাকা পড়ল না।

বললাম, 'তোমাকে তো বলেছি এ সব তামাশা আমি পছন্দ করিনে।'

মনোরমা বলল, 'দুদিন সবুর কর, তামাসাটাই আসল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

আমি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলাম।

কিন্তু তারপরেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনোরমা এই নিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগল। পরে জেনেছিলাম তার কান ভারি করবার জন্যে স্কুলের আরো দু'একজন মিস্ট্রেস পিছনে লেগেছিলেন।

এ সব ব্যাপারে মেয়েদের ঈর্ষা যে কি ভয়ানক, কি দুঃসহ আর দুর্বিষহ সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা হয়ত নেই উমাপদ কিন্তু নাটক নভেলে নিশ্চয়ই অনেক বর্ণনা পড়েছ। আমিও পড়েছি কিছু কিছু। এতদিন বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কোন যুক্তি নেই, কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মেয়েরা যা বিশ্বাস করবে, তার থেকে তুমি ওদের একচুলও নড়াতে পারবে না। বেশি বলে কাজ কি, এককথায় মনোরমা আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। এমন দিন যায় না যেদিন এই নিয়ে কথা না ওঠে। এমন রাত যায় না যেদিন এই ব্যাপার নিয়ে ও আমাকে খোঁটা না দেয়, খোঁচা না দেয়। রাত্রে ফিরতে একটু দেরি হলে ও বলে, 'কি দুজনে মিলে সিনেমায় গিয়েছিলে নাকি, না থিয়েটার? লেকে না ইডেন গার্ডেনে?' অথচ মনোরমা নিজেই জানে, ওসব শখ আমার কোন কালেই নেই। শখ করবার সময়ই হয়নি জীবনে। সেকথা বললে মনোরমা জবাব দেয়, 'তোমার তো নতুন জীবন শুরু হয়েছে।'

তা এক হিসেবে কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি নতুন জীবনের স্বাদ আমি পাচ্ছিলাম। কিন্তু তা লেকে, গার্ডেনে, সিনেমায়, থিয়েটারে নয়! নিজেরই কাজের জায়গায়, নিজেরই কাজকর্মের মধ্যে। অফিসে খাটি, স্কুলের জন্যে খাটি, রেফিউজীদের কলোনীতে একটা নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আমার ডাক পড়ল। এসব কাজে উৎসাহ উদ্যমের অভাব আমার মধ্যে কোনদিনই ছিল না। কিন্তু এবার যেন তা দ্বিগুন বেড়ে গেল। স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, পাশের হার বাড়ল, মেয়েদের সেকশনে একটা জেনারেল স্কলারসিপ পর্যন্ত পেল, যা স্কুলের ইতিহাসে কোনদিন ঘটেনি। আমি টিচারদের মাইনের গ্রেড বাড়িয়ে দিলাম। হেডমাস্টার, হেডমিস্ট্রেসের মাইনে হল দু'শ। ধারে কাছে কোন স্কুলে অত দেয় না। কেউ কেউ কানাকানি করল, এই বেতন বৃদ্ধি জয়ন্তীর জন্যে। যারা আমার দলে ছিল তারা বলল, তা যদি হয় ক্ষতি কি? সুবিধে কেবল জয়ন্তী পাচ্ছে না, সবাই পাচ্ছে। নিজের কৃতিত্ব বাড়িয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়ে আমি আমার স্ত্রীর উপর শোধ নিলাম, শত্রুদের মুখে ছাই দিলাম।

হ্যাঁ, জয়ন্তীর সঙ্গে দিনান্তে কি দিনের সকালে [illegible] একবার করে দেখা হয়, কথা হয়। কিন্তু সেকথা প্রায়ই কাজের কথা। স্কুলের আরো উন্নতি কি ক'রে হবে সেই কল্পনা, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমি খানিকক্ষণ আলাপ করি। সে সব আলাপ শেষ হয়ে গেলে জয়ন্তী হয়ত বলে, 'আপনার

বিরুদ্ধে কিন্তু আমার দারুণ নালিশ আছে। কেবল খাটছেন, শরীরের দিকে মোটেই তাকাচ্ছেন না।'

তোমার কাছে অস্বীকার করব না উমাপদ, ভারি মধুর লাগত কথাগুলি। মনে হ'ত জীবনে এই—এই প্রথম একটি মেয়ের মুখে ওসব কথা শুনছি। অথচ মনোরমা যে কত হাজারবার হাজারভাবে আমার শরীরের জন্যে উদ্বেগ জানিয়েছে তা সেই সব মুহূর্তে একবারও মনে পড়ত না। জয়ন্তীর কথার জবাবে আমি হেসে বলতাম, 'নিজের শরীরের দিকে নিজে তাকালে এই সব অনুযোগ শুনবার সুযোগ কি হত ?'

জয়ন্তীও হাসত, 'তলে তলে এত। এত সব কাজকর্ম বুঝি সেই জন্যেই।'

কখন যে আমার সেই উঁচু আসন থেকে আমি ওর সমতলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তা টেরও পাইনি কিংবা টের পেলেও উঁচু বেদীতে উঠে বসবার মত আমার যেন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। জয়ন্তী যদি আমার সহকর্মী, সহমর্মী আর সমব্যথী হয় তাহলে সমবয়সীই বা কেন হবে না ? দৈবক্রমে কয়েক বছর আগে জন্মেছি বলে ? সেই আকস্মিকতার বাধাটাই কি বড় বাধা ?

এই সময় আমাদের দেখাসাক্ষাতের আরো একটা বাধা ঘটল। জয়ন্তী বলল, 'আমি এম এড্ পড়ব। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

এ বাধা ঠিক অকস্মিক নয়, এ আমাদের দুজনের মিলিত সৃষ্টি। আমিই ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। টিচিং লাইনেই যখন আছে জয়ন্তী, থাকবেও, তখন নিজের যোগ্যতা ও আরও বাড়িয়ে তুলুক। কলকাতায় এম, এড এর কোর্স দু'বছরের, দিল্লীতে একটা শর্ট কোর্স আছে। ন'দশ মাস লাগে।

জয়ন্তী বলল, 'আমি দিল্লীতেই পড়ব। বয়স হয়ে গেছে এখন কি আর পড়াশোনায় মন লাগে। আপনি দিল্লীতেই একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

আমি বললাম, 'দিল্লী যে বহুদূর।'

জয়ন্তী বলল, 'টালীগঞ্জ থেকে ভবানীপুরের দূরত্বই কি কিছু কম ? আপনি তো সেই পথটুকুও পাড়ি দিতে পারলেন না। একদিনও এলেন না আমাদের হস্টেলে।' তারপর একটু হেসে বলল, 'দিল্লীই ভালো। এই উপলক্ষে বেশ একটু বেড়ানো হবে।'

বেড়ানোটা যেন ওর একার নয়, আর একজনেরও।

আমিই সব ব্যবস্থা করে দিলাম। সরকারী মহলে ঘোরাঘুরি করে একটা মোটা স্টাইপেণ্ড পাইয়ে দিলাম ওকে। ছুটি দিলাম স্কুল থেকে। তারপর যাওয়ার দিন হাওড়া স্টেশনে ওকে তুলে দিতে গেলাম। একবার বললাম, 'তোমার কোন বন্ধুবান্ধবকে খবর দিলে না ?'

ট্যাক্সিতে ও আমার ঠিক পাশেই বসেছিল। কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়ে ও জবাব দিল, আমার কোন বন্ধুও নেই, বান্ধবও নেই।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বন্ধু থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল।'

জয়ন্তী বলল, 'কী জানি। পুরুষদের বিশ্বাস করা বড় শক্ত। তারা বড় ছোট, বড় হীন। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম দেখলাম আপনি। আপনার মধ্যে এমন একজনকে পেলাম যাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করতে পারি, সমস্ত মন দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারি।'

খুব কাছাকাছি বসেছিলাম আমরা। ওর শরীরের ছোঁয়া আমার শরীরে লাগছিল, ওর দেহের উত্তাপ লাগছিল আমার শরীরে। আমি হয়ত সেই মুহূর্তে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে পারতাম। কিন্তু শ্রদ্ধা। ওই একটি শব্দে আমি হিম হয়ে গেলাম। হিমালয়ের মত স্থাণু হয়ে রইলাম।

ট্যাক্সি থেকে ট্রেন। দিল্লী মেলের একটা ইন্টারক্লাস কামরায় আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্পও করল। আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস নীরজা নন্দীকে ও সব বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঠিক করে এসেছে। তাকে দিয়ে কাজ চালাতে কোন অসুবিধে হবে না। তারপর হেসে বলল, 'কিন্তু দেখবেন, আমার জায়গা যেন ঠিক থাকে। এরই মধ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করে ফেলবেন না যেন।'

আমি বললাম, 'স্থান শূন্য হলে তবে তো ফের পূরণ করার কথা ওঠে।'

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। আমি নেমে আসছি, হঠাৎ জয়ন্তী নিচু হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিল।

আমি বললাম, 'আঃ আবার ওসব কেন। তুমি তো জানো ওই প্রণাম-ট্রনাম আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

জয়ন্তী আমার দিকে হেসে তাকাল, 'খুব করেন। প্রণাম আর সুনাম ছাড়া আপনারা কি আর কিছু চান ?'

গাড়ি ছেড়ে দিলে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি সেই চলন্ত গাড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। জয়ন্তী কি আমার দ্বিধা সংকোচ, আমার প্রৌঢ় বয়সের হিসেবী মনকে সত্যিই তিরস্কার করে গেল ? সুনাম। সুনাম চাইনে একথা কি বলতে পারি ? সুনাম কে না চায় ! চোর, জুয়াচোর অতি বড় লম্পটও এই সুনামের কাঙাল। সাধুর বেশ ধরে সে নীতিবাদীদের এই সামাজিক সুনাম চুরি করতে চায়। জানো উমাপদ, একজন লম্পটই আর একজন লম্পটকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, বেশি ব্যঙ্গ করে। একজন মাতাল আর একজন মাতালের কাছে উপহাসের পাত্র। মদ আর মেয়ে সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে যার দুর্বলতা যত বেশি আর একজন দুর্বলের ওপর সে তত বেশি খাপ্পা। কিন্তু যদি এই গোপনতা ওরা ঘুচিয়ে দিতে পারত, যদি একজোট হয়ে বলতে পারত—আমরা যা করছি বেশ করছি, তাহলে এই গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে এরাই সমাজ ও সরকার গঠন করত। হ্যাঁ, এই চোর, জোচ্চোর বদমাস মাতালের দল। দলে তো এরাই ভারি। তাহলে আর ঢাক ঢাক চুপ চুপের দরকার হত না। আইন তৈরী করত এরা, নীতিশাস্ত্র এরা নতুন করে লিখত। চৌর্য সামাজিক সমর্থন পেত। তাহলে সামাজিক মানুষের বুকের মধ্যে পরম অসামাজিক জীব এমন করে বাস করতে পারত না, এমন করে দিনরাত তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে পারত না। কিন্তু চরিত্রহীনদের আসল হীনতা কোথায় জানো ? নীতিবাগীশদের নীতির কাছে তারাও মাথা নোয়ায়।

ফিরে এলাম বাড়িতে। বেশ একটু রাতই হল ফিরতে। মনোরমা বলল, 'আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ওর সঙ্গে দিল্লী পর্যন্তই গেলে। গেলেই পারতে। এই কটা মাস আর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হত না।'

আমি আরও ধারালো বিদ্রূপে বললাম, 'এখানকার মিলনের যন্ত্রণাও তো কম নয়। বিষে বিষে বিষক্ষয় হয়।'

মনোরমা বলল, 'ও। আমি বুঝি আজকাল তোমাকে কেবল যন্ত্রণাই দিই ? আমাকে বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি। তোমার সব যন্ত্রণা মিটুক।'

আমি জবাব দিলাম, 'বিষ খেয়ে যারা মরে, তারা কারো এনে দেওয়ার অপেক্ষা করে না। খেতে হয় খেলেই পার।'

গিয়েই জয়ন্তী পৌঁছ সংবাদ দিল। প্রথমে পোস্টকার্ড আমার বাসায় ঠিকানায়। বউদিকে প্রণাম জানিয়েছে, আর ছোটদের স্নেহাশিস। আমি জবাব দিলাম সরকারী এনভেলপে। জয়ন্তী পাল্টা চিঠি দিল বেসরকারী রঙীন খামে। এবার আর বাসার ঠিকানায় নয়, সকুলের ঠিকানায় নয়, আমাদের ইনসিওরেন্স অফিসের ঠিকানায়। ওপরের খাম রঙীন, ভিতরের কাগজও রঙীন। চিঠির পর চিঠি। অবশ্য শুরুতে শ্রদ্ধাস্পদেষু পাঠ দিয়ে চিঠির শেষে জয়ন্তী যথারীতি প্রণতা কি বিনীতা হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝখানের কথাগুলি পড়লে মনে হয় এই পত্রালাপ যেন দুই বন্ধুর মধ্যে। তাতে অসম বয়স, অসম অবস্থার কোনরকম আভাস নেই। সে সব চিঠির কোনটিতে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা, কোনটিতে দিল্লীর আবহাওয়া আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা। বেশির ভাগ চিঠিরই কোন বিষয় থাকত না। যেন লেখার আনন্দে লিখে যাচ্ছে জয়ন্তী। লিখতে ভালো লাগছে, লিখতে ইচ্ছে করছে তাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এক এক চিঠিতে এক একটা মুড ধরা পড়ত। রোদ-বৃষ্টি, জ্যোৎস্না-আঁধার, শীত-গ্রীষ্ম কিসে ওর মনের কিরকম রূপান্তর হয় তা লিখে জানাতে ভালোবাসত জয়ন্তী। শহরতলীতে কি শহরের কাছাকাছি কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে খুঁটে খুঁটে তার বর্ণনা দিত। আর

মাঝে মাঝে লিখত, আমার মত মানুষ সে আর দেখেনি। কোন কোন চিঠিতে আমাকে দিল্লী যাওয়াব জন্যে আমন্ত্রণও জানাত। লিখত, বড় একা একা লাগে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে একেক সময়।

আমার চিঠি লেখার অভ্যাস ইদানীং প্রায় ছিল না। আমি বিবৃতি লিখি, খবরের কাগজের সম্পাদকের নামে খোলা চিঠি পাঠাই। স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরীর অর্থসাহায্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করি। ব্যক্তিগত চিঠি পড়া, ব্যক্তিগত চিঠি লেখা প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। কিন্তু জয়ন্তীর চিঠিগুলি আমার মনে নতুন আফসোস জাগিয়ে দিল। আমি তো কোনদিন ভাষাশিল্পের চর্চা করিনি। যদি করতাম, যদি লেখক হতাম তাহলে বোধ হয় ওর ওই সব চিঠির জবাব দিতে পারতাম। কথার আড়ালে মনের কথাকে কি করে আধখানা ঢাকতে হয়, আধখানা বলতে হয় সে ছলা কলা তো কোনদিন শিখিনি! যদি শিখতাম, তাহলে বোধ হয় জয়ন্তীর সে সব চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হত। যাই হোক, চিঠিতে আমি কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতাম না। কারণ 'শতং বদ মা লিখ', এই নীতি আমি মেনে চলতাম। মোটামুটি সাদামাঠা ভাষায় ছোটখাট চিঠিই লিখতাম। তবু সেই সব চিঠিও জয়ন্তীর ভালো লাগত। সে লিখে জানাত সারল্যের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য আছে আমার ভাষায়, আমার চিঠিতে। আন্তরিকতার, হৃদয়বত্তার যে উত্তাপ, সেই তাপ রয়েছে আমার মধ্যে। আমি লিখতাম, 'জয়ন্তী, তোমার ওসব প্রশংসা আমার কানে নিন্দার মত লাগে, আমার মনে ব্যঙ্গের মত বেঁধে। আমি মোটেই ভালো নই, মোটেই বড় নই, অনেক হীন, অনেক ছোট।' জয়ন্তী লিখত, 'আপনি মিথ্যে বিনয় করছেন। আপনি জানেন না যে আপনি কি। আপনি ভাবছেন এসব বুঝি আমার স্তুতি। তা নয়, এ আমার স্তব। তাতো আমি নিজে ইচ্ছে করে করিনে। আমার মুখ থেকে তো আপনিই বেরিয়ে পড়ে।'

তোমার মত দিল্লীতে আমারও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে উমাপদ। বড় বড় সরকারী চাকুরে। বেসরকারী কাজেও কেউ কেউ আছে। তাদের মধ্যে দু'একজন অনেকদিন থেকেই আমাকে দিল্লীতে যেতে বলেছিল। সে বলা মুখের বলা নয়, অন্তরের সাযও তাতে ছিল। তবু আমার যাওয়া হত না। একটা না একটা কাজে আটকা পড়ে যেতাম। সেবার পুজোর ছুটিতে খানিকটা সময় হল। ভাবলাম যাব নাকি! আসব নাকি একটু বেড়িয়ে। কিন্তু মনের এই ভাবনা মুখ ফুটে কোথাও প্রকাশ করবার আগেই আমাদের কমিটির এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বিজন ডাক্তার একদিন হেসে বলল, 'ওহে শৈলেশ, খেটে খেটে তোমার শরীর যে আধখানা হয়ে গেছে। যাও না, একটু চেঞ্জ-টেঞ্জ থেকে ঘুরে এস। এ সময় দিল্লী অঞ্চলের ক্লাইমেট বেশ ভালো। দু'এক সপ্তাহেই শরীর-মন সেরে যাবে।

বললাম, 'আমার শরীর মনের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না ডাক্তার। তুমি অন্য রোগীদের দেখ।'

যাওয়া হল না। গেলে দু'একটা দরকারী কাজও সেরে আসতে পারতাম, শুধু বেড়াতেই যেতাম না। কিন্তু গেলাম না।

মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতা বিজন ডাক্তারেরও আছে, আমি জানি। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটা ও-ই সবচেয়ে বেশি করত। মানুষ নিজে যখন প্রেমে পড়ে তখন তার মধ্যে মহিমা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু অন্যের প্রেমে পড়াটা তার কাছে আছাড় খেয়ে পড়ার সামিল।

দিল্লীর দূরত্বকে মেনে নিলাম। কিন্তু পুরী যাওয়ার সুযোগ ঘটল। এক বন্ধু যাচ্ছিলেন পুরীতে, তিনি বললেন, 'চলহে, দু'চার দিন একটু সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আসবে।' তিনি পরিবার নিয়ে যাচ্ছেন না। তাই আমারও সপরিবারে যাওয়ার কথা ওঠে না। কিন্তু মনোরমা শুনেই বেঁকে বসল। বলল, 'তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারব না। তোমার পুরীটুরী সব ভুঁয়ো। তোমার যাওয়ার মাত্র একটি জায়গাই আছে।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি কি আমাকে সেই বৃটিশ সরকারের মত নজরবন্দী করে রাখতে চাও? আমার ওপর তোমার এতই যদি অবিশ্বাস, আলাদা হয়ে থাকলেই পার। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখলেই পার।'

মনোরমা বলল, 'হ্যাঁ, এখন তো তুমি তাই চাও। তাইতো তোমার মনের ইচ্ছা।'

দিনভর খুব কথা কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাটি চলল।

আমি বললাম, 'তুমি যে সব কথা বলছ, যে সব দুর্নাম দিচ্ছ, আর কেউ হলে তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলত।'

মনোরমা বলল, 'জিব ছিঁড়ে আমাকে বোবা বানাতে পারবে নাকি? দেখনা ছিঁড়ে।'

আমি ভাবলাম কোন বাধাবন্ধন মানব না। সন্ধ্যার গাড়িতে সত্যিই পুরী চলে যাব। কিন্তু বিকেল বেলায় এক কাণ্ড ঘটল। দেখি মনোরমার সেই রুদ্রাণী মূর্তি আর নেই। মেঝের উপর উপুর হয়ে পড়ে ও কাঁদছে। আর ওর সেই কালো, বিপুল স্থূল দেহটা বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই কাঁপুনিতে আমার অন্তরের গভীরে হঠাৎ ভূমিকম্পের মত একটা ঝাঁকুনি লাগল উমাপদ। আমি আমার ঘরখানার চারিদিক তাকালাম। এলোমেলো অগোছালো ঘর। যেন সংসারের সব শ্রীছাঁদ নষ্ট হয়ে গেছে। অমনিতে আমার স্ত্রী বেশ সুগৃহিণী, সাজাতে, গুছাতে জানে। সব আসবাবপত্র, বিছানাপাটি পরিপাটি ক'রে রাখতে ভালোবাসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে ওর কোন কিছুতেই যেন মন নেই। যে ছেলেমেয়েগুলি ওর চোখের মণি তাদের দিকেও মনোরমা তাকাতে ভুলে গেছে। তাদের সমানে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সব হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার মত আমার দৃষ্টি এড়িয়ে এঘর থেকে ওঘরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশি বয়সে বিয়ে করেছি। ছেলেপুলে হয়েছে আরো বেশি বয়সে। তাই ওরা এখনো সবালক হয়ে ওঠেনি। তাহলে ব্যাপারটা ওরা সব বুঝতে পারত। কিন্তু সবটা না পারলেও ওরা খানিকটা খানিকটা যেন এখনই বুঝতে পারছে। এটুকু বুঝতে ওদের বাকি নেই যে, সব অশান্তির মূলে আমিই দায়ী। আমার জন্যেই ওদের মা কাঁদছে, কষ্ট পাচ্ছে। ওদের বোবা চোখে আমি সুস্পষ্ট অভিযোগ দেখতে পেলাম।—'কেন এমন হচ্ছে? ব্যাপারখানা কি?'

আমি আস্তে গিয়ে আমার স্ত্রীর পাশে বসলাম, আস্তে আলগোছে হাত রাখলাম ওর পিঠে। বললাম, 'রমা, কাঁদছ কেন, কেঁদ না।'

আমার এই সামান্য আদরে ঠিক একটি অল্পবয়সী মেয়ের মতই মনোরমা ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমি কাঁদব না তো সংসারে কাঁদবে কে। তুমি যাও, তুমি সুখী হও, তুমি সুখে থাক। আমি আর তোমাকে বেঁধে রাখতে চাইনে। কি দিয়ে বেঁধে রাখব। আমার কি আছে।'

আমি আমার মোটা খদ্দরের ধুতির কোচার খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'রমা, তুমি মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ।'

মনোরমা বলল, 'হয়ত তোমার কথা সত্যি। হয়ত সবই মিথ্যে। কিন্তু তোমাকে তো কুরূপা মেয়েমানুষ হয়ে সংসারে জন্মাতে হয়নি। তোমাকে তো আমার মত নির্গুণ, অশিক্ষিতা হয়ে থাকতে হয়নি। তুমি কি করে বুঝবে আমার মত মেয়ে স্বামী সংসার সব পেয়েও যে শান্তি পায় না, তাকে যে কেবলি হারাই হারাই ভয়ে থাকতে হয় সে কথা তুমি বুঝবে কি করে।'

আমার পুরী যাওয়া আর হল না। সারা সন্ধ্যাটা স্ত্রীর কাছে বসে রইলাম। আমার ছোট ঘরের মধ্যে বিশাল সমুদ্র আর তার অগুণতি ঢেউয়ের ওঠাপড়া অনুভব করতে লাগলাম।

একটু আগে তোমাকে বলেছি উমাপদ, সংসারে চোর জোচ্চর বদমায়েসের সংখ্যাই বেশি। সাহস থাকলে তারাই খোলাখুলি ভাবে রাজত্ব করত। কিন্তু কথাটা সত্যি নয় উমাপদ। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কি করে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেও যে আছে আধখানা করে সৎ, মহৎ আর ভালোমানুষ। তাদেরও যে আধখানা হিংসা, আধখানা অহিংসা। তারা নীতির কাছে মাথা নোয়ায় একথা মিথ্যে। তারাও প্রীতির কাছেই হৃদয় পাতে।

জয়ন্তীর কাছে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করলাম। ওর দু' তিন খানা চিঠির জবাবে আমি একখানা পোস্টকার্ড কোনবার দিই, কোনবার দিইনে। এ্যাকটিং হেডমিস্ট্রেসকে বলি জবাব দিতে।

তারপর জয়ন্তী এম-এড্ ডিগ্রী নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরে এল। ফিরে এসে দখল করল গদি। আমাকে নিরালায় পেয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম আমি আর ফিরব না।'

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'চিঠিপত্র বন্ধ করেছিলেন যে। আপনি কি কোন সম্পর্কই রাখতে চান না?'

তরুণী রূপবতী নারীর অভিমানের সেই অপূর্ব ভঙ্গি দেখে আমার সেই মুহূর্তে মনে হল উমাপদ,

সংসারে মান সম্মান সব তুচ্ছ। রূপের আগুনের কাছে সব গুণ নিষ্প্রভ। পুড়ে মরার মত সুখ আর নেই, জ্বলে মরার মত নেই আনন্দ। পুরুষের কাজ সৃষ্টি নয় অনাসৃষ্টিও। যে সব খোয়াতে জানে না, সব হারাতে জানে না, সে শুধু আধখানা পায়। যে নিজের বিত্ত বিভব সারাজীবন ধরে পাহারা দেয় সে তো যখ। আর যে জুয়াড়ী এক দানে সব খুইয়ে গাছতলায় ছেঁড়াকাঁথা পাতে তার এক চোখে লাখ টাকার স্বপ্ন আর এক চোখে লাখ টাকার স্মৃতি। কিন্তু বুকের মধ্যে তোলপাড় করলেও মুখের কথায় শান্ত সংযত থাকবার শিক্ষা আমি পেয়েছি। এ আমার অনেকদিনের অভ্যাস। সহিংসে অহিংসে দুই সংগ্রামেই এ অস্ত্রের প্রয়োগ করতে হয়েছে।

আমি তাই ওর কথার জবাবে মৃদু হেসে বললাম, 'সম্পর্ক থাকবে না কেন জয়ন্তী। তুমি এই স্কুলের বেতনভুক হেডমিস্ট্রেস, আমি অবৈতনিক সেক্রেটারী। এ সম্পর্ক আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।'

জয়ন্তী আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে ওর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর পর মুহূর্তে রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠল। স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা সেই সম্পর্কই থাকবে।'

ওর সেই রণোন্মাদিনী মূর্তি দেখে আমি প্রমাদ গণলাম। হয়ত সুযোগ পেলে সাদা নিশান উড়িয়ে সন্ধিও করতাম, কিন্তু তেমন কোন অবকাশই পেলাম না। তারপর থেকে ছোট বড় সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে শুধু শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। স্কুলে হেডমিস্ট্রেস বড় না সেক্রেটারী বড়। স্কুল সম্বন্ধে ও বিশেষ বিদ্যা অর্জন করে এসেছে আর আমি সেখানে হাতুড়ে। নামের পিছনে ওর ডিগ্রীর মালা, আমার সেখানে একটি ডিগ্রীও নেই। স্কুলের খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার তো কোন ধারণা নেই উমাপদ। বিশদ বর্ণনায় তুমি কোন উৎসাহ পাবে না বরং তোমার বিরক্তি বাড়বে। মোট কথা প্রত্যেকটি ব্যাপারে ও আমার নির্দেশ অমান্য করতে লাগল। আমাকে অপমান করতে লাগল, আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে আনাড়ীর সিদ্ধান্ত বলে উপহাস করতে লাগল। একজিকিউটিভে জয়ন্তীও বিশেষ সদস্য। মিটিংগুলিতে ও আমার সমালোচনা করে। ওর চাপা শ্লেষ আর ব্যঙ্গ থেকে আমি রেহাই পাইনে। বিজন ডাক্তার মুখ টিপে হাসে। আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'পায়ে পড় হে পায়ে পড়। দেহি পদপল্লবমুদারম্। না হলে এ যাত্রা আর রক্ষা নেই।'

জয়ন্তী নিজের গরজে নিজের শক্তিতে একটা মেয়েদের হস্টেল খুলল।

আমি বললাম, 'আবার হস্টেলের কি দরকার।'

জয়ন্তী বলল, 'আমি থাকব কোথায়। আমার আগের হস্টেলের সিট তো গেছে। আপনার বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে। কিন্তু সেখানে কি আমার জায়গা হবে? আপনি রাজী হলেও বউদি নিশ্চয়ই রাজী হবে না।'

ওর শ্লেষে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠল। যেন কে তা আচ্ছা করে মলে দিয়েছে। মনে পড়ল একদিন আশ্রয় ভিক্ষার জন্য জয়ন্তী আমার ওখানেই গিয়েছিল। সেদিন মনোরমার কাছে ও বলেছিল আমার বাড়ীর বারান্দাতেও ও মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। আজ দিন বদলে গেছে, আজ ওর সাহস বেড়েছে। আর এই সাহস বাড়াবার মূলে আমি। আমি ওকে আশ্রয় না দিলেও প্রশ্রয় দিয়েছি।

এমনি চলতে লাগল। যুদ্ধের কৌশল জয়ন্তীও কম জানে না। কাজকর্মে ওর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, কমিটিতে ওর আধিপত্য। একজনের প্রিয়া না হলে কি হবে, জয়ন্তী আজ জনপ্রিয়া।

তারপর একটা ব্যাপার নিয়ে এই সংগ্রাম একেবারে চরমে উঠল। ও রুল জারি করে দিয়েছিল—হেডমিস্ট্রেসের বিনা অনুমতিতে মেয়েদের স্কুলে কেউ ঢুকতে পারবে না। এমন কি কমিটির সম্ভ্রান্ত সদস্যরাও নয়—রুলটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু এটা তো আমার হাত দিয়েই জারি হওয়ার কথা। সব নোটিশের নিচে আজকাল জয়ন্তীর স্বাক্ষর থাকে। কেন আমি কি নিরক্ষর হয়ে গেছি?

কমিটির সদস্য পরিমলবাবু সেদিন এসে নালিশ জানালেন। বিশেষ একটা জরুরী কাজে তাঁর মেয়েকে ডাকবার জন্যে তিনি স্লিপ না দিয়েই স্কুলের ভিতরে ঢুকেছিলেন, জয়ন্তী তাঁকে স্কুলের ঝিকে

দিয়ে অপমান করিয়েছে। ঝি সুধাময়ী এসে বলেছে, 'কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। এখানে ঢুকবার নিয়ম নেই। মেয়ে পরে যাচ্ছে।'

পরিমল দত্ত সেই দুইজনের একজন যাঁরা শুরু থেকেই জয়ন্তীর বিরুদ্ধে ছিলেন, আমার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এবার আমি তাঁর পক্ষ নিলাম। জয়ন্তীকে ডেকে বললাম, 'তোমাকে পরিমলবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি এই স্কুলের সঙ্গে অনেকদিন থেকে আছেন। গোড়াতে অনেক টাকা ডোনেট করেছেন।' জয়ন্তী বলল, 'সেইজন্যে তাঁর অনেক অন্যায় আমরা মেনে নিতে পারিনে। তিনি অহেতুক টিচারদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছেন তা আপনিও জানেন।'

আমি শক্ত হয়ে বললাম, 'তাঁর বিচার নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তুমি তার আগে ক্ষমা চাইবে। এটা নিয়ম শৃঙ্খলার কাছে নতি স্বীকার, কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়।'

জয়ন্তী বলল, 'আমি তা পারব না। আপনি যেটাকে নিয়ম বলছেন সেটাই ঘোরতর অনিয়ম।'

আমি বললাম, 'আমাদের নিয়ম যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে চাকরি করো না।'

জয়ন্তী বলল, 'আপনি এই কথা বলছেন? এত জেদ আপনার?'

আমি জ্বলে উঠলাম, 'জেদ? হ্যাঁ, এত বড়ই আমার জেদ। সেই মুনি-মূষিকের গল্পের কথা ভুলে গেছ জয়ন্তী? যে মুনি ইঁদুরকে সিংহ বানায়, ফের তাকে ইঁদুর করবার শক্তিও সেই রাখে।'

জয়ন্তী বললে, 'কিন্তু সে শক্তি আপনি রাখেন না। কারণ এটা মুনি-মূষিকের গল্প নয়, নারী-পুরুষের গল্প। আমি আপনার কাজ ছেড়ে দিলাম।'

অনেকে অনেকরকম সাধাসাধি করল কিন্তু জয়ন্তী তার পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিল না। যেদিন গেল আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে গেল না। আমি ভাবলাম কৃতজ্ঞতা বলে সংসারে সত্যিকারের কোন বস্তু নেই। ওটা কেবল কথার কথা।

বছর দেড়েকের মধ্যে জয়ন্তীর কোন খোঁজ আমি রাখিনি। খোঁজ নেওয়াটা আমার মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করেছি। তবু খবর এসে পৌঁছেছে কানে। আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য সে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। লণ্ডনে আছে, পড়ছে। টাকাটা সরকারের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে। বেসরকারীভাবে পাওয়াটাও ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। জয়ন্তীর মত মেয়ের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়।

তারপর এক বছর বাদে জয়ন্তীর এই চিঠিখানা আমি পেয়েছি। তুমি দেখতে পার উমাপদ। এ চিঠির মধ্যে না দেখবার মত কিছু নেই।"

শৈলেশ্বরবাবু বুকপকেট থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

উমাপদবাবু সাগ্রহে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন:

শ্রীচরণেষু

অনেক দিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। যদিও লেখবার ইচ্ছা অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। কিন্তু পেরে উঠছিলাম না। যে দুর্ব্যবহার আপনার সঙ্গে করে এসেছি প্রথমে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিই। যদিও জানি, ক্ষমা আমি না চাইলেও পাব, না চাইতেই পেয়েছি। এত বড় অপরাধ, এত বড় অকৃতজ্ঞতা আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারেন বলে আমি জানিনে।

আপনাকে একটি খবর জানাবার আছে। আমি বিয়ে করেছি। সে এখানকার এমব্যাসিতে কাজ করে। দেখতে শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়। বয়স আমার চেয়ে দু' এক বছরের কমই হবে, তাই সে অনেক বাড়িয়ে বলে। আমাদের আলাপ এই বিদেশে এসেই হয়েছে।

এবার দেশে ফেরারও সময় হয়ে এল। দিল্লীতে একটা ভালো চাকরির কথা হচ্ছে। শৈলেনও দূতাবাস থেকে এবার নিজের আবাসে ফিরবে। আমার স্বামীর নামের সঙ্গে আপনার নামের অদ্ভুত মিল রয়ে গেল। কবিতার চকিত মিলের মত এই মিল আকস্মিক। তাই উল্লেখ না করে পারলাম না। আমরা যতই বস্তুবাদী হইনে কেন, জীবন থেকে আকস্মিকতা কি তাতে বাদ যায়।

দেশে ফিরব। ফিরে গিয়ে যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। আগে থেকেই নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলাম। এবার কিন্তু পায়ের ধুলো না দিয়ে পারবেন না। এবার তো আপনার সংকোচের আর কোন কারণ রইল না।

বউদির কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ নেই। কিন্তু বাচ্চাদের স্নেহ জানাবার দাবি এখনো আছে। দাবি বলব না সাধ বলব? কেমন আছে ওরা? পড়াশুনো কেমন চলছে? ওদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনার আরো পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত ওরাও কিন্তু এক একটি প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মত খ্যাতিমানরা প্রায়ই সে কথা মনে রাখেন না।

বিদ্যাপীঠের কোন খবর জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নিজেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আপনি যদি বিনা জিজ্ঞাসায় কিছু জানান তাহলেই জানতে পারব। প্রণাম জানাই। ইতি—

সেদিনের সেই দুর্বিনীতা

একবার নয় দু দু'বার চিঠিখানা পড়লেন উমাপদ লাহিড়ী। তারপর ভাঁজ করে খামের ভিতরে চিঠিটা ভরে বন্ধুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসলেন, বললেন, "পড়লাম।"

শৈলেশ্বর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

উমাপদ হেসে বললেন, "মেয়েটি লেখাপড়া ভালই জানে। ভদ্রতা করতেও বেশ শিখেছে।"

শৈলেশ্বর আহত স্বরে বললেন, "লেখাপড়া, ভদ্রতা—এসব তুমি কি বলছ লাহিড়ী?"

উমাপদ বললেন, "তবে? তুমি কি ভেবেছ ও তোমার প্রেমে এখনো হাবুডুবু খাচ্ছে, কি কোনদিন খেয়েছে?"

শৈলেশ্বর বললেন, "না না, আমি তা বলছিনে। তবে—"

উমাপদ তেমনি স্মিতমুখে বললেন, "হ্যাঁ, তবে আর তবু একটু আছে। আমার মনে হয় কি জানো? প্রথম বয়সে কোন তরুণ বয়সী বন্ধুর কাছ থেকে ও কোন দারুণ ঘা খেয়েছিল। তাই যৌবনের ওপর ওর বিতৃষ্ণা। স্বাভাবিক প্রেমের ওপর ওর এই বিরাগ। তাই ওর এত কর্মযোগ। প্রেমের শূন্য স্থান শ্রদ্ধা দিয়ে প্রীতি দিয়ে ও ভরে তুলতে চেয়েছিল। তা পারবে কেন? পারল না যে তাতো পরেই বোঝা গেল। তোমার কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চৈতন্য হল। বছর যেতে না যেতেই যৌবনকে বরণ করে নিল।"

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে উমাপদ এবার একটু কোমল সুরে বললেন, "তবে এ নাটকে তোমারও ভূমিকা আছে শৈলেশ, বেশ বড় ভূমিকাই আছে। মধ্যবর্তীর ভূমিকা। তুমি শুধু ওকে কাজই দাওনি, স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, হ্যাঁ বাসনাভরা ভালবাসা দিয়ে ওর মনকে সংসারের দিকে টেনে এনেছ। সেই জন্যে তোমাকে ও চিরকাল শ্রদ্ধা করবে, তোমার কাছে বড় কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করি শৈলেশ। দেহের টান তো সোজা টান নয়। বয়সে যত ভাঁটা পড়ে ওতে যেন তত উজান বয়: দ্বিগুণ জ্বলে নেববার আগে। আমরা তখন পণ্ডিত হই। আধখানা ছেড়ে আধখানা নিই। মন মেলে না তাই শুধু দেহ ধরে টান দিই। শ্রদ্ধাকে প্রেম বলে ভুল করি, প্রীতিকে, বন্ধুত্বকে, কৃতজ্ঞতাকে প্রেম বলে ভুল করি। অনেক সময় ইচ্ছে করেই ভুল করি, ভোলাতে চাই। তারপর সেই ভোলা আর ভোলানোর প্রায়শ্চিত্ত চলে।"

উমাপদবাবু ফের একবার বন্ধুর দিকে তাকালেন, একটু থেমে বললেন, "আমার কথাগুলি কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না।"

শৈলেশ্বর বললেন, "বল, বলে যাও!"

উমাপদবাবু বলতে লাগলেন, "এই বয়েসে দেহের বিনিময়ে আমরা দেহ পাইনে। তাই অর্থ যশ, আধিপত্যের বিনিময়ে আমরা তা দখল করি। ভাবি, সব পেলাম। কিন্তু যা পাই তাতে নিজেরও মন ভরে না, যা দিই তাতে আর একজনেরও দেহের সুখ অতৃপ্ত থাকে। তবু এই অসম আর বিষম দেনা-পাওনার বিরাম নেই। প্রকৃতির পরিহাস থেকে সংসারে রক্ষা পায় আর ক'জন? আত্মজীবনীতে যারা কেবল আত্মার কথা লেখেন, একটু ভালো করে খোঁজ করলেই ধরা পড়ে দেহের কথা তাঁরা কিভাবে চুরি করেছেন। দেহ তো শুধু দেহের মধ্যেই নেই; সে যে মনের মধ্যেও ঢুকেছে। মনও তোমার সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের বয়সে মনই একমাত্র শরীর। সে কথা ভুলতে গেলেই বিপদ। জয়ন্তীর জীবনে তুমি মধ্যবর্তী। আর একটু খাতির করে বললে বলতে পারি মধ্যমণি। এই মধ্য বয়সে মধ্যস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার আশা রেখ না শৈলেশ।"

শৈলেশ্বর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখখানা কেমন যেন অপ্রসন্ন। মনে মনে ভাবলেন, 'উমাপদ আগে ছিল কবি, এখন শুধু দর্শন-বিজ্ঞানেব চর্চা করছে। তাই ওর এত তাড়াতাড়ি চুল পেকেছে। তাই জীবনকে কয়েকটা সাধাবণ সূত্রে বাঁধবার দিকে ওর ঝোঁক। উমাপদ নিশ্চয়ই সব ব্যাপার বুঝতে পারেনি। ও হয় নির্বোধ না হয় পবশ্রীকাতর। নাকি উমাপদও ভুক্তভোগী ?'

শেষ কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশ্বরেব মুখে একটু হাসি ফুটল। তিনি বন্ধুর হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বেশ একটু জোরে চাপ দিলেন। এতক্ষণে একজনের হাতের ওপরে আব একজনের হৃদয়ের ভার পড়ল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

স্বাধিকার

কলেজে বেরোবার আগে ড্রেসিং টেবিলেব সামনে দাঁড়িয়ে বীথিকা আলতো করে মুখে পাউডারের পাফ বুলোচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে আশালতা পা টিপে টিপে শোবাব ঘরেব সামনে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মেয়েব প্রসাধন দেখলেন, রোজ দেখছেন, কতদিন ধরে দেখছেন, দেখে দেখে তবু যেন সাধ মেটেনা। সাজসজ্জার দিক থেকে মায়ের মতই হয়েছে মেয়ে। ভারি ওজনের গয়নাগাঁটি পছন্দ করে না। চড়া রঙেব শাড়ি আর রাঙা ধরনেব মেক-আপ মোটেই মনঃপূত নয় বীথিকাব। সাজসজ্জা সম্বন্ধে বরং একটু উদাসীন অগোছাল ছাপই আছে। তাই প্রসাধনে বেশি সময় লাগেনা তার। কিন্তু আশালতাব আজকাল মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে—মেয়ে আব একটু বেশি করে, বেশিক্ষণ ধরে সাজুক। রুজ আব লিপস্টিক না মাখে না-ই মাখলো, কিন্তু শাড়ি-ব্লাউসের রং আরও একটু গাঢ় হোক, খোঁপা বাঁধার ছাঁদে নতুনত্ব আসুক। মার আংটি, চুড়, বালার নিত্য নতুন প্যাটার্ন সম্বন্ধে খুকু কিছু আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখাক। শত হলেও মেয়ে তো, আর এই বয়সেব মেয়ে, ওর পক্ষে সাজসজ্জাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য ওকে না সাজলেও সুন্দর দেখায়। কিন্তু সাজলে যে আরো সুন্দর দেখায় সে কথাও তো মিছে নয়।

হঠাৎ মেয়েব কানের দিকে চোখ পড়তেই আশালতা থমকে গেলেন। তারপর একটু তিরস্কারের সুরে বললেন, 'ওকি খুকু, সেই লাল পাথব বসানো ফুল দুটি খুলে রেখেছিস যে ! না না, ওটা তোমাকে আজ পবতেই হবে। অনিমাদি অত সাধ করে আগ্রা থেকে তোমার জন্যে কিনে এনেছেন।'

বীথিকা এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'এনেছেন বলে সব সময় যে পরতে হবে তার তো কোন মানে নেই মা। আমি তো আর বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি নে।'

আশালতা এবার হাসলেন, 'তা জানি, কলেজেই যাচ্ছ কিন্তু তুমি তো এখন আর কলেজের ছাত্রী নও—প্রফেসব এখন একটু সাজ গোছ ক'রে বেরোলে কেউ নিন্দে করবে না। আর করে যদি, করুক। আমি কারো কোন নিন্দের ভয় করি নে।'

মেয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে আশালতা দেরাজ খুলে নিজেই ফুল জোড়া বার করলেন। তারপর জোর করে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়ে ছাড়লেন। তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণী মেয়ে নয় যেন বীথিকা, যেন চৌদ্দ বছরের স্কুলের ছাত্রী। প্রতিবাদ করে যখন কোন ফল হয় না, বীথিকা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কর তোমার যা ইচ্ছে।'

আশালতা বললেন, 'করবই তো। তুমি প্রফেসরই হও আর যা-ই হও আমার কাছে যে খুকু সেই খুকু।'

গভীর স্নেহে কণ্ঠ স্নিগ্ধ হয়ে এল আশালতার। পরিতৃপ্ত আত্মপ্রসাদে এই প্রৌঢ় বয়সেও মুখখানা কোমল হয়ে উঠল।

সেই মুখের দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে বীথিকা বলল, 'তুমি বুঝি তাই ভাব মা ?'

আশালতা বললেন, 'এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে ?'

বীথিকা বলল, 'তা ঠিক। তোমার মধ্যে দ্বিধা সংকোচ বলে কোন বস্তু নেই। বেশি চিন্তা ভাবনাও তোমাকে করতে হলে সোজাসুজিই ক'রে ফেলতে পার।'

মেয়ের মুখে আত্মস্বভাবের বিশ্লেষণ শুনে আশালতা হাসলেন, বললেন, 'তাছাড়া কি, আমি কি তোদের মত ?' তারপর কি মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা খুকু, তোর বুঝি ভয় ভয় করে ?'

বীথিকা বলল, 'তোমাকে ? ভয় ভয় কি বলছ মা, তোমাকে রীতিমত ভয় করি।'

আশালতা বললেন, 'আমার কথা বলছিনে। আমাকে ভয় না করে তুই যাবি কোথায় ? তোর বাপ পর্যন্ত ভয় করে চলে। আমি তোর কলেজের কথা জিজ্ঞেস করছি। যে কলেজে পড়েছিস সেই কলেজেই যে ফের মাস্টারি করতে যাস, পারিস তো করতে ? সেই সব প্রফেসরদের সঙ্গে মিলে মিশে সমানে সমানে কাজ করতে পারিস তো ?'

বীথিকা বলল, 'কেন পারব না। আমার প্রফেসররা তোমার মত নন মা। তাঁরা আমাকে খুকি ভাবেন না। বরং খুব স্বাধীনতা দেন।'

আশালতা কৃত্রিম ক্রোধের ভঙ্গিতে বললেন, 'নেমকহারাম মেয়ে। আমি বুঝি তোমাকে কম স্বাধীনতা দিয়েছি ? আমি স্বাধীনতা না দিলে এতদিনে তোমার আমারই দশা হতো। কলেজ তো ভাল, স্কুলের গণ্ডিও পার হতে পারতিস নে। কোন যুগে বিয়ে হয়ে যেত। এত দিনে দিব্যি গিন্নিবান্নি হয়ে যেতিস। তারপর হাতা বেড়ি নিয়ে রাতদিন আমারই মত রান্নাঘরে বন্দী হয়ে থাকতিস।'

বীথিকা বলল, 'তা জানি মা। আমি যা হয়েছি তোমার জন্যেই হয়েছি। এবার যাই। কলেজের বেলা হয়ে গেল।'

ছোট্ট গড়গড়াটি টানতে টানতে সুধাময়বাবু পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ওকে ছেড়ে দাও। কলেজে যদি যেতে হয় চলে যাক। মেয়ের সঙ্গে বচসা করবার সময় পরেও পাবে। ওদিকে দেখ গিয়ে তোমার রান্নাবান্না বোধ হয় সব পুড়ে গেল।'

আশালতা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যাবে না গো যাবে না। চিরকাল তো আমাকে কেবল রান্নাঘর দেখিয়েই এলে। ভয় নেই, তোমার জিনিসপত্তরের কিছুই লোকসান হবে না। রাধাকে বসিয়ে রেখে এসেছি সেখানে।'

রাধা বাড়ির রাঁধুনি। এর আগে ঠিকে ঝি ছাড়া স্থায়ীভাবে কাউকে রাখা হয়নি। কিন্তু চাকরি নেওয়ার পর বীথিকা জোর করে রাত দিনের লোক রেখেছে। নইলে মার কষ্ট হয়। কিন্তু সুধাময়ের ইচ্ছা রান্নাঘরের কাজটা বীথির মা-ই করুক। বাইরের লোকের রান্না তার পছন্দ হয় না।

স্ত্রীর কথায় সুধাময় চটলেন না। হেসে বললেন, 'তুমি না হয় একজনকে বদলী দিয়ে এসেছ। খুকু তো আর তা দিয়ে আসেনি। ওকে ক্লাসে না দেখলে ওর ছাত্রীরা যে গোলমাল করবে।'

আশালতা বললেন, 'তা করুক। তুমি একা যে শোরগোল করতে পার ওর এক-কলেজ ছাত্রীও তা পারে না।'

স্বামীর সঙ্গে আর তর্ক না করে মেয়ের পিছনে পিছনে সদর দরজা অবধি এগিয়ে গেলেন আশালতা, বললেন, 'ও খুকু, শোন।'

বীথিকা এবার একটু বিরক্ত হয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, 'আবার কি বলছ মা।'

আশালতা বললেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল না তুই আজ কলেজে যাস। না গেলেই যখন চলবে না, তাড়াতাড়ি কিন্তু ফিরে আসিস।'

বীথিকা বলল, 'কেন ?'

আশালতা মৃদু হাসলেন, 'আহাহা তবু বলে কেন, যেন কিছু জানেন না। অরুণরা আজ আসবে যে। অরুণ, তার বাবা মা আর অরুণের ছোট বোন এনাক্ষীকে আজ চায়ে বলেছি, মনে নেই তোর ? আজ কিন্তু ওরা তোর কাছ থেকে পাকা কথা নিয়ে যাবে। পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে পঞ্জিকা দেখিয়ে দিন আমি মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। এখন অতুলবাবুর কোন খুঁতখুঁতি না থাকলেই হয়।

অমনিতে বিলাত ফেরত ডাক্তার হলে কি হবে, পাঁজি পুঁথির বেলায় তোমার বাবার চেয়েও এক কাঠি ওপরে। সকাল সকাল চলে আসিস কিন্তু! খাবার টাবার তোমাকেও এসে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে বাপু। আমি একা সব করতে পারব না।'

বীথিকা বলল, 'আচ্ছা মা তাড়াতাড়িই আসব।'

ফিরে আসবার পর সুধাময় বললেন, 'ওকি, এত তাড়াতাড়িই চলে এলে। যা একখানা মেয়ে-সোহাগী হয়েছ। আমি ভাবলাম, একেবারে বুঝি কলেজ পর্যন্তই খুকুকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। যা দেখছি—মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি বোধহয় বছরে এগার মাস জামাই বাড়িতেই কাটাবে।'

আশালতা জবাব দিলেন, 'তা যদি কাটাই তোমার তো পোয়া বারো। রাতদিন কেবল তামাক খাবে, গল্প করবে আর দাবা খেলবে। আমাকে তোমার কোন কাজে লাগে?'

সুধাময় বললেন, 'বরং উল্টোটাই সত্যি। আমাকেই তোমার কোন কাজে লাগে না। রিটায়ার করবার পর থেকে আমি একেবারেই অকেজো হয়ে গেছি।'

স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে আশালতা রান্নাঘরে চলে এলেন। মাংসটা এবেলাই রেঁধে রাখতে হবে। চিংড়ির কাটলেট খেতে খুব ভালোবাসেন অতুলবাবু। সেগুলি ওঁরা এলে গরম গরমই ভেজে দেওয় যাবে। তারপর পিঠে আর মিষ্টান্নব ব্যবস্থা।

রাধাকে ডেকে বললেন, 'অমন হাত পা কোলে করে বসে থাকলে চলবে না বাপু, যা করবার চটপট করে ফেল।'

তারপর নিজেই মাংস কষতে বসলেন।

অতুলবাবু এলে আজ দিনক্ষণ একেবারে পাকাপাকি করে ফেলবেন আশালতা। আর দেরি করে লাভ কি, মায়া বাড়িয়ে কি ফল আর। পরের ঘবে মেয়েকে তো আর না পাঠিয়ে চলবে না। এই যখন রীতি সংসাবের।

আজ নয়, দশ-এগার বছর আগে থেকেই খুকুর বিয়ের কথা হচ্ছিল। প্রথমে শুরু করেছিলেন ওর ঠাকুরদা ঠাকুরমা। নাতজামাই দেখে যাবেন এই তাঁদের সাধ। সুধাময় নিমরাজী। এত অল্প বয়সে আজকাল অবশ্য কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না। কিন্তু বুড়ো বাপ-মায়ের কথা তিনি অমান্যই বা করেন কি করে। কিন্তু আশালতাই বেঁকে বসলেন, 'না, কিছুতেই না। এত কম বয়সে কিছুতেই আমি খুকুর বিয়ে দিতে দেব না। বাবার কাছে মুখ ফুটে তুমি না বলতে পার, আমি বলব। এই বয়সে বিয়ে হয়ে গেলে জীবনে ওর কোন্ সাধ মিটবে? লেখা হবে না, পড়া হবে না। আজীবন আমার মত আকাট মূর্খ হয়ে থাকবে।'

শুধু স্বামীকেই ধমকালেন না আশালতা, শ্বশুরের কাছে গিয়েও আবদার জানালেন। তেলের বাটি আর গামছা হাতে স্নানের তাগিদ দিতে এসে বললেন, 'খুকু কি বলছে জানেন বাবা?'

'কি বলছে?'

আশালতা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'ও বলছে বাইরে থেকে ওর বরকে আর ধরে আনার দরকার নেই। ওর বর ঘরেই আছেন। আপনাকে ছাড়া ওর আর কাউকে পছন্দ নয়।'

হাঁটু অবধি তেলধুতি পরে জলচৌকির ওপর বসে হরিমোহন গায়ে সরষের তেল মাখতে মাখতে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। শত হলেও উকিলের মেয়ে তো। তা হলই বা সে ছোট আদালতের উকিল। কথা কি করে বলতে হয় তা আমার বেয়াইমশাই মেয়েকে ভালো করেই শিখিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, তোমার যখন ইচ্ছে নয়, এ বছরটা থাক।'

সে বছরটা বিয়ের উদ্যোগ স্থগিত রইল। কিন্তু পরের বছর থেকে আবার ছেলে দেখা, মেয়ে দেখানোর তোড়জোড় শুরু হল। এবার আর মিষ্টি কথায় শ্বশুরের মন ভোলাতে পারলেন না আশালতা। পুত্রবধূর আপত্তি আছে শুনে, হরিমোহনবাবু রীতিমত চটে উঠলেন, 'তুমি বলছ কি বউমা, আমাদের এই ভট্‌চায্ বংশে চোদ্দর ওদিকে আর মেয়ে পড়ে থাকে নি। তার আগেই তারা

পার হয়ে গেছে।'

আশালতা বললেন, 'কিন্তু বাবা, দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে, আপনাদের সেই গৌরীদানের আমল আর নেই।'

হরিমোহন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আমল আছে কি না আছে আমি বুঝব। আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার কথামত সংসার চলবে। তা যদি না হয় সুধাময় যেন ছেলে বউ নিয়ে আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকে।'

এরপর স্বামী এসে কৈফিয়ত চাইলেন, 'তুমি নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছ?'

আশালতা বললেন, 'হ্যাঁ করেছি। ওঁরা জোর করে আমার মেয়েব বিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমি কিছুতেই তা দেব না। ওকে আমি কলেজে পড়াব। মেয়ে তো ওঁদেব নয়, মেয়ে আমার। দরকার হয় ওঁবা যেন তোমার আব একটা বিয়ে দেন, আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে যেন কথা বলতে না আসেন।'

দিন কয়েক খুব ঝগড়াঝাঁটি চলল। তাবপর কথা বন্ধ। তাবপরেও হরিমোহন যখন পাত্র পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন ওঁদের সবাইকে না জানিয়ে—দাদাকে খবর দিয়ে মেয়ে নিয়ে বরানগরে বাপেব বাড়িতে পালিয়ে গেলেন আশালতা।

হরিমোহন বাগ কবে বললেন, 'এই যাওযাই শেষ যাওয়া। ও বউয়ের মুখ আব আমি দেখতে চাইনে, নাতনীব মুখও না। সুধার আমি ফের বিয়ে দেব।'

সুধাময় অবশ্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আর স্বীকৃত হলেন না। কিন্তু স্ত্রী আব মেয়ের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্ক ত্যাগ কবলেন। মাস ছয়েক বাদে রোগশয্যায় হরিমোহনই অবশ্য নাতনীকে ডেকে পাঠালেন। পুত্রবধূর সঙ্গে তেমন করে কথা না বললেও নাতনীর সেবাশুশ্রূষা সাগ্রহেই গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন বসিকতা করে বললেন, 'ছোটগিন্নী, তোমাকে তো তোমাব মা এই বুড়োর হাতে সম্প্রদান কবে রেখেছে। কিন্তু যদি মরি, তুমি কি সাবিত্রীর মত যমের পিছনে পিছনে ছুটবে? নাকি বলবে, বুড়ো ঘুমোল বাড়ি জুড়োল।'

খুকু ছলছল চোখে জবাব দিয়েছিল, 'না দাদু না। যমকে এ ঘবে আমি ঢুকতেই দেব না। তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে।'

হরিমোহন পাশ ফিরে শুতে শুতে বলেছিলেন, 'না ভাই, বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই। তোমাদের নতুন কালের সঙ্গে বনিবনাও হবে না।'

খুকু জবাব দিয়েছিল, 'বনিবনা না-ইবা হল দাদু। না হয় যতদিন আমরা ঝগড়া করেই কাটাব। তবু তোমাকে আমি মরে যেতে দেব না।'

হরিমোহন হেসেছিলেন, 'মরতে আব দুঃখ নেই দিদি, তোমার কথার মধ্যেই অমৃত। দেবতাদের তো নাতি নাতনী হত না তাই তাঁরা নিজেবা অমর হবার বর চাইতেন।'

নাতনীর অনুরোধেই আশালতাকে শেষপর্যন্ত ক্ষমা করেছিলেন হরিমোহন। মৃত্যুর আগে ডেকেছিলেন, কথা বলেছিলেন, সুখে থাকবার জন্যে আশীর্বাদ করেছিলেন।

কিন্তু শাশুড়ী সিন্ধুবালা ক্ষমা করেন নি। তিনি তারপর আরো চার বছর বেঁচেছিলেন। চার বছরেব প্রতিটি দিন-রাত খোঁটা দিয়েছেন বউকে। শ্বশুরের মৃত্যুব জন্যে আশালতাকে দায়ী করেছেন। বলেছেন, 'মানুষটা মনের অশান্তির জন্যেই গেল। নাহলে আরো দু'চার বছর বেশি বেঁচে যেতে পারত। তার কি মববার বয়স হয়েছিল? তার চেয়ে কত বুড়ো এই পাড়াতেই দিব্যি হেঁটে চলে আনন্দ ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে।'

খুকুর বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বলতেন, 'আমি আর ওর মধ্যে নেই বাবা। ও মেয়ে ঘরে চিরকাল আইবুড়ো হয়েই থাকুক, আর পাড়ার পাঁচটা বকাটে ছোকরার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করুক, আমি কথাটি বলব না।'

আশ্চর্য, শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীও সুর মেলাতেন। তিনিও দোষ দিতেন আশালতার। বংশের রীতিনীতি লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছামত চলছে, মেয়েকে নিজের পছন্দ মত গড়ে তুলছে, তার জন্যে আশাকে গঞ্জনা দিতে ছাড়তেন না। বলতেন, 'মেয়েতো আমার নয়, শুধু তোমার।'

আশালতা জবাব দিতেন, 'শুধু আমার ? আমি কি ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি ?'

সুধাময় বলতেন, 'কে জানে, কুড়িয়ে এনেছ না অন্য কিছু করে এনেছ। খুকুর ধারণা তার বাবা একজন অশিক্ষিত উজবুক সেকেলে গোঁড়া বামুন। আর তার মা একেবারে আধুনিকা। শিক্ষায় দীক্ষায় মাজা ঘষা, যাকে বলে ঝকঝকে তকতকে। এই বাগবাজারের কাণা গলিতে থেকেও অমন বালিগঞ্জের চালে চলা কি সোজা কথা ?'

সোজা তো নয়ই। আশালতা জানতেন, হাড়ে হাড়ে টের পেতেন---এই বৈদিক ব্রাহ্মণের বাড়িতে চলাচালের একটু অদল বদল করা বড় শক্ত। তবু তিনি একেবারে ভোল বদলে ছাড়লেন, যে বাড়িতে মেয়েরা পর্দানশীন হয়ে থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে শ্বশুর-ঘর করতে যেত আর বছর বছর ছেলে কোলে নিয়ে একবার করে ফিরে আসত বাপের বাড়িতে, সেই বাড়ির মেয়েকে তিনি স্কুলের চৌকাঠ পার করে কলেজে দিলেন। শুধু মেয়েদের সঙ্গেই নয়, আত্মীয়স্বজন, কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কলেজে পড়া বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলেদের সঙ্গেও মেয়েকে মেলামেশার অনুমতি দিলেন, সুযোগ দিলেন। শুধু মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোন লাভ হয় না। এ সমাজে মেয়েদের জানাশোনার গণ্ডি আর কতটুকু। কিই বা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য। আত্মবিশ্বাসের সুযোগসুবিধা তারা কতটুকুই বা পায়। তাই অল্পবয়স থেকেই সহপাঠী সমবয়সী পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মেশা দরকার। তাতে মনের জড়তা দূর হয়, আরও বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্পর্শে আসা যায়। সে পৃথিবী কর্মের পৃথিবী, জ্ঞানের পৃথিবী।

এই পুরুষ প্রশস্তিতে আশালতা অবশ্য গোড়াতে তেমন বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করিয়েছে তার রাঙাদা। আপন ভাই নয়, পিসতুতো ভাই। কিন্তু আপন ভাইদের চেয়েও আশালতার কাছে বেশি আপন প্রবোধ রায়। শিক্ষা সংস্কৃতি রীতি রুচিতে তাঁর সঙ্গে আশার যেমন মেলে আর কারো সঙ্গেই তেমন মেলে না। কৃতি পুরুষ প্রবোধ রায়। নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছেন। এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তাঁর যেমন নাম হয়েছে, তেমনি অর্থ। সুধাময়ের মত বাপ দাদার বাড়ির উত্তরাধিকারী হন নি, নিজের উপার্জিত টাকায় বাড়ি করেছেন লেক প্লেসে। বিয়ে করেছেন বি এ পাশ সুন্দরী মেয়েকে। তবু আশালতাকে এখনো ভালোবাসেন প্রবোধ। রাঙা বউদির সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেন, 'বি এ, এম এ বুঝিনে। বিদ্যের চেয়ে যে বুদ্ধি বড়, তা তোমাকে দেখলে বোঝা যায় আশা। তোমাকে দেখে কে বলবে যে তুমি স্কুল-কলেজের ছায়া মাড়াও নি, ঘরের বাইরে পা বাড়াওনি। সত্যি, তুমি যা করেছ তার কাছে আমার নিজের বাড়ি-গাড়ি অতি তুচ্ছ।'

আশালতা রাঙাদার প্রশংসায় উৎসাহ পেয়েছেন, প্রেরণা পেয়েছেন। আর মনে মনে সংকল্প করেছেন নিজে যা হ'তে পারেন নি, মেয়েকে তাই গড়ে তুলবেন। ও তো শুধু মেয়ে নয়, মানসী। নিজেরই এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা। তাই নিজের বাপ মার কাছ থেকে যে স্বাধীনতা পান নি, ওকে স্বেচ্ছায় সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্কুল ছেড়ে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আশালতা নিজেই যেন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছেন। ও তো আলাদা নয়, ও নিজেরই আত্মা, দ্বিতীয় যৌবন। নিজের স্বপ্ন আর সাধের সার্থক প্রতিমূর্তি।

বীথিকা যখন কলেজের চাকরিটা পেল, তখন আর একবার স্বামীর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল আশালতার। সুধাময় বলেছিলেন, 'কেন, আমার রোজগারে কি কুলোচ্ছে না যে মেয়ের চাকরি করতে হবে ?'

আশালতা বলেছিলেন, 'বিয়ের আগে করলই বা কিছুদিন। ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে শুধু কি চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকবার জন্যে ? চর্চা না থাকলে বিদ্যেয় যে মরচে পড়ে যাবে।'

মনে মনে ভেবেছেন, নিজে তো কোনদিন চাকরি করতে পারবেন না, নিজের হাতে উপার্জ্জন করার কি যে সুখ তা তো নিজে কোনদিন অনুভব করতে পারবেন না, মেয়ে করুক। ও করলেই আশালতার করা হবে।

অরুণও বসে থাকার চেয়ে ওর কাজ করাটা পছন্দ করেছে। সে বলেছে, 'মাসীমা, আর্থিক দিক থেকে আমাদের সংসারে বীথির চাকরি করার অবশ্য কোন দরকারই হবে না। আপনার আশীর্বাদে

আমার নিজের যা আয় আছে তাতেই চলবে। তবু আমি চাই বীথি শুধু ঘরকন্না না করে বাইরের কাজকর্মও করুক, যেভাবে পারে সেবা করুক সমাজকে।'

ঠিক যেন আশালতার মনের কথার প্রতিধ্বনি। চমৎকার ছেলে, শুধু বিদ্বান নয়, রূপবান, স্বাস্থ্যবান; ইনকামট্যাক্স অফিসে ভাল চাকরি করে। পদ আর মাইনে দুয়েরই গুরুত্ব আছে। বাপ বিলাত ফেরত ডাক্তার। নাক কান আর গলার রোগে বিশেষজ্ঞ। চেম্বার আছে ধর্মতলায়। এখনো অবশ্য আলাদা বাড়ি করেন নি। কিন্তু জায়গা কিনে রেখেছেন ঢাকুরিয়ায়। সাদার্ন এভেনিয়ুতে যে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন, অতি স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছাড়া কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। অরুণরাও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। একেবারে পালটি ঘর। এমন মিল সাধারণত চোখে পড়ে না। রাঙা বউদি সুরমা প্রায়ই বলেন, 'আশা, অরুণ তোমার মেয়ের জন্যেই জন্মেছে। যাকে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ।'

আশালতা হেসে জবাব দেন, 'সে প্রজাপতিটি তুমি নিজে।'

বউদি বলেন, 'না ভাই, আমি তোমার কাছে ফড়িং। প্রজাপতির রং তুমি বরং নিজেই মেখেছ। তোমাকে দেখে কে বলবে, তুমি বীথির মা, বড় বোন নও।'

বাগবাজারে থেকেও বালিগঞ্জবাসী অরুণ চক্রবর্তীর যে নাগাল পেয়েছেন আশালতা তা এই রাঙাদা রাঙা-বউদিরই গুণে। ওরাই মধ্যস্থ হয়ে অরুণ আর বীথির ভাব করিয়ে দিয়েছেন, অবশ্য মাঝে মাঝে আশালতারও নিমন্ত্রণ হয়েছে সে সব পার্টিতে। গুরুজনের গুরুত্ব হ্রাস ক'রে আশা আর সুরমা এই দুটি তরুণ তরুণীর সঙ্গে সমবয়সীর মত মিশেছেন। সখীর মত হাসি ঠাট্টা গল্প করেছেন। নিজের তো ভালোবেসে বিয়ে হয়নি। বাবা ঘটক ডেকে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। তাতে পূর্বরাগ অনুরাগের কোন বালাই ছিল না। মেয়ের বেলায় যে তার ব্যতিক্রম হতে যাচ্ছে তাতে খুশিই হয়েছেন আশালতা। এই তো তিনি চেয়েছেন। নিজে রাশি রাশি গল্প উপন্যাস পড়েছেন। কিন্তু চিরকাল পাঠিকাই থেকে গেছেন, নায়িকা হ'তে পারেন নি। খুকু হোক সেই রম্য উপন্যাসের নায়িকা। তার মধ্যে দিয়েই আশালতা হবেন। বইয়ের নায়ক নায়িকার সঙ্গে আশালতা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন অরুণ আর বীথিকাকে। লক্ষ্য করেছেন কি করে একজনের মনের রঙ আর একজনের মনে গিয়ে লাগে, একজনের গলার স্বর আর একজনের আনন্দ সিন্ধুতে কি করে তরঙ্গ তোলে, একজনের সামান্য ছোঁয়ায় আর একজন কি ভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে আপত্তি করেছেন সুধাময়, স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছেন, 'মেয়েটাকে যে এতখানি ছেড়ে দিচ্ছ এর ফল কি ভাল হবে ? বিয়ের আগে এতটা মেশামেশি কি উচিত ? পাড়ার লোকে কত কি বলে।'

আশালতা জবাব দিয়েছেন, 'বলুক। তোমার এ পাড়ার বলাবলিতে আমার কিছু এসে যায় না।'

সুধাময় বলেছেন, 'কিন্তু আমার যায়, আমি আমার পাড়া পড়শী নিয়ে বাস করি; অরুণ বিয়ে করবে কিনা শোন। যদি না করে অত মেলা মেশা করতে বারণ করে দিও।'

কিন্তু আশালতা বারণ করেন নি। বরং রাঙাদা রাঙা বউদি যখন পুরী, ওয়ালটেয়ার, শিলং দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাওয়ার সময় খুকুকে সঙ্গে নিয়েছেন, আর অরুণকে না ডাকতেও সে কোন না কোন অছিলা অজুহাতে গিয়ে হাজির হয়েছে তখন আশালতার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হয়নি; শুধু মেয়েকেই পাঠান নি আশালতা। নিজেও দাদা বউদির সঙ্গে গেছেন দু'চার বার। লক্ষ্য করেছেন সমুদ্রে পর্বতে অরুণ-বীথিকার প্রণয় কাহিনীর পটভূমির পরিবর্তন। দুজনে গল্প করতে করতে কখন ওরা গুরুজনদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সমুদ্রের ধার দিয়ে আধো অন্ধকারে পাশাপাশি হেঁটেছে। আশালতা যেন দেখেও দেখেন নি। শুধু নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে চেয়ে রয়েছেন আর সেই ঢেউয়ের অবিরাম ওঠা পড়া নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করেছেন, রক্তের মধ্যে দোলা লেগেছে প্রথম যৌবনের। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে কখন ওরা অদৃশ্য হয়ে গেছে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরালায় ঝরনার ধারে বসে গল্প করে কাটিয়েছে, আশালতা হিসাব নিতে যান নি।

শুধু দু'একদিন মেয়েকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'খুকু নিজের সম্মান বজায় রেখে চালিস, কখনও

যেন মর্যাদা হারাসনে।'

খুকু হেসে জবাব দিয়েছে, 'তোমার কোন ভয় নেই মা। আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।'

আশালতা স্মিতমুখে ফের জিজ্ঞেস করেছেন, 'তবে কার জন্যে ভাবব? অরুণের জন্যে?'

তাঁর মেয়ে যে সহজলভ্যা নয় তা তিনি অরুণের কাছেই শুনেছেন। বয়সের তুলনায় বেশি বাশভারি মেয়ে বীথিকা। ওর মনের হদিস পাওয়া ভার। এ অভিযোগ তিনি অরুণের কাছেই অনেকবার শুনেছেন। মনে মনে ভেবেছেন এই তো ভাল। সহজে ধরা দিলে ছাড়া পেতেও দেরি হয় না। যে মেয়ে দূরত্ব বজায় রাখতে জানে না—কাছের মানুষের কাছে তাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। মন জানাজানির জন্যে ওরা বড় বেশি সময় নিয়েছে সে কথা ঠিক। প্রায় পাঁচ ছয় বছর! অবশ্য অরুণের বাড়ির দিক থেকেও বাধা ছিল। ওর বাবা মা আরও অবস্থাপন্ন অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এ কথা আশালতা যে বুঝতে পারেন নি তা নয়। কিন্তু অরুণের চাল চলন আচার আচরণও তো দুর্বোধ্য ছিল না। ওর বাবা মা যদি রাজী না হতেন অরুণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করত না। কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলেছে, সেই অপ্রীতিকর চরম অবস্থার মধ্যে কাউকে যেতে হয় নি। ছেলের হৃদয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সায় দিয়েছেন তার বাপ মা। জয় হয়েছে খুকুর। রাঙা বউদি বললেন, 'জয় হয়েছে খুকুর মা আশালতার।'

রান্না ঘরের কাজ কর্ম সারতে সারতে বেলা একটা বেজে গেল। রাধা একটি অকর্মার হাঁড়ি। ওকে দিয়ে কিছু করানোর চেয়ে নিজের হাতে করলে অনেক কম সময় লাগে আশালতার। তাই করলেন। মাংস রাঁধলেন, চিংড়ির কাটলেট ভাজলেন, পিঠে আর মিষ্টান্ন তৈরী করলেন। ঘরে এসে দেখলেন অফিস থেকে অবসর নেওয়া স্বামী অন্যদিনের মতই নাক ডেকে দিবা নিদ্রা দিচ্ছেন। সকালের খবরের কাগজখানি দিয়ে মুখ ঢাকা। আশ্চর্য, আজ মেয়ের বিয়ের পাকা কথাবার্তা হবে সে সম্বন্ধে বাপের না আছে কোন উৎসাহ ঔৎসুক্য, না কোন চিন্তা ভাবনা। রাঙাদা ঠিকই বলেন, 'করেছিস কি আশা—বকে বকে, ধমকে ধমকে স্বামীটিকে একেবারে সাংখ্যের পুরুষ বানিয়ে ছেড়েছিস।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আশালতার আজকাল প্রায়ই মনে হয় এমন বাধ্য অনুগত স্বামীর চেয়ে প্রথম যৌবনের সেই খেয়ালী অত্যাচারী স্বামীই ভালো ছিল।

আজকের এই পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে রাঙাদা রাঙা বউদিকেও অবশ্য বলেছেন আশালতা, ওঁরা এলেই এ বাড়ির স্তব্ধতা ভাঙবে, নিঃসঙ্গতা দূর হবে। উল্লাসে আনন্দে, কোলাহল কলরোলে ভরে উঠবে বাড়ি। তার আগে সুধাময় যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে নিক।

স্নানের জন্যে তেলের শিশিটা তাক থেকে কেবল নামিয়ে নিয়েছেন, সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। আশালতা বললেন, 'রাধা, দেখতো কে এল এই দুপুর বেলায়।' রাধা দরজার খিল খুলে দিতে দিতে বলল, 'ওমা এ-যে দিদিমণি।'

মেয়ের আসা পর্যন্ত সবুর সইল না। হাসিমুখে আশালতা বারান্দা পার হয়ে দোরের কাছ থেকে মেয়েকে এগিয়ে আনতে গেলেন। বললেন, 'কিরে খুকু, তোর না সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ক্লাস ছিল? আমি এই জন্যেই বলেছিলাম আজ তোর কলেজে গিয়ে কাজ নেই। মন দিয়ে ক্লাস নিতে পারবি নে। কি পড়াতে কি পড়াবি, আর ছাত্রীরা হাসবে। এত তাড়াতাড়ি এলি কি করে? পালিয়ে এলি না ছুটি নিয়ে এলি?'

মায়ের এত উল্লাস এত উৎসাহ ভরা কথার জবাবে বীথিকা সংক্ষেপে বলল, 'আজ শেষপর্যন্ত কলেজে যাইনি মা।'

আশালতা বললেন, 'কলেজে যাস নি! তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি? এই রোদের মধ্যে কোথায় টো টো করে বেড়ালি? যা ইচ্ছে তাই কর। শেষে একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়লে আমি কিন্তু পারব না বাপু। কোথায় গিয়েছিলি?'

বীথিকা বলল, 'পার্ল রোডে।'

আশালতা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'পার্ল রোডে ? যেখানে সেই আর্টিস্ট ছোঁড়াটি থাকে
বীথিকা বলল, 'হ্যাঁ।'

আশালতা বললেন, 'এই রোদের মধ্যে অতদূরে সেই পার্ক সার্কাসে কেন গিয়েছিলি ? তাকে নিমন্ত্রণ করবি বলে ? তা নিমন্ত্রণের আজই কি। বিয়ের দিন করলেই হতো।'

বীথিকা বলল, 'তা হতো না মা। ঘরে চল তোমাকে সব বলি।'

যে ঘরে কাগজে মুখ ঢেকে সুধাময় ঘুমোচ্ছেন সে ঘরে গেলেন না আশালতা। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার পাশের ছোট ঘরখানায় ঢুকলেন। কাঁচের আলমারী ভরা বই। তাকের উপর রেডিও সেট। তার নিচে ছোট একখানি টেবিল। দুদিকে দুখানি চেয়ার। এই টেবিলে বসে মেয়ের কাছে জীবনের কত অপূর্ণ সাধ আর স্বপ্নের কথা বলেছেন আশালতা। সংসারের কত জটিল আর গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে পরামর্শ করেছেন।

আজ আর চেয়ারে বসলেন না আশালতা। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি বলবি বল। তোর রকম সকম আমার ভালো লাগছে না বাপু।

বীথিকা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ভেবেছিলাম, তোমাকে না বলেই পারব। নিজে সারা জীবন দুঃখ পাব, তবু তোমাকে দুঃখ দেব না। কিন্তু তা কিছুতেই হল না।'

আশালতা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর আর ভণিতা করে কাজ নেই। কি বলবি, সোজা কথায় বল।'

বীথিকা বলল, 'অরুণকে আজ না করে দিতে হবে মা। তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

আশালতা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'সে কিরে ? এই ছ'বছর ধরে এত মেলামেশার পর এখন বলছিস বিয়ে করতে পারবি নে ? লোকে বলবে কি !'

বীথিকা বলল, 'লোক-নিন্দে আমাকে সইতেই হবে মা। তুমিও তো এক সময় কত সয়েছ।'

আশালতা বললেন, 'না আমি তোমার মত নিন্দার কাজ করি নি। তোমার মত অসম্ভব কথা বলি নি। এত জায়গায় এত বেড়ালি, এত বন্ধুত্ব, এত ভালোবাসা হল তোদের মধ্যে—'

বীথিকা বলল, 'বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসা হয় নি।'

আশালতা ধমকে উঠলেন, 'কি যে বাজে বকিস। তোর বয়সী মেয়ের সঙ্গে আর একটি ছেলের বন্ধুত্বও যা ভালোবাসাও তাই।'

বীথিকা বলল, 'আগে আমিও তাই ভাবতুম, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তোমার সঙ্গে রাঙা মামার যা সম্বন্ধ এও প্রায় তাই—'

আশালতার আর ধৈর্য রইল না, তিনি মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, 'বদমাশ মেয়ে। ও কথা বলতে তোর একটুও লজ্জা হল না, সংকোচ হল না ? আমি নিজের চোখে দিখি নি তোদের ঢলাঢলি ? এখন ভাই বলে এড়িয়ে যেতে চাস ?'

বীথিকা শান্তভাবে প্রতিবাদ করল, 'ভাইতো বলি নি মা, বন্ধু বলেছি। অরুণের সঙ্গে আমার যে সম্পক গড়ে উঠেছে তা বন্ধুত্বের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। হয়ত আরো কিছু হতে পারত যদি আমি তাকে নিজে আবিষ্কার করতাম। কিন্তু তুমি আর রাঙা মামা আমাকে সে কষ্ট স্বীকার করতে দাও নি। তোমরা নিজেরা জাত গোত্র মিলিয়ে তাকে আমার সামনে এনে দিয়ে বলেছ, ওকে ভালোবাস খুকু। আমি তোমাদের কথা অমানা করি নি, তোমাদের কথা মত ভালোবেসেছি। কিন্তু তোমাদের কথামত বিয়ে করতে পারব না মা।'

আশালতা বললেন, 'হতচ্ছাড়ি, একথা আমার সামনে বলতে তোর লজ্জা হল না।'

বীথিকা বলল, 'এতদিন লজ্জা করেছি মা। ভেবেছি কি করে মুখ ফুটে বলব। ইশারায় আভাসে বলেছি, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করনি, বুঝতে চাও নি। কারণ অরুণকে তুমি—'

আশালতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'অরুণকে আমি কি—'

বীথিকা বলল, 'অরুণকে তুমি নিজে বড্ড পছন্দ করেছ মা। তাই আমার অপছন্দের কথা তুমি সহ্য করতেও চাও নি, বিশ্বাস করতেও চাও নি। ভেবেছিলাম তোমাকে দুঃখ দেব না। আমার জন্যে দুঃখ তো তুমি কম পাও নি। সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে আমি তার সামান্য অংশ শোধ

দেব। কিন্তু আজ ভাবছি এ তো শুধু আমার দুঃখের কথা নয় মা, এর সঙ্গে যে আর একজনের সুখ দুঃখও জড়িয়ে আছে। আমার ভুলের জন্যে সারা জীবন অরুণ দুঃখ পাবে—জেনেশুনে তাই কি আমি হতে দিতে পারি? অরুণকেও আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বুঝতে চায় না। তার ধারণা এ ব্যাপারে তোমার সম্মতি আর তার গায়ের জোরই যথেষ্ট। আমার মতামতের কোন দরকার নেই। কিন্তু তাতে যে দুঃখই বাড়বে মা।'

আশালতা স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দ্যাখ খুকু, আমি তোর মত লেখাপড়া শিখি নি, কলেজের প্রফেসরও হইনি। তাই বলে তুই আমাকে যত বোকা মনে করিস তাও আমি না। আমার দুঃখের কথা, অরুণের দুঃখের কথা ভাবতে তোর ভারি তো মাথা ব্যথা। তুই তোর নিজের সুখের কথা ভাবছিস। আমাকে সত্যি করে বল কে সে? কার ছলনায় ভুললি তুই। কার ফাঁদে পা দিয়ে অরুণের মত এমন যোগ্য ছেলেকে বাঁ পায়ে ঠেললি? বল আমাকে?'

বীথিকা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'মা সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, সে কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।'

আশালতা এগিয়ে এসে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলেন মেয়ের কাঁধ, যেন বাঘিনীর থাবা। তারপর তীব্র ঘৃণাভরা চাপা গলায় বললেন, 'বদমাশ মেয়ে। তোমার আবার আসা না আসা। তোমার আজ একজন আসে, কাল একজন আসে—।'

বীথিকা বাধা দিয়ে কাতর স্বরে বলল, 'মা এসব কি তুমি বলছ। তুমি না আমার মা?'

আশালতা অধীর ভাবে বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই নে, আমাকে তার নাম বল।'

বীথিকা অসহায় ভাবে মার মুখের দিকে তাকাল। কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে তার মনোসমুদ্র মন্থন করে চলেছে। অমৃত হলাহলে বিচিত্র স্বাদ জীবনের।

বীথিকা আস্তে আস্তে বলল, 'তার নাম অসীম, অসীম মুখোপাধ্যায়।'

আশালতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'অবাক করলি তুই। পার্লরোডের সেই আর্টিস্ট! সেই খৃষ্টান ছোঁড়া?'

বীথিকা বলল, 'হ্যাঁ। খৃষ্টান! তাতে কি হয়েছে। সেও চার্চে যায় না, আমিও মন্দিরের দুয়ার মাড়াই না, ধর্মে যাই হোক, জাতে সেও বাঙালী ব্রাহ্মণ।'

আশালতা বললেন, 'ছাই ব্রাহ্মণ। অমন বামুন হওয়ার কোন দাম আছে? যার ধর্ম আলাদা, সমাজ আলাদা? তাছাড়া শুনেছি তার তিনকুলে কেউ নেই।'

বীথিকা বলল, 'তোমার আশীর্বাদ পেলে তার অন্তত এককুল ভরে উঠবে মা।'

আশালতা জ্বলে উঠে বললেন, 'আমার বয়ে গেছে তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আচ্ছা তোর কি প্রবৃত্তি খুকু! জাতের মিল নেই, ধর্মের মিল নেই। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা—'

বীথিকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'তার চেহারার কথা থাক মা।'

আশালতা বলেন, 'আচ্ছা না হয় গুণের কথাই ধরি। গুণই বা কি দেখলি ওর মধ্যে? ছবি এঁকে খায়। তাও তো শুনেছি নিজের ছবি বিক্রি হয় না, পরের বইয়ের মলাট এঁকে কোনরকমে নিজের খোরাক পোশাক জোগায়। কি দেখলি তুই তার মধ্যে?'

বীথিকা বলল, 'সে কথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না মা।'

আশালতা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ন্যাকা মেয়ে। তুমি এত কথা বলতে পারলে আর সে কথা বলতে পারবে না!'

এ কথার উত্তরে বীথিকা মুখ নিচু করে রইল। মনে মনে ভাবল মা নিজেই কি পারত। এতো শুধু চোখের দেখা নয় যে মুখে বলা যাবে।

মেয়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে এলেন আশালতা। এতক্ষণ ধরে ঝগড়া আর বকাবকি করে এবার ভারি ক্লান্তি এসেছে। শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর কটুকথা বলবার, এমন কুশ্রী ভাষায় কলহ করবার আর কোন উপলক্ষ ঘটে নি। সর্বাঙ্গ যেন কিসে জ্বলে যাচ্ছে। কে জানে এ কোন্ বিষ। পেট জ্বলছে ক্ষিদেয়। এক কাপ চা খেয়ে সকালে কাজ শুরু করেছিলেন, তারপর এক ফোঁটা জলও পড়েনি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এমন বিপদ যে আসবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বছর দুই আগে একবার আর্টিস্টকে দিয়ে ঘর সাজাবার শখ হয়েছিল রাঙা বউদির। সেই সূত্রে অসীমের সঙ্গে আলাপ, সেই উপলক্ষেই তার কিছুদিন আনাগোনা। তারপরে খুকুর সঙ্গে বার দুই দেখা হয় আর্ট একজিবিশনে। আর একবার বুঝি রাজগিরে। রাঙাদা, রাঙা বউদি আর খুকু, তিনজনে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে গাছতলায় উবু হয়ে বসে অসীম নিজের মনে স্কেচ করছে। সে গল্প রাঙা বউদির মুখেও শুনেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে যে আরো নিগূঢ় কাহিনী লুকিয়ে আছে তা কিছুতেই টের পান নি। দিনকে দিন তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে মেয়ে, আশালতা বুঝতে পারেন নি।

ওরে সর্বনাশী, এ ফাঁকি তুই কাকে দিলি, আমাকে না নিজেকে? মেয়ের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা ভেবে চোখ দিয়ে জল বেরোল আশালতার। আবার এগিয়ে এলেন মেয়ের কাছে। পরম স্নেহে পিঠে হাত রাখলেন। সে হাতে এখনো রান্নার গন্ধ, রান্নার দাগ। তারপর কোমল মৃদু স্বরে বললেন, 'মুখ তোল খুকু। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। এখনো আমার নাওয়া খাওয়া হয় নি। তোর জন্যে, শুধু তোর ভালোর জন্যে—। লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন, এখনো ফিরে আয়।'

বীথিকা মুখ তুলল না, কিন্তু কাতর কোমল অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। আমার আর কোন উপায় নেই।'

উপায় নেই!

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন আশালতা। মেয়ের দিকে তাকাতে তাঁর আর সাহস হল না। এতক্ষণে তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ল। কি অদ্ভুত মানুষ। এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এদিকে আগুনে যে সব ছারখার হয়ে গেল সে খেয়াল নেই।

আশালতা ছুটে চলে এলেন নিজেদের শোয়ার ঘরে। সুধাময়ের মুখের ওপর থেকে কাগজখানা এতক্ষণে সরে গেছে কিন্তু চোখের গাঢ় ঘুম একটুও যায়নি।

স্বামীর গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে আশালতা অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'ওগো শুনছ? আর কত ঘুমোবে তুমি? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল যে। তোমার মেয়ে নাকি এক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছে।'

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলেন সুধাময়। জড়ানো স্বরে, বোধহয় ঘুমের ঘোরেই জবাব দিলেন 'বেশ করেছে।'

নির্বাক আশালতা অপলকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর পিঠের দিকে। তাঁর নতুন করে চোখে পড়ল রোমশ প্রশস্ত পিঠখানা অবিকল সেই বুড়ো শ্বশুরের মত।

আষাঢ় ১৩৬২

বন্যা

গতবারের মত এবারও আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার জল দারুণ বাড়তে শুরু করল। মাঠ ময়দান আগেই তলিয়েছিল। এবার জল এগুতে এগুতে খালের ঘাটের সবগুলি পৈঠা ছাড়িয়ে মল্লিকদের বাঁশ-বাগানের আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আইনুদ্দিন শেখের উঠানের ওপর এসে দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে, তারপর জল গিরা পর্যন্ত উঠল। তাই দেখে আইনুদ্দিনের আট বছরের মেয়ে ময়নার ভারী ফূর্তি। সে ছোট ছোট দুখানি হাতে তালি দিতে দিতে বলল, "দেখছনি বাজান, কি মজা!"

ময়নার দু' হাতে দুটি লাল কাঁচের চুড়ি। শুক্রবারদিন ভাঙ্গার হাট থেকে কিনে এনেছে আইনুদ্দিন, মনোহারী দোকান থেকে এনেছে লাল ফিতে। তাই দিয়ে কাল বিকেলে ময়নার বিনুনী বেঁধে দিয়েছে জোবেদা। ভারী সতর্ক মেয়ে। পুরো একটি রাত গেছে। তবু সে বিনুনির একটুও এদিক ওদিক হয়নি। কিন্তু চুলগুলি কেমন যেন কটা কটা হয়েছে। ভাল তেল এনে দিতে হবে। মনে মনে ভাবল আইনুদ্দিন। জোবেদা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, তাকে ডেকে বলল, 'মাইয়ার চুল যে রাঙ্গা রাঙ্গা হইয়া রইল, তা দেখছনি?'

জোবেদা মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, 'হবে না ? নিজের চুল যেমন শেজারের কাঁটার মত খাড়া খাড়া, মাইয়ার চুলও সেইরকম হবে।'

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে জোবেদার। নাক চোখ কি গায়ের রঙের চেয়ে চুলের গর্বই তার বেশি। গোছে ভারী, লম্বায় বড়, রঙও তেমনি মিশমিশে। সেই চুলের সৌন্দর্য আরও বাড়াবার জন্যে হাট থেকে দামী গন্ধতেল এনে দেয় আইনুদ্দিন। কিন্তু তেল যেন দিনদিনই আগুন হচ্ছে।

আইনুদ্দিন বলল, 'হ, সেইজন্যেই কিনা। আমার ঘরের ক্যাশবতী নিজের চুল লইয়াই অস্থির। মাইয়ার চুলের দিকে চাওয়ার সময় আছে নাকি তার।'

ময়না দাম্পত্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, 'বাজান, তুমি কেবল মার সাথেই কথা কও। আমার কথা মোটেই শোন না। আমি আর তোমার সাথে কথা কব না।'

আইনুদ্দিন হেসে মেয়েকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, 'কও কও, কী কথা কও।'

ময়না বলল, 'পানি বাইয়া বাইয়া আমাগো উঠানে আইছে দেখছ নি বাজান। নাওয়ার জন্যে আর খালের ঘাটে যাইতে হবে না। গাঙ আসবে বাড়ির ওপর, আমরা সবাই মিলা ঝাপুর ঝুপুর কইরা নাব।'

শুধু মুখেই নয়, ময়না বাপের হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে সেই শুকনো বারান্দার উপরে একবার উঠে একবার বসে স্নানের ভঙ্গি দেখাতে লাগল।

কিন্তু আইনুদ্দিন বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'অত ফুর্তি করিস নারে ময়না, অত ফুর্তি করিস না। পানি যদি এইভাবে বাড়তেই থাকে, মাইনষের ঘরদুয়ার এবারও ভাইসা যাবে। ধান পান সব তলাবে। প্যাটে আর দানা পড়বে না, পানি খাইয়াই থাকতে হবে।'

জোবেদা ঝাঁট দিতে দিতে ঘর থেকে বারান্দায় নামল। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'আইচ্ছা তুমি কেমন ধারার মানুষ কও দেখি। মাইনষের হাসি-খুশি দেখতে পার না। ওই এক ফোটা মাইয়া, তারেও তুমি শাপ শাপান্ত করতেছ। ভাসে দ্যাশ ভাসবে। দশজনের যে গতি আমাগোও সেই গতি হবে। মরবার আগেই ভয়ে মইরা থাকব নাকি ? ইন্দুরের গর্তে ঢোকব ?'

কলকেটা হুঁকোর উপর দিয়ে আইনুদ্দিন তামাক টানতে টানতে মন্তব্য করল, 'ইন্দুরের গর্ত আর নাই বিবি। সেখানে আগেই পানি ঢুইকা রইছে।'

জোবেদা রাগ করে বলল, 'থাউক গিয়া।' তারপর মেয়েকে কাছে ডেকে নিয়ে মধুর প্রশ্রয়ের সুরে বলল, 'আয় ময়না, আমার কাছে আয়। ঝাপুর ঝুপুর কইর‍্যা নাইবি। তারপর কী করবি।'

বাপকে ছেড়ে ময়না এবার মায়ের পিঠের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'নাইয়া ধুইয়া খাব।'

'কী খাবি।'

'পিয়াইজ-বাটি আর কুমড়া দিয়া ইচা মাছের ছালোন।'

'তারপর ?'

'উঠানে তো আমার গলাপানি হবে মা ; বাজান ঘাটের নাও ঘরের থামের সাথে আইনা বান্দবে। খাইয়া লইয়া সেই নায়ে বইসা বইসা তুমি আর আমি আচাব, ফুত ফুত কইরা পানি ফেলব। না মা ?'

বলত বলতে ময়না খিল খিল করে হেসে উঠল।

জোবেদাও হেসে বলল, 'শোন, তোমার মাইয়ার কথা শোন।'

বছর তিরিশেক বয়স হয়েছে আইনুদ্দিনের। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুখে কালো চাপদাড়ি। তাতে মানুষটিকে আরো বেশি গম্ভীর দেখায়। স্ত্রী আর মেয়ের হাসি দেখে আইনুদ্দিনও একটু হাসল। তারপর হুঁকোটা বেড়ায় ঝুলিয়ে রেখে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সবরকম কাজই জানে আইনুদ্দিন, সবরকমের কাজই করতে হয়। ক্ষেতে কখনো কিষাণ খাটে, কখনো কামলা ঘরামির কাজ করে, জুটে গেলে কাঠ চেলা আর মাটি কাটার কাজেও লেগে যায়।

কিন্তু বর্ষার বাড়াবাড়িকে ময়না আর তার মা যেভাবে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়াপড়শীরা তা জানাতে পারল না। এক আঙুল দু আঙুল করে রোজ জল বাড়তে লাগল। তারপর চার আঙুল, ছ আঙুল। তারপর সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে জলে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে

গেল। উঠোনে কোমর জল, ঘরেও হাঁটু অবধি ডুবে যায়। বর্ষা নয়, বন্যা। গতবারের চেয়ে এবার দেড় গুণ বেশি। গাঁয়ের বাঁশের ঝাড় উজাড় হয়ে গেল। সবাই কাঁচা বাঁশ কেটে কেটে ঘরের মধ্যে মাচা বাঁধছে। বাড়ির উপর আর এক শরিক আছে আইনুদ্দিনের। ভাইপো মৈনুদ্দিন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। বিধবা মা আছে, বউ আছে। অন্য সময় চাচা ভাইপোর মধ্যে বনিবনাও হয় না। বাড়ির সীমানা নিয়ে, বাঁশের পাতা, গাছের ডাল নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। কিন্তু এখন দুজনে মিলে দুই ঘরেরই মাচা বাঁধল।

ময়না জল ভাঙে আর ঘুরে ঘুরে বাপের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'বাজান, কী কর।'

আইনুদ্দিন রূঢ় স্বরে জবাব দেয়, 'আমার মাথা করি। সব্বনাশী, হাইসা হাইসা কারে তুই ডাইকা আনলি, সব যে ভাইসা গেল।'

মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নেয় জোবেদা, স্বামীর দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বলে, 'ওযারে গাইলাও ক্যান, ওয়ার কী দোষ।'

মায়ের কোলে উঠেও ময়নার চোখ ছল ছল করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'মা, এত পানি আইল কোত্থিকা।'

আঁচল দিযে মেয়ের চোখের জল মুছাতে মুছাতে জোবেদা বলে, 'কান্দিস না ময়না কান্দিস না।'

বাপ-মাযের অনাদরে, আর পেটের ক্ষিদেয় মেয়ের চোখে জল আসে, এইটুকুই জোবেদা জানে। কিন্তু বন্যার এই রাশ রাশ জল কোত্থেকে আসে তা সে কী করে বলবে।

কতদূরে গাঙ। গোসল করে কলসী ভরে জল নিয়ে আসতে আসতে সারা বছর কাঁখ ভেঙে যেতে চায় জোবেদার। নাইতে গিযে ঘাটে গরু আর মানুষের ভিড় দেখে কাজিদের শনের ভিটার কাছে ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর ঘাট নিরালা হলে জলে যখন নামে, তখন জল আর জল থাকে না, কাদা হযে যায়। গা মাথা ভেজে কি ভেজে না, কোনরকমে দুটি ডুব দিয়ে বাড়ি চলে আসে জোবেদা। খরার সময় যে গাঙ বাঁধবার জন্যে এক কলসী পানি দিতে পারে না, বর্ষার সময় সে সব ভাসিয়ে দিতে আসে কেন, তা ময়নার মা কী করে জানবে।

ময়না যা বলেছিল, তাই হয়েছে। পুরনো ছোট ডিঙিখানা আজকাল বারান্দার খুঁটির সঙ্গেই বেঁধে রাখে আইনুদ্দিন। বেড়া যদি না থাকত তাহলে ঘরের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে নেওয়া যেত। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর ওঠে। বেয়ে বেয়ে ওঠে সবচেয়ে উঁচু তালগাছটার মাথায়।

ময়না বলে, 'কী দেখ বাজান?'

জোবেদা শঙ্কিত হয়ে বলে, 'ওখানে ওঠছ ক্যানে? পইড়া মরবা, পইড়া মরবা। নাম শিগ্গির।'

আইনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলে, 'থাম মাগী, দেইখা লই।'

তালগাছের মাথায় উঠে চেয়ে চেয়ে বন্যার রূপ দেখে আইনুদ্দিন। কোথাও এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। সব জলে জলাকার, সব একাকার হয়ে গেছে। কইডুবি, সাইমুস্যাদি, তালকান্দি, চরকান্দি, চাঁদের কান্দির সঙ্গে তাদের পুব-সদরদি, পশ্চিম সদরদিও জলের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। ডুবে গেছে বাইশ সদরদির মৌজা। আর মানুষ সেই ডুবন্ত পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ঘরের চালে, গাছের ডালে, ডিঙিতে ডিঙিতে, তালগাছের ডোঙায়, কলাগাছের ভেলায়। মাছের মত জলচর হয়ে রয়েছে বাইশ সদরদির হিন্দু-মুসলমান। বামুন কায়েত, ধোপা নাপিত, সাহা নমঃশূদ্র, জোলা আর মোল্লারা। মাছেরও জাত আছে কিন্তু জলে ডোবা মানুষের জাত নেই।

স্ত্রীর ধমকে চমক ভাঙল আইনুদ্দিনের।

জোবেদা চেঁচিয়ে বলল, 'গাছে উইঠা বইসা থাকলেই হবে নাকি। নাইমা আস। শিগগির। মাইয়াডা সে শুগাইয়া মরল। দানাপানি কিছু দেবানা ওয়ারে!'

আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল আইনুদ্দিন। বউ আর মেয়ের খোরাকের জোগাড়ে বেরোতে হবে বটে। নিজের পেটও ক্ষিদেয জ্বলছে। কাঠা কয়েক ধান যা গোলায় তুলেছিল, বর্ষা শুরু হতে না হতে তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে দিন আনা দিন খাওয়া। কিন্তু এখন আনবে কোত্থেকে। কাজ দেবে কে। পাকিস্থান হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে অবস্থাপন্ন প্রায় সব হিন্দুই দেশ

ছেড়ে চলে গেছে। যাদের হাতে দুটো পয়সা ছিল, তাদের প্রায় কেউ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, পাটের দর নেই, দুধ মাছের দর পড়ে গেছে। আইনুদ্দিনের মত নিরক্ষর কামলা কিষাণকে কাজ দেবে কে। তারপর এই ভরা বর্ষা, আর সর্বনাশা বন্যা।

তবু ডিঙি নৌকো নিয়ে খোরাকের সন্ধানে বেরোল আইনুদ্দিন। কাজের সন্ধানে চলল। সারা গ্রাম জলে ভাসছে। মুসলমান আর নমঃশূদ্র পাড়ার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কেউ বা ঘরের মধ্যে জ্বরে ভুগছে, কারো বা ঘরই ভেঙে পড়েছে। ধোপাদের খাল দিয়ে এগোতে এগোতে আরো কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আইনুদ্দিনের। রায়েদের বর্গাদার ইয়াসিন মিঞা, ঘরামি বলাই মণ্ডল আর আইনুদ্দিনের মতই কামলা ছদন বদন দুই ভাই ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছে। আইনুদ্দিন দেখেই বুঝতে পারল, তারাও কাজের বদলে খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ইয়াসিন বলল, 'কি আনু শেখ, কাজকর্ম কিছু জোটল?'

আইনুদ্দিন হতাশভাবে বলল, 'না কাজ আর কই।'

বলাই বলল, 'ঘর কোন বেটার আস্তা নাই। কিন্তু ঘরামি লাগাবে না কেউ।'

ছদন বলল, 'লাগাইয়া কী করবে? ঘর আইজ সারাবা, কাইল আবার হেইলা পড়বে। তাছাড়া পয়সা কই মাইনষের?'

ইয়াসিন বলল, 'দুনিয়ায় আর কোন কাজ নাই। কেবল এক কাজ আছে। চাওতো নিশানা দিতে পারি।'

সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। 'কী কাজ। কোথায়! কার বাড়িতে কওনা মেঞা?'

ইয়াসিন বলল, 'এই দরিয়ার পানি সেচতে আরম্ভ কর। কাজের অভাব কী।'

সবাই রাগ করল। বে আক্কেল ইয়াসিনের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এত দুঃখ-ধান্দার মধ্যেও ওর রঙ্গরস যায় না।

রায়বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি ঘুরে ঘুরে সের দুই চাল শেষ পর্যন্ত জোগাড় করল আইনুদ্দিন। ললিত মিস্ত্রীর কাছ থেকে টাকাও ধার করে আনল গোটা তিনেক। নৌকো বিক্রি করে মিস্ত্রী বছর দুই ধরে বেশ লাভ করছে।

অর্ধেক চাল ভবিষ্যতের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক সিদ্ধ করল জোবেদা। দিন কাটল। মাচার উপরে রাত্রির অন্ধকার নামল। হ্যারিকেন একটি আছে। কিন্তু জ্বলে না। কী করে যেন জল ঢুকেছে তার মধ্যে। তেলের জোগাড় হয়নি।

ময়না বলল, 'অন্ধকারে আমার ভয় করে মা।'

জোবেদা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'ভয় কিরে পাগলী। তুইতো আমার বুকের মধ্যে আছিস। আমার দিলজান। সাপ আসুক, বাঘ আসুক, আমার জান না নিয়া তোরে কেউ ছুঁইতে পারবে না।'

আইনুদ্দিনও মেয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ভয় কি। কাইলই বাজার থিকা তেল নিয়া আসব। সারা রাইত বাতি জ্বালাইয়া রাখব ঘরে।'

পরদিন ভোরে উঠে আইনুদ্দিন ফের কাজের চেষ্টায় বেরোচ্ছে, গাঁয়ের এম ই স্কুলের মাস্টার গোপাল সা আর ইসমাইল সিকদার এসে হাজির। উঠানের উপর দিয়ে বৈঠা বাইতে বাইতে আইনুদ্দিনের ঘরের কাছে নৌকো ভিড়াল তারা। বড় নৌকোয় শুধু তারা দুজনই নেই, পাড়ার আরো লোকজন আছে।

আইনুদ্দিন বলল, 'ব্যাপার কী মাস্টার মশায়।'

গোপাল মাস্টার বলল, 'তৈরি হইয়া লও। যাইতে হবে আমাগো সাথে।'

আইনুদ্দিন অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়।'

ইসমাইল সিকদার বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত জেরা-ফেরার দরকার কি। তা কইতেছি তাই কর! যাইতে হবে অনেক জাগায়। থানার বড় দারোগার কাছে যাব, সার্কেল অফিসারের কাছে যাব, আদালতের মুনসেফের কাছেও যাব আমরা। দরগায় দরগায় সিন্দি মানতে হবে। যে পীর এখন দোয়া করে।'

ব্যাপারটা আইনুদ্দিনকে ওরা আরো ভাল করে বুঝিয়ে বলল। গ্রামের লোকজন নিয়ে সরকারী সাহায্যের জন্যে দরবার করতে যাচ্ছে তারা। ধান নেই, চাল নেই, নুন নেই, তেল নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, গাঁয়ের গরিব লোক বাঁচে কী করে! একথা সরকারী লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে সাহায্যের দাবি করতে হবে। তার জন্যে জনবল দরকার। দুজন একজনের কাজ নয়। যত বেশি পারে, নৌকো বোঝাই করে ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার লোকজন নিয়ে হাজির হবে শহরে। কিছু-না-কিছু সাহায্য মিলবেই। শোনা যায়, চণ্ডীদাসদির লোকেরা নাকি এইভাবে গিয়ে ধান আর কাপড় আদায় করেছে।

শুনে আইনুদ্দিন উল্লসিত হয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে মাস্টার মৌলবীদের সঙ্গে। এর আবার আপত্তি করবার কী আছে? তাছাড়া এত লোকজন দেখে মনে ভারী বল এল আইনুদ্দিনের। তাহলে সত্যিই দরিয়া সেচবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এরা। সবাই মিলে জোট বাঁধলে, সব মিলে একসঙ্গে বৈঠা চালালে বন্যার জল না কমাতে পারলেও এই দুঃখের দরিয়া তারা পাড়ি দিতে নিশ্চয়ই পারবে। আধময়লা আধাভেজা জামাটা গায়ে দিয়ে তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে চেপে প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে চলল আইনুদ্দিন। নৌকোয় উঠবার আগে মেয়েকে আর একবার ডেকে বলল, 'চললাম মা, সাবধান হইয়া থাইকো।'

ময়না বল, 'বাজান, আমার সেই ফিতা জলে ভাইসা গেছে। আমার জন্যে রাঙ্গা ফিতা আইনো।'

'আইচ্ছা।'

'আর গন্ধ তেল। মাথায় মাখব।'

'আইচ্ছা।'

'আর এক সের কেরাসিনও মনে কইরা আইনো বাজান। আমি কিন্তু আইজ আর অন্ধকারে থাকতে পারব না।'

আইনুদ্দিন এবার হেসে বলল, 'সব আনব। তোমার জন্যে ভাঙ্গার বাজারখান সুদ্দা নিয়া আসব মা।'

নিজের ছোট্ট ডিঙিখানা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল ঘরের খুঁটির সঙ্গে। তালাচাবি আর লাগাল না। দেখবার জন্যে জোবেদাই তো আছে। বড় নৌকোয় উঠে বৈঠা হাতে নিল আইনুদ্দিন। ভাইপো মৈনুদ্দিন বলল, 'আমিও আয়ি চাচা।' সেও চলল সঙ্গে। যতগুলি মানুষ প্রায় ততগুলি বৈঠা। যেন বাইচের নৌকো চলেছে, বন্যার সঙ্গে বাইচ। কে বলবে গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষ অভুক্ত অর্ধভুক্ত রয়েছে কদিন ধরে। কে বলবে এদের গায়ে জোর নেই, মনে জোর নেই। এতগুলি বৈঠার ঝপাত্‌ঝপ শব্দ শুনে, এত বড় নৌকোখানাকে তীরের মত ছুটে চলতে দেখে কারো তা সাধ্য আছে বলবার? ঘাটে ঘাটে আরো লোক উঠল, আশেপাশে পিছনে আরো নৌকো ছুটল। খাল ছাড়িয়ে নদীতে পড়ল নৌকো। কুমারের এপার ওপার সব একাকার হয়ে গেছে। নদী নয়, যেন সমুদ্র। স্রোত উজান বাতাস উজান; তবু সেই উজানের বিরুদ্ধে ছুটে চলল নৌকো।

শহরও জলে তলানো। কালীবাড়িতে জল, মসজিদ বাড়িতে জল, থানায় জল, কাছারিতে জল। দোকানপাট স্কুল আদালত সব জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। দলের মুখপাত্র ইসমাইল আর গোপাল মাস্টার সহজে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারল না। অফিসাররা বজরায় করে বন্যা দেখতে বেরিয়েছেন, গ্রাম গ্রামান্তরে লোকজনের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে গেছেন। ফির আসতে আসতে বেলা তিনটে বাজল। দারোগা সাহেব গোপাল আর ইসমাইলের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনলেন এবং উপর থেকে যে সাহায্য আসছে, সে আশার বাণীও শোনালেন। দু একদিনের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট এদিকটা দেখতে আসবেন। তখন নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা হবে। হাতে হাতে তিনি আর কী দিতে পারেন? তাঁর সাধ্য কি। সব ওপরওয়ালার হাত।

লোকজনের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মাতব্বররা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের শান্ত করল। নৌকোয় উঠে ফের সবাই বৈঠা হাতে নিল। আগেকার মত উৎসাহ আর কারো মনে নেই। জোর নেই হাতের বৈঠায়। পেটে খিদে, বুকে জ্বালা, দেহমন অবসন্ন। বেলা

পড়ে এসেছে। মাথার উপরের সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। হাতের বৈঠা পড়ে কি পড়ে না। আশ্চর্য বাৎসল্য আইনুদ্দিনের, এরই মধ্যে সে জল ভেঙে ভেঙে শহর খুঁজে খুঁজে চুলের ফিতা, গন্ধতেল, আর কেরোসিন তেল জোগাড় করে এনেছে। পাছে লোকে দেখে ঠাট্টা করে, তাই ছাতার তলায় লুকিয়ে রেখেছে জিনিসগুলি। তবু কারো কারো চোখে পড়ল। এবং এই নিয়ে টিকাটিপ্পনিও কাটল কেউ কেউ। কিন্তু তারা তো জানে না এই মেয়ে আইনুদ্দিনের কী, আগে পিছে আরো দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল তাদের। একটি জ্বরে, আর একটি কলেরায় শেষ হয়েছে। এখন ওই ময়নাই সব। একজন নয়, তিনজনের আদর ও একা ভোগ করে।

ঘাটে ঘাটে—ঘাটে ঘাটে নয়, ঘরে ঘরে, এখন ঘরই ঘাট—ঘরে ঘরে লোক নামিয়ে দিতে দিতে নৌকো প্রায় খালি হয়ে গেল। খালের ভিতর দিয়ে, সিকদার আর কাজী বাড়ির মাঝখান দিয়ে আইনুদ্দিনের বাড়িতে সীমানায় নৌকো এসে লাগতে-না-লাগতেই ভিতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। আরো দু' একখানা ডিঙি এগিয়ে এল বড় নৌকোখানার কাছে।

আইনুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বলল, 'ব্যাপারডা কী। কান্দে কেডা। কী হইছে ছদন?'

ছদন ধরাগলায় বলল, 'কিছু হয় নাই। আইস, ভিতরে আইস মেঞা ভাই।'

আইনুদ্দিন বলল, 'কিছু হয় নাই তো আমার উঠানের ওর অমন হাট মেলছে ক্যান। এত গোলমাল এত লোকজন কিসের।'

আর গোপন রাখা গেল না। নিজের চোখেই সব দেখতে পেল আইনুদ্দিন। তার সেই ডিঙিখানায় ময়নাকে শুয়ে রাখা হয়েছে। চোখ দুটি বোজা। ঠোঁট দুটি নীলচে। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে। চারদিকে লোকের ভিড়। মাচা থেকে ঘরের মেঝেয় জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে জোবেদা। সিকদারদের বড় বিবি, করিমের মা, দুজনেই তাকে টানাটানি করছে। কিন্তু কেউ তুলতে পারছে না।

ছদন শেখের মুখে ঘটনাটা সবাই শুনতে পেল। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে মাচার উপরে মাদুর পেতে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ছিল জোবেদা। কাল রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি। তাই শুতে-না-শুতেই চোখ ভেঙে কালঘুম এসেছিল। কখন যে ময়না কোলের কাছ থেকে উঠে গেছে সে জানতেও পারেনি। ঘরের মধ্যে মাচার ওপর দিনের পর দিন বসে থেকে থেকে ময়নারও হাঁপ ধরে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে সে ডিঙিতে উঠে বসেছিল। বেশিক্ষণ সেখানেও বসে থাকতে ভাল লাগেনি। দড়ির বাঁধন খুলে লগি ঠেলে উঠান-সমুদ্রের এপার-ওপার হবার চেষ্টা করেছিল ময়না। কিন্তু খোঁচ দিয়ে বোধ হয় টাল সামলাতে পারেনি।

মৈনুদ্দিনের বউ লালবানুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় জোবেদার। 'গেল গেল, ও চাচী, তোমার মাইয়া ডুইবা গেল। ধর ধর, সব্বনাশ হইল।'

ভর দুপুর। ধারে কাছে পুরুষ ছেলে কেউ ছিল না। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই সাহায্যের আবেদনের জন্যে শহরে গেছে। ছদন-বদনরা কাজের চেষ্টায় গিয়েছিল দক্ষিণপাড়ার দিকে। এসে দেখে এই কাণ্ড। মৈনুদ্দিনের মা বউ আর জোবেদা তিনজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। কিন্তু সহজে খুঁজে পায়নি, তাড়াতাড়ি তুলতে পারেনি। যখন তুলেছে, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। গাঁয়ের শ্যাম ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল ছদন শেখ। তিনি এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা টরিক্ষা করে শেষে জবাব দিয়ে গেছেন। এখন আর কারো কিছু করবার নেই।

আইনুদ্দিন ফের ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিল। ধরে রাখল জোর করে।

ইয়াসিন বলল, 'আর ডাক্তার-বৈদ্যের কাছে দৌড়াইয়া কী হবে মেঞা। এখন বউডারে সামলাও, খোদার নাম কর।'

আইনুদ্দিন রুখে উঠল, 'খবরদার। সে শালার নাম আমার কাছে কেউ কইরো না। তোমরা। কইরো না কইয়া দিলাম।'

শোকার্ত বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ বাদে প্রতিবেশীরা প্রায় সবাই বিদায় নিল। ইয়াসিন আর ছদন শেখ রয়ে গেলে শেষ কাজ করবার জন্যে। কিন্তু জোবেদা কিছুতেই ছাড়বে না

মেয়েকে। সে জোর করে ময়নাকে ডিঙি থেকে তুলে মাচার উপরে শুইয়ে দিল। উপুড় হয়ে আগলে রইল তাকে।

'নিতে পারবা না। কেউ আমার দিলজানরে আমার কাছ থিকা কাইড়া নিতে পারবা না তোমরা।'

ইয়াসিন বলল, 'যে যাবার সে তো চইলা গেছে বউ। এখন রইছে কেবল মাটিটুকু। মাটিরে মাটির সাথে মিশা থাকতে দাও। মাটির নীচে শান্তিতে ঘুমাইয়া থাউক তোমার ময়না।'

জোবেদা প্রতিবাদ করে উঠল, 'মিছা কথা, মিছা কথা কইতেছ তোমরা। এই জলের দেশে মাটি কোথায় পাবা যে মাটির নীচে শোয়াবা আমার জানরে। তোমরা ওযারে জলে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যে আইছ। তা আমি দিতে দিমু না। যে পানি আমার এমন সব্বনাশ করল তারে দিমু না আমি। দুইটা দিন সবুর কর। পইচা গইলা আমি আগে মাটি হই। সেই মাটি দিয়া ঢাইকো আমার জানরে, তবু পানিতে দিয়ো না।'

চন্দন বলল, 'কাইন্দা আর কি করবা বউ, খোদারে ডাক।'

জোবেদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না খোদা, তোমারে আর ডাকব না, তুমি নাই, তুমি নাই। বানের জলে ধুইয়া গেছ, ভাইসা গেছ, তলাইয়া গেছ তুমি।'

অবুঝ মার বুক থেকে ইয়াসিনরা শেষ পর্যন্ত ময়নার মৃতদেহকে জোর করে কেড়ে নিল। সাদা কাপড় জড়িয়ে নৌকোয় তুলল তাকে। খান তিনেক কোদাল নিল সঙ্গে।

ভিটে ঘাটায় যদি কোথাও এক ফোঁটা মাটি পাওয়া যায়। নৌকোয় করে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত সারাগ্রাম ঘুরে বেড়াল। না, কোথাও একফোঁটা শুকনো মাটি নেই। নদীর ধারে কালী খোলায় হিন্দুদের শ্মশানের উপর গলাজল। মাঠের ধারে মুসলমানের কবরখানা অনেক আগেই তলিয়েছে। তাছাড়া কত উঁচু উঁচু জংলা ভিটা ছিল। সব ডুবেছে। বাইশ সদরদির এত বড় মৌজায় এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন নেই। অন্ধকারে শেষ পর্যন্ত কুমারের স্রোতে ময়নাকে ছেড়ে দিয়ে এল তারা।

নদীর জলে আইনুদ্দিনের চোখের জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। আইনুদ্দিন বলল, 'যাও দিলজান, মাটির দেশে যাও। আমি তোমার মাটির ব্যবস্থা করতে পারলাম না। নিজের মাটি তুমি নিজেই খুঁইজা নিও।'

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল আইনুদ্দিন। সংজ্ঞা হারিয়ে জোবেদা তখনও ঘরের মেঝেয় জলের মধ্যে পড়ে আছে। পাঁজাকোলে করে তাকে তুলে নিল আইনুদ্দিন। শাড়ি বদলে দিল, কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে দিল চুলের রাশ। জেগে উঠল জোবেদা। সারারাত স্বামী-স্ত্রী সেই অন্ধকারে বাঁশের মাচার উপর স্তব্ধ হয়ে জেগে রইল। আজ আর তাদের মাঝখানে কেউ নেই। আজ ঘরে কেরোসিন তেল আছে, হ্যারিকেন আছে, দিয়াশলাই আছে, কিন্তু আলো জ্বালবার প্রয়োজন নেই কারো।

জল আরো বাড়তে লাগল। তারপরে শুরু হল বৃষ্টি। অবিরাম বৃষ্টি। কদিনের মধ্যে লোকের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল। মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়ল ঘরগুলি। আইনুদ্দিনদের খালের ঘাট দিয়ে রোজই একটা দুটো করে গরু ছাগল ভেসে যেতে লাগল। মনে হল কোন কোনটা একেবারে মরেনি। জীবন্ত অবস্থাতেই ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আইনুদ্দিন নির্বিকার।

তারপর শুধু গরুছাগল, কুকুর বিড়াল নয়, কলেরায় দু' একজন করে মানুষও মারা যেতে লাগল। আইনুদ্দিনেরই বন্ধু জোয়ান রহমৎ কাজী মারা গেল হঠাৎ। তার বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। পাড়া-পড়শীরা অনেকেই ছুটে গেল। কিন্তু আইনুদ্দিন আর জোবেদা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। দুনিয়ার কোন ঘটনাই আর তাদের টলাতে পারে না।

আবার দেখা গেল, ইসমাইল আর গোপাল মাস্টারের নৌকো। ছাত্রদের নিয়ে, গাঁয়ের যুবকদের নিয়ে তারা নিজেরাই এবার এক সেবা-সমিতি খুলেছে। সচ্ছল সম্পন্ন গৃহস্থদের কাছ থেকে টাকা চাল আর পুরনো কাপড় চেয়ে নিয়ে গরীবদের বিলাচ্ছে। সেই নৌকোয় বৈঠা ধরবার জন্যে আইনুদ্দিনকেও তারা ডাকতে এল। টাকা পয়সা দিয়ে তো সাহায্য করতে পারবে না। গায়ে খাটতে পারবে। তাই খাটুক দশজনের জন্যে। কিন্তু আইনুদ্দিন বলল, 'না মাস্টার আর না। তোমাগো নায়ে আর ওঠব না আমি।' তোমাগো চক্রান্তে পইড়া আমার সব গেছে।'

গোপাল মাস্টার অনেক করে বুঝাল, 'তোমারই পাড়া-পড়শী ভাইবন্ধুরা কষ্ট পাইতেছে আইনুদ্দিন। না খাইয়া, যা তা খাইয়া রোগে ভুইগা ভুইগা মরতেছে।'

আইনুদ্দিন নিস্পৃহ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'মরুক গিয়া। দুনিয়ায় মরবার জন্যেই তো সব আইছে। মানুষ মরবে এ আর এমন বেশি কথা কী।'

হুঁকো হাতে আইনুদ্দিন ফের ঘরের মাচার উপরে গিয়ে বসল। এ মাচাও মচমচ করতে শুরু করেছে। এ-মাচাও ভাঙল বলে। তার ঘরখানাও হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে। যদি পড়ে, আইনুদ্দিন আর নতুন করে ঘর বাঁধবে না। বন্যার জল তাকে আর জোবেদাকে যেখানে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে-পথে ময়না গেছে, সেই পথেই যাবে তারা। বানের জলে স্নেহমমতা, দয়া-মায়া ক্ষুধার যন্ত্রণা, শোকের জ্বালা কিছুই আর বাকি থাকবে না। সবভাসানী সব ভাসাবে।

পরদিনও অশ্রান্ত বৃষ্টি। সারাদিন আইনুদ্দিন আর বাইরে যেতে পারল না। বাইরে যাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছাও হল না। এই জলবৃষ্টির মধ্যে কে আর তাকে কাজ দেবে, কে দেবে খয়রাত। ঘরে অল্প যা একমুঠ চাল ছিল তার সঙ্গে কচু আর শাপলা মিশিয়ে সিদ্ধ করল জোবেদা। কোন রকমে দুগ্রাস মুখে দিয়ে জড়সর হয়ে দুজনে পড়ে রইল মাচার উপর। যেভাবে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, আর উল্টোপাল্টা বাতাস বইছে সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঘর ভেঙে পড়বার আগেই আকাশটা সুদ্ধ চালের উপর ধ্বসে পড়বে। আজ প্রলয় হবে পৃথিবীর। কেউ রক্ষা পাবে না। রক্ষা পেতে চায়ই বা কে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে একজন স্ত্রীলোকের গলা শোনা গেল, 'ও আনু মেঞা, ও জোবেদা বিবি, দুয়ার খোল, দুয়ার খোল। বাঁচাও বাঁচাও।'

প্রথমে মনে হল আইনুদ্দিন ভুল শুনছে। এই জলবৃষ্টির মধ্যে কে আসবে তাদের দুয়ারে। আসবেই বা কী করে। চারদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল। জনমানুষ কেউ আছে নাকি সংসারে যে আসবে।

আইনুদ্দিন বলল, 'শুইয়া থাক জোবেদা, ও আমাগো কানের ভুল, মনের ভুল।'

কিন্তু জোবেদা বলল, 'না দেইখা আসি। মাইনষের গলা শোনলাম, এখন গোংরানি শোনতেছি, কাতরানি শোনতেছি। দেইখা আসি কেডা অমন করে।'

জল ভাঙতে ভাঙতে দোর খুলল জোবেদা। তাদের বারান্দায় এক হাঁটু জলের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক বসে বসে কাতরাচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে জোবেদা তাকে চিনতে পেরে বলল, 'ওমা এযে সদু মিঞার পরিবার সাকিনা।'

সাকিনা কাতর স্বরে বলল, 'হ দিদি আমিই। আমারে ধইরা তোল, মইরা গেলাম আমি।'

আইনুদ্দিনও এবার উঠে দাঁড়াল। আলো জ্বালল ঘরে। তাকে দেখে মুখ নীচু করল সাকিনা। তবু আইনুদ্দিন সবই বুঝতে পারল। ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে মাস ছয়েক আগে সদু মিঞার জেল হয়েছে। তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এতদিন বাড়িতে বাড়িতে ধান ভেনে খাচ্ছিল। এই বর্ষার কমাসে খুবই বিপাকে পড়েছে। তার ঘরে কোমর অবধি জল। দেখবার শোনবার কেউ নেই। এতদিন যে কী করে টিকে আছে তাই আশ্চর্য।

জোবেদা তাকে হাত ধরে তুলে আনল, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'বাথা উঠছে নাকি?'

সাকিনা বলল, 'হ।'

জোবেদা বলল, 'ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। এই অবস্থায় আইলা কেমনে।'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল সাকিনার। আস্তে আস্তে বলল, 'জানের দায়ে আসছি দিদি। ডোঙা ছিল ঘরের কোনায়। তাই বাইয়া বাইয়া আসছি। না আইসা করব কি। ঘরখান আইজ হেইলা পড়ল। ভয় করতে লাগল একলা একলা।'

জোবেদা বলল, 'আমার এখনও ভয় করতেছে। কী সাহস তোমার। ধইন্য মাইয়ামানুষ তুমি। আইস, ঘরের মধ্যে আইস, মাচার ওপর আইস।'

সাকিনাকে জায়গা করে দিয়ে নিজে বারান্দায় এক আঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল আইনুদ্দিন।

বাইরে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে, বাতাসের শব্দের সঙ্গে গর্ভিণী নারীর গোঙানির শব্দ পাল্লা দিয়ে চলল। তারপর শেষরাত্রির দিকে জোবেদা তাকে ডেকে বলল, 'আইস, ঘরে আইস এবার।'

এখন আর গোঙানি নয়, স্পষ্ট শিশুর কান্না শুনতে পেল আইনুদ্দিন।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হইল?'

জোবেদা জবাব দিল, 'মাইয়া।'

রক্তমাখা পুরনো শাড়ি আর আইনুদ্দিনের ছেঁড়া লুঙ্গির মধ্যে শুয়ে শিশুটি তখনো কাঁদছে। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আইনুদ্দিন ফের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভোর ভোর সময় বেড়ায় ঝোলানো বাঁশের চোঙা থেকে তামাক নেওয়ার জন্যে আবার এল ঘরে। তখন সাকিনার জ্ঞান ফিরেছে।

চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জোবেদাকে দেখে তার হাতখানা চেপে ধরল সাকিনা, তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'তাজা আছে দিদি?'

জোবেদা হাসিমুখে বলল, 'হ বুইন, তাজাই আছে। তোমার কষ্টের ফল ফলছে। খোদার দোয়া।'

সাকিনা বলল, 'তোমাগোও দোয়া। কী হইছে? ছাওয়াল না মাইয়া?'

জোবেদা আস্তে আস্তে বলল, 'মাইয়া।'

বলে স্তব্ধ হয়ে রইল জোবেদা।

সাকিনা হঠাৎ আরো জোরে হাত চেপে ধরল তার, বলল, 'দুঃখ কইরো না দিদি। বানের জলে সে-ই আবার ভাইসা আইছে। এ তোমাগো সেই ময়না।'

দাই আর প্রসূতী দুজনের চোখেই জলের ধারা নামল।

জোবেদা মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলল 'না বুইন, না, সেই সব্বনাশীর নাম আর না, আর না।'

আইনুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'না না, তার নাম আর না, আর না।'

কিন্তু বুকের ভিতর থেকে প্রাণপাখি নিজের পুরনো নাম ধরে কেবলই ডাকতে লাগল, 'ময়না, ময়না, ময়না।'

ভাদ্র ১৩৬২

সংস্কারক

লেকের ধারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। আমি আর আমার সদ্যোলব্ধ বন্ধু সুধাবিন্দু রায়। আমার এই বর্ষীয়ান বন্ধুটি চক্রাকারে ভ্রমণ ভালবাসেন না। লেকের চারপাশে যেখানে নানা বয়সী বায়ুসেবীরা পাক খায়, তাদের অনুগমন করা তাঁর রুচিবিরুদ্ধ। ফাঁকা জায়গায় সোজাসুজি হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। তিনি বলেন, "আপনারা গল্প-লেখক, তাই গোলাকার পথই আপনাদের পছন্দ, কিন্তু আমার পথ সোজা। সামনে যতদূর চোখ যায়, ততদূর আমর হাঁটতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই কলকাতা শহরে সেই ইচ্ছাপূরণের কি জো আছে? এখানে পদে পদে বাধা। চোখের বাধা, পায়ের বাধা, মনের বাধা। শুধু শহরই বা বলি কেন, সারা দেশটাই ত এমনি।"

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটু জনবিরল জায়গা বেছে নিয়ে আমরা দুজনে ঘাসের উপর মুখোমুখি বসলাম। চারদিকের বাড়িগুলিতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে এই ধরনের আধো আলো আধো ছায়ায় ভরা ঘরগুলি দেখতে আমার বড় অদ্ভুত লাগে। সন্ধ্যার আলোয় মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যেন এক রহস্যের ছোঁয়া পায়। মনে মনে ভাবি, এই জীবন-রহস্যের কতটুকুই বা এজন্মে জেনে আর জানিয়ে যেতে পারব।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়। হঠাৎ আমার বন্ধুর কথায় চমক ভাঙল, "ও দিকে কী দেখছেন, ওপরের দিকে তাকান, আকাশ দেখুন, নক্ষত্রলোক দেখুন। আমি এখানে আসি তাই দেখবার জন্যে। দিনের বেলায় নানা কাজের চাপে সংসার-চিন্তার জ্বালায় এত বড় আকাশকে

দেখেও দেখিনে মশাই। দেখব কি. রাস্তার ভিড়ে নিজের কাছা-কোছা সামলাতেই অস্থির। তা ছাড়া গাড়ি চাপা পড়বার ভয় নেই ? বয়স অবশ্য ষাটের কাছাকাছি হল, কিন্তু তাই বলে আমি অমন অপঘাত-মৃত্যু চাইনে। বরং আরও বছর ষাটেক বাঁচতে পারলে আমি খুশী হই। এখনও অনেক কাজ বাকী।"

আমি হেসে বললাম,"বলেন কী। আপনার কথাবার্তার ধরনে এ-পৃথিবী ত বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।"

সুধাবিন্দুবাবু আমার সূক্ষ্ম খোঁচায় উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর একটু চড়া গলায় বললেন, "বাসযোগ্য ত নয়ই। অনাচার, ব্যভিচার, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতায় দেশ ভরে গেছে। কিন্তু সমস্ত আগাছার জঙ্গল উপড়ে ফেলে বাস্তু বানাতে হবে, ঘর তুলতে হবে। আর সেইজন্যেই বাঁচা দরকার। আমারও, আপনারও। এ ছাড়া বেঁচে থাকবার আর কোন সার্থকতা নেই। আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে। কিন্তু হাজার ইচ্ছা করলেও, আমাদের স্ত্রী-পুত্র হাজার কাকুতি-মিনতি করলেও মরবার পর আর ফিরে আসা হবে না। যা করবার এই জীবনেই করে যেতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে করতে হবে লক্ষ বর্ষের সমান। আমার কথাগুলি ভেবে দেখেছেন ?"

আমি বললাম, "হুঁ।"

তিনি আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে কেন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, বললেন, "ছাই দেখেছেন। দেশের কথা, সমাজের কথা কিছু ভেবে দেখেন না আপনারা। আপনারা এই লেখকরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে সমাজের চেহারা অন্য রকম হত। আকাশের কথা বলছিলাম। মাথার উপর যে আকাশ আছে, তার পায়ের তলায় এই বিপুলা পৃথিবী, এ-কথা সাধারণ মানুষের মনে থাকে না। মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা যাঁরা শিল্পী, তাঁরাই ত মানুষকে উদারতার দিকে টানবেন, ছোট মানুষকে বড় করবেন, বৃহত্তর মহত্তর জীবনের সন্ধান দেবেন। কিন্তু সব ভুলে গিয়ে আপনারা তুলে নিয়েছেন শুধু সেক্স। আপনাদের কথা-সাহিত্যে ও ছাড়া আর কোন কথা নেই। স্বকীয়া, পরকীয়া, আজকাল আবার আরও বিকৃতি এসেছে। আরে মশাই, নারী-পুরুষের এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ ত হাজার হাজার বছর ধরে একই ধারায় চলেছে। মানুষের সভ্যতায় ও সম্পর্কের এমন কী মৌলিক অদল-বদল হয়েছে যা নিয়ে আপনি নতুন কিছু লিখতে সাহস পান ?"

আমি নিরুত্তরে আমার উদ্দীপ্ত বিক্ষুব্ধ বন্ধুকে দেখতে লাগলাম। ছিপছিপে, দীর্ঘ চেহারা। বয়সের ভার দেহের উপর জমেনি। বরং নাক ঠোঁট চিবুকের গড়ন এখনও বেশ ধারালো। আর কথা ত নয়, বাঁকা তলোয়ার। খাপে ঢাকা নয়, খাপ খোলা। সুধাবিন্দুবাবু আধুনিক সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির কঠিন সমালোচক। বৃত্তিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেও নিজের বিদ্যাকে শুধু ছাত্রদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করেই খুশী থাকেন নি, নিজের বিষয় ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসে পড়াশুনোর অভ্যাস এবং আগ্রহ বজায় রেখেছেন।

তাঁর কথার জবাবে আমি বললাম, "দেখুন, প্রেম নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে না জেনেও অনেকে তা লিখবে, আরও অনেকে তা পড়বে। আসলে কোন বিষয়েরই নতুনত্ব সেই বিষয়ের মধ্যে নেই, আছে সেই বিষয় পরিবেশন আর ভোগের মধ্যে। আর একটা কথা। ব্যাপারটা যার যার প্রবৃত্তি আর প্রবণতার উপর নির্ভর করে। যে-লেখক ও ছাড়া লিখতে পারেন না তাঁকে ওই লেখাই লিখতে দিন। আর যাঁরা ও বিষয় নিয়ে লিখতে-পড়তে লজ্জা পান, তাঁরা না-ই বা লিখলেন, না-ই বা পড়লেন। তাঁদের জন্যে আরও হাজার পদার্থ আছে।"

সুধাবিন্দুবাবু এবার আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর চোখে আর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "এবার আপনাকে চটাতে পেরেছি। কিন্তু আপনার কথাটা মানতে পারছিনে। শুধু নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতার দোহাই দিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। নিজের ভাল লাগাটাই যে পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে ভাল এমন নির্ভাবনা শুধু শিশুদের থাকে। তারা নিজেদের খেলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আপনি কি বলতে চান, শিল্পীরা কোনদিন শৈশবের স্তর পার হন না ?"

আমি বললাম, "আপনি শিশুই বলুন আর ভ্রূণই বলুন, রূপসৃষ্টির সঙ্গে খেলার খানিকটা মিল আছে। সে-খেলা হেলাফেলার জিনিস নয়। সে-খেলা জীবনকে রস দেয়, আনন্দ দেয়।"

সুধাবিন্দুবাবু হেসে উঠলেন, "আর আপনাকে পায় কে। রূপ আর রসের দোহাই যদি একবার দিতে পারলেন তাহলে সাত খুন মাপ। একটু আগে আপনি ভোগের কথা বলছিলেন। এখন আবার বলছেন খেলা। লীলা কি খেলা যে-নামই দিন, আপনাদের লক্ষ্য ওই ভোগ। সাহিত্য শিল্প আপনাদের শুধু সম্ভোগের উপচার জোগায়, তার চেয়ে বেশী কিছু দেয় না। কিন্তু আমি সাহিত্যকে সেচোখে দেখিনে। আমি ভাবি সাহিত্য হবে মন্ত্রের মত। ওঝার মন্ত্র নয়, কানে ফুঁ দেওয়া গুরুর মন্ত্র নয়, জীবনের বেদমন্ত্র। আমি ধর্মের জায়গায় নীতির জায়গায় শিল্পকে বসাতে চাই। কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন আপনাদের সারা জীবনের কাজ খেলা ছাড়া কিছু নয়।"

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ তর্ক করে লাভ নেই। সুধাবিন্দুবাবু নিজের কথার জের টেনে বললেন, "এই গরমের দেশটা এমনিতেই বড় বেশী মাত্রায় এরোটিক। ছেলেই বলুন, মেয়েই বলুন, তারা হাফপ্যান্ট আর ফ্রক ছাড়তে না ছাড়তে সেক্স কনশাস হয়ে ওঠে। মনসাকে ধোঁয়ার গন্ধ দিয়ে লাভ কী। যে-আগুন এমনিতেই জ্বলছে, তাতে ফের হাওয়া দিচ্ছেন কেন? সব যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমার চোখের ওপর একটা জীবন সেই ছাই-ই হয়ে গেল। আমি কিছুতেই তাকে রক্ষা করতে পারলাম না।"

দীর্ঘশ্বাস চেপে সুধাবিন্দুবাবু চুপ করে রইলেন। আমি খুব সন্তর্পণে প্রশ্নটি এগিয়ে দিলাম, "কার কথা বলছেন?"

সুধাবিন্দুবাবু বলতে লাগলেন।

"আমার ভাগ্নে সরোজের কথা। ওই বাপ মা-মরা ছেলেকে সাত বছর বয়স থেকে আমি মানুষ করেছি। ওর ভরণপোষণের ভার যখন নিলাম, আমার নিজের ঘাড় তখনও শক্ত হয়নি। বিধবা মা, ছোট ভাই, স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি নিজেই তখন সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। মফঃস্বল কলেজের মাস্টারি। রোজগার সামান্য। কিন্তু মধ্যবিত্তের সংসারে ব্যয় আয়ের পিছনে পিছনে হাঁটে না, আগে আগে ছোটে। সরোজের জ্যাঠা আর কাকাও ছিলেন। অবশ্য আলাদা অন্নে। আমার বোনের ইচ্ছে ছিল না ছেলে তাঁদের কাছে থাকে। কারণ তাঁদের সংসারে পড়াশুনোর আদর নেই। টাকার জোরে মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়া, আর অন্নপ্রাশনের পর থেকেই ছেলেদের ব্যবসা বাণিজ্যে পাকা করে তোলা তাঁদের বংশের মূলমন্ত্র। কিন্তু আমার বোন লেখাপড়া ভালবাসত। মরবার আগে ছেলেকে সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'দাদা, ও যেন মানুষ হয়, ও যেন তোমার মত হয়।'

বয়স যাট হতে চলল, মানুষ হতে পেরেছি এ-অহংকার আজও আমি করিনে। কিন্তু মানুষের মত মানুষ যে কাকে বলে, সে-আদর্শ আমার মনে ছেলেবেলা থেকেই আছে। আর এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তার বড় একটা নড়চড় হয়নি। ভাবলাম, নিজের অপূর্ণতা ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়ে মেটাব। জন্ম-জন্মান্তর মানিনে। কিন্তু পুরুষানুক্রম মানি।

পূর্ণতার সাধনা এক পুরুষের নয়। সরোজ আমার ছেলের চেয়ে দু বছরের ছোট আর মেয়ের প্রায় সমবয়সী, মানে মাস-কয়েকের বড়। স্ত্রীকে বললাম, 'আর না। এই তিনটিকে যদি মানুষ করে তুলতে পার, মনে করবে তেত্রিশ জন্মের তপস্যা সার্থক হয়েছে।'

নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে সরোজকে আলাদা করে দেখবার কোন কথাই ওঠে না। আমার আপন বোনের ছেলে। আমার স্ত্রী ওকে নিজের ছেলের মতই কাছে টেনে নিল। সরোজ আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকে, একই ঘরে শোয়। শুধু একই দামের নয়, একই রঙের জামাজুতো পরে। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার স্ত্রীকে ও মা বলে ডাকে। হাজার শিখিয়ে দিলেও মামীমা বলে না। আমাকে মামা বলে ডাকতে হয় বলে ও প্রায়ই সম্বোধনটা এড়িয়ে যায়। কিন্তু ওর মিষ্টি-মিষ্টি হাসি, চোখের সলজ্জ চাউনি দেখে আমার বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। ডেকে ডেকে ওর সাড়া মেলে না, আবার না ডাকতে কখন যে এসে গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আমি টেরও

পাইনে। আমার স্ত্রী বলে, 'দেখতে সুন্দর বলে তুমি সরোজকেই বেশী ভালবাস।'

শুনে আমি হাসি। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ডেকে উপদেশ দিই, 'খবরদার, হিংসা-দ্বেষের ভাবটা যেন ওদের মনে কক্ষনো এন না। আমাদের কাছে সবাই সমান।'

সরোজ আমার গায়ের রং আর গড়নের অনেকটা পেয়েছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। আমি ভেবেছিলাম শুধু আকৃতি নয়, প্রকৃতিও সরোজের আমার মতই হবে।

ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়াটা যাতে ওরা শেখে সে-দিকে আমি লক্ষ্য রেখেছি। তার উদ্দেশ্য যে গাড়িঘোড়া চড়া নয়, জীবনেরই এক স্তর থেকে আর এক স্তরে আরোহণ করা, সে কথা ওদের মনে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করেছি। শুনেছি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি জাত-কবি আছেন, কেউ বা জাত-প্রেমিক। কিন্তু যৌবনকাল থেকেই আমি জাত-মাস্টার। আমি যে শুধু পড়িয়ে খাই তা নয়, আমি পড়াতে ভালও বাসি। ছেলেরা যাতে মনের খাদ্য পায়, আমি সাধ্যমত তার জন্যে চেষ্টা করি। কিন্তু করলে কী হবে, সুখাদ্যে ইদানীং ছেলেমেয়েদের রুচি কম। আর এই রুচিবিকার ঘটাবার মূলে আমি আপনাদের দায়ী করি। আমরা বলি, শেখ। আপনারা বলেন এই ভুবনলীলা দেখে ভোল। ওরা তা-ই করে। কোন জিনিস গভীরভাবে ভাবতে চায় না, চিন্তা করতে চায় না। কেবল আর্ট, আর্ট আর আর্ট। হাল্কা সিনেমা, হাল্কা সাহিত্য আর পলকা পলিটিকস। এর নাম আর্ট নয়, এর নাম ফ্লার্টিং। গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে এর তফাত আকাশ পাতাল। আর্ট আর পলিটিকসের দোহাই দিয়ে এরা সত্যিকারের জীবনগঠনকে বাদ দেয়, চরিত্রগঠনকে উপেক্ষা করে। এর জন্যে আপনারা কম দায়ী ভাববেন না। কারণ আপনারাই ওদের এখন আদর্শ, যাদের নিজেদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। তবু এখন আপনাদেরই যুগ, আপনাদেরই রাজত্ব। সিনেমাশিল্পী আর কথাশিল্পীদের নিয়ে ছেলেমেয়েরা যে মাতামাতি করে, সমাজের শিক্ষকরা তার সিকির সিকিও পান না। ভাববেন না আপনাদের আমি হিংসে করছি। সভাসমিতিতে আপনারা মানপত্র পান, ফুলের মালা পান, খুবই ভাল কথা। কিন্তু ভেবে দেখবেন, মালার বদলে কী দিচ্ছেন। যদি ফাঁকি দিয়ে থাকেন, সে মালা শুকোতে বেশী দেরী লাগবে না। আমি বলি, আপনাদের হাতে আছে অমোঘ অস্ত্র। আপনারা যদি সত্যিই তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছতে শুরু করেন, তাহলে দেখে দুঃখ হয়, রাগ হয়। নিরুপায় হয়ে নিজের হাতের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করে।

ছেলেমেয়েদের আমি একটু কঠিন আদর্শেই মানুষ করেছি। অল্প বয়সে সস্তা সিনেমা সাহিত্যের দিকে তাদের ঘেঁষতে দিইনি। সকালসন্ধ্যা নিজে কাছে বসে পড়িয়েছি। পাঠ্য বই ছাড়া যে সব বই তারা পড়ে সেগুলি যাতে একেবারে অপাঠ্য না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি। ভক্তিবাদ থেকে যুক্তিবাদে তাদের মনকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, যেমন আমি কলেজেও করি। আমি জানি আমার হাতে কলম নেই, পায়ের নীচে জনসভার প্লাটফর্ম নেই, আমি কোন ধর্মসংঘ কি রাজনৈতিক সংঘের সভ্য নই, আমি একজন সাধারণ মাস্টার, আমার কর্মক্ষেত্র ছাত্রদের মধ্যে। আর একটি পরিবারের পালক হিসাবে স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের মধ্যে। 'দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার' এমন ঔদাসোর ভান আমি করিনে। বহুদিন বেঁচে আছি, ওরা আমার সব। আমার ছেলেমেয়েরা জানে, আমি আমার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসি। পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য আর মর্যাদা দিই। নইলে তারা কেন দেবে? আমার আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীরা জানে, আমি আমার ছেলেমেয়েদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। তাদের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করি। কিন্তু সেই পরিশ্রমের ফল শুধু অশনবসনে ব্যয় করিনে। আমি তাদের শেখাই, তোমাদের বেশীদূর যেতে হবে না, তোমরা তোমাদের পরিবারকে ভালবাস, প্রতিবেশীদের ভালবাস। কিন্তু সে-ভালবাসা যেন খাঁটি হয়, তা যেন শুধু কথার কথা না হয়, তা যেন সত্যিই কল্যাণকর হয়। আমাদের দাবি মানতে হবে, আজকের দিনে জোট বেঁধে মাঝে মাঝে এ-রব না তুলে উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কাছে নিজের যে দাবি, তা কি শিকায় তোলা থাকবে? আমি আমার ছাত্রদের বলি, ভাল কর, ভালবাস, ভাল হও। আর এগুলিকে শুধু কয়েকটা ভাল কথা বলে মুখস্থ করে রেখ না। মুখের কথাকে মনের কথা, মনের কথাকে কাজের কথা করে তোল।

যাকগে। যা বলছিলাম। মা মারা গেলেন, ভাই বিয়ে থা করে জব্বলপুর জি এস ফ্যাক্টরিতে

চাকরি পেয়ে চলে গেল। পৈতৃক বাড়িতে রইলাম শুধু আমি। কলেজে ছেলেদের পড়াই, বাড়িতে যতটুকু সময় পাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসি। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোমার কি ক্লান্তি নেই! রাতদিন বকবক করছ ত করছই!'

আমি হেসে বলি, 'বুঝতে পারছি তোমার ক্লান্তি এসেছে। এক কাজ কর। তুমিও আমার ছাত্রছাত্রীর দলে ভর্তি হয়ে পড়। দু-একটা পরীক্ষা-টরিক্ষার জন্যে তৈরী হও, দেখবে সময়টা মন্দ কাটবে না।'

সে বলে, 'রক্ষে কর। যে-পরীক্ষা দিচ্ছি, তা-ই ঢের। আমার আর নতুন পরীক্ষায় কাজ নেই।'

তখন আমার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। টানাটানির মধ্যেই দিন কাটত। ওরই মধ্যে দু-চার টাকা লুকিয়ে ছাপিয়ে দুঃস্থ বন্ধু কি আত্মীয়-স্বজনকে পাঠাতাম। বই কেনার বাতিকও ছিল। তার ফলে অভাব-অনটনের ঝামেলাটা আমার স্ত্রীর উপর দিয়েই বেশী যেত। সবই যে সে হাসিমুখে সহ্য করত এ-কথা বললে আপনি মুখে হয়ত কিছুই বলবেন না কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই মন্তব্য করবেন, ভদ্রলোক কী স্ত্রৈণ।

মতবিরোধ মন-কষাকষি আমাদেরও আর পাঁচজনের মত হয়েছে। কিন্তু গুরুতর রকমের প্রলয়কাণ্ড কিছু ঘটেনি, যা নিয়ে আপনি মুখরোচক গল্প লিখতে পারেন।

কিন্তু সমস্যা হল সরোজকে নিয়ে। আমি আমার ছেলেমেয়েদের মত করে একই ধাঁচে একই ধরনে ওকে মানুষ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু করলে কী হবে, গোড়া থেকেই ও যেন একটু অন্য ধারা নিল। আমি ভাবলাম এ কি হেরিডিটি? বংশের ধারা? কিন্তু আমি হেরিডিটির হাতে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নই। আমি ওকে নিজের হাতে নিলাম। পড়াবার ধরন বারবার পাল্টালাম। খেলার ভিতর দিয়ে শেখাতে চেষ্টা করলাম। তবু ছেলেটা ঠিক আমার পছন্দমত এগোতে পারল না। ক্লাসের পরীক্ষায় অবশ্য পাশ করে যেতে লাগল। কিন্তু সেইটাই ত সব নয়।

সরোজের মামী বললেন, 'তুমি ও নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ো না। সকলের মাথা কি সমান? হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়?'

আমি চটে উঠে বললাম, 'দেখ, ওই ধরনের বেয়াড়া তুলনা তুমি আমার সামনে দিতে এসনা। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, তা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাইনে, হায়-আফসোসও করিনে, কিন্তু বাড়ির পাঁচটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকটিকে বিদ্বান বুদ্ধিমান দেখতে চাই।'

আমি সরোজের দিকে আরও মনোযোগ দিলাম। ইংরেজী আর অঙ্ককে যতদূর সহজ সরল আর সরস করা যায় আমি তার চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। কিন্তু আমি মন দিলে কী হবে, সরোজের যেন তেমন মন নেই। ওর যে মাথা কম তা নয়, কিন্তু মনটাই যেন কেমন অন্যমনস্ক। থেকে থেকে ও হাঁ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি ধমক দিয়ে বলি, 'কী রে? তুই কি কবি হবি, না দার্শনিক হবি?'

সরোজ চমকে ওঠে। আমার কথাটা ঠিক যেন বুঝতে পারে না। বোকার মত ভয়ে ভয়ে একটু লজ্জিত হয়ে জবাব দেয়, 'না মামা।'

আমি বলি, 'কবি হলেও আজকাল লেখাপড়া শিখতে হয়। স্বভাবকবির যুগ চলে গেছে।'

প্রথমে ভাবলাম, ম্যাট্রিকুলেশনটা পাশ করলে ওকে কোন একটা লাইন-টাইন ধরিয়ে দেব। পড়াশুনোয় যদি ভাল না হয়, ওকে জোর করে জেনারেল লাইনে আটকে রেখে লাভ কী। কিন্তু সরোজ কিছুতেই অন্য কিছু পড়তে চাইল না। ওর মামীরও তাতে অনিচ্ছা। এদিকে রেজাল্ট সেকেণ্ড ডিভিশনের উপরে ওঠেনি। আমার ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে, মেয়ে তা না পেলেও তার প্রেস নিতান্ত খারাপ হয়নি। কিন্তু ভাগ্নেটি এমন সাধারণ স্তরে নেমে গেল দেখে আমার নিজেরই লজ্জার সীমা রইল না। ছি ছি ছি, ওর জ্যেঠা-কাকারা কী মনে করবেন। হয়ত ভাববেন, আমি নিজের ছেলেমেয়ের বেশী যত্ন করেছি, ওর দিকে ততটা লক্ষ্য রাখিনি। কিন্তু তা ত নয়। আমি ত সাধ্যমত সবাইকেই সমান সুযোগ-সুবিধে দিয়েছি। জ্ঞানবুদ্ধিমত কোনরকম ইতর বিশেষ করিনি।

আমি একদিন ওকে ডেকে বললাম, 'কি রে, এখানে কি তোর মন টিকছে না? তুই কি তোর কাকার কাছে দৌলতপুরে যাবি? তিনিও তোকে নিতে চাইছেন।'

এ-কথা শুনে সরোজ আমাকে কিছু বলল না, কিন্তু ওর মামীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল, 'মামা আমাকে পাঠিয়ে দিতে চাইছেন।'

শুনে আমার স্ত্রী বাঘিনীর মত তেড়ে এলেন, 'ছি ছি ছি, তোমার কি কোন আক্কেল-বুদ্ধি নেই ? ছেলে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে বলে কি পচে গেছে ? তুমি ওকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার কে ?'

আমি ত মহা অপ্রস্তুত। বললাম, 'আমি ত ঠিক তা বলিনি।'

সরোজের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ওর মামী ওকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। দুর্বল রচনার ওপর আপনাদের কতখানি মমতা থাকে জানিনে, কিন্তু দুর্বল সন্তানের ওপর মেয়েদের স্নেহের সীমা নেই। আরও একটা কারণে সরোজ ওর মামীর মন কেড়ে নিয়েছিল। সংসারের টুকটাক কাজে ও তার মামীর সাহায্য করত। আমার ছেলেমেয়েকেও আমি বাবুগিরি, বিলাসিতা শেখাইনি। বলেছি, 'তোমরা এম এ-ই পাশ কর, আর এম এসসি-ই পাশ কর, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে কেউ থাকতে পারবে না। মেয়েদের রান্নাবান্না শিখতে হবে, ছেলেদের হাটবাজার কি টুকটাক সংসারের কাজ করা দরকার। আমার বাড়িতে তখন চাকরবাকর ছিল না। আমার স্ত্রীকেই সব করতে হত। আমি চাইতাম আমার ছেলেমেয়েরা যেন মার কষ্ট বোঝে, তাঁকে সবাই মিলে সাহায্য করে। কিন্তু আশ্চর্য, সরোজকে কিছু মুখ ফুটে বলতে হত না। ও নিজে থেকেই ওর মামীমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেত। কখন দু বালতি জল দরকার, কখন কয়লা ফুরিয়ে গেছে, আর আমার স্ত্রী উঠে চেঁচামেচি শুরু করেছে, সরোজ পড়া ছেড়ে সবচেয়ে আগে উঠে যেত। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে আসত।

সরোজের মামী হেসে বলত, 'ও যেমন আমার দুঃখ বোঝে, এ সংসারের কেউ তেমন বোঝে না।'

ছেলেটির এই দায়িত্ববোধে, এই হৃদয়বত্তায় আমি খুশী হতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও ভাবতাম, ও যদি পড়াশুনোয় আরও ভাল হত, তাহলে সোনায় সোহাগা হত। কিন্তু তেমন যেন বড় একটা পাওয়া যায় না। সংসারে সোনা আর সোহাগা প্রায়ই আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির কোন অহিনকুল সম্বন্ধ আছে বলে আমি ত মনে করিনে; কিন্তু কদাচিৎ এদের মিলতে মিশতে দেখি।

যাহোক, তারপর একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটল। আমাদের পারিবারিক ঘটনা নয়, দেশ জোড়া, মানে দেশ ফাড়ার ঘটনা। প্রথমে দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তারক্তি কাণ্ড। তারপর সালিশি, আলাদা হও, আলাদা খাও। তবু ঠিক পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি খুলনা ছেড়ে আসিনি। নিজের বাড়িঘর জায়গা-জমি আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ঘরে বয়স্থা মেয়ে। আত্মীয়-বন্ধু সব একে একে চলে এসেছে। এসে আমার এক গুঁয়েমির নিন্দা করতে শুরু করেছে। আমার স্ত্রী বার বার বলতে লাগলেন 'আমি এমনভাবে কিছুতেই থাকব না। তুমি যদি না যাও, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি একাই চলে যাব।'

আমি বললাম, 'একা আর কোথায় যাবে। দয়া করে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। বোঝা বিড়েটা অন্তত বইতে পারব।'

কলকাতা শহরে চাকরি একটা অতি কষ্টে জুটল। কলেজের গুরুগিরিই। ভাগ্যক্রমে পেশাটা বদলাতে হল না। কিন্তু কাজ জুটল ত মাথা গুঁজবার আস্তানা জোটে না। ছেলেপুলে নিয়ে দাঁড়াই কোথায়। আত্মীয়বন্ধুর ঘরের ভাগীদার হয়ে কদিন আর থাকা যায়। শহরে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য বাড়ির অভাব। নিলামের ডাকের মত সেলামি আর আগাম টাকার ডাক। স্ত্রীর তাগিদে ছুটির দিনে সকালে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। টালা থেকে টালিগঞ্জ ছুটোছুটি। তারপর বাড়িতে এসে দাম্পত্য কলহ। 'তোমার দ্বারা হবে না।' স্ত্রী যত পতিব্রতাই হক, এ-কথা জীবনে সে বহুবার উচ্চারণ করে। আর স্বামী যত স্ত্রীগতপ্রাণই হোক, ও-কথা সে বিনাবাক্যে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারাই হল। এক সহকর্মী বন্ধু ব্যবস্থা করে দিলেন। উত্তর কলকাতায় একখানা পুরনো বাড়ির পুরো একটি দোতলা। ঝোঁকের মাথায় ভাড়া নিয়ে ফেললাম। তিনখানা

ঘর।

মাসিক পঁচাত্তর টাকা ভাড়া। রোজগারের প্রায় অর্ধেক নিয়ে টানাটানি। তা হোক,তবু এমন একটু জায়গা চাই যেখানে আলো-বাতাস আসে। অন্তত এমন একখানা ঘর চাই, যেখানে ছেলেমেয়েরা দুদণ্ড বসে পড়াশুনো করতে পারে।

পুরনো সেকেলে ধরনের বাড়ি। তবু আমার স্ত্রী ঘরগুলি দেখে পছন্দ করলেন। দুনিয়ার হালচালটা এতদিনে তাঁর বোধগম্য হয়েছে। রান্নাঘরের অবস্থা ভাল, স্নানের ঘরের ব্যবস্থা নেহাত খারাপ নয়। সামনে এক চিলতে ঝুল-বারান্দা আছে। আর মাথার উপরে বড় এক ফালি ছাদ। দেখে ছেলেমেয়েরা মহা খুশী। কলকাতায় এসে এত দিন পর্যন্ত ওদের ছাদ জোটেনি। বাড়িওয়ালা শম্ভু বসাক আর এক অংশে থাকেন। মাঝখানে দেওয়াল তোলা। তাঁকে জলকল আর ছাদের আলো-হাওয়ার ভাগ দিতে হবে না।

কিন্তু দু দিন যেতে না যেতেই আমাদের হরিষে বিষাদের অবস্থা হল। বাড়িটা যা হোক এরই মধ্যে কোন রকমে থাকবার যোগ্য হলেও পাড়াটা ভাল নয়। দিনের বেলায় তবু একরকম থাকে। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে গেলেই ভূতপ্রেতের নৃত্য শুরু হয়। যত রাত বাড়ে, মাতাল গুণ্ডার হৈ-হুল্লোড়, কান্না চেঁচামেচি ও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। মনে মনে ভাবলাম, এত আচ্ছা কাণ্ড হল। ফ্রম ফ্রায়িং প্যান টু ফায়ার। এর চেয়ে বেলেঘাটার সেই বস্তিবাড়ি ভাল ছিল যে!'

বাড়িওয়ালাকে ডেকে বললাম, 'বড় বিশ্রী জায়গা ত শম্ভুবাবু। এ সব আপনারা সহ্য করেন কী করে?'

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নীচে। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গায়ে ডোরাকাটা-কলার পাঞ্জাবি। চোখ দুটো ছোট ছোট। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বেশ চালাক চতুর সংসারের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। শম্ভুবাবু আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'সহ্য করব কি মশাই। ওরাই ত দয়া করে আমাদের সহ্য করছে। এ-পাড়ায় ওদের মৌরসী স্বত্ব। তবু ত আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।'

আমি বললাম, 'না না। এর একটা ব্যবস্থা করুন।'

তিনি বললেন, 'কী আর ব্যবস্থা করবেন বলুন, সবই কি আমার আপনার হাতে? তা ছাড়া ঠিক আপনার পাশের বাড়ি ত নয় যে, গায়ে গা ছোঁয়া লাগবে। গলির ওপারে কয়েকটা বাড়ি অমন অনেক দিন ধরেই আছে। কলকাতা শহর হল শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র। এখানে অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাছ-বিচার করলে চলে না মশাই।'

বললাম, 'দেখুন নিজের জন্যে ত ভাবনা নেই। ভাবনা ছেলেপুলের জন্যে। সুস্থ পরিবেশে ভাল আবহাওয়ায় তাদের যদি না রাখতে পারি—'

শম্ভুবাবু হেসে উঠলেন, 'আপনি ত মশাই আচ্ছা মানুষ। আমরা ত স্ত্রীপুত্র নিয়ে পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করছি। কই, আমাদের ত ক্ষতি হয়নি। আর আপনি যে এত খুঁতখুঁত করছেন, যাবেন কোথায় শুনি? ঠগ বাছতে যে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের কল্যাণে সব জায়গায় এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এখান থেকে তাড়া খেয়ে ওরা ভদ্রপাড়ায় ভদ্রলোকের বাড়িঘরে—'

আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক থাক। কী হয়েছে তা ত চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছি। এর কী প্রতিকার আছে সে-কথা বলুন। আমাদের কী করা উচিত সে-কথা বলুন।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে চলে গেলেন। বোধহয় আমি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

ছেলেমেয়েদের আমি ছাদে ওঠা বারণ করে দিলাম। বিশেষ করে বিকেলে আর সন্ধ্যা বেলায়। কারণ ছাদ থেকে সবই দেখা যায়। কেউ বা খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে জানলায় এসে দাঁড়ায়, কেউ বা বিশ্রীভাবে হেসে আর অঙ্গভঙ্গি করে আর-এক জানালার সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করতে থাকে। ঘরের মধ্যে কেউ কেউ হারমোনিয়ম বাজিয়ে অশ্লীল সুরে গান ধরে। আরও যা যা হয়, সেগুলো আর আপনার শুনে কাজ নেই মশাই। আমি ওদের বারণ করে দিলাম, 'খবরদার, কেউ ছাদে উঠবিনে। ভাল পাড়ায় ভাল বাড়িতে যখন যাব, তখন উঠবে। কিন্তু এ-ছাদ তোমদের ছাড়তে

হবে।'

ছেলেমেয়েরা আমার বাধ্য। তারা কথা শুনল। শুধু আমার শাসন না, রুচির শাসনও আছে। সেই শাসনই সবচেয়ে বড় শাসন। আমি বলি একমাত্র সুশাসন। প্রবৃত্তিকে রুচি দিয়ে নিত্য মার্জনা করতে হয়। এ-যুগের সবচেয়ে বড় রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তিনি রুচিরও স্রষ্টা। রবীন্দ্রসাহিত্য আর সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে যাতে ওদের সেই রুচিধর্মে দীক্ষা হয়, আমি রোজ তার চেষ্টা করি।

ছাদে কেউ ওঠে না। শুধু সরোজ আর তার মামীমা ছাড়া। ভিজে কাপড় মেলতে হয়, শুকনো কাপড় তুলতে হয়। গোটা কয়েক ফুলের টব আছে। সরোজ সেগুলিতে জল দেয়। তবু আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করি, 'ও কেন ছাদে যায়?'

সরোজের মামী হেসে বলেন, 'ও কি একা যায় নাকি? আমি সঙ্গে থাকি। একেবারে কেউ সাহায্য না করলে আমি কি পারি?'

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, 'তা ঠিক। তোমারও অত ঘনঘন ছাদে গিয়ে দরকার নেই। আমি বারান্দায় কাপড় মেলবার ব্যবস্থা করছি।'

সরোজের মামী হেসে বলেন, 'সে-ব্যবস্থা তোমার আগেই আমি করে নিয়েছি। কিন্তু এতগুলি মানুষের কাপড়চোপড় কি এক বারান্দায় কুলোয়? ভয় নেই, আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমার আর বয়ে যাওয়ার বয়স নেই।'

আমি বলি, 'দেখ, বেশী বয়সে বয়ে যাওয়ার ওই এক সুবিধে। বয়সের দোহাই দিতে দিতে যাওয়া যায়।'

আমার স্ত্রী হেসে বলেন, 'তাহলে তোমাকেও ত আমার আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখতে হবে।'

প্রথমে বাড়িওয়ালাকে বললাম; কিন্তু তিনি আমার কথা কানে তুললেন না। শেষে আমিই নিজের খরচে ছাদের চারদিকে উঁচু দরমার বেড়া এঁটে দিলাম। ছাদে যখন ওদের উঠতেই হবে, যতটা পারা যায় আব্রুর ব্যবস্থা করা যাক। আপনি হাসছেন। যে-কোন রিফর্মকে আপনারা শিল্পীরা উপহাস করেন, তা আমি জানি। বড় বড় রাজনৈতিক বিপ্লবীরা আমাদের অবজ্ঞা করেন, তাও আমার অজানা নেই, কিন্তু রিফর্মের নামে সবচেয়ে নাক সিঁটকান বোধ হয় আপনারা—আপনারা যাঁরা ফর্মের পূজারী। যাঁরা কলম ধরেই জাতসাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেন। কিন্তু মশাই, রিফর্ম ছাড়া কোন সমাজটা চলে শুনি? কোন পরিবারটা বেঁচে থাকে? কোন মানুষটা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে পারে? একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন, জেনে হোক না জেনে হোক, আপনি সংস্কার করে যাচ্ছেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে শোধরাচ্ছেন, ছেলেমেয়েকে শাসন করছেন, পাড়াপড়শীর চাল-চলনের সমালোচনা করছেন, সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে আপনার সায় নেই সেখানে হয় হায়-হায় করছেন, না হয় শ-কার ব-কারে গাল দিচ্ছেন। আমরা প্রত্যেকেই এমনি। শুনেছি প্রত্যেকের মধ্যে একজন করে শিল্পী বাস করেন; তেমনি একজন করে সংস্কারক সংগঠকও আছেন। আপনার সেই দ্বিতীয় সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন না; ওঅন ফীড্‌স দি আদার।—একজন আর একজনের পরিপূরক, পরিপোষক।

আপনি ভাবছেন ছাদের ওপর দরমার বেড়া এঁটে এত বড় বড় কথা বলছি কেন। শুধু বেড়া বাঁধা নয়, জীবনে আরও একটু নড়াচড়ার চেষ্টাও করেছি। যখন গ্রামে কি মফঃস্বল শহরে ছিলাম, সেখানে আরও পাঁচজনকে নিয়ে স্কুল করেছি, নাইট স্কুল করেছি, ভাল একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের এই বড় শহরে এসে সব খুইয়েছি। এখানে শুধু অন্ন আর অন্ন। এই বাজারে তিনটি ছেলেমেয়ের থাকা-খাওয়া, ভদ্ররকমের পোশাক-আশাক আর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে করতে যাকে গলদঘর্ম হতে হয়, তার কি আর অন্য দিকে চোখ-কান দেওয়ার জো থাকে মশাই? আর চোখ-কান বন্ধ রেখে, হাত দুটি গুটিয়ে রেখেও আপনি যদি ভাবেন যে, আপনার হৃদয়-দরজা অষ্টপ্রহর খোলা থাকবে তাহলে—আপনি মহা ভুল করবেন। তিন শিফটে পড়াই, তাতেও পোষায় না, রাত জেগে নোট-বই লিখি, মডেল প্রশ্নোত্তর তৈরী করি, স্বনামে বেনামে কত যে বই লিখেছি, আপনারা তার খোঁজ রাখেন না। তা ছাড়া বয়সের ভার আছে, সংসারের দায় আছে। এসব আপনাকে কেবল অন্দরের দিকে ঠেলে দেবে। অন্দরের দিকে—অন্তরের দিকে নয়। কান পেতে

রই, আপন হৃদয় গহন দ্বারে--- সে-সৌভাগ্য এ-যুগের মানুষের হবার জো নেই। আজও ভাড়াটে বাড়ির সদর দরজায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয়। কে এল, কে গেল, সেই দুর্ভাবনায় মরি।

দরমার বেড়া ঐটেই অবশ্য আমি নিশ্চিন্ত রইলাম না। ইংরেজী বাংলায় কাগজের সম্পাদকের কাছে কিছু কিছু চিঠিপত্রও পাঠালাম। কোনটা ছাপা হল, কোনটা হল না। আমি জানি, এই রকমই হয়। যা হোক, তবু চেষ্টা ত করে দেখলাম।

সরোজ আই এ-টা নমোনমো করে পাশ করল। কিন্তু বি এ-তে গিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অহংকার করিনে, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে এ-দুঃখ পেতে হয়নি মশাই। নরেন্দু তখন জিওলজি নিয়ে এম এসসি পড়ছে, নীতিকে এম বি-তে ভর্তি করে দিয়েছি। ওর নিজের শখ ডাক্তারি পড়বে-- পড়ুক। কিন্তু সরোজটা কী করে বসল! প্রথমে আমার ভারী রাগ হল। ইচ্ছে হল ওর গালে ঠাস ঠাস করে গোটা কত চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু মাথার দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে। ছেলেটা চওড়ায় বেশী বাড়েনি, কিন্তু লম্বায় আমার মাথার সমান। ও যে এত বড় হয়েছে, আমি ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। কিন্তু ওই দেখতেই বড়, বয়স বেশী না, সবে কুড়ি ছাড়িয়েছে। আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, 'কোন রকমে পাশটাও করতে পারলিনে?'

সরোজ মুখ নীচু করে রইল।

আমি বললাম, 'অঙ্কটা কিছুতেই শিখলিনে, তাই তোকে সায়েন্স পড়ান গেল না। টেকনিক্যাল লাইনগুলি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম বি এ, এম এ-টা ভাল ভাবে পাশ করে যাবি। পাশ করাটা নেহাতই পড়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেটুকুও তোর দ্বারা হল না। হ্যাঁরে, জীবনে করবি কী, খাবি কী করে। সে-কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস?'

হঠাৎ সামনে আমার স্ত্রীকে দেখে আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। আমি তাকেও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠলাম, 'ফের যদি তুমি সংসারের কোন কাজ ওকে দিয়ে করাবে---।'

আমার স্ত্রী প্রতিবাদ করে বললেন, 'সংসারের কোন কাজটা ও বেশী করে শুনি? আমার ছেলেমেয়েরা যা করে, ও তার চেয়ে বেশী কিছু করে না। যে ছেলে পড়াশুনো করে, তার ওটুকু কাজে কিছু এসে যায় না। কত ছেলে খুদকুঁড়ো খেয়ে-পরে দিনরাত ছেলে পড়িয়ে পড়ার খরচ চালায়। সে-তুলনায় তোমার ভাগ্নে ত স্বর্গে আছে।'

অকাট্য যুক্তি। আমি তাড়াতাড়ি কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'হুঁ।'

আমার স্ত্রী বলে চললেন, 'কাজকর্মের দোহাই দিলে কী হবে. তোমার ভাগ্নের কত গুণ গজিয়েছে তা ত আর জান না।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী গুণ গজিয়েছে?'

আমার স্ত্রী বললেন, 'ও কি পড়াশুনো করেছে যে পাশ করবে? দু বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল নভেল পড়েছে, আর ওই শম্ভুবাবুর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়েছে। তোমরা যদি গালগল্প আর নভেল-নাটকের পরীক্ষা নিতে তাহলে তোমার ভাগ্নে সেরা নম্বর পেত।'

আমার মেয়ে নীতি বলল, 'মিছিমিছি সরোজদার নামে দোষ দিচ্ছ মা। নভেল-নাটক ত আমরাও পড়ি। পরীক্ষার ব্যাপার, অনেক সময় কত রকমের কী হয়ে যায়---।'

আমি মেয়েকে ধমক দিয়ে বললাম, থাক থাক, তোকে আর ওকালতি করতে হবে না।'

কিন্তু দুদিন বাদে আর্থিক লোকসানের জ্বালাটা একটু কমলে আমি নিজেই ওকালতি শুরু করলাম। ওকে কাছে ডেকে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, 'একটা বছর গেছে, তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। ভাল করে পড়াশুনা কর, সামনের বার ডিস্টিংশন পাওয়া চাই। দেখ, ফেল করাটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু না। দুর্ঘটনা। কিন্তু খুব বড় রকমের দুর্ঘটনা বলে ভাববার কোন হেতু নেই। পাস ফেল বড় কথা নয়, জ্ঞান লাভটা বড় কথা। জ্ঞানের পথ ছাড়া মানুষ হওয়ার ত আর কোন পথ নেই।'

সরোজ মাথা নীচু করে আমার উপদেশ শুনতে লাগল। আমি উৎসাহ পেয়ে বলে চললাম, 'আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে। পড়ানর ত্রুটি, পরীক্ষা নেবার ধরনে ত্রুটি, পদে পদে ভুল, পদে পদে গলদ। তবু তোমার পদস্খলন কেউ ক্ষমা করবে না। এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে তোমাকে

উচ্চশিক্ষিত হতে হবে। তবে তুমি এর সমালোচনা করতে পারবে। নইলে তোমার কথা কেউ কানেই তুলবে না। বলবে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। কিন্তু উঠোন যে সত্যিই বাঁকা—'

হঠাৎ মনে হল, সরোজ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কান খাড়া করে আর একটা কী ব্যাপার যেন শোনবার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'কী রে!' ও বলল, 'কিছু না।' কিন্তু একটু বাদে একটা বিশ্রী ধরনের চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের জানালাটার দিকে দু পা এগিয়ে গেল সরোজ। ওর চোখে মুখে একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

ও আগের মতই জবাব দিল, 'কিছু না।'

কিন্তু ব্যাপারটা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ফের বুঝি সেই উৎপাত আরম্ভ হয়েছে? কিন্তু ওদিকে কান দিয়ে লাভ কী!' তারপর আমি আমার মেয়ে নীতিকে ধমক দিলাম, 'তোরা ওই উত্তর দিকের জানালাটা কেন খোলা রাখিস বল তো? আমি হাজার বার বলেছি ওটা বন্ধ করে রাখবি। জানিসই ত যখন-তখন ওদিকে ওই সব হাঙ্গামা শুরু হয়। সন্ধ্যার পর ও-জানালাটা কক্ষনো খোলা রাখবিনে।'

উৎপাতের কথাটা আপনাকে বলা হয়নি, এবার বলি। বলব কি, বলবার মত কথা নয় মশাই। এ-বাড়িতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আমরা টের পেয়েছিলাম। প্রায় প্রথম থেকেই বছর ষোল সতেরর একটি মেয়ে গলির ওপারে লাল রঙের বাড়িটার জানলায় এসে দাঁড়াত। মেয়েটি শুনেছি দেখতে সুন্দরী। শুনেছিই বললাম। কারণ আমি কোন দিন তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। কিন্তু আপনাদের সৌন্দর্যের আদর্শের সঙ্গে আমার মেলে না। ফুটফুটে রঙ, বাঁশির মত নাক, পটল-চেরা চোখ, আরও যেন কী কী সব লেখেন আপনারা—ফর্দ-মেলান মেয়েদের এই রূপ কোন দিন আমাকে আকৃষ্ট করেনি। এখনকার কথা বলছিনে যখন বয়স ছিল, মুগ্ধ হওয়ার মত চোখ আর মন ছিল, তখনকার কথাই বলছি। তখনও যে-মুখে বিদ্যা-বুদ্ধির ছাপ দেখতাম সেই মুখই আমার ভাল লাগত। মেয়েদের মুখেও আমি পুরুষের ব্যক্তিত্ব আর শিক্ষা-সংস্কৃতি আশা করতাম। তা থাকলেই যে মেয়েদের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, তাদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে থাকে, সে-কুসংস্কার আমার ছিল না। থাক ওসব। আমার রুচির কথা বলে আর কী হবে। আপনাদের পাঁচজনের আদর্শে মেয়েটি সুন্দরীই ছিল। আমার স্ত্রী আর মেয়েও তার রূপ নিয়ে আলোচনা করত। অবশ্য আমার আড়ালে। আমি সামনে পড়লে তারা চুপ করে যেত। ও-সব আলোচনা আমার কানে গেলে আমি বলতাম, 'রূপ যাদের জীবিকা, তাদের রূপ থাকবে এ আর বেশী কথা কী। তার গুণের কথা যদি থাকে তা-ই বল।' সংসারে রূপের যে রূপ, তা দেখতে দেখতে মিলায়। দেখতে দেখতে তার ওপর অভ্যাসের পর্দা পড়ে। তাই মানুষ নতুন নতুন মুখে রূপ খুঁজে বেড়ায়। মেয়েরাও খোঁজে, পুরুষরাও খোঁজে। রূপ আর নতুনত্বের সংজ্ঞা তখন তাদের কাছে অভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু যে দেখতে জানে, তার কাছে তা হয় না। সে রূপের গুণ দেখে না, গুণের রূপ দেখে। বিদ্যার রূপ, বুদ্ধির রূপ, মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধার রূপ, যে-রূপ জরায় জীর্ণ হয় না, ব্যবহারে ক্ষয় হয় না, যা চিরদিন অম্লান থাকে। আপনি হাসছেন। মানে বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু গুণের এই রূপ আপনি আমি সবাই দেখে থাকি। কেউ সে সম্বন্ধে সচেতন, কেউ তা নয়, এই যা তফাত। এই গুণগত রূপ আমরা দেখি বুড়ো বাপ-মার আদরে, কচি ছেলেমেয়েদের আহ্লাদে, প্রৌঢ়া স্ত্রীর সেবাযত্নে। কিন্তু যে রূপের জন্যে আপনারা পাগল, যে-রূপের স্তুতিতে আপনারা পঞ্চমুখ আর সহস্রলোচন, সে এক ধরনের আবিষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। সে আপনার নেশার রূপ, আসক্তির রূপ। সে কারও মুখের রূপ নয়, আপনার চোখেরই আরোপ করা রূপ।

কিন্তু আমার মেয়ে বলল, 'বাবা, ও-মেয়েটার গুণও আছে। ও স্কুলে পড়ে, তা ছাড়া গানের গলাটাও বেশ মিষ্টি। এতদিন নাকি হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছে।'

আমি বললাম, 'এ-খবর তোরা কী করে জানলি? তোরা কী ওর সঙ্গে কথা বলিস নাকি?'

নীতি বলল, 'ছি ছি ছি, কথা বলব কেন? শম্ভুদা বলেছেন আমাদের। তিনি ওদের অনেক খবর

জানেন। ঝরনার মা আর দিদিমার সঙ্গেও নাকি তাঁর আলাপ আছে।'

এ কথা শুনে আমি মোটেই খুশী হলাম না। ওদের খবর তিনি রাখুন, ভাল কথা, কিন্তু সে-খবর আমাদের বাড়িতেও দেওয়ার কী দরকার। আমি আমার স্ত্রীকে গোপনে ডেকে নিষেধ করে দিলাম, 'ওই শম্ভুবাবু লোকটির সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে কাজ নেই। ওঁর আলাপ-আলোচনাটা তেমন রুচিসঙ্গত বলে আমার মনে হয় না।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'আমি যখন ওদের মাথার ওপর আছি, আমার ওপর নির্ভর কর। ও-সব ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

কিন্তু স্ত্রীর হৃদয়ের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস থাকলেও তাঁর মাথার ওপর সব সময় নির্ভর করতে পারিনে। দোষটা আমাদেরই। আমরা মেয়েদের মাথার আগুলফলম্বিত কেশদামের দিকেই এতকাল দৃষ্টি রেখেছি। ভিতরের বিদ্যাবুদ্ধির চাষে সাহায্য করতে শুরু করেছি মাত্র অল্প দিন হল।

মেয়েটি প্রথম প্রথম তার মা-দিদিমার কাছে খুব বেশী আসত না। ছুটিছাটায় মাঝে মাঝে এসে থাকত। ছুটোছুটি দাপাদাপি হাসাহাসিতে বাড়িটা অস্থির হয়ে উঠত। ও-বাড়িতে যে নতুন কেউ এসেছে, তা বেশ বোঝা যেত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এক উপসর্গ শুরু হল। গলির মোড়ে মাঝে মাঝে নতুন মডেলের গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আর বাড়ির ভিতরে কিসের একটা টানাটানি-ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। চিৎকার, কান্নাকাটি, শাসন, গালাগালিও চলতে থাকে। ও পাড়ায় এ-ধরনের হৈ-হুল্লোড় ত আছেই। আমি প্রথমে ভাবতাম সেই রকমই কিছু একটা হবে। তারপর সন্দেহ হতে লাগল, ব্যাপারটা অন্যরকম। গোড়ার দিকে এ-ধরনের কান্নাকাটির শব্দ শুনলেই ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ ছাদে চলে যেত, কি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে চাইত। কিন্তু আমি ব্যাপারটার কিছু কিছু আন্দাজ করে ফেলেছি। তাই যথাসাধ্য ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দিলাম। ছাদ ঢাকবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলাম অন্য কোথাও উঠে যাবার। কিন্তু যাওয়া কি মুখের কথা মশাই। ভাড়াবাড়ির যা অবস্থা, তাতে লোকান্তর গমন বরং সহজ, কিন্তু গৃহান্তর গমন একেবারে অসাধ্য।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি যে হাত পা গুটিয়ে বসে রইলাম তা মনে করবেন না। শম্ভুবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম একদিন। সাবেক কায়দায় তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে ফরাস সাজান। এক পাশে খান কয়েক চেয়ার-টেয়ারও আছে। দেয়ালে টাঙান কয়েকখানা বড় বড় অয়েলপেন্টিং। বীরপুরুষের মত সব চেহারা। বুঝতে পারলাম শম্ভুবাবুরই পূর্বপুরুষ। কারও হাতে বীণা, কারও হাতে বন্দুক। শম্ভুবাবুরও গানবাজনার শখ আছে। হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলা দেখে তা টের পেলাম। জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে তিনি বসে কী সব গল্পগুজব করছিলেন, আমাকে দেখে আপ্যায়ন করে বললেন, 'আরে আসুন মাস্টারমশাই, আসুন।'

মাস্টারমশাই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুবাবুর বন্ধুর দল একটি দুটি করে ঘর ছেড়ে পালাল। পার্সেন্টেজটি নিয়ে ক্লাসের ব্যাকবেঞ্চারের দল যেমন আস্তে আস্তে সরে পড়ে, এ-ও প্রায় তেমনি। আমি তাতে টললাম না। এ-কথা সে-কথার পর আমি শম্ভুবাবুকে বললাম, 'মশাই, ব্যাপারটা কী? ও-বাড়িতে রাতদুপুরে অত চিৎকার কান্নাকাটি কিসের বলুন ত? ঘরে যে আর টিকতে পারিনে।'

তিনি হেসে বলললেন, 'কেন মাস্টারমশাই, চোখ ঢেকেছেন, এবার কান দুটো ঢাকবার ব্যবস্থা করুন। তুলো গুঁজে নিন।'

ভিতরে ভিতরে রাগ হলেও তাঁর বিদ্রূপ আমি গায়ে না মেখে বললাম, 'তা বটে। কিন্তু পাড়ার মধ্যে এমন সব বীভৎস কাণ্ড, আপনারা কেউ কিছু করতে পারেন না?'

শম্ভুবাবু বললেন, 'করার এক্তিয়ার আমাদের নেই। ওটা ওদের মা-মেয়ের ব্যাপার। ওটা ওদের ব্যবসা, রুজিরোজগার। তার ওপর হাত দিতে যাবে কে?'

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী?'

শম্ভুবাবু তখন বেশ খুশী হয়ে ও-বাড়ির তিন পুরুষের ইতিহাস বলতে লাগলেন। ঝরনার দিদিমা কেমন ছিল, মা কেমন ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝরনার মার বয়সের কালে কী রকম সব শাঁসালো বাবুর দল ও-বাড়িতে আসত সেই সব কাহিনী। কিন্তু আজকাল দিনকাল পাল্টে গেছে। ওদের

মেয়েদেরও একটু লেখাপড়া না শেখালে, চালাক-চতুর না করে তুললে চলে না। তাই মেয়েকে ওরা গোড়ার দিকে স্কুলে দিয়েছিল, খরচ করে ভাল হস্টেলেও রেখেছিল। এখন সেই খরচাটা তুলে নিতে চায়। আর বেশী ইনভেস্ট করবার ওদের সাধ্য নেই, বোধ হয় ধৈর্য নেই। কিন্তু মা-দিদিমার পথ ধরা মেয়েটার মোটেই ইচ্ছা নয়। সে বাইরে আরও পাঁচটি ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, তাদেব বাড়িতে গিয়ে ভিন্ন রকমের চালচলন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছে। সে চায় না ওই পেশা নিতে। ঝরনা বলে, 'আমি আরও পড়ব।' কখনও বলে, 'থিয়েটার-সিনেমায় নামব। মার মন বোধ হয় মাঝে মাঝে গলে। কিন্তু দিদিমা পাথর। সে সাবধান করে দেয়, 'তাহলে মেয়ে একেবারে হাতের বার হয়ে যাবে।' এদিকে ঝরনার মা ঝরনার দিদিমাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কারণ মার যেমন অল্পবয়সী মেয়ে আছে, দিদিমাব তেমনি বাড়ি-টাকাকড়ি-গয়নাগাটি রয়েছে। ঝরনাকে রাজী কবাবার জন্যে দিদিমা নরমে গরমে নানারকম সাধ্য সাধনা করে। নাতনী যখন একেবারেই অবাধ্য হয়, তখন দিদিমার নিষ্ঠুরতার সীমা থাকে না। সে-নিষ্ঠুরতার বর্ণনা শম্ভুবাবু এমনভাবে করতে লাগলেন যে, শুনে সত্যিই আমাব কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা করল। বীভৎস উৎকট অবিশ্বাস্য সব কথা। মানুষ যে মানুষেব উপর, বিশেষ করে নিজের সন্তানের উপর অমন অকথ্য অত্যাচার করতে পাবে, তা আমি ধারণায় আনতে পারিনে। শম্ভুবাবু আমার কথা শুনে বললেন, 'মাস্টারমশাই, মানুষ কি আর সব সময় মানুষ থাকে? ওদেব ত আমরা অমানুষ করেই রেখেছি।'

আমি বললাম, 'তবু এ-সব একেবারেই গাঁজাখুরী গল্প বলে মনে হয়।'

শম্ভুবাবু হেসে বললেন, 'ওখানে গাঁজা কেন, মদ, ভাঙ, চণ্ডু, চরস—সবই চলে। ওখানকার গল্পটা গাঁজাখুরী নয়, জীবনটাই গাঁজাখুরী।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা ওখানে থেকে এ সব সহ্য করে কেন? ও ত বড়সড় হয়েছে। লেখাপড়াও নাকি কিছু শিখেছে। ও ওখান থেকে চলে গেলেই পারে।'

শম্ভুবাবু বললেন, 'সেই ত মজা মাস্টারমশাই। দুনিয়াটা দশঘরের নামতার মত অমন সোজা জিনিস নয়। মেয়েটাও কি কম সেয়ানা? সে কি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পারে না? পালিয়ে যাবে কোথায়? বেড়াজালে দু দিন বাদেই ধরা পড়বে। তা ছাড়া টাকা-গয়না, বাড়ি-গাড়ির লোভ কি ওরও নেই? ও কি বুঝতে পারে না, দিদিমার কাছ থেকে চলে গেলে ও কানাকড়িও পাবে না? টাকাকড়িটা ওরা খুব ভালই চেনে। পুরুষরা চায় কামিনী, কামিনীরা চায় কাঞ্চন। এই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

শম্ভুবাবুর সঙ্গে আমি আর বৃথা তর্ক করলাম না। কেউ কেউ আছে, যে কোন অনিয়মকে তারা নিয়ম বলে সয়ে নিতে পারে। উঠে যাওয়াব আগে আমি ওঁকে শুধু একটা অনুরোধ করলাম, 'এসব আলোচনা যেন আমার ছেলেদেব সামনে—'

শম্ভুবাবু জিভ কেটে বললেন, 'আরে ছি ছি।'

তারপর থেকে উৎপাতটা কখনও বাড়ে, কখনও একটু কম থাকে। মাঝে মাঝে ওরা বোধহয় মেয়েটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়। বাইরে কোথাও রেখে সাধ্য-সাধনা চলে। জানিনে মশাই কী কাণ্ড হয় না হয়।

পতিতা-সমস্যা নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি। প্রথম বয়সে শরৎবাবুর বইতে ওদের কথা কিছু কিছু পড়েছি, তারপর বড় হয়ে সব ভুলেও গেছি। কোন বইয়ের গল্প আমার মনে থাকে না। শম্ভুবাবুব সঙ্গে সেই আলাপেব পর দু-একদিন ও-সব নিয়ে একটু চিন্তা করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অবসর পেলাম না। ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা এসে পড়ল। বিশ্রী একটা সেণ্টার। আমি পাশ করাতে চাইলে কী হবে, ওরা জোট বেঁধেছে ফেল করার জন্যে। আমি আমার নিজের কলেজের ছাত্রদের কথা ভাবতে লাগলাম। কে জানে তারা কেমন লিখেছে। একজামিনারের হাতে তাদেরই বা কী হাল হচ্ছে। আমি ভেবে দেখেছি, পরীক্ষাসাগরে পতিত এইসব ছেলেদের সমস্যাই আমার সমস্যা। দু-চারটি ছেলেকে যদি ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পারি, অন্তত তাদের মনে শেখার আগ্রহটা জন্মিয়ে দিতে পারে তাহলেই ঢের। 'মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল,—স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।' প্রথম বয়সে অসাধ্য সাধনের দিকে অনধিকারচর্চার দিকেই ঝোঁক ছিল

বেশী। মালকোচা দিয়ে কাপড় পরে, বাঁশের লাঠি বাগিয়ে ধরে ভাবতাম, দুনিয়ার সব অনিয়ম ভেঙে চুরমার করব, দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধানের ভার আমার হাতে। বয়স বাড়বার পরে দিনে দিনে বুঝতে পারছি, মোল্লার দৌড় মসজিদ তক। কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে গেলেও প্রাণপণ করতে হয়। হাঁটুর জোর ক্রমেই কমে আসছে ; মসজিদ পর্যন্তও পৌঁছন হবে না, সে-কথা বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু তাই বলে দৌড়নটা এখনও বন্ধ করিনি। ছুটোছুটি না হক, হাঁটাহাঁটিটা এখনও চলে।

আমি সরোজকে বুঝিয়ে বললাম, কোন বাজে ব্যাপারে ও যেন কান না দেয়। যে-দুঃখের প্রতিকার করবার সাধ্য আমাদের নেই, তার কথা ভেবে যেন নিজের কাজ নষ্ট না করে। পরের জন্যে কিছু করতে হলে আগে চাই আত্মজ্ঞান, আত্মগঠন। সরোজ আমার কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর সত্যিই বেশ খেটে পড়াশুনো আরম্ভ করল। বাড়ির চিলেকোঠা খুব নির্জন। ও নিজেই বই খাতা বিছানা-পাটি নিয়ে সেখানে উঠে গেল।

আমি বললাম, 'ও-ঘরে কি তোর সুবিধে হবে?'

সে বলল, 'হ্যাঁ মামা।'

ওখান থেকে সেই মেয়েটার চেঁচানি যে আরও বেশী কানে আসবে সে-কথা বলতে আমার যেন কেমন লজ্জা করল। আমি ভাবলাম, গোলমালটা ত আর সব দিন হয় না। সরোজ যখন একটু নিরালায় থাকতে, নির্জনে পড়াশুনো করতেই ভালবাসে তা-ই করুক। বয়স হয়েছে, নিজের দায়িত্ব নিজেই বুঝে নিক। সব সময় চোখে চোখে রাখব তেমন সময় আমার নেই, তা ছাড়া তা বোধ হয় উচিতও নয়। নিজের চোখদুটো সরিয়ে নিয়ে আমাদের কলেজের জন দুই প্রফেসরকে বলে দিলাম ওর ওপর একটু নজর রাখতে। চক্ষুষ্মান বলে তাঁদেরও খ্যাতি আছে।

ইতিমধ্যে একদিন কলেজ স্ট্রীটে সরোজের জ্যেঠামশাই পূর্ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। তাঁরা আমার আগেই দেশ ছেড়েছিলেন। কাঁকুলিয়া রোডে বাড়ি করেছেন। বেশ হিসেবী আর করিৎকর্মা লোক। তিনি সরোজের ফেল করার খবরটা নিশ্চয়ই আগে জেনেছিলেন, তবু যেন জানেন না এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'সরোজ কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে?'

আমি দুঃখ করে বললাম, 'কই আর হল। পাশই করতে পারল না।'

তারপর তিনি আমার ছেলেমেয়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। সব শুনে বললেন, 'ওদের ক্যারিয়ার ত ভালই হয়েছে।'

তাঁর চাপা ব্যঙ্গটা তীরের মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধল। মানে, আমি আমার ছেলেমেয়েদের যতটা যত্ন নিই, ভাগ্নের বেলায় ততটা নিইনে। অথচ ব্যাপারটা কিন্তু উল্টো। সরোজ আমার সংসারে আদরযত্ন বেশী ছাড়া কম পায় না। একবার ভাবলাম, পূর্ণবাবুর সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া করি। 'খুব ত মশাই এখন সরোজ সরোজ করছেন। কিন্তু ভাই মারা যাওয়ার পর একবার খোঁজও নেননি। ভাইয়ের সঙ্গে কী রকম ভাব ছিল তাও আমার জানতে বাকি নেই।'

কিন্তু রাস্তার ওপর ঝগড়াটা আর করলাম না। তার ফলে মনটা আরও অশান্তিতে ভরে উঠল।

পূর্ণবাবু বিদায় নেওয়ার সময় বললেন, 'ইচ্ছে করলে সরোজ আমাদের ওখানেও থাকতে পারে। তেতলা বাড়িতে জায়গার ত আর অভাব নেই।'

আমি বললাম, 'ওর বাপ-মা তেতলা বাড়ি পছন্দ করত না। সরোজ তার মামার কাছে শাক-ভাত খেয়ে থাকুক, তার মা মরার সময় সেই ইচ্ছেই জানিয়ে গেছে।'

সারাটা পথ মন বড় অস্থির আর অশান্ত হয়ে রইল। সরোজের বদলে নিজের ছেলেমেয়েদের কারও পরীক্ষার ফল খারাপ হলে যেন এতটা কষ্ট পেতাম না। মনে মনে ভাবলাম, যেমন করেই পারি, ভাগ্নেকে মানুষ করে তুলব। ওর জ্যেঠা-খুড়োকে দেখাব, আমি গরিব হতে পারি কিন্তু অভিভাবক হিসেবে অপদার্থ নই।

দিনান্তে একবার করে ফের সরোজের খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদেরও বলে দিলাম ওকে একটু বেশী তোয়াজ করতে।

আমার স্ত্রী হেসে বললেন, 'সরোজকে তুমি কাছায় বেঁধে কলেজে নিয়ে যাও। বাব্বা, ভাগ্নে ত আর কারও হয় না, পৃথিবীতে তোমারই একটিমাত্র হয়েছে।'

আমি যখন সরোজকে একটু বেশী আদর করতে যাই, আমার স্ত্রী ওইরকমই ঠাট্টা করেন। আবার আমার স্ত্রী যখন সরোজের ওপর বেশী পক্ষপাত দেখান, আমিও তাঁকে পরিহাস করতে ছাড়িনে।

যাহোক, সরোজকে পড়াশুনোর সব রকম সুযোগ সুবিধে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম, রোজ একবার করে ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কী করে না করে দেখি, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিই। আর কী করতে পারি বলুন! রোজগারের ব্যবস্থা ত করতেই হবে।

ইতিমধ্যে ও-বাড়ির সেই উৎপাতটা আরও বাড়ল। হৈ চৈ মারামারি কান্নাকাটি। অশান্তির একশেষ। আগে আগে আমার কৌতূহল ছিল। এখন আর নেই। তা ছাড়া হাঙ্গামাটা ওদিককার কেবল একটা বাড়ির নয়, প্রত্যেক বাড়ির এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সকালে আমরা সবাই যখন একসঙ্গে বসে চা খাই, কি রাত্রে একসঙ্গে খেতে খেতে গল্প করি, আমাদের মধ্যে সবরকম আলোচনাই হয়। সাহিত্য সঙ্গীত রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি, শুধু পাশের বাড়িগুলির কথা আমাদের মধ্যে একবারও ওঠে না। অনর্থক পরচর্চায় আমার ছেলেমেয়ের কোন আসক্তি নেই। আর ওরা ত একেবারেই পর, সমাজের পরগাছা।

শুধু সরোজ আমাদের আলোচনায় তেমন যোগ দেয় না। খায় আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবে। নীতি বলে, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সরোজদা?' সরোজ মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু।'

নীতি বলে, 'মনে মনে ইকনমিকস মুখস্থ করছ বুঝি?'

নীতির ঠাট্টা তামাশায় সরোজ আগে যেমন চটত, বাদ-প্রতিবাদ করত, এখন আর তেমন করে না। ও ভারী শান্ত আর গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি ভাবি, পড়াশুনোর কথাই ভাবছে হয়ত। পাশ না করা পর্যন্ত বেচারার মনে শান্তি নেই। মেয়েকে ধমক দিয়ে বলি, 'তোরা যদি সবাই একসঙ্গে ওর পিছনে লাগিস— ।'

নীতি বলে, 'সবাই পিছনে লেগেও আমরা কিছু করতে পারব না বাবা। তোমার জন্যে কার সাধ্য সরোজদার গায়ে একটু আঁচড় কাটবে।'

মাঝে মাঝে দেখি সরোজ চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপর পায়চারি করছে। অনেক রাত অবধি ওর ঘরে আলো জ্বলে। আমি বলি, 'তুই কি সারারাতই জেগে থাকিস নাকি? অত বেশী খেটে দরকার নেই। শরীর ভেঙে পড়বে।' নীতি বলে, 'সরোজদা এবার একটা দারুণ কাণ্ড করবে। পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক না তুলে ছাড়বে না।'

তরপর শেষপর্যন্ত সেই দারুণ কাণ্ডই হল। পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই নয়। একদিন ভোরে উঠে সরোজকে আর দেখতে পেলাম না। খানিকবাদে শম্ভুবাবু এসে খবর দিলেন, ও-বাড়ির ঝরনাও উধাও। তার মা দিদিমা চাকর দরোয়ান কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তবু এই দুই অন্তর্ধানের মধ্যে যে কোন যোগাযোগ আছে, তা আমাদের বুঝতে, বিশ্বাস করতে, সময় নিল। আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে রইলাম। ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখেও তাকে যেন চট করে স্বীকার করে নিতে পারলাম না। কিন্তু আমার স্বীকার অস্বীকারে কী এসে যায়। এই নিয়ে সারা পাড়া তোলপাড় হল। চায়ের দোকানে লন্ড্রিতে ডিসপেনসারিতে নানারকমের কানাঘুষো চলতে লাগল। তারপর শুধু কানাকানির মধ্যেই ব্যাপারটা থেমে রইল না। ঝরনাদের বাড়ির দালাল আর দরোয়ান এসে আমাকে শাসিয়ে গেল, তাদের নাবালিকা মেয়েকে যদি আমরা ভালয় ভালয় বের করে না দিই, তাহলে আমাদের নামে ওরা পুলিশকেস করবে। শুধু তা-ই নয়, ঝরনার মা আর দিদিমা এতদিন আড়ালে ছিল। এবার তারাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা নয় তাই বলে গালাগাল শুরু করল। দুজনকে দেখতে প্রায় একই রকম। বিরাট বিপুল দুই মাংসের স্তূপ। শাসানি-ফোঁসানির সঙ্গে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় তারা আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। আমার ছেলে মুখ লাল করে এসে বলল, 'থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসি বাবা। ওদের কী অধিকার আছে আমাদের এ-সব কথা বলবার।'

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কাজ নেই বাবা। তার চেয়ে চল আমরাই এখান থেকে উঠে যাই।'

আমার স্ত্রীও আমার মতে সায় দিল, 'সেই ভাল।'

তারপর দিন তিনেকের মধ্যেই বাড়ি বদলে আমি এই লেক প্লেসে চলে এলাম। এখানে দ্বিগুণ

ভাড়া। তা-ই সই। তিন বছরের মধ্যে যেখান থেকে নড়তে পারছিলাম না; শত অসুবিধা সত্ত্বেও কেবল হিসেব-নিকেশ করছিলাম, তাড়কা রাক্ষুসীদের তাড়নায় দুদিনেই সেখানে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বলতে গেলে শাপে বর হল মশাই। আসবার সময় শম্ভুবাবু হাত জোড় করে বললেন, 'আমাদের কী অপরাধ, আমাদের কেন ছেড়ে যাচ্ছেন। দুদিন সবুর করুন, ওদের আমরাই শায়েস্তা করছি। আপনাদের মত এমন ভাল আর ভদ্র ভাড়াটে আমি এর আগে পাইনি।'

কিন্তু আমি কিছুতেই মত বদলালাম না।

এই হাঙ্গামা হুজ্জতে সরোজের জন্যে শোক করবার কথা আমরা প্রায় ভুলে গেলাম। আমার স্ত্রী পর্যন্ত ক'দিনের মধ্যে তার জন্যে হায়-আফসোস করবার অবসর পেলেন না।

এখানে এসে কাজ আরও বাড়ল। ঘরদোর সাজান গুছানর হাঙ্গামা কি কম।

আমাদের বেড়রুমটাই সব চেয়ে বড়। কারণ সে ঘরে ত শুধু আমরা দুজন থাকি না, সংসারের আরও পাঁচটা জিনিস থাকে। কোথায় খাট থাকবে, কোথায় টেবিল আলমারি, আমার স্ত্রীর পছন্দ আর হয় না। হয়ত এই নিয়েই একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। পুরো একটা ছুটির দিন এইসব গোছগাছ-টানাটানিতেই কাটল। অনার্স ক্লাসের লেকচারটা নিয়ে মোটে বসতেই পারলাম না। রাত্রে এত ক্লান্তি লাগতে লাগল যে, শুতে না শুতেই ঘুম।

সেই ঘুম ভাঙল কিসের একটা ফোঁস-ফোঁসানির শব্দে। অনেকদিনের অভ্যাস, শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম, সাপ টাপ কিচ্ছু নয়, আমারই অর্ধাঙ্গিনী। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে কাঁদছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর দিকেএগিয়ে গেলাম। আরও আস্তে আস্তে বললাম, 'বানু, কী হয়েছে। অমন করছ কেন?'

আগে আগে বাপ মার আড়ালে স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতাম। গুরুজনরা চলে যাওয়ার পর লঘুজনরাই তাদের জায়গা নিয়েছে। ছেলেমেয়ে বড হয়ে গেলে একটু সামলে চলতে হয়। নইলে নিজেরই যেন কেমন বাধো বাধো লাগে।

আমার স্ত্রী অস্ফুট স্বরে বললেন, 'দেখ, আমি যে তাকে আমার নবু নীতিরই মতই ভাল বেসেছিলাম।'

কী সর্বনাশ। আমি ভেবেছি সেই খাট-আলমারির ঝগড়ার জের। এ ত তা নয়। আমি তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে চুপ করে রইলাম। আর আমার সেই স্পর্শে তিনি বুঝতে পারলেন, আমার মুখে সান্ত্বনার কথা না থাকলেও আমার বুকে তাঁরই মত শোকের সাগর উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

আমার স্ত্রী বলতে লাগলেন, 'এখন বুঝতে পারছি, ও কেন দিনরাত অত ছাদে থাকতে চাইত। মরা ফুলগাছে জল দেওয়ার গরজ কেন অত বেশী ছিল ওর। কিন্তু এমন যে হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ও যে আমার চোখে এমন করে ধুলো দিয়ে—।'

আমি বললাম, 'বানু, ও তোমার চোখে ধুলো দেয়নি, নিজের ভবিষ্যৎকেই নষ্ট করেছে। তুমি ওর জন্যে মোটেই দুঃখ কর না।'

আমার স্ত্রী বার বার বলতে লাগলেন, চুপ চাপ না থেকে সরোজের খোঁজ-খবর ভাল করে আমার করা উচিত। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে ফেলেছে বলে কি তাকে অমন গোল্লায় যেতে দিতে হবে। পুলিশের সাহায্য নিতে হলেও তা-ই নেওয়া দরকার। আমার হাতে টাকা যদি না থাকে, আমার স্ত্রীর গায়ে গয়না ত আছে।

খোঁজখবর গোপনে গোপনে সাধ্যমত নিলামও। কিন্তু কোন লাভ হল না। উড়ন্ত পাখির কি কোন পাত্তা পাওয়া যায়? যতদিন পাখা গজায়নি, ততদিন বুকে করে রেখেছি। কে জানে কোথায় সরে পড়েছে, কি নামটাম ভাঁড়িয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে। আমার আরও কিছু অর্থব্যয় হল। তারপর আমি রাগ করে সবাইকে বলে দিলাম, 'খবরদার, ওর নাম যেন আমার বাড়িতে কেউ মুখে না আনে।'

আমার সামনে কেউ মুখে আনল না, কিন্তু আড়ালে আবডালে খুব জল্পনা কল্পনা চলল। এখন শুনলাম, বইয়ের ভিতর দিয়ে ওদের নাকি মনের কথার আদানপ্রদান চলত। শম্ভুবাবুর বই ঝবনাদের বাড়িতে যেত। সেই বই ফের আসত সরোজের হাতে। মেয়েটা নাকি বলত, আমাকে

উদ্ধার কর। হস্টেলেব বাইবে নাকি ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কবে শম্ভুবাবুর বাড়িতে নীতি সেই মেয়েটাকে দেখেছে। আমি বকাবকি করব বলে সে আমার কানে দেয়নি। এখন অনেক কথাই বেরোতে লাগল। চোর পালালে বুদ্ধি না বাড়ুক, তার চাতুরিটা ধরবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়। আমার বাড়ির সবাই সন্দেহ করতে লাগল, এ-ব্যাপারে শম্ভুবাবুরও অনেকখানি হাত আছে, অন্তত তিনি যতখানি ধোয়া-তুলসী সেজেছেন এ-ব্যাপারে তত ভালোমানুষ তিনি নন। এ-সব আলোচনা আমাব আড়ালে প্রায়ই চলত। কিন্তু যখনই কোন কথা আমার কানে যেত আমি ওদের মনে করিয়ে দিতাম, 'ও-সব থাক। পৃথিবীতে আলোচনা করবাব আবও বহু বিষয় আছে।'

তারপর মনে করিয়ে দেওয়ার আর দরকার হল না। ওরা নিজেরাই সব ভুলে গেল। সময় সব জ্বালা সব ক্ষত ভুলিয়ে দেয়, সব অকেজো কৌতূহল ঝেড়ে ফেলে। আমার ছেলে পাশ করে সারভে অব ইণ্ডিয়ায় ভাল চাকরি পেল, মেয়েও পাশ কবে ঢুকল সেবাসদনে। আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ও বলল, তাহলে এম-বি পডবার মানে বইল কী। কী আর কবব, আমি ত জোর করে কিছু করতে পারিনে, এখন যাব কথা শুনবে, তাকে খুঁজে বাব কবতে হবে।

সরোজের কথা আমাদের অনেকদিনেব মধ্যে মনে পড়ল না। তারপর মনে করবার ফের একটা উপলক্ষ্য ঘটল। বছব দুই বাদে সরোজের একখানা চিঠি এল ওর মামীমার নামে। বোধহয় গোপনে আমার কলেজ থেকে ঠিকানা জোগাড় কবে থাকবে। অনেক ভনিতা করে লিখেছে, একটি ছেলে হওয়ার পব তার স্ত্রী মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তাবা এখন নিঃস্ব। দয়াকরে তার মামীমা যদি গোটা পঁচিশেক টাকা ধাব দেন, তাহলে তার বড় উপকার হয়।

নীতি ত উল্লাসে উছলে উঠল, 'মাগো! সরোজদার ছেলে হয়েছে। আমাদের সবোজদা।'

আমি বললাম, 'তোমাদের সরোজদা নয়। আব বাচ্চা ত শিয়াল-কুকুরেরও হয়ে থাকে।'

নীতি বলল, 'বাবা, অমন বিশ্রীভাবে কথা বলছ কেন?'

বললাম, 'তবে কীভাবে বলব?'

আমি জানি এ-সব ব্যাপাবে আমার চেয়ে আমার ছেলে-মেয়েদের সহিষ্ণুতা বেশী। কিন্তু ওরা জানে না, সরোজ আমাব কাছে কী ছিল, তাকে আমি কীভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলাম। আমার বোন আর ভগ্নীপতিব কথা মনে পড়ল। তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখতে পাবিনি। সরোজের জেঠা আব কাকার সামনে আমাব আর মাথা তুলে দাঁড়াবার জো নেই। আমাব দুঃখ ওবা কী করে বুঝবে।

টাকাটা ওর মামী অবশ্য পাঠিয়ে দিলেন। আমার সম্মতি তিনি চাইলেন না, আমারও দেওয়ার দবকাব হল না। আমাব স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা অমন এক-আধটু লুকোচুরি আমার সঙ্গে করে। ওটুক সইতে হয়। তবে সান্ত্বনা এই যে, সে চুরি পুকুরচুরি নয়। আমরা ত সত্যিই আর আমাদের পরিবারেব এক-একটি অটোক্র্যাট হতে পারিনে। যে যা-ই বলুক, হতে চাইওনে। আজকাল আমার ছেলে আর মেয়েব সঙ্গে আমার ঘোরতব তর্ক হয়। প্রায়ই মতের মিল হয় না। বিশেষ করে সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে বিষম ঝগড়া বেধে যায়। যে-সব লেখককে ওরা মাথায় তোলে, আমি তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র রস খুঁজে পাইনে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি জানি, এ-সব নিতান্তই মতভেদ। ওরা মুখে যা-ই বলুক, ওদের স্বভাব চরিত্রে কি আচার ব্যবহারে এমন কিছু নেই যা মর্মভেদী। ওদের সঙ্গে আমার শুধু রক্তের সম্পর্ক নয় এক গভীর রুচির ঐক্যও গড়ে উঠেছে। যতদিন বাঁচব আপনাব বাপ-মার আশীর্বাদে আশা করি তা স্থায়ী হয়ে থাকবে।

শুধু সরোজ--। তার কথা মনে হলে এখনও--। থাক সে-কথা।

ওব মামীমার আশীর্বাদের জোর আছে দেখা গেল। মাসখানেক বাদে ফের চিঠি এল। ওর স্ত্রী সুস্থ হয়েছে। সরোজ একদিন প্রণাম করতে আসতে চায়।

আমি বললাম, 'খবরদার ওর নামও কর না।'

ছেলে বলল, 'বাবা, তোমাব এই শুচিবায়ু কেন?'

আমি বললাম, 'শুচিবায়ু ত নয়, শুচিতা। যে-কোন সংস্কারকেই কুসংস্কার বলে ভেব না।'

কিন্তু আমার নিষেধ সত্ত্বেও সরোজ সত্যিই একদিন দেখা করতে এল। জানিনে ওরাই গোপনে

গোপনে আসতে বলেছিল কি না। ছুটির দিন। বিকেল বেলা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সদর দরজা পর্যন্ত এসে ইতস্তত করছি বেরুব কি বেরব না। হঠাৎ দেখলাম দূর থেকে একজন অচেনা লোক আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। আর একটু কাছে এলে দেখলাম, অচেনা কেউ নয়, সরোজ। কিন্তু চেনা সত্যিই শক্ত। এই ক' বছরেই চেহারা অনেক পালটে গেছে। শুধু রোগাটে নয়, বুড়োটেও হয়েছে বেশ। বছর দশেক বয়স বেড়ে গেছে যেন। ও বোধ হয় ভাবেনি, প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সামনে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপর আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এল।

আমি এক লাফে অনেকখানি পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।'

ও অস্ফুট স্বরে বলল, 'মামা—।'

আমি বললাম, 'এখানে তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'

ও বলল, 'আমি একবার মার সঙ্গে—।'

আমি বললাম, 'তোমার মা বহুকাল আগে মরে বেঁচে গেছে। এখানে কেউ নেই তোমার। এক্ষুনি চলে যাও।'

সরোজ আর কোন কথা বলল না। ততক্ষণে বৃষ্টিটা আরও জোরে এসেছে। ও ভিজতে ভিজতেই চলল। আমি ফিরে এলাম ঘরে।

আমাব স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা বসে বসে জটলা করছিল। আমাকে ফিবে আসতে দেখে আমার স্ত্রী খুশী হয়ে বলল, 'বাঁচা গেল। ভাবছিলাম তুমি বোধহয় বৃষ্টির মধ্যেই বেরোলে।'

আমি বললাম, 'কেন, আমার কি আক্কেলবুদ্ধি বলে কিছু নেই?'

আমাব স্ত্রী হেসে বলল, 'তা একটু কমই আছে।'

আমার ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে বসে ছিল। আমি ওদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম। ওরা কি সব জানে? ওবা কি সব টের পেয়েছে? কিন্তু আমার বাড়ি, আমার ঘর। সরোজকে এখানে ঢুকতে না দেওয়ার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। তবু সত্য কথাটা ওদের কাছে বলতে পারলাম না; ব্যাপারটা চেপে গেলাম।

নবু বলল, 'বাবা তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

নীতি বলল, 'বাবা নিশ্চয়ই হিপনটিজম প্র্যাকটিস করছে। আমরা ত সহজে বাধ্য হবার কেউ নই।' এরপর ওরা তিনজনেই খুব হেসে উঠল। নীতিই হাসত লাগল বেশী। আজকাল প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রকেই শুধু মিত্রের আসন ছেড়ে দিতে হয় না, মেয়ে বান্ধবীর জায়গা দখল করে। আপনি কিছুতেই তাদের আটকে রাখতে পাবেন না। দিনকালই এই রকম।

ওদের হাসতে দেখে আমি খুব চটে উঠলাম। বাচালতা প্রগল্‌ভতা চট করে সইতে পারিনে। তবে আজকাল মাঝে মাঝে একাএকা অন্য রকমও ভাবি। ভাবি বয়সকে অল্পবয়সীরা যেমন শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, সমবেদনা দেখায়, তেমনি সেই সঙ্গে একটু হেসে না নিয়েও পারে না। বার্ধক্য হয় যৌবনের কার্টুন। ইডিওসিনক্রেসিতে নিজের আত্মীয়স্বজনকে হাসতে দিতে হয়। হাসতে না পারলে তারা ভালবাসতে পারে না। হাসিটা উপহাস না হলেই হল।

খানিক বাদে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও হাসলাম। তবু আসল কথাটা তখনও বলতে পারলাম না। তারপর ওরা ফের আর একদফা চা আর পাঁপর ভাজা করল। বৃষ্টি তবুও ধরে না। কাজকর্ম নেই। ভাই বোনে মিলে বসল রেকর্ড বাজাতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড। একের পর এক গান শুনতে লাগলাম। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', 'আলোকের এই ঝরনাধারায়', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।' এই পুরনো গানখানার নতুন রেকর্ড এসেছে। শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে গিয়ে আমি আমার কাজে বসলাম। কিন্তু মন বসল না। গানের কলিগুলি বেজে চলল,

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।
সবার পিছে সবার নীচে সব-হারাদের মাঝে।'

মনে মনে ভাবলাম, এ-দৈন্য কি শুধু অর্থের ? না, না। এ-দৈন্য সংশিক্ষার, এ-দৈন্য শুভবুদ্ধির, এ-দৈন্য মহৎ হৃদয়ের।

'যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রনাম আমার কোনখানে যায় থামি
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে।'

কাজ হল না। সারাটা সন্ধ্যা, সারাটা রাত কী একটা ছটফটানি আর অস্বস্তির মধ্যে কাটল। পরদিনও তাই। আমার স্ত্রীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলাম না। তিনি বললেন, 'কি হ'য়েছে ?' আমি বললাম, 'কিছু না।' কলেজের এক সহকর্মী বললেন, 'সুধাবিন্দুবাবু, আপনাকে আজ যেন বড় অন্যমনস্ক দেখছি!' আমি শুনিনি-শুনিনি করে জবাবটা এড়িয়ে গেলাম। তার কাছে কথাটা ভাঙলাম না। সে-দিনও গেল।

পরদিন স্ত্রীর জমাখরচের খাতার ভিতর থেকে চুরি করে নিলাম সরোজের ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ডটা। কলেজে গেলাম। ক্লাসগুলি শেষ হল। তবু প্রোফেসরস্ রুমে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লাম। মন স্থির করে কিছু করবার জো নেই। যা করবার অস্থিরভাবেই করতে হবে।

ঠিকানাটা খিদিরপুরের। কিন্তু জায়গাটা যে অত ঘিঞ্জি তা ভাবিনি। সন্ধ্যা উতরে গেছে। বড় রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিন্তু সে-আলো বস্তির মধ্যে ঢোকেনি। অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করে করে সরোজের বাসাটা বের করলাম। কড়া নাড়তে হল না। দোর খোলাই ছিল। আমার পায়ের সাড়া পেয়ে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। রোগাটে শীর্ণ চেহারা। পরনে সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর। মাথায় আঁচল ছিল না। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি তুলে দিল।

ঝুল-বারান্দায়-দাঁড়ান সেদিনের ঝরনাকে আমি ভাল করে দেখিনি। দেখলেও এই মেয়েটির সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারতাম কি না সন্দেহ। এক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সরোজ আছে ?'

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে অল্প একটু হাসল, বলল, 'না। তিনি ত এই খানিক আগে বেরিয়ে গেলেন।'

বললাম, 'কোথায় ?'

'টিউশনিতে।'

মনে মনে হাসলাম। নিজে কত বড় বিদ্যার জাহাজ! ও আবার মাস্টারিতে নেমেছে। তারপর একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি সরোজের মামা।'

মেয়েটি বোধ হয় আগেই আমাকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু সে-কথা বলবার সাহস পাচ্ছিল না। আমি নিজেই পরিচয় দেওয়ায় ও এবার নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কিন্তু ঠিক আগের মত লাফিয়ে সরে যেতে পারলাম না। জোড়পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অভ্যাসবশে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করলাম।

ঝরনা এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'ভিতরে আসবেন না ?'

না আর কী করে বলি। গেলাম ভিতরে। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট নেই। হ্যারিকেনের আলোই জ্বলছে। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোশ। তার ওপর শিশু ঘুমোচ্ছে। এক টুকরো কাপড়ে ক্ষীণ দেহটুকু ঢাকা। দড়ির আলনায় শাড়ি আর ধুতি ঝোলান। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর আসন। দেখে দেখে গা যেন শির-শির করে উঠল। অনেক সাধ্যসাধনার পর উর্বশী আজ জায়া আর জননী হয়েছে। এ কি ওর এক জন্মের সাধ ? এ সাধ কি ওর মা আর দিদিমার মনেও ছিল না ? তক্তপোশের ধার ঘেঁষে বসলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর হঠাৎ বললাম, 'তোমরা কি প্রথম থেকেই এ-বাড়িতে আছ ?'

ঝরনা মুখ নীচু করে বলল, 'না। প্রথমে একটা ভাল বাড়িতেই উঠেছিলাম।'

'সেখানে চলত কী করে ?'

ঝরনা আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর লজ্জিতভাবে একটু হেসে বলল, 'দিদিমার কিছু গয়না চুরি করে এনেছিলাম।'

এ-কথা শুনে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। তারপর বসে বসে আরও খানিকক্ষণ শুনলাম ওদের কাহিনী। গোড়ার দিকে খুব সাধু সঙ্কল্পই ছিল। কালীঘাটে বিয়ের পাট সেরে একজন ভর্তি হয়েছিল স্কুলে আর একজন রাত্রের কলেজে। কিন্তু অধ্যবসায়টা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ছেলে হওয়ার আগে থেকেই অসুখবিসুখে ধরেছে। আরও আগে ফুরিয়েছে গয়নার টাকা। কিছু নাকি চোরের ওপর বাটপাড়িতেও গেছে। সরোজের স্থায়ী কান কাজকর্ম এখনো জোটে নি। এটা-সেটা করে চলে।

ভাবলাম ঝরনার মা-দিদিমার খবরটা এবার জিজ্ঞেস করি। তারা কি কোন সাহায্য করেনি, নাকি ওরাই নিতে চায়নি ? আমার মত তাদেরও কেউ কি এমনি লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল ? ভাবলাম জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হল।

খানিক বাদে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঝরনা আরও একবার প্রণাম করে বলল, 'আবার আসবেন।'

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছুতেই বলতে পারলাম না, 'তোমরাও যেয়ো।' কথাটা কেমন যেন গলায় আটকে গেল। আমি জানি, আমি না পারলেও আমার ছেলেমেয়েরা পারবে। তারা বলবে।

বাড়িতে এসে রাত্রে খাওয়ার সময় সবিস্তারে বললাম সরোজের কাহিনী আর আমার অভিযানের কথা। নবু খেতে খেতে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, 'সত্যি বলছ বাবা ? তুমি এতখানি আধুনিক হয়েছ ?'

আমি হাতের গ্রাস মুখে না তুলে ওদের দিকে চেয়ে চড়া গলায় বললাম, 'না, আধুনিক হইনি। এই যদি তোমাদের আধুনিকতা হয় আমি এর মধ্যে নেই।'

নীতি বলল, 'কেন ?'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এ ত সেই বাল্যপ্রেম, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা আর অকাল-সন্তান। এই দায়িত্বহীনতার মধ্যে প্রগতি কোথায় ?'

ওরা আর তর্ক করল না। পাছে আমি আরও রেগে যাই, রেগে গিয়ে বিষম খেয়ে বসি। একদিন সেই রকমই এক কাণ্ড ঘটেছিল।

কিন্তু সত্যিই আমি রাগ করিনি। সেই আগের মত জ্বালা আর নেই। ঘা অনেক শুকিয়ে গেছে। তবু এখনও সরোজদের কথা মনে হলে আমি ভারী একটা অস্বস্তি বোধ করি। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে আমি ওদের কথা ভাবি। সরোজ তার ছেলে বউকে কী করে বাঁচাবে ? ওই বিদ্যেবুদ্ধি আর ওই রোজগারে কী করে ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে ? আমি যেটুকু করেছি, ও ত সেটুকু করতে পারবে না।

আমার নবু মাঝে মাঝে অনুপ্রাস দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। সে বলে, 'বাবা, শুধু কম্প্যাশন থাকলে হয় না, সেই সঙ্গে প্যাশনও থাকা চাই।'

কিন্তু বলতে পারেন, মানুষ আর কতকাল এই যুক্তি-বুদ্ধিহীন বিচার-বিবেচনাহীন প্যাশনের দাসত্ব করবে ?"

সুধাবিন্দুবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি আরও কিছুক্ষণ ধরে প্রশ্নবোধক হয়ে রইল।

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি ফের জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, কথা বলছেন না যে ?"

হেসে বললাম, "আমার কথা আপনার কাহিনীর মধ্যেই আছে।"

ভাদ্র ১৩৬৪

সহদেব

জানলার ধারে ছোট তক্তপোশখানার ওপর উপুড় হয়ে বসে কবিতা লিখছিল একটি ছেলে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কালো রোগাটে চেহারা। পিঠের দু-খানি হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। নতুন দু-খানি পাখার উদ্গম হচ্ছে যেন। কবিতা লিখছিল। কিন্তু প্রেমের কবিতা নয়। এক রুক্ষ রিক্ত ঊষর মরুভূমির সঙ্গে নবাঙ্কুরের সংগ্রাম। জন্মমুহূর্ত থেকে তার যুদ্ধযাত্রা। সে সংগ্রামের শেষ নেই। বহু অঙ্কুর বীজের মধ্যেই বিনষ্ট হয়, শেষ পর্যন্ত আলোর মধ্যে মাথা তুলতে পারে না। তবু এই বিনাশই শেষ কথা নয়। সে যে বনস্পতির স্বপ্ন নিয়ে মরে, সেই স্বপ্নই সত্য। তার সেই স্বপ্ন হাজার হাজার বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। হাজার হাজার অঙ্কুর তৃণে শস্যে লতায় তরুতে সার্থক হয়ে উঠে। তার পরাজয় নেই। তবু শেষ নেই সংগ্রামের। সব রকমের ব্যর্থতা বিফলতা প্রতিকূলতার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সংগ্রাম। সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সংগ্রাম, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংগ্রাম, নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। ভাবের সঙ্গে ভাষার সংগ্রাম, যে ভাষা তার স্বভাবকে প্রকাশ করে না, উপহাস করে, পরিহাস করে। সংগ্রামের শেষ নেই, জীবন মানেই সংগ্রাম। শিল্পও কি সংগ্রাম নয়?

লেখা বন্ধ করে ভাবছিল ছেলেটি। চিন্তার জটিল জটকে শব্দ, ছন্দ আর মিলের সাহায্যে যত ছাড়াবার চেষ্টা করছিল ততই যেন তা আরো জটিলতর হয়ে উঠছিল। শিল্প নিজের আধখানাকে ঢাকবে। কিন্তু সবখানিকে নয়। তাছাড়া তার কবিতা কাদের জন্যে? দেশের জনসাধারণের জন্যে। মুষ্টিমেয় অসাধারণের জন্যে সে নিশ্চয়ই লেখে না! তবে? তবে কেন লেখার মধ্যে আসবে শব্দকাঠিন্য, ভঙ্গির বাহুল্য, বিদেশী পুরাণ আর সাহিত্যের মন্থন, আর তার ফলে কাব্যের অস্পষ্টতা?

তবে কি সব কবিতাই হবে 'পাখি সব করে রব'?

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে ছেলেটি।

কিন্তু তার চেয়েও কঠিন প্রশ্ন তার বাবার! 'এই সহদেব, আবার কাব্যি করতে বসেছিস?'

সহদেব কাটাকুটি ভরা কাগজগুলি এক পাশে সরিয়ে রেখে তার বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, 'বাবা!'

আহত ক্ষুব্ধ ছেলের চোখে চোখ রাখল শশধর, পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'কী বলবি বল।'

সহদেব বলল, 'না, বলবার কিছু নেই। কাব্য কথাটা ভালো করে বলতে পার বল। না পার তো বল না। তোমার বেকার ছেলে কবিতা লেখে বলে দুনিয়ার কাব্য 'কাব্যি' হয়ে যায়নি। তুমি আমার ওপর রাগ করতে পার, আমাকে অপমান করতে পার, কিন্তু যে মহৎ শিল্প তোমারও নয়, আমারও নয়, সব দেশের, সব কালের, সব মানুষের, তাকে ব্যঙ্গ করার তোমার অধিকার নেই বাবা।'

শশধর তেমনি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। তারপর ফের একটু হেসে বলল, 'এতকাল পদ্য লিখতিস্ এবার বুঝি নাটক শুরু করেছিস? থিয়েটারে নামবি? সিনেমায় নামবি? তা করলেও তো হত। তা করেও তো কত লোক করে খাচ্ছে। কিন্তু যা একখানা দাঁড়কাকের মত চেহারা। ওই চেহারার জন্যে তোর চাকরি বাকরি কিচ্ছু হবে না।'

বাবার এই আকস্মিক অদ্ভুত আক্রমণে কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব হয়ে রইল সহদেব। এতক্ষণ তার গুণ মানে নির্গুণতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। এবার তার আকৃতির বিরূপতাকেও ব্যঙ্গ করছে তার বাবা! আশ্চর্য!

এই কটূক্তির জবাব সহদেবকে দিতে হল না। রান্না-ঘর থেকে ছুটে এসে তার মা যোগমায়া মাঝখানে এসে দাঁড়াল, 'এই সাতসকালে আবার কি শুরু করলে শুনি! বয়স তো এখনো পঞ্চাশ পেরোনি, এই বয়সেই ভীমরতি হল নাকি তোমার?'

শশধর বলল, 'ভীমরতির আবার কী দেখলে ?'

যোগমায়া বলল, 'দেখাবার কীইবা বাকি রেখেছ শুনি ? বাপ হয়ে নিজের ছেলের চেহারার নিন্দে করছ লজ্জা করে না ? নিজের চেহারাখানা কী ?'

যোগমায়া হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো ছোট আয়নাখানা তুলে নিয়ে স্বামীর সামনে ধরল, 'নিজের চেহারার কথা কি একেবারে ভুলে গেছ ?'

শশধরের প্রথমে রাগ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীর কাণ্ড দেখে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল, 'কথাটা ঠিকই বলেছ বটে। ভোলবার কি আর জো আছে ? হতভাগাটা অবিকল আমার মতই হয়েছে।'

সহদেব লজ্জিতও হল, বিরক্তও হল। মাকে একটু ধমকের সুরে বলল, 'আঃ কি করছ ? রেখে দাও আয়নাটা।'

যোগমায়া স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'তবে ? যেমন বাপ, তেমন তো ব্যাটা হবে। ওকে দুষে লাভ কি।'

তিনজনের মধ্যে যোগমায়াই অবশ্য দেখতে সুন্দর। তার রঙ ফরসা। মুখের ডৌলটি পানের মত। নাক চোখ ঠোঁট চিবুকের গড়নও ভালো। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে ছটি। সেই তুলনায় শরীর এখনো বেশ শক্তই আছে। তার রূপ ছেলেরা পায়নি। মেয়েরা কেউ কেউ পেয়েছে। যোগমায়া হেসে বলে, 'রক্ষা যে উল্টোটি হয়নি। তাহলে আর ওদের বিয়ে দিতে পারতাম না।'

শশধর দাসের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কালো রোগাটে চেহারা। মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে। গালদুটি ভাঙা, পুরু ঠোঁটের ওপর আরো পুরু এক জোড়া গোঁফ। অবশ্য ছোট করে ছাঁটা।

সহদেব তার বাবারই নবসংস্করণ, যুবসংস্করণ। কিন্তু যৌবনের লাবণ্য সহদেবের মধ্যে যেন নেই। এই বয়সেই কেমন একটা পাকানো দড়ির মত শরীর। স্বাস্থ্য নেই, দেখলে মনে হয় শক্তিরও অভাব আছে। ছেলের এই স্বাস্থ্যহীন, রূপহীন যৌবন যেন সহ্য করতে পারে না শশধর। বাঁকা চোখে তাকায়, বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

যোগমায়া হেসে বলে, 'আহা, চেহারা খারাপ, ও তার করবে কি। চেহারার ওপর মানুষের তো কোন হাত নেই। প্রথম বয়সে তুমিও যে কোন্ ময়ূর ছাড়া কার্তিক ছিলে তা আমার জানা আছে।'

শশধর বিরক্ত হয়ে বলে, 'আঃ কথায় কথায় কেবল আমার তুলনা টানো কেন। ওকি সব ব্যাপারেই আমার মত হবে ? তাহলে আর ওকে স্কুল কলেজে পড়ালাম কেন, বি. এ. পাশ করালাম কেন ? ও যদি আমার মতই হবে তা হলে তো ওকে ছেলেবেলা থেকে দোকানেই বসিয়ে দিতাম।'

রানী রোডের মোড়ে একখানি গয়নার দোকান আছে শশধরের। তার বাবা তাদের তিন ভাইকে আলাদা আলাদা দোকান করে দিয়েছিলেন। রানী রোডের দোকানখানা শশধরের ভাগে পড়েছে। নিজের বুদ্ধি, সততা আর পরিশ্রমের জোরে এই দোকানকে সে বাড়িয়েছে। এই দোকানের আয়ে বড় ছেলেকে বি. এ. পাশ করিয়েছে, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, শহরতলীতে ছোট একটি বাড়িও করেছে। অবশ্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রির কিছু টাকাও ভাগের ভাগ সে পেয়েছিল। এই দোকান তার লক্ষ্মী। তবু শশধরের ইচ্ছা নয় তার কোন ছেলে স্যাকরার কাজ করে। বড় বড় জুয়েলার হওয়া যায়, শহরের বড় রাস্তায় তেতলা বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে, দোকানে বিশ-পঁচিশ জন কর্মচারী খাটে, তখন কেউ আর স্যাকরা বলে ডাকে না। ধনী, মানী বলেই সম্মান করে। কিন্তু শহরতলী, যেখানে চার আনা শহর, বার আনা পাড়া গাঁ, সেই অদ্ভুত জায়গায় হাতের কাজ যারা করে তাদের সম্মান কম। আগে তো 'তুমি' বলেই ডাকত, আজকাল ভদ্রতা বশে কেউ কেউ 'দাস মশাই' কি 'শশধরবাবু' বলে বটে, কিন্তু মনে মনে তেমন সমাদর করে না। লোহার কাপই হোক, তামা পেতলের কাপই হোক, আর সোনারূপার কাপই হোক এসব ব্যাপারে মানুষের দর প্রায় সমান। বড়লোকের ঝি বউয়েরা, গৃহিণী-সোহাগিনীরা শশধরদের গড়া গয়না কানে পরবে, গলায় পরবে, হাতে পরবে, খোঁপায় পরবে, কিন্তু যারা কারিগর—শিল্পী, তাদের তেমন মর্যাদা দেবে না। আজব এই দুনিয়া। এখানে কলম কানে না গুঁজলে বাবু হওয়া যায় না, ভদ্রলোক হওয়া যায় না। তাই বড়

ছেলেকে শশধর বি. এ. পাশ করিয়েছে। ও কলমজীবী হয়ে সমাজের সম্মান অর্জন করুক এই ছিল তার আশা। কিন্তু সে আশা পূরণ করতে পারছে কই সহদেব। কলেজ থেকে বেরিয়েছে দু-বছর হল। তারপর আর কোন আপিসেই ঢুকতে পারেনি। ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। দু-এক জায়গা থেকে হয়তো ডেকে পাঠায়, সেজে গুজে যায় সহদেব। কিন্তু ছেলের মুখ দেখেই শশধর বুঝতে পারে ওর চাকরি হবার কোন আশা নেই। সোমত্ত ছেলে। কতকাল আর বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করবে। শশধরের নিজেরই যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। চোখে সয় না। অবশ্য এখনই তার সংসারে ভাতের অভাব হয়নি। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিতেও সে ছেলেকে পারে, শার্ট, পাঞ্জাবি, ধুতি, জুতো এবং আপিসে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ট্রাউজার জোগাতেও শশধর কার্পণ্য করে না এবং ছেলে যে আধাসাহেব সেজে বের হয় তা তার দেখতে ভালোই লাগে, কিন্তু সে সাজ যে থিয়েটারের এক রাত্রের রাজার সাজের মত, তা যে এক বেলার বেশী স্থায়ী হয় না।

তাই শশধর আজকাল ছেলেকে বলতে শুরু করেছে, 'চল আমার সঙ্গে দোকানে। কাজকর্ম শিখবি। হাল আমলের গয়না—তার নিত্য নতুন প্যাটার্ণ সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। খাঁটি সোনা কিভাবে ওজন নিতে হয়, কিভাবে গালাতে হয়, হিসাবপত্তর ঠিক রাখতে হয় কিছুই তো জীবনে শিখিসনি। এ তোর বি. এ. ক্লাশের পাঠ্যের চেয়ে কম নয়।'

সহদেব প্রথম প্রথম অবাক হয়ে বলেছে, 'তুমি বলছ কি বাবা, আমি যাব ওই দোকানে?' ছেলের কথার ধরনে ক্ষেপে উঠেছে শশধর, 'কেন, তাতে কী হয়েছে? আমার দোকানে গেলে তোমার জাত যাবে? বাঁদর ছেলে। স্যাকরা বাপের ভাত খাচ্ছ তাতে তোমার জাত যায় না, আর তার দোকানে গেলে মান যায়? কলেজে ঢোকা অবধি আমার দোকানের সুমুখ দিয়ে তুই হাঁটিসনে, ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে নিস, আমি বুঝি কিছু টের পাইনে ভাবিস?'

যোগমায়া এসে বিবাদ মিটাবার চেষ্টা করে, 'কি যে বল মাথা খাবাপের মত, ও কি দোকানের কিছু জানে যে দোকানে যাবে? ও গিয়ে করবে কী সেখানে?'

শশধর বলে, 'করবে আমার মাথা! ওকে আমার মত কারিগরী করতে তো আর বলিনে। কারিগর আমিই আছি। গাধার মত বুড়ো বয়স পর্যন্ত আমিই খাটব। তোমার নন্দন বাবু হয়ে চেয়ারে বসে থাকবে, লেখাপড়ার কাজটুকু হিসেব নিকেশটুকু করবে। দোকান কি করে চালাতে হয়, কি ভাবে কারিগর খাটাতে হয় তা শিখবে। না কি বাবুর তাতেও অপমান? দোকানের কাজকর্ম যদি একেবারেই কিছু ওর মাথায় না ঢোকে, আমি চোখ বুঝলে যে গুষ্টীসুদ্ধ রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। সে খেয়াল আছে?'

যোগমায়ার মুখে কথা জোগায় না। ছেলের সম্বন্ধে সেও ভিতরে ভিতরে আস্থা হারাতে শুরু করেছে।

শশধর ঘর থেকে বেরোবার আগে ছেলেকে ফের একবার নির্দেশ দিয়ে গেল, 'কাব্যিই হোক—কাব্যই হোক, ওসব লেখা টেখা এখন রাখ। টিউশনি ফিউশনি কিছুই তো এখন আর নেই। চুপচাপ বসে না থেকে কি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে না বেড়িয়ে দোকানে গিয়ে দু-দণ্ড বসলি তাতে ক্ষতি কি।'

সহদেব হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাই বসব বাবা, তাই বসব। কাল থেকে ঠিক দোকানে যাব আমি। সুধন্য কারিগরের কাছে কাজ শিখব। বসে বসে মেয়েদের গয়না গড়াব।'

শশধর বলল, 'তা যদি গড়াস ভালোই হবে। ওই পদ্য লেখার চেয়ে সে কাজ ঢের ভালো। তাতে পয়সা আছে। আর মেয়েরা পুরুষের কাছে ওই সব গয়নাই চায়, চোথা কাগজে লেখা পদ্য চায় না। কলেজে পড়া মেয়েই হোক আর লেখাপড়া না জানা গিন্নীবান্নিই হোক, গয়নার লোভ সবারই আছে। দোকানে বসে বসে দেখি তো। ওদের মন সোনা দিয়ে কিনতে হয়, শুধু কাগজ কলমে হা-হুতাশ করলে কোন লাভ হয় না।'

বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে অস্থির হয়ে উঠল সহদেব। ছি-ছি-ছি, বাবা তাকে ভেবেছেন কী। কবিতা মানেই কি কোন মেয়ের জন্যে হা-হুতাশ। সহদেবের দু-একজন বান্ধবী এখানে কদাচিৎ দু-এক দিন আসে। সেই সঙ্গে আরো অনেক বন্ধু থাকে। তাদের সঙ্গে সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

হয় সহদেবের। তার বাবা কি সেই মেয়েদের কটাক্ষ করে এই সব বাজে কথা বলছেন, বিশ্রী ইঙ্গিত করছেন? বিচিত্র কিছু নেই। ওঁর যা শিক্ষা-দীক্ষা তাতে ওঁর পক্ষে মেয়েদের সম্বন্ধে এমন মনোভাবই স্বাভাবিক। তার বাবা তো ভালো, এই পাড়ারই কত উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোককে সে দেখেছে। সমবয়সী দুটি তরুণ-তরুণীর মেলামেশার তাঁরা কেবল একটি অর্থই জানেন। বীথির সঙ্গে বাসের একই সীটে বসে কাজের কথা, কি আধুনিক কবিতার কথা বলতে বলতে যখন দু-একদিন গেছে সহদেব, সহযাত্রীরা সবাই নিষ্পলক আর উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন। তার বাবা কটাক্ষ করবেন এ আর বেশী কথা কি।

সহদেব ঝগড়াটা আর বেশীদূর গড়াতে দিল না। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকুই দেরি করল, তারপর পুরনো স্যাণ্ডেল জোড়ায় পা গলিয়ে চটপট বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পিছন থেকে যোগমায়া ওকে বলল, 'ও সহদেব, কিছু খেয়ে গেলিনে?'

সহদেব বলল, 'বিরক্ত কোরো না, পরে এসে খাব।'

সদর দরজা ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় গলির মোড় পর্যন্ত এল সহদেবের মেজো বোন বীণা। দশ এগার বছর বয়স হয়েছে। পরনে ফ্রক, কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'যেয়ো না দাদা, যেয়ো না। এ ভাবে গেলে বাবার কাছে আরো বকুনি খাবে।'

সহদেব মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খাই খাব। তুই যা তো এখন। হতচ্ছাড়া অভদ্র মেয়ে কোথাকার।'

বীণা উল্টোদিকে ছুটে পালাল।

সহদেবও পালাতে পারলে বাঁচে। 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোনখানে।' পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন অজ্ঞাত দেশে চলে যেতে চায় সহদেব। সেখানে গিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেবে।

কিন্তু আপাতত মোল্লার দৌড় মসজিদ তক। বেকার ছেলের আশ্রয় পাড়ার সস্তা চায়ের দোকান। এখানে এখনো চার পয়সা করে কাপ চা পাওয়া যায়। চেনা দোকান। বাকি বকেয়াও চলে।

দোকানে ঢুকতেই কালীবাবুর স্বগত সম্ভাষণ, 'এসো হে এসো সহদেব। আর সব দেবদেবীরা কোথায়। কাউকেই যে দেখছিনে।'

আরো কয়েকজন লোক চা খাচ্ছে, আর কাগজ পড়ছে। সহদেব তাদের ধার দিয়ে উত্তর দিকে সব চেয়ে পিছনের বেঞ্চটায় গিয়ে বসল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'কালীদা, এক কাপ চা।'

সহদেবের নামটা নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে, কালীদাও ঠাট্টা করেন। করবেই তো। সবচেয়ে চরম ঠাট্টা করে গেছেন তার ঠাকুরদা। তিনিই সেই মহাভারতের আমলের সেকেলে নামটাকে এযুগের অতি আধুনিক কবির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই মিলিয়ে তখন তারা পাঁচজন। ঠাকুরদা যুধিষ্ঠির থেকে শুরু করে সহদেবে এসে থেমেছেন। সহদেব তখনও শিশু। সে বুঝতে পারেনি তার ঠাকুরদা নামকরণের ভিতর দিয়ে কী সর্বনাশটি তার করে গেলেন। ছি-ছি-ছি, এমন নাম কেউ রাখে? ভদ্রলোকের ঘরে রাখে না। সহদেব যে জাতে খাটো তা তার নামেই প্রমাণ। আজকাল রামায়ণ আর মহাভারত বৈশ্য শূদ্রদের হাতে চলে গেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা ওই দুই গ্রন্থ থেকে নাম সংগ্রহ করে না। হাল আমলের লেখকেরা ওই দুই পৌরাণিক কাব্যের কোন উপাখ্যান নিয়ে নাটক লেখেন না, আজকালকার গল্প উপন্যাসে ওই সব চরিত্রের বিন্দুমাত্র আদল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন যুগে জন্মেও সহদেবকে ওই নামের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। যুধিষ্ঠির ভীম দাদাদের কোন আপত্তি হয়নি; তারা বাপ ঠাকুরদার মত জাত ব্যবসায়ে লেগে গেছে। যত বিড়ম্বনা সহদেবের। স্কুলে থাকতে পণ্ডিতমশাই ঠাট্টা করে বলতেন, 'কি হে, কনিষ্ঠ পাণ্ডবের খবর কি? ব্যাকরণ কৌমুদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এত কম কেন?'

তার নাম শুনে কলেজের সহপাঠীরা মুখ মুচকে হাসত, সহপাঠিনীদের তো কথাই নেই।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় সহদেব এফিডেফিট করে নামটা পাল্টাতে চেয়েছিল। মহাভারতের মধ্যেই থাকবে। সহদেবের বদলে সঞ্জয়। বেশ আধুনিক নাম, ধ্বনি-মাধুর্য আছে।

কিন্তু এ প্রস্তাবে সহদেবের বাবা শশধর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'এ নাম তোমার বাবার দেওয়া নয়, আমার বাবার দেওয়া। এর একটি অক্ষর পাল্টালে প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তা বলে দিলাম।'

বাবার সেই পিতৃভক্তি দেখে সহদেবের হাসিও পেয়েছিল দুঃখও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নামটা আর পাল্টানো হয়নি। তারপর আস্তে আস্তে সয়ে গেছে। সহদেবের মত নামও সহনীয় হয়েছে। নামের মত চেহারা। নিজের চেহারাটাও সহদেবের পছন্দ নয়। বাবা পর্যন্ত এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেন। কিন্তু তিনি তো জানেন না এর দায়িত্ব সহদেবের নয়। দায়িত্ব যদি কারো থাকে তবে বাবার এবং তস্য বাবার। অবশ্য ডন বৈঠক বারবেল করে কিছু মাসবৃদ্ধি হত। পেশীগুলিকে বেশী না হোক অল্পস্বল্প দৃশ্যমান করা যেত। বাবা হয়তো তাই বলতে চান। কাব্যচর্চা না করে শরীরচর্চার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেন। কিন্তু দিলে কি হবে, কুস্তির আখড়া, খেলার মাঠ কি জিমনাসিয়াম সহদেবকে কোনদিন টানেনি। এখন তো একমাত্র আকর্ষণ কবিতার। শুধু বাগর্থের প্রতিপত্তি। সহদেব আর কোন সম্পত্তি চায় না।

চায়ের কাপ শেষ করে সহদেব উঠে দাঁড়াল। পয়সা বাকি রাখল না। ঝুল পকেট থেকে আনিটি বের করে দিল কালীবাবুর হাতে।

বেরিয়ে আসছে বন্ধু শেখর দত্ত এসে ঢুকল।

শেখর সহপাঠী। চাকরি-বাকরির সুবিধা হবে ভেবে বি. কম. পড়তে গিয়েছিল। পরীক্ষক ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আসলে বাণিজ্যবিদ্যায় শেখরের কোন আগ্রহই নেই। সেও সাহিত্যের ভক্ত। তার অবস্থা আরো সঙ্গীন। নিজেদের বাড়ি নেই ব্যবসা নেই। তার বাবা বেসের কেরানী। মা নেই। কিন্তু ভাই বোন একপাল। চাকরি ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলবার উপায় নেই। কিন্তু কে দেবে চাকরি ?

সহদেব বন্ধুর সঙ্গে ফের এসে চা নিয়ে বসল। খানিকক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে। জীবনের ঝড় চায়ের কাপের ওপর দিয়েই যাক্। এ ঝড় সইবার মত আর কোন হৃদয়সমুদ্র অপেক্ষা করে আছে।

সহদেব বলল, 'তুমি এক কাজ কর। আবার বি. কমটা দাও।'

শেখর অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, 'দূর। বার বার দিলেও আমি পাশ করতে পারব না। আমার নার্ভের আর কিছু নেই। তুমি বরং এম. এটা দাও। এমনিতে তো চান্স পেলে না, প্রাইভেট পড়। তা না হলে লাইব্রেরীয়ানশিপ কি জার্ণালিজম। তোমার তো অনেক পথ খোলা আছে।'

সহদেব হেসে বলল, 'কিন্তু পথিকের যে আর পা চলে না। সে যে একেবারে মধ্যপথে বসে পড়েছে। কম্পার্টমেন্টালে ভরে গেছি। ন্যাড়া ফের আর বেলতলায় যায় না। দেখ ওই ধরনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমার আর ইচ্ছে হয় না পড়তে। আমি আমার নিজের পছন্দমত পড়তে চাই। সেই পড়াই আসলে পড়া। পড়ার প্রেমে পড়া।'

শেখর বলল, 'কিন্তু চাকরি-বাকরি না মিললে এ প্রেম কতদিন থাকবে ?'

এ ব্যাপারে দু-জনের অভিজ্ঞতাই সমান। আপিসে আপিসে বন্ধ দ্বার। কোথাও কাজ খালি নেই। তাদের জন্যে নেই অন্তত। যত সুপারিশ চিঠিই তারা সঙ্গে গেঁথে দিক্, আবেদনপত্র যতই পাকা ইংরেজিতে তারা অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে লিখিয়ে নিক না কেন, ফলের কোন তারতম্য ঘটেনি। কোন কোন আপিস দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কেউ বা তাও করেননি।

এর পর ব্যক্তিগত আলোচনা নৈর্ব্যক্তিকতায় রূপ নিল। সরকারী ব্যবস্থা, স্বরাষ্ট্র নীতি, পররাষ্ট্র নীতি, মিশ্রিত অর্থনীতি, সমাজের রাষ্ট্রের নানা ধরনের দুর্নীতি নিয়ে দু-জনে দারুণ সমালোচনা করল। সাহিত্যকেও বাদ দিল না, সাহিত্যিকদের বরবাদ করল। যাঁরা এক সময় প্রিয় ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই আদর্শচ্যুত, নিষ্ঠাহীন, শ্রদ্ধার অযোগ্য ; এমনকি অপাঠ্য।

সহদেব বলল, 'ওঁদের একি দুর্গতি হল শেখর। ওঁরা তো বেকার হননি।'

শেখর বলল, 'বেকার হবেন কেন। ওঁরা অতিমাত্রায় সাকার, অতিমাত্রায় সক্রিয়। তার ফলে যা হবার হয়েছে। শুধু সংখ্যা আর পরিমাণ বাড়ছে, আর কিছু বাড়ছে না। আগুমৃত্যু আর শিশুমৃত্যু

এখানকার সাহিত্যের বিধিলিপি। তুমি বলতে পার কজনের লেখা এই বিশ শতকের ওপারে গিয়ে পৌঁছবে ? বেশী নয়, মাত্র তেতাল্লিশ বছর ? তার কারণ ওঁরা কেবল সাম্বৎসরিক পূজা সংখ্যার কথা ভাবেন। যাঁর যাঁর দৌড় বুঝতে পেরেছেন। নগদ বিদায়ের চেয়ে আর যে কিছু প্রাপ্য নেই তা জানেন। তাই কোন দিক থেকেই কিছু বাকি রাখতে চান না। উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল, হে মোর পাঠক, পাঠিকা গো, সম্পাদকের দল।'

তীব্র বিদ্রূপে হেসে উঠল সহদেব।

শেখর বলল, 'রাখো রাখো অত হেসো না। তুমি কোন্ শতাব্দীর ?'

সহদেব বলল, 'আমি ? আমার এখনো জন্মই হয়নি।'

শেখর বলল, 'তা হলে আগে জন্ম নাও। অন্নারম্ভ হোক, আধো আধো বুলি ছেড়ে কথা বলতে শেখো, তারপর টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বল শৃণ্বন্তু বিশ্বে। ওঁরা সবাই আর কিছু না হোক জন্মযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মৃত্যুযন্ত্রণাও· যে মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভোগ করেন তা জানি।'

সহদেব বলল, 'কিন্তু সে মৃত্যু তো ইচ্ছামৃত্যু। আমার পিতামহের মত। সে তো আত্মহত্যা !'

শেখর বলল, 'হয়তো শুধু তাই নয়। হয়তো তাঁদেব নিহত হবার মূলে জীবন্মৃত হবার মূলে আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন আমাদের বেকারত্বের মূল শিকড় অনেক গভীরে, হয়তো তেমনি— ।'

সহদেব বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি আজ হঠাৎ এমন বিপক্ষে গেলে যে, না কি পূর্বপক্ষ ? আমাকে তর্ক করার সুযোগ দিচ্ছ ?'

শেখর বলল, 'না, ঠিক তাও নয়। আজ আর একজন লেখকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার মত আমিও তাঁকে কষে গাল দিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে অনেকগুলি কথা বললেন। তাঁর শুরুটা ক্রোধের কিন্তু শেষটা আক্ষেপের। তাঁর কিছু কথা তোমাকে শোনাই, কোন লেখকই স্কুলের ছেলের মত বছর বছর ক্লাস প্রমোশন পান না। তাঁর গতি সরীসৃপের মত। তার উঠতি পড়তি আছে, ঝড়তি পড়তিও অনেক সইতে হয়। অনির্বাণ শিখা নিয়ে কজন আসে। বেশীর ভাগই জোনাকি। এই নেবে, এই জ্বলে। সে আগুন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া বড় সহজ সহদেব, কিন্তু ফুঁ দিয়ে জ্বালানো বড় কঠিন।'

আজ কী হয়েছে শেখরের কে জানে। তর্কটা জমল না। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ সহদেব বলল, 'জানো শেখর, আমি কাল থেকে দোকানে বেরোব ঠিক করেছি।'

শেখর অবাক হয়ে বলল, 'সে কি ? তার মানে ?'

সহদেব অদ্ভুত একটু হাসল, 'তার মানে একেবারে পৈতৃক ব্যবসা। সোনার কলম তোমাদের হাতে থাক, আমি সোনা দিয়ে কলম বানাব। কলম না হোক, আংটি, কানপাশা, কঙ্কন, কেয়ুর, কাঞ্চি— ।'

শেখর বলল, 'আরে না না। দেখ আরো কিছুদিন। দোকানে ঢুকলে আর চাকরির চেষ্টা চরিত্র করবে কখন ? ফারদার পড়াশুনোও আর হবে না।'

সহদেব বলল, 'নাই বা হল তাতে ক্ষতি কি। তোমরা জুয়েল হও, আমি জুয়েলার হয়েই খুশি থাকব। কাব্যালংকার না, একেবারে খাঁটি স্বর্ণালংকার আমার ভাবী বন্ধু-পত্নীকে উপহার দিতে পারব।'

শেখর হেসে বলল, 'হ্যাঁ, পত্নীর পিতার তো আর খেয়ে দেয়ে ঘুম নেই। তিনি মেয়ে কাঁধে করে পিছনে পিছনে ঘুরছেন। বরং তুমি কবি মানুষ, তোমার অনেক গুণগ্রাহিণী—'

সহদেব বলল, 'সাধে কি ফেল করেছ ? তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। তুমি জানো না কল্পনা ছাড়া কবির আর কেউ নেই। সে ছাড়া আর সবাই অনাত্মীয়া।'

শেখর বাসে উঠতে উঠতে হেসে বলল, 'অন্তত একজনকে জানি যে মোটেই কল্পনা নয়—'

সহদেব বুঝতে পারল বীথিকার কথা বলছে শেখর। কিন্তু বীথিকা শুধুই বান্ধবী, তার চেয়ে বেশী কিছু কোনদিন হবেও না। মণীন্দ্র কলেজে এক সঙ্গে পড়ত. সেই সূত্রে আলাপ। এখন এম-এ পড়ছে। এক বছর ওরও নষ্ট হয়েছে। খালের ওপারে আর, জি. কর রোডে থাকে। বাপ গরীব

ব্রাহ্মণ। টিউশন করে পড়ার খরচ চালায়। শুধু নিজের নয়, ভাই বোনদেরও। দেখতে ভালো নয়। তবু বাপ-মার অনুরোধে কয়েকবার দেখা দিতে হয়েছিল, তারা সবাই অপছন্দ করে গেছে। বীথিকার সঙ্গে এইটুকু যা মিল আছে সহদেবের। অকিঞ্চনতার মিল দুর্ভাগ্যের মিল। আর কোন আশা সহদেব করে না। ওর বাবা গোঁড়া বামুন। আর বীথি বড় পিতৃভক্ত মেয়ে।

বেলা প্রায় দুপুর পর্যন্ত মণীন্দ্র রোড দিয়ে পায়চারি করল সহদেব। না, আর তার সংকল্প টলবে না, সে নিশ্চয়ই কাল থেকে বাবার রানী রোডের দোকানে গিয়ে ঢুকবে। আর যদি ঢোকে কারিগর হয়েই ঢুকবে। সেও তো এক শিল্পীর কাজ। সেখানে বসে শিল্পীর সম্মান সে আদায় করবে। কারিগরদের পতিত করে রেখেছে বর্ণহিন্দুর সমাজ। তার ফলে সে নিজেই মার খেয়েছে। তার শিল্প গেছে, সৃষ্টি গেছে, সব গেছে। শুধু সাহিত্য, চিত্র আর সংগীতকে শ্রদ্ধার আসন দিয়ে কোন সমাজ বাঁচতে পারে না। সহদেবের মনে হল এই শ্রদ্ধাই বা ক-দিনের? এই শ্রদ্ধাই বা কতটুকু খাঁটি? বিশুদ্ধ শিল্পের আদর ক-জনের কাছে আছে? দুধে জল না মেশালে আজও ক-জন শিল্পী উপবাসের হাত থেকে রক্ষা পান? শুধু নিজের শিল্পকে আঁকড়ে ধরে ক-জন শিল্পী সপরিবারে বাঁচতে পারেন? তাই একবার মরার ভয়ে, তিনি কাপুরুষের মত প্রতিদিন মরেন, আর সেই জীবন্মৃত অবস্থায় মৃত আর মুমূর্ষু সন্তানের জন্ম দেন।

সহদেব এপথ নেবে না। চাকরির দাসত্ব স্বীকার করে শিল্পরাজ্যে আধিপত্য চাইবে না। সে সারাদিন ছোট হাতুড়ি দিয়ে, ছেনি দিয়ে কাজ করবে, সোনা দিয়ে গয়না গড়াবে, সারারাত অক্ষরে অক্ষরে গড়বে কবিতা। সে অক্ষর সোনার অক্ষর নয় রক্তের অক্ষর। কিন্তু পাঠকের মনে তা রস হয়ে গিয়ে পৌঁছবে। পাঠকের জন্যে রক্ত নয়, তার জন্যে রস। ঠিক জীবন নয়, জীবনের নির্যাস।

বীণা এসে সহদেবের পাঞ্জাবির আস্তিন টেনে ধরল। 'দাদা কী ছাই পাগলের মত বকছ। চল, বাড়িতে। মা না খেয়ে রয়েছে।'

এতক্ষণে সহদেব টের পেল খিদে পেয়েছে। মৃদুস্বরে বলল, 'চল যাচ্ছি।'

বীণা মুচকি হেসে বলল, 'আর একবার সাধিলেই খাইব। তুমি সেটুকুও সাধাসাধি করতে দিলে না। এই রাগের এত বড়াই।'

সহদেব বোনকে ধমকে দিয়ে বলল, 'থাম, বড় পাকা পাকা কথা শিখেছিস।'

নেয়ে খেয়ে সহদেব বেশী দেরি করল না, শুয়ে শুয়ে টমাস মানের গল্প পড়ল না অন্যদিনের মত। জামা গায়ে স্যাণ্ডেল পায়ে ফের বেরিয়ে পড়ল।

যোগমায়া বলল, 'বাবারে বাবা! তোর পায়ের তলায় কি খুরো। আবার কোথায় বেরোচ্ছিস এই ভর দুপুরে?'

সহদেব বলল, 'কলেজ স্ট্রীটে।'

যোগমায়া একটু হেসে বলল, 'চাকরির খোঁজে যাচ্ছিস বুঝি?'

সহদেব বলল, 'হুঁ।'

সত্য কথাটা মাকে বলল না সহদেব। কলেজ স্ট্রীট যে চাকরির পাড়া নয় বইয়ের পাড়া সে কথা মাকে বলে লাভ কি।

হ্যাঁ, বইয়ের পাড়ায় শেষবারের মত যাচ্ছে সহদেব। বলা যায় না দোকানের কাজে ঢুকলে ওপাড়ায় হয়তো যাওয়ার আর তার প্রবৃত্তি থাকবে না। সেও হয়তো তার বাবার মতই হবে। কিন্তু তার বাবারই বা শুধু দোষ কি। তার বাবা না হয় সামান্য সেকরা। কত উকিল ডাক্তার মাস্টার প্রফেসর আর আপিসের শত শত কেরানীবাবুর খবর কি রাখে না সহদেব? বইয়ের সঙ্গে তাঁদের কজনের সম্পর্ক থাকে? কাঁচের আলমারির চাবি কজনে খোলেন? এমন কি যাঁরা লেখক, তাঁরাও অনেকে পাঠক সত্তার কথা ভুলে যান। অথচ পড়াশুনা আর দেখাশোনা এই দুই পথেই লেখকের স্বচ্ছন্দ বিহার চাই।

সারাটা দুপুর আর বিকাল সহদেব কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। বই কেনার পয়সা নেই। শো কেসে শুধু বইয়ের মলাট দেখল, প্রিয় লেখকদের নামগুলি উচ্চারণ করল পরম প্রিয়জনের নামের মত। এক প্রাক্তন বন্ধু চা টোস্ট খাওয়ালেন। একজন প্রফেসর আদর করে পিঠ

চাপড়ে দিলেন। একজন পাবলিশার বললেন, 'উপন্যাস লিখে আনুন ছাপব। কবিতা কজন পড়ে ? কজনে কেনে ?'

সন্ধ্যার পর ঠেলাঠেলি করে ফের বাসে উঠল সহদেব। আপিস ফেরৎ কেরানীকুল বাদুড়ের মত ঝুলছে। চাকরির এইতো সুখ। এ সুখ সে চায় না। কলম পেষার ভুয়ো আভিজাত্য তাকে ছাড়তে হবে, ত্যাগ করতে হবে পোষা পায়রার স্বাচ্ছন্দ্য।

ঘড়ির কাঁটা ছটার ওপর। সাড়ে ছটায় বীথিকা অপেক্ষা করবে শ্যামবাজারে কফি হাউসের সামনে। এক টিউশনের শেষ আর এক টিউশনের আরম্ভ। মাঝখানে কয়েকটি মুহূর্ত। মুখোমুখি বসে এক কাপ করে কফি কি চা। দু-চারটি সুখ দুঃখের কথা। জীবন আর কাব্য। কিন্তু বাসটা বড় আস্তে চলছে। প্রত্যেক স্টপে এতক্ষণ করে থামছে কেন ? সে যদি আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে !

অবশেষে যাত্রী বোঝাই দুইয়ের-বি দয়া করে পৌঁছল শ্যামবাজারের মোড়ে। দুরু দুরু বুকে রাস্তা পার হল সহদেব। হ্যাঁ, সে ঠিক এসেছে।

কিন্তু বীথিকা বলল, 'দেখ, আজ যে দেখা হল এই যথেষ্ট। আজ আর চা খাওয়ার সময় হবে না।'

'কেন ?'

'বাবার অসুখ। হার্টের ট্রাবল আবার বেড়েছে। ডাক্তার নিয়ে এক্ষুনি যেতে হবে।'

সহদেব বলল, 'একটু দেরি করতে পার না ? এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে।' বীথিকা বলল, 'পাগল ! থ্রম্বসিসে তার চেয়েও কম সময় লাগে।'

সহদেব বলল, 'হার্টের ট্রাবল মানেই থ্রম্বসিস নয়। তুমি বড় ভীরু।'

বীথিকা ম্লান মুখে বলল, 'কী জানি আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে আসল রোগটা চেপে যাচ্ছেন ডাক্তার। আমি ভয় পাব বলে বলছেন না।'

সহদেব বলল, 'তাতে কোন লাভ হয়নি। ভয় তুমি পেয়েই রয়েছ।'

মনে মনে ভাবল হৃদ্‌রোগগ্রস্ত প্রেমিক হওয়ার চেয়ে ওর ওই হৃদ্‌রোগী বাপ হওয়া সহদেবের পক্ষে মন্দ ছিল না।

বীথিকা বলল, 'এই মোড়েই ডাক্তারের ডিসপেনসারি। তাই সময় পেলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। এবার যাই।'

সহদেব বলল, 'শোন, তোমার সঙ্গে আমারও একটা জরুরী কথা আছে।'

'বল।'

সহদেব বলল, 'কাল থেকে আমি দোকানে বেরোচ্ছি।'

বীথিকা সহদেবের চোখে চোখ রেখে একটু হাসল, তারপর আগের শব্দটিরই পুনিরাবৃত্তি করে বলল, 'পাগল।' কিন্তু সেই একটি মাত্র শব্দে সহদেবের চোখের সামনে যেন অনন্ত সুধাসিন্ধু উথলে উঠল।

বীথিকা মোড় পার হয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে। সহদেব অপলকে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ট্যাক্সি ড্রাইভারের ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠল ফুটপাতে।

বাড়িতে পৌঁছে ফের সেই কবিতা নিয়ে বসল সহদেব। সকালের সেই আরম্ভ করে রাখা কবিতা। কে জানে এই হয়তো তার শেষবারের কবিতা। স্বর্ণকার হওয়ার পর সে কি আর সত্যিই বর্ণ-কার থাকতে পারবে ? শিল্প-সূত্রের দুই প্রান্ত সত্যি কি আর মিলবে তার হাতে ? মেলানো কি যায় ? শিল্পের দেবী বড় নিষ্ঠুর। ঈর্ষাতুরা প্রণয়িনীর মত সে অন্যের ভজনা সয় না। কবিতা লিখতে লাগল সহদেব। কাটাকুটি ছেঁড়াছিঁড়ি। এই খাটনিতে আস্তো এক উপন্যাস হয়ে যায়। কিন্তু একটি কবিতা তার কাছে একটি উপন্যাসের চেয়েও বেশী। একটি মহাকাব্য।

অঙ্কুরের সঙ্গে মরুভূমির সংগ্রামের কথা লিখে যেতে লাগল সহদেব। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি সে সংগ্রামের শেষ নেই। সে সংগ্রাম আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম। আত্মপ্রকাশই যথেষ্ট। প্রকাশের বেদনার চেয়ে বড় বেদনা নেই, প্রকাশের আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ অসম্ভব।

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ায় চমকে উঠল সহদেব। 'খাবিনে ? অনেক রাত হয়ে গেল যে !'

মা নয় বাবা। আশ্চর্য—কিন্তু মায়ের মতই দরদ তাঁর গলায়। সহদেব বলল, 'একটু পরে খাব বাবা। আর শোন, আমি কাল থেকেই দোকানে বেরোব। আমি ঠিক করে ফেলেছি, এর আর নড়চড় হবে না।'

সারাদিনের খাটুনির পর শ্রান্ত শশধর এবার একটু হাসল, 'হুঁ, তোমার মত আনাড়ীকে দোকানে নিয়ে দোকান আমি লাটে তুলে দেব, না? তুই লিখছিস লেখ। আর মাঝে মাঝে কাজকর্মের খোঁজ কর। এক দিন না এক দিন হবেই। এত ব্যস্ত হবার কি আছে? আমি তো আছি। আজ আমি সুধন্য পালকে কি বলছিলাম জানিস?'

'কি বলছিলে বাবা?'

শশধর হেসে বলল, 'বলছিলাম সুধন্য, আমার ছেলের দুই রকমের কলম। এক কলম দিয়ে পরীক্ষা দেয়, পাশ করে, ফেল করে। চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠায়—কোনবার জবাব পায়, কোনবার পায় না। কিন্তু আর এক কলম আছে, সে তার একেবারে নিজের। সুধন্য বলল, কি রকম। আমি বললাম, সে কলম দিয়ে সে মনের আনন্দে লেখে। সে কলম দিয়ে সে তোমার আমার মতই গয়না গড়ায় সুধন্য। মা লক্ষ্মীদের গয়না নয়, মা সরস্বতীদের গয়না।'

সহদেব কাগজপত্র সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা!'

শশধর বলল, 'বাবা!' দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দুই জোড়া চোখ নিঃশব্দে ছলছল করতে লাগল।

আশ্বিন ১৩৬৪

উত্তরণ

পাবলিশার বললেন, 'দপ্তরী মাত্র একশ কপি বই দিয়ে গেছে। আজ পাঁচ কপি নিয়ে যান। দরকার হয় পরে আরো দেব।'

কল্যাণী বলল, 'মোটে পাঁচ কপি? আমার যে অনেককে দিতে হবে। এই আমার প্রথম বই। আত্মীয়স্বজনরা আছেন, অফিসের বন্ধুরা রয়েছে—।'

প্রৌঢ় পাবলিশার তরুণী তন্বী লেখিকার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'থাকবেই তো, বন্ধুবান্ধব তো থাকবেই। ধীরে ধীরে এক একজনকে দেবেন। এক দিনেই তো সব দেওয়া শেষ হয়ে যাবে না। গল্পের বই আস্তে আস্তে কাটবে। বন্ধুবান্ধবকে দেওয়ার সময় পরে ঢের পাবেন।'

বঙ্কুবাবুর কর্মচারী পঞ্চানন বইয়ের একটি প্যাকেট কল্যাণীর দিকে এগিয়ে দিল।

ছোট দোকানের সামনে লোকজনের ভিড় বেড়ে চলেছে। কল্যাণী আর দেরি করল না। বঙ্কুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বইয়ের প্যাকেটটি নিয়ে কলেজ স্ট্রীটের সরু গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। দু চারজন লেখক পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কেউ বা ঢুকলেন গলির মধ্যে। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তাকালেনও। কিন্তু কল্যাণী বেশ বুঝতে পারল, তাঁরা একটি মেয়ের দিকে তাকালেন , কোন লেখিকার দিকে নয়। সে অনেককে চেনে, তাকে এঁরা কেউ চেনেন না। কিন্তু সে কি চিরকালই এমন অচেনা থাকবে?

ভারি ভালো লাগছে ভাবতে। তার বইও বেরোল। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কি আছে। পাবলিশার কার্পণ্য করলেও কল্যাণীর বইয়ের গেটআপটি পরিচ্ছন্ন হয়েছে। জমকালো রঙে মোটা তুলিতে আঁকা নারীমূর্তি যে মলাট জুড়ে দাঁড়িয়ে নেই এতেই সে খুশী। ছিঃ, সে বড় ছেলেমানুষি হত। কী-ই যে রুচি হয়েছে এখনকার। বড়দের বই ছেলেদের মলাট দিয়ে মোড়া। এখনকার ক্রেতাদের এই নাকি পছন্দ। কিন্তু কল্যাণী তাঁদের চোখের কথা ভাবেনি। তার লেখক বন্ধু দিব্যেন্দু রায়ের পরামর্শ মতই বইয়ের অঙ্গসজ্জা করেছে। এই নিয়ে দিব্যেন্দুবাবু তাঁর পাবলিশারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, আর্টিস্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছেন, তবে এমন বই বেরোতে পেরেছে। শুধু কি মলাট? বইয়ের নামটিও দিব্যেন্দুবাবুরই দেওয়া। 'আমরা এলাম।'

চমৎকার নাম। কারো নামের সঙ্গে এ নামের মিল হবে না। যেমন আজকাল হচ্ছে, এক নামে পাঁচজনের বই বেরোচ্ছে। কিন্তু কল্যাণীর বই অনন্য। তার বই স্বনামধন্য। এ নাম যদিও পরের দেওয়া তবু কল্যাণীর মনঃপূত হয়ে তা তার একান্ত আপন হয়ে উঠেছে। আচ্ছা অভিধানে এত শব্দ থাকতে ওই দুটি কথাকে কেন জুড়ে দিলেন দিব্যেন্দুবাবু ? কোথায় খুঁজে পেলেন ওই দুটি শব্দ ? এই নিয়ে অফিসের বান্ধবীরা হাসাহাসি করেছে। 'তোমরা কারা ?'

কল্যাণী বলেছে, 'কারা আবার। যারা আমার গল্পের নায়ক নায়িকা তারা।'

বান্ধবীরা হেসে বলেছে, 'উঁহু, শব্দের ঝোঁকটা বহুবচনের নয়, দ্বিবচনের।'

দিব্যেন্দুবাবু এখনো বিয়ে করেননি। বইয়ের সংখ্যা খান দশেক হলেও বয়স তিরিশের নিচে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবে বইকি সখিরা। কিন্তু কল্যাণী জানে ব্যাপারটা শুধু ঠাট্টাই। দিব্যেন্দু তার বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছাড়া আর কিছু না। কল্যাণী আর কিছু হতে দিতে পারে না। বাপ মা ভাই বোনের ভরণ পোষণের ভার তার ওপর। সে সকলের আশ্রয়। সবাইকে অনাথ করে তার সরে দাঁড়াবার জো নেই, সরে দাঁড়াবার প্রবৃত্তিও নেই।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল কল্যাণীর। মনে পড়ল বাবার কথা। আজকের দিনে সবচেয়ে আগে তাঁকেই স্মরণ করা উচিত ছিল। বাবার জন্যেই তো সব। বাবাই তো তাকে লিখিয়েছেন। সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন। অথচ তাঁর কথা মনে না ক'রে সে এতক্ষণ একজন অনাত্মীয় পুরুষের কথা ভাবছিল। সে কথা ভেবে কল্যাণীর লজ্জা হ'ল এবার। ছি ছি ছি, প্রথম কপিটি দিব্যেন্দুবাবুকে দিয়ে আসবার কথা সে ভাবল কী করে। বাবাকে উৎসর্গ করা বই। প্রথম কপি তাঁরই প্রাপ্য। কতদিন ধ'রে তিনি রোজ জিজ্ঞাসা করছেন, 'কিরে কলি, তোর বই বেরোল ?' তার বই সম্বন্ধে এত ঔৎসুক্য আর কার আছে ? না দিব্যেন্দুবাবুরও নেই। তা হলে কি এমন দিনে তিনি এদিকে একবার আসতে পারতেন না ? কত কল্পনা, কত পরিকল্পনাই তো এতদিন ধ'রে হয়েছিল, 'কল্যাণী দেবী, আপনার বই যেদিন বেরোবে কী ক'রে সেলিব্রেট করবেন বলুন তো ?'

কল্যাণী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'তার আমি কি জানি। যে না বই তার আবার সেলিব্রেশন।'

দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, 'তাই কি হয় ? নবজাতকের সম্বর্ধনা চাই বই কি। কী করবেন। কফি খাওয়া যাবে এক সঙ্গে।'

কল্যাণী বলেছিল, 'সে তো আপনি মাঝে মাঝে খেয়েই থাকেন।'

দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, 'তাইতো, তাহলে তো আরো নতুন কিছু করা দরকার। ছোটখাটো একটা সভাই ডাকা যাবে তাহলে। আরো পাঁচজন লেখক লেখিকা থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে নবাগতার পরিচয় হবে।'

কল্যাণী বলেছিল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

কিন্তু তার কথাটা যে দিব্যেন্দুবাবু এমন সত্য ক'রে তুলবেন কল্যাণী তা আশঙ্কা করেনি। এর আগে অবশ্য তিনি কয়েকদিন এসেছেন। এক সঙ্গে পাবলিশারের দোকানে গিয়ে বইয়ের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। নানারকম জল্পনা কল্পনা করেছেন। কিন্তু একদিনের না আসা হাজার দিনকে ব্যর্থ করে দেয় তা কি তিনি ভাবতে পারেননি ? হতে পারে অন্য কোথাও গল্প জমিয়েছেন দিব্যেন্দুবাবু। তাঁর বন্ধুর অভাব নেই, বান্ধবীর অভাব নেই, কিন্তু অভাবের সংসারে কল্যাণী তার বাবার একমাত্র অবলম্বন।

দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে ছত্রিশ-এ নম্বরের তৃতীয় বাসটিতে উঠে পড়ল কল্যাণী। কষ্ট করেই উঠল। ভিড় পাতলা হবার আশায় থাকলে রাত আটটা বাজবে।

ছোট লেডীজ সীটটি জুড়ে দুই ভদ্রলোক বসেছিলেন, কল্যাণীকে দেখে অপ্রসন্নভাবে উঠে দাঁড়ালেন। কল্যাণী জানলার ধারে ঘেঁষে বসে তাঁদের একজনকে জায়গা করে দিল। সবদিন এই সৌজন্যবোধ, কি মনের প্রসন্নতা থাকে না কল্যাণীর। কিন্তু আজ তার জীবনের এক বিশেষ দিন। আজ তার প্রথম বই বেরিয়েছে। আজ সে গ্রন্থকর্ত্রী। লেখিকার চেয়ে অনেক ধ্বনি-গম্ভীর কথাটি। কিন্তু আজকাল এ ধরনের শব্দ কেউ ব্যবহার করে না। মুখে না, লেখাতেও নয়। বাবা ঠিকই বলেন,

'এখনকার তোমরা সব হালকা আর পলকার ভক্ত। যেমন তোমাদের ভাব তেমনি তোমাদের ভাষা। যেমন তোমাদের মন তেমনি তোমাদের মুখ। কোনটাই পুরু না, সব পাতলা। গাম্ভীর্য নেই, গভীরতা নেই, যতসব কাগজের নৌকা।'

বাবার অভিযোগগুলি কান পেতে শোনে, মন দিয়ে শোনে কল্যাণী। শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু কলম ধরে এ যুগের ভঙ্গিতে, কাগজ ভরে এ কালের ভাষায়। বাবা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। মাও তাঁর দেখাদেখি রাগ করেন।

'এ কি ছাইভস্ম লিখছিস?'

কল্যাণী মুখ টিপে হাসে। ওঁদের ক্ষুণ্ণ না করে তার উপায় নেই। সে মাতৃভাষায় কথা বলে কিন্তু লেখে নিজের ভাষায়।

তবু বাবার কাছেই তার হাতেখড়ি। হাতেখড়ি বলা যায় কি? না, বাবার সঙ্গে তার এক অদ্ভুত সম্পর্ক; বাবা তাকে লিখতে শেখাননি, নিজে লিখে কল্যাণীর নাম ধার নিয়েছেন। সে কথা ভেবে এত অবাক লাগে আজ, এত লজ্জা হয় যে তা কাউকে বলা যায় না।

বাবার লেখার ঝোঁক অনেকদিন ধরেই ছিল। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সবই লিখতেন। লিখে লিখে মাকে শোনাতেন, তাকে শোনাতেন। শুনতে শুনতে মা হাই ছেড়ে বলতেন, 'বেশ হয়েছে।'

কল্যাণীও উৎসাহ দিয়ে বলত, 'বেশ হয়েছে বাবা।'

কিন্তু তাদের রুচির সঙ্গে কোন মাসিক সাপ্তাহিকের সম্পাদকের রুচির মিল হত না। তাঁরা পত্রপাঠ বাবার সব লেখা ফেরত পাঠাতেন। এমন কি, না পাঠ করেই অপাঠ্য বলে অবহেলা করতেন। বাবার মুখের দিকে আর তাকানো যেত না। এক একটা লেখা ফেরত আসত আর তিনি শয্যাশায়ী হতেন। সম্পাদক যেন বাবার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছেন। বাবার মুখের দিকে তাকানো যেত না। তবু মা মুখ করতে ছাড়তেন না। বলতেন, 'মিছিমিছি কতগুলি পয়সা নষ্ট। কাগজ নষ্ট, কালি নষ্ট, তারপর আবার ডাকটিকিটের খরচা। ওই পয়সাগুলি বাজারের মধ্যে দিলে দুটো আনাজ তরকারি বেশী আসে। ছেলেমেয়েগুলি খেয়ে বাঁচে।'

ধমক খেয়ে বাবা কিছুকাল লেখা টেখা সব ছেড়ে দেন। শুধু অফিসে বেরোন, আর বাসায় এসে চুপচাপ বসে থাকেন। কলেজের অফিসে কনিষ্ঠ কেরানী। প্রফেসররা তো ভালো, সর্দার বেয়ারাদের চেয়েও সেখানে কম সম্মান কল্যাণীর বাবার। বাড়িতেও নামে মাত্র কর্তা। করবার যা মা নিজেই করেন, কি বাবাকে দিয়ে করান। বাবা এসে চুপ করে রোয়াকে বসে থাকেন। তাস পাশার নেশা নেই, মানুষজনের সঙ্গে মেলা-মেশার শক্তি নেই। শুধু চেয়ে থাকা, শুধু চেয়ে দেখা। গলি দিয়ে লোকজন আসে যায়। কেউ যদি বাবাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করে জবাব দেন। না করে তো দেন না। যেচে কারো সঙ্গে কথা বলতে যান না কল্যাণীর বাবা। হয়তো ভয় পান পাছে কেউ জবাব না দিয়েই চলে যায়।

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবা যে অমন নিঃসঙ্গভাবে একা একা বসে থাকেন তাতেও মার রাগ। তাও মার সহ্য হয় না। তিনি বলেন, 'আচ্ছা, দুনিয়াদারিতে তোমার কি কেউ নেই? দিনরাত পথের মধ্যে বসে থাকবে কেন, কি হয়েছে তোমার? ঘর কি তোমার কাছে বিষ? ঘরে যদি তোমার মনই না টেঁকে এ ঘরে আগুন জ্বেলে দাও, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে একদিনে সব শেষ হয়ে যাক। ধিকি ধিকি করে পুড়তে পুড়তে আমি যে খাক হয়ে গেলাম।'

মার চোখে জল দেখতে পায় কল্যাণী। রান্নাঘরে গিয়ে তিনি রাঁধেন না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। এবার কল্যাণী মনে মনে মার পক্ষ নেয়। উঠে গিয়ে পিঠের কাছে গা ঘেঁষে বসে। তখনো সে ফ্রক পরে। বয়স আর কত। এগারো বারোর বেশী নয়। কিন্তু সেই বয়সেই সে বুঝতে পেরেছিল বাবার তূণে এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র আছে যার সঙ্গে মা কিছুতেই পেরে ওঠেন না। এমনিতে বাবা মার মধ্যে বনিবনাও নেই, সংসারের খুঁটিনাটি অভাব অনটন নিয়ে ঝগড়া লেগেই আছে। কিন্তু কল্যাণী লক্ষ্য করে, দুদিন যদি বাবা মার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলেন মার যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। বাবা অনায়াসে মার অনাদর অবহেলা সহ্য করতে পারেন কিন্তু মা বাবার এক ফোঁটা অমনোযোগ সহ্য করতে পারেন না। কল্যাণীর মার জন্যেও কষ্ট হয়, বাবার জন্যেও কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্টের মাত্রাটা

বাবার জন্যেই যেন বেশী।
কল্যাণী বলে, 'বাবা, তুমি আর লিখছ না কেন?'
তার বাবা বলেন, 'কী হবে লিখে? কেউ তো আর ছাপবে না।'
কল্যাণী বলে, 'নিশ্চয়ই ছাপবে। তুমি আবার পাঠিয়ে দেখ। দেখবে এবার নিশ্চয়ই ছাপা হবে।'
বাবা ভরসা পেয়ে বলেন, 'তুই বলছিস হবে?'
কল্যাণী বলে, 'কেন হবে না বাবা। তুমি ছেড়ে দিয়ো না, লেখা ছাড়া তো তোমার আর কিছু নেই।'
গোপনে গোপনে বাবা আর মেয়েতে কথা হয়। যেন দুজনে এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশীদার। কল্যাণীর বাবা ফের লিখতে শুরু করেন, কাগজে কাগজে আবার লেখা পাঠান, কিন্তু সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কোন কোন লেখা ফেরত আসে, বেশীর ভাগ লেখাই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফিরতি ডাকটিকিট পাঠাবার মত অত পয়সা কই কল্যাণীর বাবার। সব লেখা যে তিনি ডাকে পাঠান তা নয়, নিজে গোপনে গোপনে পকেটে করে নিয়ে যান কাগজের অফিসে। সে লেখা গোপনই থেকে যায়, প্রকাশিত আর হয় না।
তারপর হঠাৎ একদিন কল্যাণীর বাবা তার বাংলা রচনার খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'কলি, দেখি দেখি, তোর হাতের লেখাটা তো মন্দ হয়নি।'
কল্যাণীর মা সগর্বে বলেন, 'তোমার চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে।'
কল্যাণী লজ্জিত হয়। তখন সে পাড়ার হাই স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে। সেক্রেটারীকে ধরাধরি করে হাফ ফ্রীশিপ পেয়েছে। ছাত্রী হিসেবে মন্দ নয়। বাৎসরিক পরীক্ষায় তিন চারজনের মধ্যেই থাকে।
মার কথার প্রতিবাদ করে কল্যাণী বলল, 'কী যে বল তুমি। বাবার লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনা। ওঁর লেখা কত পাকা।'
বাবা বলেন, 'তা হোক। কাঁচা হলেও তোর লেখার ছাঁদ বেশ ভালো।'
দুদিন বাদে বাবা তাঁর সদ্য লেখা একটা কবিতা নিয়ে আসেন, 'এটা একটু কপি করে দে তো মা।'
কল্যাণী বাবার কথা মত আর একখানা কাগজে সুন্দর করে কবিতাটি লিখে দেয়। তারপর নিচে যেই লেখকের নামটি লিখবে বাবা বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'উঁহু, আমার নাম নয়। ওখানে লেখ শ্রীমতী কল্যাণী বসু রায়।'
কল্যাণী অবাক হয়ে বলে, 'সে কি বাবা। আমার নাম কেন লিখব।'
বাবা বলেন, 'আমি যখন বলছি, তুই লেখ না। কোন দোষ হবে না, তুই লেখ।'
কল্যাণী আর প্রতিবাদ না করে বাবার কবিতা 'হৃদয় ব্যথা'য় নিজের নাম সই করে দেয়।
মাস তিনেক বাদে 'অঞ্জলি' পত্রিকায় ছাপা হয় সে কবিতা। কাগজটি ডাকে আসে কল্যাণীরই নামে। মোড়ক খুলে কম্পিত হাতে বাপ আর মেয়ে দুজনেই কাগজের পাতা উল্টায়। একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের নিচে তাদের হৃদয় ব্যথা স্থান পেয়েছে। বড় বড় হরফে কয়েকটি মুক্তার অক্ষর। সেগুলি এক সঙ্গে গাঁথলে একটি মেয়ের নাম উচ্চারিত হয়। কী অপূর্ব তার ধ্বনি, কী অনির্বচনীয় তার ব্যঞ্জনা। কোথায় ব্যথা—বাপ আর মেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। যেন উৎসব লেগেছে বাড়িতে।
মা এক সময় বলেন, 'কিন্তু ওই সব কথা তুমি মেয়েটার নামে ছাপলে?'
বাবা বলেন, 'তাতে কী হয়েছে?'
মা বলেন, 'না, হয় নি কিছু। তবে ওই সব হৃদয় টিদয় আছে তো? ওগুলি কি ভালো?'
বাবা হেসে বলেন, 'হৃদয় টিদয় থাকাই বুঝি খুব খারাপ? আচ্ছা, এরপর থেকে ও আপদ বাদ দিয়েই লিখব।'
কবিতার পরে গল্প। অঞ্জলির পরে সচিত্র শঙ্খ, মহিলাদের মুখপত্র বঙ্গনা কাগজেও কল্যাণীর নামে তার বাবার লেখা ছাপা হতে থাকে। কী আশ্চর্য, একটা কাগজ থেকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা পর্যন্ত আসে। তিন টাকা মার হাতে দিয়ে দু' টাকার মিষ্টি কিনে আনেন বাবা। বিশু, শুভা, সন্তুদের মধ্যে

মহোৎসব পড়ে যায়।

মা খুশী হয়ে বলেন, 'ওগো, কলির জন্যে কিছু একটা কিনে দিলেই পারতে।'

কল্যাণী বলে, 'বাবা, তুমি একটা নতুন কলম কিনে নাও না। লিখতে লিখতে তোমার কলমের একদিকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। আর একটা কলম কেন।'

বাবা বলেন, 'কিনব কিনব। আস্তে আস্তে কত কি হবে দেখবি।'

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি সব হয় না। কল্যাণী বসু রায়ের নামাঙ্কিত লেখাও বড় আর মাঝারি কাগজে অমনোনীত হয়। সেগুলিও সমানে ফেরত আসে। বাবা দমে যান। কিন্তু লেখা ছাড়েন না। গল্প টল্প ছ মাসে ন মাসে যা দু' একটা ছাপা হয় যত্ন করে নিজের বাক্সে রেখে দেন। ভাবেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল কল্যাণী। কিন্তু কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে বাবাকে অফিস থেকে বিদায় নিতে হল। স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না। বাস থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে গেলেন। ফিরে আসবার পর বাঁ দিকটা ধরে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে রোয়াক পর্যন্তও আর যেতে পারেন না বাবা। ঘরেই বসে থাকেন। ডান হাতটা এখনো চালু আছে। তাতে কলম এখনো চলে। কিন্তু সংসার চলে না।

কল্যাণী ভেবেছিল না খেয়ে সব সুদ্ধ তারা মরে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণের জোর। মরল না। মরতে মরতেও বেঁচে গেল। গয়নাগাটি বিক্রি করে কিছু টাকা আগাম দিয়ে বাকিটা কিস্তিবন্দী করে সেলাইর কল কিনে মা হলেন দর্জি। আর অনেক ধরাপড়ার পর কল্যাণী ঢুকল মার্চেন্ট অফিসে রুটিন গ্রেড ক্লার্ক হয়ে। ছুটির পর কমার্শিয়াল কলেজে গিয়ে টাইপ আর সর্টহ্যাণ্ড শিখে নিল বছরখানেকের মধ্যে। তাতে পদোন্নতি আর বেতন বৃদ্ধি দুই-ই হল। বাবা সংসারের ধার ধারেন না। শুধু লিখে যান। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই যেন হয়েছেন।

অফিসের খাটুনির পর রাত্রে ফিরে এসে বাবার ওইসব লেখা নকল করে দিতে কল্যাণীর মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। কিন্তু এর চেয়ে তাঁকে তেল মালিশ করে দেওয়া অনেক সহজ। তবু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণী না করতে পারে না। তার হয়ে মা ই বরং খোঁটা দেন, 'আচ্ছা, তুমি কিরকম ধারার মানুষ। মেয়েটা সারাদিন খেটে খুটে আসে. ফের তুমি ওকে ওইসব কাজে লাগাও। তোমার প্রাণে কি দয়া মায়া বলতে কিছু নেই?'

কল্যাণী বলে, 'থাক থাক, তোমাদের আর রাত দুপুরে এ নিয়ে ঝগড়া করতে হবে না। যা লিখতে হবে দাও আমি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু লেখার আপদও কম নয়। একদিন অফিসে গিয়ে কল্যাণী দেখল, তার দুই কলিগ রেখা আর সুনেত্রা খুব হাসাহাসি করছে।

কল্যাণী কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কি ব্যাপার, এত ফূর্তি কিসের তোদের। বড়বাবুর নেকনজরে পড়লি নাকি?'

সুনেত্রা বলল, 'না রে না। আমরা একটা গল্প পড়লুম। বাব্বা কি লেখাই একখানা লিখেছিস।'

কল্যাণী বিস্ময়ের ভাণ করে বলল 'আমি আবার লিখলাম কোথায়।'

রেখা বলল, 'আমরা সব জানি।'

তারপর দেরাজ খুলে অঞ্জলি পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যাখানা বের করে দিল।

কল্যাণী দেখল, বাবার সেই 'মরুতৃষ্ণা' গল্পটি এতদিনে ছাপা হয়েছে।

রেখা হেসে বলল, 'তোর এই গল্প পড়ে দিব্যেন্দুদা কি বলেছে জানিস? এ গল্প কল্যাণী বসু রায় না লিখে দাক্ষায়ণী দাসী লিখলেও পারতেন। যেমন ভাষা, তেমনি ভঙ্গি, তেমনি ভাব। তুই একেবারে প্রাক্-বঙ্কিম যুগে চলে গেছিস ভাই। দিব্যেন্দুদা বললেন, মাইকেল বিদ্যাসাগরের সমবয়সী।'

কোন এক দুর্বল মুহূর্তে কল্যাণী ওদের কাছে স্বীকার করেছিল সে লেখে। কল্যাণী বসু রায়ের নামে যে সব গল্প বেরোয় সেগুলি তারই রচনা। আজ সেই জালিয়াতির শাস্তি ভোগ করতে হল। জল জরিমানার চেয়েও বড় বন্ধুদের উপহাস। বাবার অপরাধের জন্যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল

কল্যাণীকে। নিজের নামের যে অক্ষরগুলি একদিন তার চোখে মুক্তার বিন্দুর মত মনে হয়েছিল, আজ তা বিষেব ফোঁটার মত লাগল।

নিঃশব্দে সেই বিষ হজম করে কল্যাণী ফিরে এল বাড়িতে। বাবাকে এসে বলল, 'তুমি আমার নামে ওসব গল্প আর পাবলিশ করো না।'

বাবা মুখ তুলে বলেন, 'কেন রে কলি, কি হয়েছে?'

কল্যাণী বিরস শুকনো গলায় বলল, 'আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। তুমি ওসব আমার নামে আর চালিয়ো না বাবা।'

কল্যাণীর বাবা লেখা থেকে মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু তুই ছাড়া যে আমার আর গতি নেই মা। তুই ছাড়া সংসার অচল, তোর নাম ছাড়া আমি অচল।'

কল্যাণী বলল, 'অচল যদি হও, চুপ করে বসে থাকো। ওসব চালাকি করতে যেয়ো না।'

বাপকে এমন কঠিন কথা কোনদিন আর বলেনি কল্যাণী। আঘাতের দুঃখ নিজের বুকেই শতগুণ হয়ে লাগল। রাত্রে নিজে যত্ন করে বাবাকে খাওয়াল। তাঁব পায়ে হাত বুলিয়ে দিল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবা বললেন, 'যা এবার শুতে যা।'

কিন্তু ঘরে এসে শুয়ে পড়ল না কল্যাণী। মার শাসন, ভাই-বোনদের বিরক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে রাত জেগে ডায়েরি লিখতে লাগল কল্যাণী। প্রথমে ডায়েরি, তারপর গল্প। একটু এদিক ওদিক করে বাড়িয়ে কমিয়ে কাটছাঁট করে রূপান্তর সাধন। কল্যাণী নিজের কথা লিখল, বাবার কথা লিখল, ভাইবোনকে নিয়ে লিখল, অফিসের বন্ধু আর সহকর্মীদের নিয়ে লিখল। এ লেখা মেয়ের জবানীতে পুরুষের রচনা নয়, মেয়েব চোখে দেখা, মেয়ের মর্ম দিয়ে বোঝা পুরুষপ্রধান সমাজের রূপ, দরিদ্রের অন্তর দিয়ে অনুভব করা ধনিকপ্রধান সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই একই হৃদয় আর একই ব্যথার কাহিনী। যুগে যুগে গোঙানিব ধরনটা শুধু আলাদা।

তারপর থেকে নিজেব নামেই নিজের লেখা বেরোতে লাগল কল্যাণীব। বাবার কলম ঠিক স্তব্ধ হল না। থেমে থেমে চলতে লাগল। কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে।

যে দিব্যেন্দু রায় একদিন বিদ্রূপ করেছিলেন তিনি নিজে এসে ধরা দিলেন, যেচে আলাপ করলেন কল্যাণীর সঙ্গে। তার লেখার সুখ্যাতি করলেন, সাহায্য করলেন। গল্প সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এ বই বাবাকেই উৎসর্গ করেছে কল্যাণী। দিব্যেন্দুর নামটা যে কয়েকবার মনে না পড়েছে তা নয়। কিন্তু মনের কথাকে কলমেব মুখে কিছুতেই টেনে আনেনি।

নারকেলডাঙ্গা ছাড়িয়ে কাদাপাড়া। সেই পাড়ায় কল্যাণীদের হাল আমলের বাসা। বাস থেকে নেমে বেশী দূর হাঁটতে হয় না। গলির মুখেই বাড়ি। দোর পর্যন্ত যাওয়ার আগেই শুভা আর সন্তু ছুটে এল। সন্তু বলল, 'দিদি, তোর হাতে কী ওটা। প্যাকেটে কী?'

কল্যাণী হেসে বলল, 'কিছু না। একটা ডিকসনারি।'

ছোট বোন শুভা ছোঁ দিয়ে সন্দেশের বাক্সের মত কেড়ে নিল দিদির হাতের বইয়ের প্যাকেট। প্রথমে হাত দিয়ে খুলতে চেষ্টা করল, পারল না। তারপর দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল রঙিন সুতোর বাঁধন। ব্রাউন রঙের মোড়কটা খোলসের মত পড়ে রইল পথে। বই ক'খানি নিয়ে ওরা কলস্বরে বাড়ির ভিতরে ঢুকল, 'মা, 'আমরা এলাম', 'আমবা এলাম'।'

কল্যাণী হাসিমুখে ভাইবোনের পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সন্তুর আর সবুর সয়নি। সে আগেই গিয়ে বাবাকে বইগুলি দেখিয়েছে। উৎসাহে তিনি সত্যিই বিছানার ওপরে উঠে বসেছেন। সামনে একটি স্যুটকেশ—বাবার সেই চিরন্তন লেখার টেবিল। তার ওপর তাঁর লেখা কাগজের রাশ।

বাবা হেসে কল্যাণীর দিকে তাকালেন। 'এতদিনে তাহলে তোর বই বেরোল কলি?'

'হ্যাঁ বাবা।'

তিনি বললেন, 'বেশ হয়েছে। তা নবাগত কি আগন্তুক নাম দিলেই পারতিস।'

কল্যাণী বলল, 'ও নামে আরো বই আছে বাবা।'

এবার তিনি উৎসর্গের পাতাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, 'ঈস্, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু রায় শ্রীচরণেষু। কিন্তু শিবপ্রসাদ তোর কে তা লোকে কী করে বুঝবে। বাপও হতে পারে, মেসোও হতে পারে।'

মা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, প্রতিবাদ করে বললেন, 'শুনলি কথা? ছেলেমেয়েদের সামনে কী যে যা তা বল তুমি।'

কল্যাণীর বাবা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। 'যাক, বেশ হয়েছে। ভূমিকা নেই, সূচীপত্র নেই, কী যে এক স্টাইল হয়েছে তোদের। লোকে গল্প খুঁজে বের করবে কী করে।'

বইখানা আগাগোড়া উল্টে পাল্টে দেখে নিঃশব্দে বইখানি নামিয়ে রাখলেন মাদুরের ওপর। তারপর অস্ফুট আর্তনাদের সুরে বললেন, 'আমার সেই গল্পগুলির একটাও বুঝি দিসনি?'

বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারল না কল্যাণী। মুখ নামিয়ে নিয়ে আরও অস্ফুট স্বরে বলল, 'না বাবা।'

তিনি ধরা গলায় ছল ছল চোখে বললেন, 'সম্পাদকের মত তুইও শেষ পর্যন্ত অমনোনীত করলি!'

কল্যাণীর মা এবার স্বামীর পক্ষ নিলেন। তাঁর গলায় দুঃখ আর রাগ দুই-ই ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'ছি ছি ছি, ওর লেখা একটা গল্পও তুই তোর বইতে দিতে পারলিনে? তোর নামেই তো বেরিয়েছিল, তোর নামেই তো থাকত! কী দোষ ছিল তাতে? বুড়ো মানুষ, রোগা মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে এইটুকু দয়ামায়াও তোর হল না? চুলোয় যাক তোর লেখা। মায়া মমতাই যদি না থাকে, বই লিখে কী হবে?'

একটু থেমে শ্লেষের সুরে বললেন, 'দিব্যেন্দু বুঝি সব বাদ দিয়েছে?'

কল্যাণী আরক্ত মুখে বলল, 'তাঁর কেন দোষ দিচ্ছ মা? তিনি কিছুই করেননি। আমি আমার বিচারবুদ্ধি মত যা করবার করেছি।'

মা আবার বললেন, 'চুলোয় যাক তোর বিচারবুদ্ধি।'

কল্যাণী নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে রইল চুপ করে। অফিসের কাপড় ছাড়ল না, হাত মুখ ধুতে গেল না। টিনের চেয়ারখানার ওপর কাঠ হয়ে বসে রইল। উৎসবের ঘরে মুহূর্তের মধ্যে যেন শোকের স্তব্ধতা নেমেছে।

আজ নয়, মাসের পর মাস, যতদিন ধরে বইখানা ছাপা হচ্ছে তার প্রত্যেকটি দিন এই একই দ্বন্দ্বে কল্যাণী ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। বাবার সেই গল্পগুলি রাখবে কি রাখবে না। তার শিল্পবুদ্ধির সঙ্গে মমতার দ্বন্দ্ব, হৃদয়বোধের দ্বন্দ্ব। সে তো বাবার সম্পাদক নয়, সে তার বাবার মেয়ে। আর তার বাবা অসহায় পঙ্গু, সবদিক থেকে দুর্বল আর বঞ্চিত। যাঁর কোন আশা, কোন সাধ আকাঙ্ক্ষা জীবনে পূর্ণ হয়নি। যিনি বাঁচতে গিয়ে বাঁচতে পারেননি, লিখতে গিয়ে সে লেখা কাউকে শোনাতে পারেননি। তাঁর একটি কি দুটি লেখা নিজের বইতে নিলে দোষ কি। তাঁর রক্ত কল্যাণীর শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে আর তাঁর একটি রচনা কি কল্যাণী আত্মগত করতে পারে না? পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে তার লেখাও থাকবে না, তার বাবার লেখাও থাকবে না। কাল সব একাকার করে দেবে, সব নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলবে। তাহলে ক্ষতি কি পরমাত্মীয়ের একটি রচনাকে আত্মগত করায়? কিন্তু কিছুতেই পারেনি কল্যাণী। সে বাবাকে নিয়ে লিখেছে, বাবাকে বই উৎসর্গ করেছে, তবু বাবার লেখা নিতে পারেনি। সে বাবারই মেয়ে। বাবারই ভাষা, বাবারই ভাব, বাবারই সাধ, স্বপ্ন আর সাধনার ধন। তবু সে আলাদা, তবু সে সম্পূর্ণ আর একজন। আর সেই স্বাতন্ত্র্যেই তার স্বকীয়তা।

অনেকক্ষণ বাদে কল্যাণী উঠে দাঁড়াল। বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পন্থা সে খুঁজে পেয়েছে। ছদ্মনাম থেকে মুক্ত করে বাবার সেই লেখাগুলি তাঁর নিজের নামেই বই করে প্রকাশ করবে কল্যাণী। পাবলিশার যদি নাই জোটে টাকা ধার করে ছাপবে। মাসখানেকের মধ্যে বার করবে সে

বাবার বই।

কল্যাণী উঠে এসে বাবার ছোট ঘরখানার মধ্যে ঢুকল। তিনি অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল কল্যাণী। এ বাসায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু বাবার কাণ্ড দেখে কল্যাণী অবাক হয়ে গেল। তাঁর সামনে এক রাশ ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। শুধু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিই নয়, পুরোন সেই ছাপা গল্পগুলির ফাইল কপিও টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে।

কল্যাণী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'এ কি বাবা, এ কি করলে তুমি।'

বাবা ছল ছল চোখে বললেন, 'ওগুলি কিছু হয়নি। তাই নষ্ট করে ফেললাম।'

কল্যাণী বলল, 'সে কি বাবা, তুমি কি আর লিখবে না?'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'না লিখে থাকব কি ক'রে, লিখতেই হবে। কিন্তু যশের লোভে তোকে আর জ্বালাব না।'

কল্যাণী ধরা গলায় ডাকল, 'বাবা।'

বাবা বললেন, 'আয় তোকে আশীর্বাদ করি। আজ বড় আনন্দের দিন।'

কল্যাণী মাথা নিচু করে বাবার কাছে এসে বসল।

কার্তিক ১৩৬৮

সন্ধান

শুনে দুঃখিত এবং স্তম্ভিত হলাম আমার বন্ধু সুধাকর দত্ত দ্বিতীয়বার পাগল হয়ে গেছেন। প্রথমবারের অসুস্থতা বছর দেড়েক ছিল। লুম্বিনী পার্কে রেখে চিকিৎসা করাবার পর বেশ সেরে গেলেন। বছর খানেক ভালোই রইলেন। ফের এই কাণ্ড। ডাক্তাররা কিন্তু খুব ভরসা দিয়েছিলেন তাঁরা জোর করে বলেছিলেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন সুধাকরবাবুর আর কোন ভয় নেই।'

খবর পেয়ে আমি ওদের বেনেপুকুরের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই যেতে পারিনি। নানা কাজকর্মের চাপে তিন চার দিন দেরিই হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি সুধাকরবাবুকে তাঁর দাদা আগেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার নাকি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মারধর গালাগাল করে সারা বাড়িটাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছিলেন। ভাড়াটে বাড়ি। পাঁচজনের শান্তির ব্যাঘাত হয়। তাই সুধাকরবাবুর দাদা প্রভাকরবাবু আর কালবিলম্ব করেননি।

বাড়িতে গিয়ে দেখি সমস্ত পরিবার মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। সুধাকরবাবুর দুটি ভাইপো ভাইঝি মনের আনন্দে বারান্দায় লুকোচুরি খেলছে। ছেলেটির বয়স বছর সাত আট, মেয়েটির বয়স পাঁচ ছয়।

প্রভাকরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এমন হল কেন।'

একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী করে বলব। কেন এমন হল তাই যদি জানতে পারতাম তাহলে তো একটা কিছু প্রতিকারই করা যেত।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। এমন রূঢ়তা সুধাকরবাবুর দাদার কাছ থেকে আশা করিনি সুধাকরবাবু আমার বাল্যবন্ধু নন। অফিসের সহকর্মী। বিয়ে-থা করেননি। পড়াশুনো ভালোবাসেন বইপত্র নিয়েই থাকেন। শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। আমার মেজাজের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। তাই একধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা কোনদিন রেস্টুরেন্টে বসে চা খেয়েছি, কি কার্জন পার্কে বসে গল্প করেছি, কদাচিৎ দু'একবার সিনেমায় গিয়েছি। তিনি কয়েকবার বাড়িতেও ডেকেছেন। বাড়িতে মানে তাঁর ঘরে। একতলায় সারি সারি তিনখানা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে শেষের দক্ষিণ দিকের ঘরখানিতে সুধাকরবাবু থাকতেন। সেখানে বসে বসে দুজন গল্প করতাম। সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি, দুজন ভদ্র নাগরিক যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে আমরা তার বাইরে যেতাম না। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, অথচ ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রায় বলতেই

চাইতেন না সুধাকরবাবু। তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও আমি তেমন মেলামেশা করি এটা তাঁর যেন ইচ্ছা ছিল না। তবু কয়েকবার যাতায়াতের ফলে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আর সবাইর সঙ্গে, আলাপ পরিচয়ও আস্তে আস্তে হয়ে গেছে। সুধাকরবাবুর মা আর দাদা বউদির সঙ্গে আমার প্রায় তেমনি করেই আলাপ হয়েছিল। ঠিক পারিবারিক বন্ধু আমি ওদের হতে পারিনি। ওঁদের কারোরই বোধহয় তেমন আগ্রহ ছিল না। পরিবারের প্রত্যেকেই যেন একটু বেশি মাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। সুধাকরবাবুর দাদা প্রভাকরবাবুও তাই। কলেজের প্রফেসারি করেন। শুধু গুরু নয় গম্ভীরও। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। সুধাকরবাবু তাঁর চেয়ে দু তিন বছরের ছোট। কিন্তু দাদা আর ভাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও আমার সঙ্গে প্রভাকরবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাই তাঁর কথার অসৌজন্যটুকু কানে লাগল।

তাঁর স্ত্রী পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলা। মোটা বলা যায় না তবে বেশ একটু পুষ্টাঙ্গী। গায়ের রং গৌর। লম্বা কম নন। পাঁচ ফুট তিন চার ইঞ্চি হবেন। তাই পুষ্টতাটুকু তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁর হৃষ্টতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সুধাকরবাবুরা দুই ভাই যেমন একটু বেশিমাত্রায় গম্ভীর আর বিষণ্ণ প্রভাকরবাবুর স্ত্রী তা নন। এ বাড়ির মধ্যে তিনিই যা একটু সামাজিক। সামান্য কারণেই সশব্দে হাসেন, আলাপ টালাপে আগ্রহও আছে। কিন্তু তিনি যে বাইরের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলেন তা তাঁর স্বামী, দেওর কি শাশুড়ী কেউ যেন তেমন পছন্দ করতেন না। বুঝতে পেরে আমিও একটু দূরত্ব রেখে চলতাম। অথচ যাকে রক্ষণশীল বলে পরিবারটি ঠিক তাও নয়। পাঁজিপুঁথি তাবিজকবজের অনুশাসন এঁদের কাউকে মানতে দেখিনি। সামাজিক রীতিনীতি স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধেও এঁদের মতামতের ঔদার্যই লক্ষ্য করেছি। তবু আমার মনে হয়েছে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এঁরা একটু বেশি মাত্রায় চাপা। অবশ্য আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ধরনই এই। প্রাইভেসিকে আমরা মানসিক আভিজাত্য বলে মনে করি। সহজে নিজের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার কথা কাউকে বলিনে, আবার কেউ বলুক তাও চাইনে। আমার মনে হয়েছে সুধাকরবাবুর বউদি অমিতা দেবী পাছে এই নিয়মভঙ্গ করে পারিবারিক আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করেন সেই জন্যেই তাঁর চারিদিকে এমন কড়া পাহারা ছিল। অবশ্য পাহারা দেবার খুব যে বেশি দরকার ছিল তা নয়। বাইরের লোকজনকে কদাচিৎ এ বাড়িতে দেখেছি। অমিতা দেবীর ভাই বোন আর বউদিদের মাঝে মাঝে দেখেছি। আর প্রভাকরবাবুর ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসে। ইকনমিকসের অধ্যাপক হিসাবে নাম আছে তাঁর। পরীক্ষার সময় কোন কোন ছাত্রী তাঁর কাছে এসে পড়ে যায়। প্রভাকরবাবু মেয়ে কলেজের প্রফেসর। পাড়ার ছাত্রীরাও নানা ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নেয়। রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির হলেও সহিষ্ণু আর সহৃদয় বলে প্রভাকরবাবুর খ্যাতি আছে। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়াতে সাহায্য করেছে।

খবর নেওয়ার জন্যে অফিসের ছুটির পরে বেরিয়েছিলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই শীতের সন্ধ্যা নেমেছে। গাছপালা ঘেরা পুরোন বাড়ি। দিনের বেলাতেও কেমন একটু রহস্যঘন মনে হয়। এই দুর্ঘটনার ছোঁয়ায় অস্বস্তিকর বিষণ্ণতা যেন আরো বেড়ে গিয়েছিল।

একটু বাদে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আচ্ছা চলি। আজতো আর হবে না, আমি বরং কাল পরশু গিয়ে সুধাকরবাবুকে দেখে আসব।'

প্রভাকরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না, আপনি বরং আরো কিছুদিন পরে—আমি আপনাকে এখানে খবর দেব—তখন দেখা করতে যাবেন। চেনা কাউকে দেখলে আরো গোলমাল করে। দেখাসাক্ষাৎ করতে ডাক্তাররা নিষেধ করে দিয়েছেন।'

আমি আর একবার ঘা খেলাম। অবশ্য প্রভাকরবাবু যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ডাক্তাররা যদি নিষেধ করে দিয়ে থাকেন আমিই বা কেন যাব। কিন্তু প্রভাকরবাবুর বলবার ভঙ্গির মধ্যেই এমন একটা বাধা দেওয়ার, প্রতিরোধ করবার ধরন ছিল যা অনুভব করতে পেরে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। আমি তো সাধারণ পাঁচজনের মত কৌতূহলী হয়ে আসিনি, ওঁদের বিপদে সহানুভূতি জানাতেই এসেছি। কিন্তু বাইরের কারো সহযোগিতায়, কারো সহানুভূতিতে যেন এঁদের দরকার নেই। এঁরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আর কাউকে ঢুকতে দিতে চাননা। যেন কিসের একটা ভয়।

পাছে যেটুকু ওঁরা জানাতে চান তার চেয়ে বেশি কিছু লোক জেনে ফেলে।

আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে আগেই বিদায় নিয়ে রেখেছি। এবার বেরোবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু প্রভাকরবাবুর স্ত্রী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিলেন, 'না না তা কি হয়। অফিস থেকে ফিরেছেন একটু চা টা খেয়ে যান।' আমি দ্বিতীয়বার আপত্তি করলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা করুণভাবে বললেন, 'দেখুন, আমাদের বন্ধুবান্ধব বেশি নেই। তাছাড়া ইদানিং আপনার সঙ্গেই যা একটু মিশত, আর কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাইত না।'

এরপর এঁর অনুরোধ এড়ান কঠিন হল। প্রভাকরবাবুও বললেন, 'বসুন একটু, আমিও এক্ষুণি বেরোব।'

অমিতা দেবী ভিতরে চলে গেলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে এলেন তাঁর শাশুড়ী। বিধবা বৃদ্ধা মহিলা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে। পরনে থান, ছিপছিপে শীর্ণ চেহারা। মুখখানা ভারি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত বলে মনে হয়। নিষ্প্রভ দুটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার আবার সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা।' তাঁর চোখে জল বেরোল না, গলা আর্দ্র হয়ে উঠল না। সব যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'সর্বনাশ কেন বলছেন ? আর পাঁচটা অসুখের মত এও একটা অসুখ। চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।'

তিনি বললেন, 'আর সারবে না।'

হঠাৎ প্রভাকরবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধা মার দিকে ফিরে তাকিয়ে খানিকটা বিরক্তি আর অস্বস্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'কী করে জানলে সারবে না ? যাও ভিতরে যাও।'

প্রভাকববাবুর মা উঠে গেলেন না। যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'তখন অত করে বললুম বিয়ে দে। বিয়ে দিলে সব শুধরে যাবে। আমার কথা কেউ শুনল না।'

প্রভাকরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না তোমরা সবাই মিলে আমাকেও পাগল করে তুলবে। সুধা তো কচি খোকা নয়। ওর বিয়ের জন্যে কে না চেষ্টা করেছে ? কথা যদি না শোনে—'

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আমি বসে আছি। বাইরের লোক হয়ে তাঁদের পারিবারিক আলোচনা শুনে ফেলেছি। এতে তিনি আরও অধীব হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললেন, 'কই, তোমাদের চা-টা হল ?'

ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে মা আর সেখানে বসে থাকতে সাহস পেলেন না। মোড়া ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

এর পর অমিতা দেবী ট্রেতে করে দুটি চায়ের কাপ টোস্ট আর ওমলেট নিয়ে এলেন।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'এত কেন করতে গেলেন ?'

তিনি বললেন, 'এত আর কই, খান।'

প্রভাকরবাবু নিজেব চায়ের কাপটি তুলে নিযে বললেন, 'বিরজা কোথায় ?'

অমিতা দেবী বললেন, 'রান্না করছে।'

'নীলা-দিলু ?'

অমিতা দেবী সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'পড়ছে।'

এবার একটু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করলেন প্রভাকরবাবু। চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। খাবারটা সেরে আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

অমিতা দেবী বললেন, 'ওকি আপনি বসুননা।'

প্রভাকরবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'ওঁর যদি কাজ থাকে ওঁকে আটকে রেখে লাভ কি।'

অমিতা দেবী তখন বললেন, 'আচ্ছা আব একদিন কিন্তু আসবেন। ভালো কথা, আপনার যে বইগুলি আছে, মানে সুধাকরকে আপনি যে বইগুলি পড়তে দিয়েছিলেন, সেগুলি কি আজ নিয়ে যাবেন ?' একটু থেমে করুণ সুরে বললেন, 'এখনতো আর দরকার নেই।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আচ্ছা থাক আর একদিন এসে নেব।'

তিনি বললেন, 'তাই আসবেন।'

প্রভাকরবাবু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃদু পদচারণ দেখেই তা বুঝতে পারলাম, আমি আর দেরি করলাম না। অমিতা দেবীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে তাঁর স্বামীর পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলাম।

পথে এসে তিনি বললেন, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

বললাম, 'আমি তেত্রিশ নম্বর ধরব।'

তিনি যেন নিষ্কৃতি পেলেন, 'ও, আমি সার্কুলার রোড থেকে ট্রাম নেব। কলেজ আছে রাত দশটা অবধি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুধাকরও ওঁর মতই প্রায় ছ'ফুট লম্বা, দোহারা গড়ন, ফর্সা রঙ, লম্বাটে ধরনের মুখ। চোখ আর নাকের গড়নে খুঁৎ আছে বলে পুরোপুরি সুপুরুষ মনে না হলেও লাবণ্যটুকু চোখে পড়ে। চিবুকের টোলটুকু ভারি সুন্দর লাগে আমার কাছে। সেই টোল প্রভাকরবাবুর মুখেও আছে। কিন্তু সে মুখ বন্ধুর মুখ নয়।

আমি আস্তে আস্তে পুব মুখে এগোতে লাগলাম। গোরাচাঁদ রোড দিয়ে, বাঁয়ে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ রেখে, নিউ সি. আই. টি রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এই অঞ্চল দিয়ে সুধাকরবাবুর সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছি। বেড়াতে বেড়াতে গল্প করতে তাঁর খুব ভালো লাগে। তবে বাড়ির কাছাকাছি এসব অঞ্চল ছাড়া বেশি দূর তিনি যেতে চাইতেন না। একটু এগিয়ে পার্কের মধ্যে কিছুতেই তাঁকে নিতে পারতাম না। বলতেন, 'ওখানে বড় ভীড়।'

ভ্রমণের গণ্ডীর মত আলাপের সীমাও আমাদের সঙ্কীর্ণই ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গগুণেই হোক, আর আন্তরিকতার জন্যেই হোক, কোনদিন কোন আলোচনা একঘেয়ে লাগত না। গম্ভীর হলেও তিনি নীরস ছিলেন না, তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সহজ পরিহাস প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। কথায় কথায় আমি একদিন বলেছিলাম, 'আচ্ছা সুধাকরবাবু, আপনি বিয়ে থা করছেন না কেন?'

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চেয়ে থেকে হেসে বলেছিলেন, 'ব্যাপার কি? আপনি ঘটকালি শুরু করলেন কবে থেকে? মেয়ের সন্ধান আছে নাকি?'

'মেয়ের অভাব কি?'

তিনি বলেছিলেন, 'মেয়ের অভাব নেই। মনোরমার বড় অভাব।'

'আপনি কি সুন্দরী মেয়ের কথা বলছেন?'

'তাহলে চক্ষুরমা বলতাম।'

আমি হেসে বললাম, 'দেখুন, সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, কিন্তু রূপের প্রবেশ পথ চোখ। বাইরের চোখ আছে বলেই আমরা মনশ্চক্ষুর কথা তুলতে পারি।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু যতই বলুন মন আর চোখ এক নয় (যাকে চোখ দিয়ে ভালোবাসেন তাকে মন দিয়ে ভালো নাও বাসতে পারেন, কিন্তু যাকে মন দিয়ে ভালোবাসেন সে আর যাই হোক চক্ষুশূল হয়না) আমি অবশ্য দৃষ্টিহীন হতে চাইনে। কিন্তু দুই চোখকে যখন প্রশ্রয় দিই তা সহস্রলোচন হয়ে ওঠে।'

সুধাকরবাবুর কথাবার্তা আমি সব সময় বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে ওঁকে পিউরিট্যান, মর‍্যালিস্ট বলে মনে হত। মাঝে মাঝে আবার উল্টো সুরের কথাও শুনতে পেতাম। আমার মনে হত তিনি কোন বিষয় সম্বন্ধেই কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। পৌঁছাবার দিকে যেন তাঁর তেমন গরজও নেই। উল্টোপাল্টা চিন্তাতেই তাঁর আনন্দ। আনন্দ না আসক্তি? এখন মনে হচ্ছে তিনি সবসময়েই কোন না কোন বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতেন। সামান্য সাধারণ বিষয়েও তাঁর মনস্থির করতে সময় লাগত। বোধহয় মনস্থির তিনি করতেই পারতেন না। শেষ পর্যন্ত ঝোঁকের মাথায় যা হয় কিছু একটা করে বসতেন। আগে লক্ষ্য করিনি, এখন মনে হচ্ছে অস্বাভাবিকতা তাঁর মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল।

বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আরো দু একবার আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা

কখনো তিনি মুখে বলেননি। তবে একদিন মন্তব্য করেছিলেন, দাম্পত্যজীবনের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই।

আমি তর্ক তুলেছিলাম, 'বিশ্বাস না থাকার কি মানে হয়, সংসার আর সমাজকে যদি স্বীকার করেন, দাম্পত্য-বন্ধনকে না মেনে উপায় থাকেনা।'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'ওই যে বললেন বন্ধন, ওর মধ্যেই আসল কথাটুকু রয়ে গেছে। দাম্পত্য থাকুক কিন্তু তার অত আঁটসাঁট বিধিনিষেধের বাঁধন যেন না থাকে, একজনকে আর একজনের পুরোপুরি দখলে রাখবার প্রতিযোগিতা যেন না চলে। তাহলে সে বাঁধন দুদিন যেতে না যেতেই গলার ফাঁস হয়ে দেখা দেয়। এই আমার দেখে শেখার অভিজ্ঞতা, জানিনে আপনারা ঠেকে আরো কিছু বেশি শিখেছেন কিনা।'

একটু বাদে ফের বলেছিলেন, 'অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্ককে যদি খুব ঢিলে করে দিই তাতেও বোধহয় সম্পর্কের সেই ঘনত্ব আর থাকে না। সেও এক ধরনের সোনার পাথর বাটিই হয়ে দাঁড়ায়।'

তত্ত্ব ছেড়ে মাঝে মাঝে আমি তথ্যের দিকে পা বাড়িয়েছি। নানা কৌশলে জানতে চেষ্টা করেছি কোন মেয়ে তাঁর জীবনে এসেছে কিনা। যদি এসে থাকে তার সঙ্গে ওঁর মিলনে বাধা কোথায়।

কিন্তু সুধাকরবাবু কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেননি। হেসে বলেছেন, 'আপনারা গল্প লেখক। কল্পনায় একটি কেন একশত নায়িকারও আমদানি করতে পারেন। কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের মত লোকের মানসী বস্তুজগতে থাকে না, তাকে মনোজগতেই গড়ে তুলতে হয়, এবং তুলে রাখতে হয়। জল ছাড়া যেমন মীন বাঁচেনা, মন ছাড়া তেমনি মনোরমার অস্তিত্ব নেই।'

আমি ওঁর কথায় সায় দিতাম না। আমার নায়করা রাম শ্যাম যদু মধু ; আমার নায়িকারা পুঁটি বুঁচি খেঁদি পেঁচির দল। আমি জানি তাদের কেউ সর্বাঙ্গসুন্দরী নয়, অনেকেই বরং অসুন্দরী, আমি জানি তাদের কেউই বুদ্ধিতে হৃদয়ে কোনদিন পূর্ণতা পায় না। তা নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই। প্রেমই হোক, মত্ততাই হোক তার স্পর্শে অংশই আমাদের পূর্ণতার স্বাদ দেয়। নিরবয়ব মানস সৌন্দর্যকে আমি স্বীকার করিনে। স্থূল খড়-মাটি কাঠ লোহা, প্রীতি প্রেম, ঈর্ষা দ্বেষ-রক্তমাংস এসব উপাদান ছাড়া আমি অচল, তবে উপাদানই আমার সব একথাও মানতে রাজী নই।

এই নিয়ে সুধাকরবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক হত। আর সে তর্কের কোন মীমাংসা হত না।

তা সত্ত্বেও সুধাকরবাবুকে আমার ভালো লাগত। আমাকেও তিনি কিছু কিছু পছন্দ করতেন। কিছু কিছু ছাড়া কি। পুরোপুরি পছন্দ আর কে কাকে করতে পারে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে। সেই নিজেরই কি সবখানি সে পছন্দ করে?

তারপর সেই দুর্ঘটনা ঘটল। আমাদের সওদাগরী অফিসের একাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন সুধাকরবাবু। কোন বিভাগেই কাজ করে তাঁর সুখ ছিল না। বদলি হতে হতে তিনি ওখানে গিয়ে ঠেকেছিলেন। যোগ-বিয়োগে তিনি হাজার দশেক টাকার গোলমাল করে ফেললেন। চীফ একাউন্ট্যান্ট চোখ গোল করে বললেন, 'এখন যে জেলে যেতে হবে মশাই। কোম্পানী কি সহজে ছাড়বে?'

সুধাকরবাবু মুখ চূণ করে বললেন, 'তাইতো কি হবে!' আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'অত ভাবছেন কেন? যারা আপনাকে চেনে তারা কিছুতেই একথা মনে করবেন না টাকাটা আপনি নিজের সিন্দুকে তুলেছেন।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু আমাকে কজনই বা চেনে?'

বললাম, 'তাহলে তো কোন কথাই নেই। অচেনা লোকে আপনার সম্বন্ধে কী ভাবল না ভাবল তাতে কি এসে যায়।'

তিনি বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমাদের চেনা জগৎ অনেকগুণ বড়। আমরা রোজ সে জগতের সঙ্গে মুখোমুখি হইনে। কিন্তু তবু তা আছে।'

সুধাকরবাবু সামাজিক ছিলেন না। কোন বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন কি কোন সভাসমিতিতে তাঁকে যেতে দেখিনি। তিনি সব সময় ভীড় এড়িয়ে চলতেন। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলনা। বন্ধুর

সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু দেখে অবাক হলাম পাছে সমাজ তাঁকে অবিশ্বাস করে, ভুল বুঝে মিথ্যা অপবাদ দেয় তা নিয়ে তাঁর আশঙ্কার অন্ত নেই। জেনারেল ম্যানেজার এই নিয়ে যে কোন হৈ চৈ করলেন তা নয়। সুধাকরবাবুকে ডেকে দু চারটে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। একটু তিরস্কারও করে থাকবেন, ব্যাপারটা যে ভুলের জন্যেই হয়েছে তাতে তিনি কোন সন্দেহ করলেন না। তবে টাকাটা তাড়াতাড়ি পুরিয়ে দিতে বললেন। লিমিটেড কোম্পানীর নানারকম অসুবিধে আছে।

সুধাকরবাবুর দাদা কিছু নিজের কাছ থেকে, কিছু বা ধার করে সংগ্রহ করে দিলেন। শুনেছি তাঁর স্ত্রীর গয়নার বাক্সেও হাত পড়েছিল। যা হোক এই নিয়ে মামলা মোকর্দমাও হলনা, সুধাকরবাবুর চাকরিও গেলনা। অবশ্য আর একবার তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হল। কিন্তু সেই যে তাঁর ধারণা হল তিনি সবাইর চোখে হেয় হয়ে গেছেন, তাঁর জন্যে তাঁর দাদা বিড়ম্বিত হয়েছেন, তা কিছুতেই আর তাঁর মন থেকে সরানো গেলনা।

আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে। আপনার নিজেরই তো দাদা। আপনার জন্যে তিনি না হয় কিছু কষ্ট করলেনই।'

সুধাকরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'উহু। অযোগ্যতা এমনই জিনিস তাতে ভালোবাসার বাঁধনেও টান পড়ে। কোন সময়ে ছিঁড়ে যায়। এর চেয়ে আমার জেলে যাওয়াই ভালো ছিল।'

আমি বললাম, 'ছি ওসব কি বলছেন। আপনি ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। যা করছিলেন তাই করুন। যেমন পড়াশুনা নিয়ে ছিলেন তেমনি থাকুন।'

কিন্তু বললে কি হবে, ওঁর মনের মধ্যে যে ধারণা ঢুকে গেছে তার অপসারণ আমার পক্ষে সম্ভব হলনা। দেখা হলে ওই এক কথা নিয়েই আলোচনা হত। আমি ইচ্ছা করেই তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

মাস কয়েকের মধ্যেই অদ্ভুত সব অভ্যাস সুধাকরবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। এর আগে সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি মিশতেন না। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না, কে কী নিয়ে আলোচনা করে সেদিকে কান দেবার তাঁর কোন গরজ ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। দুজন লোক একসঙ্গে কথা বললে তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কখনো বা পা টিপে টিপে তাঁদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়। এ কী গোয়েন্দাগিরি, এ কী অসভ্যতা। সকলেরই ব্যক্তিগত জীবন আছে। যার যার নিজের সমস্যা আছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সুখদুঃখের কথা সঙ্গোপনে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। অন্য কেউ যদি সে আলাপ উৎকর্ণ হয়ে শোনে কি পিছনে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয় লোকের তাতে বিরক্ত হবারই কথা। একাউন্টসের পরেশ সরকার এমনি বিরক্ত হয়েই একদিন বলেছিলেন, অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছেন মশাই। আপনার কথা আলোচনা হচ্ছে না। আমাদের আরো কাজ আছে। নিশ্চয়ই আপনি কিছু একটা ঘটিয়েছিলেন। নইলে আপনার অত ভয় কিসের? Guilty mind এর ধরনই ওই।'

সঙ্গে সঙ্গে এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তেড়ে উঠে সুধাকরবাবু ঘুষি মেরেছিলেন পরেশবাবুর মাথায়।

সারা অফিসে হুলস্থুল পড়ে গেল। সুধাকরবাবু পরেশবাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। আমার তো শুনে প্রথমটা বিশ্বাসই হয় না। সুধাকরবাবু কারো গায়ে হাত দিতে পারেন তাঁর সঙ্গে যে দীর্ঘদিন ধরে মিশেছে তার পক্ষে একথা সত্যি মানতে পারা শক্ত।

সবাই ধরাধরি করে দুজনকে আলাদা করে ছাড়িয়ে দিল। সুধাকরবাবু রুদ্ধ আক্রোশে বললেন, 'আমাকে চোর বলল।'

পরেশবাবু বিদ্রূপ করে বললেন, 'চোরকে চোর বলব না সাধু বলব?'

সুধাকরবাবু বললেন, 'আমি তোমার নামে ডিফেমেসন সুট আনব। শুয়োর কোথাকার।'

জেনারেল ম্যানেজার দুজনকেই সাসপেণ্ড করতে চেয়েছিলেন। আমরা ধরাধরি করায় সুধাকরবাবুর বিনা মাইনের তিন মাস ছুটি মঞ্জুর হল। পরেশবাবু ক্ষমাটমা চেয়ে আগের মতই কাজ করতে লাগলেন।

সেই থেকেই সুধাকরবাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতি শুরু। দিন কয়েক বাদে আমি দেখা করতে গেলে তিনি দুঃখ করে বললেন, 'সত্যি আমি বড় লজ্জিত। আমি যে অমন একটা পশুর মত ব্যবহার করতে পারি—।'

আমি বললাম, 'মানুষের মেজাজ কোন কোন সময় খারাপ হতে পারে। তাতেই তাকে পশু বলা যায়না।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, 'আপনি বরং কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। শরীরটাও সারবে।'

তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'শরীরের আমার কিছুই হয়নি। আমি বেশ আছি।'

তাঁর মা আর দাদা বউদিও তাঁকে বাইরে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ঘর ছেড়ে নড়বেন না। তার গোঁ কেউ ভাঙতে পারলেন না। তিনি আমার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। ঘর থেকে কিছুতেই বেরোবেন না। আমি একদিন জোর করে তার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বিরক্ত হয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তারপরে যা হবার হল। ছুটি ফুরোবার আগেই তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। নাওয়া খাওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই খামখেয়ালীপনা করতেন। এখন একেবারেই আয়ত্বের বাইরে চলে গেলেন। একদিন গিয়ে শুনলাম ঘরের বহু জিনিসপত্র ভেঙে চুরে নষ্ট করে ফেলেছেন, আলমারির বইপত্রও নাকি আর কিছু আস্ত রাখেননি। শুনে দুঃখ হল। বেশ ভালো কলেকসন ছিল।

প্রথমে রাঁচী পাঠাবার কথা শুনেছিলাম। তারপর লুম্বিনী পার্কেই প্রভাকরবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাবলাম ভালোই হল। কাছাকাছি আছেন। মাঝে মাঝে অন্তত দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে।

কিন্তু আমি দু একদিনের বেশি যেতে পারিনি। প্রথম দিনেই তিনি আমাকে খানিকটা চিনতে পারলেন বলে মনে হল। অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে বললেন, 'এই যে আসুন ভিতরে আসুন।'

আমি বললাম, 'চিনতে পারছেন?'

তিনি উদভ্রান্তের মত আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'চিনব না কেন। আমার কাউকে চিনতে বাকি নেই। আমি সবাইকে চিনি, সবাইকে চিনি।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন সুধাকরবাবু।

মনে মনে ভাবলাম জ্ঞানীরা পাগল হয়েও জ্ঞানগর্ভ কথা ছাড়া বলেন না। আবার সাধারণের কাছে অনেক তত্ত্বজ্ঞ আর জ্ঞানীরাও পাগল হিসেবেই পরিচিত থাকেন। কিন্তু আমি তো সুধাকরবাবুকে তেমন করে চেনার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, পরিচিত বন্ধু হিসেবে চিনেছেন কিনা তাই জানতে চেয়েছিলাম। সে প্রশ্নের সদুত্তর পেলামনা। চিকিৎসার ধারা সম্বন্ধে ডাক্তারের সঙ্গে দু তিন মিনিট আলাপ হল, কিন্তু তিনিও দেখলাম বেশি কথা বলতে অনিচ্ছুক।

এরপর অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে নানারকম আলোচনা শুনেছিলাম। সুধাকরবাবু নাকি একাই পাগল হননি। এ রোগ ওঁদের বংশগত। ওঁর বাবাও নাকি পাগল হয়ে মারা যান। সুধাকরবাবুর মাও এ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। আর একজন বললেন, 'ওর দাদাই বা কি? তিনিও দুবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন।'

দেখলাম শুধু আমি নয় অফিসের আরও কেউ কেউ ওদের পরিবারকে চেনেন। নানাসূত্রে নানা ধরনের খবর আসতে লাগল। তবে এসব সংবাদের কতখানি সত্য কতখানি জল্পনা আমি আর তা যাচাই করে দেখিনি। কিন্তু আশ্চর্য সুধাকরবাবুর রোগটা যত তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি অল্পদিনের মধ্যে সেরেও গেল। বোধ হয় ছ'মাসও তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়নি। তার আগেই ছাড়া পেলেন।

আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হইনি। তাঁর দাদাকে ফোন করে খোঁজখবর নিয়ে ডাক্তারেরা দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন কিনা তা জেনে সুধাকরবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

কোণের সেই ছোট ঘরখানিতে ইজিচেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন সুধাকরবাবু। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, একটু হেসে বললেন, 'আসুন আসুন!'

আমি তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসে বললাম, 'ওকি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।'

তিনি বললেন, 'বসেই তো থাকি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর কেমন আছে আপনার'?'

তিনি বললেন, 'ভালো।'

সামনের বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে আবার যেন খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। যেন কোন অতল গভীরে ডুব দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আনমনা হবার অভ্যাস ওঁর নতুন নয়, গোড়া থেকেই ছিল। আমি দেখলাম অসুখের পর শরীরটা ওঁব রোগা হয়ে গেছে। দেহ মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় চলে গেছে তা বোঝা যায়। ঝড়েব পরের এখনকার অবস্থাটা বড় শান্ত। বেশ চোখে পড়ে।

ঘরের আসবাবপত্রেরও অনেক অদলবদল হয়েছে দেখা গেল। সেই বইয়ের আলমারিগুলি আব নেই। তবে দেওয়ালের দিকে ঠেস দেওয়া টেবিলটা রয়েছে। তার ওপর সুন্দর একটি ফুলতোলা টেবিল ক্লথ। বোধ হয় ওঁর বউদির হাতের কাজ। অল্প কিছু বই পত্র। কালো রঙের একখানা বড় ডায়েরি। তাব পাশে কম দামি একটি ফাউন্টেন পেন আর একটি রঙিন পেনসিল।

জানালার ধারে তক্তপোষ। তাতে পরিচ্ছন্ন বিছানা টিপয়ের ওপর ছোট একটি ফুলদানি। তাতে দুটি শ্বেত পদ্ম। পাপড়িগুলি এখনো খোলেনি। চমৎকার সাজানো গুছানো ঘর। সুস্থ মানুষেরই বাসগৃহ। তবু আমার মনে হল যেন একটি হাসপাতালের চেম্বারে বসে আছি। সবই আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যের যেন অভাব।

একটু বাদে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাগজ কলম রয়েছে দেখছি। লেখেন নাকি কিছু কিছু ?'

সুধাকরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ের ভঙ্গি করলেন, বললেন, 'ইচ্ছে হয় লিখতে। আর কিছু না পারি নিজের কথা বলতে তো বাধা নেই। নিজেকে নিয়ে একখানা উপন্যাস সবাই লিখতে পারে। কিন্তু তাও পেরে উঠিনে। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'ও নিয়ে ভাববেন না। সময় সময় ওরকম হয়।'

সুধাকরবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আমি সব ভুলে গেছি। ফের একেবারে ক খ থেকে শুরু করতে হবে। একেবারে নতুন শৈশব। এক হিসেবে মন্দ নয়, বুড়ো হওয়ার আগেই মরে যেতে পারব।'

তিনি সব ভুলে গেছেন একথা আমার যেন বিশ্বাস হতে চাইছিল না। যিনি এখনো এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তিনি সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন এ কথা মানি কী করে। হয়তো এও তাঁর এক ধরনের ধারণা। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছেন একথা এই মুহূর্তে তাঁর ভাবতে ভালো লাগছে। অবশ্য কথা বলবার ধরনের মধ্যে কিছু যে বৈষম্য ছিল না তা নয়। কেমন যেন থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন সুধাকরবাবু। যেন তিনি ঠিক আমার সামনে বসে নেই। অনেক দূরে চলে গেছেন। কিম্বা এমন অনেক কথা তাঁর মনে আসছে যা তিনি মুখে বলতে চাইছেন না, অন্য অনেক কথা দিয়ে চাপা দিতে চাইছেন।

এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বসেও খুব যেন স্বস্তি বোধ করছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন উঠতে পারলে বাঁচি। এই সময় সুধাকরবাবুর বউদি এসে রক্ষা করলেন। আমার জন্যে চা আর তাঁর দেওরের জন্যে দুধের গ্লাস নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলের মত এইটুকু খেয়ে নাও তো।'

সুধাকরবাবু বললেন, 'আমার চা কই।'

'উঁহু চা নয়। এখন দুধ খাবে। বেশি চা খেলে রাত্রে তোমার ঘুম হতে চায় না। তা কি ভালো ?'

নিজের ইচ্ছায় বাধা পড়ায় মনে হল সুধাকরবাবু ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখনই যেন উঠে দাঁড়াবেন, কি কিছু একটা কাণ্ড কারখানা করে বসবেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম শেষপর্যন্ত প্রাণপণে সেই রাগকে চেপে রাখলেন। দুধের গ্লাসটা অমিতাদেবীর হাত থেকে নিয়ে এক পাশে রেখে দিয়ে

বললেন, 'পরে খাব। আচ্ছা বউদি আমার বইয়ের আলমারিগুলি সব সরিয়ে নিয়ে গেলে কেন? একটাও কি রাখতে নেই?'

অমিতাদেবী হেসে বললেন, 'একটাও কি আস্ত আছে যে রাখব?' বলেই তিনি যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। একথা বলা তাঁর ইচ্ছা ছিল না তা বুঝতে পারলাম। একটু বাদে তিনি সব সামলে নিয়ে হেসে তরল কণ্ঠে বললেন, 'গেছে তো বালাই গেছে। ঢের পড়েছ আর পড়তে হবে না. এবার হাতে কলমে কাজকর্ম কর।'

কিন্তু সুধাকরবাবু ওকথায় ভুললেন না। কাতর ভঙ্গিতে বললেন, 'ভেঙে চুরে সব বুঝি নষ্ট করেছি? আর কি কি গেছে বলতো বউদি?'

অমিতাদেবী হেসে বললেন, 'আর আবার কি যাবে? বইগুলি গেছে ভালোই হয়েছে। ওগুলি ছিল আমাদের শত্রু। বইয়ে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাতে না।'

আমি লক্ষ্য করলাম পানের রসে অমিতাদেবীর ঠোঁট দুটি লাল। কথা বলবার ভঙ্গিতেও সহজ সরলতা আর কৌতুক আছে। এ বাড়িতে এই বধূটিকেই আনন্দের ঝরণা বলা যায়। আর সব অচল পাহাড়।

শাশুড়ীর ডাক শুনে অমিতাদেবী একটু বাদে মোড়াটা ছেড়ে উঠে গেলেন।

সুধাকরবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেয়ালগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছেন একখানা ছবি কি ফটোও নেই। সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি। অনেক কষ্ট করে অনেকদিন ধরে বইগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, সব গেছে।'

হঠাৎ তাঁর দুটি চোখই ছলছল করে উঠল। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'অত ভাবছেন কেন। আবার হবে আবার করবেন।'

তাঁর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

একটুবাদে তিনি ফের কথা বললেন, 'জানিনে আরো কত নষ্ট করেছি আর কার কি ক্ষতি করেছি। কিন্তু আমাকে জানতে হবে। আমি সারা জীবন দিয়ে সব শোধ করে যাব। আমি কারো কাছে ঋণী থাকব না, আলবৎ নয়।'

চেয়ারের হাতলে চাপড় দিলেন সুধাকরবাবু। তাঁর চোখ মুখের ভঙ্গি কেমন যেন এক ধরনের অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। সুধাকরবাবু আবার ক্ষেপে গেলেন না তো?

আমরা সুস্থ মানুষ উন্মাদকে ভয় করি। সে আমাদের অনাত্মীয়, অপরিচিত শত্রুর মত। ছেলেবেলায় আমার প্রতিবেশী একটি পাগলকে দেখেছিলাম। তিনিও খুব বিদ্বান, স্কুল কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন, হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যায়, তারপর একদিন শিকল ভেঙে বেরিয়ে দশ বার বছরের একটি ছেলেকে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন আনেক লোকজন জড় হয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলে।

পাগলকে আমার দারুণ ভয়। শুধু আমি কেন, কে না ভয় করে? যে উন্মাদ হিংস্র নয় তার সঙ্গেও একঘণ্টা কাটাতে আমার সাহস হয়না। অথচ এই উন্মাদ আমাদের নিজের মধ্যেই আছে। কখনো কামে কখনো ক্রোধে কখনো হিংসায় আমরা সুস্থতার সীমা ডিঙিয়ে যাই, জ্ঞান হারাই বোধ হারাই। তবু আংশিক উন্মাদযুক্ত উন্মাদের পুরো উন্মাদকে ভয়ের সীমা নেই।

আস্তে আস্তে সুধাকরবাবু শান্ত হলেন। তাঁকে শ্রান্তও দেখাতে লাগল।

এক ফাঁকে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তিনি দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমায় দু একখানা বই চাইলে দেবেন তো! ভয় নেই আর ছিঁড়ব না।'

হেসে বললাম, 'না না ছিঁড়বেন কেন।'

তারপর আরো কয়েকদিন এসেছি। একদিন দেখি তিনি ছোট ভাইঝিকে নিয়ে বাড়ির ধারের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বেড়াচ্ছেন। ভারি ভালো লাগল।

সুধাকরবাবু হাসলেন, 'দেখেছেন? নীলি দিলু কেউ আর আমাকে ভয় করে না। ওদের সাহস

বেড়ে গেছে। তার চেয়ে বেশি সাহস ওদের বাবা মার। সত্যি ভারি ভালো লাগে। আমার কাছেও ছেলেমেয়েরা আসে। আমার সঙ্গেও লোকে কথা বলে। To start life anew.'

বললাম, 'তা বলবে না কেন ? অসুখ বিসুখ কি আর মানুষের হয় না ? তারপর ফের সুস্থ হলে সে কথা আর কে মনে করে রাখে !'

তিনি বললেন, 'সুস্থতা কি জিনিস যে একবার তা না হারায় সে কোনদিন তা বুঝতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ও বস্তু আমরা পদে পদে হারাই। কিংবা হারিয়েই রয়েছি। পুরোপুরি সুস্থ আমাদের মধ্যে কজন ?'

ভাইঝিকে বিদায় দিয়ে সুধাকরবাবু আমার আরো কাছে এলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি নিজের হাতে নিজের কোন জিনিস নষ্ট করেছেন।'

আমি হেসে বললাম, 'করেছি বইকি ?'

তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলুন তো ?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'জীবন।'

সুধাকরবাবু একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'এসব আপনার কাল্পনিক দুঃখবিলাস। আপনি কিছু নষ্ট করেননি কিন্তু আমি করেছি। আমি আমার সুনাম সংযম সব হারিয়েছি।'

আমি একটু কৌতুকের সঙ্গে বললাম, 'কি রকম ?'

তিনি বললেন, 'ওই অবস্থায় আমি নাকি সব অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথা বলেছি, শুধু তাই নয় আমি নাকি'— তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আমি নাকি কোন একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছি। ছি ছি ছি।'

লজ্জিতভাবে মুখখানা একটু ফিরিয়ে রাখলেন সুধাকরবাবু। তাঁর ভাব দেখে আমি হেসে বললাম, 'বেশ করেছেন।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি বলছেন, খুব মজা পাচ্ছেন, না ! কিন্তু ভেবে দেখুন তো একজন ভদ্রলোকের—। ছি ছি ছি।'

আমি বললাম, 'আপনি তো আর তখন সুস্থ ছিলেন না। ইচ্ছা করে তো ওসব করেননি।'

তিনি বললেন, 'তা কেন করব ? ব্যাপারটা আমার মনে নেই। কে সে মেয়ে, কখন ঘটল এ কাণ্ড সব ভুলে গেছি।'

বললাম, 'আপনি শুনলেন কার কাছে ?'

তিনি বললেন, 'শুনেছি। ছি ছি ছি আমি ভাবতে পারিনে—।'

তারপর আরো যে কদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কোন না কোন ভাবে এই প্রসঙ্গ সুধাকরবাবু টেনে এনেছেন। কোনদিন বলেছেন, 'দেখুন যদি মেয়েটির নামধাম জানতে পারতাম আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতাম। সে হয়তো লজ্জায় আমার সামনে আর আসতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'ওসব ভাবনা ছেড়ে দিন। ও অবস্থায় লোক কত কাণ্ডই না করে। বিশেষ করে যখন আপনার কিছু মনে নেই।'

সুধাকরবাবু লজ্জিত মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'না, না এখন একটু একটু মনে পড়ছে। খুব আবছা আবছা। মুখখানা ভারি সুন্দর, ভারি সুন্দর। চোখ দুটি কালো আর বড় বড়। আর সেই চোখভরা গভীর মমতা আর সহানুভূতি। যার বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, বুঝেছেন। দাদার ছাত্রীদের মধ্যে কি কেউ—ছি ছি ছি আমি ভাবতেই পারিনে।'

একটুকাল চুপ করে রইলেন সুধাকরবাবু। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লক্ষ্য করেছেন, দাদা আজকাল আর তাঁর কোন ক্লাস বাড়িতে নেন না। তাঁর ছাত্রীদের আসা যাওয়া খুব কম। লক্ষ্য করেছেন ব্যাপারটা ? হয়তো আমার জন্যেই—। ছি ছি ছি।'

আমি বললাম, 'না না, তা কেন হবে। হয়তো আপনার কোন পুরোন বান্ধবী অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলেন।'

সুধাকরবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। কিন্তু কে ? কে সে হতে পারে ?'

অসহায়ভাবে স্মৃতির তলদেশ যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন সুধাকরবাবু, সে কে ? সে কে ?

মাথার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল বুলাতে লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'যেই হোক ভারি রূপবতী, শুধু রূপ নয়, লাবণ্যে ভরা। লাবণ্যে ভরা মুখ মমতায় ভরা বুক। আমি অমন আর দেখিনি। হয়তো আমি তার কাছে কোন অপরাধ করিনি।'

আমি বললাম, 'না না, অপরাধ করবেন কেন ? আপনি ওসব চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিন।'

কিন্তু আমি যতই অন্য প্রসঙ্গ তুলি সুধাকরবাবু যেন কিছুতেই স্বস্তি পান না। খানিকক্ষণ বাদে বাদে আবার ওই কথায় ফিরে আসেন।

'জানেন তার স্পর্শ আমি যেন এখনো অনুভব করতে পারি। অদ্ভুত অদ্ভুত। তার তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত কাব্য, সমস্ত ধনরত্ন উজাড় করে দিলেও তার তুলনা হবেনা। পৃথিবীতে স্পর্শসুখের তুলনা নেই ! এ শুধু দেহের সঙ্গে নয়, সত্তার সঙ্গে সত্তার স্পর্শ। এর বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।'

সুধাকরবাবুর চোখমুখ এক অদমনীয় বাসনার আভায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। যেন আগুনের আঁচ লেগেছে।

আমি চুপ করে থাকি। এ অবস্থায় ওঁকে বাধা দিয়ে লাভ নেই, বরং সব বলতে দেওয়া ভালো।

সুধাকরবাবু বলতে থাকেন, 'অথচ ওই প্রথম। বিশ্বাস করুন, জীবনে আমি কোনদিন আর কাউকে ঠিক অমন করে— । সেই প্রথম। সেই প্রথমা। প্রথমা আর পরমতমা। কিন্তু আশ্চর্য আমি তার নাম মনে আনতে পারছিনে। মুখখানা চোখের সামনে আসতে আসতে মিলিয়ে যায়। কে হতে পারে ? আশ্চর্য।'

আমি বললাম, 'আপনি বরং কোন সাইকোলজিস্টের কাছে যান। তিনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'খবরদার ওদের নামও আমার কাছে করবেন না। ওরা দুনিয়ায় ডাক্তারি ছাড়া কিছু জানে না। কাব্য বলুন সাহিত্য বলুন সবই ওদের কাছে রোগের বীজাণুতে ভরা। মনের ডাক্তারে আমার দরকার নেই। তার চেয়ে মনের মানুষ অনেক ভালো।'

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, তাতে তিনি আরো উত্তেজিত হবেন। বরং সুধাকরবাবুর কথায় সায় দিয়ে চললে ওঁকে শান্ত রাখা যায়।

তারপর আমি মাস দেড়েক ওঁর আর কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লেখার ব্যাপারে বাইরের তাগিদের সঙ্গে অন্তরের তাগিদে মেলানো সহজ নয়। অথচ সে চেষ্টা আমাদের অনবরতই করতে হয়।

কিন্তু এ কী ! আমি ঘুরে ফিরে সুধাকরবাবুদের বাড়ির কাছেই এসে পড়েছি। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। তারপর বাস যখন এল উপচে পড়া যাত্রীদের দেখে ঢুকবার আর সাহস হলনা। দ্বিতীয় রথ কখন আসবে ঠিক নেই। নিজের মনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলাম। ঘুরে ঘুরে একেবারে সুধাকর বাবুদের বাড়ির কাছে হাজির। আমার গাটা শির শির করে উঠল।

ধারে কাছে আলো নেই, শব্দ নেই। গলির প্রান্তে পুরো বাড়িটা আবছা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উন্মাদাগারই বটে। কিন্তু নিজের মনের সেই অস্বস্তিকর ভাবটুকু জোর করে কাটিয়ে উঠলাম। ভাবলাম এসেই যখন পড়েছি অমিতাদেবীর কাছ থেকে বইগুলি চেয়েই নিয়ে যাই। সুধাকরবাবুর বারবার অনুরোধে ডস্টয়েভস্কির সেটটা তাঁকে ধার দিতে হয়েছিল। বইগুলি সত্যিই এখানে ফেলে রেখে আর লাভ নেই।

কড়া নাড়তেই সামনের ঘরে আলো জ্বলল। অমিতাদেবীই এসে দোর খুললেন। প্রথমে একটু অবাক হলেন। দ্বিতীয়বার আমাকে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেননি। হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আসুন। কী ব্যাপার।'

আমি লজ্জিত হয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললাম, 'ইয়ে, মানে ভাবলাম বইগুলি নিয়ে যাই।'

অমিতাদেবী বললেন, 'সেই ভালো।'

দোরটা ভেজিয়ে দিলেন তিনি। তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনি তো চা ভালোবাসেন। আর এক কাপ— ।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না না আর চা নয়। আপনি বরং বইগুলি— । সুধাকরবাবুর তাগিদে অতিষ্ট হয়েই ওসব বই ওঁকে দিয়েছিলাম, নইলে দেওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।'

অমিতাদেবী বললেন, 'বইতে কোন ক্ষতি হয়নি। ইদানীং কোন বইয়ের পাতাই উল্টে দেখবার তার ক্ষমতা ছিল না। আমি অনেক আগেই ওগুলি সরিয়ে রেখেছিলাম।'

বললাম, 'ভালোই করেছিলেন। ইদানীং কি করতেন সুধাকরবাবু ?'

তিনি বললেন, 'খেয়ালীপনার কি কিছু ঠিক ছিল ? হিজিবিজি লিখত, নিজের মনে মনে বক বক করত।'

আমি একটুকাল চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'কিন্তু ফের এমন হঠাৎ উদ্দাম— ।'

অমিতাদেবী একটু চোখ নামিয়ে নিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি তো জানেন সব। উদ্দামতা ওর মনে সব সময়েই ছিল। প্রাণপণে চেপে রাখতে চেষ্টা করত। সেদিন সারাদিন কিছু খেলনা। রাতটাও উপোসে কাটাবার মতলব। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে দোর খোলালাম। কিন্তু আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে আরো ক্ষেপে গেল। বাঘের মত তেড়ে এল একেবারে।'

আমি বললাম, 'তারপর ?'

তিনি বললেন, 'আমি কিছুতেই সরে যেতে পারলাম না। দু হাত দিয়ে আমার দুই কাঁধ ততক্ষণে সে চেপে ধরেছে। বল সে কে ? বলতেই হবে তোমাকে। আমি যত বলি ঠাকুরপো ছাড়ো ছাড়ো, সে কেউ নয়, কেউ নয়। আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। কিন্তু পাগল কি আর সে কথা শোনে ?'

অমিতাদেবী থামলেন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আপনি কি সত্যিই ঠাট্টা করেছিলেন ?'

অমিতাদেবী আমার মুখের দিকে তাকালেন। দুচোখের কোণে জল টল টল করছে। একি শোক না অনুশোচনা ?

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ।'

দুজনে ফের একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনি বললেন, 'যাই বইগুলি নিয়ে আসি।'

পৌষ ১৩৬৪

শুভার্থী

হেমাঙ্গ রায়ের বৈঠকখানায় রবিবারের আড্ডা জমেছিল। জনতিনেক বন্ধু এসে জমায়েত হয়েছিলেন, আরও দু-একজন আসবেন এমন প্রত্যাশা ছিল। যুবাদের নয় প্রৌঢ়দের আড্ডা। ঘর সংসার, স্ত্রীপুত্র, নাতি নাতনির কথা প্রায়ই উঠে পড়ছিল। সেই সঙ্গে চোখের ছানি, দাঁতের যন্ত্রণা, ব্লাড প্রেসার, প্রম্বসিসের প্রসঙ্গকেও পথ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আগন্তুকদের মধ্যে কেমিস্ট্রির প্রফেসার ভবেশ দত্তগুপ্ত, ইঞ্জিনীয়ার শীতাংশু চৌধুরী এবং ভেটরিনারি কলেজের রিটায়ার্ড সার্জন শৈলেন সেহানবীশ তাঁদের পদমর্যাদায় এবং হেমাঙ্গর সঙ্গে বহুদিনের সৌহার্দ্যের জোরে ঘরের দুটো ইজিচেয়ার আর তক্তপোশের তাকিয়াটা দখল করে বসেছিলেন। এছাড়াও আরো দু-চারজন ছিলেন। তবে তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। তাঁরা নীরব শ্রোতা, কি বিশেষ কেউ-না-গোছের ব্যক্তি। বলবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। হেমাঙ্গবাবুর তিন বন্ধু বিশেষ করে অধ্যাপক আর শল্যচিকিৎসক আসর মাত করে রেখেছেন।

অতিথিবৎসল বন্ধু হিসাবে হেমাঙ্গ রায়ের সুনাম আছে। দামি চা এবং গরম সিঙ্গাড়া তিনি অকৃপণভাবেই বিলিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বন্ধুদের কথা বলতে দিয়ে নিজে মৃদু ও মিতভাষীর ভূমিকা

নিয়েছিলেন।

বউবাজার অঞ্চলে হেমাঙ্গবাবুর ছোট একটি প্রেস আছে। তার আয়ে সংসার মোটামুটি চলে যায়। বন্ধুদের ধারণা, বিনা আয়েও চলত। কারণ হেমাঙ্গর সংসার খুবই সংক্ষিপ্ত। বছর দশেক হল স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলে মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এলাহাবাদে, ছেলের কর্মস্থল দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে। কলকাতা ছেড়ে দুজনের কারো কাছেই থাকেন না হেমাঙ্গবাবু। পুরোন চাকর শম্ভুই তাঁর এখানে সহায় ও সম্বল।

হেমাঙ্গবাবু আদর্শবাদী মানুষ। পান বিড়ি সিগারেট খান না। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন কি জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে যান, সেখানে গিয়ে বাড়ির লোকের মত অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেন কি দরকার হলে পোলাও মাংস রসগোল্লা সন্দেশ পরিবেশনও করেন, কিন্তু হাজার মাথা কাটলেও এক কাপ চা ছাড়া কিছু মুখে দেন না। পঞ্চাশের ওপারে পৌঁছেও হেমাঙ্গবাবু নিয়মিত ডন বৈঠক করেন, অবশ্য কাউকে দেখিয়ে নয়, এমন কি শম্ভুরও চোখের আড়ালে। নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত যেমন কাউকে দেখিয়ে মাজেন না, তেমনি অনেক নিত্যকর্মই তিনি গোপনে সারতে ভালোবাসেন। বন্ধুদের ধারণা, এই সংযমের জন্যেই উত্তর পঞ্চাশে হেমাঙ্গের দেহে ভুঁড়ির আভাস দেখা যায় না। দাঁত আর চোখও তিনি অক্ষত রাখতে পেরেছেন। হেমাঙ্গ সুপুরুষ নন, তবে স্বাস্থ্য ভালো। নিজের বয়সকে অন্তত বছর দশেক কমিয়ে বলতে পারেন, যদিও তা বলেন না। কারণ হেমাঙ্গ যেমন ছেলেবেলায় পড়া স্বাস্থ্যসুধা শুধু মুখস্থ করেননি, তাকে অনুসরণ করেছেন, তেমনি বর্ণপরিচয়ের প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত নীতিশাস্ত্রের মূল আর মোটা কথাগুলিও অসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। বন্ধুরা এই নিয়ে আগে আগে হেমাঙ্গকে ঠাট্টা করেছেন, এখন গোপনে গোপনে ঈর্ষা করেন। ভবেশবাবু বলেন, "হেমাঙ্গর অর্ধাঙ্গ নেই, তবু কী সুখে আছে তাই দেখ।"

শৈলেনবাবু বলেন, "নেই বলেই আছে। দেখ না বিধবারা কিরকম স্বাস্থ্যবতী হয় আর বাঁচেও বহুদিন। আমাদের অর্ধেক খায় স্ত্রী, বাকি অর্ধেক পরস্ত্রী। আমাদের গজভুক্ত কপিত্থ না হয়ে কি জো আছে ?"

এর আগে শৈলেনবাবু বলতেন, "হেমাঙ্গ হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করলেও আসলে ওর বিদ্যা দ্বিতীয় ভাগের বেশি এগোয়নি। ওর যে সুখ তা শিশুর সুখ, মূর্খের সুখ। ওর কেবল বয়সই বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বাড়েনি। নাতিনাতনিকে শোনাবার মত একটি গল্পও জীবনে করতে পারবে না।"

আজকাল আর অত জোরে হেমাঙ্গকে পরিহাস করতে পারেন না শৈলেনবাবু। ঠাট্টা বিদ্রূপের ধারটা কমে আসছে। বাড়ছে থ্রম্বসিসের ভয়। তবু শৈলেনবাবু এখনও সভায় পতিত্ব করেন। ভাঙলেও মচকান না।

আজকের তর্কটা উঠেছিল পতিতাবৃত্তি নিয়ে। ভারত সরকার আইন করে যে একে বন্ধ করেছেন, এতে ভালো হয়েছে কি হয়নি তাই নিয়ে ভবেশবাবু আর শৈলেনবাবুর মধ্যে জোর কথা কাটাকাটি চলছিল।

ভবেশবাবুর বক্তব্য, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট যে দু-তিনটে ভালো কাজ করেছেন তার মধ্যে একটি হ'ল এই প্রস্টিটিউশন নিষিদ্ধকরণ। এতে অধঃপতন থেকে পুরুষরাও বাঁচবে, মেয়েরাও বাঁচবে। এ জাতের জন্যে এই ধরনের মোহমুদ্গরই দরকার। যারা শত শত বছর ধরে পাঁজির শাসন মেনে এসেছে, মনুর অনুশাসন মুখস্থ করেছে, রাতারাতি নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর তাদের ছেড়ে দিলে হয় কুফল ফলে, না হয় কোন ফলই ফলে না। আইন আর অর্ডিন্যান্সের গদা হাতে জাঁদরেল ডিক্টেটর এদেশের পক্ষে এখন দরকার। এই সব নাবালকদের মানুষ করতে হলে শাসনই একমাত্র পথ। আইন করে ছোট বড় সব কু-অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। তবে আইনের প্রয়োগটা যেন যথাযথ হয়। নইলে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে থাকবে। যেমন ঢুকে বসেছে ওষুধের মধ্যে জল, দুধের মধ্যে জল, চালের মধ্যে কাঁকর, জেলখাটা দেশসেবকের মধ্যে কামিনীকাঞ্চন আর পদাধিকারের লোভ। মুগুর নিয়ে শুধু মোহকে ভাঙলে হবে না, লোভকেও চুরমার করা চাই। ভবেশবাবুর দুঃখ এই যে, সরকার মদ্যপান আর লাম্পট্যকে যতখানি চোখ রাঙিয়েছেন চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি,

শোষণকে ততখানি শায়েস্তা করবার দিকে ঝোঁকেননি। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধ বেশি ছাড়া কম গুরুতর নয়। তবু যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ। পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে সবকার যে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, তাতেই ভবেশবাবু খুশি।

শৈলেনবাবু একটার পর একটা সিঙ্গাড়া চালাতে চালাতে বললেন, "দুনিয়াটাকে তোমরা হেমাঙ্গর মতই বড় সহজ সরল করে দেখছ হে ভবেশ। দুনিয়াটা আর যাই হোক দ্বিতীয়ভাগের পাতা নয়। কি পুরুষ কি মেয়ে প্রত্যেকের মনেই বহুভোগের বাসনা প্রবল। এটা যুগযুগান্তরের সংস্কার। একে আইনের ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে পারবে না। এইসব সাপ সাপিনীরা তাড়া খেয়ে ইঁদুরের গর্তে লুকোবে, তার ফল আরো খারাপ হবে। আইন করে বন্ধ কোরো না, শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে শোধরাও। যারা দেহ বিক্রি করে তাদের অন্য পণ্যের সন্ধান দাও। যারা দেহ কিনতে যায় তাঁদের সাহিত্যশিল্প সম্ভোগ করতে শেখাও। সমাজের সব স্তরে অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা কর। যখন ছুঁলে আর জাত যাবে না, তখনই একটুকু ছোঁয়া লাগার মাহাত্ম্যটা সবাই বুঝতে পারবে। আমি মরে গেলেও স্বৈরাচারকে তক্তে বসাব না। মানুষ নিজেই নিজেকে শোধরাবে। তাতে যদি হাজার বছরও লাগে লাগুক।"

ভবেশবাবু এবার উত্তেজিত হয়ে আরও তর্ক জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, "তোমার এই উদারতার মানে হল সুবিধাবাদ। তুমি কোন গণতন্ত্রের যুক্তিতে গণিকাতন্ত্রকে সমর্থন করছ আমি জানিনে। তুমি তোমার নিজের পাস্টকে ভালোবাসতে পার, তার সাফাই গাওয়ার জন্যে দিনকে রাত করতে পার কিন্তু আমি আমার জাতের ফিউচার চাই।"

শৈলেনবাবু হেসে বললেন, "তার মানে একদল মাস্টার আর একদল পুলিসই তোমাকে সেই স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিয়ে দেবে। বেত, চকখড়ি আর হাতখড়ি। কি বল?"

কোঁদলটা বেশ জোরাল হয়ে উঠছে, আমরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে কবির লড়াই দিব্যি উপভোগ করছি, হঠাৎ হেমাঙ্গবাবু মাঝখানে পড়ে সব মাটি করে দিলেন। তিনি হেসে বললেন, "আরে থামো থামো অত মাথা গরম করছ কেন? ছেলেরা রয়েছে। ওরা কী ভাববে। তার চেয়ে আমি একটা গল্প বলি, ঠাণ্ডা হয়ে শোন।"

শৈলেনবাবু বললেন, "তুমি আবার গল্পের কি জানো। জীবনে স্ত্রী ছাড়া কারোর মুখ দেখনি। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর হিন্দু বিধবার মত একাদশী সম্বল করেছ। তোমার গল্প মানে তো হিতোপদেশের গল্প। ও গল্প ভবেশকে শোনাও যে চিরকাল নাবালক হয়ে রইল। আমি উঠি।"

কিন্তু হেমাঙ্গবাবু তাঁর হাত চেপে ধরলেন, "আরে বসো বসো। এই বয়সে অত অস্থিরতা কি মানায়? তোমাদের তর্ক শুনে আমার অনেকদিনের পুরোন একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট যা আজ করছেন, আমি তা বিশ বছর আগে করতে চেষ্টা করেছিলাম।"

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "বল কি!"

শৈলেনবাবু নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন।

হেমাঙ্গবাবু একবার ঘরের অন্য দু তিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বন্ধুদের ছাড়া আর সবাইর অস্তিত্ব উপেক্ষা করে বলতে শুরু করলেন:

"তুমি ভুল করছ শৈলেন, আমার এ গল্পে কোন উপদেশ নেই। হিত আছে কিনা তা জানিনে। তবে এ গল্প তোমার পক্ষেও যাবে না, ভবেশের পক্ষেও না। তোমাদের কারো পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে এ গল্প বলছিনে। তোমাদের আলাপ আলোচনায় আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল তাই তোমাদের শোনাচ্ছি। গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। কারণ সেও এক ছলনা। তাতে না জমে গল্প, না জোর পায় উপদেশ। তাছাড়া তোমার নির্দেশ উপদেশ শোনার বয়স পার হয়ে গেছে।

আমার তখন নিজের প্রেস ছিল না। আর একজনের প্রেসের ম্যানেজার ছিলাম। মাইনে বেশি পেতাম না তবে মানসম্মানটা ছিল। ঘরের স্ত্রী যেমন শ্রদ্ধা করতেন কি ভালবাসতেন, অফিসের মালিক আর কর্মচারীরাও তেমনি আমার কথা শুনতেন। তোমরা যতই ঠাট্টা কর, দুনিয়াটা যার যার

নিজের অভিজ্ঞতায় গড়া। আমার জীবন আমাকে যে গণ্ডীর মধ্যে রেখেছে তার বাইরে আমার যাওয়ার জো নেই। যে মদ খায় সে তার সুখও জানে দুঃখও জানে। যে খায়না সে অনেকখানি কল্পনা করে নেয়, কিন্তু সবটুকু জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একথা ভাবাও ভুল, জীবনে যত জটিলতা যত গভীরতা ওই মদের স্বাদের মধ্যেই রয়েছে। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই কথা। সংসারে অনেক মানুষ আছে যাদের মা বোন স্ত্রী মেয়ে ছাড়া আর কোন নারীর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয় না। কেউ বা ভয় পেয়ে প্রবৃত্তিকে দমায়, কারো বা প্রবৃত্তি আপনিই দমে থাকে। কিন্তু তাই বলে তার জীবন যে অজটিল কি অগভীর হয় তা নয়। মেয়েরা হয়তো জটিলতার আধার। কিন্তু একমাত্র আধার বলা কি ঠিক? মানে আমি বলতে চাই শৈলেনের ধরনের অভিজ্ঞতা আমার না থাকলেও আমি জীবনে নানা দুঃখ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি, নিজের অনেক ক্ষুদ্রতা দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করেছি, কখনো হেরেছি, কখনো জিতেছি। শৈলেনের আফশোস আমি অনেক অভিজ্ঞতার স্বাদ না পেয়েই মরব। আমি শুধু শিশুপাঠ আর ধাবাপাত বগলে করেই সংসার থেকে বিদায় নেব। আমি ভাবি যেসব অভিজ্ঞতার বড়াই শৈলেন করে সেগুলি না হলেও ওর কোন ক্ষতি ছিল না। জীবনের স্বাদ-বিস্বাদের সঙ্গে পরিচয় তার অন্যপথেও আসতে পারত।

প্রথম যৌবনে অবশ্য আমি এমন নরম সুরে কথা বলতাম না। গোঁড়ামিটা পুরোমাত্রায় ছিল। প্রেসের কর্মচারীদের ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করতে পারতাম না। বকে ধমকে ফাইন করে তাদের অস্থির করে তুলতাম। মালিক এতে খুশি হতেন। তিনি ভাবতেন, আমি তাঁর পক্ষে। আমি ভাবতাম আমি ন্যায়ের পক্ষে, যুক্তির পক্ষে। আমি সাবঅর্ডিনেটদের বোঝাতাম, কাজে ফাঁকি দিলে মালিকের ক্ষতির চেয়ে তোমাদের ক্ষতি হবে বেশি। তোমরাই অলস হবে, অযোগ্য হবে, চরিত্র হারাবে। মন দিয়ে কাজ করবার শক্তিই তোমাদের চলে যাবে। এখানে যদি না পোষায় তোমরা বরং অন্য কোথাও যাও, অন্য কোন কাজ ক'রো। কিন্তু অনিচ্ছায় আধা ইচ্ছায় ষোল আনার জায়গায়, শক্তিসামর্থ্যের মাত্র চার আনা দিয়ে নিজেদের অমন করে নষ্ট কোরো না। তারা খুশি হত না। আমাকে ভাবত মনিবের পক্ষের দালাল। মালিককে বলতাম গরু ঘোড়ার কাছ থেকে যথেষ্ট কাজ পেতে হলে উপযুক্ত দানাপানি দেওয়া দরকার। মানুষের জন্যে তো দানাপানির চাইতেও অনেক বেশি কিছু চাই। মালিক মুখ ভার করতেন।

আমার এসিস্ট্যাণ্ট ছিল অনিল বিশ্বাস। একসঙ্গে কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম। তাকে আমি চাকুরি দিয়ে আনি। তার কৃতজ্ঞতাও ছিল বন্ধুপ্রীতিও ছিল। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ছিল না। একদিন তার বউ আমার বাড়িতে এসে কেঁদে পড়ল। কী ব্যাপার? না, অনিল মাইনের সব টাকা সংসারে দেয় না। বীডন স্ট্রীট অঞ্চলে আর একটি মেয়ের কাছে যায়। সেখানেই অর্ধেক টাকা খরচ করে আসে। এদিকে ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের সমানে যত্ন করতে পারে না, স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ মেটাবার শক্তি নেই। এ কী বদখেয়াল!

আমার স্ত্রী বললেন, 'তোমার কথা তো সবাই শোনে। তোমার হাতে ক্ষমতাও অনেক; তুমি অনিলবাবুকে রক্ষা কর। ভদ্রলোককে ওই রক্ষিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো। নাহলে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

আমার শক্তির ওপর আমার স্ত্রীর এই গভীর বিশ্বাস দেখে আমি খুব খুশি হলাম। আমার বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ নেই, প্রচুর অর্থোপার্জনের ক্ষমতা নেই। সহিংস অহিংস দুরকমের রাজনীতিই কিছু কিছু করেছি কিন্তু কোন দল কি উপদলের নেতৃত্ব আমার হাতে আসেনি। তবু আমি আমার নিজের রাজ্যে একেশ্বর হয়েই ছিলাম।"

শৈলেনবাবু হেসে বললেন, "আর স্ত্রীর হৃদয়েশ্বর সে-কথাও বল।"

হেমাঙ্গবাবু বলতে লাগলেন,'আমি আমার স্ত্রীকে ভরসা দিলাম। অনিলের স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আপনার কোন ভয় নেই। আমি যেমন করেই পারি ওর এই বদখেয়াল ছাড়াব।

তারপর অফিসে গিয়ে অনিলকে নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খানিকক্ষণ পারিবারিক কর্তব্য দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠার মহিমা নিয়ে বেশ একটু ভূমিকা বিস্তার করলাম। তারপর বললাম, 'অনিল, তোমার চালচলন সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। একটা বদঅভ্যাস

তোমাকে ছাড়তে হবে।'

অনিল হেসে বলল, 'তুমি কি আমার নস্যি নেওয়ার কথা বলছ হেমাঙ্গদা ?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'নস্যি নেওয়াটা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু আমি যে সে কথা বলছিনে তা বুঝতে তোমার নিশ্চয়ই বাকি নেই।'

অনিল বলল, 'তবে কি সিগারেটের কথা বলছ ? কিন্তু সিগারেট তো আমি বেশি খাইনে। বিড়ির ওপর দিয়েই তো চালিয়ে দিই।'

আমি বললাম, 'কেন কথা বাড়াচ্ছ ? আমি সে কথাও বলছিনে।'

অনিল হেসে বলল, 'তোমার কঠিন দৃষ্টি একেবারে তরল পদার্থটার ওপর গিয়ে পড়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তাও তো আমি খুব খাইনে। পয়সা কোথায় যে খাব ? মাসে দু-একবারের বেশি জোটে না। তাও নিতান্ত ওষুধের মাত্রায়।'

আমি বললাম, 'তোমার রোগের উপযুক্ত ওষুধই বেছে নিয়েছ। কিন্তু চিকিৎসার ভার নিজের ওপর না রেখে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার কথা শোন, যে স্ত্রীলোকটির কাছে তুমি যাতায়াত কর, সেখানে আর যেয়ো না।'

অনিল প্রথমে খুব চটে উঠল। বলল, 'এসব তোমাকে কে বলেছে ? যত সব বাজে কথা।'

আমি বললাম, 'মোটেই বাজে কথা নয়। দুশ্চরিত্রদেব সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তারা সত্য কথা বলতে ভয় পায়।'

অপমানটা অনিলকে খুব লাগল। তার গৌরবর্ণ মুখ রাগে টকটক করতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'বেশতো ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয় তাতে তোমার তো কোন ক্ষতি নেই। তুমি দেখবে, আমি অফিসের কাজকর্ম ঠিকমত করে যাচ্ছি কিনা, তুমি দেখবে নিচুওয়ালা কি ওপরওয়ালা কারো সঙ্গে আমি কোন খারাপ ব্যবহার করেছি কি না। তা যদি না করি, আমার প্রাইভেট লাইফে উঁকিঝুঁকি মারবার তোমার অধিকার কিসের ? আমি নস্যিই নাকে গুঁজি কি কোন নটীকে বুকে তুলি সে খোঁজে তোমার দরকার কিসের ?'

আমি বললাম, 'অনিল দরকার আছে। তুমি আমার বন্ধু। তোমার ভালোমন্দ দেখবার দায়িত্ব আমার ওপর আপনিই এসে পড়ে, আমার স্ত্রী কি ছেলেমেয়ের অসুখবিসুখে তুমি যেমন ছুটে যাও তেমনি আমাকেও ছুটে আসতে হয়। কারণ এও একধরনের অসুখ।'

অনিল বলল, 'অসুখ।'

আমি বললাম, 'অসুখ ছাড়া কি।'

অনিল বলল, 'কিন্তু এইসব নেশা যদি আমাকে ইস্পেটাস দেয়, আমার কাজকর্মের দ্বিগুণ উৎসাহ আর শক্তি জোগায়, তাহলে এইসব অভ্যাসকে তুমি অসুখ বলবে কেন ?'

আমি বললাম, 'প্রথমে এই ধরনের নেশায় শক্তিসামর্থ্য বাড়ে বলে তোমাদের যে ধারণা আছে তা ভুল। দাদ থাকলে তা চুলকিয়ে আরাম পাওয়া যায় তাই বলে দাদ পুষে রাখাটা শরীরের পক্ষে ভালো নয়। মলম দিয়ে তা সারিয়ে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এইসব ডিসিপেশন তেমনি সভ্যতা সংস্কৃতির দাদ। এগুলিকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলেই সভ্যতা এগোয়। তুমি কিছুতেই এ একগুলি বদঅভ্যাসকে সদঅভ্যাস, কি তোমার জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য বলে প্রমাণ করতে পার না। তা যদি পারতে তাহলে অন্ধদের রাতকে দিন বলে চালিয়ে দিতে পারতে। কিন্তু যত গায়ের জোর গলার জোরই আমাদের থাকুক না সে ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।'

অনিল গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেল। দিনকয়েক আমার ধার দিয়েও ঘেঁষল না। দেখা হলে চোখে চোখে তাকায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। সামনাসামনি পড়লে পাশ কাটিয়ে যায়। আগে আগে আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে দু-একদিন যেত। আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করত। এখন সে সব বন্ধ। আমি বুঝতে পারলাম বন্ধুকে হারাতে বসেছি। বন্ধুত্ব রক্ষার একটা বড় শর্ত হল তার দোষগুলি উপেক্ষা করে গুণগুলিকে দ্বিগুণ করে বলা। হিত কথার চেয়ে মনোহর কথা বলতে জানা। কুর্বন্নপি ব্যলিকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ এব সঃ। যাকে ভালোবাস তার ভুলো দোষ গুণ ধর। কি দোষগুলি সুদ্ধ ভালোবাস। কিন্তু এই রীতিনীতি আমি মানতে পারিনি। তার ফলে

অনেক বন্ধুবিয়োগ হয়েছে। অনিলের সঙ্গেও আমার চায়ের টেবিলের বন্ধুত্ব ছিল না। আমি ভাবলাম ওর যদি ভালোই না করতে পারলাম, ওকে ভালোবাসলাম কী করে।

অনিল আমার কাছে এল না কিন্তু আমিই ওকে ফের একদিন পাকড়াও করলাম, বললাম, 'অনিল ছেড়েছ ওসব ?'

অনিল বলল, 'তুমি কি আমার বন্ধু না জ্যেঠামশাই ?'

আমি বললাম, 'বন্ধুকেও কোন কোন সময় জ্যেঠামশাই হতে হয় যেমন স্ত্রী মাঝে মাঝে দিদি কি মায়ের রোল নেয়। দেখ সম্পর্কটা শুধু সম্বোধনের মধ্যে নেই। তুমি আমার কুটুম্ব না বন্ধু না আত্মীয়, ভাইপো না বেয়াই না মেসোমশাই সেটা বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে ভালোবাসার সম্পর্ক। মুখের সম্বোধনটা যাই হোক না কেন। সেই ভালোবাসার দায়িত্ব হল ভালো চাওয়া, ভালো করা। স্ত্রী ছাড়া অন্য যে মেয়েটাকে তুমি ভালোবাস তা তোমার স্পর্শসুখ ছাড়া কিছু নয়। তার অনুভূতি চামড়াব ওপরে, চামড়ার নিচে তা পৌঁছোয় না।'

অনিল প্রতিবাদ করে বলল, 'তুমি তা কী করে জানলে ? আর যদি তাই হয় তাতেই বা ক্ষতি কী ? শরীরের পক্ষে অস্থি মেদ মজ্জা যেমন দরকার, চামড়াটাও তেমনি। আমার চামড়া তোমার কোন কাজে লাগবে না। হরিণ কি বাঘের চামড়া নয় যে পেতে তুমি যোগাসনে বসতে পারবে। কিন্তু তাই বলে আমার চামড়ার দাম আমার কাছে কম নয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তার চেয়ে তোমার স্ত্রীর হৃদয় মনের দাম বেশি।'

অনিল বলল, 'আমি তো তাকে বঞ্চিত করছিনে। তার যা প্রাপ্য আমি তো তাকে দিয়েই যাচ্ছি। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ আমার সাধ্যমত আমি শুধু তার ভাতকাপড়ই যোগাইনে, সাবান স্নো থেকে শুরু করে বছরে দু-একখানা গয়নাগাঁটিও দিই। অন্তরের ভালোবাসাও যে কম দিই তা নয়। মালতীর ওখানে যাই নিতান্তই একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে। এমন নয় যে, মালতীকে আমি বিয়ে করে ঘরসংসার পেতেছি কি তার কোলে ছেলেমেয়ে এনে দিয়েছি। কোনক্রমেই মালতী আমার স্ত্রীব সতীন নয়। তাব এত দুশ্চিন্তা, এত হিংসা-দ্বেষ কিসের ?'

আমি বললাম, 'তোমাব মত জ্ঞানপাপী আর দুটি নেই। মালতীকে ভালো না বেসেও তুমি তার কাছে যাও। আব স্ত্রীকে ঠকিয়েও তুমি তা স্বীকার কবতে চাও না। ভালোবাসাটা কি ফ্রাকশন আর ডেসিমেলের অঙ্ক যে তুমি একে খানিকটা ওকে খানিকটা তাকে খানিকটা দেবে ?'

অনিল বলল, 'একটু চিন্তা করে দেখ সংসারে দেওয়া নেওয়ার ধরণটাই তাই। আমরা অংশকেই সদর্পে পূর্ণ আব অখণ্ড বলে ঘোষণা কবি। আসলে পুরোপুরি একজন আর একজনকে দিতেও পারে না, নিতেও পাবে না, যদি পারত দু-চারদিনেব বেশি অখণ্ডতাকে সহ্য করতে পারত না।'

আমি বিবক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি যত তর্কই কব, মালতী না মল্লিকা ওকে তোমার ছাড়তেই হবে।'

আবও বললাম, 'যদি না ছাড়, এখানকার চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

অনিল একটু চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে গেল। ওকে চাকবি থেকে ছাড়াবার ক্ষমতা যে আমার আছে তা ও জানে।

একটু চুপ করে থেকে অনিল বলল, 'বেশ, আমাকে কয়েকদিন সময় দাও, আমি ভেবে দেখি।'

আমি হঠাৎ অনিলের হাত চেপে ধরে বললাম, 'অনিল, ভাববার কিছু নেই। তুমি আমার কথা শুনে চল, তোমার ভালোই হবে। দু-চারদিন একটু কষ্ট হতে পারে তারপর আর এসব কথা মনে পড়বে না। তুমি নিজেব মুখেই স্বীকার করেছ ব্যাপারটা একটা অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়। মালতীর সঙ্গে তোমার ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, যা আছে তা নিতান্তই নস্যি সিগারেটের নেশা। একজন বন্ধুর অনুরোধে তুমি কি সেই নেশা ছাড়তে পার না ?'

অনিল বলল, 'এসব অস্থায়ী সম্পর্কে ছাড়াছাড়ি তো অনিবার্য। তুমি আমাকে এই নিয়ে পীড়াপীড়ি না করে আমাকে আমার বুদ্ধিবিবেচনার ওপর নির্ভর করতে দাও।'

অনিল আর আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে না দেখে আমি খুশি হলাম। ও সেখানে গিয়েও

বলতে পারত, 'যাইনে। তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।'

কিন্তু তা না করে ও যে আমার কাছে সব স্বীকার করে আমার সঙ্গে তর্ক করে তাতে আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, ও যত তর্কবিতর্কই করুক আমার কথাগুলি উড়িয়ে দিচ্ছেনা, ভেবে দেখছে। আমিও যেমন অবসর সময় ওর কথাগুলি নিজের মনে নাড়াচাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করি অনিলও কি আর তা করে না ? আমি যে ওর শত্রু নই, হিতাকাঙ্ক্ষী তা তো অনিল বোঝে।

শুধু কাজের ফাঁকে আমার অফিসের চেম্বারে নয়, পার্কে কি গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে, রেস্টুরেণ্টে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম। তোমরা জিজ্ঞাসা করবে আমার কি অন্য কোন কাজকর্ম ছিল না ? নিশ্চয়ই ছিল। চাকরিবাকরির ব্যস্ততা, সাংসারিক চিন্তাভাবনা ছাড়াও কিছু দায়দায়িত্ব সবসময় জড়িয়ে থাকত। কারণ দল উপদলের মায়া তখনও একেবারে ছাড়তে পারিনি। তাছাড়া পাড়ার নাইট স্কুল, লাইব্রেরী আর দু-একটা অনাথ আশ্রমের সঙ্গেও একেবারে সম্পর্কহীন ছিলাম তা নয়। তবু এসব করেও সময় পেতাম। কী করে পেতাম তা এখন ভাবতে অবাক লাগে। একটা জেদ যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। যেমন করেই হোক অনিলকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। আমি কিছুতেই ওর কাছে হার মানব না। আমার সমস্ত মানসম্মান যেন এই হারজিতের মধ্যে ধরা রয়েছে। তোমরা প্যাশনের কথা বল। প্যাশনের কেন্দ্র শুধু যে সবসময় একটি মেয়েই হবে তার কোন কথা নেই। আরো অনেক বস্তু ব্যক্তি আইডিয়া কি আইডিয়াল তার স্থান নিতে পারে।

কিন্তু এত করেও আমি যখন শুনলাম, অনিল অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছে আর সে কাজ প্রায় ঠিক করে এনেছে, আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

অনিলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নাকি আমার হাত এড়াবার চেষ্টা করছ ?'

অনিল বলল, 'তোমার তো একজোড়া হাত নয়, দশজোড়া হাত। এড়িয়ে যাব কোথায় ? কিন্তু আমি যদি অন্য কোথাও একটা ভালো চান্স পাই, বন্ধু হয়ে তোমার কি তাতে আপত্তি করা উচিত ?'

আমি বললাম, 'তোমার যেখানে খুশি যেতে পার আমি আপত্তি করব কেন ? তবে সেই মেয়েটিকে না ছাড়লে তুমি আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।'

অনিল বলল, 'তোমার ছেলেমানুষি আর গেল না। আচ্ছা এক পিউরিট্যানের পাল্লায় পড়া গেছে। ধর যদি নাই ছাড়ি তুমি কী করবে শুনি ?'

আমি হেসে বললাম, 'কী করব ? আমার চেহারাখানা তো দেখেছ। তাছাড়া আমার কিছু চেলাচামুণ্ডাও আছে। তারা তোমাকে আচ্ছা করে মার লাগাবে। দেহের সুখ যাদের খুব প্রিয় দেহের দুঃখকেও তারাই সবচেয়ে বেশি ভয় করে। শরীরের কষ্ট সন্ন্যাসীরাই সইতে পারে, ভোগীরা পারে না।'

হাসতে গিয়ে অনিল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তোমরা সব পার, তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। নীতির নামে, ভগবানের নামে মানুষের ওপর তোমরা যত নির্যাতন করেছ দুর্নীতি তার দশভাগের একভাগও পারেনি।'

আমি শুধু বন্ধুকে মারের ভয় দেখিয়েই নিরস্ত রইলাম না, আমার এক চেলাকে ওর পিছনে লেলিয়ে দিলাম। এর আগে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও মালতীর ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু আমার গোয়েন্দা গিয়ে গলির নাম নম্বর ঠিক নিয়ে এল।

তারপর আমি নিজেই গেলাম। দুপুরে নয়, রাত্রেও নয়, বিকেল বেলায়। অফিস থেকে একটু আগেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম। ও-পাড়ায় আমি যে ঠিক প্রথম গেলাম তা নয়। আমাদের এক কর্মী পুলিসের ভয়ে ওই ধরনেরই একটা বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়েছিল, তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে আমি গিয়েছি। পাড়ার এক ধুরন্ধর আমার চেনা এক ভদ্রঘরের মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে ওই অঞ্চলে রেখেছিল। মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল তা নিয়ে। সেই উপলক্ষেও দু-একবার যাতায়াত করতে হয়েছে। তবু বাড়িটার মধ্যে ঢুকতেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল।

দোতলা বাড়িটায় যেন বিয়েবাড়ির উৎসব লেগেছে। সাজসজ্জা প্রসাধনের পালা চলছে তখন।

মালতীর নাম বলতে দোতলায় ওর ঘরখানা একজন লোক আমাকে দেখিয়ে দিল। ও তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। আমার নাম শুনে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। আঠের উনিশ বছর বয়স। কি সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে। শামলা রং। কিন্তু দেহের পরিপুষ্ট গড়নে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ডৌলে শুধু রূপ নয়, এমন এক লাবণ্য আছে যা ওপাড়ার কোন মেয়ের মধ্যেই আশা করতে পারিনি। তোমরা জানো রূপ যারা ভাঙিয়ে খায় তাদের রূপ বেশিদিন থাকে না, যৌবনও তাড়াতাড়ি পালায়। বুঝতে পারলাম মালতী অল্পদিন এসেছে। ঝরবার সময় আজও হয়নি। বুঝতে পারলাম অনিল একেবারে অকারণে মজেনি।

মালতী বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার গায়ে এখনকার মতই গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পরনে মোটা সাদা ধুতি। পায়ে কেম্বিসের জুতো। চেহারার দৈর্ঘ্যটা অন্যের শ্রদ্ধা আর সমীহা আকর্ষণের কাজে লাগে।

আমি বললাম, 'আমার নাম হেমাঙ্গশঙ্কর রায়।'

মালতীর মুখ একটু যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। গলাটা কেঁপে গেল যেন। কিন্তু কাঁপা গলাও কী মিষ্টি শোনায়।

মালতী বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' একটু এগিয়ে এসে সে আমার জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ওর বেণীটি আমি লক্ষ্য না করে পারলাম না। সেই বেণী ওর দেহের মতই সুদীর্ঘ।

আমি বললাম, 'তুমি আমার নাম তাহলে অনিলের মুখে শুনেছ?'

অনিলের নাম আমার মুখে শুনে ও লজ্জা পেল। আস্তে আস্তে বলল, 'শুনেছি।'

আমি বললাম, 'তাহলে এও শুনেছ আমি তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছি।'

মেয়েটি বলল, 'তিনি আজকাল আর বেশি আসেন না।'

আমি বললাম, 'আমি চাই যাতে একেবারেই না আসে। সেই কথা বলতেই আজ আমি এসেছি।'

আরও দু-চারটি মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, তাদের চাপা হাসির শব্দও বেশ শুনতে পাচ্ছিলাম।

মালতী তা লক্ষ্য করে বলল, 'ওরা গোলমাল করছে। আপনি ভিতরে এসে বসুন।'

জানালার ফাঁক দিয়ে গদিওয়ালা খাট, ফুলদানি, বইয়ের তাক আর একটা হারমনিয়ম দেখা যাচ্ছিল।

বললাম, না, আমি ঘরে যাব না। তোমার যা বলবার আছে ওখানে দাঁড়িয়েই বল।'

মালতী বলল, 'আমি আব কী বলব।'

বললাম, 'তাহলে আমি বলছি শোন। এখানে যখন কথা বলবার সুবিধে হচ্ছে না, তুমি কাল আমাদের বাড়িতে এসো।'

মেয়েটি বলতে পারত, 'আপনি যখন আমার ঘরে এলেন না, আমি কেন আপনার বাড়িতে যাব?'

কিন্তু অতটা সাহস তখনো তার হয়নি, অতটা প্রগলভ হওয়ার বয়সও তার ছিল না।

মালতী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনার বাড়িতে? কিন্তু কেউ যদি কিছু মনে করেন?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'কেউ মানে তো আমার স্ত্রী? না, তিনি কিছু মনে করবেন না। তুমি তো তার কোন ক্ষতি করনি। ক্ষতি করেছ আর একটি পরিবারের। আচ্ছা চল, তোমার ঘরেই চল। ঘরে গিয়েই সব বলছি।'

আমি নিজেই ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার কোন সংকোচও নেই, কুণ্ঠাও নেই। কারণ আমি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। কিন্তু সবাই তা মানতে রাজী নয়। মোটা বাড়ীওয়ালী মালতীকে বাইরে ডেকে নিয়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, 'এ কি ব্যাভার তোর? ঘরে লোক নিলি, আমার সঙ্গে কথা কইলি না যে!'

মালতী ফিস ফিস করে বলল, 'চুপ কর মাসী। উনি সেজন্যে আসেননি। উনি স্বদেশী নেতা। দেশের কাজে এসেছেন। দু মিনিট বাদেই চলে যাবেন।'

বাড়িওয়ালী বলল, 'আর হাসাসনি বাছা। কত ঢঙই দেখলাম। স্বদেশী বিদেশী ফকির সন্ন্যেসী

চিনতে আর কাউকে বাকি রইল না।'

তারপর আর কোন কথা কানে গেল না। মালতী বোধ হয় মাসীর মুখ চেপে ধরে থাকবে।

খানিক বাদে মালতী ফিরে এল। আমি গদি আঁটা চেয়ারটায় ততক্ষণে বসে পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই আরাম পাচ্ছিনে। দুটো কান ঝাঁ ঝাঁ করছে।

একটু বাদে মালতীর দিকে চেয়ে আমি বললাম, 'তুমি একটি পরিবারের দারুণ ক্ষতি করেছ। অনিলের স্ত্রী ভাবনায় চিন্তায় শুকিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওর দুটি বাচ্চার দিকে তাকানো যায় না।'

আমি একটু বাড়িয়েই বললাম অবশ্য। সৎ উদ্দেশ্যে একটু আধটু মিথ্যার আশ্রয় নিলে ক্ষতি নেই।

মালতী চুপ করে রইল।

আমি গলায় যতখানি আবেগ ঢালতে পারি ঢেলে বলতে লাগলাম, 'একটা পরিবার ধ্বংসে হয়ে যেতে বসেছে। তুমি তো জানো অনিল রাজাও নয়, মহারাজাও নয়, সামান্য একজন কেরানী। ও যদি বাজেভাবে টাকা নষ্ট করে, ওর স্ত্রীপুত্র না খেয়ে মরবে। অফিসে জানাজানি হলে ওর চাকরি চলে যাবে। তখন কোথাও ওর ঠাঁই হবে না।'

মালতী বলল, 'কিন্তু আমি তো তাঁকে ডেকে আনিনি। তিনি নিজেই এসেছেন।'

আমি বললাম, 'তাকে ফেরাবার ক্ষমতা তোমার হাতেই আছে।'

মালতী বলল, 'আমার হাতে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ তোমার হাতে। একমাত্র তুমিই পার ওর বউ ছেলেকে রক্ষা করতে। মানসম্মান স্বাস্থ্যসম্পদ নিয়ে ওকে বাঁচতে দেওয়ার ক্ষমতাও তোমারই আছে। আবার তুমি ওকে রসাতলে টেনে নামাতেও পার।'

মালতী বলল, 'আমি তা চাইনে।'

আমি বললাম, 'আমি জানি, তুমি তা চাইতে পার না। তুমি যদি ওকে ভালোবেসে থাক তুমি ওর ভালোই চাইবে।'

মালতী বলল, 'ভালো আমরা কী করে বাসব বলুন। তবে আপনি যা বলেছেন তা করব।'

আমি বললাম, 'মালতী, তোমার মুখ দেখে, তোমার মুখের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমি ভদ্রঘর থেকে এসেছ, লেখাপড়াও কিছু জানো। আর তুমি যে ওকে ভালোবাস তাতেও আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি যে ভালোবাসে সে নিজেও ভালো হয়, আর একজনকেও ভালো হতে দেয়। আমি বামুনের ছেলে, তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, তুমি তোমার কথা রাখবে। তুমি আর ওকে আসতে দেবে না।'

সেদিন অমন অহংকার কী করে করতে পারলাম আজ ভেবে অবাক হয়ে যাই। যাত্রা থিয়েটারের মত অমন নাটকীয় ভাষাভঙ্গীই বা কোত্থেকে এসেছিল তা ভেবে আজ হাসি পায়, লজ্জা হয়, বিস্ময় লাগে। কিন্তু বুক ফুলিয়ে নিজেকে একবার জাহির করতে পারলে তাতে সাময়িক ফল পাওয়া যায়। আমিও পেলাম। মালতী সত্যিই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল। প্রতিজ্ঞা সে রেখেছিল।

অনিল দিন কয়েক খুব আস্ফালন করে বেড়াল আমাকে দেখে নেবে। কিন্তু আমার দলবল দেখে শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেল। চেষ্টা চরিত্র করে বিলিতি এক মার্চেন্ট অফিসে ভালো চাকরিই পেল অনিল। আমার নামে যা তা কুৎসা রটাতে বাকি রাখল না। বন্ধু হল শত্রু। তবে আজকাল আর সেই দ্বেষ নেই। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হলে আমরা হেসে কথা বলি। একজন আর একজনের স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনির খোঁজখবর নিই। বুড়ো বয়সে নখ আর দাঁত সবই ভোঁতা হয়। কিন্তু নেশা অনিল আজও ছাড়তে পারেনি। কিছু কিছু যা ছেড়েছে তা বয়স আর ডাক্তারের শাসনে। তবে অনিলকে আমি আর তত দোষ দিইনি। কোন একটা অভ্যাস অর্জনই হোক আর বদলানোই হোক, তা যে প্রায় জন্মান্তর নেওয়ার সামিল, সে বোধ আমার হয়েছে। এই জ্ঞান কেবল যে সংসারে দেখে দেখেই আমার হয়েছে তা নয়, ঠেকেও হয়েছে।

এবার মালতীর কথাটা বলি। অনিলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার পরেও তার সঙ্গে আমার আরো

কিছুদিন যোগাযোগ ছিল।

একদিন সেই আমাকে খবর দিল, আমার সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। আমি তাকে ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। চিঠিপত্র লেখারও অনুমতি দিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল মেয়েটির কিছু উপকার করব। ওর যেমন মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিলাম তার বদলে ওকে কিছু না দিতে পারলে যেন বিবেকে বাধে।

আমি ওকে জানালাম, ওর সেই ঘরে গিয়ে দেখা করবার আমার আর ইচ্ছা নেই। বাড়িওয়ালীর যা মূর্তি দেখে এসেছি তাতে বিনা দর্শনীতে ফের ওদিকে ঘেঁষা নিরাপদ নয়। দরকার হলে আমার বাড়িতে কি অন্য কোথাও সে দেখা করতে পারে।

মালতী তাতেই রাজী হল। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ওর কোন এক আত্মীয়ের অপারেশন হয়েছে। তাকে মাঝে মাঝে দেখতে যায়। মালতী জানাল, আমি যদি ছুটির পরে দয়া করে সেখানে যাই দেখা হতে পারে।

ভারি অদ্ভুত লাগল। রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের গোপন দেখা-সাক্ষাৎ আমার আরো দু একটি মেয়ের সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু নৈতিক কারণে এই প্রথম। আমি রাজী হলাম। বেকার ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ও আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। বিকেলের হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের ভিড় জমেছে। পুকুরের জলে সূর্যাস্তের রঙ। পথের দুধারে আমগাছের সারি। বাতাসে কিসের একটা ওষুধের গন্ধ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগলাম।

মালতী বলল, 'এবার আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ওখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না। যা করছি আমি আর তা করতে চাইনে।'

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, 'মালতী, এই তো চাই। তোমরাও ভালো হবে, সুন্দর হবে, দেশের দশের কাজে লাগবে, আমরাও তাই চাই। তোমরা চিরকাল সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে থাকবে কেন ?'

আমার এত উচ্ছ্বাসের উত্তরে মালতী শুধু বলল, 'আমাকে কাজ দিন, আমি কাজ করব। যাতে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

মাথায় সাদা রুমাল জড়ানো মালতীর বয়সী দুটি নার্স আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আঁটসাট পোশাকে ব্যস্ত সেবিকা মূর্তি বেশ লাগল দেখতে।

মালতীকে বললাম, 'কাজ জোগাড় করে দিলে তুমি তা করবে ?'

মালতী বলল, 'করব। ওই নরক থেকে কে না বেরোতে চায়।'

বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে আমি সব কথা খুলে বললাম। তাঁর কাছে আমি কিছুই গোপন করতাম না। দলের দু একটা গুপ্ত কাজকর্ম ছাড়া আমি সব বিষয় নিয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কার জন্যে কোন কাজ করে দিয়েছি, সব বলতাম। তবু মালতীর কথা শুনে তাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'ডুবে ডুবে কোথায় জল খাচ্ছ কে জানে।'

আমি বললাম, 'ছিঃ।'

তিনি বললেন, 'এখানে সেখানে দেখা না করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেই পার। কতজনেই তো আসে।'

আমি বললাম, 'আমি তাকে বাড়িতেই আসতে বলেছিলাম। সে রাজী হয়নি। একটা সংকোচ তো আছে। ভালো কোন কাজকর্ম যদি জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো আসতে আর কোন লজ্জা থাকবে না।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'তুমি ওকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছ বুঝি ? এত লোকের কাজ জুটিয়ে দিচ্ছ, আমাকে তো কিছুই দিলে না ?'

আমি হাসতে লাগলাম। ভালোবাসার ফুল ঈর্ষার কাঁটা দিয়ে ঘেরা। প্রেম নিষ্কণ্টক হলে তার কি চেহারা হবে কে জানে। তবে কাঁটা তো শুধু কাঁটাই থাকে না। তা কখনো ছুরি হয়, কখনো বর্শা। বুক আর পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। কিন্তু আমি কোনদিন কাঁটাকে বাড়তে দিইনি। সযত্নে তা তুলে ফেলতেই চেষ্টা করেছি।

মাস্টারি করবার বিদ্যা মালতীর নেই। ওর জন্যে আমি নার্সের কাজই জোটাতে চেষ্টা করলাম। শুধু কাজ নয়, আমার মনে হল নার্সের পোষাকটাও মালতীকে চমৎকার মানাবে।

ওই ক্যাম্বেলেই একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। হাসপাতালে খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দুই-ই তাঁর আছে। আমি তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লাম। তিনি সব শুনে রাজী হলেন। শেষে হেসে বললেন, 'দেখো যেন বিপদে টিপদে না পড়ি। আমার ছাত্রদের মাথা টাথা না ঘুরে যায়।'

আমি বললাম, 'ছাত্রদের মাথা ঠিকই থাকবে, মাস্টারদের নিয়েই যা ভাবনা।'

সব ঠিক হয়ে গেল। প্রথমে কিছুদিন ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। কোয়াটার আর ভাতার ব্যবস্থা আছে। তারপরে স্থায়ী চাকরি। আজকাল একটি মেয়েকে ঢোকানো শক্ত। অনেক হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি করতে হয়, বিদ্যাবুদ্ধির উঁচু বেড়াও খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু বিশ পঁচিশ বছর আগে অত কড়াকড়ি ছিল না। তবু সব ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করতে মাসখানেক সময় কেটে গেল। আমি একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম। মালতীর চাকরি হয়েছে এই কথা সে তাকে জানিয়ে আসবে। বাড়িওয়ালীকে না ঘাটিয়ে কালীঘাট টালিঘাটের কিছু একটা অজুহাত দিয়ে মালতী যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর আর তাকে কিছু ভাবতে হবে না। চিঠিতে আমি সব কথাই লিখে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বিশ্বাসী ছিল। মালতীকেও আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না।

চিঠির জবাবে মালতী আমাকে খুব শ্রদ্ধা জানাল। আমি যে কষ্ট করে তার জন্যে এতখানি করেছি তাতে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সারাজীবনেও এই ঋণ সে শোধ করতে পারবে না। ওখান থেকে চলে আসবার তারিখটা দিনতিনেক বাদেই সে ঠিক করল। এ কদিন তার গোছগাছ করতে সময় লাগবে।

আমি খুশি হয়ে ডক্টর মিত্রকে সব জানিয়ে রাখলাম। বুধবার আসবার কথা। বেশ মনে আছে অন্য সব কাজকর্ম ফেলে আমি হাসপাতালে তার খোঁজ নিতে গেলাম। অবাক হলাম, মালতী আসেনি। পরদিন না, তারপর দিনও না। তবে কি কোন অসুখ বিসুখ হল ? না কি বাড়িওয়ালী বুড়ী পথ আটকাল ? আমি সেখানে খোঁজ নিতে পাঠালাম। আমার লোকজন ফিরে এসে বলল, মালতী মঙ্গলবার থেকে নিরুদ্দেশ। বাড়িওয়ালী গালাগাল করছে। তার নাকি ছ' মাসের ভাড়া মেরে দিয়ে চলে গেছে মেয়েটা। গয়না গাঁটি আসবাবপত্র সবই আস্তে আস্তে সরিয়েছে। কিছুই আর ধরবার জো নেই।

আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। প্রথমে আমার মনে হল ব্যাপারটা অনিলেরই কীর্তি। সেই আগে থেকে টের পেয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে এনেছে। কিন্তু অনিল একথা শুনে খাপ্পা হয়ে উঠল। তার স্ত্রীও স্বামীর এই অপবাধের কথা কিছুতেই স্বীকার করলেন না। অনিল নাকি নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলেছে, মালতীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

ডক্টর মিত্র নিজেই একদিন ফোন করে খবর নিলেন, 'কী হে, তোমার মালতীর কী হল ? তার জন্যে যে সব ঠিক ঠাক করে রেখেছি।'

আমি তাঁর কাছে লজ্জা আর দুঃখ জানালাম।

ডক্টর মিত্র ফোনের মধ্যে হেসে উঠলেন, 'আরে আমি তখনই বুঝেছিলাম। ওসব ফুল কি আর আমাদের হাসপাতালের বাগানে ফোটে। আমরা কি আর তেমন মালী ? যাকগে, পালিয়েছে বাঁচা গেছে। তোমার আর আমার স্ত্রীর বহু ভাগ্য যে, আমাদের দুজনের কাউকেই সঙ্গে নেয়নি। তাঁদের শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক।'

আমাদের দুজনের স্ত্রীই শাখা সিঁদুর নিয়ে যেতে পেরেছেন। আমার সেই ডাক্তার বন্ধুটিও আর নেই। তারপর কতকাল গেল। সে কি আজকের কথা। তারপর সংসারের কত কি বদলাল। দিনকাল হালচালের কত কি পরিবর্তন হল। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা আজও আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

শৈলেনবাবু চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "বল কি হে ? এই তোমার পত্নীব্রত ? তোমার শোবার ঘরে তোমার স্ত্রীর দামি অয়েল পেইন্টিংখানা এখনো ঝুলছে যে।"

বন্ধুদের ঠাট্টা গায়ে না মেখে হেমাঙ্গবাবু বলতে লাগলেন, "এখনো কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মনে

পড়ে যায় সেই মেয়েটাকে। বিশেষ করে যখন রাত্রে নিজের ঘরে চুপচাপ একা একা কাটাই। বইপত্র বন্ধ করে ছাদে গিয়ে অন্ধকারে বসি। জীবনের খাতাটাকে স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিই। সে কমবয়সী অবুঝ মেয়ের মত এলোমেলোভাবে পাতাগুলি উলটায় পালটায়। ছেঁড়ে আর জোড়া দেয়।

ভাবি মেয়েটা পালাল কেন ? কার ভয়ে ? কখনো মনে হয় সে কাজকেই ভয় করেছে। ভেবেছে কেন এত খাটব ? ক'টা টাকাই বা আসবে তাতে ? বিনা খাটুনিতে সুখে থাকতে পারলে কে আর খাটতে চায় ? কিন্তু এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হয়নি। হয়তো কাজকে সে ভয় করেনি। ভয় করেছে নিজেকে, ভয় করেছে নিজের উপকারী বন্ধুকে। অপকারের লোভকে ভয় করেছে।

তারপর আমি তাকে অনেকবার অনেক রকম খুঁজেছি। কোথাও পাইনি। আর না পাওয়ার ফলেই হয়তো তার সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কল্পনায় আমার মন ভরে উঠেছে। আমি কখনো ভেবেছি সে কলকাতার বাইরের কোন হাসপাতালে নার্সের চাকরি নিয়েছে। কখনো মনে হয়েছে সে ওই বিকৃত জীবনের হাত এড়িয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে ঘরসংসার করছে। আমার কল্পনা কিছুতেই তাকে এই ব্রথেলের ক্লেদ ব্যর্থতা বন্ধ্যাত্বের মধ্যে চিরদিনের জন্যে ডুবে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বাস্তববোধ সেই আশঙ্কার কথাই আমাকে মনে করিয়ে দেয়। সে হয়তো আছে, ওইসব জায়গাতেই আছে। যাতায়াতের পথে ওসব পাড়ার কাছাকাছি গিয়ে পড়লে আমি তাকে ওসব অঞ্চলেও খুঁজি। নিজের কাছে লজ্জার আর গ্লানির সীমা থাকে না। তবু তাকে একবার দেখতে চাই। আমি যার ভালো করতে চেয়েছিলাম, যার মনে ভালো হবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, একটি সুন্দর উন্মেষ, সার্থক সম্ভাবনা উদ্রেক করে দিয়েছিলাম তার পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করবার বাসনা আমি আজও ছাড়তে পারিনি।"

হেমাঙ্গবাবু থামলেন।

ভবেশবাবু নীরব আর নিশ্চল হয়ে রইলেন।

শৈলেনবাবু ছাইদানিটি নিজের কোলের কাছে টেনে নিলেন। হেমাঙ্গবাবু বিড়ি-সিগারেট খান না। তাঁর পুরোন আধখানা ভাঙা একটা ফুলদানিতেই বন্ধুদের ছাইদানির কাজ চলে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

পত্রবিলাস

দেরাজটা আধখানা টানতেই সব দেখা গেল।

নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা চিঠির তাড়া। তাড়া নয়, গুচ্ছ। তাড়া বলে মিনতির দিদিরা। মিনু মনে মনে বলত, গুচ্ছ। পুষ্পগুচ্ছ, পত্রগুচ্ছ, কবিতাগুচ্ছ।

ঘরে কেউ নেই, ধারেকাছে কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত। মিনুর বিয়ের জন্যেই ব্যস্ত রয়েছে সবাই। দিদির সঙ্গে মা বেরিয়েছেন মার্কেটিংএ। বাবাকেও টেনে না নিয়ে ছাড়েননি। বীথিদি আর ছোড়দা গাড়ি নিয়ে বাকি নিমন্ত্রণগুলি সারতে গিয়েছে। অন্য লোকজন রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, আর জামাইবাবুরা সবান্ধবে ব্রীজ খেলায় মত্ত। মিনতির এই নিজস্ব নির্জন ঘরখানিতে কেউ আর এখন আসবে না। যদি বা আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টোকা দেবে, অনুমতি চেয়ে নেবে।

মিনতি সময় পাবে। এমন কি দুঃখ জানিয়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুককে ফিরিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। কেউ আসবে না। মিনতি উঠে গিয়ে আধখোলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি টেনে দিল ঘন নীল রঙের পর্দা। তারপর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে নতজানু হয়ে বসল দেরাজের কাছে। এবার পুরো দেরাজটাই টেনে নিল। বুকে এসে লাগল মেহগনি কাঠের স্পর্শ। নিজের মনেই একটু হাসল মিনতি। কিছুদিন আগেও শরীর এত খারাপ ছিল যে, এসব অনুভূতি প্রায় ছিলই না।

ফিতে-বাঁধা রাশ রাশ চিঠিতে দেরাজটি এবার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আর একখানা চিঠি

রাখবারও যেন জায়গা নেই। আর জায়গা নেই বলেই যেন চিঠির পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে। দু দিন পর থেকে যে জীবন শুরু হবে তার কোন কোণেই এই চিঠিগুলির আর জায়গা হবে না।

অথচ গত পাঁচ বছর ধরে এই চিঠিগুলি মিনতির একমাত্র—একমাত্র না হোক, প্রধান অবলম্বন ছিল। এক-একখানা চিঠিকে কতবার করে যে সে পড়েছে, তার ঠিক নেই। এক-একখানা চিঠি আসবার অপেক্ষায় সে যে কত অধীর মুহূর্ত কাটিয়েছে, আজ আর তার হিসাব নেওয়া যায় না। শুধু স্মৃতিতে তার পুরো স্বাদ ধরাও পড়ে না।

চিঠিগুলিকে কিছুদিন হল কালানুক্রমে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে সাজিয়ে বেঁধে রেখেছে মিনতি। প্রথমে এই বুদ্ধি হয়নি। গোড়ার দিকে যেমন তেমন করে রেখে দিত। সবগুলিই যে ড্রয়ারে রাখত তা নয়। বরং ড্রয়ারে প্রথম প্রথম রাখতই না। তখনকার চিঠিগুলির মধ্যে তো কোন গোপনতা ছিল না। প্রায় কিছুই ছিল না বলতে গেলে। টেবিলের উপর দিনের পর দিন সে সব চিঠি পড়ে থাকত। হয়ত কোন চিঠি থাকত নভেলের পত্রচিহ্ন হিসাবে, কোনখানা উড়ে যাবার ভয়ে ডিকশনারির তলায় চাপা, চায়ের কাপের ঢাকনি হিসাবেও গোড়ার দিকে কোন কোন চিঠিকে ব্যবহার করেছে মিনতি। খামগুলির উপর গোলাকার দাগগুলি বোধ হয় এখনও দেখা যাবে। ভাবতে এখন লজ্জা করে মিনতির। ছি ছি ছি, কী নির্বোধ, কী উদাসীনই না ছিল তখন সে! অথচ তখন—শুধু তখন কেন, তার ঢের আগে থেকেই উৎপলকুমার রায় বেশ প্রতিষ্ঠিত গায়ক। রেডিওতে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন হয়, বাড়ির সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। পরিবারের প্রত্যেকের কাছে এবং মিনুর বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই উৎপলকুমার তাঁর নামে আর কণ্ঠমাধুর্যে শুধু পরিচিতই নন, প্রিয় গায়কদের একজন। বেশ বিক্রি তাঁর রেকর্ডগুলির। যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভালবাসেন, সেগুলি তাঁরা সযত্নে সঞ্চয় করেন।

তবু মিনতির কাছে তাঁর চিঠিগুলির বেশী সমাদর ছিল না। অতি-সাধারণ মামুলি চিঠি। দু-চার লাইনেই শেষ। 'সুচরিতাসু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রোগ্রাম আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুশী হলাম। শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার নিন।'

এই ধরনের চিঠিই প্রথম প্রথম আসত। পোস্টকার্ডে কি সস্তা কাগজে কোনরকমে দায়-সারা চিঠি। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে জবাব দিয়েছেন।

মিনতির অত দামী রঙিন প্যাডের কাগজের বদলে ভাল একখানা কাগজ ব্যবহারের কথাও ভদ্রলোকের মনে হয়নি। হলেনই বা বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর অবজ্ঞার দানকে মিনতি অহেতুক আদর করতে যাবে কেন?

মিনতির বড়দিদি নীতি কিন্তু তখন মিনতির এই ঔদাসীন্যের নিন্দা করত: 'ছি, ছি, ছি, তোর এ কী স্বভাব মিনু। চিঠিগুলি যদি ভাল করে রাখতেই না পারিস, তাঁকে চিঠি লিখিস কেন, তাঁর কাছে থেকে চিঠির জবাব চাসই বা কেন?'

মিনতি প্রতিবাদ করত, 'কে বলল যে চাই? তিনি না চাইতেই লেখেন।'

ছোড়দি বীথি বলত, 'লিখবেন না? তিনি যে আমাদের মিনুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন।'

পরিহাসের সূচগুলি মনে গিয়ে বিঁধত মিনতির। তার দিদিরা সামনে থাকতে তাকে দেখে কেউ মুগ্ধ হবে না, এ-কথা সে ভাল করেই জানে। নীতির মত চোখ-মুখের গড়ন নেই তার, বীথির মত নেই রঙ, স্বাস্থ্য আর দেহসৌষ্ঠব, তাকে দেখে মুগ্ধ হবে কে? তা ছাড়া, দিদিদের মত তার বিদ্যাও নেই। ওরা দুজনেই এম এ পাশ করেছে। আর মিনতি বি এ-র চৌকাঠ পার হতে গিয়ে একবার ইকনমিকসে হোঁচট খেল, দ্বিতীয়বার পড়ল অজ্ঞান হয়ে। সেই থেকে মিনতির অসুখ আর সারেনি। প্রায়ই মাথা ঘোরে, ঝিমঝিম করে। মালদা শহর থেকে শুরু করে কলকাতার নামজাদা ডাক্তাররা পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারেননি। হার মেনে বলেছেন, তার ব্যাধিটা মনের, তার ব্যাধিটা বাতিক ছাড়া কিছুই নয়। মিনুর বাবা মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু মিনু কিছুতেই রাজী হয়নি। সে বলেছে, 'আমার মনের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব বাবা, কোন মনস্তাত্ত্বিকের দরকার নেই।'

মিনতি জানত, তার দিদিরা যেমন তাকে ভালবাসে, তেমনি গোপনে গোপনে একটু অবজ্ঞাও

করে। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সব মহলেই অনুকম্পা কুড়তে হয় মিনতিকে। তার দূরসম্পর্কের এক জেঠিমা সেবার তার মাকে বলেছিলেন, 'তোমার এই মেয়ে পার করতে বেশ একটু বেগ পেতে হবে ভাই।'

কথাটা আড়ালে থেকে মিনতি শুনে ফেলে। তারপর থেকে জেঠিমা কি জেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। এমনি আস্তে আস্তে অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক ছেদ করে মিনতি ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। রোগ হয়েছিল এই নির্জনবাসের সহায়। জ্বরজারি মাথাব্যথা লেগেই থাকত। কারও সঙ্গে না মিশবার, কোথাও না যাবার অজুহাত থাকত হাতের কাছে।

মিনতির মত মেয়েকে কারও যে চোখে পড়বে, একথা ভাবাই যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, উৎপল রায়ের পড়েছিল। তিনি সেবার মালদয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দলবল নিয়ে গাইতে এসেছিলেন। মিনুর ছোড়দা সেই অনুষ্ঠানের একজন পাণ্ডা। যুগ্ম সেক্রেটারিদের একজন। উৎপলবাবুকে নিজেদের বাড়িতেই তুলেছিল এনে। সঙ্গে আরও দু-একজন গায়ক ছিলেন। অভ্যর্থনা, আলাপ-পরিচয়, গল্প-সল্পের ভার ছোড়দা আর দিদিরাই নিয়েছিল। মিনুর স্থান ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে। তবু অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে আলাপ হয়ে গেল। নীতি আর বীথি দুজনেরই তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা অটোগ্রাফের বাতিক পার হয়ে এসেছে অনেকদিন। মিনু মাঝে মাঝে তখনও দুএকজনের স্বাক্ষর ধরে রাখে।

খাতাটা হাতে নিয়ে তার পাতাগুলি উল্টে যেতে যেতে উৎপলবাবু মিনুর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ, এ ত দেখছি সবই বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ, এর মধ্যে আমি কেন ?'

তখন বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স উৎপলবাবুর। গায়ের রঙ না ফরসা না কালো। সুপুরুষ নন, বলিষ্ঠ নন। তীক্ষ্ণাগ্র নাক নেই, চোখ দুটি শ্রুতিমূলে পৌঁছবার অনেক আগেই থেমে গিয়েছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট আর চ্যাপ্টা চিবুকে মুখের ডৌলকে সুশ্রী কোনরকমেই বলা চলে না। তবু উৎপলবাবুর মধ্যে কোথায় যেন শ্রী আছে বলে মিনতির মনে হয়েছিল। পরে মিনু ভেবে দেখেছে সেই শ্রী তাঁর হাসি আর কথা বলবার ভঙ্গিতে। দাঁতগুলির সুষম সুন্দর গঠনে। কিন্তু গড়নের সৌন্দর্য মানুষের হাসিকে কতখানি সুন্দর করে তুলতে পারে, যদি তাঁর অন্তর প্রীতি আর প্রসন্নতায় ভরা না থাকে। তাঁর কথাগুলিও যে মিনতির ভাল লেগেছিল তা কি শুধু উচ্চারণের স্পষ্টতা আর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার জন্যে ? মোটেই তা নয়। মিনতি এ নিয়েও তারপর অনেক ভেবে দেখেছে। কথা হল খেয়া নৌকো। তা হল এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে পৌঁছবার জন্যে, এক অন্তর থেকে আর এক অন্তরে পারাপারের জন্যে। নইলে সে-যাত্রায় পুরো একটি দিনও ত মিনুদের বাড়িতে ছিলেন না তিনি, এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ হলেন তিনি কী করে!

একটু ভেবে নিয়ে অটোগ্রাফ-খাতায় শেষ পর্যন্ত সই করেছিলেন উৎপলবাবু। নাম স্বাক্ষরের আগে এক টুকরো কবিতাও লিখেছিলেন,

'যদিও জানি না
এ নামের মানে আছে কিনা।'

মিনুর বড়দি নীতি বলেছিল, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো। আপনার কি কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে নাকি ?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'এখন আর নেই। ছেলেবেলায় একটু আধটু ছিল।'

বীথি বলেছিল, 'কিন্তু কী বিনয় আপনার। যাই বলুন, পুরুষের অত বিনয় আমার ভাল লাগে না। তাঁরাও যদি অহংকারী না হন, দাম্ভিক না হন, হবে কে ?'

নীতি বলেছিল, 'আমাদের বীথি পৌরুষ আর পরুষতাকে এক বলে জানে।'

মিনতি এ-তর্কে যোগ দেয়নি। উৎপলবাবুও যে যোগ দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি শুধু স্মিতমুখে ওদের দুজনের বাগ্‌যুদ্ধ দেখেছিলেন।

ফাংশন সেরে আসরের সুখ্যাতি আর মালা নিয়ে উৎপলবাবুর ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। তার একটু আগে দিদিদের সঙ্গে মিনুও ফিরে নিজের টেবিলে এক টুকরো কাগজ রেখে দিয়েছিল। তা আর পায়নি। পরে বুঝল বীথির শত্রুতা। সে ততক্ষণে সেই কাগজের টুকরো

উৎপলবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছে।

'দেখুন, আপনার কবিতার সেই জবাব। মিনুকে কবিতা লিখলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ও ছড়া কেটে তার জবাব দেবে।'

উৎপলবাবু উৎসুক হয়ে বলেছিলেন, 'দেখি দেখি।'

তারপর তাঁর সুরেলা সুমিষ্ট গলায় আবৃত্তি করেছিলেন,

'নামের মান জানে পঞ্চজনে
নামের মানে জানি আপন মনে।'

নিজের কবিতা অন্যের কণ্ঠে শোনার যে সুখ তা সেই প্রথম পেয়েছিল মিনু। কাগজটুকু তিনি পকেটে রেখে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এযাত্রায় এই হল আমার সেরা মানপত্র।'

মিনু বলেছিল, 'বাঃ, ওটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আপনি কি নিয়ে যাওয়ার জন্যেই দেননি?'

মিনতি ভারী লজ্জা পেয়েছিল, তারপর মৃদু আপত্তির সুরে বলেছিল, 'মোটেই না। বীথিদি ওটা আমার টেবিল থেকে চুরি করে এনেছে। আর আপনি ডাকাতি করেছেন।'

কথা শেষ করে মিনু সেখানে আর দাঁড়ায়নি। নিজের কথায় নিজেই সে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। ছি ছি ছি, কী নির্লজ্জ, কী প্রগলভাই না তিনি মনে করেছেন মিনুকে! বীথির রূপ আছে। ওর মুখে সব কথাই মানায়। কিন্তু মিনুর আছে কী! সে কোন্ লজ্জায় মুখ বাড়ায়, মুখ তোলে, মুখ খোলে?

পরদিন ভোরের গাড়িতে উৎপলবাবু চলে গিয়েছিলেন। স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল মিনুর। কিন্তু হল না। স্টেশন বেশ দূরে। শহর থেকে মোটরে করে সেখানে যেতে হয়। গাড়িতে ঠাঁই কোথায়? উৎপলবাবুর দলবলে তা ভরে গেল। সি অফ করবার জন্যে শুধু ছোড়দাই সঙ্গে গেলেন।

মিনু চুপে চুপে এক ফাঁকে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখে ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো আর ছাইয়ে ভরতি। খালি প্যাকেটগুলি পড়ে রয়েছে কার্পেটের ওপর। কিন্তু ইজিচেয়ারের হাতলে কিছু ভাল নিদর্শনও ফেলে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন মালাগুলি। ভুলে গেলেন নাকি? দিদিরা কী করছিল? অত যে কাছাকাছি ছিল, একবারও কি মনে করিয়ে দিতে পারেনি? নাকি ইচ্ছা করেই রেখে গিয়েছেন?

জুঁই ফুলের মালাটি বেছে নিয়ে নিজের খোঁপায় জড়িয়েছিল মিনতি। তাই দেখে বীথির কী ঠাট্টা! মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়েছিল,—

'মালা হাতে খসে পড়া ফুলের একটি দল, মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও।—কিন্তু তুই শুধু একটি দল নিয়ে খুশী হসনি, পুরো একটি মালাই তুলে নিয়েছিস।'

মিনতি রাগ করে বীথির গায়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল মালা। বলেছিল, 'নে। একটা বাসী ফুলের মালা, তাই নিয়ে অত! যতক্ষণ ছিলেন তোর দিকেই তো তাকিয়ে ছিলেন। তাতেও হয়নি?'

বীথি বলেছিল, 'ভুল করছিস। আমাকে শুধুই চোখ দিয়ে দেখে গেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন কেবল তোকে।'

মিনতি বলেছিল, 'আর বড়দিকে?'

বীথি হেসে বলেছিল, 'ওকে বোধ হয় শুধু নাক দিয়ে শুঁকে গেছেন।'

বড়দি তাড়া করে এসেছিল, 'ফাজিল কোথাকার!'

সেই থেকে শুরু। সেই কাগজের টুকরো, কবিতার টুকরো থেকে। উৎপলবাবু কলকাতায় গিয়ে ছোড়দার কাছে পৌঁছ সংবাদ দিয়েছিলেন। তাতে শেষের দিকে মিনতির কথা ছিল। তার কবিতা নাকি উৎপলবাবুর খুব ভাল লেগেছে। তাঁর বন্ধুদেরও।

ছোড়দা হেসে বলেছিল, 'মিনুকে আর পায় কে! ও বোধহয় মাসখানেকের মধ্যে খানকয়েক মহাকাব্য লিখে ফেলবে।'

কিন্তু মহাকাব্য লেখবার শক্তি কই মিনুর। না একটি জীবন দিয়ে লিখতে পারল, না কোটি কোটি

অক্ষর দিয়ে। কাব্য হল না, গল্প না, উপন্যাস হল না, কিছুই হল না। লিখল শুধু চিঠি, টুকরো কবিতা আর ডায়েরি। কিছু না পারার, কিছু না হওয়ার, কিছু না পাওয়ার বিলাপে ভরা।

সেই ডায়েরির পাতা মাঝে মাঝে চিঠির আকারে কপি করে পাঠিয়েছে উৎপলবাবুকে। নিজের মনে মনে কথা বলা পৌঁছে দিয়েছে আর একজনেব কানে। কিন্তু মরমে পৌঁছেছে কি না কে জানে!

চিঠি মিনুই আগে লিখেছিল। ছোড়দার চিঠিতে তার নামের উল্লেখ দেখে সে আর না লিখে থাকতে পারেনি। তাঁর মধুর কণ্ঠের—তার চেয়েও বেশী তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের সুখ্যাতি করেছিল, নিজের মুগ্ধ হৃদয়কে প্রায় সেই প্রথম চিঠিতেই ধরে দিয়েছিল মিনতি।

তার জবাবে এসেছিল সাধারণ চিঠি, মামুলি চিঠি। হয়ত প্রথমেই ধরা দিতে চাননি। কিংবা পরখ করে নিতে চেয়েছিলেন। আব মিনতি শোধ নিয়েছিল সেসব চিঠি অনাদর করে; চিঠিগুলিকে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে, চায়ের কাপ, দুধের কাপ, পথ্যের বাটির ঢাকনি হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু তাতে কি সব জ্বালা, সব তৃষ্ণা, সব আকাঙ্ক্ষা ঢাকা পড়েছে? পড়েনি, শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠিও সরাতে দেয়নি মিনতি, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পর্যন্ত না। সব দিয়ে গুচ্ছ বেঁধেছে, ঐতিহাসিকেব মত সাল তারিখ কাল অনুযায়ী সাজিযেছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা আছে দুজনের একটি সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তার অর্ধেক আছে এখানে; মিনুর কাছে। বাকী অর্ধেক আর একজনের কাছে আছে কি না কে জানে? তিনিও কি মিনুর মত একখানি একখানি করে সব পাওয়া চিঠি সঞ্চয় করে বেখেছেন? মিনুর চিঠিগুলি দেখতে অনেক সুদৃশ্য। রঙিন খামে রঙিন প্যাডের কাগজে অতি যত্ন করে লেখা। কেউ গুছিয়ে বাখলে ভালই দেখায়। কিন্তু তাব বদলে মিনু যে চিঠিগুলি পেয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকখানিই সাধাবণ সরকারী খামে মোড়া। কাগজগুলি বেশীর ভাগই সাদা আর সস্তা। বাইরে থেকে এই চিঠিগুলির কোথাও কোন রঙ নেই। রঙ শুধু এর কথাগুলির মধ্যে। তবু মিনতির মাঝে মাঝে মনে হযেছে শুধু তার লেখা চিঠিগুলিই নয়, তার পাওয়া চিঠিগুলিও রঙিন হোক, কাগজগুলি দামী হোক। যেমন দিদিদের চিঠিগুলি হয়। রঙ দেখলেই চেনা যায় সেগুলি কোন রসে ভরা। কিন্তু লিখি-লিখি করেও উৎপলবাবুকে এ নিয়ে কোন কথা লিখতে লজ্জা করেছে মিনতির। ছি ছি ছি, এ রঙ কি বাইরে থেকে লাগাবার, মুখ ফুটে চেয়ে নেওয়ার? এর জন্যে কি কোন কথা নিজে থেকে বলা যায়? মিনতির মনে হয় এদিক থেকে মেয়েদের দাবি অনেক কম। তাদের চোখ খুশী হবার জন্যে পুরুষের রঙিন পোশাক দাবি করে না, মণিমুক্তার অলঙ্কারের ফরমায়েশ করে না। পুরুষের অনাড়ম্বর বেশ আর ভূষণহীনতায় তার দীনতার কথা মনে হয় না। কিন্তু পুরুষেব চোখ কি অত অল্পে খুশী হয়? জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে না গেলে তারা কি কোন মেয়ের দিকে তাকায়?

মিনু জানে জমকালো পোশাক তাকে মানায় না। সেজন্যে শাড়ির চড়া রঙ, আর গয়নার আধিক্য সে চিরকাল এড়িয়ে চলেছে। আবরণে আভরণে, ভোজনে শয়নে কোথাও কোন বিলাস নেই তার। শুধু চিঠিতে আছে। তার চিঠি থাকবে দামী কাগজে লেখা, তার পাতার রঙ থাকবে গাছের পাতার মত, তার ভাষায় থাকবে ফুলের সৌন্দর্য, আর প্রচ্ছন্ন সৌরভ। সে সৌরভ শুধু ভাষায় আসে না, যদি তাতে প্রাণের স্পর্শ না থাকে।

আটপৌরে আবরণ নিয়ে যে-সব চিঠি উৎপলবাবুর কাছ থেকে এসেছে তা যদি আর কেউ লিখত মিনতি দূব করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এব আগে অনেক মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে চিঠি লেখালিখি চলেছে। তাদের বিয়ে হবার পরে প্রায় বন্ধ। উৎপলবাবুই প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ যাঁর সঙ্গে চিঠির আত্মীয়তা শুরু হয়েছে। তাঁর একখানা চিঠি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতবার করে যে পড়েছে মিনু, তার ঠিক নেই। ভাষা ত সঙ্কেত, ভাষা ত এক ধরনের ইশারা ছাড়া কিছু নয়। সেই সঙ্কেতেব ভিতর থেকে কী নিগূঢ় অর্থ বের করা যায়, কথার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে, মনের কোন্ গোপনতম গহ্বরে পৌঁছান চলে, বার বার সেই চেষ্টা করেছে মিনতি: না করে উপায় ছিল না। এ তো দিদিদের দাম্পত্যপত্র নয়! যার আবরণের জন্যে শুধু একখানা খামই যথেষ্ট। চিঠি ভরে যে কথাগুলি মিনতির কাছে এসে পৌঁছয়, শুধু খাম ছিঁড়লেই কি তার অর্থ ধরা পড়ে? সেই নিহিত অর্থ কখনও থাকত প্রকৃতি বর্ণনায়, কখনও থাকত সংগীতের তত্ত্ব আলোচনায়, কখনও থাকত উদ্ধৃত গানের কলিতে কলিতে লুকনো।

আর এই লুকনো পথেই ত অভিসারের আনন্দ। যে পথের রেখা ইশারার মত দেখা যায় কি যায় না সেই অস্পষ্ট পথই যে মিনুর একমাত্র পথ।

তবু সেই গোপনতা মাঝে মাঝে ধরা পড়তে লাগল। বড়দিরা থাকে দিল্লিতে। জামাইবাবু সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। বাপের বাড়িতে বেশী আসতে পারে না বড়দি। কিন্তু বীথির শ্বশুরবাড়ি এই মালদতেই। সে প্রায়ই আসে। সপ্তাহে একদিন দুদিন এসে না থাকলে বাবা অস্বস্তি বোধ করেন।

বেড়াতে এসে বীথি মাঝে মাঝে খুলে ফেলে মিনুর চিঠি। পড়ে আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিনুর বুঝতে বাকী থাকে না এই হাস্যরসের উৎসটা কোথায়। রাগ করে বলে, 'আমার চিঠি কেন পড়লি ? বিয়ের পর তোর ভদ্রতাবোধটুকুও গেছে।'

বীথি হাসে : 'অত চটছিস কেন ? এ তো বরের চিঠিও নয়, প্রিয়বরের চিঠিও নয়। আমাদের পারিবারিক বন্ধুর চিঠি। ওতে কোন্ গোপন কথা লেখা আছে যে তুই লুকিয়ে রাখবি।'

পরিহাসটা বিষাক্ত তীরের মত মিনুর বুকে গিয়ে বেঁধে। লুকবার কিছু নেই সেই তো সবচেয়ে বড় দুঃখ। এর চেয়ে সত্যিই যদি ঢেকে রাখবার মত কিছু থাকত, এমন প্রচণ্ড মারাত্মক রকমের কথা যা পড়তে গিয়ে দারুণ লজ্জা পেত মিনু, তা হলেই যেন সবচেয়ে খুশী হত সে। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই বলে চিঠিগুলিতে একেবারেই যে কিছু নেই তাই বা কী করে বলে! চিঠির ভিতর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না কিংবা দাতার কিছুই দেওয়ার ইচ্ছা নেই মিনুর মন একথা মানতে চায় না।

একদিন গিয়ে মিনতি মার কাছে নালিশই করে বসল, 'আচ্ছা মা, ছোড়দির এ কী স্বভাব বল তো!'

মা বললেন, 'কী হল তোদের আবার ?'

মিনু বলল, 'ছোড়দি কেন আমার চিঠি পড়বে! এত চিঠি পেয়েও ওর আশ মেটে না ? ওর মেয়ে-বন্ধু আছে, ছেলে-বন্ধু আছে, জামাইবাবুও শিকাগো থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লেখে। তবু কেন আমার চিঠির দিকে ওর বাজপাখির মত চোখ ?'

বীথি হেসে বলে, 'খবরদার বাজপাখির চোখ বলবিনে। আমাকে সবাই বলে মৃগাক্ষী, মীনাক্ষী, ময়ূরাক্ষী—আর তুই বাজের সঙ্গে একটা বাজে তুলনা দিলেই হল ?'

মাও হাসেন : 'তা বাপু তোমারই দোষ। তুমি কেন ওর পার্সনাল চিঠি দেখবে ?' তারপর মিনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, উৎপলবাবুই বা সপ্তাহে সপ্তাহে তোকে অত কী লেখেন বল্ তো ? আর তুই বোধহয় সপ্তাহে দুখানা লিখিস। কী যে এত কথা জমে ওঠে আমি তো বুঝতে পারিনে। আমার তো দু লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। নীতির শাশুড়ী মাসখানেক হল সেই যে একখানা চিঠি দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তার জবাব দিতে পারলাম না।'

প্রতিবাদ করে করে চিঠিগুলির উপর এক সময় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে মিনতি। তার চিঠি বীথিও খোলে না। খুললে মিনু কষ্ট পায়, তার অসুখ বাড়ে বলেই বোধহয় তাদের এই সহৃদয় বিবেচনা।

সব সময় যে বড় চিঠি আসত তা নয়, মাঝে মাঝে দু-এক লাইনে, দু-একটি কবিতার লাইনে উৎপলবাবু চিঠি শেষ করতেন।

তারপর ফের পুরো চিঠি শুরু হত। মিনুর রোগশয্যায় ওষুধপথ্য ফল আসত। সেই সঙ্গে খামেভরা চিঠিগুলি আসত। প্রায় কোন সপ্তাহই বাদ যেত না। প্রথম প্রথম সেই চিঠিগুলির মধ্যে কিছু থাকুক না থাকুক মিনুর মনে হত এই সুনিয়মে আসাই যে ভালবাসা। নিয়ম ? তেতো ওষুধের মতই নিয়ম মিনুর কাছে প্রায় বিষ। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের কোন নিয়মই ওর মানতে ইচ্ছা করে না। শুধু চিঠির নিয়মই নিয়ম হয়েও ব্যতিক্রম। চিঠি লিখতে ভাল লাগে মিনুর। পেতে আরও ভাল লাগে। কিন্তু একথা যে কতখানি সত্যি, তা ঠিকমত যাচাই হয় না। কখনও মনে হয় লিখতেই তার বেশী ভাল লাগে। লিখে যাওয়াই যে পাওয়া। নিজেকে দিতে দিতেই যেন নিজেকে পাওয়ার স্বাদ বেশী করে মেলে।

শুয়ে শুয়ে যে চিঠিগুলি পেত মিনু সেগুলিতেই যেন অন্তরঙ্গ সুর বেশী বাজত। এ-সব চিঠির

অনেক তাব মুখস্থ হয়ে গেছে।—

'তোমাব অসুখের কথা যত শুনি, নিজেব স্বাস্থ্যের জন্যে তত আমার লজ্জা বাড়ে। মনে হয় আমি যেন একা একা একান্ত স্বার্থপরের মত জীবনের সমস্ত সুখ-সম্পদকে ভোগ করে চলেছি। গান আছে, গানের কলেজ আছে, দলবল নিয়ে ছুটোছুটির শেষ নেই। আমাব আজ আগ্রা, কাল দিল্লি, পরশু বোম্বে, তরশু মাদ্রাজ। অবশ্য শুধু একার জন্যে নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার আমি নিয়েছি। তাতে আরও কয়েকজনের জীবিকা জড়িয়ে আছে। অজুহাত আছে আমার। এমনও হয় সেই অজুহাতে আমি আমার আসল কাজকে ফাঁকি দিই। আরও যে কত ফাঁকিতে জীবন ভরে ওঠে তার আর ঠিক নেই। তবু এত কাজ আর এত ফাঁকির মধ্যেও মাঝে মাঝে নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আসে। তা কাজ দিয়েও ভরা নয়, আবার ফাঁকি দিয়েও ভরা নয়। সেই দুর্লভ এক-একটি ক্ষণে আমি একজনের কথা ভাবি। আকাশেব এক-একটি নিঃসঙ্গ তারার মত এমনি দু-একটি নিবিড় মুহূর্ত ছাড়া যাকে আমি আর কিছুই দিতে পারি নে।'

আব একখানা চিহ্নিত চিঠি টেনে নিয়ে খুলে পড়ল মিনু : 'তুমি জানতে চেয়েছ তোমার মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি? এই প্রশ্ন করে তুমি অত সংকুচিত হয়েছ কেন? এ-জিজ্ঞাসা কি শুধু তোমাব একার? তা তো নয়। তোমাব আমাব সকলেরই। যাদের অনেক আছে, তারাও একথা জিজ্ঞাসা করে, যাদের কিছু নেই তারাও। কিন্তু কিছু নেই বলে কাউকে অপমান করবার অধিকার কি আমাদের আছে? আমি কিছু দেখতে পাইনি, আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, বড়জোর এই কথাটাই বলতে পারি। দুটো চোখ আছে বলেই আমবা কি সবাইকে পুরোপুরি দেখতে পাই! আমিও যেমন অনেককে দেখিনে, আমাকেও তেমনি অনেকে দেখেও দেখে না।

'তোমাব মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি, তাব চেয়ে তোমাকে যে আমি দেখতে পেয়েছি, এই সত্যই আমার কাছে বড। নাও তো দেখতে পারতাম। চোখ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তোমার মধ্যে দর্শনীয় কিছু কম আছে বলে নয়। যারা চোখকে প্রলুব্ধ করে, আকৃষ্ট করে, তাদেরও তো দেখেছি। কখনও লুকিয়ে, কখনও আড়চোখে, কখনও বা সোজাসুজি। কিন্তু সেই চোখের দেখাকে কতক্ষণই বা মনে রাখতে পেরেছি?

'জীবনে এই দুর্ভাগ্যই তো বেশী ঘটে যখন আমবা একজন দেখি, আর একজন দেখিনে। কিংবা রূপের চেয়ে বিরূপতাকে দেখি, গুণেব বদলে দোষের আকবকে দেখতে পাই। কিন্তু দুজনেই যখন পরস্পরকে দেখি, তখন তিল আব তিল থাকে না, তিলোত্তম হয়, তিলোত্তমা হয়ে ওঠে।

'তোমার কথাব জবাব তোমার কথাতেই দিতে হয। তোমার মধ্যে এমন একজনকে দেখেছি যাকে আমিও নির্ভয়ে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পারি আমাব মধ্যে তুমি কী দেখলে?'

উৎপলবাবুর এ-চিঠি মিনু অনেকবার পড়েছে। রোগে আরোগ্যে, বিকালে সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে, মেঘে ঢাকা বর্ষার দিনে, ফুটফুটে কোজাগরী জ্যোৎস্নায় রাত জেগে এ-সব চিঠি পড়েছে মিনু। কোন কোন মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে, আবার এমন দুঃসময় এসেছে যখন সন্দিগ্ধও কম হয়নি! এই যে পরতে পরতে কথার স্তর, এর মধ্যে কোথাও কি সত্য বলে কিছু আছে? আন্তরিকতা আছে? এই কথায় ভরা চিঠিগুলি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ কই? যে ভালবাসে সে কি অত কথা বলতে ভালবাসে? ভালবাসা কি শুধু মূককে বাচাল করে? বাচালকেও মূক করে না? দুঃসহ সন্দেহ হযেছে মিনুর। আর সেই সংশয়ের জ্বালায় নিজেই ছটফট করেছে। চিঠিগুলিকে মনে হয়েছে অভিশাপের মত। এতে যে যত সুখ তত যন্ত্রণা তা কি সে আগে জানত!

মার কাছে অসুখের কথা বলে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু বীথির কাছে তো তা পাবার জো নেই। সে ধরে ফেলেছে। অন্ধকারে ছাদেব আলিসায় বসে নিজের হাতের মধ্যে মিনুর শীর্ণ মুঠি চেপে ধরে রেখেছে বীথি। যেন কিছুতেই আর ছাড়াছাড়ি নেই। সামনে অন্ধকারে কলনাদে বয়ে চলেছে বর্ষার মহানদী। খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার শুধু ঝিলম নয়, যে-কোন নদী যে-কোন নদ, যে-কোন নারী যে-কোন নর। তার খাপের বাঁকা তলোয়ার অকস্মাৎ এসে বিঁধতে পারে যে-কোন বুকে, যে-কোন মুহূর্তে।

বীথি আস্তে আস্তে বলেছে, 'মিনু, তুই ওসব চিঠি লেখালেখি ছেড়ে দে।

মিনু বলেছে, 'কেন বীথিদি ?'

বীথি জবাব দিয়েছে, 'ছেড়ে না দিলে তোর অসুখ সারবে না। আমরা প্রথম প্রথম ভাবতাম চিঠি পাওয়া, চিঠি লেখা তোর পক্ষে রিক্রিয়েশনের কাজ করবে, তুই যখন আনন্দ পাস— । কিন্তু এ যে দেখছি হিতে বিপরীত হল।'

মিনু বলেছিল, 'বীথিদি, সত্যিকারের কোন আনন্দে দুঃখের মিশেল নেই বল তো ?'

বীথি চটে উঠে বলেছিল 'তোর ওসব বস্তাপচা তত্ত্বকথা রাখ তো ! আনন্দের স্বাদের সঙ্গে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার স্বাদের কোন মিল নেই। ও-সব কবিদের কল্পনা বিলাস। তুই আমার শাড়ি-গয়নার বিলাসিতা নিয়ে ঠাট্টা করিস, কিন্তু মানসিক বিলাসিতা আরও খারাপ।'

মিনু এ-কথার কোন জবাব দেয় নি।

বীথি বলেছিল, 'তা ছাড়া সে ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সঙ্গীত-সঙ্গিনীদেরও অভাব নেই। তুই কোন্ আশায়—'

মিনু তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বীথির মুখ চেপে ধরেছে, 'চুপ কর্ বীথিদি, চুপ কর্। তুই এত ভালগার হতে পারিস আমার ধারণা ছিল না।'

সেখান থেকে উঠে মিনু সেদিন নিজের ঘরে খিল দিয়েছিল। সে-রাত্রে আর খায়নি, ঘুমোয়নি। তারপর মিনু ইচ্ছা করেই পত্রধারাকে বন্ধ করে দিল। তার চিঠি-লেখালেখির যখন এমন অপব্যাখ্যাই হয় দরকার নেই লিখে। কিন্তু না লিখে যে বড় কষ্ট। মনে হয় জীবনের স্রোতই যেন শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে। গ্রীষ্মের মহানন্দার মত তাতে শুধু বালি, শুধু বালি।

সে না লিখলেও পর পর একখানা নয়, দুখানা চিঠি এল উৎপলবাবুর। মিনু পড়ল, বার বার পড়ল, কিন্তু জবাব দিল না। বেশ মজা। তিনি ভাবুন তিনি উদ্বিগ্ন হন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস আসুক যে, মিনুর শক্ত অসুখ হয়েছে আর সেই অসুখে ভুগে ভুগে সে মরে গিয়েছে। একজন যদি এমনি করে হঠাৎ মরে যায় আর একজন যদি তা কিছুতেই জানতে না পারে, আর না জানতে পেরে দূর দুরান্তর থেকে সে যদি সারা জীবন তাকে চিঠি লিখে যায়, তা হলে বেশ হয়। চিঠির পর চিঠি, চিঠির পর চিঠি। মিনু নেই কিন্তু তার উদ্দেশে চিঠিগুলি আসছে, বেশ লাগে ভাবতে। তার সমাধি ফুলের বদলে চিঠির স্তবকে ভরে উঠছে বেশ লাগে ভাবতে। তাকে কি এমন ভাল কেউ বাসে না যে তার কাছ থেকে চিঠির জবাব না পেয়েও সে চিঠি লিখে যাবে ? মিনু বেঁচে না থাকলেও আর-একজন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার উদ্দেশে শুধু চিঠি পাঠাবে ?

মিনু তার ডায়েরিতে লিখে রাখল কথাগুলি। যেন নিজেকে নিজে চিঠি লিখছে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছে। কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব কি নিজের দিতে ইচ্ছা করে ? জীবনটাকে আগাগোড়া কি অত বড় একটা পরীক্ষার খাতা ভাবতে ভাল লাগে যে, যা লিখবে মিনু নিজেই লিখবে, তার লেখা কেউ লিখে দেবে না, তার কথা কেউ বলবার থাকবে না ?

প্রশ্নের জবাব মিলতে দেরি হল না। দিন দুই বাদেই ছোড়দা একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। হেসে বলল, 'কী রে, তোরা কি ঝগড়াঝাঁটি করেছিস নাকি ?'

মিনু অবাক হয়ে বলল 'ঝগড়া আবার কার সঙ্গে ছোড়দা ?'

ছোড়দা হেসে বলল, 'আবার কার সঙ্গে ? দিল্লিতে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করতে গিয়েও ভদ্রলোকের স্বস্তি নেই। আমাদের অফিসে টেলিগ্রাম করেছেন তুই কেমন আছিস জানতে চান। একেবারে প্রিপেড টেলিগ্রাম।'

লজ্জায় মিনু নিজের ঘরের কোণে এসে মুখ লুকাল। ছি ছি ছি, তার জন্যে টেলিগ্রাম ! বাবা মা ছোড়দারা কী ভাবলেন ; সব যে ধরা পড়ে গেল। টেলিগ্রামের সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি শুধু ত সঙ্কেতের মধ্যে গোপন রইল না। হীনবুদ্ধি পোস্টমাস্টার তাকে যে আবার ভাষায় ধরে দিয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই সীমাহীন লজ্জার সঙ্গে, এক গোপন আনন্দের ধারাও এসে মিশে গেল। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' সে ভুবন নিশ্চয়ই শুধু বাইরের ভুবন নয়।

যুক্ত বেণীর মত দুটি ধারা ঘিরে ধরল মিনুকে। ধরা পড়বার লজ্জা, আর ধরা পড়বার গর্ব। ধরা দেওয়ার ভয় আর ধরে দেওয়ার পরিতৃপ্তি। কে বলে আনন্দের ধারা অবিমিশ্র, একস্রোতা ? বীথি

কিছু জানে না, কিচ্ছু জানে না। জীবনের কত স্বাদ যে বিষাদের মোড়কে মোড়া বীথি তার কিছু জানে না।

শুধু টেলিগ্রাম নয়, কলকাতা থেকে এল কয়েকখানা নতুন রেকর্ড। উৎপলদা তার নামেই পাঠিয়েছেন। মিনুর নামে।

গ্রীষ্মের পরে বর্ষা এসেছে। মিনুর জানলার তলা দিয়ে মহানন্দা ভরে উঠেছে, ছুটে চলেছে। সে চলার শেষ নেই, দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে।

মিনুর ঘরে বাজে বর্ষার গান—

'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে!'

মিনুর গলায় সুর নেই, সে গভীর রাত্রে নিজের মনে আবৃত্তি করে—

'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের 'পরে!'

ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মিনু জানলা খুলে দিয়ে তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। শিকগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। মিনুকে বাধ্য হয়ে মানতে হয় এই শিকগুলির বাধা। কিন্তু বাইরের প্রবল বর্ষণ কি কোন বাধা মানে? সে ঝাপটায় ঝাপটায় মিনুর সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়, তার সমগ্র সত্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মিনু আবৃত্তি করে—

'যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমাব জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝবে সুরেব ধাবা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পবে, ভুখের 'পরে।
শ্রাবণের ধাবাব মত পড়ুক ঝবে, পড়ুক ঝরে।'

আশ্চর্য, এত ভিজেও মিনু এবার আর অসুখে পড়ে না। বাবাব ডাক্তাববন্ধু হেসে বলেন, 'তুমি ভাল হয়ে গেছ মা। অসুখটা তো তোমাব আসলে—। এবাব তুমি যা ইচ্ছে তাই খেতে পাব, যেখানে খুশী যেতে পার। এখন থেকে তুমি পুরোপুরি স্বাধীন।'

স্বাধীন? কতটুকু স্বাধীনতা আছে মিনুব? শুধু মিনুর কেন? যে কোন মেয়ের? ডাক্তার তাঁর বাধা তুলে নিলেই কি সব বাধা উঠে যাবে?

বর্ষাব পরে শরৎ গেল, শীত গেল। মহানন্দা আবাব শীর্ণা, নিবানন্দা। কিন্তু মিনুকে সেই যে বর্ষা এসে ছুঁয়েছিল, কানায় কানায় ভরে দিয়েছিল, তার যেন আর সরে যাওয়ার মন নেই।

সবাই বলছেন, 'তুই সেরে গেছিস মিনু, ভাল হয়ে গেছিস।' বাবা-মার এই কথাব মধ্যে কোথায় যেন একটু নিগূঢ় অর্থ আছে। মিনু তা টের পায়। টেব পেয়ে তাব ভাল লাগে না। অত ভাল তো সে হতে চাযনি। এমন সাবা তো সে সাবতে চায়নি।

এদিকে তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চক্রান্ত চলছে। পাত্রের খোঁজ চলছে অনবরত। বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওযা হয়েছে। ছি ছি ছি। চিঠিপত্র নাকি আসতে শুরু করেছে। এ-চিঠিও চিঠি।

আমগাছগুলিতে বোল ধরেছে। ডালগুলি যেন ভেঙে পড়ে-পড়ে। মিনু দিনরাত জানালা খুলে রাখে। হাওয়ায় মুকুলের গন্ধ আসে। মালদয় বাস করেও পাকা আম মিনু ছোঁয় না। পাকা আমেব গন্ধ সে ভালবাসে না। সে শুধু মুকুলের ভক্ত। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, মিনু চেয়ে চেয়ে দেখে গাছগুলিতে মাথায় মাথায় এই পুষ্পবৃষ্টি। তারপর আলো নিভে গেলে অন্ধকারে সেই সৌরভ যেন আরও ঘন হয়, ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে আসে। যেন বেশবাসেব সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়।

গন্ধের পরে সুর। কিন্তু সে-সুবেও গন্ধেরই কথা।

উৎপলদার নতুন রেকর্ড বেবিয়েছে,—

'মন যে বলে চিনি চিনি
যে গন্ধ বয় এই সমীরে।'

চিনি চিনি, কিন্তু সত্যিই চিনি কি?

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটেছে। ফলে গিয়েছে ঘটকালির ফল।

বাবা মিনুকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। মাও আছেন, বীথিও আছে। কিন্তু মিনুকে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল। বাবা তাঁর চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'জলপাইগুড়ির ওই সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম মিনু।'

মিনু জানে এই কথা শোনবার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। সে মুখ নিচু করে বলল, 'আমাকে এ-সব কথা কেন বলা! আমি আগেই তো বলে দিয়েছি, বিয়ে আমি করব না।'

বাবা বললেন, 'সে কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার 'না' বলার কোন কারণ নেই।'

সামান্য মুখ তুলে মিনু বলল, 'কেন?'

বাবা বললেন, 'ছেলে হোক মেয়ে হোক যারা কোন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা নিয়ে থাকে কি দেশের কাজে যারা নিজেদেব উৎসর্গ করে রাখে, তাদের বিয়ে না করার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু তোমাদের মত মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করার কোন অর্থ নেই।'

মিনু আবার মুখ নামাল।

বাবা বললেন, 'এতদিন তোমার অসুবিসুখ ছিল, কিছু বলি নি; কিন্তু এখন ত তোমার সে-সব নেই—।'

মিনু বলল, 'কী করে জানলে যে নেই। বাবা, তুমি নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও।'

বাবা বললেন, 'মিনু, বাপকে কখনও উকিল হতে হয়, কখনও ডাক্তার হতে হয়, কখনও গুরু হয়ে ঠিক পথ দেখিয়ে দিতে হয়। তার দায়িত্ব অনেক।'

মিনু বুঝতে পারল প্রতিবাদ নিষ্ফল। সে মনে মনে বলল, 'জানি জানি, বাপকে সবই হতে হয়। শুধু কবি হতে নেই, শিল্পী হতে নেই, প্রেমিক হতে নেই।'

নহবত এখনও আসেনি, কিন্তু সারা বাড়িতে বিয়েব বাজনা বাজছে। মিনুকেও আগে থেকেই বিয়ের সাজ না সাজলে চলবে না।

গৌহাটি কলেজে বড়দা প্রফেসর। সেখানে টেলিগ্রাম গিয়েছে। তিনি যেন অবিলম্বে সস্ত্রীক চলে আসেন। ছোড়দাও ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাছে আছে বলে চাপটা তাব উপরেই বেশী। নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপানো হয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের তো শুধু ছাপানো চিঠি দিলে চলে না। তাই চিঠি লেখা চলেছে। বাবা লিখছেন, মা লিখছেন, দিদিরা লিখছে। আজ সবারই চিঠি লেখার পালা।

কিন্তু এত কাজ এত ব্যস্ততার মধ্যেও মা আসল কথাটা ভোলেননি। মিনুকে একান্তে ডেকে নিয়ে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, তারপর কপালের উপর থেকে দু-এক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলেছেন, 'সেই চিঠিগুলি কী করলি?'

মিনু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছে, 'কী আবার করব?'

মা বলেছেন, 'নষ্ট করে ফেল। লক্ষ্মী মেয়ে। ওগুলি দিয়ে তো আর কোন দরকার নেই। কিছু নেই যদিও তবু পড়ে যদি কেউ কিছু ভাবে।'

মিনু কোন কথা বলেনি।

মা বলেছেন, 'কিসে কী হবে। শেষে অশান্তির শেষ থাকবে না।'

মিনু মাকে আশ্বাস দিয়েছে, 'ভেব না। যা করবার আমি ঠিকই করব।'

বীথিরও চিন্তা ওই চিঠিগুলি নিয়ে। কেউ তো হিতৈষিণী কম নয়। দু-দুবার করে জিজ্ঞাসা করেছে বীথি, 'চিঠিগুলির কী করলি?'

মিনু বলেছে, 'এখনও কিছুই করিনি।'

বীথি বলেছে, 'করে ফেল্। যা করবার এখনই ডিসাইড করে ফেল। নষ্ট করতে যদি না চাস যার চিঠি তাকে ফিরিয়েও দিতে পারিস।'

বীথি পরামর্শ দিয়েছে।

মিনু বলেছে, 'ছিঃ।'

বীথি বলেছে 'ছিঃ কেন? শুনেছি অনেকেই তো এমন করে।'

মিনু বলেছে, 'তুমি ভেব না, যা করবার আমি ঠিকই করব।'

ফেরত দেওয়ার কথায় মন সরেনি মিনুর। সে নিজের কোন লেখা ফেরত চায় না। এ যেন কাগজের অফিসে গোপনে পাঠানো নিজের কবিতা ফেরত পাওয়া। এ-পাওয়ার মত বড় হারানো আর নেই। সে যেমন নিজের লেখা ফেরত চায় না, নিজের চিঠি ফেরত চায় না তেমনি অন্যের চিঠি ফেরত দিলে তার যে কী অপমান তাও সে বোঝে। চিঠি লেখা আর-একজনের চিঠির জন্যে, নিজের চিঠি ফেরত পাওয়ার জন্যে তো নয়। পালা যখন শেষ হয়ে যায়, চুপ করে থাকতে হয়; গান যখন শেষ হয়ে যায়, চুপ করে থাকতে হয়। যে গায় আর যে শোনে, তাদের কারও বলবার দরকার হয় না 'শেষ হল'। যতি চিহ্নের জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাসই যথেষ্ট।

দেরাজ থেকে চিঠির তাড়াগুলি একে একে বাইরে নামাল মিনু। সন তারিখ মিলিয়ে ইতিহাসের মত সাজানো। একটি সম্পর্কের ইতিহাস। রাজা রানী নেই, ছোটখাট মান-অভিমান ছাড়া যুদ্ধ নেই, বিগ্রহ নেই, তবু এক টুকরো ইতিহাস আছে। মিনু একবার ভেবেছিল চিঠিগুলিকে নতুনভাবে সাজাবে। সন-তারিখের ফিতেয় না বেঁধে নতুন ধরনে বাঁধবে। যে চিঠিগুলি তাড়াতাড়িতে লেখা নয়, কাজের চাপে যে-সব চিঠি কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়েনি, কিংবা কথার চাপে যে চিঠিগুলিতে রসের স্বল্পতা ঘটেনি, যে চিঠিগুলি কয়েকটি মধুর মুহূর্তকে সত্যিই বুকে করে ধরে রেখেছে, মিনু বেছে বেছে সেই চিঠিগুলিকে আলাদা করে রেখে দেবে। তার স্বাদ যে আলাদা। শুধু চিঠি কেন, প্রিয়জনের সব কথা, কাজ আর আচরণের ভিতর থেকে প্রিয়তমকে বেছে নেওয়ারও এই রীতি। তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ দানে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ গানে।

আজ সব ছাই করে দেওয়ার দিন এসেছে।

হাঁ, এগুলি পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। তাতে নিজে খাক হয়ে যাবে মিনু, তবুও। সত্যিইত চিঠিগুলির মধ্যে কটি কথা খাঁটি, কটি কথা অন্তরের স্পর্শ পেয়েছে তার ঠিক কি! আন্তরিকতাই যদি থাকবে তাহলে অন্তত আর একবার তিনি এসে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু নিজে থেকে আসা দূরের কথা এখানকার সংস্কৃতি-পরিষদ অনেক সাধাসাধি করেও তাঁকে আনতে পারেনি। প্রতিবারই অন্য কোন কাজ তাঁকে আটকে রেখেছে, অন্য প্রোগ্রামের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে। কেন আসেননি, মিনু জানে। পাছে তাকে দেখে আরও খারাপ লাগে। পাছে চিঠির ছলনা চোখের দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে যায়। মিনু সব জানে, সব বুঝতে পারে।

সেইজন্যেই কলকাতায় মিনুর কয়েকবার যাওয়া সত্ত্বেও একবারও দেখা হয়নি, তিনি কোথাও-না-কোথাও প্রোগ্রাম করতে বেরিয়েছেন। কি অন্য কোন আকস্মিকতা তাঁর সহায় হয়েছে।

চিঠিগুলির যে অর্থ মিনু করেছে হয়ত সবই তার নিজের মনের বানানো। তিনি বানিয়েছেন একরকম করে, মিনু বানিয়েছে আর-এক রকমে। মুখের কথার মাটির মূর্তিতে সে মনের কথার রঙ লাগিয়েছে। আজ সেই মিথ্যার মূর্তির বিসর্জনের সময় এসেছে। সে নিরঞ্জন জলেই হোক আর আগুনেই হোক—একই কথা।

দেরাজ থেকে চিঠিগুলি টেনে বার করে মিনু মেঝের উপর স্তূপাকার করল। দেশলাইটায় আট দশটা কাঠি আছে। পাঁচটি বছরের পক্ষে একটি কাঠিই যথেষ্ট। মিনু জ্বালতে চেষ্টা করল। কিন্তু কাঠিগুলিতে কি বারুদ নেই! একটাও যেন জ্বলতে চায় না। বিরক্ত হয়ে মিনু কয়েকটা কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত একটি জ্বলল। কিন্তু জ্বলন্ত কাঠিটা একবার এদিকে সরে আর একবার ওদিকে সরে। যেন চিঠিগুলিকে তা পোড়াতে আসেনি, আরতি করতে এসেছে।

'কী করছিস তুই।'

বীথির চাপাগলায় মিনুর চমক ভাঙল। ফিরে তাকাল মিনু। বীথি কী করে এল? তবে কি দরজায় খিল দিতেও মিনু ভুলে গিয়েছিল। বীথি বলল, ঘণ্টা দুই হয়ে গেল যে। এতক্ষণ লাগে! যা করবার তাড়াতাড়ি কর। ওঁরা যে এসে পড়েছেন।'

আধপোড়া নিবন্ত কাঠিটা দুটি আঙুলের ফাঁক থেকে আপনিই খসে পড়ল।

ক্লান্ত আর্ত অস্ফুট স্বরে মিনু বলল, 'দিদি, আগুনে দিতে পারলাম না ভাই, জলেই দিতে হবে।'

বীথি মিনুর দু চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, সে জল মহানন্দার নয়।

দু পা এগিয়ে এসে বীথি ছোট বোনকে আরও কাছে টেনে নিল, বলল, 'আমার হাতে তুই সব ছেড়ে দে মিনু, তোর কোন ভয় নেই।'

মিনু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'বীথিদি, এর পরও দু-একখানা চিঠি হয়তো আবার আসবে। সেগুলি রিডাইরেক্ট করবার দরকার নেই। সেগুলি আমি খুলতে আসব না। তোরাও যেন কেউ না খুলিস।'

বীথি বলল, 'কেউ খুলবে না বোন, তোর কোন ভয় নেই।'

ভাদ্র ১৩৬৫

পার্শ্বচর

আশ্রমটি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজেরা ইচ্ছামতো যে ঘুরে বেড়ালাম তা নয়। আশ্রমের যিনি বর্তমান অধ্যক্ষ—বিনয়ভূষণ নাগ—তিনিই আশ্রমের চারিদিক আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। তিনি বললেন, 'এখন আর দেখবার বিশেষ কিছু নেই। মানুষের মতিগতি আজকাল বদলে গেছে। ঘর-সংসার বিষয়-সম্পত্তিই এখন মানুষের সব। তার বাইরে মানুষের চিন্তা আজকাল আর যেতে চায় না।'

আমি প্রতিবাদ করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এ কি শুধু বর্তমান কালেরই বিশেষত্ব? কোন্ দেশে কোন যুগে সাধারণ মানুষ দলে দলে তার ঘর-সংসার বিষয়-আশয় ছেড়ে অধ্যাত্মজীবনের অনুরাগী হয়েছে। তাদের সংখ্যা লাখে এক। ঘর-সংসারকে ভালোবাসা যদি বস্তুবাদ হয়—সব দেশের সব যুগের মানুষই বস্তুবাদী।

পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আশ্রম। সারি সারি ছোট-বড় পাথরের বাড়ি। এখন খানিকটা ছাড়া-ছাড়া আর জীর্ণ মনে হলেও, একসময় যে সমৃদ্ধি ছিল তা অনুমান করা যায়। বাঁধানো চত্বর, মন্দির, ছোট ছোট কুঠুরী। একটু দূরে সুন্দর একটি শ্বেতপাথরের বাড়িও দেখা গেল। সবুজ গাছপালার আড়ালে বাড়িটি যেন এখন আত্মগোপন করে রয়েছে।

আমি বললাম, 'ও বাড়িটা—'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওখানেই স্বামীজী থাকতেন।'

আমি বললাম, 'থাকতেন মানে? এখন আর থাকেন না?'

বিনয়বাবু বললেন, 'না। তিনি আজ তিরিশ বছর দেহরক্ষা করেছেন।'

আমি বললাম, 'তিরিশ বছর! সে তো অনেকদিন যে।'

বিনয়বাবু একটু হেসে বললেন, 'তা হ'ল বইকি। আমরা এখানে এসেছি তাও তো পঞ্চাশ বছর হবে। বছর আর কি। বারোটা মাস ঘুরে আসতে আর কতটুকু সময়ই বা লাগে।'

তাঁর কথা বলবার ধরনটি বড় ভালো লাগল। সত্যিই তো। সময়কে হিসাব দিয়ে বাঁধা যায় না। আমাদের কৃত্য কর্তব্য, অচরিতার্থ সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে পিছনে ফেলে রেখে সময় দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়। নীচে যে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র ছুটে চলেছে, সময়ের স্রোত তার চেয়ে তীব্র।

বললাম, 'পঞ্চাশ বছর এখানে আছেন? আপনার নিজের বয়স কত হবে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আটাত্তর।'

'অত হয়েছে! দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।'

আশ্চর্য, বিনয়বাবুর মাথার চুল এখনো সব পাকেনি। কাঁচা চুলের পরিমাণ এখনো যেন বেশি। বয়সের তুলনায় শরীরও বেশ শক্তই আছে বলতে হবে। পরনে খাটো একখানা ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়া। নিখুঁতভাবে কামানো গোলগাল মুখ। ছোটখাটো চেহারা। তাতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা বর্ণনা করবার মতো। সেকালের জমিদার-তালুকাদার বাড়ির গোমস্তা, কি মহাজনের আড়তের তশীলদারের সঙ্গেই তাঁর চেহারার মিল আছে। কিন্তু আমার সঙ্গী এবং গাইড অমিয়বাবু এখানে আসতে আসতে বলেছিলেন, 'এই আশ্রমে বিনয়বাবুর পদই সবচেয়ে ওপরে। উনিই সব চালান। অথচ বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। সাধারণ একজন কর্মচারীর বেশি বলে ভাবাও যায় না ওঁকে।' সেই কথা মনে পড়ায় আমি বিনয়বাবুকে ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনিই এখন এখানকার অধ্যক্ষ?'

ঘুরতে ঘুরতে একটি গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। ছায়ায় আসতে পেরে একটু স্বস্তি পেলাম। বড় রোদ লাগছিল। জুতা খানিকটা দূরে আশ্রমের ঢুকবার পথেই রেখে আসতে হয়েছে। রোদের তাপে উত্তপ্ত পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অনর্থ এই কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যে আমি মনে মনে বিরক্তও হচ্ছিলাম। আমার সঙ্গী স্থানীয় রেল-অফিসার ভদ্রলোক যতই আগ্রহ দেখান, এই রোদের মধ্যে আশ্রমের উঠান পার হয়ে স্বামীজীর শয়নঘর, সাধনস্থল দেখবার মতো উৎসাহ আমার আর অবশিষ্ট ছিলনা।

আমার কথার জবাবে বিনয়বাবু হাত জোড় করে বললেন, 'অধ্যক্ষ-টধ্যক্ষ কিছুই নই, মশাই। আমি এই আশ্রমের একজন সাধারণ বাসিন্দা। ঘাড়ে যে কাজটুকু পড়েছে তাই শুধু করে যাওয়ার চেষ্টা করি।'

বিনয়বাবু দেখলাম সার্থকনামা পুরুষ। একেবারে অতিবিনয়ী। কিন্তু মানুষের অহংকারের চেয়ে বিনয় ভালো। তা যদি মৌখিক হয় তবুও।

গাছের ছায়ায় একটি পাথরের ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ আশ্রম তাহলে চালান কে?'

বিনয়বাবু অসংকোচে বললেন, 'যার আশ্রম তিনি চালান। স্বামী ভূমানন্দ।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু তিনি তো শুনলুম আজ তিরিশ বছর দেহরক্ষা করেছেন।'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? মহাপুরুষদের কথা পরে বলছি, যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁরাও কি শুধু তাঁদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন? দেহ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তাঁদের সব শেষ হয়ে যায়?'

আমি বললাম, 'যায় না?'

তিনি আমার অবিশ্বাসকে শান্তভাবে হেসে মার্জনা করলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'না, যায় না। দেহ গেলেও মানুষ থাকে। এইখানেই তো মানুষের জয়। এই যে গাছপালা পাহাড় পর্বত দেখছেন এদের কারোরই দেহের স্থায়িত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ পারেনা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন ওই-যে দুটো পাথরের ঢিবি দেখছেন---যেন জন্তুর মতো হাঁ করে রয়েছে—আমাদের বয়সের চেয়ে ওর বয়স যে কতগুণ বেশি, হিসেব করে বলতে পারবেন না—আমিও পারবনা। ওদের শক্তিও মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। যদি একবার গড়িয়ে পড়ে, আপনার আমার মতো বহু লোককে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি মানুষের শক্তির তুলনায় পাথরের শক্তি বড়?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'সে কথা বাতুলেও বলবে না। মানুষ চলে গেলেও সে তার পুত্র-পৌত্রের মধ্যে থাকে, বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তির মধ্যে থাকে, যদি আরো কিছু বড় কাজ করে যেতে পারে তার মধ্যে থেকে যায়। মহাপুরুষরা আরো বেশি করে বাঁচেন। তাঁদের কীর্তির মধ্যে ধর্মমতের মধ্যে শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে বাস করেন।'

অমিয়বাবু বললেন, 'এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস স্বামী ভূমানন্দ এখনো এই আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। রোজ রাত্রে ওই শিলাখণ্ডের উপর এসে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের শোভা দেখেন। তিনি এখনো এই আশ্রমের মায়া কাটাতে পারেননি, এ কথা কি সত্যি?'

বিনয়ভূষণ একবার অমিয়বাবুর দিকে তাকালেন। অমিয় লাহিড়ী রেলের পদস্থ অফিসার। উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। এসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের লৌকিক প্রবাদ তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করছেন, নাকি পরিহাস করছেন, স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনয়ভূষণ যেন তা বুঝতে চেষ্টা করলেন। একটু বাদে হেসে বললেন, 'বরং বলুন আশ্রমবাসীরাই তাঁর মায়া কাটাতে পারছেন না। তিনি মায়া-মোহের অতীত। আগেও যেমন ছিলেন এখনো তেমনি। আর তাঁকে দেখতে পাওয়া না-পাওয়ার কথা যে বলছেন ওটা যার যার বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

অমিয়বাবুর মুখে মৃদুহাসির আভাস দেখে বিনয়ভূষণ বললেন, 'এ শ্লোক আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি, তাই ব'লে আমাদের বুড়োবয়সে যে তার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়েছে তা ভাববেন না।'

বিনয়ভূষণের কথার মধ্যে ক্রোধের উত্তাপ নেই, বরং তাঁর হাসিতে স্নিগ্ধ প্রশান্তিই লক্ষ্য করলাম।

অমিয়বাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'সে তো ঠিক-ই।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বরং ছেলেবেলার শিক্ষার ভিত আমাদের নড়বড়ে বলেই তার ওপর কোন ইমারত দাঁড়ায় না। সব ভেঙে ভেঙে পড়ে।'

আশ্রম-পরিক্রমা সেরে এবার আমরা অফিস-ঘরে এসে বসলাম। ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ভূমানন্দের এক দেয়াল জোড়া প্রতিকৃতি। গেরুয়া-ভূষিত এক দীর্ঘকায় পুরুষ। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌড়। কালো দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। চোখ-দুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ। এই নির্জীব প্রতিকৃতির চোখ দেখেও মনে কেমন যেন একটু আতঙ্কের ভাব জাগে।

এই প্রতিকৃতির নীচে বিনয়বাবুর চেয়ার টেবিল পাতা। টেবিলের দু'দিকে রাশ রাশ খাতাপত্র। সওদাগরী অফিসের বড়বাবুর টেবিলের কথা মনে পড়ে। দেয়ালে ঠেস দেওয়া গোটাতিনেক আলমারি: যেটায় কাঁচের পাল্লা, তার মধ্যে গীতা উপনিষদ আর রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণের সঞ্চয় চোখে পড়ল। পাল্লায় ঢাকা আলমারিগুলিতে কী আছে ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। বলা ভালো, চেষ্টা করলাম না।

বিনয়বাবু চেয়ারটায় বসলেন তো না যেন তলিয়ে গেলেন। তরপর সেই চেয়ারের গহ্বর থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসুন। কী খাবেন বলুন। সরবত না চা। এই গরমে বোধহয় সরবত-ই ভালো। কেউ কেউ অবশ্য চা-ও পছন্দ করেন। বাহাদুর—'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, কিছু চাইনে।'

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালাম একটু: 'বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চলল, এবার আমরা উঠব। অমিয়বাবু, আর দেরি করবেন না।'

অমিয়বাবু বললেন, 'বাঃ, দেরি তো আপনার জন্যেই। এ অঞ্চলে আপনি অতিথি, আমরা গৃহী। কী বলুন বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'তা তো বটেই। তারপর আমার সঙ্গে সরাসরি কথা না ব'লে, অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

নেপালী চাকর বাহাদুর এসে সামনে দাঁড়াল।

তিনি বললেন, 'দু'গ্লাস সরবত নিয়ে এসো। জলদি। আপনারা এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করে তারপর যাবেন।'

বললাম, 'না না। আমার জরুরী কাজ আছে।' তারপর হেসে বললাম, 'আপনারা সন্ন্যাসী। আতিথেয়তায় কিন্তু গৃহীদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আতিথেয়তা সকলেরই ধর্ম। গৃহী-অগৃহী ভেদ নেই। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী এ-কথা কে বলল আপনাকে? আমার মধ্যে কি সন্ন্যাসের কিছু আছে?'

আমি বললাম, 'নামে আর বেশভূষায় অবশ্য নেই। কিন্তু এতদিন আশ্রমে বাস করেও কেন আশ্রমের বেশ নেননি—যদি অপরাধ না নেন, সে কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব।'

বিনয়বাবু হাসলেন, 'কথায় বোঝা যাচ্ছে আপনি কলকাতার নাগরিক। সবাই কি সন্ন্যাসের যোগ্য হয়? এখানে একজন মাত্র খাঁটী সন্ন্যাসী ছিলেন। এই আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বেশ প'রবার এমন যোগ্যতা আজও হয়নি। আপনি হয়তো ভাবছেন আর কবে হবে? আশি বছর বয়স হতে চলল, জীবনে সময় আর কবে হবে। আমিও তাই ভাবি।'

সরবত খেয়ে আমি আর বসলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবুও উঠলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর আমরা বিদায় নিলাম।

বিনয়বাবু আমাদের নিষেধ না শুনে আশ্রমের সীমানা অবধি এগিয়ে দিলেন। ভদ্রতায় সৌজন্যে আমাদের মতো দুজন অবিশ্বাসীর মন যে তিনি জয় করেছেন তাতে কোন আর সন্দেহ নেই।

হাজারখানেক ফুট খাড়া হবে পাহাড়টা। পথ একসময় ভালো ছিল। এখন আবার অনাদর অবহেলার ছাপ পড়েছে। ছোট ছোট জংলা আগাছায় ভরে উঠেছে জায়গাটা।

সিগারেট ধরিয়ে অমিয়বাবু বললেন, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?'

বললাম, 'না, কষ্ট আর কি।'

অমিয়বাবু বলতে লাগলেন, 'এখন তো সহজেই যাতায়াত চলে। পচিশ ত্রিশ বছর আগেও খুব দুর্গম ছিল এ জায়গা। বাঘ-টাঘ বেরোত। এখনো সন্ধ্যার পর শহরের লোকজন এদিকে আসতে ভয় পায়।'

আমি বললাম, 'সেটা খুবই স্বাভাবিক। বাঘ না হোক, সাপের ভয় তো আছেই।'

অমিয়বাবু বললেন, 'সাপ-বাঘের চেয়ে মানুষের ভয় বুঝি কিছু কম? শুনেছি ভূমানন্দকেও লোকে দারুণ ভয় করত। তাঁর নাকি মারণ উচাটন-বশীকরণের ক্ষমতা ছিল।'

বললাম, 'জায়গাটাই তো তন্ত্রমন্ত্রের। তা ছাড়া মানুষের মনোভূমিও তখন মন্ত্রমুগ্ধতার অনুকূল ছিল। এখন আর ওসব খাটে না। এখন জঙ্গল ক্রমেই সাফ হচ্ছে। বনের আর মনের দুই-ই।'

আমার সঙ্গী বললেন, 'আপনি খুব আশাবাদী। আমার তো মনে হয় আমাদের মনের অরণ্য সাফ হতে এখনো ঢের দেরি। মানুষের এক একটা মন তো নয়--এক একটা আফ্রিকা মহাদেশ।'

মন ছেড়ে ফের আমরা এই বন্য পাহাড়ের প্রসঙ্গে এলাম। উৎরাইয়ের পথে এবং নীচে নেমে গাড়িতে বসে অমিয়বাবু এই আশ্রমের ইতিহাস আমাকে শোনালেন। এই ইতিহাসের মধ্য কতখানি সত্য আর কতখানি লোকের মুখে মুখে তৈরী কিংবদন্তী আছে তা তিনি বেছে বার করবার চেষ্টা করলেন না। যাচাই-বাছাইয়ের কাজে আমিও যে বিশেষ উৎসাহ দেখালাম তা নয়।

ভূমানন্দ প্রথম যৌবনে পূর্ববঙ্গের কোন এক পাড়াগাঁ থেকে এখানে বোধ হয় জীবিকার খোঁজেই এসেছিলেন। ঘরে সদ্য-বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছিলেন ছ'মাসের মধ্যেই ফিরে যাবেন। যাওয়া আর হয়নি। কামাখ্যার কোন এক মোহিনী তাঁকে বশীকরণের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল। কয়েক বছর পরে তার মৃত্যুতে সে-জাল ছিঁড়ে যায়। মোহিনীর ফাঁদ থেকে বেরোলেও, ভূমানন্দ কিন্তু আসামের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার পথ আর খুঁজে পান না। না পেয়ে তিনি একটা পাহাড়েই থেকে যান। সেই পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে এক দিব্য আশ্রম গড়ে তোলেন। নাম রাখেন সিদ্ধকূট। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর সহযোগী হন বিনয়ভূষণ। কেউ কেউ বলেন তাঁরা ছিলেন স্কুলের সহপাঠী। কারো কারো মতে এখানেই তাঁদের আলাপ পরিচয় আর বন্ধুত্ব হয়। বড় বিশ্বস্ত বন্ধু বিনয়ভূষণ। একই সঙ্গে রাজ সন্ন্যাসীর তিনি মন্ত্রী সেনাপতি, সওদাগর আর কোটাল। দেখতে অবশ্য একেবারে নফরের মতো।

কেউ কেউ বলেন, এও ভূমানন্দের বশীকরণের ফল। তারই প্রভাব আর প্রতাপ বিনয়ভূষণের সমস্ত ব্যক্তিত্ব শুষে নিয়েছে। সমবয়সী সমধর্মী বন্ধু হয়েছে অনুচর, দাসানুদাস। কিন্তু বন্ধুই হোক আর দাসইহোক, এমন বিশ্বস্ত মানুষ ভূমানন্দ জীবনে আর কাউকে পাননি; মরণেও না। ভূমানন্দের মৃত্যুর পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন নিন্দার কথা, তাঁর চরিত্রের কোন বিরূপ সমালোচনা বিনয়ভূষণের মুখে কেউ শুনতে পাননি। বরং প্রাণপণে তিনি বন্ধুর সমস্ত অকীর্তি আর অপবাদকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছেন। কখনো বা তাঁর মধুর আচরণে, স্মিত সুন্দর কথায় আর হাসির আবরণে, কখনো বা

দুরূহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কুয়াশায়।

খ্যাতি কীর্তি ভূমানন্দের কম ছিল না। তাঁর আধ্যাত্মিক ধর্মমতে কেউ বিশ্বাস করুক আর না-করুক, তাঁর সংগঠনী শক্তিকে স্বীকার না করে উপায় নেই। নিঃস্ব কপর্দকহীন হয়ে এসে এই গভীর জঙ্গলে, অনাবিষ্কৃত অনুর্বর পাহাড়ে তিনি এক উপনগর গড়ে তুলেছিলেন। আশ্রমের নামে শহরে তাঁর প্রেস ছিল, কাঠের ব্যবসা ছিল, লোকহিতের জন্য স্কুল-অতিথিশালা, অনাথাশ্রমও পরিচালনা করেছিলেন। এসব শুধু বশীকরণ-বিদ্যায় চলে না, প্রখর বিষয়বুদ্ধিও থাকা চাই। অবশ্যই অর্থ তিনি ধনী শিষ্যদের কাছে থেকেই পেয়েছেন। ধনীরা পেয়েছেন বাণী। তাঁর উদাত্ত গম্ভীর ললিতকণ্ঠের শাস্ত্রপাঠ আর ব্যাখ্যা শুনে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ এসে ভিড় করত। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীরা সংখ্যায় বেশি ছিল। থাকতে চাইতও বেশিক্ষণ। যারা সমতলে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালার মধ্যে আর ফিরে যেতে চাইত না, তাদের জন্য এই পাহাড়ের চূড়ায় মহিলা-শাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ভূমানন্দ। শোনা যায়, সেই শাখায় যত ফুল ফুটেছে তার সবই সুন্দর, মধুর আর রমণীয়। অনিচ্ছুক স্বামী কি অভিভাবককে নাকি নিজের মন্ত্রেতন্ত্রে গাছ আর পাথর বানিয়ে রাখবার ক্ষমতা ছিল ভূমানন্দের। কারো কারো উপর মন্ত্রবল প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সাধ করে বৃক্ষ আর প্রস্তর হয়ে আশ্রমের শোভা বাড়াত।

শিষ্যাদের ওপর ভূমানন্দের এই পক্ষপাত নিয়ে তাঁর সামনে কারো কিছু বলবার সাহস ছিল না। পরোক্ষে কেউ যদি অস্ফুট স্বরে কিছু বলত, কানাঘুষা করত—তাদের কানে অমৃতের মন্ত্র ঢেলে দেওয়ার জন্যে ছিলেন বিনয়ভূষণ। তিনি বলতেন, নারী আদ্যাশক্তির আধার। সৃষ্টি-স্থিতির সহায়িকা। যে পুরুষের শক্তি অসাধারণ—আদ্যাশক্তি নানা আকারে, নানা রূপে তাঁকে ঘিরে রাখেন। তাতে কারো কোন ক্ষতি হয় না, বরং জগৎ-সংসারের তাতে লাভ হয়। সেই অসাধারণ পুরুষের তাতে সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়ে, দানের ক্ষমতা বাড়ে, তাতে পৃথিবীর দৈন্য হ্রাস পায়।

বিনয়ভূষণ কখনো বা বলতেন, সাধারণ গৃহীরা নারীকে যে-চোখে দেখেন, যাঁরা অগৃহী তাঁরা সে-চোখে দেখবেন কী করে? গৃহীর কাছে সম্ভোগের একটি মাত্র পথ, একটি মাত্র পদ্ধতি, একটি মাত্র স্থান—তাঁর শয়নগৃহ। কিন্তু যিনি গৃহের বন্ধন স্বীকার করেননি তাঁর সম্ভোগের কোন বাঁধা পথ নেই, নির্দিষ্ট কোন রূপ কি মূর্তি নেই। তাঁর উপভোগের প্রকরণ অসংখ্য। তিনি দৃষ্টিতে ভোগ করেন, বাণীতে ভোগ করেন, স্বপ্নে চিন্তায় কল্পনায় সম্ভোগ করেন। মহাপুরুষ যিনি, তিনি মহাশক্তির মহাপ্রেমিক। সেই প্রেম তাঁকে প্রভূত কর্মক্ষমতা সৃষ্টিক্ষমতা জোগায়। এই জন্যেই প্রেম তাঁর প্রয়োজন, প্রেম তাঁর ইন্ধন।

কখনো বা বিনয়ভূষণ বলতেন, আসলে ভূমানন্দের কোন কিছুতে আগ্রহ নেই আসক্তি নেই। মহাসমুদ্রেই যত নদী উপনদী শাখানদীরা মিলিত হয়ে ধন্য হয়। ভূমানন্দের সঙ্গ-সান্নিধ্য সেই সমুদ্র। তাতে অনবরত ভক্তির ধারা প্রীতির ধারা এসে মেশে।

বিনয়ভূষণ নিজে অকৃতদার। এখন বুড়ো হয়েছেন। কিন্তু যৌবনেও মেয়েদের ধারে কাছে তিনি ঘেঁষতেন না। মেয়েরাও যে তাঁর সম্বন্ধে কোন আকর্ষণ বোধ করত আশ্রমের বাইরে কি ভিতরে কেউ কোনদিন সে কথা বলেনি। ভূমানন্দের অলৌকিক ক্ষমতায় যারা বিশ্বাস করত তারা বলত আশ্রমের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর বন্ধুর ভিতরটা শুকনো কাঠ আর পাথরের মতো নীরস শক্ত করে রেখেছিলেন। হয়তো তাই। কিন্তু বিনয়ভূষণ রসসরোবরের কাছে না গিয়ে, কী করে রসতত্ত্বের অমন চমৎকার ব্যাখ্যা করতেন লোকের কাছে তা কম বিস্ময়কর ছিল না। অবশ্য সবাই বলত এও ভূমানন্দেরই লীলা। তাঁরই বাণী বিনয়ভূষণ মুখস্থ করতেন। ভাষা-ব্যাখ্যার কমা সেমিকোলনটি পর্যন্ত সবই ভূমানন্দের।

আশ্রমের উন্নতির পথে কোন বাধা ছিল না। ভক্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। আশ্রমিকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি আর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি দু'দিকেই চোখ রেখেছিলেন ভূমানন্দ।

তারপর কী একটা গোলমাল হ'ল। আশ্রমের একটি গাছ হঠাৎ একটি জীবন্ত পুরুষ হয়ে উঠল। হয়তো তার ওপর যথাবিধি মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করেননি ভূমানন্দ। তাই যাকে তিনি কাঠ করে রেখেছিলেন তার মধ্যে দাবাগ্নি জ্বলল। সামান্য ক্ষীণজীবি জজ-কোর্টের অল্প-মাইনের কেরানীটি

থানায় গিয়ে ডায়েরী করল—ভূমানন্দ তার সুন্দরী স্ত্রী মঞ্জরীকে আশ্রমে বন্দিনী করে রেখেছেন। সেই সহায়সম্বলহীন কেরানীর নালিশ করবার মতো মনোবল কোথায় ছিল কে জানে। তার তো তপোবল ব'লে কিছু ছিল না। তবে শোনা যায় অনেকেই তাকে সাহায্য করেছিলেন। অনেক ভক্ত তাঁদের গোপন অভিযোগ যুক্ত করে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে।

যাতে আদালতে কেস্‌টা না ওঠে তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন বিনয়ভূষণ। কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা তো সব-সময় সফল হয় না, শক্তিমানের শক্তিও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভূমানন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যেদিন জারী হ'ল, বিনয়ভূষণ বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন আত্মগোপন করতে। ভূমানন্দ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ধ্যানাসনে বসে থেকে বললেন, 'তাই করব। তুমি একদিনের জন্য আশ্রমিকদের নীচে নেমে যেতে বলো। একদিনের জন্য ওদের সরিয়ে দাও।'

বিনয়ভূষণ অক্ষরে অক্ষরে আদেশ মানলেন। আশ্রম শূন্য হ'ল; সন্ধ্যার পর অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত হ'ল। ধ্যানাসন ছেড়ে পাহাড়ের কিনারে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালেন ভূমানন্দ। জমাট অন্ধকারের মতো আর একটি বিশাল শিলা নদীর মধ্যে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। ভূমানন্দ সেখানে পা রাখলেন। তারপর যে কী হ'ল তা আর জানা যায় না। আশ্রমের মালী দারোয়ান কি দু'একজন বাসিন্দা যারা জেনেছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি পাহাড়ের ধস্‌ নামবার শব্দ শুনেছিল। কয়েকদিন আগে থেকেই ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যা সুরু হয়েছে। দুই তীরে গাছপালা ভেঙে জনপদ ভাসিয়ে করাল স্রোত কোথায় ছুটে চলেছে কে জানে।

কিন্তু পুলিশের ভয়ে ভূমানন্দ ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, এ কথা ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করে না। বিনয়ভূষণ তো করেনই না। যদি জলেই লীলা সংবরণ করে থাকেন ভূমানন্দ নিজের তাগিদেই করেছিলেন। তাঁর অন্তরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা নিভাবার আর কোন উপায় ছিল না। তা ছাড়া তিনি নাকি ভক্তদের আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর দেহান্ত হ'লে জলেই যেন সমাধি দেওয়া হয়। আগুন তাঁকে সারাজীবন জ্বালিয়েছে, মৃত্যুর পর শীতল জলই তাঁর কাম্য। তাই আশ্রমে ভূমানন্দের সিদ্ধি-শৈল আছে, অন্তর্ধান-শিলা আছে, কিন্তু সমাধিস্থান নেই। কারো কারো ধারণা ভূমানন্দ এখনো বেঁচে আছেন। কেউ কেউ বলেন দেশান্তরে গিয়ে দেহরক্ষা করেছেন। কাপুরুষেরা বহুবার মরে, মহাপুরুষেরা বহুরকমে মারা যান।

আশ্রমের সামান্য যে কয়েকজন শিষ্যানুশিষ্য এখনো আছেন তাঁরা নাকি গভীর রাত্রে ভূমানন্দের ছায়াদেহ দেখতে পান। অঙ্গে সেই গেরুয়া ভূষণ, মাথায় পাগড়ি, হাতে যষ্ঠি, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা।

অমিয়বাবু কাহিনী শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। গাড়ি রেল-কোয়ার্টারে ঢুকল। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট বাড়ি; সামনে ফুলের বাগান, জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা।

আমি তাঁর হাসির উত্তরে বললাম, 'রহস্যময় পুরুষ।'

তিনি বললেন, 'কে রহস্যময়?'

আমি বললাম, 'স্বামী ভূমানন্দ।'

অমিয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'তাঁর চেয়েও বেশি রহস্যময় ওই সাদা-ফতুয়ার সিধে-মানুষ বিনয়ভূষণ। আমি আরো কয়েকবার ওঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। আশ্রমের কাজ নিয়ে উনি নিজেও আমার অফিসে মাঝে মাঝে আসেন। নানা ভাবে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু আসল রহস্যটা আজও ভেদ করতে পারিনি।'

বললাম, 'কিসের রহস্য?'

অমিয়বাবু বললেন, 'ওঁর নিজের জীবন-রহস্য। কোন্‌ আকর্ষণে কোন্‌ ইনটারেস্টে বিনয়ভূষণ এখনো এখানে পড়ে আছেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'বোঝা এমন কি শক্ত। জীবিকার টানেই পড়ে আছেন। এই বয়সে নূতন কাজকর্ম খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়। আশ্রমের যেটুকু সম্পত্তি এখনো আছে তার উপস্বত্বে দিব্যি দিন কেটে যায়—কর্তৃত্ব আছে, পদগৌরব আছে, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন আছে, মানুষের আর কী চাই।'

অমিয়বাবু বললেন, 'সাধন-ভজনে উনি যে খুব বিশ্বাস করেন তা তো মনে হয় না। যদি

করতেন, নিজেও গেরুয়া পরতেন, তারপর একদিন না একদিন আনন্দ হয়ে বসতেন। ভূমানন্দের তিরোধানের পর ওঁর পক্ষে স্বামী হওয়া খুবই সহজ ছিল। কেন হননি উনিই জানেন। বোধ হয় সারাজীবন ধরে মিথ্যা-ভাষণটাই ওঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে—মিথ্যা-ভাষণের ভার আর সইতে চাননি। ওঁর ধরন-ধারণ আচার-আচরণ দেখে মনে হয় ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে যেন ওঁর ওপর সব চাপিয়ে দিয়ে গেছে। বঙ্কুকৃত্যের এক অস্বাভাবিক ধারণা আছে ওঁর মনে। সেই ধারণা আর বদ্ধমূল অভ্যাস থেকে ওঁর নিজেরও বোধ হয় এখন আর সরে আসার সাধ্য নেই।'

একটু বাদে আমি বললাম, 'আচ্ছা, ভূমানন্দের ছায়াদেহ কি ওঁরই রটনা?'

অমিয়বাবু বললেন, 'আমার তো মনে হয় ছায়াদেহ উনি নিজেই। যে গেরুয়া-বেশ দিনের বেলায় পরতে ওঁর লজ্জা, সেই বেশ উনি রাত্রির অন্ধকারে প'রে তার মাহাত্ম্য অনুভব করতে চেষ্টা করেন। হয়তো মাঝে মাঝে তাঁরও মনে হয়, দীর্ঘ সংযত শান্ত জীবন বড় একঘেয়ে। তার চেয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে আগুনের মতো জ্বলে ওঠা, ঝড়ের মত বয়ে যাওয়া—তারপর প্রবল বন্যার স্রোতে ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাওয়া অনেক ভালো। যে প্রবল প্রখর উদ্দাম বাসনায় বিপর্যস্ত জীবনকে তিনি পাশ থেকে দেখেছেন, অথচ যার সঙ্গে কিছুতেই একাত্ম হ'তে পারেননি—শেষ বয়সে এসে তার স্বাদ নিতে হয়তো তাঁর সাধ যায়।'

হেসে বললাম, 'অসম্ভব নয়। মানুষের সাধের অন্ত নেই। আচ্ছা, সেই মঞ্জরী দেবীর কি হ'ল? যাকে নিয়ে এত কাণ্ড?'

অমিয়বাবু বললেন, 'তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্রমেই রয়ে গেছেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারেননি। এদিক থেকে মৃত্যুর পর ভূমানন্দ জয়ী হয়েছেন। তিনি বিদ্যুৎলতার মতো ওই মেয়েটির কাছ থেকে জীবনে যা পান নি, জীবনান্তে তাই পেয়েছেন। একাত্ম আনুগত্য। সেই লতা এখন শুকনো লতা। জরায় জীর্ণ। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতাপ ছিল। আশ্রমের কোন কোন বিভাগ এখনো তাঁর নিজের দখলে আছে।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা, বিনয়ভূষণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী রকম?'

অমিয়বাবু হাসলেন, 'উঁহু, মোটেই সেরকম কিছু নয়। বরং উলটো। একেবারে আদায় কাঁচকলায়। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ভেতরে নাকি দারুণ রেষারেষি। এখন অবশ্য সে ঝাঁজ আর নেই। দুজনেরই বয়স হয়েছে।

আশ্রমেরও তো আর বিশেষ কিছু নেই। ঝগড়া করবেন কী নিয়ে?'

হেসে বললাম, 'বিরোধের ইচ্ছা যদি থাকে, বিষয় তেমন না থাকলেও চলে। বোধ হয় এই সুখেই বিনয়বাবু আশ্রমে রয়ে গেছেন। ঝগড়া করবার সুখ, বিবাদ-বিসংবাদ করবার সুখ। ভূমানন্দ বেঁচে থাকতে যা তিনি পারেন নি। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বিনয়ভূষণের ভূমিকা অনুচরের নয়, পার্শ্বচরের নয়। সমবাহু সমশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীর।'

অমিয়বাবু হেসে উঠলেন, 'আপনার আবিষ্কার অসাধারণ! যোগীর সুখ কি শেষ পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়?'

গেটের সামনে এসে অমিয়বাবু তাঁর জীপের ব্রেক কষলেন।

বৈশাখ ১৩৬৭

বন্দিনী

নানা বয়সী মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চায় ছোট লেডীজ পার্কটা ভরে গেছে। তবু কোনরকমে একটি বেঞ্চ দখল করে বসে দুই সখী সারা বিকেল ধরে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল। দুজনে কলেজে একসঙ্গে পড়ত। অনসূয়া রায় বছর দুই হল বি এ পাস করে সরকারী অফিসে ঢুকেছে। শ্রীলেখা ঘোষালও পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু পাস করতে পারেনি। তবে রেজাল্ট বেরোবার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে সহায় করে সে আরো একবার পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু একই ফল। মানে

একই রকমের বিফলতা। শ্রীলেখার সঙ্কল্প সে আরো একবার পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তার স্বামীর তাতে সায় নেই। অরুণ নাকি বলেছে, "এ অবস্থায় রিস্‌ক না নেওয়াই ভালো। মাস চারেক পরেই তো তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।" বন্ধুর পরিপুষ্ট দেহের দিকে চেয়ে অনুসূয়া একটু হাসল, "আমিও তাই বলি। তোর কাজ নেই আর ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে। বেশ তো আছিস। সংসারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ-র পর এম এ ডিগ্রী নিতে যাচ্ছিস। তোর আর ভাবনা কি।"

অনসূয়ার হাসি, কথা আর তাকাবার মানে বুঝতে পেরে শ্রীলেখা একটু লজ্জিত হল। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে একটু টেনে বসল, তারপর বন্ধুকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই কেবল আমার সুখটাই দেখলি, দুঃখটা বুঝতে পারলিনে। যাই বলিস, আজকালকার মেয়েদের স্বামী-সংসার একদিকে আর নিজের ক্যারিয়ার একদিকে। তুই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করে নিয়েছিস।'

অনসূয়া বলল, 'ছাই ক্যারিয়ার। কেরানীগিরি আবার একটা ক্যারিয়ার নাকি। তাও তো এবার স্ট্রাইকের জন্যে যেতে বসেছিল।"

শ্রীলেখা বলল, "যাই হোক, ঝামেলা তো মিটে গেছে। চাকরিতে তোর প্রসপেক্ট আছে। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে চাই কি তুই অফিসার গ্রেডে চলে যেতে পারিস। আমি খাঁচার পাখি। পড়াশুনো যদি না হয় আমার যা হবার হয়ে গেল। আর তুই মুক্ত পাখি। অফিসের ওই সময়টুকু ছাড়া তুই যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতে পারিস।"

অনসূয়া বলল, "উড়ে বেড়াবার জ্বালা আছে রে। ব্যাধ তীর-ধনু হাতে পিছনে পিছনে লেগেই আছে। তীরের ডগায় বিঁধে যে কোন মুহূর্তে ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।"

শ্রীলেখা আরও ঘন হয়ে বসে সখীর চিবুক তুলে ধরল, "আহাহা, কি সুখের ভয় রে। ধুলোয় ফেলবে কেন, পুষ্পশরে যারা বেঁধে রক্তাক্ত পাখিকে তারা বুকেই তুলে নেয়। তারপর—" শ্রীলেখা এবার অনসূয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে আদর করে। পাখি ছাড়া ব্যাধেরও তো দুটি ঠোঁট আছে।"

মুখ সরিয়ে এনে শ্রীলেখা এবার জিজ্ঞাসা করল, "বল না অনু, সে ব্যাধ তোর কোথায়। অফিসে না অফিসের বাইরে।"

অনসূয়া বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে বলল, "তুই যা ভাবছিস তা নয়। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তোকে আর একদিন বলব।"

শ্রীলেখা ভাবল অনসূয়া বড় চাপা মেয়ে। দু'বছর একসঙ্গে পড়ে সে ওকে চিনেছে। যারা বুদ্ধিমতী তারা বোধ হয় চাপাই হয়। শুধু বুদ্ধিমতী নয়, অনসূয়া সুন্দরীও। কালোর ওপর সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা। টানা নাক-চোখ। বলতে কইতে পারে। ওকে ভালোবাসার জন্যে ছেলেরা পাগল হবে না কেন। শ্রীলেখা সুন্দরী নয়। রং ফর্সা হলেও বেঁটে মোটা। তারপর আবার মুখচোরা। তাই দায় হিসাবে বাপের ঘাড়ে পড়েছিল। তিনি প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা দেনা করে মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন। শ্রীলেখার ভারি লজ্জা হয় এজন্যে। অনসূয়াকে এ লজ্জা পেতে হবে না। এ দুঃখ ভোগ করতে হবে না। ওকে যে নেবে সে শুধু ভালোবেসেই নেবে। ভালোবাসা ছাড়া সে ওর কাছে আর কিছুই চাইবে না। আহা সে কী সুখ।

"কে সে? বল না অনু?"

শ্রীলেখা আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

অনসূয়া এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "বললাম তো আর একদিন বলব।"

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল, "ও আচ্ছা। না বলতে চাস না বললি। না বললে আমি তো আর জোর করে তোর পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারব না।"

"গোপন কথা বুঝি পেটে থাকে।" অনসূয়া একটু হাসল।

কিন্তু শ্রীলেখা হাসল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

বন্ধুর দেখার বস্তুটি কী লক্ষ্য করতে গিয়ে দুটি পামগাছের আড়ালে পুরোন কনভেন্ট স্কুলটা চোখে পড়ল অনসূয়ার. এদিককার জানলাগুলি বন্ধ। বোধ হয় রাস্তার ধার বলেই এই সর্তকতা।

কিন্তু বাড়ির জানলা বন্ধ হলেও স্মৃতির দুয়ার এরই মধ্যে খুলে গেছে অনসূয়ার। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন—চারটি বছর সে ওই কনভেন্ট স্কুলে কাটিয়ে দিয়ে গেছে। কৈশোরের প্রথম তারুণ্যের পর কত সুখ-দুঃখের আনন্দ-আহ্লাদের স্মৃতি ওই স্কুলবাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্ব আর ঝগড়া করেছে দিনরাত। তারা আজ কোথায়। সেই সব দিনগুলিই বা কোথায়। কত টিচারের স্নেহ পেয়েছে, বকুনি খেয়েছে। কাউকে ভালোবেসেছে, কাউকে দেখতে পারেনি। তাদের সঙ্গেও অনসূয়ার জীবনের আর কোন যোগ নেই। যোগ নেই তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রতনদির কথা। আশ্চর্য, তাঁর কথা মাঝে মাঝে কেন এত বেশি করে মনে পড়ে অনুসূয়ার? তাঁর স্মৃতি তো সুখের স্মৃতি নয়, শুভ আর সুন্দর জীবনের স্মারক নয়।

"এই শ্রীলেখা, শোন।"

বন্ধুর কাঁধ ধরে নাড়া দিল অনসূয়া।

শ্রীলেখা মুখ ফিরাল, "কী বলছিস?"

"ওই কনভেন্ট স্কুলের সাদা বাড়িটা চিনিস? মানে কোন মিস্ট্রেস কি ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ টালাপ হয়েছে? তোরা তো ছ' মাস হ'ল এ পাড়ায় এসেছিস।"

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল, "না ভাই আমার তো স্কুল-কলেজের পাট চুকেই গেছে। আমার আর ওসব জেনে কী হবে।"

অনসূয়া একটু হেসে বলল, "তাই নাকি? জানিস, ওই কনভেন্টে আমি ছেলেবেলায় অনেকদিন কাটিয়েছি। অনেক বছর।"

শ্রীলেখা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর ছেলেবেলার কথা কে শুনতে চাইছে অনু?"

অনসূয়া বলল, "আমার ছেলেবেলার জীবন বুঝি আর আমার জীবন নয়? শোন, ওখানে আমাদের একজন মিস্ট্রেস ছিলেন রতনদি। মিস সরকার। পুরো নাম রত্নমালা সরকার। আমরা যখন তাঁকে দেখি তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। তবু সেই বয়সেও তিনি দেখতে যে কী সুন্দর ছিলেন তোকে কি বলব।"

শ্রীলেখা বাধা দিয়ে বলল, "তোর কিছু বলতে হবে না। চল এবার উঠি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ওঁর ফিরবার সময় হয়েছে। শাশুড়ী নিশ্চয়ই আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। চল বরং বাড়িতে গিয়ে এবার এক কাপ চা খাবি। তারপর যদি তোর সময় হয় আর ইচ্ছে থাকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে যাবি।"

অনসূয়া বলল, "নিশ্চয়ই আলাপ করব। বিয়ের সময় তো আর সে সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখান থেকে তোদের বাড়ি তো মোটে দু মিনিটের পথ। ওই তো দেখা যাচ্ছে। তোর বর এসে নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকবে। আর যদি বেশি লাজুক হয়, হাতছানিও দিতে পারে। তখন আমরা একছুটে ওখানে গিয়ে পৌঁছব। ঈস, কী ছুটোছুটিই না তখন করেছি। জানিস আমি খুব ছুটতে পারতাম। এখনো পারি। রতনদির কাছে কী বকুনিই না খেয়েছি দুষ্টুমি আর দুরন্তপনার জন্য। রোজ তাঁর ব্ল্যাক বুকে আমার নাম উঠত। শুধু কি আমার? কারো নামই বাদ যেত না। বোর্ডিং হাউসে তখন আমরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন ছিলাম। ছোট বড় সব মেয়েকেই তিনি কালো দাগে দাগিয়েছেন। অস্থির হোসনে। বোস আর একটু। আর মিনিট পাঁচ-সাত নিশ্চয়ই অরুণবাবু তোর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন।"

"হ্যাঁ, দেখতে সুন্দরী হলে কী হবে, রতনদির মন ভালো ছিল না। কী কড়া মেজাজ আর কী নিষ্ঠুর স্বভাবই যে তাঁর ছিল তুই ভাবতেও পারবিনে। আমরা মেয়েরা ছিলাম তাঁর কাছে মশা আর ছারপোকার মত। যদি পারতেন তিনি আমাদের টিপে মারতেন। এমন একজন জাঁদরেল মেয়েমানুষের হাতে বোর্ডিং হাউসের সব রকম কর্তৃত্ব যে কী করে গিয়ে পড়েছিল তা জানিনে। স্কুলে পজিশনের দিক থেকে তিনি হেডমিস্ট্রেস তো দূরের কথা, সেকেণ্ড কি থার্ড টিচারও ছিলেন না। বোর্ডিং হাউসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদও তাঁকে কেউ দেয়নি। আমার মনে হয়, তিনি নিজেই সব জোর করে দখল করেছিলেন। বয়সে ছিলেন তিনি সবচেয়ে বড়। কনভেন্টে এসেছেনও সবাইর

আগে। তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মত জোর কারো ছিল না। সে চেষ্টাও বোধ হয় কেউ করেননি। হেডমিস্ট্রেস মিস পামার ছিলেন শান্তশিষ্ট নির্বিবাদী মানুষ। স্কুলের কাজ আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিল। থিয়োলজির ওপর তাঁর অনেক আর্টিকেল শুধু মিশনারি পত্রিকায় নয়, অন্য কাগজেও বেরোত। সেকেণ্ড টিচার রেবাদির ইন্টারেস্ট ছিল সাহিত্যে। তিনি ইংরেজী নভেল নাটক পড়তে ভালোবাসতেন। থার্ড টিচার সুনন্দাদির ঝোঁক ছিল খেলাধুলো আর গার্ডেনিংএ। তিনি মেয়েদের নিয়ে টেনিস ব্যাডমিন্টন খেলতেন। আমরাও তাঁকে খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু বলব কি ভাই। আমাদের বুড়ী রতনদির আর কোন কিছুতে ইন্টারেস্ট ছিল না। না ধর্মে, না সাহিত্যে, না সেলাই বোনায়, না খেলাধুলোয়। কিন্তু মানুষের তো একটা না একটা অকুপেশন চাই। বুড়ীর কাজ ছিল ছোটবড় সব মেয়ের পিছু লাগা। ওঁর কলীগদেরও তিনি ছেড়ে দিতেন না। তাঁদের পিছনেও তিনি গোয়েন্দাগিরি করতেন। একজনের কথা আর-একজনের কানে লাগাতেন। একজনের অযথা নিন্দা আর-একজনের কাছে করা ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। তিনি হয়তো ভাবতেন এই করে করে তিনি কারো কারো শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা পাবেন। কিন্তু তাই কি আর পাওয়া যায়? দিদিমণিদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতেন না, শ্রদ্ধা করতেন না, তবে ভয় করতেন। আর সহ্য করে যেতেন। কনভেন্টের অথরিটির সঙ্গে তাঁর কিসের একটু বাধ্যবাধকতা ছিল আমরা কেউ জানিনে। আড়ালে আবডালে দিদিমণিদের মধ্যে কেউ তাঁকে বলতেন শাশুড়ী আবার কেউ বা বলতেন দিদিশাশুড়ী। সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস পেতেন না। যদি তিনি এসব শুনতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর আদরের পুতের বউ আর নাত-বউদের জিভের ডগা আর নাকের ডগা বঁটি দিয়ে কেটে ছেড়ে দিতেন।

একেই তো কনভেন্টের বাঁধাধরা রুটিন লাইফ। তারপর রতনদির এই অত্যাচারে আমরা ত্রাহি ত্রাহি করছিলাম। আমাদের ভোর পাঁচটায় উঠতে হত। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের জায়গায় বসে প্রেয়ার। তারপর পড়তে বসা। নাওয়ার ঘণ্টা পড়লে নাওয়া, খাওয়ার ঘণ্টায় খেতে যাওয়া। চারটে পর্যন্ত স্কুল। তরপর জলযোগ। তারপর খেলতে যাওয়া। কনভেন্টের উঁচু পাঁচিলঘেরা মাঠ আছে। সেই মাঠে দিদিমণিদের ইচ্ছেমত আমাদের খেলতে হবে। কোন্‌দিন কোন্ খেলা হবে তাও শুনেছি আমাদের স্পোর্টসের সুনন্দাদি নয় রতনদিই ওপর থেকে সব ঠিক করে দিতেন। যিনি জীবনে কোনদিন বল ধরেননি, র‍্যাকেট ছুঁয়ে দেখেননি, তবু অন্য রুটিনের মত তাঁর হাতেই ছিল খেলার রুটিনের সুতো। তিনি সুতো নাড়তেন আর আমরা ছোট-বড় পুতুলের দল নাচতাম, ফিরতাম, ঘুরতাম, ছুটতাম। আচ্ছা বল তো শ্রীলেখা, এ ধরনের খেলায় কি আনন্দ পাওয়া যায়? অন্যের ইচ্ছেমত পড়া যায়, কিন্তু খেলাটা যার যার নিজের ইচ্ছেয় হওয়াই তো ভালো। নিজের ইচ্ছেয় না-খেলাটাও খেলা। কিন্তু তা হবার জো ছিল না। একেবারে অসুস্থ হয়ে শুয়ে না পড়লে খেলতে আমাদের যেতেই হত।

সেবার একদিন আমি আর আমার পাশের সীটের বেলা নন্দী যুক্তি করে ঠিক করলাম আমরা খেলতে যাব না। আমরা দুজন তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। বেলা আমার চেয়ে দেখতে ছোটখাটো হলেও বয়সে দু বছরের বড়। মনে মনে তরুণী। আরো দু বছর আগে থেকে সে নভেল পড়ছে আর প্রেমে পড়েছে। তুই শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছিস। সেই প্রমিলারাজ্যে প্রেম আবার কার সঙ্গে। অবাক হবারই কথা। ছুটিছাটায় যখন কনভেন্ট থেকে বাড়িতে যেতাম সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা পুরুষের— তা সে বালকই হোক, যুবকই হোক, বৃদ্ধই হোক কারোরই নাম শুনতাম না, গন্ধ পেতাম না, দাড়ি-গোঁফ দেখতাম না। অবশ্য দিদিমণিদের কারো কারো ঠোঁটে গোঁফের আভাস ছিল—সেই মেয়েলি গোঁফ বাদে। এই অবস্থায় কি করে প্রেম সম্ভব। কিন্তু বেলা ছিল অসাধারণ মেয়ে। ও ছুটিতে যখন বাড়ি যেত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আসত। কেউ বা দাদার বন্ধু, কেউ বা বোনের প্রাইভেট টিউটর, কেউ বা জামাইবাবুর ভাই। যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব জমত তার সঙ্গে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করত। ডাকে না। ডাকের সব চিঠি রতনদি সেন্সর করে দিতেন। চিঠি আনাগোনার অন্য একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। যে সব মেয়ে বাইরে থেকে স্কুলে পড়তে আসত তাদের কেউ কেউ ছিল বেলার কূটনৈতিক দূতী। তারা বই খাতার মধ্যে লুকিয়ে এসব চিঠি

নিয়ে আসত নিয়ে যেত। এই দুঃসাহসিক কাজের বদলে তারা বেলার কাছ থেকে লজেন্স বিস্কিট কি নগদ পয়সা টয়সা পেত।

আমি বেলাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি, 'বেলা অত ঝুঁকি নিতে যাসনে। কবে ধরা পড়বি আর রতনদি তোকে ফাঁসিতে লটকে ছাড়বে।'

বেলা বলেছেন,'দুর, বুড়ী আমার সঙ্গে চালাকিতে পারবে নাকি? রতনদি হাঁটে ডালে ডালে আমি হাঁটি পাতায় পাতায়।'

এই সাহস কেবল বেলার একারই ছিল না। ওর দলে আমাদের ডরমিটারির অন্তত আরো দু-তিনজন মেয়ে ছিল। তবে তাদের সঙ্গে আমার তেমন ভাব ছিল না।

আমি আর বেলা যে সেদিন খেলতে গেলাম না তার কারণ দুখানি চোরাই নভেল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। নির্জন ঘরে বসে আমরা তা পড়ব। আর বেলার বন্ধু সমীর দাস যে চিঠি পাঠিয়েছে আমরা দুজনে মিলে তার জবাব দেব। আমাকে না হলে বেলার চিঠি লেখা হত না। নিজের হাতের লেখার জন্যেও ওর ভারি লজ্জা ছিল। তাই আমাকেই সব করে দিতে হত। কে নাকি বলেছিল আমার হাতে অমুকে এসে তামাক খেয়ে গেছে, বেলাও তেমনি আমার হাতে প্রেম করত। পরে বুঝেছিলাম, ভিতরে ওর আরো একটু মতলব ছিল। যদি ধরা পড়ে আমাকেও জড়িয়ে নিতে পারবে।

সেদিন আমরা খেলতে নামলাম না। জ্বরের ভান করে সেই বোশেখ মাসের গরমেও মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম।

ডরমিটারি একেবারে খালি। একটি মেয়ে তো ভালো, একটি মাছিও কোথাও নেই। স্কুলের ছুটির পর দিদিমণিরা যে যাঁর বেড়াচ্ছেন, বুনছেন, বই পড়ছেন, চিঠি লিখছেন। বেলা আর আমি স্প্রীংয়ের খাটে উঠে বসে গল্প করতে লাগলাম। বেলা প্রাণ ভরে তার ভালোবাসার গল্প বলে গেল। ওর মন আজ বড় উদার। বেলা বলল, 'হাঁ করে তুই কেবল আমার কথাই শুনছিস। তুই নিজেও লভে পড়-না অনু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

আমি হেসে বললাম, 'না ভাই, তার আর দরকার নেই। একা তোর প্রেমের জ্বালাতেই আমি অস্থির। এর পর যদি নিজেও পড়ি আর উপায় থাকবে না।'

তুই তো জানিস লেখা, স্কুলে কেন কলেজ লাইফেও মকরকেতন আমার কাছে শুধু কৌতুকের কেতনই ছিলেন। যারা প্রেমে পড়ত আর ছটফট করত তাদের দেখে আমার হাসি পেত।

সমীরের চিঠিটার কী জবাব দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ দেখি চোখ দুটি কপালে তুলে বেলা একেবারে চুপ করে গেছে।

আর কেউ নয়, ছায়ামূর্তির মত রতনদি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়ে সাদা রবারের জুতো, তা পরে কনভেন্টের ঘরে, বারান্দায়, করিডোরে নিঃশব্দে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাঁর গায়ে ওই গরমের মধ্যেও ফুলহাতা জামা, পরনে কালোপেড়ে মিহি শাড়ি, ঘন রূপালী চুলের রাশ কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। এই বয়সেও তাঁর গায়ের সে কী রং, টিকোল নাক, পাতলা ঠোঁট, টানা টানা ভুরু। আজ এতকাল বাদে তোর কাছে তাঁর রূপের বর্ণনা দিতে পারছি, কিন্তু সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর রূপ দেখিনি। সেদিন এক ডাইনি বুড়ীকে হঠাৎ সামনে দেখে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম। তাঁর কোটরে বসা চোখ দুটি জ্বলছিল।

'কী করছ তোমরা?'

বেলা অস্ফুট গলায় বলল, 'আমাদের জ্বর হয়েছে।'

'এই বুঝি জ্বরের নমুনা?'

'আজ্ঞে, নার্সকে জিজ্ঞেস করুন।

ডাক্তার দূরে থাকতেন কিন্তু নার্স আমাদের কনভেন্টের মধ্যেই ছিল। আমাদের অসুখ বিসুখ হলে দেখবে, সেবাশুশ্রূষা করবে এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু মুখ-খিচুনির ভয়ে তার হাতের সেবা আমরা কেউ চাইতাম না। তবু বেলা নার্সকে মাঝে মাঝে দু-এক টাকা দিয়ে বশ করেছিল। কিন্তু রতনদি যে তার কথা বিশ্বাস না করে নিজেই আমাদের জ্বর যাচাই করতে আসবেন তা কে জানত?

রতনদি এসে আমার কপালে হাত রাখলেন। সাদা, লম্বা লম্বা বোগাটে আঙুল। ডাইনীর আঙুলের ছোঁয়ায় আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ।'

তারপর বেলার কপালে ফের সেই হাতখানা রাখলেন। কিন্তু তার আগেই জ্বরের জ্বালা আর প্রেমের জ্বালা সব জুড়িয়ে ফেলে বেলা একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। রতনদি তাপ পাবেন কোথায়? তবু তিনি নার্সকে হুকুম দিলেন, 'থার্মোমিটার দাও তো।'

নার্স ভয়ে ভয়ে থার্মোমিটার তাঁর হাতে এগিয়ে দিল।

রতনদি চাদরটা উলটে ফেলতেই সমীরের দেওয়া নভেলখানা বেরিয়ে পড়ল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ। এই জ্বর তোমাদের!'

তা সত্ত্বেও থার্মোমিটার বগলে লাগিয়ে আমাদের দুজনেরই টেম্পারেচার নিলেন। আমি লর্ড ক্রাইষ্টকে মনে মনে ডাকতে লাগলাম। বেলা হিন্দুর মেয়ে। তেত্রিশ কোটির মধ্যে ও অন্তত তেত্রিশ জনের নাম জপ করল। কিন্তু কিছুতেই আমাদের টেম্পারেচার সাড়ে সাতানব্বইয়ের ওপর উঠল না।

রতনদি নার্সকে বললেন, 'ওদের দুজনকে 'সিক রুম'-এ নিয়ে যাও।'

নার্স বলল, 'আজ্ঞে ওরা তো—'

রতনদি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি তাই করো। ওরা যখন অসুস্থ, ওদের 'সিক রুম'-এ নিয়ে রাখাই ভালো।'

আমরা বললাম, 'রতনদি, এবারকার মত আমাদের মাফ করুন।'

তিনি বললেন, 'মাফের কোন কথাই ওঠে না। You are diseased, you require proper treatment.'

সিক রুম ছিল আমাদের কাছে বিভীষিকা। সত্যি সত্যি অসুস্থ হলেও আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইতাম না আমাদের নার্স ঠিক ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ছিল না। তার রণচণ্ডীর মূর্তিই সেখানে আমরা দেখেছি। যেমন তার কড়া ওষুধ, তেমনি কড়া মেজাজ আর তেমনি বিশ্রী পথ্য।

তবু সেই হেল-এ রতনদি আমাদের ঠেলে পাঠালেন। মিথ্যে বলবার শাস্তি আমরা সেখানে দেড় দিন থেকে ভোগ করলাম।

রেবাদি, সুনন্দাদিরা শুনেছি আমাদের পক্ষ নিয়ে একটু বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রতনদি তাঁদের কাউকে আমল দেননি। ধমক দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই ওরা এমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর থেকে আমাকে আর বেলাকে রতনদি খুব চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। অন্য ঘরে বেলার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভয়ে ওর সঙ্গে কথাই বলিনে। তবু রতনদি আমার দিকে কী রকম চোখ করে তাকান। দেখতে ভয় লাগে। তিনি যেন আমার অসৎ বুদ্ধির তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চান।

বেলার কিন্তু এতেও শিক্ষা হল না। সে তেমনি চিঠি চালাচালি করতে লাগল। তার পর একদিন আয়ার হাতে ধরা পড়ে গেল। রতনদি গোপনে গোপনে আয়াকে গোয়েন্দা হিসেবে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একখানা চিঠির সূত্র ধরে বেলার সব চিঠি তার বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ওকে চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম। বেলা জবাব দিয়েছিল, 'ও কথা বলিসনে ভাই। ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে পুড়ে যায়।'

কিন্তু চিঠিগুলি আবিষ্কার করে রতনদি নিজেই পুড়িয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বেলার বাবা এসে তাকে নিয়ে গেলেন। আমরা বললাম, 'ও বেঁচে গেল।'

অবাধ্যতার জন্যে ছোটখাট চুরি কি দুষ্টুমির জন্যে রতনদি এমন আরো দু-তিনটি মেয়েকে কনভেন্ট-ছাড়া করেছিলেন।

এরপর থেকে কনভেন্টে কড়াকড়ি আরো বেড়েই গেল। মেয়েতে মেয়েতে যে বন্ধুত্ব তাও রতনদি পছন্দ করতেন না। আমার মনে হয়, যে কোন দুজনের মধ্যে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা দেখলেই

তাঁর এক ধরনের হিংসে হত। তিনি টিচার আর ছাত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারতেন না। ওপরের ক্লাসের কোন মেয়ের সঙ্গে নীচের ক্লাসের কোন মেয়ের মেলামেশা দেখলে আপত্তি করতেন। তাতেও নাকি খারাপ হবার ভয় আছে।

রতনদি ফুল ভালোবাসতেন না, কবিতা ভালোবাসতেন না, চাঁদের আলো থেকে মুখ লুকিয়ে থাকতেন। পৃথিবীর যা কিছু কোমলতা কমনীয়তা তার ওপর তিনি যেন খড়্গহস্ত ছিলেন।

আমাদের কনভেন্টের লনে কতরকমের ফুল ফুটত। বড় বড় ডালিয়া, ক্যানা, নানা জাতের নানা রঙের লিলি। দেশী ফুলের মধ্যে জুঁই, বেলি, চামেলি। সুনন্দাদি নানা জাতের গোলাপও এনেছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ সেসব ফুল তুলতে পারতাম না। রতনদির ধারণা ছিল ফুল মেয়েদের মনের নরম মাটিকে আরো বেশি নরম করে দেবে। আর সেই মাটিতে যত সব অবাঞ্ছিত আগাছা জন্মাবে। একটি মেয়ে খোঁপায় ফুল পরেছিল বলে তার ফাইন হয়ে গেল। তারপর থেকে খোঁপা বাঁধা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমরা চুল শুধু বিনুনি করে রাখতাম। কখনো দুটি, কখনো একটি।

একবার আমাদের হেডমিস্ট্রেস মেয়েদের ডেকে বলেছিলে, 'তোমরা এই বাগানের ফুলের মত সুন্দর হও, পবিত্র হও।

তা শুনে রতনদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'হেডমিস্ট্রেস জানেন না, ফুলের কীটগুলি তাঁর ডরমিটারিতে গিজ গিজ করছে।'

যত দিন যেতে লাগল রতনদির মেজাজ তত খিটখিটে হয়ে উঠল। রাগ বাড়ল, বকুনির মাত্রা বাড়ল। রেবাদি আর-এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। সুনন্দাদি বিয়ে করে কনভেন্ট ছেড়ে দিলেন। তাই নিয়ে বুড়ীর কি গজগজানি। সুনন্দাদি নাকি আগে থেকেই খারাপ ছিল।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। রতনদির দুটি বড় পুতুল ছিল, কে যেন তা চুরি করে নিয়ে গেল। আমরা সন্দেহ করলাম, নতুন আয়াটারই এই কীর্তি। সে সোনার লোভে দুটো পুতুলকে সরিয়েছে। পুতুল দুটিকে রতনদি সোনা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। কখনো শাড়ি পরাতেন, কখনো ধুতি পরাতেন। আদর করে ডাকতেন, 'আমার নূপুর ঝুমুর।' আয়া কিন্তু কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। রতনদি তাকে অনেক বকলেন, ভয় দেখালেন, লোভ দেখালেন, কিন্তু নূপুর ঝুমুরকে পাওয়া গেল না।

রতনদি দোতলায় পুবদিকের সবচেয়ে নির্জন আর ছোট ঘরটিতে থাকতেন। জিনিসপত্রে বোঝাই বড় একটা ট্রাঙ্ক আর সুটকেস তালাবন্ধ করে তিনি খাটের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুতুল দুটি যে কাঁচের আলমারিটায় থাকত, তাতে তিনি চাবি দিতেন না। মেয়েদের খবরদারি আর শাসন-শাস্তির ফাঁকে তিনি যখনই ঘরে আসতেন সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে পুতুল দুটিকে আদর করতেন। তাদের গয়না বদলাতেন, বেশ পালটে দিতেন। তিনি তাঁর শাসন আর স্নেহকে একেবারে আলাদা দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। শাসনের ভাগ পড়েছিল আমাদের ভাগ্যে আর নিষ্প্রাণ পুতুল দুটির ভাগে ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। কিন্তু সব তাঁর গোপন ছিল। এই নিয়ে কেউ কোন ঠাট্টা তামাশা করলে তিনি চটে উঠতেন। তবু ব্যাপারটা সবাই জানত। দিদিমণিরা বলতেন, 'রতনদির হৃদয়ের সমস্ত মধু ওই পুতুল দুটি চুরি করে নিয়েছে। আমাদের জন্যে হুল ছাড়া আর কিছুই নেই।'

এই পুতুল দুটির বয়স যে কত ছিল তা কেউ ঠিক করে বলতে পারত না। কেউ বলত বিশ বছর, কেউ বলত তিরিশ বছর, কেউ বলত আরো বেশি।

পুতুল দুটি চুরি যাওয়ায় রতনদি একেবারে ক্ষেপে গেলেন। মারমুখী হয়ে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, বললেন, 'পুলিসে খবর দাও।'

হেডমিস্ট্রেস শান্তভাবে বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে পুলিস-টুলিস ডাকলে কনভেন্টের সুনাম নষ্ট হবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, আপনি বরং আর দুটি পুতুল কিনে নিন।'

এতে রতনদি আরো ক্ষেপে গেলেন, 'কী, তোমাদের এত টাকার জোর হয়েছে আমাকে টাকার লোভ দেখাও। আমি তোমাদের প্রত্যেকের বাক্স প্যাটরা তল্লাসী করব। ছাত্রীই হোক আর টিচারই হোক, কাউকে বাদ দেব না। আয়া, নার্স, মেট্রন সব আমার সঙ্গে এসো। আমি সব সার্চ করব।'

কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। সবাই হেডমিস্ট্রেসের ইঙ্গিতে দূরে সরে রইল। কোন ছাত্রী কী কোন টিচার তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না।

রতনদি চেঁচিয়ে কেঁদেকেটে সারা কনভেন্টকে অস্থির করে তুললেন, 'তোরা সবাই আমার শত্রু। আমি এতদিন শত্রুপুরীতে বাস করে এসেছি। আজ বুঝতে পারলাম।'

রাগ করে রতনদি নিজেই পুলিস ডাকতে যাচ্ছিলেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে তুলে এনে তাঁর নিজের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। জ্ঞান অবশ্য তাঁর খানিক বাদেই ফিরে এল। কিন্তু শোকে দুঃখে তিনি সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠতে পারলেন না।

তাঁর ঘর থেকে আমাদের ডরমিটারি বেশ দূরে। তবু অনেক রাত্রে আমরা তাঁর কান্না শুনতে পেতাম, 'আমার নূপুর ঝুমুর রে, আমার নূপুর ঝুমুর রে।'

সেই কান্নায় আমাদের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যেত। এতদিন তাঁর শাসনকে ভয় করেছি। আজ তাঁর কান্নাকে তার চেয়েও বেশি ভয়। অতগুলি মেয়ে থাকতাম আমাদের ডরমিটারিতে। কিন্তু অনেক রাত্রে আলাদা আলাদা মশারির তলায় শুয়ে আমাদের মনে হত আমরা প্রত্যেকে একা। আমাদের যেন কেউ নেই। বাপ মা বাড়িঘর ছেড়ে যেন কতদূরে আমরা এসে পড়েছি। ছোট ছোট সাদা মশারিতে ভরা বিরাট সে ঘরটা এক সাগরের মত। সেই সাগরে আমরা আলাদা আলদা একেকটা দ্বীপ। আমাদের চারদিকে অফুরন্ত কান্নার ঢেউ, 'আমার নূপুর ঝুমুর রে, আমার নূপুর ঝুমুর রে।'

রতনদির হার্ট-ডিজিজ বাড়ল, রক্ত আমাশয় বাড়ল। তারপর তাঁকে কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদে আমাদের স্কুল গরমের জন্যে ছুটি হয়ে গেল। স্কুল খোলার সাত দিন আগে রতনদি মারা গেলেন।

আমরা ভেবেছিলাম আমাদের চার্চের লাগা গ্রেভইয়ার্ডে খুব জাঁকজমক করে আমরা তাঁর সমাধি দেব। তাঁর জন্যে এপিটাফ লেখা হয়েছিল, মার্বেলের স্লাব কেনা হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর ডেড-বডিই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। রতনদির আত্মীয়-স্বজনের কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আনক্লেমড বডি বলে হাসপাতালের অথরিটি কোথায় তাঁর শব সরিয়ে দিয়েছেন কে জানে।

আমাদের হেডমিস্ট্রেস দেশ থেকে ফিরে এসে খুব রাগ করে হাসপাতালকে কড়া চিঠি দিলেন। কেস করবেন বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

রতনদি যে মারা গেলেন তার চেয়েও তাঁর দেহটা যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল সেই দুঃখটাই আমাদের মনে বেশি করে বাজল। তিনি আমাদের হাতের মাটি নিলেন না, যেন পরম অভিমানে তাঁর দেহসুদ্ধ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

তবু আমরা তাঁর জন্যে প্রেয়ার করলাম, তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করলাম। মিটিং-হলে টিচাররা কনভেন্টের জন্যে তাঁর ত্যাগ সেবা আরো নানারকম গুণের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন। আর আমরা মেয়েরা এ-ওকে লুকিয়ে কেন জানিনে, চোখের জল ফেললাম।

রতনদি মারা যাওয়ার পরে পুরোন টিচারদের মুখে, বুড়ো মালীর মুখে তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম। প্রথম যৌবনে রতনদি নাকি কাকে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু সে ভালোবাসা ফিরে পাননি। অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। সবই কিংবদন্তী।

কিন্তু আমার মনে হয় অন্যরকমও হতে পারে শ্রীলেখা। এমন ভালোবাসাও জীবনে আসে হয়তো তা ভালোবাসা নয় শুধু প্যাশন—যা সহ্য করা যায় না। আবার সহ্য না করলে আর একটা দিকে হয়তো একটা পুরো সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অতৃপ্ত তৃষ্ণা যেমন হৃদয়কে শুকিয়ে দেয়, বিতৃষ্ণাও তেমনি। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় শ্রীলেখা একটা মাস্টারি-টাস্টারি নিয়ে ফের এই কনভেন্টে এসে লুকোই। কিন্তু ভয় হয় যদি আমি আর একটি রতনদি হয়ে উঠি!'

অনসূয়া থামল।

পার্কে এখন আর কেউ নেই। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। অন্ধকার এবার ঘন হয়ে উঠল।

চারদিকের গাছপালাগুলির উপর কে তেল কালি লেপে দিয়েছে। কানের কাছে মশার গুনগুনানির আর বিরাম নেই। কিন্তু শ্রীলেখার কিছুই যেন খেয়াল ছিল না। যার জন্যে এত কৌতূহল অনুসূয়ার সেই শেষ আত্মোদ্‌ঘাটনও তার কানে যায়নি। অবাক হয়ে শ্রীলেখা শুধু রতনদির কথাই ভাবছিল। পৃথিবীতে এত সুখ, এত শান্তি, তবু একেকটি জীবন কেন এমন মরুভূমি হয়ে যায়, পাগলের প্রলাপের মত কেন একেবারেই তার কোন অর্থ থাকে না।

ভাদ্র ১৩৬৭

ঝড়

জানলা দিয়ে জোর জলের ঝাপটা আসছে আর ঝড়ের শব্দ। শুয়ে শুয়ে ঝড় দেখতে পাইনে। জানলার বাইরে গাছগুলি বড়ই লম্বা লম্বা আর ফুলের চারাগুলি খুবই ছোট। তাই ওরা কিরকম বেঁকে যায়, মাথা নোয়ায়, ডালগুলি ভেঙে মুচড়ে যেতে থাকে, তা এই বিছানা থেকে আমার চোখে পড়ে না। ঝড় আমাকে দেখা দেয় না, শুধু শব্দ শোনায়।

'জানলা দেওয়ার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা। নাইবা দিলে। থাক না খানিকক্ষণ খোলা।'

'তাই কি হয়, তোর সব ভিজে গেল যে।'

'কিছুই ভেজেনি মা, আমি যে শুকনো সেই শুকনোই আছি।'

'হ্যাঁ, শুকনো না আরো কিছু। বৃষ্টির ছাঁট এসে সব ভিজিয়ে দিয়েছে। এরা সব গেল কোথায়। কী যে আক্কেল এদের!'

'দুটি জানলাই বন্ধ করে দিলে মা?'

'দেব না, তোর ঠাণ্ডা লাগবে যে! একটু কিছু খা এখন। এক কাপ দুধই না হয় খা।'

'না।'

'আঙুর আনিয়ে রেখেছি, খাবি গোটাকয়েক?'

'না মা।'

'তোর কেবল না আর না। না খেলে শরীর সারবে কী করে বল তো?'

'আমার না খেয়ে খেয়েই সারবে।'

'তোমার বাপু কেবল জেদ আর জেদ। কাউকে ডেকে দিয়ে যাব? রিনু, অনু, জয়ন্তী কারো সঙ্গে গল্প করবি?'

'না মা।'

'আমিও যে তোমার কাছে একটু বসব তার জো নেই। বিনুর ছেলে দুটি এমন হয়েছে আমার হাতে ছাড়া খাবে না। কী যে মতলবে।'

'তুমি ওদের খাইয়ে দিয়ে এসো মা। তোমাকে এখন আর এখানে বসতে হবে না।'

'রেডিও খুলে দিয়ে যাব?'

'না।'

'বইটই পড়বি একখানা? দিয়ে যাব?'

'না।'

'একেবারে কিছু যদি না নিয়ে থাকিস তাহলে তো শুয়ে শুয়ে শুধু রাজ্যের ভাবনা ভাববি।'

'তুমি ভেব না মা, আমি কিছু ভাবব না। তুমি যাও ওদের খাইয়ে এসো। আমি ততক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শুনি।'

তুমি কী রকম রাগ করে চলে গেলে। আমি রাগ করলে তুমি আর আজকাল হাস না কিন্তু তোমার রাগ দেখলে আমার মাঝে মাঝে বড় হাসি পায় মা। তুমি এইটুকুতেই রেগে অস্থির? আর

আমি যে আজ সাত বছর শুয়ে আছি, আমি রাগ করব কার ওপর ? ভাগ্যের ওপর ? ছি ছি ছি, ভাগ্য কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও যে লজ্জা হয় । আমার মত একুশ বছরের লেখাপড়া জানা মেয়ে কি ভাগ্য মানে ? ভাগ্য না দুর্ঘটনা । আমি কি দুর্ঘটনার ওপর রাগ করব ? কয়েকদিনের জ্বরে অজ্ঞান হয়ে রইলাম তারপর আস্তে আস্তে আমার সব শরীর অবশ হয়ে গেল । একটা দুর্ঘটনা । না কার অ্যাকসিডেন্ট নয়, ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট নয়, প্লেন-ক্রাস নয়, তবু সব ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে যাওয়া । এও এক দুর্ঘটনা । দুর্ঘটনা বড় খটোমটো শব্দ । আমি যদি কবিতা লিখতাম, আগে লিখতাম—সেই সাত বছর আগে । দুটো খাতা ভরে ফেলেছিলাম । এখন আর পারিনে—কলম ধরতেই পারিনে । আর তাই চিঠি লিখতে পারিনে, নিজের হাতে ডায়েরি লিখতে পারিনে । আমার লেখাই এখন মনে মনে লেখা, মনে মনে লেখা আর মনে মনে মুছে ফেলা । না, মুছে ফেলবার দরকার হয় না । আপনিই মুছে যায় । আকাশের মেঘের মত । মেঘে মেঘে কত নদী কত হ্রদ কত সাগর কত পর্বত । তারপর সব অন্ধকার । কালো শ্লেটের মত, দিদিমণিরা আসবার আগে হাইস্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের মত । তখন কত কবিতা লিখেছি । স্কুলে থাকতে । অবশ্য খুবই কাঁচা । এখন লিখলে আর অমন কাঁচা কবিতা লিখতাম না, কুকুর নিয়ে বিড়াল নিয়ে স্কুল নিয়ে বড় দিদিমণিকে নিয়ে ছড়া লিখতাম না । এখন লিখলে কী লিখতাম । যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যে দুর্ঘটনা ঘটে রয়েছে তাই নিয়ে লিখতাম । কিন্তু দুর্ঘটনা কথাটা বসাতাম না । বড় শ্রুতিকটু । তার চেয়ে ভাগ্য এমন কি দুর্ভাগ্য ভালো । হোক সেকেলে । কিন্তু মানে তো একই । আর কানে তো ভালো শোনায় । আমি কি দুর্ভাগ্যের ওপর রাগ করব ? যাকে আমি ধরতে পারিনে, ছুঁতে পারিনে, আঁচড়াতে কামড়াতে পারিনে, তার ওপর রাগ করে কী লাভ ? আমি কি ডাক্তারদের ওপর রাগ করব ? তাঁরা কি ভুল চিকিৎসা করেছিলেন ? কিন্তু দাদারা তো বেছে বেছে এই শহরের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারই এনেছিলেন । শুরুতেই বড় ডাক্তার এনেছিলেন । দাদারা তো কোন কৃপণতা করেননি । এই সাত বছর ধরে তাঁরা আমার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন । দাদারা ডাক্তার বদলাচ্ছেন, ডাক্তাররা ওষুধ বদলাচ্ছেন, চিকিৎসার ধারা বদলাচ্ছেন । আমিই শুধু বদলাচ্ছি না । আমি তাহলে রাগ করব কার ওপর ? দাদাদের ওপর না । তাঁরা খুব ভালো । মার ওপর না । মা খুব ভালো । তবে কি ডাক্তারদের ওপর ? তাঁরা কেন ভুল করলেন ? অবশ্য ভুল করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই । কিন্তু ভুল যদি না করে থাকেন আমার অসুখ সারছে না কেন । তাহলে স্বীকার করুন আপনাদের ক্ষমতা নেই । তাই আমার রোগ যতদিন আছে আমার চিকিৎসাও ততদিন আছে । ভাবতে মন্দ লাগে না—আমি যেন এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র । একদিকে রোগ-সৈন্য আর একদিকে ডাক্তারদের দল । তাঁদের হাতে আধুনিক সব মারণাস্ত্র । অ্যাটম বম্ব, হাইড্রোজেন বম্ব । আমার রোগকে ওঁরা বলছেন পলিনিউরেসথেনিয়া । বাব্বা, কি লম্বা নাম । আমার রোগও আমার মত মেয়ে । স্ত্রীয়ামাপ । ও আমার সর্বাঙ্গে স্নায়ুতে স্নায়ুতে মিশে রয়েছে । ও আমাকে ভালোবেসেছে । আমাকে ছেড়ে নড়তে চায় না । সতীনের ভালোবাসা । সতীন, কী বিশ্রী কথা । ঠাকুরমার মুখে শুনেছি । তাঁদের আমলে সতীন থাকত, মার আমলে নেই । বাবা মা ছাড়া আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতেন না । বউদিদের আমলেও ও-আপদ ঢুকে গেছে । বউদিদের সতীন নেই । কোনদিন সতীন হতেও পারবে না । আইন তাদের পথ আটকে রাখবে । কিন্তু বান্ধবীদের পথ আটকাতে পারবে না । বড়দার বান্ধবীদের দেখলে বড়বউদির মুখ কী রকম ভার হয়ে যায় । চোখের ভাব অন্য রকম হয় । আমি সব দেখতে পাই, সব বুঝি । আমাকে দেখতে সবাই তো আসেন । তাঁরা আমাকে দেখেন, আমি তাঁদের দেখি । ছোড়দা ভারি চালাক । কোন মেয়ে বন্ধুকে পারতপক্ষে বাড়িতে আনে না । বাইরে বাইরে ঘোরে । ছোটবউদির রাগটা তাই চাপা । ঝগড়াটাও চাপা । স্বামীর বান্ধবীরা আজকাল স্ত্রীর আধা সতীন । আধা না হোক সিকি সতীন । আমার সে ভয় নেই । আমার সিকিও নেই, দু-আনিও নেই । ছটাকও নেই, কাঁচ্চাও নেই । বন্ধু থাকলে তো তার আর এক বান্ধবীর ভয় ? স্বামী থাকলে তো তার ভালোবাসা নিয়ে ভাগাভাগি । আমার ছেলে বন্ধু নেই । মেয়ে বন্ধুরাই বা কোথায় । পর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে । বরুণা এম. এ. পড়ে । কিন্তু আমার আর খোঁজ নেয় না । তার এখন কত বন্ধু । বোধহয় ছেলে বন্ধুই বেশি । পাড়ার ছেলেরা আমারই কম বন্ধু হতে চেয়েছে ? তখনো আমি ফ্রক ছাড়িনি ।

মাঝে মাঝে শুধু শখ করে শাড়ি পরি। সেই তখন থেকেই। কত ভাবেই যে ভাব জমাতে চাইত। আমি তখনই কিছু কিছু বুঝতে পারতাম। এখন আবো ভালো কবে বুঝতে পাবি। এখন আর কেউ আসে না। না এলো। তাদের কারো ওপব আমার বাগ নেই। এই সাত বছবে আমি সবাইকে ভুলেছি। তাদেব ওপর আমার রাগ নেই, ডাক্তারদের ওপব বাগ নেই. কিন্তু মাঝে মাঝে বড় রাগ কবতে ইচ্ছে করে। বুঝতে পারিনে কার ওপব রাগ করব। অদৃষ্টেব ওপর রাগ কবাই ভালো। কিন্তু অদৃষ্ট কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়। বড সেকেলে কথা। আমি সেকেলে হতে চাইনে। তাছাড়া যাকে দেখতে পাইনে ধবতে ছুঁতে পাইনে বুঝতে পর্যন্ত পারিনে তার ওপর বাগ করা না কবা সমান কথা। তাই যাদেব দেখি তাদেব সবাইব ওপর মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কব রাগ হয়। ইচ্ছে হয় তাদের সবাইকে তৃণ কুটোব মত কুটি কুটি করি. দাঁত দিয়ে কামড়াই, নখের আঁচড়ে বক্ত বের করে দিই, সবাইকে শেষ কবি। আমাব এই অবস্থার জন্যে কাউকেই আলাদাভাবে দায়ী করতে পারিনে. তাই সবাইকেই আসামী সাব্যস্ত কবি।

'শুক্লা, একেবাবে চুপচাপ শুয়ে আছ যে।'

'চুপচাপ থাকবো না তো কী করবো ছোটবউদি।'

'তা ঠিক। তোমাব এখন চুপ করে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তোমাব যেমন চেঁচামেঁচি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউদি।'

'কী করব ভাই, মেয়েটা বড জ্বালায়। দিদির ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে। ছেলেমেয়ের কী যে জ্বালা তা তো আব বুঝলে না। মেয়েটা ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে বলে তোমার দাদার কী রাগ।'

ছোটবউদি কী চালাক তুমি। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে নিলে। ভেবেছ ছেলেমেযেব কথা তোলায় আমি মনে দুঃখ পেয়েছি। আমি যদি ভালো থাকতাম. তোমাদেব মত এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কবতাম কিনা। এম. এ. পডতাম। পাস করতাম—প্রফেসরি করতাম। তারপর যা হবার হত। বিয়ে হলেও এত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ে হতে দিতাম কিনা।

'জানো শুক্লা. খালি কি মেয়ের ওপর রাগ। আমাকেও আজকাল দুচোখ পেতে দেখতে পারে না। কেবল বলে মোটা হয়ে যাচ্ছ। আমি মোটা হচ্ছি আব তুমি পাল্লা দিয়ে রোগা হচ্ছ শুক্লা। ভালো করে খাওনা-দাওনা. হবে না এমন? আমার ইচ্ছে কবে কি জানো? আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে তোমার হাতে পায়ে লাগিয়ে দিই। তাতে যদি তোমার শবীর সারে।'

'খববদার ছোটবউদি, অমন কাজও করতে যেয়ো না। অনর্থক ছোড়দাব শবীর থেকে রক্তপাত হবে।'

'কেন তার বক্তপাত হবে কেন?'

'বাঃ রে, তোমরা যে অঙ্গাঙ্গী। তিনি তোমার অর্ধাঙ্গ। তুমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। একজনের মাংস কাটলে আর একজনের দেহে প্রাণ থাকবে নাকি? তুমি বলছিলে তোমাকে দেখতে পারে না। এবারকার ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে গোপনে গোপনে কত টাকা দামের শাড়ি এসেছে শুনি? পঁচিশ না তিরিশ? এই বুঝি দেখতে না পারার নমুনা?'

'আহা শাড়িই বুঝি সব। এসো শুক্লা, তোমার চুল বেঁধে দিই। বাব্বা, কী চুলই না তোমার মাথায়। চুলের অরণ্য। তুমি যখন ভালো হয়ে উঠবে কতজনে এই চুল নিয়ে কবিতা লিখবে। কতজনের ইচ্ছে হবে ওই রাশ রাশ চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে।'

'যাক বউদি, একসঙ্গে অতগুলি লোক যদি আমার চুলের মুঠি এসে ধরে আমাব মাথায় টাক পড়ে যাবে।'

'চুলের যত্ন না করলে এমনিই টাক পড়বে। এসো তোমার চুল বেঁধে দিয়ে যাই।'

'না বউদি, এখন না। এখন থাক। তোমার পায়ে পড়ি, একটু বাদে। ঝড়টা থামুক তার পরে।'

'ওমা. ঝড়ে তোমার কী করবে। তোমার দাদারা বাইরে—বোধ হয় এই ঝড়বৃষ্টির জন্যেই তাঁদের আজ দেরি হয়ে যাবে। তোমার চুলটা বেঁধে দিয়েই যাই। মা বললেন. আমার এখনো সব কাজ পড়ে আছে। ঘর ঝাঁট দিতে হবে, বিছানা পাততে হবে।'

'আঃ, যাও বলছি। যাও এখান থেকে। আমার জন্যে তোমাদের কারো কিছু করতে হবে না।'
'রাগ কোরো না শুক্লা, রাগ করলে তোমার শরীর আরো খারাপ হবে। কী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। সবাই বলে এতদিন ধরে ভুগছে তবু কী শান্ত মেজাজ। কী মিষ্টি কথা, আর কী সুন্দর মুখ। বাড়ির মধ্যে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী শুক্লা। এত রূপ আর কারো নেই। মুখখানা ঠিক একেবারে ফুটন্ত পদ্মফুলের মত। ঠিক তেমনি রঙ।'
'পদ্মফুলের মত মুখ। আর দেহটা ঠিক তার ডাঁটার মত না বউদি? যাও, তুমি তোমার বিছানা পেতে এসো। তারপর আমি চুল বাঁধব। ঝড় থামুক—তারপর।'
ছোটবউদি চলে গেল। বিয়ের আগে আমি ওকে জয়ন্তীদি বলে ডাকতাম। খুব ভালো মেয়ে। আমার কত মুখঝামটা সহ্য করে। ছোটবউদি আমার বন্ধু, আমার সখী। আমি সীতা ও সরমা। আমি সীতা কিন্তু আমার রাম নেই। সীতাকে রাবণ রামের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল। আর আমার রাবণ আমাকে আগে থেকেই দশ হাতে আগলে রেখেছে পাছে রাম আসে। বউদি বিছানা পাততে গেল। বিছানা পাতায় ওদের কী আনন্দ! ওদের বিছানা শুধু ঘুমোবার জন্যে আর আমার বিছানা দিনরাত সব সময়ের জন্যে। বিছানা আমার কাছে বিষ। আমি আর পারিনে। আর জেগে জেগে এমন করে শুয়ে থাকতে পারিনে। তবু কত যত্ন করে এই বিছানা আমার মা রোজ দুবার করে পেতে দিয়ে যান। কোন কোন দিন তিনবারও পাতেন। সব সময় তো কাছে থাকতে পারেন না। যেন নিজের কোলখানা সব সময়ের জন্যে পেতে রেখে যান। আমার মা সাদা থান পরেন। আমার বিছানার রং সাদা। আমার বিছানা আমার মায়ের কোল। আর বউদির বিছানা তার স্বামীর কোল। আমি কী করে জানলাম? আমি সব জানি। সব জানি। আমার দেহটা থেমে আছে মন তো আর থেমে নেই। সে অনেক বেড়েছে। অনেক—অনেক। বড়দা বলেন অসুখে তোর কিন্তু একটা মস্ত লাভ হয়েছে শুকু। বাংলা ইংরেজী কাব্য নাটক উপন্যাস কিছুই আর বাকী রাখিসনি। সাতটা বছরে তুই সাতটা এম. এ. পাস করেছিস শুকু। আমার তো একখানা বই ছুঁয়ে দেখবারও সময় নেই। জ্বর-জ্বারি না হলে কোন একখানা বই পড়তে পারিনে। বড়দা মেজদা আপনারা ইঞ্জিনিয়ার। আপনাদের নিজেদের ফার্ম আছে হেয়ার স্ট্রীটে। সব সময় ব্যস্ত। আপনাদের বই পড়বার সময় কোথায়। দরকারই বা কি। কিন্তু আমার তো না পড়ে উপায় নেই। বই আমার সঙ্গী। অবশ্য বড়দা যত বাড়িয়ে বলেন তত নয়। তত আমি পড়িনি। প্রথম প্রথম ইংরেজী পড়তে তো ভয়ই হত। ভয়ের চেয়ে বেশি হত লজ্জা। সবাই ঠাট্টা করবে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। আর বিদেশী ভাষা তার সমস্ত রস আর রহস্য আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। দুজনে মিলে লুকোচুরি খেলা। আমি তাকে ছুঁতে যাই আর সে পালায়। ছেলেবেলায় কত খেলেছি উঠোনে, পার্কে, পিকনিক পার্টিতে গিয়ে। বন্ধুরা আমার চোখ বেঁধে দিত। আমি ঠিক আন্দাজে আন্দাজে বের করে দিতাম কে আমার মাথায় টোকা দিয়েছে, কে আমার বিনুনী ধরে টান দিয়ে গেল। আমার আন্দাজ সবচেয়ে বেশি ছিল। পর্ণা বলত শুকু তুই একটা কুকুর! কুকুরের মত তোর শুঁকবার শক্তি। বই পড়ার বেলায়ও আমি আন্দাজে আন্দাজে এগিয়েছি। চোখে রুমাল বাঁধা দেখতে পাইনে কিছু। একবার তো মল্লিকবাবুদের বাগানের দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেল। ইংরেজী বই পড়তে গিয়েও কতবার যে আমার মাথা ঠুকেছে তার ঠিক নেই। ডিকসনারি দেখে দেখে পড়েছি। কিন্তু ডিকসনারি হল মূর্তিমান রসভঙ্গ। না দেখলেও চলে না, আবার দেখতে গেলে ধৈর্য থাকে না। তারপর আমার চোখের রুমাল খুলে গেল। দেখি সামনে এক বিরাট দেয়াল। মাথা ঠুকতে ঠুকতে অনেক ফোকর বেরোল। অনেক জানলা। জানলা আর দরজা। হাজার দরজা। সব খোলেনি। আস্তে আস্তে খুলছে। বিশ্ব-সাহিত্যের দোরগুলি আস্তে আস্তে খুলছে। আমি যখন ভালো হয়ে উঠব তখনও দোরগুলি বন্ধ হবে না। কিন্তু আমার জানলা দুটি এখনো বন্ধ। বৃষ্টি কি এখনো থামেনি? এখনো তার শোসানি আর ফোঁসফোঁসানি সমানে চলেছে।
ক্রীং ক্রীং ক্রীং।
আবার কার ফোন এল।
বিছানার কাছেই ফোন। ইচ্ছা করলেই ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনে। কিন্তু বাজনা শুনতে

ভালো লাগে। যিনি ফোন করছেন তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে ভালো লাগে। কে ফোন করছে? তিনি নন তো? এই ঝড়ের মধ্যে কি আমাকে মনে করেছে? কে আমাকে ফোনে ধরতে চাইছে? কে? কে? কে? কড়া নাড়ার শব্দ শুনলে আমি বুঝতে পারি কে। পায়ের শব্দ শুনলে চিনতে পারি কে আসছে। কিন্তু ফোনের বাজনা সব এক রকম।

'হ্যালো, কে আপনি? ওঃ ডক্টর দত্ত? আসতে পারবেন না? না না, এই ওযেদারে কী করে বেরোবেন? না, আজ এসে আপনার দবকার নেই। আপনি পরশুই আসুন। আমি ভালো আছি। বেশ আছি। ঠিক আছি। একদিন ম্যাসাজ বাদ গেলে আমাব কিছু হবে না।'

ওঁর কি আর একটু কথা বলবাব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমাব ইচ্ছা করছে না। আমি ছেড়ে দিলাম। ডাক্তার। ডাক্তার ছাড়া আমাকে কে ফোন করবে? উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমি বারণ করে দিলাম। কী আর হবে ম্যাসাজ করে? একদিন বাদ গেলে কোন ক্ষতি হবে না। আজ তিন বছব ধরে উনি চিকিৎসা করছেন। ভাবি তো লাভ হল! ডক্টর দত্ত কিন্তু ভালো লোক—ভদ্রলোক। সব সময় আমাকে ভরসা দেন তুমি সারবে—সেরে উঠবে। সারি আব না সারি সেরে ওঠার কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। উনি সপ্তাহে তিনদিন আসেন। শুধু কাজ সেরেই চলে যান না। কাজের পরে বসে বসে গল্প করেন। অথচ ওঁব আরো কত কাজ পড়ে থাকে, আমার মত ওঁর আরো কত পেসেন্ট। ওঁর বয়স যদি পঞ্চাশ পেরিয়ে না যেত, ওঁর ঘরে যদি বউ আর চারটি ছেলেমেয়ে না থাকত, আমি ভাবতে পারতাম উনি আমার প্রেমে পড়েছেন। দূর। উনি পড়লেই বা কি! আমি পড়তাম নাকি। ডক্টর আর নার্সের প্রেমের গল্প পড়েছি। পেসেন্ট আর নার্সের প্রেমের গল্প পড়েছি। পেসেন্ট আব ডাক্তারের— । না মনে পড়ছে না। বাজে কথা। লেখকদের যত সব বানানো কথা। যতক্ষণ আমি রোগিণী আমার প্রেমে শুধু রোগই পড়বে আর কেউ না। পেসেন্টকে যে ভালোবাসা তার মধ্যে শুধু স্নেহ সহানুভূতি আর অনুকম্পা। তার মধ্যে প্যাসন নেই। আমি চাইনে তোমাদের স্নেহ, চাইনে তোমাদেব সিম্প্যাথি। সিম্প্যাথির ওপর পরম অ্যাপাথি আমার। ডক্টর দত্ত আমাকে কি করে ভালোবাসবেন? তিনি সবই দেখেছেন। ম্যাসাজের সময় সবই দেখতে দিতে হয়। অবশ্য মা সামনে থাকেন। মা আমাব নার্স। আমার ধাত্রী, আমার ধরণী। আমার সব অঙ্গ আমার মা দেখেন, আমি দেখি আর ডাক্তার দেখেন। আর কেউ না—আর কেউ না। ডাক্তারই একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ, দুর্ভাগ্যবান পুরুষ যিনি আমার কুরূপও দেখেছেন। দেখুন। ওঁর কাছে আমার আর লজ্জা নেই। ডাক্তারকে সব দেখাতেও হয়, ডাক্তারকে সব শোনাতেও হয়। শুধু মন না খুললেও চলে। তিনি চাদর উলটে আমার শরীরের সব দেখতে পান, কিন্তু মনকে তো দেখতে পান না। আমি তাকে চাদরের পর চাদর চাপিয়ে ঢেকে রেখেছি। আর আদরের পর আদব। আমি নিজেই আমার মনকে আদর করি। আমার যে সুস্থ সুন্দর সবল মন অতিকষ্টে এই অসুস্থ দেহের মধ্যে বাস করছে তার দুঃখ আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? ডাক্তার কতটুকু বুঝতে পারেন? বুঝতে পারুন আর নাই পারুন ওঁর সহানুভূতি আছে। উনি আমাকে ধরে ধরে হাঁটান, ওঠ-বস করান। তারপর নিজে ঐ চেয়ারটায় বসে বসে গল্প করেন। প্রেমের গল্প নয়, ঘরকন্নার গল্প নয়। সেসব তো নভেলেই পড়ি। ওই বুড়ো মানুষের মুখে সে গল্প আর কী শুনব। উনি শিকারের গল্প বলেন, মাছ ধরার গল্প বলেন। মাছ ধরায় ওঁর খুব শখ। জলের জন্তু আর ডাঙার জন্তু শিকার করতে গিয়ে কবে কোন বিপদে পড়েছিলেন আর বুদ্ধির জোরে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন—সেইসব গল্প। মাঝে মাঝে শুনতে মন্দ লাগে না। শুনতে শুনতে আমি আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাই। আমাকে আরো ছেলেমানুষ করে দেওয়াই বোধহয় ওঁর উদ্দেশ্য। আমি যেন এগারো বছরের খুকি। ফ্রক পরে ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, ছুটছি, লাফাচ্ছি। ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বয়স বাড়তে থাকে। একুশ থেকে বাড়তে বাড়তে যেন একষট্টি, একাত্তর, একাশিতে গিয়ে পৌঁছায়। রাত্রির অন্ধকারে ভেবে ভেবে আমি শিউরে উঠি। যদি জেগে উঠে দেখি আমি বুড়ী হয়ে গেছি। যদি বুড়ো হওয়ার আগে আমার এই রোগ না সারে তাহলে কী হবে আমার—কী হবে।

কিন্তু রাত যখন ভোর হয় আর আমি আমার মুখ দেখি, আর আমার মায়ের হাসিমুখ দেখি—আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়।

ছোড়দার বন্ধু বেণুদা আমাকে আর এক রকম ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ঝড়ের ভয়। অবশ্য শুধু ফোনে ফোনে। বউদিদিদের ভাই আর দাদাদের বন্ধু কতজনের সঙ্গেই তো ফোনে আলাপ করেছি। কিন্তু বেণুদার মত কথা বলতে কেউ জানেন না আর যেচে যেচে অত ফোনও কেউ করেন না। আমি নিজে একটু হিসেব করেই ফোন করি। অমনিতেই দাদারা আমার জন্যে কত খরচ করেন। ওঁদের খরচ আর বাড়াতে চাই না। ওঁরা আমার জন্যে দামি রেডিও কিনে দিয়েছেন। তাতে আমি পৃথিবীর যে কোন বড় শহরকে ধরতে পারি। সেখানকার গান শুনতে পারি, বক্তৃতা শুনতে পারি। লণ্ডন, মস্কো, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, রোম, যে কোন বড় শহর আর পুরনো শহরকে আমি কানের ভিতর দিয়ে পাই। দাদারা রেডিওটা আমার ঘরে রেখেছেন, ফোনটা রেখে দিয়েছেন বিছানার পাশে। যাতে আমি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে পারি। কিন্তু সবাইর সঙ্গে গল্প করে কী আনন্দ আছে ? সবাই কি গল্প করতেই জানে ? বেণুদা কথা বলতে জানতেন। আর তার সেই হোটেল থেকে যখন তখন আমাকে ফোন করতেন। বেণুদার নাওয়া-খাওয়ার যেমন ঠিক ছিল না, কাজকর্মের কিছু ঠিক ছিল না। তেমনি ফোন করবার সময়ও কিছু ঠিক ছিল না। আর আমি সব সময় ঠিক হয়েই আছি। আমার সবই বাঁধাধরা। নাওয়া-খাওয়া ঘুমোন বিশ্রাম পড়াশুনো সব ডাক্তারের নিয়মে বাঁধা। তাই মনে মনে সবদিক থেকেই বেঠিক বেণুদাকে আমি বড় পছন্দ করতাম। আমি তাঁকে তিনবার মাত্র দেখেছি। ফর্সা ছিপছিপে চেহারা। বয়স দাদাদের চেয়ে কম। কিছুতেই তিরিশের বেশি না। আর দেখতে দাদাদের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তাঁদের মত গুণীও নন, বিদ্বানও নন। আমার মত বেণুদাও ডিগ্রীহীন। কিন্তু বাইরের পড়াশুনো খুব আছে, আর ঘুরতে খুব ভালোবাসতেন। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ওঁর মুখে বাঁধা। মাসের মধ্যে দশ পনের দিন বেণুদা বাইরে কাটান। বিয়ে থা করেননি। মা বাবা নাকি বেনারসে থাকেন।

ছোড়দাকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছি, 'বেণুদার কিসের বিজনেস ?' ছোড়দা হেসে বলতেন, 'ওর কথা আর বলিসনে। ও একটা ফোরটোয়েণ্টি। আজ সিমেণ্ট, কাল প্লাস্টিক। ওর কোনটা যে ঠিক কোনটা যে বেঠিক ধরা শক্ত।' বড়দা বলেছিলেন, 'শুকুর সঙ্গে তুই আর আলাপ করিয়ে দেবার মানুষ পাসনি। কেন ও-ধরনের লোককে অ্যালাউ করিস।'

ছোড়দা বলেছিলেন, 'তাতে কি ! বাড়ীতে তো আসে না। দূর থেকে শুকুর ও আর কী ক্ষতি করতে পারবে। শুকু ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে একটু মজা পায় তো পাক না।'

ক্ষতি ! যেন কাছে এসেই আমার ক্ষতি করবার কারো সাধ্য আছে। আমার যেন কোন বুদ্ধি হয়নি। নিজেকে রক্ষা করবার মত শক্তি হয়নি।

বেণুদা খুব কথা বলতেন, খুব গল্প করতেন।

সেবার বলেছিলেন, 'তুমি যে কী করে অমন উদ্ভিদের মত এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে আছ আমি ভেবেই পাইনে শুক্লা।'

আমি বলেছিলাম, 'বাঃ রে, আমি ইচ্ছে করে বসে আছি নাকি ?'

'জানি ইচ্ছে করে বসে নেই। একান্ত অনিচ্ছায় শুয়ে আছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কী ইচ্ছে করে জানো ? ঝড়ের মত উড়ে গিয়ে তোমাকে একেবারে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে আসি।'

'রক্ষে করুন বেণুদা—অমন ঝোড়ো-হাওয়া আমার সইবে না। আমি যে শুকনো পাতা।'

'তুমি কেন শুকনো হতে যাবে শুক্লা। তোমার কথা এত সরস, তোমার গলার স্বর এত মিষ্টি ! আমি তোমার গলা শুনব বলেই তো এত ঘন ঘন ফোন করি।'

'যাঃ, কি যে বলেন।'

মাঝে মাঝে মনে হত বেণুদা সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। আমার মত মেয়েকে এসব কথা বলে লাভ কি। উনি কি বোঝেন না এতে আমার কত কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করে থাকত। তিনি কষ্ট না দিলে আমি যেন বেশি কষ্ট পেতাম। একমাত্র বেণুদাই আমার অসুখকে আমল দেন না ; আমার রোগের কমা-বাড়ার খোঁজ নেন না। একমাত্র তাঁর কাছেই আমি সুস্থ সবল স্বাভাবিক মেয়ে। যেন আমি ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারি।

তিনি আর একদিন বলেছিলেন, 'আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমার খাটসুদ্ধ তোমাকে আমি

পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসি, তারপর গরুড় পাখীর মত আকাশময় ঘুরে বেড়াই।'

আমি বলেছি, 'দোহাই বেণুদা, অমন কাজও করবেন না। আমি যত হাল্কা আমার খাট তত ভারী। আপনি ব্যালেন্স রাখতে পারবেন না।'

বেণুদা বলেছেন, 'আমি কোনদিনই তা পারিনে। সেই ভালো। আলাদা খাটের দরকার নেই। আমার পিঠই তোমার পীঠস্থান হোক।'

আর একদিন বোম্বে থেকে প্লেনে ফেরার পথে বেণুদা নাকি ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। এসে ফোনে সেই ঝড়ের গল্প। তিনি বললেন, 'কী বাম্পিংই যে হয়েছিল। আর একটু হলেই যেতাম আর কি। সেই ঝড়ের মধ্যে তোমার কথা আমার মনে পড়ছিল।'

'ওমা ঝড়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।'

বেণুদা বলেছিলেন, 'তোমার সম্পর্ক বুঝি শুধু ঘরের সঙ্গে?'

সম্পর্ক যে ঝড়ের সঙ্গেও আছে তা আমি পরে টের পেয়েছিলাম। ছোড়দা সেদিন হঠাৎ এসে বললেন, চীটিং আর ফোর্জারির দায়ে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে বেণুদার নামে। আর তিনি অ্যাবস্কণ্ড করেছেন। সেদিন আমার বুকের মধ্যে ভীষণ একরকম ঝড় বইতে লাগল। সেকি সমুদ্রের ঝড় না আকাশের ঝড়—আমি জানিনে, বোধ হয় দুই-ই।

বেণুদা কি ধরা পড়েছেন? নিশ্চয়ই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। নইলে একদিন না একদিন ফোন করতেন। তিনি ফোন না করে থাকতে পারতেন না। কিন্তু কেন বেণুদা অমন করতে গেলেন। কেন তাঁর এমন দুর্মতি হল। আমার মত তিনিও কি অসুস্থ? আমি দেহে তিনি মনে। কিন্তু আমার অসুখের ওপর আমার তো কোন হাত নেই। আর বেণুদার? হতে পারে তাঁরও কোন হাত নেই। পুলিস তাকে মিছিমিছি ধরেছে। কিন্তু তাহলে—

তিনি পালিয়ে বেড়াবেন কেন? আমি আর ভাবতে পারিনে। ভাবলে আমার বুকের মধ্যে ফের কী রকম যেন ঝড় ওঠে। আমি তার ঝাপটা সইতে পারিনে। শরীর দুর্বল বলেই সইতে পারিনে। আমি কবে সুস্থ হব, সবল হব? তখন সব ঝড়-ঝাপটা সইতে পারব। ঝড়ের মধ্যে বেরোতেও পারব। মা এসে জানলা খুলে দিয়েছেন। বৃষ্টি কি থামল। এরই মধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলি জ্বলেনি। ঘরের আলোই বা জ্বাললে কেন মা। আমার অন্ধকারই ভালো।

'বিনু চিনু এসে গেছে। ওঃ কি ভেজাটাই ভিজেছে। এত করে বলি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি অন্তত কিনে নে।'

দাদারা এসেছেন। এবার সবাই আমার ঘরে এসে বসবেন। এখানে বসে সবাই চা খাবেন। আমার সারাদিনের খবর নেবেন। আর জিজ্ঞেস করবেন, 'কেমন আছিস শুকু।'

আমি জবাব দেব, 'ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'

আশ্বিন ১৩৬৭

একটি ফুলকে ঘিরে

আশ্চর্য, বুকটা এখনো ঢিপঢিপ করছে। অথচ কিছুই তো নয়। একটিমাত্র ফুল। একটি গোলাপ—একজনের হাত থেকে পাওয়া। টেবিলের ওপর ফুলটিকে রেখে রিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার সতের বছরের জীবনে অনাত্মীয় একজন পুরুষের হাত থেকে এমন পুষ্পার্ঘ সে প্রথম পেল। দেওয়ার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল কিনা, রিনি লক্ষ করেনি, কিন্তু নিতে গিয়ে নিজের হাত কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, চোখের পাতা নেমে এসেছিল। তাই ভালো করে তাঁকে দেখতে পারেনি। তাঁর পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার ছিল, গায়ে ছিল সাদা শার্ট, এই-টুকু শুধু মনে আছে। কিন্তু এ তো তাঁর উৎসবের সাজ নয়, এ তো তাঁর আটপৌরে বেশ। এই পরেই তো তিনি এ-বাড়িতে আসেন। তবু কেন তাঁকে আজ নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল? তিনি এই ফুলটি দিয়েছেন বলে? দেবার ইচ্ছা তাঁর অনেকক্ষণ আগেই মনে এসেছিল বলে? অনেকক্ষণ, না

অনেকদিন ? কে জানে ? এর আগে রিনি তো তাঁকে এমন করে দেখেনি। এর আগে রিনি তাঁকে দেখতেই পারত না। সেই ভালো ছিল। সেই না-দেখতে পারাই ঢের ভালো ছিল। এই ফুলটিকে নিয়ে এখন সে কী করবে ? কোথায় রাখবে এই ফুল ? বিনুনি খুলে ফেলে খোঁপা বাঁধবে ? খোঁপার মধ্যে গুঁজে রাখবে ? মা যদি ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে দেখতে পান ? দেখতে পেলেও তিনি বুঝতে পারবেন না, এ-ফুল তাকে কে দিয়েছে। যতক্ষণ না সে মুখ ফুটে বলে। কিন্তু রিনি কিছুতেই বলবে না। তবু দরকার নেই খোঁপায় পরে। পরতে কিসের একটা অস্বস্তি হচ্ছে, ভয় হচ্ছে রিনির। দরকার নেই পরে। তবে কি জানলা দিয়ে ফেলে দেবে ? যেমন তাঁর দেওয়া আরো জিনিস আগে ফেলে দিয়েছে ? কিন্তু ফেলতে ইচ্ছা করছে না। আজ এমন বস্তু সে পেয়েছে যা তার পক্ষে ফেলে দেওয়াও কঠিন রেখে দেওয়াও কঠিন। অবশ্য এক্ষুনি কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তার কোন মানে নেই। বাবা আপিস থেকে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। চিনু আর বিনুকে নিয়ে মা পিসীমার বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। তাঁরও আসতে দেরি আছে। ও-ঘরে ভজু চাকর রান্না করছে। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ আর এ-ঘরে আসবে না। কিন্তু রিনির মনে হচ্ছে কেউ আসুক, কেউ এসে পড়ুক। এই একাকিত্বও রিনির কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। পড়তে ভালো লাগছে না। লিখবে নাকি ? বসে বসে ডায়েরি লিখে সময় কাটাবে ? কিন্তু লিখতে গেলে আজকের বিকেলের ঘটনাটুকুই তো ঘুরে ঘুরে আসবে। দরকার নেই। কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে। একবার মা জোর করে তার ডায়েরি কেড়ে নিয়ে পড়েছিলে। পড়ে সে কী হাসি। তবু রক্ষা, সেদিনের পাতায় অন্য কোন কথা ছিল না। শুধু মেঘবৃষ্টির বর্ণনা ছিল।

কী করবে রিনি। সেদিন যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরোন ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানলা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল ; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাঁটে চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজ-পত্রের সঙ্গে নিজের মনকে ওর দূর-দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময় সেই বৃষ্টিঝরা, বৃষ্টিভরা সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। প্রথমে গেলেন বারান্দায়, তারপরে পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করছিলেন মার সঙ্গে। রিনি অবশ্য তার ডায়েরিতে দুজনের সেই গল্পের কথা লেখেনি। শুধু বর্ষা-বৃষ্টির কথাই লিখেছিল। তাই পড়েই মা হেসে অস্থির। কী করবে রিনি, ভাষা যদি তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে কী করতে পারে। মনে মনে সে যা ভাবে, তার যা লিখতে সাধ হয়, তা তো আর কাঁচা নয়, শুধু ভাষাটাই কাঁচা। তার লেখা পড়ে কলেজের বন্ধুরা হাসে, ঠাট্টা করে। তারা লেখাটাই দেখে। সে যে কী লিখতে চেয়েছিল, তা তো আর দেখে না।

সেদিন সেই ভদ্রলোককে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি ঝড়বৃষ্টি মাথায় না করে আসতে পার না ? কেমন ভিজে গেছ দেখ দেখি।'

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কী করব বল, মেঘ দেখলেই যে তোমার কথা মনে পড়ে।'

মা চোখের ইশারায় রিনিকে দেখিয়ে দিতেই ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। কিন্তু রিনি ঠিকই শুনে ফেলেছে। পাছে আরো বেশি না শুনতে হয় ঠিক তক্ষুনি সে ঘরের মধ্যে সরেও এসেছে। যেটুকু শুনেছে তাই কি কম ? সেই একবার মাত্র শোনা কথা রিনির কানের কাছে বোলতার মত বারবার শব্দ করছে। সত্যি মনে মনে সেদিন খুবই রাগ হয়েছিল রিনির। কেন অমন কথা তিনি তার মাকে বলবেন ? তিনি তো তাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নন। কাকা নন, মেসোমশাই, পিসেমশাইদের কেউ নন। অমন কথা বলবার অধিকার তাঁকে কে দিল ? বাবা ছাড়া ও কথা কারো মুখেই কি মানায় ?

ভদ্রলোক ভিন্নজাতের মানুষ। রিনিরা কায়েত, তিনি বামুন। অবশ্য আজকাল বামুন কায়েতের মধ্যেও আত্মীয়তা কুটুম্বিতা হয়। কিন্তু বিয়ে না হলে তো আর তা হয় না। বিয়ে না হলে হয় বন্ধুত্ব। জিতেশবাবু কি মায়ের বন্ধু ? কথাটা শুনতেও যেন কেমন লাগে। রিনি বাবার বন্ধুর কথা শুনেছে, বান্ধবীর কথা শুনেছে, ছোট কাকা তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন দেখেছে স্বচক্ষে। দেখতে খারাপ লাগেনি। কিন্তু মার বন্ধু কথাটা বলতে ভালো লাগে না, শুনতেও যেন কেমন কেমন। তিন বছর আগেও এ শব্দ রিনির কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল। তখন মা'র মুখে তাঁর

বাপের বাড়ির মামার বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের কথাই শুনেছে। কোন বন্ধুর কথা শোনেনি। এমন কি কোন মেয়ে বন্ধুর কথাও না। মা'র আত্মীয়রা নামে মাত্র ছিলেন, বন্ধুদের কোন নামগন্ধও ছিল না। এতদিন বাদে তিনি এলেন। মা অবশ্য বাবার কাছে বন্ধু বলে প্রথমে ওঁর পরিচয় দেননি, বলেছিলেন, 'আমাদের জিতেশদা। বালুরঘাটে আমরা পাশাপাশি থাকতাম।'

ব্যস, বাবার কাছে মা ওইটুকু বলেই খালাস। বাবাও তেমনি। কৌতূহল বলে যেন কোন বস্তু নেই মানুষটির মধ্যে। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, পাশাপাশি থেকে তোমরা কি করতে। লুডো, ক্যাবাম খেলতে না গল্প করতে? এতদিন এই জিতেশদা কোথায় ছিলেন? কেন আসেননি, খোঁজ খবর নেননি, এতকাল বাদে কী করেই বা তিনি মার ঠিকানা পেলেন, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলেন না। বাবা ওই রকমই। সব সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অফিসের কাজ, সংসারের হিসেবপত্র, টালীগঞ্জে তিন কাঠা জমি কিনেছেন, সেখানে কবে কী ভাবে বাড়ি তুলতে পারবেন তাই নিয়ে জল্পনাকল্পনা, ব্যয়-সংক্ষেপ নিয়ে রোজ দুবেলা লেকচার আর ঝগড়া অথচ নিজেই অপব্যয়ের এক চূড়ান্ত উদাহরণ। নিজের অফিস আর নিজের সংসার ছাড়া বাবার আর কারো সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই।

কিন্তু এই বাবাই আজকাল মাঝে মাঝে মাকে বেশ ঠাট্টা করেন, 'জিতেশবাবু বুঝি আজও এসেছিলেন? যাক এতকাল বাদে তোমার একজন বন্ধু জুটেছে।' মা বলেছিলেন, 'নতুন করে জুটেছে নাকি? আমার অনেকদিনেরই জোটা বন্ধু।'

সেদিন রবিবারের বিকেলে সবাইয়ের জন্যে চা করতে করতে বাবা মা'র দাম্পত্য আলাপ শুনতে পেয়েছিল রিনি। মার মুখে কোন পুরুষের সম্বন্ধে বন্ধু কথাটা সেই প্রথম শুনেছিল। ভালো লাগেনি। কেমন যেন 'অসভ্য অসভ্য' লেগেছিল। আড়াল থেকে মার হাসিখুশী মুখখানাও কেমন যেন অসভ্য অসভ্য দেখাচ্ছিল।

ওই ভদ্রলোক আসবার পর থেকে মা এরই মধ্যে একটু আধুনিকা হয়েছেন। না, সাজসজ্জায় নয়, কথাবার্তায় খোঁজখবর রাখায়। মা আজকাল নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন, মাসিক সাপ্তাহিকের শুধু গল্পগুলি নয়, প্রবন্ধগুলিরও পাতা ওলটান। মাঝে মাঝে রিনির কলেজের বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। শুধু সাহিত্য সংকলন নয়, গ্রীক ইতিহাস আর নগরবিদ্যা তাতেও মার উৎসাহ এসেছে। সবই তো বাংলায়। তাই পড়তে অন্তত নাড়াচাড়া করতে কোন অসুবিধে হয় না। কেন কে জানে। ভদ্রলোক তা কোন কলেজের প্রফেসর নন। কি একটা বিদেশী মেডিক্যাল ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ। মানে একটু উঁচু দরের হকার। ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার জন্য মার কেন এত বিদুষী হবার সখ। মা রিনির সঙ্গে আজকাল তার কলেজের গল্প করতে বেশি ভালোবাসেন। প্রফেসররা কি রকম। ছেলেরা কি রকম। ছেলেরা কি রকম তা রিনি কী করে জানবে। সে কি ছেলেদের সঙ্গে মেশে না তাদের সঙ্গে পড়ে? রিনিরা যখন কলেজ থেকে বেরোয় ছেলেরা কলেজে ঢোকে। তবু এই সন্ধিক্ষণেও কোন কোন ছেলের সঙ্গে রিনিদের ক্লাসের কোন কোন মেয়ের যে একটু আধটু কথাবার্তা আলাপ পরিচয় হয় না তা নয় কিন্তু রিনি ওসবের মধ্যে থাকে না। রিনির লজ্জা করে। তা ছাড়া যে সব ছেলে গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে, মেয়েদের কাছে কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়, পিছু পিছু ঘোরে তাদের ভারি হ্যাংলা মনে হয় রিনির। চালচলনে ওদের চ্যাংড়ামি তার মোটেই সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে সে ক্লাসের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে, 'ওই ছেলেটার মধ্যে তোরা কী পেলি বলতো, অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার মত কী আছে?'

মঞ্জু হাসে। দীপা বলে, 'তুই তার কী বুঝবি।'

ওরা দুজনেই রিনির চেয়ে দেড় বছর দুবছরের বড়। সেই অধিকারে ওরা রিনিকে খুকু বলে ক্ষেপায়। রিনি গোটা ফার্স্টইয়ার সালোয়ার পরে ক্লাস করেছে। তাই নিয়ে ওদের কী হাসি। প্রায়ই বলত, 'ফ্রক পরে আসিসনে কেন?' দীপা বলত, 'মা ঝিনুক বাটি দিয়ে দেয়নি সঙ্গে?' আর একদিন ওই দীপাই তার নাক টিপে ধরে বলেছিল, 'দেখি দুধ গলে নাকি।'

মঞ্জু বলেছিল, 'ছেড়ে দে ভাই। তুই দেখছি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবি।'

দীপা বলেছিল, 'আহাহা, পাকতে কিছু বাকি আছে কিনা। অমন মেনি বেড়ালের মত থাকলে কী

হবে, ও মেয়ে হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।'

আসলে বজ্জাত ওরা নিজেরা। তবু ওদেব সঙ্গ ছাডা রিনি আর কারো সঙ্গে মিশতে পারেনি। তাই ওদের সঙ্গ ছাড়তেও পারেনি। সেই থার্ড ক্লাস থেকে ওদেব সঙ্গে বন্ধুত্ব। কত ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমানের পরেও তা টিঁকে আছে। কত মাসের পর মাস কথা বন্ধ করে থাকবারও পরও ফের একজন আর-একজনের কাছে মুখ খুলেছে, মন খুলেছে। মনের কথা বলবার মত সত্যিই একজন কাউকে না কাউকে দরকার। মার কি এতদিন কেউ ছিল না? এখন আর তেমন কেউ আসেন না, কিন্তু আগে আগে তো বাবার কত বন্ধুবা এসেছেন, কাকারা এসেছেন, মার সঙ্গে কথাবার্তা হাসিঠাট্টাও করেছেন কত, কিন্তু কই, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে মা যেমন জমিয়ে গল্প করেন তেমন তো আর কারো সঙ্গেই রিনি করতে দেখেনি, অথচ জিতেশবাবুর মধ্যে এমন কীই বা আছে? বাবার মত বিদ্বান নন, বুদ্ধিমান নন, পদস্থ অফিসাবের গুরুদায়িত্ব ওঁকে বইতে হয় না, নিতান্তই একজন সাধারণ ক্যানভাসাব। রূপে কি স্বাস্থ্যেও যে বাবার চেযে ভালো তা নয। শুধু বয়সই যা দু-চাব বছর কম। চল্লিশ বিয়াল্লিশ। রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। গায়ের বং একটু ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, মুখখানা গোলও নয় লম্বাও নয়, ববং একটু যেন চৌকো। প্রথম দিন দেখেই রিনি তো চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ আবাব কি রকম মুখ রে বাবা। এর চেয়ে রিনির বাবাব মুখ দেখতে অনেক ভালো। একটু লম্বাটে, নাক চোখ ঠোঁট ঠিক পরিমাণমত। রূপে গুণে সত্যি জিতেশবাবু বাবার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না। তবুও যে এ বাড়িতে ওঁব এত আদর তার কারণ উনি বাবা ছাড়া অন্য কেউ বলে। অন্য বলেই অনন্য।

প্রথম প্রথম ভদ্রলোককে বেশী পছন্দই করতে পারেনি রিনি। তিনি এ বাড়িতে এলেই মা একেবাবে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। খাবার আনতে দেন, চা করেন, তাবপর মুখোমুখি বসে গল্প। কখনো খাটের ওপব পাশাপাশি বসে, কখনো বারান্দায় চেয়ার পেতে বেতেব টেবিলটা মাঝখানে আর ঝুলন্ত ফুলের টবগুলি চোখের সামনে রেখে। কথা বলতে বলতে কথা শুনতে শুনতে মা ঘরকন্নার কথা ভুলে যান। রিনিবা যদি এসে পাশে দাঁড়ায় ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন টেবই পান না মা। তোমাদের মধ্যে সিন্দুক ভরা কী এত কথা জমে রয়েছে বাপু যে, উজাড় করে ঢেলে না দিলে চলে না, আর ঢেলে দিতে না দিতেই ভরে ওঠে, সাত দিন যেতে না যেতেই আবার সেই কথার মণিমুক্তা সোনার সিন্দুক ছাপিয়ে উপচ পড়ে? ভদ্রলোক এলেই মা যেন আত্মহারা হন, আত্মীয়-স্বজন স্বামী ছেলে-মেয়েদেব হারিয়ে ফেলতেও ওঁব যেন কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু রিনির ভারি কষ্ট হয়, দুঃখ হয, রাগ হয়। মনে মনে। কেন? কেন? কেন মা তাদের ভুলে যাবেন? অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও ভুলে যাবেন? এই ঘর-সংসারের জন্যে যাঁর এত মায়া, ধোয়ামোছা, সাজানো-গোছানো সেরে বেলা দেড়টাব আগে যিনি খেতে বসতে পারেন না, রাতেরও খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে শুতে যাঁব বারোটা, সেই মাকে আধ ঘণ্টাব জন্যেও মমতাহীন দেখতে ভালো লাগে না রিনির। গা জ্বালা কবে, নাকি মন জ্বালা কবে। কে জানে মনটা কী বস্তু। প্রফেসর পি সি এস বলেছিলেন সূক্ষ্ম দেহ। দেহেব মধ্যেই কি আর একটা দেহ? স্থূল আর সূক্ষ্ম দুই দেহেই অস্বস্তি বোধ করে রিনি। চিনু আর বিনু অনেক ছোট। ওরা কিচ্ছু বোঝে না। বাবার অ্যাবসেন্সে এ বাড়িতে কে এল না এল তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। ওরা নিজেদের খেলা নিয়েই মত্ত। বাড়িতে বসে খেলে, বাড়ির পাশের ছোট চিলড্রেন্স পার্কটায় গিয়ে খেলে। কিন্তু রিনির ওসব ভালো লাগে না। এখনো মাঝে মাঝে ফ্রক পরলে কি হবে, সে শিশুও নয়, বালিকাও নয। সে সব বোঝে। রিনি জানে সে বাবার প্রতিনিধি। এ বাড়ির মান মর্যাদা রক্ষাব ভার তার ওপব। এই জন্যেই মার উপব তিনি যতটা নির্ভর না করেন, রিনির ওপব তাব চেয়ে ভরসা করেন অনেক বেশী। রিনি অহংকার করে না। মা লেখাপড়া কম জানলেও অনেক বুদ্ধি রাখেন। বাইরের কেউ আলাপ পরিচয় করতে এসে সহজে কেউ মার কম বিদ্যাব কথা ধরতে পাবে না, যেমন পারে না বেশী বয়সেব কথা আন্দাজ করতে। মার এখনো বেশ আঁটসাঁট শরীর। নিমন্ত্রণে টিমন্ত্রণে যাবার সময একটু সাজসজ্জা করে যখন বেরোন মনে হয় যেন রিনির বড়দিদি। কিন্তু তা হলে কি হবে, বাবা রিনকে যত পছন্দ করেন মাকে তেমন করেন না। মাব সঙ্গে তাঁর যেমন রোজ খিটিমিটি লাগে রিনির সঙ্গে একদিনও তেমন লাগে না। মা কি সেই

শোধ নিচ্ছেন ? জিতেশবাবুর সামনে গা এলিয়ে বসে তাঁর সঙ্গে প্রাণ ঢেলে গল্প করে মা কি এই কথাটা বলতে চান তাঁর দলেও লোক আছে, তাঁকে ভালোবাসারও মানুষ আছে ? ছেলেবেলায় নিজের লজেন্স গুলি জমিয়ে রেখে রিনি যেমন চিনিকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেত, মাও কি তেমনি বিনিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প করেন, দেখিয়ে দেখিয়ে বন্ধুত্ব করেন ভালোবাসেন ? জিতেশবাবু কি মার সেই অনেক কালের লুকিয়ে রাখা লজেন্স ?

প্রথম প্রথম মা বলতেন, 'কি যে ঘরের মধ্যে ঘুটঘুট করিস ! যা না রিনি, ওদের নিয়ে একটু পার্কে যা না। ঘুরে আয় না খানিকক্ষণ।'

বিনি শোনা যায় কি যায় না এমনি গলায় বলত, 'আমার কাজ আছে মা।'

কাজেব কি অভাব আছে ? রিনি কাপড় তুলত, ঘর ঝাঁট দিত টেবিল গুছোত। কিন্তু কোন কাজই ওর বেশী দূরে গিয়ে নয়।

যেখানে মা আর জিতেশবাবু বসে গল্প কবছেন তারই কাছাকাছি থেকে, তাঁদের দিকে চোখ রেখে, তাঁদেব কথায কান বেখে।

জিতেশবাবু হেসে বলতেন, 'লীলা, তোমার মেয়ে কিন্তু তোমারই মত হয়েছে।'

মা বিনিকে চটাবার জন্যেই বলতেন, 'ইস, আমার চেয়ে ও ঢের কালো।'

জিতেশবাবু বলতেন, 'তা হোক, তোমাব চেয়ে ও ঢের কাজেব আব ঢের চালাক।

রিনি বেশ বুঝতে পারত জিতেশবাবু ওকে দলে টানবাব জন্যে খোশামোদ করছেন। মন ভেজাবার জন্যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। আসলে রিনিও ওঁকে পছন্দ করে না, তিনিও ওকে পছন্দ কবছেন না। বয়ে গেছে রিনির। ওঁব পছন্দ আর অপছন্দে যেন তার এসে যায়।

মা বলতেন, 'ও মা, তা হবে না ! ওবা যে কলকাতা শহরের আজকালকাব মেয়ে। আমার মত পাড়াগেঁয়ে ভূত তো আর নয়। সত্যি, মাঝে মাঝে ভারি দুঃখ লাগে জানো ?'

জিতেশবাবু বলতেন, 'কিসের দুঃখ ?'

মা বলতেন, 'এ জীবনে কিচ্ছু হল না।'

মায়েব নিজেব হাতে পরিষ্কাব-করা মাজা মোছা (কে জানে আঁচল দিয়ে কিনা) চিনেমাটির সুন্দর ছাইদানিব মধ্যে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে জিতেশবাবু মিষ্টি মিষ্টি হাসতেন, 'মানব জমিন রইল পতিত ? কিন্তু লীলা, তোমাব জমিতে তো সোনা ফলেছে। ছেলে মেয়ে স্বামী সংসার, দু হাত ভরা চতুর্বর্গ ফল। আর কী চাও ?'

রিনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তবু যেন ওঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সমানে চলেছে ওঁদের আলাপ।

মা বলেছেন, 'দেখ, আমি আমার মেয়ের মত একেলে না হতে পারি কিন্তু দিদিমা ঠাকুমার মত অত সেকেলেও তো নই। মেয়েদেব বুঝি ঘর সংসার ছাড়া আর কিছু চাইতে নেই ? তাদের বুঝি হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জীবন যাবে ?'

মার মনে যে আরো চাওয়ার বস্তু আছে তা কে জানত ? অসাবধানে সংসারের একটি কাঁচের গ্লাস কি চায়ের কাপ রিনিরা যদি ভেঙে ফেলে মার যেন বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়, এমন চেঁচামেচি করেন। সেই সংসার এখন ওঁর কাছে শুধু হাঁড়ি ঠেলা ? এত অবহেলা নিজের ঘর সংসারে ? কেন, ওই একজন মানুষ আধ ঘণ্টার জন্যে এসেছেন বলে ? উনি কোন স্বর্গের সিঁড়ি হাতে করে নিয়ে এসেছেন শুনি ?

জিতেশবাবু যেন মায়ের মন বোঝবার জন্যেই বলেন, 'আহা, মেয়েদের সত্যিকারের সুখ তো আসলে— ।'

মা প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'থাক থাক'। আসল সুখের সন্ধান তোমাকে আর দিতে হবে না। আমাদের যে কিসে সুখ তা আমরাই জানি। নিজের বৌটিকে তো দিব্যি চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছ। আমার বেলায় বুঝি শুধু— ।'

জিতেশবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'কী করব বলো ? তার শুধু গৃহস্বামীতে মন ভরছিল না, অফিস-স্বামীও চাই। আমি বললাম, তথাস্তু। গৃহে একবচন, সেখানে বহুবচন। দ্রৌপদী মাত্র পাঁচজনের কথাই ভাবতে পেরেছিলেন। ওর অন্তত'— জিতেশবাবু দু হাত তুলে আঙুলগুলি

দেখান।

মাও হাসেন, 'দাঁড়াও আমি বউদিকে গিয়ে সব বলে দেব। তুমি তাঁর এইরকম সুনাম গেয়ে বেড়াও।'

এ ধরনের বাজে রসিকতা দুজনেই বেশ উপভোগ করেন। কিন্তু রিনির ভারি লজ্জা হয়। অস্বস্তি লাগে। ছি ছি ছি। ভদ্রলোক দেখি চ্যাংড়ামিতে কমবয়সী ছেলেদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কী করে ও ধরনের বদ ইয়ারকি করতে পারলেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য!

রিনির ইচ্ছা হচ্ছিল তক্ষুনি জায়গা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যেতে পারল না। সে চলে গেলেও ওঁরা আরও খারাপ খারাপ কথা বলবেন। ঠাট্টা ইয়ারকির আর সীমা থাকবে না।

মা বললেন, 'তুমি যাই বলো, তোমার স্ত্রীকে তুমি অনেক স্বাধীনতা দিয়েছ। অবশ্য তাঁর যোগ্যতাও আছে। আমার মত মুখ্যু-সুখ্যু তো আর নয়। আমার কিন্তু ইচ্ছে করে ফের পড়াশুনো করি।'

জিতেশবাবু বলেন, 'বেশ তো, শুরু করে দাও না।'

মা বল্লেন, 'দিতে পারি, তুমি যদি একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দাও। দেবে? আসবে? রোজ এসে পড়াবে আমাকে?'

আহ্লাদে সোহাগে মা যেন উথলে ওঠেন। উনি যেন রিনির মা নন, রিনিরই বয়সী কি তার চেয়েও ছোট? ভঙ্গি দেখে গায়ে জ্বালা ধরে রিনির। যদি পড়তেই হয়, বাইরের ভদ্রলোকের কাছে অমন আবদার করা কেন, বাবাকে বললেই হয়। বাবার কি বিদ্যাবুদ্ধি কারোর চেয়ে কিছু কম? তিনিই তো মাকে পড়াতে পারেন। যদি তেমন সময় না পান, রিনিদের জন্যে যেমন টিউটর রেখে দিয়েছেন মার জন্যেও তেমনি টিউটর রেখে দিতে পারেন। হ্যাঁ, মার জন্যেও বুড়ো টিউটরই রাখা দরকার, যাঁকে কিছুতেই দাদা-টাদা বলা যায় না, মুখ থেকে আপনিই দাদু শব্দটা বেরিয়ে আসে। মাও অবশ্য নতুন করে আর পড়াশুনো আরম্ভ করেন না, জিতেশবাবুও ওঁকে পড়াতে আসেন না। কিন্তু সত্যিকারের কাজটাই কি সব? কথার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। কথা যেন অন্তরীপের মত ভবিষ্যতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে যায়। রিনি বেশ দেখতে পেয়েছিল মা সেজেগুজে চুল বেঁধে কমবয়সী ছাত্রী সেজে রোজ বই খাতা কলম নিয়ে পড়তে বসেন আর ওই ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর রোজ এসে হাজির হোন। 'কই গো লীলা, পড়াশুনো কতদূর কি করেছ নিয়ে এসো দেখি।' ওষুধের ক্যানভাসার একজনের সাধের জোরে কলেজের প্রফেসর হয়ে ওঠেন। কারো বাড়ি রোজ তো আর আসা যায় না, এমন কি সপ্তাহে একদিন এলেও বাড়াবাড়ি লাগে, কিন্তু পড়াতে রোজ আসা যায়, আধ ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেও কারো কিছু বলবার জো থাকে না। যখন পড়বার কথাটা তুলেছিলেন, তখন মাও কি এইসব ভাবেননি? এমন একটি মধুর ছবি দেখেননি? এমন একটি ছাত্রী হয়ে ওঠেননি যার পড়া কোনদিন ফুরোবে না? এমন অসংখ্য সান্ধ্যমিলনের কল্পনা করেননি যা সারা জীবন ধরে আসবে?

আর একদিন উঠেছিল ওঁদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। সেদিনও চা দিতে দিতে খানিকটা সামনে থেকে আবার ঘরে গিয়ে বই গুছোবার অছিলায় খানিকটা আড়াল থেকে ওঁদের সব কথা শুনেছিল রিনি।

মা বলছিলেন, 'সত্যি, আর ভালো লাগে না এই একঘেয়ে জীবন। দাও না একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে। দিব্যি বাবু সেজে পান মুখে দিয়ে অফিসে যাব আসব। সংসারের কোন ঝামেলা-ঝক্কিই আর পোহাতে হবে না।'

জিতেশবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আগেকার মেয়েরা শাড়ি চাইত, গয়না চাইত। আমাদের যার যেটুকু সাধ্যে কুলোতো দিতাম। এখন, তোমরা দল বেঁধে চাকরি চাইতে শুরু করেছ। কিন্তু চাকরিও যা আকাশের চাঁদও তাই। পরের চাকরি করে কী হবে, বরং নিজে কিছু একটা গড়ে তোল! নিজের হাতে গড়া জিনিসের মধ্যে যে সুখ পরের কাজে কি আর তা মেলে?'

মা বললেন, 'তুমি ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছ? কিন্তু তাতে তো টাকা লাগে। গরীব মানুষ, অত টাকা কোথায় পাব? আমাদের মূলধনের মধ্যে তো দুখানি হাত।'

জিতেশবাবু হেসে বললেন, 'আর একখানি মুখ।'

মা মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'যাও।' তারপর বললেন, 'সবাই তোমার মত কিনা। সবই মুখে মুখে। জিভ সর্বস্ব।'

জিতেশবাবু বললেন, 'যা বলেছ। জিভেই এখন আমার জীবনের শেষ লক্ষণটুকু আছে। আর সব অসাড়। সত্যি, আমিও মাঝে মাঝে ভাবি ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর, নিজেই একটা কিছু গড়ে তুলব। ছোটমত একটা ওষুধের কারখানা-টারখানা যদি দিতে পারতাম। কিন্তু একার সাধ্যে কুলোবে না। তুমি আসবে আমার সঙ্গে? পার্টনার হবে?'

রিনির কানে খচ করে বিঁধেছিল কথাটা। কী অসভ্য! কী অসভ্য! অভদ্রতার একশেষ। পার্টনার কথাটার যে আরো মানে আছে, রিনি তা জানে না উনি ভেবেছেন বুঝি?

মা কিন্তু বলে চললেন, 'কেন হব না? তুমি যদি ডাকো আমি নিশ্চয়ই আসব। আমার হাতে অবশ্য নগদ টাকা কিছু নেই। কিন্তু বাবার দেওয়া গয়না তো আছে, তাই ধরে দেব। তুমি একটা কিছু গড়ে তোল। আর আমাকে সেখানে যে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দাও। আর কিছু না হোক, তোমার কারখানার ওষুধ মোড়ক করবার কাজও কি আমাকে দিয়ে হবে না?'

উৎসাহে উল্লাসে উত্তেজনায় জিতেশবাবু সোজা হয়ে বসেছিলেন, 'কী বলছ তুমি? মোড়ক করবার কাজ মানে? তার জন্যে আমরা অন্য লোক রাখব। কত দুস্থ দুঃখী গরীব মেয়ে আছে, তাদের নেব। যদি তেমন কিছু একটা গড়ে তুলতেই পারি, আমি হব ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর তুমি হবে জেনারেল ম্যানেজার। তার চেয়ে কোন নিচু পদ তুমি বিনয় করে নিতে চাইলেও তোমাকে দিতে পারব না।'

মা বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার কি তেমন বিদ্যের জোর আছে?'

জিতেশবাবু বলেছিলেন, 'বিদ্যে! বিদ্যে দিয়ে কি হবে? বিদ্যে যারা তোমার কাছে চাকরিপ্রার্থী হয়ে আসবে তাদের দরকার। হাজার হাজার অ্যাপলিকেশন পড়বে। বি-এ, এম-এ, বি এস-সি, এম এস-সি। কারো কারো বা বিদেশী ডিগ্রী। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ফেরত সব বাঙালী যুবক, তোমার কাছে চাকরি-প্রার্থী হয়ে হাত কচলাবে। যাকে যোগ্য মনে কর তাকে চাকরি দেবে। একটু একটু পক্ষপাত যদি করো, আমি কথা বলব না। আমি সব সময়ই তোমার পক্ষে। আমি আর তুমি পাশাপাশি ঘরে থাকব। তবু যখন তখন দেখা হবে না, কিন্তু শোনা হবে। দুজনের টেবিলে দুটি ফোন আছে। ফোনে ফোনে কথা বলব। একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। সন্ধ্যায় একসঙ্গে অফিস থেকে বেরোব। উঁহু, তাই বলে এক গাড়িতে নয়। উঁহু, এক গাড়িতে নয়। তাতে নানা জনে কানাঘুষো করতে পারে। কোম্পানী আমাদের দুজনকে আলাদা করে দুখানা গাড়ি দেবে। দুজনের গাড়ি পাশাপাশি চলবে। যে রাস্তা অনুদার অপ্রশস্ত সেখানে তুমি আগে আমি পিছে।'

রিনি বুঝতে পারে সমস্ত ব্যাপারটাই ঠাট্টা। মাও শেষ পর্যন্ত হেসে ওঠেন। কিন্তু যতক্ষণ না ভদ্রলোকের কথা শেষ হচ্ছিল মা অপলকে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, রিনি তা লক্ষ্য করেছে। যেন ব্রতকথা শুনছিলেন মা, রূপকথা শুনছিলেন। ভদ্রলোকের মুখে রূপ না থাকলে কি হবে, কথায় রূপ আছে।

ঠাট্টা ছাড়া কিছু নয়। তবু এই ঠাট্টার মধ্যেও দুজনের মনের চেহারা কি দেখতে পায়নি রিনি? জিতেশবাবুর অত বড় কারখানায় অত প্রাসাদের মত অফিসে রিনির জায়গা হল না, রিনির বাবার জায়গা হল না, শুধু তার মা আর উনি। কী সাহস মানুষটির! কত বড় স্পর্ধা তাই দেখ। এ কথা ভাবতে পারলেন কী করে, বলতে পারলেন কী করে? আর মা-ই বা কিরকম? যেই বলা অমনি রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রলোকের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হতে। একবার ভাবলেন না লোকে কী বলবে, রিনিরা কী মনে করবে। সব আক্কেল বুদ্ধি কি মার ধুয়ে মুছে গেছে?

আর একদিন উঠেছিল পথের কথা। সেদিন প্রাইভেট পড়ানোও নয়, কারখানা আর অফিসবাড়ীও নয়। ভদ্রলোক ওষুধের নমুনা নিয়ে নর্থবেঙ্গলে গিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং হয়ে গ্যাংটক পর্যন্ত। সেই পথের কথা, বিপদ আপদের কথা, অ্যাডভেঞ্চারের কথা। আজকাল লোক কথায় কথায় ইংল্যোণ্ডে যাচ্ছে, জার্মানীতে যাচ্ছে, আমেরিকায় যাচ্ছে, আর

ওঁর দৌড় ওই গ্যাংটক পর্যন্ত। তার আবার গল্প।

'সে যে কী পথ তুমি ভাবতেও পার না লীলা!'

মা অমনি অভিমানের ভঙ্গিতে মুখ ভার করে বললেন, 'চাইনে ভাবতে। কী স্বার্থপর মানুষ। একা একা ঘুরছ তো ঘুরছই। মাস দেড়েকের ওপর হয়ে গেল, সেই যে গেছ তো গেছই। একটা খবর বার্তা নেই। একখানা চিঠি পর্যন্ত নেই। এই তো তোমার মায়ামমতা।'

ভদ্রলোক হাসি দিয়ে মায়েব মন একেবারে ভিজিযে দিয়েছেন, 'দেখ, চিঠি ঠিক লিখে উঠতে পারিনি, কিন্তু রোজ লিখি লিখি করেছি। এমন দিন যায়নি তোমার কথা মনে পড়েনি। এমন জায়গায় যাইনি যেখানে মনে না হয়েছে তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ হত।'

শুনতে শুনতে মার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। রিনিব অন্তর রাগে জ্বলে গেছে। কী স্পর্ধা ভদ্রলোকের, কী সাহস! প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মা ওঁকে কতখানি এগোতে দিয়েছেন।

মা বলেছেন, 'তোমার যত সব বানানো কথা। তোমার মত মহা মিথ্যুক আর নেই।'

'আচ্ছা, একবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোব।'

মা বলেছেন, 'হুঁ তুমি আবার বেরোবে। তুমি একদিন একটা সিনেমা পর্যন্ত আমাকে দেখালে না। একদিন সঙ্গে করে ওই পার্কটা পর্যন্ত যাবে তাই তুমি পারলে না।'

জিতেশবাবু ভরসা দিয়েছেন, 'যাব, যাব। যেদিন যাব সেদিন একেবাবে লম্বা পাড়ি দেব। তারপর শোন, গ্যাংটকের যে হোটেলটায এবার উঠেছিলাম—।'

মা অমনি গালে হাত দিযে হোটেলের গল্প শুনতে বসেন। ভদ্রলোক মাকে সঙ্গে করে সিনেমায় রেস্টুরেন্টে, পার্কে কি লেকে না নিযে গেলে কি হবে, নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তেব ভিতব দিয়ে তাঁকে না নিয়ে যান এমন পথ নেই, যানবাহন নেই, শহর বন্দর নেই। আর সেই সব কল্পধামে গল্পের জগতে মা নিশ্চয়ই একা একা ওঁর সঙ্গে বেড়ান। সেসব জায়গা হয় বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতেব মত নির্জন, আর শহর বন্দর হলে এমন সব লোকজন আছে যাঁবা সব অচেনা। অচেনা লোকজনও যা, গাছপালাও তা। তাদের কাছে আবাব চক্ষুলজ্জা।

ভদ্রলোক প্রথম প্রথম একেবারে খালি হাতে আসতেন, তাবপর বোধ হয় ভাবলেন, ছেলেপুলের বাড়ি একেবারে শূন্য হাতে যাওয়াটা সব দিন ভালো দেখায না। তাই মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিসও আনতে লাগলেন। দামী জিনিস কিছু নয়। হযতো এক শিশি লজেন্স, এক কৌটো বিস্কুট, কি খাবার জন্যে এক পাউণ্ড দার্জিলিং-এর চা। কি বিজযার পরে বড জোব এক টাকার সন্দেশ। আর উপহারের মধ্যে যত ওষুধের খালি শিশি, কৌটো—যাব দাম নেই, শুধু দেখতে সুন্দব আর রঙীন। শুধু চিনু আর বিনু নয়, মাও সেই খেলনাগুলি পেয়ে কী খুশীই না হযেছেন। হেসে বলেছেন, 'বাঃ, কী সুন্দর তোমার এই বিস্কুটের টিনটা। আমি এর মধ্যে ডাল রাখব।'

শুধু ডাল নয়, সেই খালি শিশি আর কৌটোগুলি মা যেন মনেব খুশী দিয়ে ভরে তুলেছেন, ভদ্রলোক কোন বার আনতে ভুলে গেলে চেয়ে নিয়েছেন। ছি ছি ছি, কী হ্যাংলামি, কী কাঙালপনা। রিনি কিন্তু ওর হাতে থেকে কোন উপহার নেয়নি, ওঁর আনা কোন খাবার খায়নি। জোর করে হাতেব মধ্যে গুঁজে দিলেও লুকিয়ে হয় ফেলে দিয়েছে, না হয় চিনু কি বিনুকে দিয়েছে।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা অন্যবকম হল। ভদ্রলোক আজ যখন বিকেল বেলায় এলেন, মা বাড়ি ছিলেন না, চিনু আর বিনুকে নিয়ে ভবানীপুরে পিসীমার বাড়িতে গিযেছিলেন। রিনিরও যাবার কথা ছিল কিন্তু মাথাটা ধরেছিল বলে যায়নি, কলেজও কামাই করেছে। বিকেল বেলায় গা ধুযে, চুলের বিনুনি কবে মারই হালকা সবুজ রঙের মাদ্রাজী শাড়িখানা পবেছিল রিনি। তারপর বারান্দায় রেলিং-এর ধারে চেয়াবটা টেনে নিয়ে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। বাড়ির পব বাড়ি, ছাদের পব ছাদ, তারই ফাঁকে এক চিলতে আকাশ। সেই আকাশে অদ্ভুত একটু রঙ—লাল নয়, সবুজ নয়, হলদে নয়, বেগুণী নয়, সে রঙের নাম জানে না রিনি। কিন্তু দেখতে ভালো লাগছিল।

রিনির হঠাৎ মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে দেখল ঠিকই। সেই ভদ্রলোক, মায়ের বন্ধু জিতেশবাবু। কিসের একটা অস্বস্তি ভয় লজ্জা আর আশঙ্কায় বুক ভবে উঠল রিনির। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল, কথা না বলে চলে যাচ্ছিল—ওঁর সঙ্গে পারতপক্ষে সে কোন কথা বলে

না। জিতেশবাবু বললেন, 'ইয়ে তোমার মা কোথায় ?'

রিনি বলল, 'ভবানীপুরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।'

পাছে মনে করেন, অভদ্রভাবে তাঁকে বিদায় করে দিতে চাইছে, তাই বলেছিল, 'আপনি বসুন।'

তিনি বললেন, 'না, আর বসব না। আমারও কাজ আছে।'

'এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না ?' নিতান্তই ভদ্রতা করে বলেছিল, রিনি।

তিনি হেসে বললেন, 'না। বসবও না, চা-ও খাব না। তুমি তো আমাকে পছন্দ করো না।'

পছন্দ করে না ঠিকই। কিন্তু মুখের ওপর যদি কেউ ওকথা বলে বসেন, তা কী স্বীকার করা যায়!

রিনি তাই বলেছিল, 'কে বললে আপনাকে।'

তিনি বলেছিলেন, 'কে আবার বলবে। এই ধবো, যদি বলি, তুমি আমাকে এই গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো, যাবে ?'

রিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'হুঁ।'

এটুকুও সাধারণ ভদ্রতা। যে ভদ্রলোক একটু বসলেন না, চা খেলেন না, কিছুই নিলেন না, তাঁকে কি এটুকুও দিতে নেই ? একটু এগিয়ে দিতে নেই ?

চাকরকে ঘরদোর দেখতে বলে রিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়। তৈরি হওয়া আর কি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার পাউডারের পাফটি মুখে বুলিযে নেওয়া আব নতুন কেনা নীলরঙের স্যাণ্ডালটার মধ্যে পা গলিয়ে দেওয়া। তারপর ওঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। রোজ বার কয়েক করে যে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে রিনি সেই পুরোন বাড়িব সরু সিঁড়ি বেয়েই নামল, কিন্তু মনে হল যেন পাহাড থেকে নামছে। সদব পেরিয়ে সেই অতিচেনা গলি। একদিকে বস্তি, আর একদিকে মুড়ি-মুড়কির দোকান, ঘোতনদার জয়লক্ষ্মী স্টোর্স, রমেশ দাসেব সস্তা সেলুন। তবু রিনির মনে হল যেন অদেখা অচেনা গ্যাংটক শহরের কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। মোড়ে পৌঁছতে দু মিনিটের বেশি লাগল না। একটা ফুলের দোকান আছে এখানে। গরীব একটা মালী বসে। যেমন তার চেহাবা তেমনি ফুলগুলিব ছিবি। যারা এই রাস্তা দিয়ে শিবমন্দিরে পুজো দিতে যায়, তারাই এখানে ফুল বেলপাতা কেনে।

কিন্তু জিতেশবাবু হঠাৎ এই ফুলের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রিনি বলল, 'কী হল ?'

তিনি বললেন, 'কিছু ফুল কিনি।'

রিনি বাধা দিল না। দিলেই কি তিনি শুনতেন ? তাছাড়া ভেবেছিল উনি নিজের জন্যেই কিনছেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। তিনি এক ডজন রজনীগন্ধা কিনে তাব হাতে দিলেন। আব কিনলেন একটি লাল টুকটুকে গোলাপ। হেসে বললেন, 'তোমাব জন্যে।'

রিনি বাধা দিতে পারল না, প্রতিবাদ করতে পারল না, কোন একটি কথামাত্র বলতে পারল না।

তিনি রিনির দিকে তাকিয়ে আর একটু হাসলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। ট্রামে উঠলেন কি বাসে উঠলেন রিনি লক্ষ্যই করতে পারল না।

ফিরতি পথটুকুতে কিছুই কি সে লক্ষ্য করেছে ?

সিঁড়ি বেয়ে কোন রকমে উপরে উঠে এসেছে রিনি। আশ্চর্য আজ কিছুতেই পারল না ফুলগুলি ফেলে দিতে। যেমন ফেলে দিয়েছিল তার ভাগের লজেন্স, তুচ্ছ শিশি কৌটোর উপহার।

রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি খাটো করে কেটে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে রিনি! কিন্তু গোলাপটিকে রাখতে পারেনি। এই গোলাপটি হয় ফেলে দেবে, না হয় দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করে লুকিয়ে রাখবে। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। তাকে ফুল বলে আর চেনা যাবে না। কিন্তু মা যতক্ষণ এসে না পৌঁছন, ততক্ষণ ফুলটিকে টেবিলের ওপর রাখতে ক্ষতি কি ?

কিন্তু এ ফুল উনি কেন দিলেন, কাকে দিলেন ? কেন রিনিকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে গেলেন ? ওঁর কি আরো দূরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল ? ভয়ে পারলেন না ? কার ভয়ে ? ওঁর কি এখানে

আরো অপেক্ষা করবার ইচ্ছা ছিল ? ভয়ে পারলেন না ? কার ভয়ে ? কিন্তুএমন যদি হয় রিনিকে তার মার শাড়ি পরে থাকতে দেখে তিনি ওকে তার মা বলেই ভুল করেছিলেন। তাই যদি হবে, ভুল ভাঙবার পরেও কেন অমন হাসি-ভরা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ? রিনি কারো চোখের দিকে তাকায় না বলেই কি কোন্ দৃষ্টির কী মানে তা বুঝতে পারে না ? মানুষের মন যত দুর্বোধ্যই হোক, তার দুটি চোখ দুখানি নোট বই। জিতেশবাবু মার সঙ্গে কথা বলতে আসেন, কিন্তু দেখতে আসেন তাকে, তা রিনি অনেক দিন দেখেছে। তিনি বার বার তাকে কাছে ডেকেছেন, রিনি যায়নি, কথা বলতে চেয়েছেন, রিনি বলেনি।রিনির কোন সন্দেহ নেই, সে ওঁকেই জয় করে নিয়েছে। যেমন একদিন বাবাকে করেছিল। আদরে সোহাগে সেবায় শুশ্রূষায় বাবাকে সে একেবারে বাধ্য করে ফেলেছে। এবার মায়ের বন্ধুর পালা। কিন্তু ওঁর বেলায় আর এক অস্ত্র। অনাদর, অনাগ্রহ, বিতৃষ্ণা, বিরূপতা। রিনি হঠাৎ নিজের মনে অদ্ভুত এক উল্লাস বোধ করল। সে জয় করেছে, কেড়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে। এই রক্তগোলাপ তার সাক্ষী। এই রক্তগোলাপ দিগ্বিজয়িনীর লুঠ করা মণিমাণিক্য : বল্লমের মুখে তুলে আনা পরম শত্রুর রক্তাভ হৃদপিণ্ড।

রিনি দুটি আঙুলে ফুলটাকে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। তার বিজয়-কেতন তার গৌরবপতাকা। বেচারা মা, তোমার একমাত্র বন্ধুটিও গেল। কিন্তু মায়ের বন্ধু। কী বিশ্রী শুনতে, মায়েব বন্ধু। তার চেয়ে বয়সে বড, ঢের বড়। মায়ের চেয়েও বড। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো বাঘ শিকার করে রিনির এত গর্ব। ছি ছি ছি। রিনি মঞ্জু আর দীপার বন্ধুদের কিছুই করতে পারল না, শেষ পর্যন্ত কিনা মায়ের বন্ধুকে—ছি ছি ছি। কিন্তু ভদ্রলোকের মুগ্ধ চোখ দুটি বড় সুন্দর, তাঁব দেওয়া গোলাপটির রঙ এত টুকটুকে লাল, আর তাঁর মুখের সব কথাই তো রূপকথা। কিন্তু—কিন্তু তিনি কেন সবদিক থেকে রূপকথার রাজপুত্র হলেন না।

আষাঢ ১৩৬৮

একটি মৃত্যু ও আমি

দুপুর বেলায় ঘুমোচ্ছিলাম। রাত দুপুর নয়, দিন দুপুবে। যখন নাইট ডিউটি পড়ে তখন আমরা 'রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।'

কিন্তু অকালেই ঘুমটুকু ভাঙল।

কানের কাছে কিসের একটা গোলমাল হচ্ছে। কারা যেন কথা বলছেন। বিছানাব পাশেই ফোন। আমার খাটের ধারে বসে সেই ফোন তুলে কে যেন আলাপ করছেন। আরো জন দুই লোক তাঁর পাশে আব পিছনে দাঁড়ানো। কী মুসকিল একটু ঘুমুতেও দেবে না এরা। সংসারে কোন সুখই একেবারে নিষ্কণ্টক নয়। সাধ করে বিছানার পাশে আমিই এই টেলিফোনের প্রতিষ্ঠা করেছি। দূরের বন্ধুদের সঙ্গে শুয়ে বসে গল্প কবব, যদি ভাগ্য ভালো হয়, কালেভদ্রে কোন কোন দূরবর্তিনী কি অদূরবর্তিনীর গল্প শুনব। কিন্তু তখন উপায়টাই খুঁজেছি, অপায়ের দিকে চোখ রাখিনি। এই স্বরক্ষেপ যন্ত্রটি সময় অসময়ে বেজে উঠে যে আমার নাইট ডিউটি দেওয়া ঘুম ভাঙাবে, এবং বেশির ভাগ সময় আমাকে বাদ দিয়ে আমার প্রতিবেশীদেব ডাকবে আর পড়শীদেরও দিন দুপুর কি রাত দুপুর জ্ঞান থাকবে না এমনটা আশঙ্কা করিনি।

ঘুম ভাঙলেও চোখ বুজে পড়ে রইলাম। বোবার যেমন শত্রু নেই, ঘুমন্ত মানুষেরও তেমনি সামাজিক কর্তব্য নেই। পা থেকে গলা পর্যন্ত লেপের পুরু প্রলেপ ছিল। টেনে নিয়ে মুখটাও ঢাকলাম। যাঁরা এসেছেন তাঁদেব আমি ইতিমধ্যে আড চোখে দেখে নিয়েছি। তাঁরা আমাব অপরিচিত নন, পব নন, পরম না হলেও আত্মীয়। তবু এই মুহূর্তে আমি ঠিক তাঁদের মুখোমুখি হতে চাইনে। কোন আলাপ আলোচনায় যোগ দেওয়াও আমার ইচ্ছা নয়। মন যদিও বহু বাসনার বাবুই বাসা তবু ভাঙা ঘুম জোড়া লাগুক এই আকাঙ্ক্ষাটুকু ছাড়া এখন আমার দ্বিতীয় আর কোন কাম্য বস্তু নেই। এর জন্যে আমি যে বিশেষ লজ্জিত তাও নয়। যার কর্তব্য নিশাকালে, ঘুমিয়ে নেওয়ার

জন্যে দিনে তার যদি শিষ্টাচারে সৌজন্যে একটু আধটু অকর্তব্য ঘটেই পড়ে সে অপরাধ মার্জনার অযোগ্য হয় না। লেপের আবরণের মধ্যে থেকে আমি যেন ঘুমের ঘোরেই ঈষৎ পাশ ফিরলাম। কিন্তু সত্যিকারের ঘুম নয় বলেই আগন্তুকদের কথাগুলি দিব্যি কানে যেতে লাগল।

'হ্যাঁ বারোটায় মারা গেছেন। ভুগছিলেন ঠিকই, অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। তবু মরবার বয়েস তো আর হয়নি। যাকগে যা হবার তাতো হল। তোমরা এসো। বিশু নমুদের খবরটা দিয়ো। যদি পারে আসবে। না ছেলেরা কেউ সামনে ছিল না। ঠিক মত খবর দেওয়া হয়নি। যেমন ভাগ্য। আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক উঠে চলে যাচ্ছেন দেখে আমি এবার চোখ মেললাম।

বললাম, 'কী ব্যাপার পরেশমামা ?'

তিনি বললেন, 'আর কি ব্যাপার, হয়ে গেল। দিদি চলে গেলেন।'

আমি একটু চুপ করে রইলাম। মারা যাওয়াটাকে আমরা যাওয়াই বলি। কোথায় যে যাওয়া সেইটুকুই শুধু জানিনে। আজও বহুলোক তাকে পরলোক বলে মানে। ছেলেবেলায় আমিও তাই বিশ্বাস করতাম। বয়স বাড়বার পর আর কিছু বেড়েছে কিনা নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে, কিন্তু সেই কল্পনার স্বর্গটুকু খুইয়েছি।

পরেশ মামা বললেন, 'দেখতো, তোমার আবার ঘুম ভেঙে গেল। থাক থাক তোমার আর উঠতে হবে না। তুমি ঘুমোও। তোমার নাইট ডিউটি, আমি সব শুনেছি। তুমি ঘুমোও।'

আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পরেশ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁরই দিদি মারা গেছেন। কিন্তু মনে হল না খুব বিচলিত। শোক পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়কে অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়ে নাও নিতে পারে। তা ছাড়া এ মৃত্যু হঠাৎ আসে নি। আত্মীয় স্বজনকে দীর্ঘমেয়াদী নোটিশ দিয়েছে, যাঁকে যেতে হবে তাঁকেও তৈরী করে নিয়েছে তিলে তিলে।

ভদ্রমহিলা লিভারের ব্যাধিতে বছর দুই ধরে ভুগছিলেন। সহ্যের অতীত কষ্ট পাচ্ছিলেন। সে কষ্ট এতদিনে ঘুচল।

তাঁর চিরনিদ্রা আর ভাঙবে না। কিন্তু আমার ফাটলধরা ঘুমটুকু ফের একবার জুড়ে না নিলে নয়। আজও আছে রাত জাগবার পালা।

লেপ মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আমি ভাবলাম আমার কি একবার উঠে দেখে আসা উচিত ছিল না ? একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েও আমার কি এমন মড়ার মত পড়ে থাকা সঙ্গত ? সেই মৃত্যুশয্যা এখান থেকে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ। পা বাড়ালেই নন্দ মুখার্জী লেন। কিন্তু পা বাড়ালে তবে তো। না যাওয়ার পক্ষেও আমার যুক্তির অভাব নেই। মহিলাটিকে আমি সামান্যই চিনি। জীবনে দু একবার মাত্র দেখেছি। তাও দু-চার মিনিটের জন্যে। তাঁর রোগ শয্যায় যাব যাব করে একদিনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্য ওঁরাও যে আমাকে কেউ প্রত্যাশা করেছেন তা নয়। সব আত্মীয়তাই তো আর এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। স্বল্প পরিচয়ের পুরু পর্দার আড়ালে আমার বাস। ওঁদের বাড়িতে একবার এক বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তাই বলে জন্মমৃত্যুর সব খবর রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া আমি না গেলেও অবারিতভাবে আমার ফোন ওঁদের ব্যবহার করতে দিয়েছি। মাঝে মাঝে দ্বিজেনবাবু—ওই মহিলাটির স্বামী আমার এখানে ফোন করতে এসেছেন। অন্য আত্মীয় স্বজনও কেউ কেউ ফোন করে গেছেন। সেই আনাগোনার ভিতর দিয়েই আমি জানতে পেরেছি, মানে অন্যমনস্ক অর্ধমনস্কভাবে আমার কানে গেছে, এই মহিলাটির রোগভোগের কথা, চিকিৎসার কথা। মাঝে মাঝে ওষুধ মাঝে মাঝে ডাক্তার সুদ্ধ বদলাবার কথাও শুনেছি। কিন্তু সব নামই তো রাধার শ্যাম নাম নয়, যে কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুবে। শুনেছি আর ভুলেছি। এ যেন ছেলেবেলার প্রাইমারী স্কুলের শ্লেটে লেখা শ্রুতলিপি। লিখেছি আর মুছেছি। যিনি আমার চিত্তলোকের কেউ নন আমার অনুভূতির রাজ্যে তাঁর ইহলোক আর পরলোকের সীমানা একটি চকখড়ির রেখায় চিহ্নিত। আমার স্থানও ওঁদের মনোভূমিতে ঠিক এমনি তিলার্ধ পরিমাণ। তাই শোক করে লাভ নেই। নিজের অনুদারতা নিয়ে অযথা অনুতাপ নিষ্ফল।

শোক নেই, তবু নিজেকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। ঘুম

যখন ভাঙল ঘরের মধ্যে অন্ধকার, বাইরেও বিশেষ আলো নেই। রোদ একেবারে ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে উঠেছে কি গাছের ঘন ডালে।

জেগে উঠেও গা ম্যাজ ম্যাজ করতে লাগল। মেজাজটাও ভাল লাগল না। শীতকালে দিবা নিদ্রার এই ফলটুকু হাত পেতে নিতেই হয়। মনে হল শুধু অনেক যে ঘুমিয়েছি তাই নয়, হিজিবিজি অনেক স্বপ্নও দেখেছি। সে সব স্বপ্ন নিশ্চয়ই অসামাজিক আর অপ্রীতিকর। তাই বিন্দু বিসর্গও সচেতন মনে আনতে পারছিনে।

বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া শুধু ঘরে নয়, সমস্ত দেহ মনেই যেন জড়িয়ে রয়েছে। সব যেন কেমন অবাস্তব খাপছাড়া খাপছাড়া। আমি কি হঠাৎ অন্য কোন রাজ্যে এসে পড়েছি ?

কিন্তু একটি পরিচিত মুখ দেখে আর সেই মুখের কথা শুনে আমার ভ্রম ভাঙল। এ রাজ্যপাট আমারই। রাজ্যের যিনি অধীশ্বরী তিনি একেবারে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাজির। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছ। দু দুটো ফোন এল, তাতেও তোমার ঘুম ভাঙল না।'

বললাম, 'ডেকে দিলে না কেন ? কার ফোন ?'

তিনি বললেন, 'তোমার হলে কি আর না ডেকে দিয়ে পারতাম ? বীণা মাসীমাদের ফোন। তাঁর মাবা যাওয়ার খবর শুনে তাঁর ভাগ্নে আর ভাইপোরা ফোন করেছিলেন।'

বললাম, 'ও।'

'সবাই খোঁজ খবর নিচ্ছে, যাচ্ছে আসছে। তুমি একবাবও গেলে না। যাই বলো এটা কিন্তু ভালো দেখায় না।'

বললাম, 'তুমি তো গিয়েছ ?'

তিনি বললেন, 'গিয়েছি বইকি। আমি কি আর তোমার বলার অপেক্ষায় আছি। কতবার গেলাম, কতবার এলাম।'

বললাম, 'তাতেই তো হয়েছে।'

তিনি বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, 'না তা হয় না। সব কাজেই বদলী চলে না। পারো তুমি অফিসে নিজে না গিয়ে কোনদিন আমাকে পাঠাতে ?'

স্বীকাব করলাম তা আমার সাধ্যাতীত। তারপর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বিবর থেকে বেরোলাম।

কিন্তু শুধু আমার ঘরই নয় বহির্বিশ্বও যেন এক বৃহৎ গহ্বরের চেহারা নিয়েছে। শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। শহরতলীর রাস্তায় আজ কেন যেন আলো জ্বলেনি। আমার ঘরের সামনের দীপদণ্ডটি প্রায়ই নির্বাপিত থাকে। আজ দেখলাম সেই নির্বাপন দণ্ড সবাই মাথা পেতে নিয়েছে।

বাঁ-দিকের বাড়িগুলি সারিবদ্ধ নয়, ছড়ানো ছিটানো, ডানদিকের বাড়িগুলির বিন্যাস মোটামুটি সরল রেখায়। ঠাণ্ডার আর মশার ভয়ে প্রত্যেকটি বাড়িই দোর জানলা বন্ধ করে এককেটি সিন্দুক হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিবেশীদের পাশাপাশি রয়েছি। মুখ অনেকেরই চিনি। কিন্তু ওই মুখ পর্যন্তই। সুখ দুঃখকে চিনি বললে নিজের শক্তির অত্যুক্তি হবে। চিনিনে। আর এই অপরিচয় স্বল্প পবিচয়কেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। আমার এক সুচতুর বাকপটু সহকর্মী একদিন বলেছিলেন, 'অনেকে আপনার কাছে মন খোলে না, হৃদয় খোলে না বলে আপনি মন খারাপ করেন। আরে মশাই যদি খুলত আপনি কি সব সইতে পারতেন ? সেই বিশ্বভার বইতে পারতেন ?' তা ঠিক। পারতাম না। বিশ্বের হৃদয় তো দূরের কথা শুধু নিজের হৃদয়ভার বহনই কত সময় দুঃসহ আর দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। নিজেকে নিজে বইতে পারিনে। তবু তো অনেকের অর্গলবদ্ধ হৃদয় দ্বারে উদ্বাহু হাত বাড়াই। সীমা ছাড়াবার জন্যে মন আকুলি বিকুলি করে। নিজের মধ্যে অনেককে এবং অনেকের মধ্যে নিজেকে দেখবার, ছোঁবার, অনুভব করবার স্বাদ পেতে চাই।

পাকা বাড়িগুলি ছাড়িয়ে কাঁচা রাস্তার বস্তীর মধ্যে পড়লাম। দুদিকে টালীর বাড়ি, অপরিচ্ছন্ন। এ পথে আমার আনাগোনা কম। দূরত্বকে একটু ছাঁটকাট করবার জন্যেই পাকা পথ ছেড়ে এই বাঁকা পথ নিয়েছি। নোংরা অস্পষ্ট অস্বচ্ছ এ যেন আর এক রাজ্য। নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য নয়। আমি ভুলে

গেছি ঠিক এই বস্তীতে না হলেও এরই মত আর একটি বস্তীতে আমি এক সময় বাস করেছি। বাস করেছি বলেই যে আরো পাঁচজন বাসিন্দার সুখ দুঃখের শরিক হয়েছি তা নয়। সাধ করে স্বেচ্ছায় সোহাগে তো আমি প্রীতির ডোর বাঁধতে যাইনি, বাধ্য হয়ে সেখানে ডেরা বেঁধেছি। সেই জনসমুদ্রে নিজের ঘর বিচ্ছিন্ন করে রেখে দ্বীপান্তরিত হয়েছি। তাই তাদের আমি চিনিনি। তারা আমার দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শের অতীত, আমার অনুভূতি উপলব্ধির বহির্লোকেব অধিবাসী। আমার পাড়ার প্রান্তে এই যে বস্তী, পা বাড়ালেই যেখানে আমি আসতে পাবি, অথচ আসি না, সেখানকার লোকজনও আমার অচেনা, এদের কারও মুখ পর্যন্ত চিনিনে। এই যারা হল্লা করছে, জটলা করছে, শিস্ দিয়ে গান গাইছে, বাইরে কলের কাছে জল নেওয়ার জন্যে ভিড় করেছে, এঁরা আমার কাছে ছায়ার ছায়া। আমিও এদের চিনিনে, আমাকেও এদের চিনবাব জন্যে কোন মাথা ব্যথা নেই। একটি মৃতা নামে মাত্র আত্মীয়া প্রৌঢ়া নারীর শয্যার পাশে আমি যথাকালে উপস্থিত হইনি বলে আমাকে লজ্জিত না হলেও চলে। আমার আশেপাশে হাজার হাজাব জীবন্ত মানুষ আমার কাছে মৃত, আমার চিত্ত তাদের সম্বন্ধে সমান অসাড অনুভবশক্তিহীন। বস্তীর শেষ প্রান্তে চওড়া একটি ড্রেন। নোংরা জল কুল কুল শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে। এই কি ইহলোক আর মৃত্যুপুরীর মধ্যবর্তিনী বৈতরণী? পার হবার জন্যে একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে দেওয়া আছে। উত্তরণটা শক্ত হল না।

ঠিকানা এবং পথের নিশানা শুনে এসেছিলাম। কলোনীর ভিতবে ঢুকে সোজা খানিকটা এগিয়ে ডান হাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। তারই দোতলায় দ্বিজেনবাবুর বাসা।

মুদি দোকানটির সামনে কয়েকজন যুবকের জটলা। টেস্ট খেলার মরশুম চলেছে। তারই আলোচনায় মশগুল। রসভঙ্গ করব কিনা ইতস্তত করতে করতেও জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আচ্ছা এখানেই কি একজন ভদ্রমহিলা—।' যুবকটি একটু বিরক্ত হয়ে বিরস মুখে বলল, 'হ্যাঁ এই বাড়িতেই মারা গেছেন। যান ওপরে যান। গেলেই দেখতে পাবেন। ওইতো বাঁ দিকেই সিঁড়ি। যান চলে যান।'

কথা তো নয়, ছেলেটি যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল। ওর দোষ নেই। এর মধ্যে হয়তো আরো অনেককেই পথ দেখাতে হয়েছে।

সরু সিঁড়ির ধাপগুলি বেয়ে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। কোন কান্নার রোল ভেসে আসে কিনা শুনবার জন্যে কান খাড়া করলাম। না, তেমন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। না পেলেই ভালো। শোকের প্রবল বন্যার মধ্যে পড়লে বাইরের লোককে বড় অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়!

ঘরের সামনে নানা আকারেব নানা প্রকারের কয়েকজোড়া জুতো। তা দেখে আমিও জুতো খুললাম। একটু আলাদা জায়গায় রাখলাম। জুতো জোড়া নতুন। হারালে কি বদলালে বড় লোকসান হবে। ঠেকে ঠেকে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

মেঝেয় একটি মাদুব বিছানো। তার ওপর জনকয়েক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনলাম। মৃতা মহিলাটির ভাই আছেন, ভগ্নীপতি আছেন এবং স্বয়ং পতি দ্বিজেনবাবুও রয়েছেন দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে।

আমাকে দেখে পরম বিষাদে একটু হাসলেন, 'আসুন।' বুড়ো হয়েছেন ভদ্রলোক। মাথার চুল সবই পেকেছে। গাল ভরতি খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। একটু মোটাসোটা শরীর। কিন্তু কোন বাঁধুনি যেন আর নেই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আল্গা হয়ে গেছে।

আসুন বলে সবাই বসে রইলেন। আমিও কী যে বলব ভেবে পেলাম না।

সামনে একখানা খাটের ওপর মহিলাটির মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছে। চোখ দুটি বোজা। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করা। দুটি তরুণী খাটের ওপর বসে রয়েছে। একজন পায়ের কাছে আর একজন পাশে। মুখের আদল দেখে মনে হল দুই বোন। দুজনের চোখই একটু ফোলা ফোলা। বোধ হয় খানিক আগে খুব কেঁদেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কান্না নেই। জল নেই কারো চোখে।

আমি কিছু দেরি করে এসে বোধ হয় ভালোই করেছি। শোকের আবর্তের মধ্যে পড়ে যাইনি।

হঠাৎ দোরের পাশে একটি নারীকণ্ঠ শুনলাম, 'পরেশ আর দেরি করছ কেন। দেরি করে লাভ কি।'

গলার স্বরটুকু তো বেশ মিষ্টি। আমি চোখ তুলে তাকালাম। বয়সে ইনিও প্রৌঢ়া। তবে পাতলা ছিপছিপে শরীর। চেহারায় বেশি বয়স বলে মনে হয় না। মুখের গড়নটুকু বেশ সুশ্রী।

তিনিও আমাকে দেখলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। ইনি এঁদেরই কোন আত্মীয়া হবেন। দেখেছি আরো দু-একবার। কিন্তু সম্পর্ক সূত্রটা মনে করতে পারছিনে। পরেশবাবু পরম বৈরাগ্যের সুরে বললেন, 'লাভ লোকসান সব শেষ হয়ে গেছে। বলাই আর সুবলকে তো সব বলে টলে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেউ কি আর ফিববার নাম করছে ? শুধু খাটটা এনে ফেলে রেখে গেছে। নতুন কাপড়, ফুল, এখন পর্যন্ত কিছুই এল না।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমি কি দেখব বেরিয়ে ?'

আর এক ভদ্রলোক একটু ধমকের সুরে বললেন, 'আপনি কোথায় যাবেন ? আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন ? যা করতে হয় আমরাই করব। আপনি চুপ করে বসুন তো।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু তোমাদের বড্ড কষ্ট হবে। এই ঠাণ্ডা, এই শীতের রাত্রে ভারি কষ্ট হবে তোমাদেব। আমি তখন থেকেই বলছি তোমরা তাড়াতাডি করো, তাড়াতাড়ি করো—।'

কেউ তাঁর কথার কোন জবাব দিলেন না।

বৃদ্ধ যেন নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'জানি, তোমরা কেন দেরি করছিলে জানি। ছেলেরা যদি কেউ এসে পড়ে। কিন্তু তারা কেউ আসবে না।'

ওঁর ভায়রা ননীবাবু বললেন, 'আসা তো উচিত ছিল। আপনি টেলিগ্রাম করেছিলেন তো ?'

বৃদ্ধ বললেন, 'তা কি আর করিনি ?'

'কী লিখেছিলেন ?'

'লিখেছিলাম মাদার সিরিয়াসলি ইল্।'

'আর কিছু না ? ওই সঙ্গে কাম হিয়ার কথাটা লিখে দিলেই হত ! এত ভুল করেন।'

দ্বিজেনবাবু একটু হেসে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বললেন, 'ভুলই হয়েছে। শেষের কয়েকদিন তো কোন কথা ছিল না। শুধু চোখের চাউনিটুকু ছিল। যতবার মুখেব কাছে মুখ নিয়ে এগিয়ে গেছি খুশি হয়নি।' দ্বিজেনবাবু মাথা নেড়ে একটু যেন হাসলেন, 'খুশি হয়নি। মেয়েমানুষের মন। ছেলের চেয়ে আপন তার কাছে কেউ নেই। অথচ এই দুটো বছর আমি আলাদা বাসা করে রইলাম, নিজের হাতে সেবা করলাম, শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু করলে কি হবে আমি যে পর সেই পর।'

এ কি অভিমান না অভিযোগ। নাকি শুধুই নারী চরিত্রের বর্ণনা ?

কিন্তু বৃদ্ধের এই স্বগতোক্তির দিকে কারো মনোযোগ দেওয়ার যেন সময় নেই। ননীবাবু পরেশবাবু দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়েছেন। সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাত বাড়ছে। শীতের রাত। এর পর কখন শব বের করা হবে ?

ননীবাবু বললেন, 'সিঁড়ির যা ধরণ ? খাটটা কি যাবে ?' পরেশবাবু বললেন, 'তা যাবে না কেন ? একটু কাৎ করে নিতে হবে আর কি।'

হঠাৎ আমার মনে হল আমার কোন ভূমিকা এখানে আর নেই। আমি একটি কথাও বলতে পারিনি। ওঁরাও আমার সঙ্গে আলাপ করবার মত কথা খুঁজে পান নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে বললাম, 'আমি তাহলে--'

পরেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও, তুমি যাও। তোমার তো আবার নাইট ডিউটি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ওরে বাবা ! নাইট ডিউটি। এই শীতের দিনে রাত জাগা বড্ড কষ্ট। আপনি আর দেরি করবেন না। এদিককার জন্যে ভাববেন না, এদের অনেক লোকজন আছে। পাড়ার ছেলেরাও কেউ কেউ যাবে।'

আমি প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। শুধু আগমন আর নির্গমনে সামাজিক কর্তব্য শেষ হল। কায় নয় মন নয়, এমন কি বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজন হল না।

বাইরে আসতে আসতে ভাবলাম কিছু বলে এলেই হত। আমি ভালো কথা বলতে পারিনে, কিন্তু একেবারে বোবাও তো নই। এমন মূক আর বধির সেজে থাকবার কী দরকার ছিল। কিন্তু কথা বলবার ওঁরা কোন সুযোগই দিলেন না যে। হাবে ভাবে পরিষ্কারই বুঝিয়ে দিলেন আমি একান্তই

বহিরাগত, অনাহূত অনাবশ্যক।

আমি কেউ নই, আমি অহেতুক নিঃসম্পর্কীয়, এই বোধ সুখকর কি স্বস্তিদায়ক নয়। কেন কিছু বললাম না ? আমার কি আশঙ্কা ছিল যা কিছু বলব তাই নিষ্প্রাণ ফাঁকা বুলির মত শোনাবে। আমার কথা বলা ওঁদের কাছে বাহুল্য মনে হবে ? কি একটা ছুঁচ মনের মধ্যে থেকে বিঁধতে লাগল. আমি অন্ত্যজ, আমি অসম্পৃক্ত।

বাড়িতে ফিরে এসে রুক্ষভাষায় স্ত্রীর অপার কৌতূহল মিটিয়ে দিলাম। না, শবযাত্রা এখনো বেরোয় নি। কখন বেরোবে আমি জানিনে, কে এসেছেন না এসেছেন আমি কী করে বলব ?

ঘণ্টাখানেক বাদে খেয়ে দেয়ে আমি অফিসের কাজে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস স্টপে বাস নেই, একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। কালো একটি আলোয়ানে মাথা ঢাকা। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি চোখের দৃষ্টিতে পরিচয় স্বীকার করলেন। আমিও তাঁকে চিনলাম। একটু আগে দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে দেখেছি। সুশ্রী মুখখানা এই মুহূর্তে গম্ভীর বিষণ্ণ। সিঁথিতে সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখা। মনে হল যেন সদ্য পরে এসেছেন।

ভেবেছিলাম তিনি কোন কথা বলবেন না। কিন্তু বললেন। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেরোচ্ছেন ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওঁরা বেরিয়েছেন ?'

তিনি বললেন, 'এই একটু আগে নিয়ে বেরোল। কান্নাকাটিতে মেয়ে দুটো অস্থির। ভেবেছিলাম আজ রাতটা ওখানেই থেকে আসব। কিন্তু থাকবার কি জো আছে ? ওঁর শরীর ভালো না। ছোট মেয়েটার কদিন ধরে জ্বর।'

বাস এসে গেল। ওঁকে আগে উঠতে দিয়ে আমি পরে উঠলাম। একই সীটে পাশাপাশি বসলাম। চোখের ইসারায় তিনিই বসতে বললেন।

কণ্ডাক্টর আসতে দুখানা টিকেট নিলাম। তিনি মৃদু একটু আপত্তি তুলে থেমে গেলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে একা ছেড়ে দিতে ওঁদের ইচ্ছে ছিল না। অবশ্য একা একা চলাফেরা আমার অভ্যাস আছে। অনেক রাত্রেও ফিরেছি। এই বীণাদিদের ওখান থেকেই ফিরেছি। কিন্তু আজ ওঁরা আপত্তি করেছিলেন অন্য কারণে।'

আমি চোখের দৃষ্টিতে তাঁর কাছে কারণটা জানতে চাইলাম।

তিনি একটু যেন হাসলেন, বললেন, 'ওঁরা ভাবছিলেন আমার মনের যা অবস্থা তাতে আমি বুঝি একা একা বাসে উঠতে নামতে পারব না, রাস্তা পার হতে গেলে গাড়ি চাপা পড়ব। সেই সুখ কি আমার কপালে আছে। বীণাদির মত অমন সবাইকে রেখে সবাইর সামনে— ।'

মহিলাটি থামলেন।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'উনি আপনার কী হতেন।'

মহিলাটি বলতে লাগলেন, 'সম্পর্কে মামাতো বোন। ঠিক আপন নয়, কিন্তু আপনের চেয়েও বড়। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পুতুল খেলেছি, পুকুরে চান করেছি, বড় একটা পুকুর ছিল মামাবাড়িতে ; পাল্লা দিয়ে সাঁতার কেটেছি এপার ওপার হয়েছি। আমার সঙ্গে কোনদিন পারত না। আজ সে আগে পার হয়ে চলে গেল।'

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বললেন না। জানলার দিকে মুখ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি তাঁর গালের ওপর একটি জলের ধারা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু কোন কথা বললাম না। অনেক সময় বলার চেয়ে শুধু শোনার ভিতর দিয়ে আমরা বেশি কাছে যেতে পারি।

মাথার আঁচলটা পড়ে যাচ্ছিল, তিনি তুলে ফের ঠিক করে নিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাতের আঙুলগুলি লাল টকটক করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার হাতে কী হল।'

তিনি একটু অপ্রস্তুত হয় বললেন, 'ও কিছু না। বীণাদিকে শেষবারের মত আলতা পরিয়ে

এলাম। সেই ছেলেবেলা থেকে কতবার ও আমাকে পরিয়েছে, আমি ওকে পরিয়েছি। আলতা বড় ভালবাসত। পুজোর সময় কতবার আলতার শিশি পাঠিয়ে দিত। আজ সব শেষ।'

মহিলাটির পাতলা রক্তাক্ত দুটি ঠোঁট ফুলে উঠল। চোখের কোণে দুটি মুক্তা বিন্দু চিকচিক করতে লাগল।

আমি বললাম, 'দেখুন অমন হয়। ছেলেবেলার বন্ধু হলে—।'

আর কিছু মুখে এল না। যেন প্রথম ভাষা শিখেছি।

শ্যামবাজারে এসে বাস থেকে নামলাম। আমাকে অন্য বাস নিতে হবে। তিনিও নামলেন। কাঁটাপুকুর লেনে যাবেন। হেঁটে যাবেন বাকি পথটুকু।

আমি বললাম, 'না না হেঁটে যাবেন কেন ? দাঁড়ান একটা রিক্সা ডেকে দিই। এই সময় আপনার পক্ষে হেঁটে যাওয়া উচিত হবে না।'

আমি রিক্সাওয়ালাকে কোথায় যেতে হবে বলে দিলাম।

ভদ্রমহিলা বিশেষ আপত্তি করলেন না। উঠে বসলেন। একটু নমস্কার বিনিময়। চোখের দৃষ্টিতে একটু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

রিক্সাওয়ালা রাস্তা পার হয়ে চলে গেল।

আমি ন'নম্বর বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্বল্প পরিচিতা সদামৃতার জন্যে এখনো আমার মনে কোন শোকের অনুভূতি নেই। কিন্তু আর একটি শোকার্তা মহিলাকে সামান্য সমবেদনা জানাতে পেরে আমি যেন হারিয়ে যাওয়া বৃহৎ জগৎ সংসারের সঙ্গে নতুন করে ফের সংযুক্ত হয়েছি।

পৌষ ১৩৬৮

ঝড়ের পরে

গাঁয়ের একটি ছেলে পথ দেখিয়ে আনছিল। সে একেবারে ভিতরের উঠানে এসে শক্তিপদকে দাঁড় করিয়ে দিল। হাতের হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখল শক্তিপদ। চারদিকে স্তব্ধ। না, কান্নাকাটির কোন শব্দ নেই। উঠানের পশ্চিমে উত্তরে পুবে ছোট বড় খানকয়েক ঘর। টিনের চাল, বাঁখারির বেড়া, মাটির ভিত। জীর্ণ ঘরগুলি পড়ো পড়ো করছে কিন্তু পড়ছে না। তারাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের ঘরখানিই বড়। তার পিছনে বাঁশের ঝাড়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ তার আগায় উঠেছে। চিকমিক করছে পাতাগুলি।

শক্তিপদ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয়ে একটা খবর দাও তো দেখি। বড় ছেলেটির নাম যেন কী। ঠিক মনে পড়ছে না।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তারাদাস। ও তাক এদিকে আয়। তোদের বাড়িতে অতিথ এসেছে।'

হাসির সময় নয় তবু একটু হাসি পেল শক্তিপদর। ছেলেটি বড় গ্রাম্য। গ্রামের ছেলে গ্রাম্য তো হবেই।

তার হাঁক-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে এল।

'কে ? কে এসেছে রে ?'

শক্তিপদ তাদের দিকে তাকাল। মেয়েগুলির মাথার চুল ঠিকই আছে। ছেলেদের মাথা ন্যাড়া। কিন্তু একী! এরই মধ্যে সব হয়ে গেল। সবে তো চারদিন।

বড় ছেলেটি—বোধ হয় বছর চৌদ্দ হবে তার বয়স। সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'কে আপনি ?'

শক্তিপদ বলল, 'তুমি আমাকে আরো ছোট বয়সে একবার দেখেছ। বোধ হয় মনে নেই। আমি তোমাদের রাঙামামা। তোমার মাকে গিয়ে বল আমি এসেছি।'

তারাদাস সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে শক্তিপদর ধুলোমাখা জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর উঠে যাকে একটু আগে চিনতেও পারেনি তারই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরম অভিমানে নালিশ জানাল,'মামা, বাবা

ঠোঁট দুটি স্ফীত, চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

শক্তিপদ সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখল। ছেলেটি রোগা। হাতের তালুতে হাড় ঠেকে। শক্তিপদ একটুকাল সেই হাড় কখানায় হাত বুলাল। তারপব সান্ত্বনার বদলে একটি অকিঞ্চিৎকর তথ্য তাকে শোনাল—'আমি টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি।'

খবর দেওয়ার জন্যে বাকি ছেলে-মেয়েগুলি ভিতরে গিয়েছিল। কিন্তু সুবর্ণ এল না।

ছেলেরা ফিরে এসে বলল, 'মা কাঁদছে। মা আসবে না।'

বছর পাঁচছয়ের একটি মেয়ে গামছাকে শাড়ির মত করে পরেছে। সে পরম বুদ্ধিমতীর মত বলল, 'মার লজ্জা করে।'

তারাদাস বলল, 'মামা, আপনি ওদের সঙ্গে ভিতরে যান। আমি স্যুটকেস আর বিছানাটা তুলে আনছি।'

সামনে একফালি সরু বারান্দা। সামনেব দিকটা খোলা, পিছনের দিকটা ঘেরা। কেমন যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গেব মত। সেই সুড়ঙ্গের ভিতব থেকে ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল, 'কে বাবা, কে তুমি।'

প্রথমে চমকে উঠল শক্তিপদ, শিরশির কবে উঠল গা। ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে উনি।'

কে একজন বলল, 'ঠাকুরমা। দুদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন। এখন কথা বলছেন।'

ওঃ। মনে পড়ল শক্তিপদর। ভগ্নীপতির আশি বছরের বৃদ্ধা মা তো এখনো বেঁচে আছেন।

শক্তিপদ নিজেব পরিচয় দিল। কিন্তু অন্ধকারেব মধ্যে এগোতে সাহস পেলনা।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার কান্না শোনা গেল, 'সেই আসা এলে বাবা। কি দেখতে এলে বাবা।'

ঘরের ভিতরেও বেশ অন্ধকার। বাইরে যেটুকু রোদ ছিল এতক্ষণে তাও বোধ হয় নিঃশেষে মুছে গেছে। সেই অন্ধকাবের মধ্যে শক্তিপদ অনুভব করল, মেঝেব ওপর শোয়া অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তির ছায়া থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শক্তিপদ স্থির হয়ে একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে ভিজে চোখে ভিজে গলায় ডাকল, 'সুবর্ণ, সোনা।'

'কী দেখতে আর এলেন বাঙাদা! আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।'

কিছু বলবার নেই। তবু কিছু বলতে হয়।

শক্তিপদ বলল, 'এর ওপর তো কারো হাত নেই বোন। সবই ভগবানের হাত।'

সঙ্গে সঙ্গে শক্তিপদর মনে হল অনেক অনেক দিন বাদে সে আজ একটি অনভ্যস্ত শব্দ উচ্চারণ করল। ভগবানে সে বিশ্বাস করে না। অন্তত হাত-পাওয়ালা ভগবানে তো নয়ই। প্রচলিত অনেক কিছুতেই সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু শোকে সান্ত্বনা প্রচলিত ভাষাতেই দিতে হয়। তবেই তো সবাইর বোধগম্য হতে পারে। আর ভাষা মানেই পৌত্তলিকের ভাষা। শব্দ মানেই রূপ। ধারণা ভাবনার রূপ।

বারান্দা থেকে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে তোরা একটা আলোটালো জ্বেলে দে। শক্তি কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। শ্যামা, কোথায় গেলি শ্যামা? ঘরে সন্ধ্যে দিবি না তোরা?'

একটি মেয়ে বলল, 'দিদি জল আনতে ঘাটে গেছে। এক্ষুণি আসবে। তুমি আর চেঁচামেচি করো না ঠামা। তোমার শরীর খারাপ করবে। আমরা আলো জ্বেলে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দুটি হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে এল তারাদাস। একটি ঘরের ভিতরে এনে রাখল। আর একটি বারান্দায় ঠাকুরমার সামনে এনে রাখতে যাচ্ছিল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না না, আমার আর আলোর দরকার নেই। আলোয় আমি আর কী দেখব। আমার যে সব অন্ধকার হয়ে গেছে।' একটু থেমে ফের তিনি আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, 'অসুখ নয় বিসুখ নয় সাক্ষাৎ যম এসে জ্যান্ত ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বাবা।'

শক্তিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কী! তাহলে কী হয়েছিল?'

টেলিগ্রামে শুধু মৃত্যুর খবরই ছিল আর শক্তিপদকে তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে অনুরোধ

জানানো হয়েছিল। রোগ ব্যাধির কোন উল্লেখ ছিল না। এবার মৃত্যুর কারণ আস্তে আস্তে সব শুনল শক্তিপদ। সে মৃত্যু অপঘাত মৃত্যু। তা যেমন বীভৎস তেমনি মর্মন্তুদ।

অফিসের কাজকর্ম সেরে রাত দশটার ট্রেনে স্টেশনে নেমেছিল নন্দলাল। তারপর চিরদিনের অভ্যাসমত রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে পার হয়ে আসছিল। উল্টোদিক থেকে কোথাকার এক মোটর ট্রলি এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। ট্রলিটিও ব্রীজের ওপর কাত হয়ে পড়ে। শুধু নন্দ নয় ট্রলিরও একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। আর একজন এখনও আছে হাসপাতালে। নন্দর দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

শক্তিপদ স্তব্ধ হয়ে রইল। মৃত্যু মাত্রই ভয়ঙ্কর। কিন্তু কোন কোন মৃত্যুর বীভৎসতার বোধ হয় আর তুলনা নেই। একটা কথা ভেবে শক্তিপদ শিউরে উঠল। খানিক আগে সে নিজেও বোকার মত ওই ব্রীজের ওপর দিয়েই এসেছে। বীমগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক ছিল। হেঁটে আসবার সময় বেশ ভয় ভয় করছিল শক্তিপদর। আশেপাশে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ছিল। আশ্চর্য, কিন্তু কেউ তাকে কদিন আগের দুর্ঘটনার কথা বলে সাবধান করে দেয়নি। নিচে—অনেক নিচে নদীর জল টলটল করছিল। ওপরে কি নিচে রক্তের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। মাত্র কদিন আগের ঘটনা। কালস্রোত আর জলস্রোত একই সঙ্গে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। একটু বাদে তারাদাস সামনে এসে দাঁড়াল—বলল, 'মামা বাইরে জল তুলে দিয়েছি। আসুন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চান করবেনতো? ইঁদারার জল আছে ইচ্ছা করলে নদীতেও নাইতে পারেন। বাড়িব পিছনেই নদী।'

স্নান করতে পারলেই ভালো হত। চৈত্র মাসের শেষ। এরই মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। কিন্তু অসময়ে নতুন জায়গায় এসে চান করতে সাহস পেল না শক্তিপদ। দিন কয়েক আগে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে গেছে। স্নান করার চেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ভিজে গামছায় গা মুছে ফেলবে সেই ভালো।

তারাদাস ফের তাড়া দিল, 'আসুন আর দেরি করবেন না। স্টিমারে ট্রেনে সারাদিন কেটেছে। কিছুই বোধ হয় খাওয়াটাওয়া হয় নি। গাড়িতে বেশ ভিড় ছিল না? পথে খুব কষ্ট হয়েছে না মামা?'

যেন মামার সঙ্গে তারাদাসের কতদিনের আলাপ।

ভাগ্নের কাছে স্বীকার করল না শক্তিপদ, কিন্তু কষ্ট হয়েছে ঠিকই। কলকাতা থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের এই গণ্ডগ্রামে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে গেছে। দুবার গাড়ি-বদল করতে হয়েছে। ফের স্টিমারে পার হতে লেগেছে দেড় ঘণ্টা। হয়রানির এক শেষ।

উঠানে নামতে না নামতেই দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে এসে প্রণাম করল শক্তিপদকে। গা ধুয়ে শাড়িটাড়ি বদলে এসেছে। বয়স আঠের উনিশ হবে। শামলা রঙ।

শক্তিপদ বলল, 'তোমার নামই তো শ্যামা? আমাকে দেখেছ ছেলেবেলায়। মনে আছে?'

শ্যামা ঘাড় কাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি যারা ছিল তারাও ঢিপ ঢিপ করে শক্তিপদর জুতোর ওপর মাথা রাখল।

সেই গামছাপরা মেয়েটি এবার বেশ পাল্টে এসেছে। তার পরনে এবার একটি পুরোন ফ্রক।

সে বলল, 'আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না?'

তারাদাস ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ যাঃ ভারি নামওয়ালী এসেছিস। বিরক্ত করিসনে মামাকে। বিশ্রাম করতে দে।'

শক্তিপদ মেয়েটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বলল, 'কী নাম তোমার বল।'

'উমা।'

মেয়েটির মুখে হাসি। এতক্ষণে স্বনাম-ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছে সে।

তারাদাস বলল, 'বোনদের নাম শ্যামা, উমা বাধা। ঠাকুরমার দেওয়া সব ঠাকুর-দেবতার নাম। আর আমাদের নামগুলিও তেমনি। তারাদাস হরিদাস গুরুদাস। সব সেকেলে।'

শক্তিপদ বলল, 'তাতে কী হয়েছে। তোমরা তো একালের। নামে কী এসে যায়।'

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে আদরের সুরেই কথা বলল শক্তিপদ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে

হল নন্দলাল বড় বেশি ডিপেণ্ডেণ্টস রেখে গেছে। একটি ছাড়া সবাই তো অপোগণ্ড। কী যে গতি হবে এদের।

উঠোনের একধারে বালতিতে জল, গামছা, একটি ঘটি। সামনে ছোট একখানি জল-চৌকিও পাতা আছে। শ্যামা হ্যারিকেনটি এনে কাছে রাখল।

চৌকির ওপর বসে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নিল। পা ধুলো। জুতোর ভিতর দিয়েও একগাদা ধুলো ঢুকেছে। বড্ড ধুলো এদিককার রাস্তায়। স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছে শক্তিপদ। রাস্তা ভালো নয়।

ঘরের মধ্যে সুবর্ণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। তার যেন উঠবার শক্তি নেই, কথা বলবার শক্তি নেই। হ্যারিকেনের আলোয় এবার ভালো করে তাকে দেখল শক্তিপদ। দেখবার কিছু নেই। থানকাপড়ে মোড়া কখানা হাড়ের পুঁটলি। ঈস কী বুড়ীই না হয়ে পড়েছে সুবর্ণ। সামনের কয়েকটি দাঁত পড়ে গেছে, গাল ভেঙে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এত বুড়ো হবার তো ওর কথা ছিল না। শক্তিপদর, চেয়ে ও অন্তত পাঁচ ছ বছরের ছোট। শক্তিপদর এই তেতাল্লিশ চলছে। ওর তাহলে— । এই আকস্মিক মৃত্যুশোকই কি ওকে এমন করে জীর্ণ করেছে? নাকি আরো বহুদিন আগে থেকেই ও জীর্ণ হয়ে আসছিল? দারিদ্র্য, ব্যাধি আর অতিরিক্ত সন্তানবাহুল্য। ছটি আছে আরো গুটি চার-পাঁচ হয়ে অকালে চলে গেছে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক যুগে— । অশিক্ষা—অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বলি। অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলল শক্তিপদ। অথচ তার এই খুড়তুতো বোনটি বেশ সুন্দরী ছিল; বেশ সুন্দরী। ওর গায়ের রঙের জন্যেই তো নাম রাখা হয় সুবর্ণ। এখন সেই সোনা একেবারে সিসে হয়ে গেছে।

'ওরে তোরা কী ঘুটঘুট করছিস সব। শক্তিকে কিছু খেতেটেতে দে। বেচারা সেই কাল থেকে মুখ শুকিয়ে আছে।'

সুবর্ণর বুড়ী শাশুড়ী তাঁর সুড়ঙ্গশয্যা থেকে চেঁচাচ্ছেন।

তারাদাসই এখন বাড়ির বড় কর্তা। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না ঠামা। সবই হচ্ছে।'

একটু বাদে শ্যামা এসে বলল, 'মামা আপনি এ ঘরে আসুন।'

পাশেই ছোট আর একখানা ঘর। মেঝেয় আসনপাতা। কাঁসার গ্লাসে জল। কানা উঁচু ছোট একটি থালায় মুড়ি, চিনি, নারকেল-কোরা।

তারদাসের ভাই হরিদাস বলল, 'আমরা এখানে বসছি। দিদি, তুমি চা করে নিয়ে এস।'

শক্তিপদ বলল, 'কমিয়ে নাও। এত কী আর খেতে পারব।'

কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। শক্তিপদ জোর করে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের হাতে কিছু কিছু গছিয়ে দিল।

খেতে খেতে শক্তিপদ জিজ্ঞেস করল, 'এত আগেই তোমাদের সব কাজটাজ হয়ে গেল?'

তারাদাস বলল, 'অপঘাত মৃত্যু যে। তাই তিনদিনের দিনই সব হল। ও বাড়ির কাকা পুরুত নিয়ে এলেন। তিনি আবার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন।'

শক্তিপদ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্ত আবার কিসের? কত খরচ হয়েছে?'

তারাদাস বলল, 'কাকা সব জানেন। এখনও হিসাবপত্তর কিছু ঠিক হয়নি।'

খাবার খেয়ে শক্তিপদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, মোটা সোটা প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'নমস্কার। চিনতে পারেন? অনেক আগে দেখাসাক্ষাৎ হত। আমার নাম পরিতোষ দাস।'

শক্তিপদ প্রতি নমস্কার করে বলল, 'বা চিনতে পারব না কেন? চেহারা টেহারা অবশ্য একটু বদলে গেছে। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই তো এলাম।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমিই টেলিগ্রাম করেছিলাম। চিঠিপত্তরও যেখানে যা লিখবার অমিই লিখেছি। শুনেছেন তো সব, দাদা আমার কীভাবে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।'

গলাটা একটু যেন ধরে গেল পরিতোষবাবুর।

তারপর ভদ্রলোক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে লাগলেন। ছোট লাইন। দিনে একখানা গাড়ি আর রাত্রে একখানা গাড়ি যায়। গাড়ির সময় বাদ দিয়ে রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে সবাই চলাফেরা করে। কারো কিছু হয় না। কিন্তু সর্বনাশ যখন হবার। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'রাতদুপুরে খবর পেয়ে যখন গেলাম তখন আর কিছু ছিল না। চেনা শক্ত। লোকজন নিয়ে নিচ থেকে ওপরে তুললাম। রক্তে মাখামাখি। হাড়পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো।

মাথার খুলিটা সুদ্ধ—।'

শক্তিপদ বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। ওসব শুনে আর কী হবে।'

তবু আরো কিছু বিশদ বিবরণ শুনতে হল। নন্দলালের মৃতদেহ বাড়ি পর্যন্ত আনেন নি পরিতোষবাবু। পাছে পুলিশের হাঙ্গামা হয় তাই তখন তখনই সৎকাবের ব্যবস্থা করেছেন। একেই তো যে শাস্তি হবার তা হয়েছে। তারপর যদি অস্থি কখানা নিয়ে পুলিশে টানাটানি করত, ডাক্তারে ছুরি ধরত তাহলে কি তা সহ্য করা যেত ? বরং কিছু খরচপত্র করেও কাজটা তাডাতাড়ি তিনি সেরে ফেলেছেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পরিতোষবাবুব বাড়িতেই হল। তিনিই গরজ কবে এই বন্দোবস্ত করলেন। বড় একখানা ঘরের মধ্যে পাশাপাশি খেতে বসে পরিতোষবাবু বললেন, 'ও বাড়িতে তো মশাই ডিম মাছ কিছু পেতেন না। আপনার খেতে কষ্ট হত। তিনদিনে শ্রাদ্ধ গেছে কিন্তু অশুচ তো তিরিশ দিনই। মাছ মাংস এক মাস আমিও খাব না। তবে ছেলেপুলেরা খায় খাক।'

মাছ মাংস অবশ্য শক্তিপদ নিজেও পছন্দ করে। কোন বেলায় নিরামিষ খেতে বাধ্য হলে তার পেট ভরে না। কিন্তু আজ এ বাড়িতে বসে লুকিয়ে আমিষ খেতে তার কেমন যেন রুচি হচ্ছিল না। নন্দও মাছটাছ খুব ভালোবাসত। খেতেও ভালোবাসত খাওয়াতেও ভালোবাসত। অনেক আগে পর পর কয়েক বছর এই দিনাজপুর থেকে বড বড় সিঙ্গি আর মাগুর মাছ সে শক্তিপদর কলকাতার বাসায় পাঠাত। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ কবত তখন। মাছটাছ জোগাড় করা তখন সুবিধে ছিল।

পরিতোষের বুড়ো মা এসে সামনে বসলেন। সম্পর্কে জেঠীমা হন নন্দর। তিনি সস্নেহে বললেন, 'খাও বাবা খাও। ওই মাছটুকু আবার পড়ে বইল কেন। খেয়ে ফেল। নিয়তি বাবা সবই নিয়তি। অদেষ্ট। নইলে ওই বিরিজের ওপর দিয়ে রাজ্যসুদ্ধ লোক আজন্ম চলাফেরা করে। ওই নন্দও তো কতদিন ঝড়বিষ্টির মধ্যে রাতদুপুরে বাড়ি এসেছে। খেয়া নৌকোয় পয়সা দিতে হয়। তাছাড়া কে আবার অত হাঙ্গামা কবে। গাঁয়ের লোক ওই বিরিজের ওপর দিয়েই পারাপার হয়। কই কারো তো কিছু কোন দিন হল না। কিন্তু যার ভবপারের ডাক এসে যায় তাকে কি আর ধরে রাখবার জো আছে ? হতে দেখেছি বাবা, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমরা পড়ে রইলাম আর ও চলে গেল—।'

বৃদ্ধার গলা আটকে এল। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি। পরিতোষবাবু বললেন, 'যাও তো তুমি, এখান থেকে উঠে যাও। ভদ্রলোক খেতে বসেছেন আর তুমি—।'

খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে শক্তিপদকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পরিতোষবাবু। একেবারেই এ বাড়ি ও বাড়ি। সীমানা-চিহ্ন হিসাবে গোটা কয়েক সুপারিগাছ আছে মাঝখানে।

দু-একটা কথার পরেই পরিতোষবাবু বিদায় নিলেন, 'আপনাকে বড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কথা-বার্তা যা আছে কাল হবে।'

শুতে যাবার আগে কী একটা কথা মনে পড়ল শক্তিপদর। পকেট থেকে একশ টাকার একখানা নোট বের করে সুবর্ণের কাছে গিয়ে তার হাতে গুঁজে দিল।

সুবর্ণ বলল, 'এ কী।'

শক্তিপদ বলল, 'রাখ, রেখে দে।'

সুবর্ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'টাকা দিয়ে আমি কী করব রাঙাদা।'

শক্তিপদ মনে মনে ভাবল, 'টাকা অবশ্য মৃত্যু শোকের সান্ত্বনা নয়। কিন্তু যারা শোক করবার জন্যে বেঁচে থাকে তাদের তো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসেই ও বস্তুর দরকার হয়।'

আসবার সময় এই টাকা আর যাতায়াতের রেল-ভাড়াটা জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে শক্তিপদকে। সে কথা মনে পড়ল।

তারাদাস এল হ্যারিকেন হাতে, স্মিতমুখে বলল, 'চলুন মামা, আপনাকে শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ ওর পিছনে পিছনে চলল।

উঠান ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একখানা ছোট ঘর। ভাগ্নেভাগ্নীরা তার হোল্ডঅলটা আর খোলে নি। নিজেদের বিছানাই পেতে দিয়েছে। শীতল পাটির ওপর একজোড়া মাথার বালিস। ফর্সা ঢাকনিতে ফুলতোলা। শিয়রের কাছে একটি জানালা। আরো দু'তিনটে জানলা আছে ঘরে।

খানিক দূরে ছোট একজোড়া টেবিল চেয়ার। কিছু বইপত্র। নারকেলের দড়িতে বেড়ার সঙ্গে তক্তা বেঁধে তাক করা হয়েছে। তার ওপর অনেকগুলি পুরোন পঞ্জিকা। আর দুখানা মোটা মোটা বই। বোধহয় রামায়ণ-মহাভারত।

সেই বড় মেয়েটি চেয়ারে বসে কী একখানা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল, এবার লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

শক্তিপদ বলল, 'এই যে শ্যামা। তোমাদের এই বাইরের ঘরখানা ত বেশ নিরিবিলি।'

শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ, বাবা শেষের দিকে এই ঘরেই থাকতেন। রাত্রে ঘুমোতেন। ছুটি কাটাবার জন্যে এখানে চলে আসতেন। ধর্মগ্রন্থট্রন্থ নিয়েও বসতেন। কিন্তু বাবার কি আর পড়াশুনোর জো ছিল। ছোট ভাইবোনগুলি এসে এত উৎপাত করত! কেউ ঘাড়ের ওপর চড়ত, কেউ পিঠের ওপর উঠত। কেউ একটা পয়সার লোভে পাকা চুল তুলে দিত, কেউ বা পা টিপে দিয়ে পয়সা চাইত। ওদের জ্বালায় আমি বাবার কাছে ঘেঁষতে পারতাম না। বাবাও সবাইকে খুব ভালোবাসতেন। যেদিন ওরা নিজেরা না আসত তিনিই ওদের ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতেন।'

তারাদাস বলল, 'দিদি, মামার যা যা লাগবে সব দিয়েছিস তো?'

শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ। জল আছে কুজোয়, গ্লাস রইল। পাখা, টর্চ সব আছে। মশারিটা চাঁদা করে রেখে গেলাম। শোয়ার সময় ফেলে নেবেন। না কি এখনই ফেলে দিয়ে যাব?'

শক্তিপদ বলল, 'না না থাক। আমিই ফেলে নিতে পারব। তোমরা যাও এবার। রাত হল।'

রাত অবশ্য দশটার বেশি হবে না। কিন্তু সারা গ্রাম এরই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেন রাত দুপুর।

তরাদাস তবু যায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, 'একা একা থাকতে আপনার আবার ভয়টয় করবে না তো?'

শক্তিপদ হেসে বলল, 'ভয় কিসের?'

তারাদাস বলল, 'বাবা এই ঘরেই থাকতেন কিনা। দিনের বেলায় তেমন কিছু হয় না। রাত্রে একা একা আসতে আমার কিন্তু গা ছমছম করে।'

শ্যামা হাসি চেপে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই আর মামা কি সমান? কোন কিছু দরকার হলে ডাকবেন শুনতে পাব। আমার ঘুম খুব পাতলা। আর ঠাকুমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না। আজ আরো হবে না। সারা রাত ছটফট করবেন।'

শক্তিপদ বলল, 'কেন?'

শ্যামা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আজ ঠাকুরমার আফিং আসে নি। তারুর ভুল হয়ে গেছে আনতে।'

শক্তিপদ অবাক হয়ে বলল, 'আফিং দিয়ে আবার কী করেন উনি?'

তারাদাস দিদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কী আবার করবেন, খান। প্রথমে খেতেন বাতের ওষুধ হিসেবে। তারপর পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এখন আর বড় একটা ডেলা না হলে চলে না। বাবা রোজ রাগ করতেন, আবার রোজ আনতেন। মুখে বলতেন, আমি আর পারব না। বাবা তো গেলেন, এখন তাঁর মার আফিং-এর খরচ কে জোগাবে?'

শ্যামা ধমক দিয়ে বলল, 'থাক, তোর আর বুড়োপনা করতে হবে না। চল এবার, মামাকে

ঘুমোতে দে।' শক্তিপদ ভাবল আশ্চর্য এই শরীরের নিয়ম। পুত্র শোকাতুরারও নেশার বস্তুটি সময় মত না পেলে চলে না।

ওরা চলে গেলে শক্তিপদ দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মশারিটা ফেলে নিল। একটু একটু হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। সেই সঙ্গে বেলফুলের উগ্রগন্ধ। ফুল আর ফলের বাগান করবার বেশ শখ ছিল নন্দলালের।

ক্লান্ত দেহে যত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে ভেবেছিল তা এল না। শক্তিপদ একটা সিগারেট ধরাল। সত্যিই একজন মরা-মানুষের খাটের ওপর শুয়ে আছে সে। সেই মানুষটি আর নেই। কিন্তু তার ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্রই পড়ে আছে। এই খাট-মশারি, টেবিল-চেয়ার, ঘরের কোণে ওই পুরোন গড়গড়াটা—সবই রয়েছে। প্রাণের চেয়ে জড়বস্তু অনেক দীর্ঘজীবী আর টেঁকসই।'

এত কোমল পেলব প্রাণের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তিরোভাবও তেমনি। শক্তিপদ ভাবল বড় অদ্ভুত বস্তু এই মৃত্যু। মানুষ এক হিসাবে তাকে নিয়ে ঘর করে তবু তার কথা তার মনে পড়ে না। না পড়াই ভালো। মৃত্যুকে না ভুললে জীবনকে ভুলতে হয়। শক্তিপদও ভাবে না মৃত্যুর কথা। ভাববে কি। কলকাতায় কি আর তার মরবার সময় আছে। দুটো অফিস। একটা হোলটাইম, আর একটা পার্টটাইম। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ছেলেমেয়ে দুটি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মা অবশ্য ঘুমোয় না। জেগে জেগে বই পড়ে, কি সেলাই করে। শক্তিপদ টেবিল চেয়ারে স্ত্রীর মুখোমুখি বসে খায়। খেতে খেতে গল্পটল্প হয়। কোনদিন বা সংসারের অভাব অনটনের ফিরিস্তি ওঠে। তারপর মহানিদ্রার কথা নিশ্চয়ই শক্তিপদের মনে হয় না। তখন যৌথ নিদ্রারই আয়োজন চলে।

কিন্তু মনে না পড়লেও, মনে না করলেও মৃত্যু আছে। তার মুখোমুখি মানুষকে দাঁড়াতেই হয়। নিজের মৃত্যুর আগে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হয়। কী এই মৃত্যু! মৃত্যু মানে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। হ্যাঁ, এ ছাড়া মৃত্যুর আর কোন অর্থ আছে বলে শক্তিপদ যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে পারে না। আগে আগে ছেলেবেলায় পারত। তখন যুক্তিটুক্তি কিছু ছিল না। তখন বাপ-দাদার মুখে যা শুনত তাই বিশ্বাস করত। জন্মজন্মান্তর দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব আরো কত রূপকথায়। বিশ্বাস ছিল। নিজেও আকাশের দিকে তাকিয়ে কত দেবরাজ্য স্বর্গরাজ্য দেখত, কত কী কল্পনা করত। তারপর বিজ্ঞান এসে সেই কল্পনার পাখা কেটে নিয়েছে। আশ্চর্য যে বিজ্ঞানের দোহাই সে দেয় সেই বিজ্ঞান কিন্তু সে একপাতাও পড়েনি। সে আর্টসের ছাত্র। যা পড়েছে সব কবিতা গল্প উপন্যাস। ভেবেছিল ঘরে বসে বিজ্ঞানের পুঁথির দু-একটা লৌকিক সংস্করণ উলটে পালটে দেখবে। তাও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে একালের বিজ্ঞান দর্শনের হাওয়া ভেসে এসেছে। এই সামাজিক হাওয়াটাই সব। তাতেই মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

পরিতোষবাবুর মা বলছিলেন, অদৃষ্ট নিয়তি। শক্তিপদ কোন কথা বলেনি। শক্তিপদ যত দূর পারে এই সব অনাধুনিক অবৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে এড়িয়ে যায়। না এড়ালেই গড়াতে হবে। কিছুতেই গোলক ধাঁধার মধ্যে পথ মিলবে না। তার চেয়ে এই দৃশ্যমান বস্তুজগতকেই সর্বস্ব বলে ধরে নিয়ে ন্যায়নীতি প্রীতি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে ঘর করা ঢের ভালো। যার যে রকম বিশ্বাসই থাকুক না দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ তাই করে। এই বস্তুজগৎকেই সর্বস্ব মনে করে। এক অর্থে সবাই বস্তুতান্ত্রিক।

তবু মাঝে মাঝে এই ধরনের একেকটা ঘটনা চমকে দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। সত্যি নন্দলালের এমন করে মরবার কী অর্থ হয়? অদৃষ্ট নিয়তি পূর্বজন্মের কর্মফলের শরণ না নিয়েও এর বাস্তব ব্যাখ্যা অবশ্য দেওয়া যায়। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির শিকল গাঁথা যায়। কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য হয় না। কিন্তু যা ঘটে গেল ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে ফের অঘটিত করা যায় না। চরম অমঙ্গল যা ঘটবার তাতো ঘটলই। অমঙ্গলের অস্তিত্ব মানতেই হয়। তা যেমন বাইরের জগতে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ঘটনার মধ্যে আছে তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে আছে ষড়রিপুর আকারে। সেই রিপু কখনো প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ, কখনো প্রবল। কে যেন বলেছিলেন

মঙ্গল আছে বলেই অমঙ্গল আছে। এ ব্যাখ্যা শক্তিপদর মনঃপূত হয়নি। কেন, শুধু মঙ্গল থাকলে কী ক্ষতি ছিল ? আসলে জড় প্রকৃতিতে মঙ্গলও নেই অমঙ্গলও নেই। সে তার নিজের নিয়মে কি অনিয়মে চলে। মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবজগৎ তার ইষ্ট আর অনিষ্টের ব্যাখ্যা সেই প্রকৃতির ভিতর থেকে খুঁজে নেয়।

তত্ত্ব থেকে ঘুরে ঘুরে ফের নন্দর কথা মনে এল শক্তিপদর।

সত্যি কীভাবেই না নন্দ মারা গেল। ও নাকি মাছের তরকারিটা রাত্রে এসে খাবে বলে রেখে গিয়েছিল। সে আশা তার আর মেটেনি। জীবন যে অনিশ্চিত তাতে সন্দেহ কী। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক জীবন এখনো পদ্মপত্রে নীর। আর চিরকাল হয়তো তাই থাকবে। কিন্তু তাই বলে মানুষ কি তার নিশ্চিত বুদ্ধির গর্ব ছাড়বে ? দীপের পর দীপ জ্বেলে সব অন্ধকার দূর করবার, সব রহস্য ভেদ করবার স্পর্ধা কি তার কখনো শেষ হবে ?

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকের শব্দে। হয়তো ছেলেমেয়েদের কোলাহলও তার সঙ্গে মিশে ছিল। ভারি ভালো লাগতে লাগল শক্তিপদর। শান্তস্নিগ্ধ ভোরের হাওয়া বেশ উপভোগ্য। কান জুড়নো স্তব্ধতা, চোখ জুড়ানো সবুজ দৃশ্য। চারিদিকে গাছপালা আমজাম কাঁঠালের বাগান। জানালা দিয়ে একটা বড় পুকুর দেখা যায়। বাঁধানো ঘাটে কারা এরই মধ্যে নাইতে নেমেছে। ওপারে পোস্ট অফিস। ছোট একটা পাকাবাড়ি তৈরি হচ্ছে পাশে। সামনে একখানা বেঞ্চ পাতা। তার ওপর জনতিনেক ভদ্রলোক বসে কী আলাপ করছেন। ছবির মত দৃশ্য। বেশ লাগতে লাগল শক্তিপদর। আশ্চর্য, শোকক্ষুব্ধ হয়ে সে যেন একটি শোকার্ত পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে নি। এরই মধ্যে নন্দলালের অপমৃত্যুর কথা সে ভুলতে বসেছে। লজ্জিত হল শক্তিপদ। জীবন এইরকমই নিষ্ঠুর। মৃত্যুকে সে শিশুর মত ক্ষণে ক্ষণে ভোলে। নতুন খেলনা পেয়ে হাসে। জানে না মৃত্যুর হাতে সেও শিশুর খেলনা ছাড়া কিছু নয়।

দোর খুলে বেরোতেই দেখল তারাদাস আর তার ভাই হরিদাস দাঁড়িয়ে। হরি তার দাদার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। সামনের একটা দাঁত পোকায় খাওয়া। কোত্থেকে নিমডালের একটা দাঁতন নিয়ে এসেছে। স্যুটকেসের মধ্যে অবশ্য শক্তিপদর পেস্ট আর টুথব্রাশ আছে। অঞ্জলি সব গুছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্নেকে খুশি করবার জন্যে শক্তিপদ দাঁতনটাই হরিদাসের কাছে থেকে চেয়ে নিল।

তারাদাস বলল, 'দিদি জিজ্ঞেস করছিল আপনি কি মুখটুক ধোয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেবেন ?'

শক্তিপদ বলল, 'না, পরেই খাব।'

আর একটু পরে ওদের বড়ঘরের বারান্দায় জলচৌকির ওপর বসে চা খেতে খেতে ভাগ্নেভাগ্নীদের পড়াশুনো সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল শক্তিপদ। শ্যামা আর পড়ে না।

সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। কি দিতে বাধ্য হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলে মেয়েদের আর বেশি পড়বার ব্যবস্থা নেই। ভেবেছিল বাড়িতে পড়ে স্কুল ফাইনালটা দেবে। আর হয়ে ওঠে নি। তারাদাস যায় শহরের স্কুলে। মান্থলি টিকেটে যাতায়াত করে। এত বড় পরিবারের একমাত্র সম্বল ছিল নন্দলালের সোয়া শ টাকা মাইনের চাকরি। তবু ওরই মধ্যে দু'একখানা করে জমি সে রেখেছে। ফসল যে বছর ভালো হয় টেনেটুনে ছ'সাত মাস যায়। আর কোন সম্পদ নেই। লাইফ ইনসিওরেন্স হাজার দেড়েক টাকার করেছিল। অনেক আগেই ল্যাপসও হয়ে গেছে। আর যা আছে সব দেনা। জমির খাজনা বাকি, দোকানপাটে বাকি। একজন গৃহস্থকে কতরকম ফিকির ফন্দী করেই তো সংসার চালাতে হয়। ধার কর্জ কার না আছে।

নন্দর মা বললেন, 'সব কি আর নগদে চলত বাবা ? সেই রকম রোজগার কি আর ছিল ? তবু যতক্ষণ পেরেছে জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধুবান্ধব কারো কাছে হাত পাতে নি। নিজের জামা ছিঁড়ে গেছে, পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পায়ের জুতায় তালি পড়েছে। তবু হাত পাতেনি। আমি একেক সময় রাগ করেছি। তুই কি একটা পিশাচ ? এই ভাবে মানুষ অফিস আদালত করে ? ছেলে আমার হেসে বলেছে—আমাকে যারা চেনে তারা এতেই চিনবে মা।'

একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিছুকাল ধরে মেয়ের বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কোথাও কিছু পুঁজিপাটা তো ছিল না। কী করে বিয়ে দিত সেই জানে। মাঝে মাঝে একেক দল এসে মেয়ে দেখে যেত! চণ্ডীপুরের দত্তরা পছন্দও করে গিয়েছিল। ছেলেটি লেখাপড়া জানে। রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করে। দেনাপাওনা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন কি আর কিছু হবে? সব কথা শেষ হয়ে গেছে বাবা।'

বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্যামা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। শক্তিপদ চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে সে কোন ভরসা দিতে পারল না। তার অনেক দায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। বুড়ো মা আছেন, ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ আছে। টিউটরের মাইনে গুনতে হয় পঞ্চাশ টাকা। চড়া বাড়ি ভাড়া। তাছাড়া লোক লৌকিকতা শিষ্টতা ভদ্রতা, নাগরিকতার মাশুল কি কম জোগাতে হয় নাকি?

একথা ওকথার পর শক্তিপদ বলল, 'আমায় আজ দুপুরের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।'

সবাই স্তম্ভিত। এও যেন আকস্মিক দুর্ঘটনা।

নন্দর মা বললেন, 'সে কি আজই চলে যাবে বাবা। কোন কথাই তো হল না। কিছুই তো তোমাকে বলতে পারলাম না।'

শক্তিপদ বলল, 'যেতেই হবে মাঐমা। পরের চাকরি। দুদিনের বেশি ছুটি নিয়ে আসতে পারিনি। ফার্মের সব জরুরি কাজ কর্ম পড়ে আছে। পরে আর এক সময় আসব।'

তিনি বললেন, 'এসো বাবা। কাজের ক্ষতি করে—কী আর বলব। সেও বাবা অফিস কোনদিন কামাই করেনি। রোগ ব্যাধি নিয়েও ছুটেছে। বলত, মা আর কোন বিদ্যে তো নেই। লোকে যদি বুঝতে পারে আমার যা সাধ্য তা আমি করেছি, কাজে আমি ফাঁকি দিইনি—লোকে যদি সে কথা বিশ্বাস করে সেই আমার পুঁজি!'

শেভ করবার জিনিসপত্র স্যুটকেস থেকে বার করে নেবে বলে সেই ছোট ঘরখানায় ফের ঢুকল শক্তিপদ। পায়ে পায়ে এল শ্যামা। বলল, 'মামা, দিন আমি সব বার করে দিচ্ছি। আপনি এখানে বসেই শেভ করুন না। আমি জল এনে দিচ্ছি।'

বাটিতে করে জল নিয়ে এল শ্যামা। শক্তিপদর মনে পড়ল বিয়ের আগে অল্প বয়সে সুবর্ণও এমনি ফাইফরমায়েস খাটত, টেবিল গুছিয়ে দিত, বিছানা ঝেড়ে দিত, ভারী বাধ্য ছিল সুবর্ণ শক্তিপদর। আজ সে অসুস্থ অশক্ত। রোগে শোকে বিছানা নিয়েছে। তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে তার মেয়ে। রূপটা তেমন পায় নি, রংটা তেমন পায় নি। তবে মায়ের মুখের আদলের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

শ্যামা ডাকল, 'মামা!'

শক্তিপদ বলল, 'কিছু বলবে? বল না।'

শ্যামা মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি কিন্তু ঠাম্মার ওসব কথায় কান দেবেন না।'

'কোন সব কোথায়?'

শ্যামা মুখ নিচু করে রইল। একটু কি লজ্জার ছোপ পড়েছে ওর মুখে?

শক্তিপদ এবার বুঝল। ব্রাশ দিয়ে গালে সাবানের ফেনা তুলতে তুলতে হেসে বলল, 'ও।'

শ্যামা বলতে লাগল, 'আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন মামা। কলকাতা কত বড় শহর, সেখানে কত রকমের কাজ—।'

শক্তিপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। সে সব পরে হবে। তুমি ভেব না।' ভাবল শহর বড় হলেও কাজ বড় সুলভ নয়।

মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে পরিতোষবাবু এলেন, 'কী মশাই ঘুমটুম হল? আপনি নাকি আজই চলে যাচ্ছেন, সে কি কথা। আপনারা কলকাতার লোক বাইরে এলেই ছটফট করেন। আমাদের আবার কলকাতায় গেলে মন টেঁকে না। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে কনস্টিপেশন।'

শক্তিপদ হেসে বলল, 'যা বলেছেন। কলকাতার সঙ্গে কনস্টিপেশনের কুটুম্বিতা আছে।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'চলুন ওই পোস্ট অফিসের দিকটায়। ওটা আমাদের গাঁয়ের সদর।

ওখানে নীরদবাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব চলুন। নন্দদাকে খুব ভালোবাসতেন

পরিতোষের সঙ্গে পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল শক্তিপদ। তিনি দেখাতে দেখাতে চললেন, 'ওইটা পোস্ট অফিস। ওর পাশে লাইব্রেরী বিল্ডিং হচ্ছে। গবর্নমেন্ট থেকে গ্রান্ট পেয়েছি আমরা। উত্তর দিকে ওই যে টিনের ঘরগুলি দেখছেন ওটা স্কুল। অনেকদিনের পুরোন।'

বেঞ্চে কয়েকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সব চেয়ে বয়স যাঁর, টাকটাও বড়, খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিতোষবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন :

'নীরদরঞ্জন চৌধুরী। এখানকার জমিদার। আর ইনি শক্তিপদ সরকার। নন্দদার সম্বন্ধী।'

নীরদবাবু বললেন, 'আরে ছেড়ে দাও ওসব। সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।'

শক্তিপদ লক্ষ্য করল খানিক দূরে গাছ-পালার আড়ালে একটি জীর্ণ প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। ফাটল দিয়ে বটের চারা উঠেছে।

পরিতোষবাবু বললেন, 'পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথমে আমরা এঁদের আশ্রয়েই এখানে আসি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। সে সব তো পূর্বজন্মের কথা।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'নন্দদাকে উনি খুব ভালোবাসতেন।'

নীরদবাবু বললেন,'হ্যাঁ, একটি লোক ছিল বটে। গ্রামে তার শত্রু ছিল না।'

বেঞ্চে আরো যে তিনজন বসেছিলেন তাঁরাও সেই রায় দিলেন। নন্দর সঙ্গে কারো ঝগড়া বিবাদ ছিল না। ছেলেবুড়ো সবাইর সঙ্গে সে হেসে কথা বলত। কোনরকম দলাদলির মধ্যে যেত না। বরং দলাদলি মেটাতেই চেষ্টা করত। অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু বাড়িতে গেলে এক কাপ চা না হলে একটা পান কি এক ছিলিম তামাক কি নিদেনপক্ষে একটি বিড়ি না নিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত না।

শক্তিপদ ভাবল, 'এর চেয়ে নন্দ আর বেশি কি পেতে পারত। এই তো যথেষ্ট। মরণশীল মানুষের এইটুকুই অমরত্ব। মৃত্যুর পর দু'এক প্রহর ধরে পাড়াপড়শীর মুখে মুখে শুধু এই সুনামটুকুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিই আমাদের মত সাধারণ মানুষের আকাশ ছোঁয়া মনুমেন্ট। মরবার পর যে ক'জন বন্ধু এই দেহটাকে কাঁধে তুলে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাবে তারা যেন বলতে পারে লোকটা কারো ক্ষতি করে নি, লোকটা চোর ছিল না, ডাকাত ছিল না, বদমাস ছিল না। লোকটা একেবারে মন্দ ছিল না।'

শক্তিপদ বলল, 'ছেলেমেয়েগুলিকে দেখবেন। ওদের তো আর কেউ নেই। আপনারাই সহায় সম্বল।'

নীরদবাবু বললেন, 'মানষের কতটুকু শক্তি শক্তিবাবু। যিনি দেখবার তিনিই দেখবেন। ভগবান দেখবেন।'

তিনি উঁচুতে আঙুল তুললেন।

শক্তিপদ ভাবল, আবার ভগবান। এই শব্দটির সাহায্যেই কাল সে বোনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ইনিও আজ এই শব্দের সাহায্য নিলেন। এই শব্দের অর্থ তাদের দুজনের কাছে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ও ব্যঞ্জনা আলাদা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। হঠাৎ এক অদ্ভুত সহনশীলতায় শক্তিপদর মন ভরে উঠল। কোন কোন সময় কোন কোন ক্ষেত্রে এসে মানা না মানা সব সমান হয়ে যায়। দেখতে হবে মানুষ মানুষকে মানল কিনা, মানুষকে ভালোবাসল কিনা। তারপর আর কী মানল না মানল, আর কী জানল না জানল আর কাকে বিশ্বাস করল না করল—সব তুচ্ছ।

নীরদবাবু কথা দিলেন নন্দর চাষের জমিগুলি কোথায় কী অবস্থায় আছে তিনি খোঁজ খবর নেবেন। রেল কোম্পানির কাছে একটা ক্ষতিপূরণের আবেদনের কথাও উঠল। তবে কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। রেলপুলের ওপর দিয়ে যাতায়াত তো আসলে বেআইনী।

শেষে বললেন, 'ভাববেন না। যার যা সাধ্য সবাই সেটুকু নন্দর জন্যে করবে। নিনাইয়ার শতেক নাও।'

কিন্তু অত বিশ্বাসের জোর শক্তিপদর মনে কোথায়? নন্দ যাদের রেখে গেছে সংসার সমুদ্রে

শত তরণীর ভরসা তাদের সামান্য। শক্তমত নিশ্ছিদ্র একটি তরণী পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

বেলা এগারোটার গাড়ি যখন ধরতেই হবে আগে থেকেই তৈরি হওয়া ভালো। একটু বেলা হলে গামছা কাঁধে নদীতে স্নান করতে গেল শক্তিপদ। সঙ্গে সঙ্গে চলল ভাগ্নেভাগ্নীর দল। মামা খানিকবাদেই চলে যাবে শুনে তারা আর কেউ কাছ ছাড়া হচ্ছে না, সব সময়েই পাছে পাছে আছে।

বাড়ির পিছনেই নদী। নদী নয় নদ। নাম নাগর।

এই রসের নামটি ওর কে রেখেছে কে জানে।

জলে নামল শক্তিপদ। এই গ্রীষ্মের সময় সামান্যই জল আছে। এই ঘাট থেকেও উত্তর দিকে তাকালে সেই ব্রীজটিকে দেখা যায়। ছোট্ট নদীর ওপর ছোট্ট অখ্যাত এক রেল ব্রীজ। কদিন আগে একজনের জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে দিয়েছে।

মামীর সঙ্গে নাইবে বলে তারাদাস হরিদাস দুজনেই তেল মেখে জলে নেমেছে। সাবান এনেছে সঙ্গে।

হরিদাস বলল, 'দাদা, তুই তো সব করছিস। সাবানটা আমার হাতে দেনা আমি মামার পিঠে মাখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ বলল, 'হ্যাঁ হরিই দিক।'

হরি খুশি হয়ে সাবান মাখাতে শুরু করল। নিজের কোমল চওড়া পিঠে পাখির পালকের মত দুটি কোমল করতলের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল শক্তিপদ।

তারাদাস বলল, 'জানেন মামা বাবা বাঁচবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন। এপারে মাঝিমাল্লারা যারা ছিল তাদের কাছে শুনেছি বাবা অন্ধকারে বসে বসে আসছিলেন। অন্য দিন টর্চটা থাকে। সেদিন ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় আমি যখন এলাম বললেন, তুই নিয়ে যা। দূর থেকে ট্রলিটা দেখতে পেয়ে বাবা প্রথমে ছাতা ফেলে দিয়েছিলেন, তারপর জুতো জোড়া, তারপর নিজে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়বেন আর সময় পেলেন না।'

মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ তো ওইভাবেই লড়ে। আর শেষপর্যন্ত হারে। শক্তিপদ ভাবল, মৃত্যুভয় সাধারণ মানুষের কাছে একান্ত স্বাভাবিক। কারণ মৃত্যু চিররহস্যে আচ্ছন্ন। জন্মও তাই। যতদিন না বিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর মুখের ওপর থেকে এই দুটি কালো পর্দা তুলে ফেলতে পারবে ততদিন থিয়োলজি আর মেটাফিজিকসের রাজত্ব অব্যাহত চলবে। কিন্তু এই দুই রহস্যের সমাধান হলেও মানুষ হয়তো আরও দুরূহতর কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যার মাথা আছে তারই মাথা ব্যথার দরকার হয়।

স্নান শেষ হল। খাওয়াদাওয়াও শেষ হল। আজ ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে বসে নিরামিষই খেল শক্তিপদ। পরিবেশন করতে লাগল শ্যামা। রোগা শরীর নিয়ে সুবর্ণ এসে বসল সামনে।

সুবর্ণ বলল, 'সবই তো দেখে গেলেন। বউদিকে বলবেন। আমি আর কী বলব। বলবার কোন শক্তি আমার আর নেই—আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করল শক্তিপদ। ট্রেনের এখনও দেরি আছে।

তারাপদ বলল, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। আমরা আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব, গাড়িতে তুলে দেব।'

হঠাৎ সুবর্ণ উঠে গিয়ে কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে এল। সেখানে আর কেউ ছিল না।

শক্তিপদ বলল, 'ওটা কী সুবর্ণ।'

সুবর্ণ লজ্জিতভাবে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওঁর একটা ফটো। ভালো ফটো তো ঘরে নেই। এটা অনেকদিনের আগের তোলা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় নিয়ে যদি—'

শক্তিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি ভালো স্টুডিয়ো থেকে এনলার্জ করে এনে পাঠিয়ে দেব।'

সুবর্ণ সরে গেলে শক্তিপদ কাগজটা খুলে দেখে নিল ফটোখানা। বাহান্ন বছরে মারা গেল নন্দলাল। এ ফটো অনেক আগের তোলা। প্রথম যৌবনের। এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। লম্বাটে

ধরনের মুখ। নাক চোখও বেশ বড় বড়। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু যেন এখনো চেনা যায়। ভারি ভালোবাসত স্ত্রীকে। খুব আদর যত্ন করত। শক্তিপদর এই বোকাটে বোনটির মধ্যে কী যে এক অপূর্ব রহস্য আবিষ্কার করেছিল নন্দলাল তা সেই জানে। কলেজ জীবনে এও এক বিস্ময় ছিল শক্তিপদর কাছে। এসব নিয়ে হাসি ঠাট্টাও কম করেনি। কিন্তু যতদূর জানে শক্তিপদ মোটামুটি ওদের দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। দারিদ্র্যে অভাব অনটনে দুঃখে' শোকে তা জীর্ণ হয়নি। বলা যেতে পারে সুখী হওয়া ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। তবু যে যার পথে যে যার ধরনে সুখই তো মানুষ খোঁজে আর সেই সুখের তোরণে পৌঁছবার আগে সবাইকেই বহু দুঃখের দরজা পার হয়ে যেতে হয়।

যাত্রার আয়োজন বাঁধা ছাঁদা চলতে লাগল। প্রণাম আর আশীর্বাদের পর্ব শেষ হল। পথ খরচটা আছে কিনা দেখে নিয়ে পাঁচটা টাকা শক্তিপদ শ্যামার হাতে গুঁজে দিল, 'ভাইবোনদের মিষ্টি কিনে দিয়ো।'

শ্যামা আপত্তি করে বলল, 'না না না. আপনার হয়তো শেষে টানাটানি পড়বে। ও আমি নেব না।'

কিন্তু শ্যামাকে নিতেই হল।

ততক্ষণে তারাদাস আর হরিদাস দুজনে দুই ন্যাড়া মাথায় শক্তিপদর স্যুটকেস হোল্ডঅল তুলে নিয়েছে।

শক্তিপদ বলল, 'ওকি আমার কাছে একটা দাও. তোমরা পারবে কেন?'

হরিদাস বলল, 'খুব পারব। আমরা এমন কত নিই।'

সুবর্ণব শাশুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিল শক্তিপদ, বলল, 'চলি মায়েমা।'

বৃদ্ধা ছলছল চোখে বললেন, 'এসো বাবা, আবার এসো,—মনে রেখো ওদের কথা।'

বাঁখারির বেড়া দিয়ে বাড়ির সামনের দিকটা ঘেরা। সুবর্ণ সেই বেড়ার ধার পর্যন্ত এল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'রাঙাদা একটা কথা।'

শক্তিপদ ফিরে তাকাল. 'কী কথা সোনা।'

সুবর্ণ বলল, 'দেখবেন ওরা যেন ভেসে না যায়, ওরা যেন মরে না যায়।'

শক্তিপদ বলল, 'ছিঃ মরবে কেন।'

তারাদাস আর হরিদাস বোঝা মাথায় বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে আগে আগে চলেছে। সরু পথ। দুদিকে গাছ গাছালি. ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের বাড়ি। তারাদাস ডান হাতে একটা পুঁটুলি ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। শক্তিপদ বলল. 'ওটা আবার কী।'

তারাদাস বলল, 'কয়েকটা পেঁপে দিলাম বেঁধে। আমাদের গাছের বড় বড় পেঁপে। বেশ স্বাদ আছে। যেতে যেতে পেকে যাবে। কলকাতায় এ জিনিস পাবেন না মামা।'

শক্তিপদ বলল, 'তা ঠিক।'

তারাদাস যেতে যেতে বলল, 'আমাদের জন্যে অত ভাববেন না মামা। মা আর ঠামা যত ভাবে আমি তত ভাবি না। চলেই যাবে কোন রকমে। দিদিও কিছু করবে, আমিও কিছু করব। তা ছাড়া খরচ অনেক কমিয়ে ফেলব। বাবা মাছের জন্যে ভারি ব্যয় করতেন। মাছ দেখলে আর লোভ সামলাতে পারতেন না। মাছের জন্যে আমি এক পয়সাও ব্যয় করব না। নদী নালা থেকে মেরে খাব—'

হরিদাস বলল, 'আমিও মারব। আমিও বঁড়শি বাইতে জানি।'

শক্তিপদ হাসল। যেন মাছের খরচটাই সংসারে সব। বলল, 'খবরদার কেউ জলে টলে নেবো না।'

হরিদাস বাহাদুরি দেখিয়ে বলল, 'আমরা সবাই সাঁতার জানি।'

ডাইনে মাঠ। মাঠের ধার দিয়ে রাস্তা। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। শক্তিপদ এগোতে লাগল। আরো কিছুদূর গেলে নদী। খেয়া নৌকোয় নদী পার হবে। ওপারে স্টেশন।

ওরা দু'ভাই ফের তার আগে আগে চলেছে। শক্তিপদ ভাবল, মরবে না হয়তো। কিন্তু পদে

পদে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। ওদের সেই অনির্দিষ্ট কালের দীর্ঘস্থায়ী জীবনযুদ্ধে, নিজের সংসারের বোঝা মাথায় করে কতখানি সহায়ক হতে পারবে শক্তিপদ, বলা সহজ নয়।
ভাদ্র ১৩৬৯

মর্মরমূর্তি

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥
এবার সভাপতি কর্তৃক যোগেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান।'

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ছাপানো অনুষ্ঠানসূচী থেকে এক ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন। আর প্রবীণ সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। অনিমেষ এক মুহূর্ত একটু গড়িমসি করল। ভাবল তার বোধ হয় না উঠলেও চলে। সে তো আর সভাপতি নয়, প্রধান অতিথি।

কিন্তু অনুষ্ঠানের সেক্রেটারী বনাম ঘোষণাকারী তার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'কই চলুন?'

দ্বিধাটুকুর জন্য এবার লজ্জিত অনিমেষ। শিষ্টাচারে হয়তো একটু ত্রুটি হল। বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ সভাপতি এরই মধ্যে ডায়াস থেকে কার্পেটমোড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছেন। কে যেন তাঁর হাত ধরে সাহায্য করতে এসেছিল, তিনি বললেন, 'আরে না-না, অত বুড়ো হই নি!'

বরং অনিমেষই অতিবৃদ্ধের মত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নামল। জীবন যদিও স্খলন-পতনে ভরা, কিন্তু এখানে এই সহস্রলোচনের সামনে সে পা ফসকাতে রাজী নয়।

প্যাণ্ডেলের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই উত্তর দিকে শ্বেতপাথরে বাঁধানো বেদী। বেদীর উপরে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আবক্ষমূর্তি। বেদীর ওপর নাম-ধাম, জন্মমৃত্যুর সন-তারিখ সবই আছে। কিন্তু অনিমেষের অত কৌতূহল কোথায়?

পাশেই চোদ্দ-পনের বছরের একটি সুদর্শন ছেলে একথালা মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সভাপতির হাতে সবচেয়ে বড় মালাটি দেওয়া হল। তিনি উঠে গিয়ে মূর্তিতে মাল্যদান করলেন। অনিমেষ যন্ত্রের মত তাঁরই অনুসরণ করল। তার পর মালা দিলেন স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা। যোগেন্দ্রনাথের পুত্র যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। দীর্ঘাঙ্গ ভদ্রলোক কুণ্ঠিত বিনয়ে এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সভাপতির দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ আমার সব আয়োজন সার্থক হল। পায়ের ধুলো পড়ল আপনাদের।'

সভাপতি এই বিনয়ের বিনিময়ে বললেন, 'পায়ের ধুলো কি বলছেন, আপনি ধীমান ভক্তিমান কৃতী পুরুষ, বংশের গৌরব, আপনাদের মত মানুষকে দেখলেও পুণ্য!'

বেশ বলতে পারেন তো ভদ্রলোক! এত কথা অনিমেষের মুখে যোগাত না। সৌজন্যের স্মিত হাসিতেই সব কাজ সারতে হত।

একে একে আরো অনেকে মালা দিলেন। মেয়েরা মালা দিয়ে নীচু হয়ে প্রণাম করলেন।

একটি সুন্দরী কিশোরী ধূপদানিতে ধূপ ছিটিয়ে দিল। বাড়িয়ে দিল ঘৃতদীপের সলতেটি। মাল্যদান পর্বের পর আবার সভারোহণ।

তার পর স্থানীয় এক ভদ্রলোককে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করা হল। তিনি যোগেন্দ্রনাথের গুণাপনার সুখ্যাতি করলেন। অমন কৃতী অমায়িক উদার-হৃদয় পুরুষ আর দেখেন নি। পূর্ববঙ্গের সেই সুদূর পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসে সোদপুরের এই অবহেলিত অবজ্ঞাত অঞ্চলকে তিনি মানুষের বাসযোগ্য করে গেছেন। তিনি ধনী ছিলেন। কিন্তু সেই ধন শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করেন নি, বহুজনের মুখের দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। নামমাত্র দাম নিয়ে তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জমি বণ্টন করেছেন। তাঁরই দাক্ষিণ্যে এখানে এই উপনগরটি গড়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবার ভার নিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র যতীন্দ্রনাথ।

তিনি শুধু তাঁর পিতার প্রস্তরমূর্তিই প্রতিষ্ঠিত করেন নি, তাঁরই নামে নানা আকারে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্যাণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পল্লীবাসীর জন্যে স্কুল করেছেন, পাঠাগার করেছেন, জলাশয় করেছেন, একটি পার্ক করে দেবারও তাঁর ইচ্ছা আছে। সেই উদ্যান হবে শিশুদের জন্যে। এই অঞ্চলের বাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের কণ্ঠে কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথের পুণ্য পিতৃনাম ধ্বনিত হোক এই তাঁর অন্তরের অভিলাষ। ভগবান তাঁর সেই সৎ পবিত্র ইচ্ছাকে পূর্ণ করে তুলুন।

বক্তা থামলেন। কিন্তু সভার শ্রোতাদের হাততালি যেন থামতে চায় না।

বেশ বলেন ভদ্রলোক। স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাস্টার। আত্মপ্রত্যয় আছে। এমন একটি উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলতে জানেন, যেখান থেকে সমস্ত শ্রোতাকে স্কুলের ছাত্র বলে মনে হয়। শ্রোতারাও সাময়িকভাবে শিক্ষার্থী বনে যায়। এমন একটি বিভ্রম জাগাতে না পারলে বক্তৃতা করে বাহবা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় বক্তা অনিমেষ। কিছু বলতে গেলেই সে মহা অসুবিধা বোধ করে। চল্লিশ বছরেরও বেশি যে ভাষা বলছে শুনছে এবং সেই হাতেখড়ির আমল থেকে যাতে কিছু কিছু লিখছেও, সেই অতিপ্রিয় অতিপরিচিত ভাষা তার রসনায় বিমাতৃভাষা হয়ে ওঠে। কি এমনো মনে হয়, মাত্র মাসকয়েক সে কথা বলতে শুরু করেছে, মায়ের কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ আর একটি দুটি বাক্য সবে আয়ত্ত করেছে মাত্র। কিন্তু বক্তৃতা তার যতই বালকোচিত হোক, অমৃতং বালভাষিতং বলে মার্জনা সভাজনের কাছে সে পায় না—এ কথা অনিমেষ ভালো করেই জানে।

সে যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল। ঘোষণাকারী বললেন, 'এবার আমাদের প্রধান অতিথি তাঁর সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবেন।'

অনিমেষ জানে ভাষণকে জ্ঞানগর্ভ করবার দরকার করে না। তা শূন্যগর্ভ হলেও বেশ চলে যায়, যদি তা সুভাষিত ও সুখশ্রাব্য হয়। অনিমেষের সে দক্ষতাই বা কোথায়? তাই সে কয়েক নিমেষের মধ্যেই কাজ শেষ করল। প্রথম বক্তা যে কথা বলেন নি, সেই পাঠাগারের কথা তুলল। লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনই আজকের উপলক্ষ। পাঠাগারের গুরুত্ব, পাঠভবনের ব্যবহারবিধি, আর সবচেয়ে শেষে বই-ই যে মানুষের স্থায়ী বন্ধু, এই নিয়ে মিনিট কয়েক ধরে কয়েকটি মামুলী কথা বলে অনিমেষ তার বক্তব্য শেষ করে আসন নিল এবং রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

বলা বাহুল্য, একটি হাততালিও শোনা গেল না। অনিমেষ ফের মনে মনে সেই অভ্যস্ত আক্ষেপ করতে লাগল, ছি ছি ছি, কেন এলাম, কেন কিছু বলতে গেলাম!

এর পর বৃদ্ধ সভাপতি মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। আসলে উৎসাহ-উদ্যমে তিনিই যুবক। তিনি প্রথমে নিজের অধিকার নিয়ে বিনয় করলেন, কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভা-উদ্বাহুরিব বামনঃ।' রঘুবংশ থেকে পরম বিনয়ী মহাকবির তিন-চারটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন সভাপতি। তার পর আনলেন পিতৃপূজার প্রসঙ্গ। সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।'

মন্ত্রমুগ্ধ সভা উৎকর্ণ এবং সভাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে নির্নিমেষ হয়ে রইল।

সংস্কৃত ছেড়ে প্রাকৃত বাংলায় এবার সভাপতি বলতে লাগলেন, 'কিন্তু এই মহাবাণী শুধু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থের পাতায় আছে। জীবনের দৈনন্দিন জমাখরচের খাতায় কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। আজ সমাজে আমরা এমনভাবে চলি যেন পিতা কোনদিন ছিলেনও না। যেন আমরা স্বয়ম্ভু, ভুঁইফোঁড়। বাপ বুড়ো হয়ে গেলে আমরা তাঁকে বলি ওল্ড ফুল। মুখে না বললেও মনে মনে বলি। আমাদের আচার-আচরণে চালচলনে বলি। আর মরে গেলে আমরা বেঁচে যাই। মরা বাপের নামগন্ধও আমরা কোথাও রাখি নে। সব ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলি। একটু বয়স হয়ে গেলে বাপের নাম আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে না তাই রক্ষা, নইলে নামটিও বলতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আজ আমাদের শ্রাদ্ধবিধি নেই, শ্রদ্ধা জানাবার কোন অনুষ্ঠান নেই। পিতৃপুরুষের স্মরণ-কীর্তনকে আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা যেন শুধু একপুরুষের মেয়াদ নিয়ে এসেছি,

গালাগালের সময় ছাড়া চোদ্দ-পুরুষের কথা আমরা উল্লেখই করি নে। আমরা শুধু নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই একমাত্র সম্পর্ক বলে মনে করি। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে সমাজে সেই যৌন সম্পর্কের কাছে আর সব সম্পর্কই আজ গৌণ হয়ে গেছে।' সভামণ্ডপ মৌন হয়ে রইলেন, তাতে যে প্রাণের সাড়া জেগেছে তা বেশ লক্ষ্য করল অনিমেষ। মানুষ সংস্কৃত ভাষায় বোধ হয় তিরস্কৃত হতেও ভালোবাসে।

সভাপতি বলতে লাগলেন, 'এই অকৃতজ্ঞতার ফল আমরা হাতে হাতে পেয়েছি। আমরা জাতকে জাত অকিঞ্চন অনাথ হয়ে গেছি। স্মৃতি আর শ্রুতি আজ আমাদের কাছে হাস্যকর। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে কোন প্রতিশ্রুতিই বা আমরা রাখতে পারছি? এই চরম বিস্মরণ আর পরম অকৃতজ্ঞতার যুগে, আমি এখানে এসে, আমাদের যতীন্দ্রবাবুর এই পুণ্য পিতৃধামে এসে অবাক হয়ে গেছি। এ তিনি করেছেন কী? এ তো শ্রদ্ধাহীন ঐতিহ্যহীন লুপ্ত স্মৃতি, এ যুগের মানুষের কাজ নয়!'

এর পর সভাপতি যতীন্দ্রবাবুর প্রত্যেকটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র গুরুত্ব আর গৌরবের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর দীর্ঘ ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে দেশ-বিদেশের কবি মনীষীর রচনার উদ্ধৃতি মণি-মুক্তার মত বসিয়ে বসিয়ে দিতে লাগলেন।

পুরো এক ঘণ্টা তিনি বললেন। আরও এক ঘণ্টা বললেও শ্রোতারা অধীর হত না। তাদের হাততালির দীর্ঘতায় তা বুঝতে পাবল অনিমেষ।

'চমৎকার বলেছেন!' অনিমেষ সভাপতিকে সাধুবাদ দিল।

তাঁর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল। কিন্তু ভাষায় বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'আমরা তো শুধু ওইটুকুই পারি। এই গলাটুকুই সম্বল। কিন্তু আপনারা ঢের বেশি বলে বলীয়ান। কলম যাঁদের হাতে আছে, তাঁদের মুখের মধ্যে জিভ আছে কি না আছে কে দেখতে যায়?

এর পর যতীন্দ্রবাবু আর তাঁর সহচরেরা অনিমেষদের লাইব্রেরী ভবনে নিয়ে গেলেন। প্রতিমূর্তির পাশেই বাড়িটি তুলেছেন যতীন্দ্রবাবু। ছোট সুন্দর বাড়ি। তিন-চারটে কাঁচের আলমারি বোঝাই বই। রিডিংরুমটি চেয়ার টেবিলে সাজানো।

সভাপতি বললেন, 'বেশ শান্ত নিরিবিলি চমৎকার পরিবেশ। পড়াশুনো করবার জায়গাই বটে।'

যতীন্দ্রবাবু সখেদে বললেন, 'কিন্তু পড়ে কজন?'

পরিদর্শকের খাতায় কিছু মন্তব্য লিখে এবং জলযোগ সেরে সভাপতির সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল অনিমেষ। বিদায়-নমস্কার, প্রতি-নমস্কার, শিষ্টভাষণ, প্রতি-ভাষণ। তার পর ড্রাইভার স্টার্ট দিল গাড়িতে। অনিমেষ হাঁফ ছেড়ে ভাবল, 'আজকের মত দায় চুকল।'

সভাপতি শুধু বাগ্মী নন, আলাপচারীও। অনিমেষ পাশে বসে তাঁর সেই সদালাপ শুনতে শুনতে এল। কর্মজীবনে জেলাজজ ছিলেন। বছর দশেক হল অবসর নিয়েছেন। এখন প্রাচীন সাহিত্য আর আধুনিক সভাসমিতি নিয়ে আছেন। রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্যদর্শন—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর স্বচ্ছন্দ অনায়াস গতি দেখে মুগ্ধ হল অনিমেষ। পথের দিকে কোন লক্ষ্য রইল না, সময়বোধ লুপ্ত হল।

সভাপতি বললেন, 'দুটো কথা শোনবার জন্যে লোকে ডাকে। যদি দেখি শ্রোতারা শুনতে চাইছে, আরো দুটো কথা বেশিই বলি। ভাবি না হলে ওদের খরচা পোষাবে না। কিন্তু যদি দেখি সভা চঞ্চল—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে তেমন দুর্ভাগ্য অবশ্য আমার খুব কমই ঘটে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে অতি সংক্ষেপে কাজ সারি। আবার কোথাও বা মাস্টারি করতে হয়, পুলিসী করতে হয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিজের হাতেই নিতে হয়। উপায় কি? ধমকে শাসনের দণ্ডে না হোক, লাঠি তুলে ব্যঙ্গ করে টিটকিরি দিয়ে বিমুখ জনচিত্তকে বশে আনতে হয় মশাই, উপায় কি! কিন্তু আজকের অডিয়েন্স বেশ ভালো ছিল। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে এই উপলক্ষে আমার পরিচয়ও হয়ে গেল। এইটুকুই লাভ। বুঝলেন এইটুকুই লাভ! বুড়ো বয়সে এই দৌড়-ঝাঁপ আর গলাবাজি কি পোষায়? কিন্তু চোখমুখ বুজে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে দু-একজন সাধু সজ্জনের সঙ্গ মেলে, দুটো সৎ আলোচনা হয়, সময়টা বেশ কাটে। আচ্ছা নমস্কার নমস্কার। আপনি এসে গেলেন, এই

তো সিঁথির মোড়। আমার এখনো ঢের দেরি। সেই ধুধু গোবিন্দপুর। ভবানীপুর কি এইখানে? আচ্ছা আচ্ছা। ভাগ্যে থাকলে আবার এক দিন এমনি করে ফের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। আর যদি তার আগে অন্য পারের সভা থেকে ডাক আসে, তা হলে তো কথাই নেই। নবীন সেনের সেই যে দুটি লাইন আছে, আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে হয়—

"সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু ভাসে কৃষ্ণ-পদ তরী
এ পারেতে সন্ধ্যা, ঊষা অন্য পারে মুগ্ধকরী।"

গাড়ি থেকে নেমে গলির দিকে পা বাড়াল অনিমেষ। মনে মনে ভাবল, গাড়িতে মুখুজ্যেমশাইর সঙ্গে এত কথা হল, কিন্তু সেই পিতৃতর্পণের প্রসঙ্গ আর ওঠে নি। তিনি ইচ্ছে করেই তোলেন নি, না কি ভুলে গেছেন কে জানে? অনিমেষও আর ও আলোচনার মধ্যে যায় নি। অথচ আজকের সভায় প্রধান বিষয় কিন্তু তাই ছিল—পিতৃ-তর্পণ! অন্তত অনিমেষের তাই মনে হয়েছে। কিন্তু সভামঞ্চ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা পিতৃপ্রসঙ্গ কত সহজেই না ছাড়িয়ে এসেছে?

অন্ধকার গলির মত সিঁড়িও আলোহীন। বালব নাকি প্রায়ই চুরি হয়ে যায়। তাই বাড়ির মালিক বিরক্ত হয়ে সিঁড়িতে আর আলোর ব্যবস্থা করেন নি। অনিমেষের মনে হল, সে যেন পিতৃলোক থেকে একেবারে প্রেতলোকে এসে হাজির হয়েছে।

কড়া নাড়তে ঝি এসে দোর খুলে দিল। বলল, 'মেয়েদের নিয়ে বউদি এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।' তার পর হেসে বলল, 'বোধ হয় সিনেমায় যাবেন। আপনারও নাকি সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপনার দেরি দেখে—'

সারদা কথাটা অনুচ্চ রাখলেও, অনিমেষ বুঝতে পারল ব্যাপারটা। তার দেরি দেখে অন্য সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে আরতি। আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলিতে তার দেওরের তো অভাব নেই!

ইদানীং আরতিকে সঙ্গ তারাই দেয়। অনিমেষের খোঁচার বদলে সেও খোঁচা দিতে ছাড়ে না, 'কী করব বল, এ-কাজে ও-কাজে পাড়া-পড়শীকেই ডাকাডাকি করে আনতে হয় আমার। সেধে-ভজে চা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে। তোমার কি, ছুটির দিনে তোমার তো সভাসমিতি বাঁধা—সভাপতি হতে পারলে আর কিছু চাও না!'

অনিমেষ বলে, 'সেই দোষে তুমি কি আমার পতিত্ব খারিজ করতে চাও নাকি?'

আরতি জবাব দেয়, 'আমি চাইব কেন? তুমি নিজেই খারিজ হতে পারলে বেঁচে যাও!'

জামাকাপড় না ছেড়েই ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল অনিমেষ।

আরতি আর চিনু-মিনু অনেকদিন ধরেই সিনেমা সিনেমা করছিল। কিন্তু অনিমেষ কান দেয় নি। আজ ওরা নিজেরাই সুযোগ করে নিয়েছে।

হঠাৎ ছেলের কথা মনে পড়ল অনিমেষের। 'শান্টু কোথায়? সেও গিয়েছে না কি সঙ্গে?'

সারদা বলল, 'না দাদাবাবু, শান্টু যায় নি। সে তিন নম্বরের সন্তু-নন্তুর সঙ্গে খেলছে। একটু বাদেই খাইয়ে দেব। বউদি সব ব্যবস্থা করে গেছেন।'

কিন্তু স্ত্রীর ব্যবস্থাপনার কথা শুনে অনিমেষ খুশি হল না। বলল, 'হ্যাঁ, ব্যবস্থা যা তা তো দেখতেই পাচ্ছি! যাও ওকে ডেকে নিয়ে এস। রাত্রে আবার খেলা কিসের? পড়া নেই, শুনো নেই—।'

সারদা শান্টুকে ডাকতে চলে গেল।

অনিমেষ অতিথির ধোপদুরস্ত জামাকাপড় ছেড়ে এবার গৃহী হল। পুরনো লুঙ্গিখানা পরল। বাথরুম থেকে মুখহাত ধুয়ে এসে একটি সিগারেট ধরাল। এরই সাহায্যে সে মাঝে মাঝে গজদন্ত মিনারে গিয়ে ওঠে।

'বাবা আমাকে ডেকেছ?'

সাত-আট বছরের দুরন্ত ছেলে, এখন আসামীর মত সামনে দাঁড়িয়েছে।

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি নীচের ফ্ল্যাটে কী করছিলে শান্টু? দিনেও খেলবে, রাত্রেও খেলবে? এই কি খেলার সময়?'

শান্টু বলল, 'আমি খেলছিলাম না তো বাবা!'

'তবে কী করছিলে ?'

'নন্তুর ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনছিলাম। সব পুরনো গল্প। পচা। তুমি একটা ভালো দেখে গল্প বল না বাবা ?'

অনিমেষ বলল, 'পরে হবে গল্প। এখন একটু পড়াশুনো কর। সবে তো সাতটা। যাও একটু বইটই নিয়ে বসো।'

শাণ্টু অপ্রসন্নভাবে পাশের ঘরে চলে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে অনিমেষ নিজের মনেই একটু হাসল। পড়াশুনোর কথা তুললেই ছেলেমেয়েদের মুখ কালো হয়ে যায়। আশ্চর্য, এই কথাটা অনিমেষের বাবাও বলতেন!

'পড়তে বললেই মন্টুর মুখ হাঁড়ি। দুষ্টু ছেলেদের বই হল ওষুধ!' বলতেন বাবা। আশ্চর্য, কতদিন বাদে বাবার কথা ফের মনে পড়ল অনিমেষের। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—হয়তো বছরের পর বছর বাবার কথা সে তোলে নি। আশ্চর্য লাগে ভাবতে। মুখুয্যেমশাই যেভাবে বলেছিলেন, প্রায় সেইভাবেই ভুলেছে। নাম ভোলার কোন প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু ব্যক্তিটিকে ভুলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব—যা একই সঙ্গে কড় আর মধুর ছিল, শাসনে স্নেহে কাঠিন্য আর কোমলতার অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছিল যাঁর মধ্যে, তাঁর কথা আজকাল কদাচিৎ মনে পড়ে অনিমেষের, স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে কদাচিৎ স্মরণ করে।

অনিমেষ তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করে নি। এসব রক্ষণ সংরক্ষণে সে বিশ্বাস করে না। তার বাবা অবশ্য যতীন্দ্রবাবুর বাবা যোগেন্দ্রনাথের মত খ্যাতিমান বিত্তবান ক্ষমতাবান ছিলেন না। কি অনিমেষ নিজেও যতীন্দ্রবাবুর মত বড়বাজারের আমদানি-রপ্তানির বড় কারবারী নয়। দেশী পাবলিসিটি ফার্মের সামান্য একজন কপি-রাইটার মাত্র। তবু অখ্যাত বাবার অকৃতী ছেলেরও যেটুকু কৃত্য ছিল, সেটুকুও কি অনিমেষ করেছে ? করে নি। আঠার বছর আগে তাঁর মৃত্যুর এক মাস বাদে অনিমেষ সেই যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছুই করে নি। শাস্ত্রীয় মতে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেয় নি, বার্ষিক শ্রাদ্ধ-তিথি পালন করে নি। মহালয়ার দিনে এখনো অনেকে পিতৃতর্পণ করেন। কিন্তু অনিমেষ ওসব মন্ত্রতন্ত্রের দিকে যায় নি। ঈশ্বর, লোকান্তর, জন্মান্তর, দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব তার কাছে দর্শন বিজ্ঞানের মূল্য পায় না, আদিযুগের কবি-কল্পনা বলে স্বীকৃতি পায়। সে কল্পনা উঁচুস্তরের সে কথা মানে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু বলে মানে না। তবু আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষেরও তো কোন না কোন আচার-অনুষ্ঠান আছে। তারা জাতীয় মহাপুরুষদের জন্মদিন মৃত্যুদিন পালন করে। পরিবারেও জন্মোৎসব প্রধান পুরুষের মৃত্যুতিথি পালন করে কেউ কেউ। সেইসব উপলক্ষে জীবিতের একটু বিশেষ ধরনের আদর-আপ্যায়ন আর মৃতের স্মরণ-কীর্তন চলে। অনিমেষের পরিবারে ওসব কিছু ছিল না। আরতিই প্রথমে তার ছেলেমেয়েদের জন্মোৎসবের ব্যবস্থা করেছে। এই উপলক্ষে ভালো বাজার হয়। আরতি নিজেও কোন-কোনবার বাজার করে আনে। বেছে বেছে দু-চারজনকে খেতে বলে। যার জন্মদিন তার বন্ধুরাই অগ্রাধিকার পায়। চিনু মিনু দুজনেই এখন কলেজের ছাত্রী। প্রত্যেকের জন্মদিনে পাঁচ-ছটি করে মেয়ে এসে কলকল্লোল জুড়ে দেয়। দিদির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিনু একবার বারোজন বন্ধুকে বলেছিল। ভিতরে ভিতরে খুব চটে গিয়েছিল অনিমেষ। কিন্তু মুখে হাসি টেনে স্ত্রীকে বলেছিল, 'একেবারে একটি ছেলে ধরে আনলেই পারতে। জন্মোৎসবের সঙ্গে মেয়ের বিবাহোৎসবটাও হয়ে যেত।'

আরতি বলেছিল, 'ইস, অত সহজেই বুঝি পার পাবে ভেবেছ : বারোজনেই তুমি চোখ কপালে তুলেছ, ওদের একেকজনের বিয়ের সময় বারোশ লোককে বলব। তখন দেখি তুমি কোথায় যাও!'

অনিমেষ জবাব দিয়েছিল, 'কোথায় আর যাব, লোটা-কম্বল নিয়ে কোন আশ্রম-টাশ্রমের পথ দেখতে হবে। তার আগে যদি তোমাকে কারো হাতে সম্প্রদান করে যেতে পারি, তা হলে তোমার মেয়েদের সম্প্রদানকর্তার অভাব হবে না।'

আরতি বলেছিল, 'অভাব আমার কিছুতেই হবে না। অত যদি আবোল-তাবোল বল, মুখ বেঁধে রাখবার মত রুমালেরও কি অভাব হবে ?'

ছেলেমেয়েদের বয়স যত বাড়ছে, ওদের জন্মদিনের ঘটা তত বাড়ছে। জামা জুতো শাড়ি পেন

প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু কিনতে হয়। আরতি কিনিয়ে ছাড়ে। ছেলেমেয়েরা মার কাছে আবদার জানায়। সে আবদার শেষ পর্যন্ত রাখতে বাধ্য হয় অনিমেষ।

এ ছাড়া নিজেদের বিবাহবার্ষিকী। আজকাল আর বন্ধু-বান্ধবদের এ উপলক্ষে বলে না অনিমেষ। প্রথম প্রথম দু-এক বছর বলত। তারা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে আসত। নৈশ ভোজটা পুরোমাত্রায় সেরে যেত। আরতিও কোন-কোনবার তার প্রাক্তন সহাধ্যায়িনীদের বিয়ের স্মারকতিথিতে খেতে বলেছে। গান-বাজনা, হৈ-চৈ, বাজি রেখে ব্রীজ খেলা, কি চড়ুইভাতিতে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়া—প্রথম আমলের সেইসব স্মরণোৎসব প্রায় মহোৎসবে গিয়ে দাঁড়াত। আজকাল অত সব হয় না। তবে আরতির জন্যে একটু বেশি দামের শাড়ি এখনো প্রতিবারই আসে। ফুলদানি দুটি গোলাপে রজনীগন্ধায় ভরে ওঠে। আর অতিথি হিসেবে মাংস ভাত দই মিষ্টি খায় চিনু-মিনু-শান্টুরা। এই গতবারই তো শান্টু বলেছিল, 'বাবা, রোজ যদি তোমাদের এমন বিয়ে হত বেশ মজা হত।'

আরতি জবাব দিয়েছিল, 'তোমার বাবাকে আর লোভ দেখিও না শান্টু, তোমার নতুন নতুন মা এনে ঘর ভরে ফেলবে। পুরনো মায়ের আর তা হলে এ বাড়িতে জায়গা হবে? সে দুয়োরানী হয়ে মনের দুঃখে ঘুঁটে কুড়োতে চলে যাবে!'

শান্টু অবশ্য বিশ্বাস করে নি, হেসে বলেছিল, 'ধোৎ!'

রিচুয়াল একেবারে বাদ দিতে পারে নি অনিমেষ। শুধু তার ধরন পালটেছে। সংসার থেকে পূজাপার্বন একেবারে তুলে দিলে কি হবে, নতুন ধরনের পূজা-অনুষ্ঠান উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আর আস্তে আস্তে তা কায়েমী হয়ে যাচ্ছে।

জীবিতদের জন্যে আচার-অনুষ্ঠান বিধি ব্যবস্থা সবই আছে। শুধু মৃতদের জন্যে কোন ব্যবস্থাই অনিমেষ রাখে নি। মৃতদের সে একেবারেই মরে যেতে দিয়েছে। নিজের কাণ্ড দেখে এই মুহূর্তে নিজেই অবাক হল অনিমেষ। সত্যি বাবাকে সে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলেছে! শুধু কি বাবা? মা? মার কথা অবশ্য অনিমেষের মনে নেই, তিনি অনিমেষের দু বছর বয়সে মারা গেছেন। কিন্তু মার বদলে অনিমেষ যাঁর কোলে মানুষ হয়েছিল, মরে যাওয়ার পর সেই জেঠিমাকেও কি আর মনে রাখতে পেরেছে অনিমেষ? কাউকে পারে নি। বাবার পিসীমা বুড়ী ঠাকুরমা অনিমেষকে কত ভালোবাসতেন, কত রূপকথা শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন, কত অত্যাচার আবদার পালন করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি আর ইহলোকে নেই, অনিমেষ তাঁকে স্মৃতিলোক থেকেও নির্বাসন দিয়েছে। এমনি কত—আরো কত আত্মীয়স্বজন বন্ধু পুরুষ নারী ছায়া-মিছিলের মত সব সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। এক দিন যাঁরা অনিমেষকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন, স্নেহে বাৎসল্যে প্রীতিতে ভরে রেখেছিলেন, তাঁদের সবাইকে নির্মমভাবে ভুলে গিয়েছে অনিমেষ। এক দিন যারা সব দিয়েছিল, অনিমেষ আজ তাদের কিছুই দিতে পারে না। সে বড় ব্যস্ত, জীবন ধারণের জন্যে বড় ব্যস্ত, সংসার পালনের জন্যে বড় ব্যস্ত। সে আর কাউকে কিছু দিতে পারে না। একটি নিমেষের জন্যে স্মৃতির কণিকা পর্যন্ত নয়। ভাবতে অবাক লাগে। ভাবতে অবাক লাগে, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কী এতই শত্রুতা? এতই দুস্তর ব্যবধান? কিন্তু আর যাকেই ভুলুক বাবাকে সে কী করে এমন নিঃশেষে ভুলে গেল? বাবার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তার প্রীতির সম্পর্ক—অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অথচ বাবার সে শেষ বয়সের, অন্তত মধ্য বয়সের সন্তান—প্রথম বয়সের নয়। বয়সের ব্যবধান সম্পর্কের ব্যবধান কত সহজে পার হয়ে এসেছিল অনিমেষ। গেঁয়ো মানুষ ছিলেন বাবা। এ কালের শিক্ষাদীক্ষা মোটেই তাঁর ছিল না। কিন্তু 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' পিতৃকৃত্য তিনি যেন অক্ষরে অক্ষরে মেনে ছিলেন। মিত্র করে নিয়েছিলেন পুত্রকে। এমন কথা ছিল না যা তিনি অনিমেষের কাছে না বলতেন। ঠাকুরমা মাঝে মাঝে ধমক দিতেন, 'অভয়, তোর দুঃখ-দুর্দশার কথা অতটুকু ছেলে কি বুঝবে? কেন ওসব বলে বলে ওর মন খারাপ করে দিচ্ছিস।'

তিনি বলতেন, 'অতটুকু কোথায় দেখছ পিসীমা? ও যে একেবারে বুড়ো হয়ে জন্মেছে। জান নাম ধরে ডাকলে ছেলে কাছে আসে না, বাবা বলে ডাকলে তবে সাড়া দেয়!'

তা ঠিক। বাবা তাকে বাবা ছাড়া আর কিছু বলে ডাকতে জানতেন না। তিনি যখনই অনিমেষের

নাম ধরে ডাকতেন, তার মনে হত তিনি রাগ করেছেন। ছেলেবেলায় 'বাবা' ছাড়া বাবার মুখে অন্য কোন ডাক মোটেই তার মনঃপূত হত না। আশ্চর্য, নিজের ছেলেকে সে অমন করে আদর করতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা করে অনিমেষের।

হয়তো এত আদর সোহাগের কারণ ছিল। পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে হয়ে মারা যাওয়ার পর অনিমেষকে পেয়েছিলেন তিনি। ঠাকুরমা বলতেন, 'তুই আমার অভয়ের মনে কষ্ট দিস নে রে। তুই তার আরাধনার ধন।'

শেষ দিন পর্যন্ত তাকে আরাধনার ধন করেই রেখেছিলেন বাবা। কিন্তু অকৃতজ্ঞ অনিমেষ, তাঁর কোন স্মৃতিই ধরে রাখতে পারে নি। এমন কি তাঁর আকৃতি-প্রকৃতির কিছুই তার মধ্যে নেই। অনিমেষ তার বাবার মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ পায় নি, পৌরুষ পায় নি, তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধি, বাকশক্তি কিছুই পায় নি। মাত্র নিম্ন প্রাইমারী ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যা ছিল তাঁর, সামান্য মুহুরিগিরি ছিল পেশা, কিন্তু কী অসাধারণ বুদ্ধি ক্ষমতা আব আত্মপ্রত্যয়ে তিনি সমস্ত তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে উঠেছিলেন! আশেপাশের বিশ-পঁচিশখানা গাঁয়ের সবাই তাঁকে জানত, মানত। ধীমান বুদ্ধিমান হৃদয়বান বলে মানত। নিশ্চয়ই এক দিনে সব হয় নি। বহু বছরের পরিশ্রম আর কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি এই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বালক বয়স থেকে যেভাবে দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি যুঝেছিলেন এবং পরিণত বয়সে যে সাফল্য তিনি পেয়েছিলেন, তা অনিমেষের পক্ষে ধারণা করাও কঠিন।

আশ্চর্য বাবার সে কিছুই পায় নি। কিছুই যে অনিমেষ পায় নি, পাবে না তা যেন তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। অনেক আরাধনার পর ধন মিলল বটে, কিন্তু সে ধন থলির একেবারে তলায় পড়ে থাকে, সে মুদ্রা বাজারে চলে না। প্রকাণ্ড পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর যে পুত্র মিলল, সে বড় হয়ে যাবজ্জীবন তাঁকে নৈরাশ্যে দগ্ধ করল। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, অনিমেষ তাঁকে কিছুমাত্র আশান্বিত করতে পারে নি। না স্কুল-কলেজের পরীক্ষার ফলে, না অর্থ রোজগারে, না আত্মবিকাশের অন্য ক্ষেত্রে। তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাস অনেকবার কানে গেছে অনিমেষের। তাঁর দুটি বুদ্ধি-উজ্জ্বল চোখের বিষণ্ণতা বহুদিন চোখে পড়েছে। বাবার ওপব যদি কোন বিরূপতা অনিমেষের এসে থাকে, শুধু এই জন্যে। তাঁর বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিন্ততাব নিধি হতে পারে নি বলে অনিমেষের যেমন অতিরিক্ত লজ্জা ছিল, ভয় ছিল, ক্ষোভ ছিল—তেমনি প্রবল আক্রোশও ছিল বাবার ওপর।

সেই গোপন আক্রোশই কি মৃতকে এমন করে সরিয়ে দিয়েছে? তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, অনিমেষ তাঁর কাছে বার বার হেরেছে। সে প্রতিযোগিতা অতি প্রচ্ছন্ন ছিল। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী কেউ বলে নি, অনিমেষ বাপকা বেটা হয়েছে।

তাই কি তাঁর মৃত্যুর পর অনিমেষ তাঁকে ভুলে গিয়ে সেই পরাজয়ের শোধ নিয়েছে? ছিঃ, তা কেন হবে! বাবার সঙ্গে অনিমেষের কি তেমন কোন বিরোধ-বৈরিতার সম্পর্ক ছিল? মোটেই তা ছিল না। বরং একদিকে গভীর স্নেহ আর একদিকে পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার বন্ধনেই তারা চিরদিন আবদ্ধ রয়েছে। অনিমেষের আয়ুষ্কালের যে চব্বিশ-পঁচিশ বছব তিনি বেঁচেছিলেন, অনিমেষ তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বাদ-প্রতিবাদ করেছে, তাঁর মত-পথেব রুচি-আদর্শেব বিরোধিতা করেছে, এমন কথা অনিমেষের বিশেষ মনে পড়ে না। এদিক থেকে তাদের সম্পর্ক এক হিসেবে আদর্শ সম্পর্ক ছিল। বাপ-ছেলের কত তিক্ত সম্পর্কই তো দেখেছে অনিমেষ! অবাধ্য দুর্বিনীত ছেলেকে বাপ বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছেন, ছেলে বাপের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভেংচি কেটেছে, বাপকে লাঠি মেরেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অর্থ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি নিয়ে, এমন কি নারী নিয়েও পিতাপুত্রের মধ্যে কত শত্রুতার কথা শুনেছে অনিমেষ। বাপ-ছেলেই হোক, স্বামী-স্ত্রীই হোক আর ভাই-বন্ধুই হোক—যে কোন সম্পর্কই পড়ে পাওয়া সম্পর্ক নয়, তিলে তিলে দুজনে মিলে গড়ে তোলা সম্পর্ক। সে মধুব সম্পর্ক বাবার সঙ্গে অনিমেষ গড়ে তুলেছিল। কথান্তর মতান্তর, যা তাঁর সঙ্গে অনিমেষের হয়েছে, তা সামান্য। গাঁয়ের বাড়িতে চা খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, অনিমেষ কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে চায়ের পাট বসিয়েছে, কাকীমাকে দিয়ে গোপনে গোপনে চা তৈরি করে খেয়েছে। বাবা সেটা পছন্দ করেন নি। নিজে যদিও তামাকেব নেশায় মশগুল ছিলেন, তবু কঠিন-নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'ওসব নেশা-ফেশা এখানে চলবে না!' কিন্তু অনিমেষ চালিয়েছে।

এমনি ছোটখাটো বিদ্রোহ আর অবাধ্যতা। এর চেয়ে বড় রকমের কোন ভাঙচুর করবার, অদল-বদল করবার শক্তি অনিমেষের ছিল না। সেই প্রবণতারই অভাব ছিল তার মধ্যে। এখনো আছে। বড় রকমের কিছু গড়বার, বড় রকমের কিছু ভাঙবার শক্তির অভাব এখনো অনুভব করে অনিমেষ। নিজেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেখে কোত্থেকে এল এই অক্ষমতা? সে কি এল সেই বাল্য-কৈশোরের অতি বাধ্যতা, অতি আনুগত্য থেকে, না কি এর মূল আরও কোন দুর্জ্ঞেয় গোপন রহস্যের মধ্যে নিহিত? একজন ব্যক্তি কেন যে সেই বিশেষ ব্যক্তিরূপটিই পেল, কেন একটু অন্য রকম হল না, তার মোটা মোটা কারণগুলি সাদা চোখে দেখা গেলেও অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিকড় আছে, যা দুর্নিরীক্ষ্য। সব দেখা যায় না বলেই, সব নিজের মুঠিতে শক্ত করে ধরা যায় না বলেই মানুষ শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টবাদী হয়—তাবিজ, কবচ, কবকোষ্ঠীতে বিশ্বাস করে। অনিমেষ এখনো তত দূরে পৌঁছয় নি। এখনো আত্মচরিতের মূল নিজের মধ্যে আর কাছাকাছি পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে মাঝে মাঝে সন্ধান করে। উৎস সন্ধানের জন্যে এখনো সে যাত্রা শুরু করে নি। আত্মচরিত আর সেই চরিতের অধ্যয়নের জন্যই পিতৃ-চরিতের অনুধ্যান। কিন্তু শুধু বাপই বা কেন, বাপ-মা, জেঠা-খুড়ো, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা আরও উর্ধ্বতন পুরুষানুক্রম, আবার অবতরণিকার নীচের ধাপগুলিতে ভাই-বন্ধু স্ত্রী-পুত্রের দলও বসে আছে। অনিমেষের অস্তিত্বের চিত্রপটে তাদের দশ আঙুলের ছাপও কি দেখা যায় না? কারো আঙুলের ছাপ, কারো নখের আঁচড়? তার কোনটি ম্লান অস্পষ্ট, কোনটি বা জ্বলজ্বল করে। অনিমেষ যে অনিমেষ, তার জন্যে অসংখ্য লোক, অসংখ্য ঘটনাতরঙ্গ দায়ী। তার উৎপত্তির, স্থিতি-বৃদ্ধি, ক্ষয়ের হেতু অনেক। সে একযোনি সম্ভব নয়। আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে সে নিজের জন্যে শুধু নিজেই দায়ী। অন্তত প্রধানত দায়ী। সাবালক হওয়ার পর থেকে সেই গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্র আর সমাজ তার একার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আর অনিমেষ নিজেও তা বহন করতে চায়। তার যত দৌর্বল্যই থাকুক, নিজের দায়িত্ব সে আর কারো কাঁধে চাপাতে চায় না। না আর্থিক, না পরমার্থিক। তাতে পৌরুষের হানি, তাতে স্বত্বের বিলোপ।

এই দায়িত্ব নিয়েই বাবা মাঝে মাঝে আশঙ্কা জানাতেন। বলতেন, 'জগৎ-সংসারের কিছুই জানলি নে, শিখলি নে, বুঝলি নে, তুই যে কী করে চলবি, কী করে দাঁড়াবি, আমি তাই ভাবি! আর কিছু না হোক, নিজের একটি সংসার তো হবে, তার দায়িত্ব তো নিতে হবে!'

একটু চুপ করে থেকে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজতেন, সমস্যার ক্ষীণ সমাধান খুঁজে বার করতেন। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলতেন, 'আমার যেটুকু যা আছে, তাই নেড়েচেড়ে খেও। ওতেই তোমার কুলিয়ে যাবে। অবশ্য তার জন্যেও বুদ্ধি থাকা চাই। বুঝে খাবার বুদ্ধি থাকা চাই। এই বুদ্ধির অভাবে এক পুরুষের সম্পত্তি আর এক পুরুষে এসে কর্পূরের মত উবে যায়, এমন কত দেখেছি!'

এই চূড়ান্ত অবিশ্বাসের কোন প্রতিবাদ করত না অনিমেষ। আহত হত, কিন্তু আঘাত করত না। শুধু মনে মনে বলত, 'চাই নে, চাই নে আপনার কিচ্ছু—আমি চাই নে।'

ঘটনা বিপর্যয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব না হোক, বিভাজনে সেই না চাওয়াটাই অদ্ভুতভাবে ফলে গেল। এখন আর চাইলেও পাবে না অনিমেষ। সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি পাকিস্তানে ফেলে আসতে হয়েছে। কিছুই ভোগদখলে আসে নি।

বাবার ক্ষেত্র থেকে সে সম্পূর্ণ সরে এসেছে। যেখানে তাঁর নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে আর অনিমেষ নেই। থাকলে পিতৃকীর্তিকে সে হয়তো এখনো প্রত্যক্ষ করত, নানা প্রসঙ্গে পিতৃনাম তার কানে যেত, গ্রাম অঞ্চলে এখনো তাঁর কালের মানুষ যাঁরা আছেন, যাঁরা তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন, কি তাঁর কাছে অনুগৃহীত ছিলেন, এমন অনেকের মুখে বাবার কথা শুনতে পেত অনিমেষ। প্রতিধ্বনি তুলতে পারত, নিজেই তাঁর স্মারক হয়ে সেই কৃতজ্ঞ স্বজন-বন্ধু-প্রতিবেশীদের স্মরণ-কীর্তনের কথা শুনতে পেত। কিন্তু এখানে তার কিছুই নেই। এখানে শুধু অনিমেষ আছে। আর সবাই অপরিচিত। অনিমেষের পিতৃনাম পরিচয় সম্বন্ধে অকৌতূহলী। বিনা কারণে বিনা প্রয়োজনে অনিমেষ জনে জনে ডেকে বলে বেড়াতে পারে না, 'আমার বাবা অমন ছিলেন, আমার বাবা তেমন ছিলেন।' লোকে তাকে পাগল বলবে। অথচ শুধু স্মরণ আর কীর্তন ছাড়া আর কোন প্রকারেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপায় নেই, সাধ্য নেই অনিমেষের। সাধ্য যদি কখনো হয়, প্রবৃত্তি হবে

কিনা সন্দেহ। লোক-দেখানো অনুষ্ঠানে তার আপত্তি। পিতৃস্মৃতি তার ব্যক্তিগত সম্পদ। তার মধ্যে দশজনকে টেনে আনতে সে পারে না। হ্যাঁ, স্মরণের প্রয়োজন আছে। এই স্মরণে শুধু অনিমেষেরই লাভ। স্মৃতির ভিতর দিয়ে ফের সেই মধুর শৈশব, বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনে পরিক্রমণ। ফের সেই স্নেহরসের স্বাদগ্রহণ। এই মধুর স্মৃতি না থাকলে, মানুষের রিক্ততার শেষ থাকে না।

স্মরণের মত কীর্তনের প্রয়োজনও স্বীকার করল অনিমেষ। সভা ডেকে নয়। সভা ডাকবার উপলক্ষ ক'জনের বেলায় বা ঘটে? কিন্তু স্মরণে-কীর্তনে সেইসব প্রিয়জনদের ফের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, যাঁরা আর নেই। যাঁরা নেই, তাদের ফের অস্তিত্ববান করে তোলা যায়।

অনিমেষের মনে পড়ল অনেক দিন সে তার মেয়েদের কাছে, স্ত্রী-পুত্রের কাছে, কি অন্য কোন আত্মীয়স্বজন পরিচিতজনের কাছে বাবার কথা বলে না, কাউকে তাঁর কথা বলতে শোনে না। অনিমেষ নিজেই নীরব হয়ে গেছে, আর কে বলবে?

হঠাৎ পিতৃকথা বলবার জন্যে ভারী আগ্রহবোধ করল অনিমেষ। কাঠ নয়, পাথর নয়, শুধু বাকমূর্তি প্রতিষ্ঠাই। তাব আয়ত্তের চিনু-মিনুর ফিরতে সেই সাড়ে নটা। সিনেমা মধ্যে। কিন্তু কার কাছে বলবে? আবতির আর দেখে ফিবে এসে কি শ্বশুরেব পুরনো কথা শুনবার মত মুড থাকবে? তারও থাকবে না, মেয়েদেরও থাকবে না। ওরা তখন খাবার টেবিলে বসে সদ্য দেখা সিনেমার গল্প নিয়ে আলোচনা করবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দক্ষতা-যোগ্যতা নিয়ে, পরিচালকের গুণাগুণ নিয়ে মা আর মেয়েদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হবে। অনিমেষের পিতৃচরিত সেখানে জায়গা পাবে না। তবে কি বুড়ী ঝি সারদাকে বাবাব কথা শোনাতে বসবে অনিমেষ? সারদা কানে কম শোনে। তা ছাড়া সারাদিনের খাটুনির পর সে এখন বসে বসে ঢুলছে। মনিব-মনিবানীব হুকুম সে এতক্ষণ তামিল করেছে, কিন্তু এখন ওব এত পরিশ্রমেব পব অভয় মজুমদাব নামে একজন অপরিচিত, বহুকাল ধরে মৃত ভদ্রলোকের স্মৃতিকথা ওর ওপর চাপিয়ে দিতে গেলে মহা অবিচার করা হবে। তবে কাব কাছে বলবে অনিমেষ? একটি যোগ্য শ্রোতাও কি সে পাবে না? নিজের মনে বিড়বিড় কবা ছাড়া তাব কি এই মুহূর্তে আব কোন উপায় নেই?

'বাবা!'

পাশেব ঘর থেকে শাণ্টু বেবিয়ে এল।

'আমাব পড়া হয়ে গেছে বাবা। পড়েছি, অঙ্ক কষেছি।'

অনিমেষ বলল, 'বেশ বেশ। আমি ভেবেছি তুমি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছ!'

শাণ্টু বলল, 'বাঃ রে, ঘুমাব কেন? আমি মা আর দিদিদের সঙ্গে খাব।'

অনিমেষ বলল, 'তুমি কি অতক্ষণ জেগে থাকতে পারবে? ওদের যে অনেক বাত হবে শাণ্টু!'

'হোক গিয়ে। আমি তোমাব কাছে বসে বসে ততক্ষণ গল্প শুনব। একটা গল্প বল না বাবা?'

শাণ্টু চেযারের হাতলে বসে অনিমেষের গলা জড়িয়ে ধরল।

অনিমেষ উল্লসিত হয়ে উঠল। ঠিক ঠিক। এতক্ষণে তো শ্রোতা মিলেছে! আশ্চর্য, শাণ্টুব কথা তো তার মনেই হয় নি। অথচ ওর চেয়ে যোগ্য শ্রোতা আর কে আছে? বাবার কথা শুধু নিজের ছেলেকেই বলতে পারে অনিমেষ। শাণ্টু জেনে বাখুক তার ঠাকুরদা কেমন ছিলেন। কি রকম ছিল তাঁর চবিত্র, আকৃতি-প্রকৃতি। কত গুণের আধাব তিনি ছিলেন। শুধু একজন নীরস বৈষয়িক মানুষই ছিলেন না, গান-বাজনায় তাঁব দক্ষতা ছিল, অভিনয় করতে জানতেন। বাবার সব কথা আজ ছেলেকে শোনাবে অনিমেষ। কিন্তু সহজ ভাষায় বলতে হবে, শিশুবোধ্য করে—তাব পক্ষে আকর্ষণীয় করে বলতে হবে। মনে মনে তার গুরুগম্ভীর পিতৃচরিত্রকে নিমেষের মধ্যে শিশু-সাহিত্যে ঢালাই করে নিল অনিমেষ। তার পর ছেলেকে বলল, 'গল্প শুনবে শাণ্টু?'

'হ্যাঁ বাবা।'

শাণ্টু অনিমেষের বুকের সঙ্গে মিশে উৎকর্ণ হয়ে রইল। অনিমেষ স্মিতমুখে স্নিগ্ধ স্বরে বলল, 'আমাব বাবাব গল্প তোমাকে শোনাই শাণ্টু, তিনি তোমার ঠাকুরদা। নাম জান তাঁর? বলেছি তো আগে, ভুলে গিয়েছ! অভয়েশ্বর মজুমদার। আব যেন ভুল না হয়। হ্যাঁ, তিনি খুব মজার মানুষ ছিলেন। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা—'

বাবার রূপবর্ণনা শেষ করে তাঁর কর্মজীবনের গুণ-যোগ্যতার গল্প শুরু করল অনিমেষ। অল্পবয়স থেকে তাঁর সেই জীবন সংগ্রামের কাহিনী, অল্পবিদ্যা নিয়ে শুধু অসাধারণ বুদ্ধি পরিশ্রম আর সততার জোরে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব--সব সহজবোধ্য ভাষায় অনিমেষ বলে যেতে লাগল। খানিক বাদে সে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বল তো শান্টু, কি রকম মানুষ ছিলেন তোমার দাদু? ওইরকম হতে তোমারও কি ইচ্ছা করে না? অমন বুদ্ধি, অমন সাহস—'

কিন্তু শান্টু কোন সাড়া দিল না। অনিমেষ ওর গায়ে হাত দিয়েই বুঝতে পারল ও ঘুমোচ্ছে। তার মনে হল, বাবার কোন কথাই হয়তো শান্টুর কানে যায় নি। না যাক, অনিমেষ তো বলতে পেরেছে! এই উপলক্ষে সে তো তার বাবাকে স্মরণ করতে পেরেছে!

তার মনে হল, এমনি করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেও হয়তো তার বাবার কাছে ঠাকুরদার গল্প শুনেছে। বাবা শুনেছেন তাঁর ঠাকুরদার গল্প। এমনি করে শোণিতের ধারার সঙ্গে ইতিহাসের ধারা বয়ে চলেছে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে আরতিরা ফিরে এল। কড়া নাড়ার শব্দে অনিমেষ উঠল না, ঝি এসে দোর খুলে দিল।

মেয়েরা পাশ কাটিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

আরতি একটুকাল অবাক হয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর হেসে বলল, 'ও কি, তুমি অমন স্ট্যাচু হয়ে বসে আছ কেন?'

ফাল্গুন ১৩৬৯

দুর্বল মুহূর্ত

ঝুল বারান্দায় পাশাপাশি নীচু বেতের চেয়ার পেতে দুই বোন চুপ করে বসেছিল। অনেকদিন বাদে ফের তারা একসঙ্গে বাপের বাড়ি এসেছে। যে বাড়িতে তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, ঝগড়া করেছে, ভাব করেছে, সেখানে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল খুব কমই হয়। স্বামী-পুত্র নিয়ে দুজনেরই এখন আলাদা আলাদা সংসার। মীরার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যে মায়া কিছু হতে দেয় নি। এবার সমস্ত বাধাবিঘ্ন পার হয়ে একটি ছেলে তারও কোলে এসেছে। মায়া এখন সেই ছেলে-অন্ত প্রাণ।

মীরা এই নিয়ে ছোট বোনকে ঠাট্টা করছিল, "খুব যে আপত্তি ছিল মা হওয়ার, এখন যে একেবারে ডবল মা হয়ে গেছিস; ছেলের বাবার দিকেও একটু চোখটোখ রাখিস। নইলে বেচারা হিংসেয় ফেটে মরবে। পুরুষরা বড় হিংসুটে হয়, জানিস তো? ছেলে-মেয়েকেও নিজের শরিক বলে মনে করে। পাওনা-গণ্ডায় এক তিল কম পড়লে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেয়।"

মায়া একটু হেসে বলল, "নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছ বুঝি দিদি? কিন্তু আমরা মেয়েরাই কি কম হিংসুটে?"

মীরা বলল, "নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিস বুঝি?"

এর পর দুজনে চুপ করে রইল। নীচের রাস্তা দিয়ে অনবরত বাস, লরী, ট্যাক্সী, কিছু বা প্রাইভেট কারও চলছে। তার শব্দে কান পাতা দায়। কয়েক বছর আগেও শহরতলীর এ অঞ্চলটা অনেক নিরিবিলি ছিল। এত লোকজন ছিল না, এত গাড়িটাড়ি ছিল না। রাস্তাটা অনেক সুদৃশ্য ছিল। দুদিকের সবুজ ডালপালা ছড়ানো গাছগুলি এমন ন্যাড়া শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না। ঋতুতে ঋতুতে তাদের রং বদলাত, রূপ বদলাত। পাতাগুলি মৃদু হাওয়ায় দুলত। ঝোড়ো হাওয়ায় আত্মরক্ষা করত। সামনের বড় পার্কটাও আজকাল আর বেড়াবার মত নেই। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। পুকুরের জলের রং দেখলেই বোঝা যায় তা ব্যবহারের অযোগ্য। তবু লোকজনের কমতি নেই। তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলেই এখনও এই পার্কে এসে ভিড় করে। এখন অবশ্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ আগে রাস্তার, ঘরের সব আলো নিভে

গেছে। বিদ্যুতের মিতব্যয়িতা চলছে শহরে। আরো কতক্ষণ এমন অন্ধকারে বসে থাকতে হবে কে জানে? বাবা-মা নাতি-নাতনীকে নিয়ে এক পুরোন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বেশি দূরে নয়। পাড়ার মধ্যেই। তবু হয়তো এই অন্ধকারের জন্যেই আসতে পারছেন না, কি যোগেশবাবু আসতে দিচ্ছেন না।

মায়া একটু বাদে বলল, "চল দিদি, এবার ভিতরে যাই।"

মীরা বলল, "তা তো যাবই। আমার কথার জবাব দিলি নে যে।"

মায়া বলল, "কোন কথার?"

মীরা তার আগের কথাটা ফের আস্তে আস্তে আওড়াল, "মেয়েরা যে হিংসুটে, তা কি করে জানলি?"

মায়া বলল, "এ কি আবার জানতে হয় নাকি?"

মীরা বলল, "না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমার কথার সরাসরি জবাব দে। কথাটা কি আমাকে দেখেই তোর মনে পড়ল?"

মায়া বলল, "ছিঃ দিদি, ওসব কী বলছ? তুমি কি আমাকে কারো চেয়ে কম ভালোবাস? তুমি কি আমাকে কিছু কম দিয়েছ?"

ছোট বোনের এই কৃতজ্ঞতায় একটু খুশী হল মীরা। হেসে বলল, "তুই বোধ হয় আমার সেই বদান্যতার কথা মনে করছিস! আমার যখন বিয়ে হল, আমি তোকে বলে দিয়েছিলাম, আমার সব তোকে দিয়ে গেলাম—মনে পড়ছে?"

মায়া চুপ করে রইল।

মীরা বলতে লাগল, "অবশ্য দেওয়ার মত তখন কী-ই বা আমার ছিল? সম্পদের মধ্যে ছিল আমাদের ঘরখানা, চেয়ার, টেবিল, বইপত্তর, জামাকাপড় রাখবার পুরোন আলমারিটা আর একটা ভাঙা হারমোনিয়াম আর বাবা-মার ভালোবাসা। সবই আমরা দুই বোনে ভাগাভাগি করে ভোগ করতাম। আমার বিয়ের পর ষোল আনা তুই-ই সব পেলি। তার আবার দায়ও চাপল তোর উপর। বদমেজাজী বাবা আর বাতের রোগী মা—তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা, ফাই-ফরমায়েস, রান্নাবান্না, ঘর সংসারের দায়িত্ব সবই তোর ঘাড়ে এসে পড়ল। আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে তোর সুখ্যাতি শুনতাম। বাবা যেদিনই যেতেন তোর প্রশংসা করতেন। কলেজে বেরোবার আগে তুই কি রকম কাজকর্ম সেরেটেরে যাস, মাকে কোন কষ্ট করতে দিস নে, কোনরকম মতলব করিস নে, তোর আলস্য নেই, গাফিলতি নেই,—বাবা পঞ্চমুখে তোর প্রশংসা করতেন। শুনে আমার একটু একটু হিংসে হত।"

মায়া বাধা দিয়ে বলল, "দিদি, ওসব কথা কেন বলছ, ওসব পুরোন কথা তুলে আর লাভ কি?"

মীরা বলল, "লাভ কিছু নেই। তবু পুরোন দিনের কথা মনে করতে মাঝে মাঝে বেশ লাগে। এমন কিছু পুরোন নয়। বারো-তের বছর হল। কিন্তু একেক সময় মনে হয়, যেন কতকাল হয়ে গেল। কোন কোন সময় মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। সব যেন আমার চোখের ওপর ভাসে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোর কাজকর্মের সুখ্যাতি শুনে হিংসে হত আমার; খুশীও হতাম আমি। যখন ছিলাম তুই ঘর-সংসারের কাজ বড় একটা দেখতিস্ নে, নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতি। পড়ার বই পড়তি, গল্পের বই পড়তি। কাজকর্মে ডাকলে বিরক্ত হয়ে উঠতি। বাবাকে এক কাপ চা পর্যন্ত করে দিতে তোর আলস্য ছিল। সেই তুই আমার বিয়ের পর এমন বদলে যাবি, এতখানি বুদ্ধি-বিবেচনা তোর হবে, এর চেয়ে আনন্দের কি আছে? একটু দুঃখ হত এই ভেবে, বাবা আমার কথা আর তুলতেন না, বলতেন না, 'মীরা তুইও ঢের করেছিস!' আমি করবই—এটা যেন ধরা কথা। তোর করাটাই অবাক হবার মত। পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মত। বাবা আমার কথা তুলতে বলতে ভুলে যেতেন। কিন্তু আমি ভুলতে পারতাম না। অবশ্য ভোলা উচিত ছিল। আমি স্বচ্ছল সংসারে পড়েছি। স্বামী উকিল। পৈতৃক বাড়ি আছে। পশারটসার মন্দ নয়। ঝি-চাকর আছে সংসারে, যদিও তাদের সাহায্য আমি বড় একটা নিই না।"

মায়া বলল, "তোর যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তোর মত আর সংসারে কজন?"

মীরা বলল, "ঠাট্টা করছিস খুব, না? রূপ না থাক এইটুকু শ্রীছাঁদ আছে বলেই প্রায় নিখরচায়

পার হয়েছি। নইলে বাবার কি তখন খরচপত্র করবার সাধ্য ছিল ? ব্যাঙ্কের চাকরিতে মোটা মোটা টাকার হিসেব রাখতেন। নিজে আর কী পেতেন ? তোর মত কলেজে পড়া বিদ্যে তো আমার ছিল না। কালো-কুচ্ছিত ছিলাম না বলেই, অমন করে পার হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু রূপের জোরে। অভিসম্পাতও কম নেই। পার হবার আমার ইচ্ছে ছিল না। পড়াশুনোর সাধ কিন্তু আমার ছিল। কিন্তু বাবার কড়াকড়ি কত বেশি তখন। থার্ড ক্লাসে উঠতে না উঠতেই বাবা আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। পাড়ার বকাটে ছোকরাদের কেউ কেউ পিছু নিত, শিস্ দিত, যা তা বলত। সে কি আমার দোষ ? বাবা তাদের শাসন করতে পারলেন না। আমাকে ঘরে আটকে রাখলেন। বললেন, বাড়িতে বসে পড়। প্রাইভেটে পরীক্ষা দাও। তাই কি আর হয় ? স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর সংসারের কাজের চাপ বাড়ল। মার অসুখেরও তখন খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আমার ভাগ্য।"

মায়া বলল, "দিদি, কেন ফের সেসব কথা তুলছিস ? তোর মত সৌভাগ্য আর কজনের ? জামাইবাবু তোকে কত ভালোবাসেন ?"

মীরা হেসে বলল, "আহাহা, নির্মল বুঝি তোকে ভালোবাসে না ? মাথার মণি করে রেখেছে। সুখ-শান্তি আমিও পেয়েছি, তুইও পেয়েছিস। তাই তো সেদিনের দুঃখটুকুর কথা আজ হাসতে হাসতে বলতে পারি। দুঃখ কিসের জন্য জানিস ? নিজেরই দোষ ত্রুটি দুর্বুদ্ধির জন্যে। সব আমি বলতে পারি।"

মায়া বলল, "তা হলে বল, তোর মুখ যখন এতই চুলবুল করছে !"

মীরা বলল, "চুলবুলই করছে বটে। সব আমি বলব। তার পর তোকে একটা কথা বলতে বলব। একটা অনুরোধ তোকে রাখতে বলব।"

মায়া বলল, "কী দরকার দিদি ওসব কথা তুলে ? সংসারে সবাইরই কিছু না কিছু গোপন কথা থাকে, তোরও যদি থাকে তো থাক না—আমি শুনতে চাই না।"

মীরা বলল, "কিন্তু আমি যে বলতে চাই। আমার যে মুখ বড্ড চুলবুল করছে !"

চুপ করে রইল মায়া। দিদি যখন নিজের দোষের কথা না বলে ছাড়বে না, বলুক। কী যে বলবে, কী যে বলতে চায় মায়া অবশ্য তা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারছে না, আর পারছে না বলেই মায়ার কৌতূহলও বেড়েছে। যদিও মুখে ঔদাসীন্যের ভাব করছে, গোপন কথা না বলবার জন্যে মিনতি করছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কানও খাড়া করে রেখেছে। যতক্ষণ বাচ্চাটা ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে না ওঠে, যতক্ষণ বাবা-মা ফিরে এসে সদর দরজার কড়া নাড়তে না থাকেন, যতক্ষণ ফের আলো জ্বলে না ওঠে, দিদি যা বলছে বলুক। মায়ার শুনে যেতে আপত্তি কি ? লাভ না থাকুক, ক্ষতি তো কিছু নেই। তার ক্ষতি আর সহজে কেউ করতে পারবে না। যেটুকু যা হবার, তা হয়ে গেছে।

মীরা বলতে লাগল, "তুই আমার রূপের কথা বলছিলি ? দেখতে একটু সুন্দর হবার জ্বালাও কম নেই, তা জানিস ? দুই ছেলের মা হলাম, বয়স তিরিশ পার হতে চলল, এখনো স্বাধীন ভাবে কোথাও বেরোতে পারি নে। শাশুড়ী পছন্দ করেন না। তোর জামাইবাবুও পছন্দ করেন না। বাইরের কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে আমার একটা কথা বলবার জো নেই, মেলামেশার জো নেই। তুই হাসছিস্ ? এদিক থেকে তুই বেশ আছিস্ !"

মায়া হেসে বলল, "আমার কতটি জানেন, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আমার পাছে পাছে কেউ হাঁটবে না, কাছে কেউ ঘেঁষবে না। ওসব দূরে থাকুক, কেউ তাকিয়েও বোধ হয় দেখবে না। আমাকে নিয়ে কারো ভয় নেই দিদি।"

মীরা বলল, "তোকে নিয়ে ভয় নেই, আর সংসারে আমিই বুঝি শুধু ভয়ঙ্করী ? তোর দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না এ কথা বলতে পারিস নে। একজন অন্ততঃ দেখেছিল। আমরা দুজনে পাশাপাশি ছিলাম, তবু সে শুধু তোকেই দেখেছে আমাকে দেখে নি। মনে আছে তার কথা ? সরোজদা—সেই সরোজ সোমের কথা মনে আছে তোর ? আছে যে তা আমি জানি।"

মায়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "তার জন্যে এখনো কি তোমার হিংসে আছে দিদি ? এতকাল বাদেও—"

মীরা বলল, "না, এখন আর কোন হিংসেটিংসে নেই। কিন্তু তখন ছিল। সত্যি কথা বলব, তখন

হিংসেয় আমার বুক ফেটে যেত। আমি দেখতে ভালো, আমার গড়ন সুন্দর, সংসারে আমি কাজকর্মও যথেষ্ট করি, সবাই আমার রান্নাবান্নার প্রশংসা করে। এমন কি সরোজদা এলে আমি তার বেশি যত্ন করতাম, খাবার করে দিতাম, চা করে দিতাম, নিজের ভাগের মাছখানা তাকে ভেঙ্গে খাওয়াতাম। কিন্তু এত করেও তার মন পাই নি। আমার সঙ্গে হেসে কথা বলত সরোজদা, কিন্তু সে তার নিতান্তই ভদ্রতার হাসি। অন্তরের হাসি যে তার কী, তা যখন তোকে দেখে সে হাসত, তোর সঙ্গে কথা বলত, আমি টের পেতাম। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, তোর মধ্যে সে কী দেখল ? তুই তখনো কত ছোট, বাবার ধমকানিতে সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছিস্, সে শাড়ীও ভালো করে পরতে শিখিস্ নি। তবু তোর সেই অগোছালো অপটু হাতের সাজসজ্জাই তাকে যেন বেশি মুগ্ধ করত। তুই তো গাদা গাদা নভেল পড়েছিস, সেই সব নভেলের গল্প নিয়ে তুই তার সঙ্গে আলাপ করতিস। এর চেয়ে এমন কি বেশি গুণ তোর ছিল, আমি ভেবে পেতাম না। তোর দেখাদেখি বই আমিও পড়তে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সারা দিনের খাটুনির পর বই নিয়ে শুলেই আমার কেমন ঘুম পেত। তা ছাড়া বানানো গল্পে আমি কোন রস পেতাম না। আমি রান্না করতে ভালোবাসতাম, ঘরদোর সাজাতে গুছাতে ভালোবাসতাম, বুনতে ভালোবাসতাম। একটু গাইতে-টাইতেও পারতাম। বাবা তো আমাকেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হারমোনিয়মটা কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাকে শোনাব গান ? আমার গুণ যোগ্যতা কাকে দেখাব ? বাবা কী যে কড়া ছিলেন, তা তো জানিস—তাঁর ভয়ে পাড়ার ছেলেরা কেউ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারত না ! যদি বা ঢুকত, বসতে পারত না। আপন জ্যাঠতুতো খুড়তুতো মামাতো পিসতুতো ভাইটাই তো আমাদের ছিল না। যারা দূর সম্পর্কের ছিল, বাবা তাদের কাছে ডাকেন নি। এত বাধা-নিষেধ কড়া পাহারার ভিতর দিয়ে সরোজদা কী করে ঢুকল সেই এক আশ্চর্য। বাবার ব্যাঙ্কেরই সাধারণ কেরানী। কতই বা তখন মাইনে পেত—ষাট সত্তর টাকার বেশি নয় ! প্রথম প্রথম অফিসের কাজকর্মের ছুতো ধরেই আসত। বিনীত অনুগত ছেলে। বাবা ছিলেন ওপরওয়ালা। অ্যাকাউনট্যাণ্ট। তিনি ভাবতেন তাঁর মন যুগিয়ে চাকরির উন্নতিই তার লক্ষ্য। কিন্তু আমি ভাবতাম—থাক, সে কথা আর বলে কি হবে ? আমার ভুল ভাঙতে দেরি হল না। ভুল তো নয়, যেন জীবনটা ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল। তখনকার কষ্টের কথা ভাবলে আজ হাসি পায়। আমি বুঝতে পারলাম সে তোর জন্যেই আসে, যদিও আমার সঙ্গেও হেসে কথা বলে, আমার হাতের চা খায়, আমার সঙ্গেও বন্ধুর মতই ব্যবহার করে। বন্ধু ! মেয়েবন্ধু আমাদের অনেকেই ছিল, কিন্তু ছেলেবন্ধু সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিয়ের পর আমি তোকে সব দিয়ে এলাম। আমার কত কি সাধের জিনিস, সখের জিনিস, অল্পদিন আগের কেনা শাড়ী দু-একখানা, অল্পদামের গয়না—সব তোকে ধরে দিয়ে এলাম। শুধু প্রাণ ধরে দিতে পারলাম না একজনকে। অথচ ছেড়ে আসতে হল। আসব না কী করব ? তুই তাকে আগেই কেড়ে নিয়েছিস ! সে আমার বিয়ের সময় খুব কোমর বেঁধে খাটল। আমার মাসতুতো ভাইদের সঙ্গে আল্পনা দেওয়া বিয়ের পিঁড়ি ধরে আমাকে বরের চারপাশে ঘুরাল। আমি বাধ্য হয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলাম। একেকবার ইচ্ছে হচ্ছিল, একেবারে ছেড়ে যাওয়ার আগে, শেষবারের মত শক্ত করে চেপে ধরি। ও বুঝুক, ও কষ্ট পাক ! যার মনে আমি কোন কষ্ট দিতে পারলাম না, তার দেহকে কষ্ট দিই। চিরদিনের জন্যে নয়, শুধু একটি মুহূর্তের জন্যে ও আমার কাছে দুর্বল হোক, ওর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসুক। কিন্তু পারলাম না, লজ্জা করল। শুধু আলগোছে একটু ছুঁয়ে রইলাম। সেই ছোঁয়াই আমার শেষ ছোঁয়া।

তুইও আশেপাশে ছিলি তার পাশে পাশে ছিলি, তোর কী আনন্দ ! শুধু কি দিদির বিয়ে বলেই ? তুই তার সঙ্গে কথা বলছিলি হাসছিলি, মাঝে মাঝে এটাওটা এগিয়ে দিচ্ছিলি, নিচ্ছিলি। তোর পরনে দামী শাড়ী গায়ে গয়না। আমার বিয়ে—তোকে তো বাবা একেবারে নিরুগুলা রাখতে পারেন না ! তোর খোঁপায় বেলফুলের মালা পরানো। মনে হচ্ছিল তোরও যেন বিয়ে। আমার লোক দেখানো বিয়ে—তোর লোক না দেখানো বিয়ে। আমার মনে হচ্ছিল বাবা-মা যেমন আমার বিয়ে দিচ্ছেন, তেমনি আর একটি ভাবী-দম্পতি আমার বিয়ের উৎসবে মেতেছে। আমার বিবাহবাসরটা আসলে তাদেরই মিলন-বাসর। আমার বিয়েটা উপলক্ষ, আসলে উৎসবটা তাদেরই।

শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম। সেখানে বাড়িভরা লোকজন, আদর-আপ্যায়ন, হাসি-ঠাট্টা কত কি।

একজনের কথা ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগে ? আস্তে আস্তে ভুলে যেতেও লাগলাম। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ত। তোর কথা মনে হলেই মনে পড়ত। বাবা-মা কি আর কেউ এ বাড়ি থেকে গেলে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোদের কথা জিজ্ঞেস করতাম। হ্যাঁ, সে এখনো আসে। এখন আরো বেশি করে আসে। তোর সঙ্গে বসে হাসে, গল্প করে, তোর পড়াশুনায় সাহায্য করে। আরো অনেক কিছু করে বলে আমি ধরে নিতাম। এখন আর কোন বাধা নেই। বাবা-মা কি আর একটা বাধা ? তাদের ঝাপ্‌সা চোখকে ফাঁকি দিতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত ছিল, সে সরে এসেছে। এ বাড়িতে এসেও তাকে কতবার কতদিন দেখেছি। তার সঙ্কোচ অনেক কমে গেছে। সে অনেক সহজ স্বচ্ছন্দভাবে এ বাড়িতে চলাফেরা করে। আমাকে সে নতুন নামে ডাকে, বলে মীরাদি। আমার চেয়ে বয়সে সে ছোট নয়। দু-এক বছরের বড়ই বরং হবে। তবু আমি তার দিদি হয়ে গেছি। কোন্ সম্পর্কে যে দিদি, তা আমার বুঝতে বাকি থাকে না। আমি টের পাই, আর ভিতরে ভিতরে আমার বুক জ্বলে যায়। অথচ নিজের মনকে আমি ধমকাতে ছাড়ি নে। এ আমার অন্যায়, ভারী অন্যায়। আমি স্বামী পেয়েছি, সংসার পেয়েছি, সবাইর আদর-যত্ন পেয়েছি—আমার তো না-পাওয়া কিছু নেই, অপূর্ণ কিছু নেই। তবু আমার এ কি কাঙালপণা ? এ কি হিংসুটেপণা ? আমি আমার নিজের মনকে ধমকাই। কিন্তু ধমকালে কি হবে ? যাকে ধমকাই, সে যেন আমার দুষ্টু ছেলের মত। সে ভিতরে ভিতরে জানে, আমি তাকে খুব ভালোবাসি। খুব—খুব। তাকে এই শাসন আমার ভালোবাসার শাসন।

তার পর সরোজের চাকরির উন্নতি হতে লাগল। তুইও একটার পর একটা পাস করে বিদুষী হয়ে উঠলি। সংসারে আমিও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। বিয়ের বছরখানেক বাদেই মা হয়েছিলাম। দু বছরের মাথায় শাশুড়ী শয্যা নিলেন। তিনি থাকতেই আমি গিন্নী-মা হলাম।

আরো দু বছর বাদে বাবার মুখেই হঠাৎ শুনলাম প্রস্তাবটা। বাবা আমার টালিগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতে গেলেন। আমি যত্ন করে খাবারটাবার করে দিলাম। বাজারের খাবার আমি কখনো তাঁকে এনে খাওয়াই নি। তোর জামাইবাবু বাড়ি ছিলেন না, আমার শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে বাবা আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। এখন আমি বাবার সমান সমান হয়েছি। তিনিও সংসারী, আমিও সংসারী। এখন সংসারের পাঁচটা ভালোমন্দ বিষয় সম্বন্ধে আমিও তাঁকে পরামর্শ দিতে পারি। তিনি আমার পরামর্শ নেনও। শুধু পরামর্শ নয়, তোকে বলতে বাধা নেই, ঠেকলে পঞ্চাশ, শ, দেড়শ, দুশ পর্যন্ত ধার নেন। কিন্তু তাঁকে যা দিই, তা কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় ? বাবা মার কাছে মানুষের ঋণ কি কোনদিন শোধ হয় ? তোর জামাইবাবু সবই জানেন। তাঁকে আমি কিছুই লুকোই না। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, এসব ব্যাপারে তাঁর মন খুব উদার। হ্যাঁ, এ কথা সে কথার পর বাবা আস্তে আস্তে আসল কথাটা তুললেন। একটু কেসে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে মীরু, আমাদের মায়ার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে কেমন হয় ?'

আমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। বললাম, 'কার সঙ্গে ?'

বাবা বললেন, 'ওই যে, ইয়ে, আমাদের সরোজ—'

আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম।

মুহূর্তের জন্যে আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার দম আটকে আসতে লাগল। তার পর একটু বাদে বললাম, 'ছি বাবা, ছি।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন রে ? দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়, অবশ্য কুলীন-কায়স্থ নয়, কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি কানেকশনস সব ভালো। ছোট সংসার। বাপ-মা আছে, আর একটি বোন আছে। বিয়ে হয়ে গেলেই গেল। মায়া যে ধরনের মেয়ে ওর এই রকমই সুবিধে। তোর মত বড় সংসার সামলাবার কি শক্তি আছে ওর ?'

আমি বললাম, 'না। এ সম্বন্ধ কিছুতেই হতে পারে না।'

বাবা বললেন, 'কেন রে ? ছেলেটি কিন্তু কাজকর্মেও ভালো। গোপনে গোপনে পরীক্ষা-টরীক্ষাও দিচ্ছে। ও কালে কালে একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে যাবে, দেখে নিস।'

আমি বললাম, 'সেইটাই কি সব ? কাজকর্মে ভালো হলেই ভালো হল ? স্বভাব-চরিত্র দেখবে

না ? যার হাতে মেয়েকে দিচ্ছ, সে মানুষটি কেমন, তা একবার খোঁজ নিয়ে দেখবে না ?'
বাবা বললেন, 'এতদিন ধরে দেখছি, মানুষ তো ভালো বলেই মনে হয়। তবে ওরা বোধ হয় একজন আর একজনকে বেশ পছন্দ করে—তা আজকাল এই তো যখন ফ্যাশান হয়েছে—'
বাবার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। ফোকলা দাঁতে তিনি হাসলেন। তাঁর সেই হাসি দেখে আমার গা জ্বলে গেল। বুক পুড়ে গেল। আমার বেলায় তাঁর এই উদারতা কোথায় ছিল ? আমি কি কোন ফ্যাশান-ট্যাশনের কথা জানি নে ? আমি কি এ কালের মেয়ে নই ? আদ্যিকালের বুড়ী ?
উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলাম। তার পর বাবার আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললাম, 'বাবা, ওই পছন্দটাই সব নয়। অমন পছন্দ সে আরো অনেককে করেছে !'
বাবা আঁতকে উঠে বললেন, 'কার কথা বলছিস, আমাদের সরোজ ?'
বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, তার কথাই বলছি। মিটমিটে একটি শয়তান। অনেক কাণ্ডকারখানা করেছে সে। আমি খোঁজ নিয়ে জানি। পাড়ায় পাড়ায় একটি করে তার—কত আর শুনবে ?'
বাবা যেন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটু বাদে বললেন, 'বলিস কি ? আমি তো এর আগে কিছু শুনি নি ! অনেকে অনেকের নামে মিছিমিছি অবশ্য আজেবাজে কথা রটায়,—কোন প্রমাণ-টমান কি কিছু পেয়েছিস ?'
আমি বিপদে পড়লাম। প্রমাণ তো কিছু নেই ! কোন একটা মেয়ের নামটাম পর্যন্ত মনে আসছে না। তাই যে কুচুটে মেয়েটাকে আমি সবচেয়ে বেশি করে জানি, আমি তার নামই বলে দিলাম।
বললাম, 'প্রমাণ ? এসব কাজ কেউ কি প্রমাণ-পত্র রেখে করে বাবা ? তবু একটি প্রমাণ আমার হাতে আছে।'
বাবা কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আছে ? কই দেখি !'
আমি একটু চুপ করে রইলাম। একটু আটকে গেল কথাটা।
বুকের ভেতরটা দুর দুর করে উঠল। স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর করি। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই তাকে আটকে রাখতে পারলাম না। সেই অকথ্য মিথ্যেটা আমার মুখ থেকে অবলীলায় বেরিয়ে এল, 'তোমাকে কি বলব বাবা, মেয়ে হয়ে কি সব কথা বলা যায় ? সে আজও আমার পিছু ছাড়ে নি—আজও আমায় জ্বালায় !'
বাবা বললেন, 'তুই কি সত্যি বলছিস ? কী সাংঘাতিক। আমি তো ধারণাই করতে পারি নি—'
'আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি বাবা।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে হাতও দিলাম।
সেই মুহূর্তে সেই বানানো সত্যকে খাঁটি সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্যে আমি মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। তোকে বলব কি, সে মুহূর্তে এর চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে আর কিছু ছিল না।"
মীরা থামল।
অন্ধকারে দুই বোন ফের কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মায়া কোন কথা বলতে পারল না। সেই পুরোন আঘাত যেন তার বুকে ফের এসে লেগেছে। একটা প্রচণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক ঢেউ এসে তার বুকের পাঁজরা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। এইজন্যেই বাবা প্রথমে সায় দিয়ে তার পরে ঘোরতর অমত করেছিলেন। হয়তো গোপনে ডেকে সরোজকে অপমানও করে থাকবেন। তাই সে হঠাৎ আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। নিজের চেষ্টায় বদলী হয়ে চলে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌতে। ভীরু ছিল বই কি সরোজ। ভীরু আর অভিমানী। মায়াও তাকে এমন ভরসা কখনো দেয় নি যে সে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে। কী জানি আরো কি কি হয়েছিল। সরোজ আর ফিরে আসে নি। কোন যোগাযোগ রাখে নি। তার পর- -সেই প্রথম প্রেম, প্রথম বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর মায়া বিয়ে করেছে। বাবা-মা আর দিদি জামাইবাবু দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের অর্ধেক খরচ যুগিয়েছে দিদি। নিজের দামী দামী গয়নাগুলি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গয়নায় কি সব শোধ হয় ? সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ?
মীরা খানিক বাদে ফের কথা বলল। হেসে বলল, "এতদিন বাদে ফের সেই সব কথা মনে পড়ল কেন জানিস ? আজ বাসে আসতে দেখলাম সরোজকে। একই বাসে আসছিলাম। আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। পাশে একটি বউ। এমন কিছু সুন্দরী নয়। আমার চেয়ে তো কালোই, তোর

চেয়েও কালো, কিন্তু দেখে মনে হল সরোজ খুব সুখী। সাদা-কালোয়, সুন্দর-কুচ্ছিতে কিছু এসে যায় না। বউ বউ, স্বামী স্বামী! আমরা সবাই সুখী হবার জন্যই জন্মেছি। দেখলাম বউয়ের কোলে একটি বাচ্ছা, সরোজের কোলেও একটি। স্ত্রীর সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছে। একেবারে সুখে বিভোর। আমার দিকে একবারও তাকাল না। ইচ্ছা করেই না দেখবার ভান করল কিনা কে জানে?"

মীরা একটু থামল। তার পর ইতস্তত করে ফের বলল, "এক কাজ কর মায়া। তাকে একবার আসতে বল। এখন সবাই আমরা স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসারী। এখন আর আসতে বাধা কি? কিন্তু আমি ডাকলে আসবে না। তুই ডাকলে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। এলে কী করব? না, তোর কাছে যেমন সব বললাম, তেমন করে সব খুলে বলতে পারব না। সে না হয় তুই-ই তাকে আড়ালে ডেকে বলে দিস। আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও পারব না। হাতে ধরেও ক্ষমা চাইতে পারব না। অত নাটুকেপনা আমার ধাতে নেই। তবু কেন যে ডেকেছি তা সে বুঝতে পারবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, ক্ষমা চাইবার জন্যেই ডেকেছি। ক্ষমা ছাড়া আর কী-ই বা এখন চাইবার আছে? ডাকবি মায়া? লক্ষ্মী বোনটি, ডাকবি?"

মীরা বুঝি ওর হাত ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়া সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল, "ছেলে কাঁদছে দিদি। যাই এবার ঘরে যাই।"

মায়া উঠে ভিতরে চলে গেল। ওর ছেলের কান্না কিন্তু মীরা শুনতে পেল না।

একই চেয়ারে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার পর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, "ইস, সেই যে সব নিভে আছে তো আছেই। আলোটা এবার জ্বলে উঠলে বাঁচি বাবা।"

বৈশাখ ১৩৭০

ফিরে লেখা

আজ আবার তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। নতুন চিঠি নয়। তিন মাস আগের লেখা হারিয়ে যাওয়া সেই চিঠিখানার কপি তোমাকে পাঠাব। তুমিই চেয়েছ। যে সামান্য কটি চাওয়ার কথা তোমার শুনেছি তার মধ্যে এও একটি। তোমার সর্বশেষ চাওয়া, আমার সর্বশেষ পাওয়া। শুনেছি অনেক বড় বড় নামকরা লোক তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেরও কপি রেখে তবে তাকে দেন। তাই কোন চিঠি যদি তাঁদের হারায় বিশেষ ক্ষতি হয় না। এক কপি ডেড লেটার অফিসে চলে যায় আর এক কপি নিজের ড্রয়ারে থাকে, কারো চিঠি বা ছাপা হয়ে অমরত্ব পায়। কিন্তু আমি তো তেমন কেউ নই। তোমার কৃতী বন্ধুদের মতো আমি কোন লেখকও নই, শিল্পীও নই, ছাত্র-নেতা নই, জননেতাও নই। আমি নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ। শুধু সাধারণ। কি তার চেয়েও কম। আচ্ছা, যে সাধারণের চেয়েও এককাঠি নীচে তাকে কি অসাধারণ বলা যায় না?

তুমি কি আমার কথাগুলিকে বিনয় বলে ধরে নিচ্ছ? তোমার কি ধারণা এই সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে এসে আমি হঠাৎ কণ্ঠী পরেছি, ফোঁটা তিলক কেটে বৈষ্ণব হয়েছি? তা হই নি। বিনয় বিদ্বানকে মানায়, গুণীকে মানায়। যে কিছু নয়, বিনয় বোধ হয় তার পক্ষে সবচেয়ে বেমানান। তার পক্ষে মানানসই হল ঔদ্ধত্য, অতি রুক্ষতা। পরুষতার মধ্যেই তার পৌরুষ, তার পুরুষার্থ। কিন্তু আমার এমনই স্বভাব, শূন্য পাত্র হয়েও ঝঙ্কার দিতে পারি নে। ভেঙে পড়বার সময়েও ঝনঝন করে উঠি নে। কিন্তু উঠলে হত। আশেপাশের কয়েকজনের কান ঝালাপালা করে দিয়ে তার পর না হয় চিরনীরব হয়ে যেতাম। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয় কি জান? ইচ্ছে হয় একেবারে অন্য কেউ হতে।

এ তত্ত্বের কথা তুমি নিশ্চয়ই জান—আমরা এক একজন আসলে একজন নই, বহুজনের সমষ্টি। একজনের মধ্যে নানাজনের আনাগোনা। অন্তত একাধিক বিপরীত ব্যক্তিত্ব একই মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু আমি বোধ হয় এর ব্যতিক্রম। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম।

কিন্তু কী লিখতে গিয়ে কী লিখছি! প্রতিশ্রুতি রাখছি না তো। সেদিন কি এসব কথা লিখেছিলাম? মনে হয় যতদূর—না, একেবারেই না। সেদিনের চিঠিতে এই বর্ণমালা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু এই বাক্যগুচ্ছ ছিল না।

কাজটা যত সহজ ভেবেছিলাম, এখন আর তত সহজ মনে হচ্ছে না। ভেবেছিলাম নোট মুখস্থ করে করে গোটাতিনেক পরীক্ষা তো পাস করেছি, আর নিজের লেখা একখানা চিঠি ঝাড়া মুখস্থ লিখে দিতে পারব না? এখন দেখছি ব্যাপারটা বেশ কঠিন। বানিয়ে লেখার চেয়ে মুখস্থ লেখার কাঠিন্য কোন কোন সময়ে বেশি।

কেন লিখতে পারছি নে বল তো? না, স্মৃতিদৌর্বল্য আমার আসে নি। তুমি যত কথা বলেছ আমার সব মনে আছে। এমন কি কলেজের ইলেকশনের সময় তোমার নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি পর্যন্ত আমার মুখস্থ। আর যেগুলি বক্তৃতা নয়, ভাষণ নয়, শুধু আভাষ আর সম্ভাষণ, সেসব হৃদয়স্থ। কিন্তু আশ্চর্য, মাত্র তিন মাস আগে লেখা নিজের চিঠিখানার একটি লাইনও আর মনে আনতে পারছি নে!

এর জন্যে কি পরিবেশ আর আবহাওয়াকে দাযী করব? সেদিনের পরিবেশ অবশ্যই ভিন্নতর ছিল। হাওয়া তো আর হাওয়া ছিল না, উনপঞ্চাশ পবনের সমাহার সংহার মূর্তি ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, দু-চারটে শাল গাছ ঘাড়েব ওপর বুঝি উপড়ে পড়বে। নাকি আমাদের মত অগৃহী কর্মচারীদেব থাকবার জন্যে পাঁড়ে ব্রাদার্স যে এই মনোবম টালির বাড়িখানা তৈরি কবেছেন, তা এবাব মাটি ছেড়ে আকাশে উড়বে? আমার সামনে কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্পটি সেদিন কী কাঁপাটাই না কাঁপছিল। আর আমি সেই নিবুনিবু সলতেটির সামনে বসে অনেক দূরের একটি অচঞ্চল অকম্পিত অত্যুজ্জ্বল দীপশিখার উদ্দেশে চিঠি লিখছিলাম। দীপশিখা? হ্যাঁ, সে দীপ কারো কাছে আর্বতিব পঞ্চপ্রদীপ, কারো কাছে বঞ্চনার মরীচিকা।

সেদিন কী লিখেছিলাম? বলব, পরে বলব। কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই রাখব। কিন্তু তার আগে আজকের দিনটিব কথা বলে নিই। আজ সেই ঝড়ও নেই, জলও নেই। আজ ঘরে বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। আমার জানালার বাইরে ওই ন্যাড়া পাহাড়টা আজ কন্দর্পকান্তি, মহুয়ার উগ্র গন্ধে বাতাস ভারমন্থব। সাঁওতালী কুলীরা দল বেঁধে মাদল বাজাচ্ছে। তাদের উচ্চগ্রামের গীতবাদ্যে কান পাতা শক্ত। ঝুমরু একাধাবে আমার সেবক আর বয়স্য। ও আমাকে ডাকতে এসেছিল। চিঠি লেখায় ব্যস্ত দেখে মুচকি হেসে চলে গেছে। ওই হাসিটুকুব মানে কি জান? ও বুঝে নিয়েছে আমি এখন পাঁচ-পাঁচটা কোয়ারীর মালিক পাঁড়ে ব্রাদার্সের জরুরী করেসপনডেনসের ফাইল নিয়ে বসি নি, আমি অন্য চিঠি লিখছি। লিখছি কোন অনন্যাকে। ঝুমরু এটুকু বুঝেছে, কিন্তু সবটুকু বোঝে নি।

সেই ঝড়ের রাতের চিঠিখানাকে আজ এই ঝড় থেমে যাওয়া রাত্রে পুরোপুরি যদি মনে না-ই আনতে পারি, কিছু মনে কবো না। আমার চারপাশের বনভূমির মত মনোভূমিও আজ বড় শান্ত। শান্ত? হ্যাঁ, সেখানে কবরেব প্রশান্তি। নিঃসীম স্তব্ধতা।

ক-বছর আগেও কিন্তু এমন ছিল না। ছিল কি? ফিরে লেখাব আগে একটু ফিরে দেখা যাক। এখনই ফিরে দেখা? এই সাতাশ বছর বয়সে? সত্যি এই অতীত প্রীতির জন্যে আমাব লজ্জা পাওয়া উচিত। স্মৃতিচারণেব জন্যে তো সাতান্ন আছে, সাতষট্টি আছে, মায়ের শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে জীবনটা যদি আরো দীর্ঘ হয়, সাতাত্তর আছে। ফিরে দেখবার এখনই কী হল?

কিছু হয় নি। তবু কেন যেন মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এই শাল-মহুয়ার অরণ্যে বসে তোমাদের জনারণ্যের কলকাতাকে দেখি। খুব যে একটা লোভ নিয়ে বাসনা-কামনা নিয়ে দেখি তা নয়। তবু দেখি। দেখতে দেখতে কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুর মুখ ভেসে ওঠে। তারা সবাই কৃতবিদ্য। সার্থক আব সফল। গোপন করে লাভ কি, সেই স্মৃতির পটে একটি সহপাঠিনীও সুমুখী স্মিতমুখী হয়ে দেখা দেয। কখনো বসন্ত কেবিনে, কখনো কফি হাউসে পেয়ালায় ঝড় ওঠে, মুখোমুখি বসে তুমুল কলহ হয়, কখনো কপট, কখনো অকপট, কখনো সাহিত্যের, কখনো রাজনীতির। কিন্তু তখনো সবই মুখোমুখি। তখনো মুখ ফেরাবার পালা আসে নি।

অথচ তখনো তো অকিঞ্চনই ছিলাম। সস্তা মেস-হোটেলে থাকতাম, ছেলে পড়িয়ে পড়ার খরচ

চালাতাম ; ময়লা ট্রাউজার এমন কি পাজামায় আর ছেঁড়া স্যাণ্ডালে কলেজে যেতাম, যাদেব গাড়ি আছে বাড়ি আছে ঔজ্জ্বল্য আছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে কোন লজ্জা হত না। মনে হত সেই দীনবেশটা যেন আমার ছদ্মবেশ। আসলে আমিও রাজপুত্র।

অবশ্য সেদিন তুমিও ছিলে বেপরোয়া। এলগিন রোডের নামকরা এডভোকেটের মেয়ে হলে কি হয়, সেদিন তুমিও বাসে ট্রামে রিকশায় উঠেছ। তাও যখন মেলে নি, মাইলের পর মাইল হণ্টনে কাতর হও নি। হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি তুলে কতদিন যে ঠনঠনিয়ার জল ভেঙেছ, মনে আছে?

মনে পড়ে আমাদের সেই 'অভিযান' পত্রিকার কথা? কলেজ ম্যাগাজিনে তোমার মন উঠল না। তাতে অধ্যক্ষ অধ্যাপকদের বড় বেশী হস্তক্ষেপ। তা ছাড়া ফোর্থ ইয়ারের শীতাংশু হালদারের উপদলটি কাগজখানাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। তুমি বললে, 'অজয় এস, আমরা আলাদা পত্রিকা বার করি।'

আমি বললাম, 'তুমি যখন মুখেব কথাটি বার করেছ নীলা, পত্রিকাটি বেরিয়ে গেছে এ কথা ধরে রাখতে পাব।'

তুমি বললে, 'সত্যি নিজেদেব কথা লিখতে হলে নিজেদের একখানা কাগজ থাকা দরকার। অন্যের কাগজে লেখা মানে অন্যের মুখে কথা বলা। অন্তত অন্যের মুখ চেয়ে নিশ্চয়ই। কিন্তু এবার থেকে আমরা নিজেদের কলমে নিজেদের কাগজে নিজেদের মনেব কথা লিখব।'

আমি বললাম, 'তুমি লিখবে, আমি প্রুফ দেখব। আমি তো লিখতে জানি নে।'

তুমি বলেছিলে, 'ভেব না, আমি তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে ছাড়ব। না লিখে তুমি যাবে কোথায়?'

ইংরেজী অনার্স ক্লাসের সেরা ছেলে অনিমেষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সেই তীব্র দৃষ্টি এখনো মাঝে মঝে মনে পড়ে আব একা একা হাসি। সেদিন সত্যিই মনে হয়েছিল, তার সেই দুর্বার ঈর্ষার আমি যোগ্য পাত্র। সেই ঈর্ষার আগুন অন্য যে কোন ছেলেকে ভস্ম করে ফেলতে পারত।

অনিমেষের শুধু প্রতিভা নয়, প্রতাপ আর প্রতিপত্তি সবই ছিল। কিন্তু মরবার ভয় আমার ছিল না। এক মুহূর্ত আগে তোমার বচনামৃত আমাকে অমরত্ব দিয়েছে। ভগবানে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু একটি ভগবতীর ওপর আমার তখন অগাধ বিশ্বাস। তার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আর নিতান্ত অকবিরাও বাল্মীকি বেদব্যাস হবার স্বপ্ন দেখে।

আমি কিন্তু সেই 'অভিযানে' গদ্যপদ্য একটি ছত্রও লিখি নি। তুমি বারবার বলেছ, তবু লিখি নি। লিখতে পারি নে, কিন্তু কাকে লেখা বলে, কাকে বলে না সেটুকু বুঝতে পারি। অন্তত তখন পারতাম। তোমার অনেক অনুরোধ উপরোধেও আমি যখন কলম ধরলাম না, তুমি দণ্ড ধরলে। কথা ছিল, তুমি আর আমি দুজনে সম্পাদক হব। দুটি নাম থাকবে পাশাপাশি, কি ওপরে নীচে। দুটি নাম থাকবে একটি দ্বিপদী কবিতার মত। কবিতা আমি লিখি নি। কিন্তু দুটি নামকে মনে মনে সেদিন কবিতার কলির মতই সাজিয়েছিলাম।

কিন্তু ভাবলে কি হবে, শেষ পর্যন্ত চান্স পেয়ে গেল অনিমেষ। যুগ্ম সম্পাদকের পদে তুমি তাকেই বরণ করলে। আমাকে দিলে গদ্যময় কর্মাধ্যক্ষগিরি। নাম ছাপা হল তোমাদের নাম থেকে অনেক দূরে। কাগজের শেষ পাতায় বর্জাইসের ক্ষুদে অক্ষরে। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার হাত ধরলে। আরো আপত্তি করলে সেদিন পায়ে পর্যন্ত ধরতে পারতে। তুমি বললে, 'তোমাকে ছাড়া এ কাগজ চলবে না।'

আমাব চালকগিরির ওপর কেন তোমার এত বিশ্বাস এসেছিল কে জানে? শক্ত-সমর্থ, স্বাস্থ্যবান, গাঁয়ের আটপিঠে, চৌখোশ ছেলে বলেই কি আমি তোমার অত বিশ্বাসভাজন ছিলাম? আমার উৎসাহ উদ্যম আর অবিশ্রাম খাটবার ক্ষমতা কি তোমার চোখে পড়েছিল?

সেই গোটা থার্ড ইয়ার আর ফোর্থ ইয়ারেরও এক চতুর্থ ভাগ কী উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যেই না কেটেছে! দলে আরো অনেক ছেলে ছিল। তাদের কারো কারো লিখবার ক্ষমতা ছিল, কারো বা বেশী চাঁদা দেওয়ার ক্ষমতা। তবু আমার ওপরই তোমার ভরসা ছিল বেশী। কয়েক মাস যেতে না যেতেই অনিমেষ ঢিলা দিল। বাবার ধমক খেয়েছিল। রীতিমত কড়া ধমক। তবু সম্পাদকের নাম ওর বহাল রইল। আসলে কাজ করত কর্মাধ্যক্ষ। লেখকদের বাড়ি বাড়ি ধরনা দেওয়া, প্রেস

দপ্তরীখানা কোনখানে না যেতে হয়েছে?

অবশ্য সব সময় সে যাত্রা নিঃসঙ্গ যাত্রা ছিল না। তুমিও সঙ্গে থাকতে। মনে আছে, নামকরা লেখকের লেখা আদায়ের জন্যে জলবৃষ্টির মধ্যে রিকশায় করে সেই পার্কসার্কাস যাত্রা, সেই অবিরাম ধারাস্নান? আর এক দিনের সেই হাঁটা-পথে কাঠফাটা রোদে বেলেঘাটা? সেই বিখ্যাত লেখকের লেখা পেলাম না। দু লাইনের আশীর্বাণীটুকু তখন তখন লিখে দিতে তিনি আলস্য বোধ করলেন। কিন্তু তাতে কি? সেদিন যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, পাব বলে তো বেরোই নি! তবু কি পাই নি?

থাক সেসব কথা। তার পর এল খেলা ভাঙার খেলা। বাড়িতে তুমিও ধমক খেলে। তাড়া খেলে। পরীক্ষার তাড়া তার চেয়েও বাড়া। অনিমেষরা আগেই অদৃশ্য হয়েছে। তুমিও প্রায় দৃশ্যপটের আড়ালে চলে গেলে। বলতে লাগলে, 'এবার নির্ঘাত ফেল করব। পড়াশুনো কিচ্ছু হয় নি। সত্যি কাগজ কাগজ করে কী সময়টাই নষ্ট হল!' শুনে বড় কষ্ট হল। বলতে গেলে 'অভিযান' ছিল আমাদের দুজনের সৃষ্টি। আজ তোমার কাছে তা অনাসৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। তবু আরো মাস দুয়েক কাগজখানাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। তোমার সেই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে'অভিযান'-এরঅফিস সরে এসেছিল আমার মেসের ঘরে। সে ঘরের আমি শুধু এক তৃতীয়াংশের শরিক। ফার্নিচার বলতে ছারপোকাভরা একখানা নড়বড়ে তক্তপোশ, আর শিয়রের কাছে একখানা বাজে কাঠের টেবিল। তবু সেখান থেকেই 'অভিযান' বেরোত। দুঃসাহসিক অভিযান। তুমি আর কাগজের জন্যে বিশেষ কিছু করতে পারতে না, লিখতেও না। বাধ্য হয়ে আমিই সম্পাদকীয় লিখতাম। অবাধ্য কলমকে বশে আনার সে কী দুঃসাধ্য সাধনা! অনিমেষকে বাদ দিয়েছিলাম। সম্পাদিকা ছিলে একমাত্র তুমি। আমার লেখা তোমার নামে বেরোত। নামটি তুমি আমাকে ধার দিয়েছিলে। এও কি কম দান? তখন ধার দেওয়া আর ধরে দেওয়ার মধ্যে প্রভেদ ছিল সামান্য। তখন এক কলাকেই ষোল কলা মনে হত। এখনও তাই। তবে এখন সেটুকুই বা কোথায়? এখন শুধু ছলাকলা।

কিন্তু এত করেও কাগজ টিকল না। তুলে দিতে হল। প্রেসের দেনা অবশ্য তুমিই বেশীর ভাগ শোধ দিলে। তোমার বাবার কাছ থেকে নিলে, দাদার কাছ থেকে নিলে।

খুব যে খুশী হয়ে দাও নি, তা তোমার মুখ দেখে বুঝেছিলাম। কিন্তু কী করব বল? অত টাকা একা আমিই বা কী করে দেব? টুইশনে কটা টাকাই বা তখন পাই! নিজের খরচ চালাতেই তো চলে যায়। সংসার-খরচ চালিয়ে বাবা তো আর আলাদা টাকা পাঠাতে পারতেন না।

অবস্থা আমাদের ভালো ছিল না। আজও নেই। তবু যে কলকাতার অত বড় নামজাদা মিশনারি কলেজে ঢুকতে পেরেছিলাম, চার বছর পড়া চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম, সে কম কথা নয়। রাঁচীর সেই পাদ্রী সাহেবের সুপারিশ ছাড়া ও কলেজে পড়া আমার হতই না। পুরো মাইনে দিতে হলে কি আর পড়তে পারতাম? পাদ্রী সাহেব বাবাকে ভারী ভালোবাসতেন। কী এক টোটকা চিকিৎসায় বাবা তাঁর ক্রনিক ডিসপেপসিয়া সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই সুপারিশ চিঠি নিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়। আর তাই জীবনে একটিবারের জন্য ভালো কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলাম, অভিজাত ঘরের বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবন্ত একদল ছেলের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলাম। আর দৈবাৎ সেই দলের মধ্যে মক্ষীরানীর মত একটি মেয়েও ছিল। মেয়ে অবশ্য আরো ছিল। কিন্তু তারা তার কাছে পার্শ্বচরী সহচরী মাত্র। তাদের দিকে আমি ফিরেও তাকাই নি। আজ ভাগ্য তার শোধ নিচ্ছে।

সব শুধু একটিবারের জন্যে। একখানি কাগজ, একটি সম্পাদিকা, আর তার ওপর একটিবারের মত একটি সাধারণ ছেলের একচ্ছত্র আধিপত্য।

তুমি নিশ্চয়ই হাসছ। কলেজী আমলের সেই ছেলেখেলাকে কী বড় করেই না দেখছি! তার পর তুমি কত খেলা খেলেছ, কত খেলা দেখেছ। কিন্তু আমি? সেই যে একখানি ঘুড়ি দূর আকাশে উড়তে দেখেছিলাম, তার রঙীন স্মৃতিটুকু আজও মনে করে রেখেছি। তার পর পরীক্ষাপর্ব। তুমি অনিমেষ রণধীর সবাই সসম্মানে পাস করে গেলে। আমি বিনা সম্মানে কোন রকমে উতরালাম। অথচ কলেজের পরীক্ষায় অনেকের চেয়েই আমার রেজাল্ট ভালো ছিল। আই. এ-তেও তোমাদের চেয়ে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বেই জায়গা পেয়েছিলাম। এসব কথা এখন আর তোলার মানে হয় না। আমি

তখনও তুলি নি। বাবা তুলেছিলেন। দীর্ঘ চিঠিতে সে যে কী দুঃখ, কী আক্ষেপ জানিয়েছিলেন, আমি কখনো তোমাদের তা বলি নি। বাবা লিখেছিলেন, 'গরীবের ঘোড়া রোগ অপার দুঃখের কারণ। তোমার অধঃপতন যে অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে তা আমার জানতে বাকি নেই। বিদ্যা অবিদ্যা যথেষ্ট অর্জন করেছ, এবার উপার্জনে মন দাও। সংসার অচল। আমি আর কতদিন চালাব ?'

বাবার ওপর রাগ করে আমি আর কলেজ স্ট্রীটের দিকে গেলাম না। ডালহৌসী পাড়ায় হাঁটাহাঁটি করে স্যাণ্ডালের পর স্যাণ্ডাল ক্ষয় করে ফেললাম।

তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে, দু বছর বাদে সোনার মেডাল নিয়ে বেরিয়েও এলে। ফিলজফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এতকাল শুধু সুদর্শনা ছিলে, এবার থেকে সুদার্শনিকও। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নামকরা অভিজাত কলেজে অধ্যাপিকার পদ। ইন্দ্রাণীর সম্মান। ইন্দ্রাণীই বটে। শুনেছি ইন্দ্র এখনও আসেন নি। বায়ু চন্দ্র বরুণের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

তোমার দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাই বলে দর্শন ইন্দ্রিয়টিকে বাদ দিতে পারি নি। সবই দেখতাম। প্রায়ই দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে দেখতাম। সেই দেখার মধ্যে গৌরব ছিল না, গ্লানিই ছিল। তবু না দেখে থাকতে পারি নি, তোমার নতুন কৃতী বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে তোমাকে দেখতাম। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে দেখতাম অরুন্ধতীকে।

তার পর তুমি এক দিন আমার সেই চুরি করে দেখা দেখে ফেললে। হাতকড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে গেলে কফি হাউসে। তোমার বিদ্বান বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। নমস্কার বিনিময়ই অবশ্য হল, বাক্য বিনিময় বিশেষ হল না।

সেদিন তুমি হিতৈষিণী। দুঃখ করে বললে, 'অজয়, পড়াটা ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে না, ক্যারিয়ারটাই আসল। যেভাবে পার পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। চাকরিবাকরি কিছু করছ নাকি ?'

বললাম, 'কই আর ?'

অপরিচিত না হোক সদ্য পরিচিত আরো দুজন যুবকের সামনে এসব কথা আমার ভালো লাগছিল না। আমি এড়াতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তুমি ছাড়লে না। তুমি উপদেশ দিয়ে চললে, 'কিছু একটা তো করতেই হবে। জানি তো তোমার—'

আমার 'বাড়ির অবস্থার কথাটা' তোমার মুখ থেকে আর শুনতে হল না। তুমি কফিতে চুমুক দিলে।

আমি বললাম, কলকাতায় কোন সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। এত তো ঘুরলাম !'

তুমি বললে, 'কলকাতাই তো পৃথিবীর একমাত্র জায়গা নয় ?'

বললাম, 'তা জানি। তবু কলকাতার আকর্ষণ—'

তোমার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। তুমি কি ভেবেছিলে আমার কাছে কলকাতা আর তুমি সমার্থক, কলকাতা আর তুমি অভিন্ন ? ভুল ভাবো নি।

তুমি এক মুহূর্ত সময় নিলে। ঢোঁক গিললে, সেই সঙ্গে আর এক চুমুক কফিও। তার পর বললে, 'এ তোমার ভুল ধারণা। কলকাতায় কিছু যদি না হয়, অন্য কোথাও চেষ্টা করা উচিত। তার পর ফের না হয় এখানে আসবে। কলকাতা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

খুব সত্যি কথা। কিন্তু কী নির্মম সত্য।

আমি তবু যেতাম না। তোমার ধাক্কা খেয়েও কলকাতাতেই থেকে যেতাম। অর্ধভুক্ত অভুক্ত হয়েও এই পাষাণপুরীর পাথর কামড়ে পড়ে থাকতাম। এত বড়, এত বিচিত্র কর্মক্ষেত্র এদেশে আর কোথায় আছে ?

কিন্তু বাবার জন্য পারলাম না। তিনি এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসলেন। এই পাঁড়ে ব্রাদার্সের কোয়ারীতেই তিনি কাজ করতেন। এখানে তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি। আস্তে আস্তে পদোন্নতি হয়েছিল। তার পরে যা ঘটল তা উন্নতির অবনতির বাইরে। পাথরের চাঁই পড়ে বাবার পা দুখানি গেল। কোম্পানী অবশ্য ক্ষতিপূরণ করেছেন। তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করেছেন আমাকে তাঁর পদে বসিয়ে।

বাবা এখন বাড়িতেই থাকেন। এই সাঁওতাল পরগনারই এক অখ্যাত গ্রামে আমাদের ছোট একটু ডেরা আছে। গাঁয়ের নাম তোমাকে বলেছিলাম। বোধ হয় ভুলে গেছ। মনে করিয়ে দিয়ে আর লাভ কি ? বাবা গাঁয়ের বাড়িতে থাকেন। এই কোয়ারী থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। তিনি বাড়িতে বসে বসে আমার রুগ্না মা আর ছোট বোনদের খবরদারি করেন, ভাগ্যকে গাল পাড়েন আর ভাগ্যফল হিসেবে আমাকে।

আমি এখানে বেশ আছি। এও এক পাথরের রাজ্য। বড় বড় পাথরের চাঁই যন্ত্রে কুচিকুচি করা হয় এখানে। সেই পাথরের কুচি দিয়ে তোমাদের রাজপথ বাঁধানো হয়, রাজপ্রাসাদ গড়ার কাজে লাগে। আমরা এখান থেকে খোয়া সাপ্লাই করি। পঞ্চ-বার্ষিকীতে আমাদের কাজের চাপ আরো বেড়ে গেছে। কোম্পানীর তৎপরতা বেড়েছে। লাভ হচ্ছে প্রচুর।

এখানে সাহিত্য সংস্কৃতির বালাই নেই। রাজনীতি-টাজনীতিও বহু দূরে। এখানকার রীতিনীতি আলাদা। মাঝে মাঝে সাহেবগঞ্জে যাই। বইপত্র কিছু কিনে নিয়ে আসি, কিছু বা ধার করি। অবসর কাটাবার জন্যে ওই বই-ই সম্বল।

রণধীর আছে এখন ফ্রাঙ্কফুর্টে। বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে মেজো কি সেজো অফিসার। সে আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। চিঠিতে ধমকায়। বলে, 'তুমি একটা আস্ত ইয়ে। কেবল ভার বয়ে বয়েই গেলে। জীবনটাকে ভোগ করতে শিখলে না। সুখ সম্ভোগও দরকার। ওখানে আর কিছু না থাক মহুয়ার রস তো আছে, প্রচুর মুরগী আছে, আর দু-একটি সুশ্রী সাঁওতালী মেয়ে কি খুঁজলে পাওয়া যায় না ?'

তা হয়তো যায়। কিন্তু মন যায় না যে। চেষ্টা করে দেখেছি ও ধরনের সম্ভোগ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সুখ আমি চাই, নিশ্চয়ই চাই। নিজে সুখী হতে না পারলে অন্যের সুখকে উপভোগ করা যায় না। শুধু ঈর্ষার অসূয়ায় জ্বলে মরতে হয়। আমিও সুখী হতে চাই নীলা। শুধু জানি নে সেই সুখ কোন পথে আসে, কোন্ পথে তার দেখা মেলে। মাঝে মাঝে নিরাশার অন্ধকার আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমি কোন পথই দেখতে পাই নে। মনে হয় সব পথ এই জঙ্গলের মধ্যে এসে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এখান থেকে বেরোবার আর কোন উপায় নেই।

কিসে সুখ ? প্রেমে ? না, শুধু প্রেম নয়। বিনা যোগ্যতায় লটারীর পুরস্কারের মত যে প্রেম আকস্মিকভাবে আসে, কর্পূরের মতই তা মিলিয়ে যায়। সেই কর্পূর-মঞ্জরীকে দিয়ে কী হবে ? তবে কি প্রতিষ্ঠা ? খ্যাতি, কৃতিত্বের মধ্যেই সুখ ? তবে কি যশের মধ্যেই জীবনের সব রস ? এ কথা আজ ঠেকে শিখেছি, প্রেম স্বনির্ভর নয়। বড়ই পরাবলম্বী। অর্থ যশ নব নব গৌরবের জালে তাকে নিত্য বেঁধে রাখতে হয়।

কিন্তু কোথায় সেই কৃতিত্ব, সেই বিপুল যশোলাভের পথ কোথায় ? কল্পনায় সব পথই খোলা আছে, কিন্তু বাস্তবে সব পথই বন্ধ। আমি শিল্পী নই, বিজ্ঞানী নই, স্রষ্টা নই, ব্যাখ্যাতা নই। আমি শুধু পাঁড়ে ব্রাদার্সের চিঠি-লিখিয়ে কেরানী। কোথায় এর সার্থকতা ? কিসে সাফল্য ? যখন ভাবি, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাই নে। নীলা, সংসারে একদল লোক আছে যারা কিচ্ছু করে না, করতে পারে না। শুধু অনুভব করে আর কল্পনা করে। তার পর সেই আকাশচারী কল্পনাকে মাটিতে পুঁততে না পেরে আক্ষেপ করে আর অনুশোচনা করে। নিঃসন্দেহে এরাই সংখ্যাগুরু। তবু সেই দলের আয়তন বাড়িয়ে জীবনে গৌরব কোথায় ?

এখানে বেশীর ভাগ সময় আমি আমার অন্ধকার গুহায় বাস করি। নিজের দুঃখই সেই অন্ধকার। অযোগ্যতা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের অন্ধকার জমাট বাঁধে। কিন্তু ক্বচিৎ কখনো হাতড়ে হাতড়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আমি গুহামুখে আসি। মুখ তুলে তাকাই, চোখ তুলে আমার চারদিকে দেখি। যে দৃশ্য দেখা যায় না তাও দেখি। দেখি মানুষ কীভাবে অমানুষের মত বাঁচে। মূল্যবান অফুরন্ত সম্ভাবনা-ভরা সব প্রাণ কীভাবে ইতরপ্রাণীর মত দিন কাটায়। তখন ভাবি আমার দুঃখ নিতান্তই দুঃখ-বিলাস। আমি কি আমার বাবার চেয়ে বেশী দুঃখী ? আমার মার চেয়ে বেশী দুঃখী ? আমার আধা শিক্ষিতা আইবুড়ো বোনগুলির চেয়ে বেশী দুঃখী ? আর আমার এই চারদিকে যারা পাথর টানে, রাতে তাড়ি টেনে বুঁদ হয়ে থাকে, যারা শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার কোন মর্ম জানে না, তাদেরও

আমার চেয়ে কম দুঃখী মনে করতে পারি নে। অজ্ঞতা, অচেতনার সুখ ছাড়া ওদের আর কোন সুখ আছে ? তখন ভাবি শুধু ভাবাটাই যথেষ্ট নয়, অনুভব করাটাই যথেষ্ট নয়, হাতে কলমে কিছু করা দরকার।

কিন্তু জীবনে আমি একবারই কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার কি হতে পারব ?

তুমি একটি চিঠির কপিই আমার কাছে চেয়েছিলে। আমি একটি জীবনকারিনীর কপি তোমাকে পাঠাচ্ছি। প্রার্থনাতীত দান। বেণীর সঙ্গে মাথা।

কিন্তু সত্যি করে সেটুকুও চেয়েছিলে কি ?

দু সপ্তাহ আগে দু'দিনের জন্যে আমাদের এই ফার্মের কাজেই কলকাতায় গিয়েছিলাম। ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি নানা ঝামেলা। কলকাতা অফিসের যিনি ম্যানেজার, তাঁকে কাজ বুঝিয়ে দিতে বহু সময় লাগল। তার পর একটু অবসর জুটল। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি। চিনতে পারবে কিনা কে জানে। যদি না চিনতে পার তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তো দেখে আসব ! আগেও তো কতবার দূর থেকে লুকিয়ে দেখেছি। এবার না হয় কাছে থেকেই লুকিয়ে দেখব। তোমার কাছে আমার পরিচয় আজ অতি ক্ষীণ আর অস্পষ্ট। তাই নিজের বেশই আমার ছদ্মবেশ হবে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে যাত্রা। উঠে পড়লাম দ্বিতল বাসের চূড়ায়। বাসটা বড় দুলতে লাগল। সাঁওতাল পরগনার সেই ঝড় কি আজ কলকাতায় পর্যন্ত পিছু নিয়েছে ?

কী ভেবে মাঝপথে নেমে পড়লাম। মনে হল যাওয়ার আগে একবার জানান দিয়ে যাই। কাছেই আরপুলি লেন। ওই গলিতেই আমাদের সেই প্রেসটা। যে প্রেসে 'অভিযান' ছাপা হত।

প্রেসের মালিক চিনতে পারলেন। চোখ নয়, চশমাটাই কপালে তুলে বললেন, 'আরে আপনি !'

তার পর নমস্কার আর কুশল প্রশ্ন বিনিময়। কোথায় থাকা হয়, কী করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাববাচ্যে সৌজন্য বিনিময়। শিষ্টাচারের পর্ব শেষ হলে আমি বললাম, 'একটা ফোন করব।'

শুনে মালিকের মুখ গম্ভীর। আমি তাড়াতাড়ি একটা সিকি বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। মনে পড়ল এখান থেকে তোমাকে কতদিন কতবার ফোন করেছি। পয়সা দিয়েই ফোন করেছি। তার মধ্যে জলখাবারের পয়সাও ছিল।

ভাগ্য ভালো। ফোনে সরাসরি তোমাকেই পাওয়া গেল। তোমার গলা শুনেই চিনতে পারলাম। স্বর তো নয় যেন সুর !

আমার গলা তোমার পক্ষে চেনা সম্ভব ছিল না। তাই পরিচয় দিতে হল।

তুমি বললে, 'আরে তুমি ! সে কি কথা ?'

আমি বললাম, 'কথাটা অবাক হবার মতই। তবু আমিই।'

আরো কী কী ভদ্রতাব্যঞ্জক কথা হয়েছিল সেগুলি আর লিখলাম না। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। যদিও তার কিছু মনে করে রাখবার মত নয়।

তার পর আমি তুললাম সেই চিঠির কথা।

বললাম, 'তোমাকে যে চিঠিখানা লিখলাম তার জবাব দিলে না তো ?'

তুমি অবাক হয়ে বললে, 'সে কি, চিঠি ! কবে লিখলে ? কখন ? পাই নি তো !'

আমি সন বললাম, তারিখ বললাম, তিথি বললাম, ক্ষণ বললাম।

কিন্তু তুমি কেবলই বলতে লাগলে, 'পাই নি, পাই নি, পাই নি !'

আর আমি যেন শুনতে লাগলাম, 'চাই নি, চাই নি, চাই নি।'

শেষে তুমি বললে, 'লক্ষ্মীটি, তুমি তা হলে এক কাজ কর। সেই হারানো চিঠিখানার একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দাও।'

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'কী হবে আর সেই কপি দিয়ে ? কপি কি আর আছে ?'

তুমি বললে, 'আহা, তোমার কাছে নেই, দেরাজেও নেই, কিন্তু মনে তো আছে ? কপি কথাটি শুনতে খারাপ। প্রতিলিপি অনেক ভালো শব্দ। তোমার বেলায় স্মৃতিলিপিও বলা যায়। আমরা স্কুলে থাকতে শ্রুতিলিপি লিখতাম। আজ তুমি একখানা স্মৃতিলিপি লিখে দাও !'

আমি চুপ করে রইলাম।

তুমি জোর দিয়ে বললে, 'তোমাকে লিখতেই হবে। দেখ, চিঠি যে লিখল, হারালে তার পুরো লোকসান হয় না। কারণ লিখেই তো সে আধখানা পেয়েছে। কিন্তু চিঠি যার পাওয়ার কথা সে যদি হারায় তার সবখানিই গেল। আমি অমন করে হারাতে চাই নে। তোমার চিঠি আমার চাই। যা লিখেছিলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফের লিখে দেবে। খবরদার বাদসাদ দিও না, কারচুপি করো না। তোমার সেই মূল চিঠির ওপর আমার মৌলিক অধিকার।'

আমি ফোনে বলেছিলাম, 'আচ্ছা।'

মনে মনে বলেছিলাম, 'মিথ্যাময়ী, তোমার মিথ্যার মধ্যেও কী মাধুর্য!'

আসলে সত্যের চেয়ে মিথ্যাই মধুর। আমরা সত্যের সন্ধান করি, তবু মিথ্যাতেই মজি।

তুমি একদিন যেতেও বলেছিলে। কিন্তু আমি আর যাই নি। যাই নি, কিন্তু ফিরে এসে তোমার সেই অনুরোধ রাখতে বসেছি। একটি মিথ্যে অনুরোধে সত্যিকারের জবানবন্দী।

আমি জানি এ চিঠিও তোমার কাছে পৌঁছবে না। এ চিঠিও হারাবে।

তার পর ফের যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তুমি বলবে, 'আবার লিখে দাও!'

আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করব। কষ্ট পাব, দুঃসহ যন্ত্রণা পাব। ফের বিশ্বাস করতে চাইব। নিরবচ্ছিন্ন সংশয়ের দোলায় দুলব।

আবাব লিখবও।

শ্রাবণ ১৩৭০

নেপথ্যলোক

'লেটারবক্সটা খুলে দেখেছিস? সকালের ডাকে চিঠিপত্র কি কিছু এল?'

বেলা আড়ে আটটায় বিছানা ছেড়েছেন নীলাম্বর। তবু যেন দেহের জড়তা কাটতে চায় না। বারান্দায় এসে ইজিচেয়াবে ফের শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। খবর পড়বেন বলে কাগজখানা তুলে নিয়েছেন। তাতে মুখ আব বুক দুইই ঢাকা পড়েছে। হাঁটুব নিচ থেকে পা দুখানি শুধু দেখা যায়। রঙ ভারি সুন্দর। মাজা গৌর বর্ণ। গডনে কোথাও কোন খুঁৎ ধরেনি। বিশেষ করে পাতা দুটি ভারি সুন্দর। দুখানি পা জুড়ে রাখলে মনে হয় সত্যিই যেন একটি ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের আধখানা কেউ রেখে দিয়েছে। শুঁড় তোলা কটা রঙের পুরোন চটি জোড়া দেখা যাচ্ছে ইজিচেয়ারের তলায়।

'কী রে চিঠিপত্র কিছু এল? কথা বলছিস না যে?'

কাগজখানা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকালেন নীলাম্বব চৌধুরী।

মেয়ের হাতে চায়ের কাপ। প্রসন্নভাবে একটু হাসলেন নীলাম্বব। মেয়ে তাঁর রঙ পায়নি। কিন্তু গড়নের অনেকখানি পেয়েছে। রঙময়লা কিন্তু মুখশ্রী ওরও বেশ সুন্দর। নাক চোখ বেশ ভালো। ছিপছিপে দোহারা চেহারা। কালোর ওপর বেশ দেখতে তাঁর মেয়ে সবাই সে কথা বলে। আর বলে বড় ভালো মেয়ে। নীলাম্বর একটু হাসলেন। এর চেয়ে ভালো কথা দুনিয়ায় আর নেই। সোনার মেডেল, রূপার মেডেল, সার্টিফিকেট, মানপত্র, সরকারী বেসরকাবী উপাধি সব কিছুর চেয়ে বড় সুখ্যাতি এই ভালোত্ব। পাড়াপডশীর মুখের এই একটি মাত্র শব্দ। সেই সুখ্যাতি নীলাম্বর পাননি কিন্তু তাঁর শ্যামলী পেয়েছে।

চা এনেছিস? দে।' হাত বাড়ালেন নীলাম্বর: 'আর চিঠিপত্র?'

শ্যামলী বলল, 'এসেছে বাবা, তোমার চিঠিও এসেছে। এনে দিচ্ছি।'

ভারি বাধ্য, অনুগতা মেয়ে। তবু তাব গলায় একটু যেন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছে। কুঞ্চিত হয়েছে যুগল ভ্রূ।

মেয়ের এই বিরাগ, মৃদু ক্রোধটুকু লক্ষ্য কবলেন নীলাম্বর, তারপর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কোত্থেকে এসেছে?'

শ্যামলী বলল, 'একখানা ইলেকট্রিক বিল, আর একখানা তোমার লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামের নোটিশ—'

নীলাম্বর অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আর ? আর কিছু আসেনি ?'

শ্যামলী গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ এসেছে। রূপমহল থেকে তোমার একখানা কার্ডও এসেছে। তাঁরা বুকপোস্টে পাঠিয়েছেন। এ কার্ড তুমি না পেতেও পারতে। ধরে নাও পাওনি।'

নীলাম্বর মেয়ের দিকে তাকালেন। দেখতে নরম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কী শক্ত। আর কী কড়া শাসনের ভঙ্গি। এই ভঙ্গি, গলার স্বরের এই দৃঢ়তা ওর মার কাছে থেকে পেয়েছে। মায়ের হাত থেকে এখন মেয়ে নিয়েছে শাসনদণ্ড।

নীলাম্বর নরম গলায় বললেন, 'মলি, কার্ডখানা নিয়ে আয়। তোর কথা আমি অস্বীকার করছিনে। বুকপোস্টের চিঠি। এসে না পৌঁছতেও পারত। কিন্তু যখন এসেই গেছে দেখি না, কী লেখা আছে কার্ডে। দেখলেই যে আমি যাব, ওদের ওই অবহেলার ডাকে সাড়া দেব তা ভাবিস নে। কার্ডখানা দেখতে দে আমাকে।'

শ্যামলী বলল, 'বেশ দেখ।'

ইলেকট্রিক বিল, প্রিমিয়ামের নোটিশ আর রূপমহল থিয়েটারের সেই কার্ডখানা এনে শ্যামলী বাবার হাতে দিল। বিরক্ত হয়ে বিল আর নোটিশটা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে দিলেন নীলাম্বর। তারপর শাদা খামটি খুলে নিমন্ত্রণ পত্রটি বের করলেন : নতুন নাটক হচ্ছে রূপমহলে। আজ সন্ধ্যায় প্রথম অভিনয়। তারই নিমন্ত্রণ। ছাপানো হরফে রূপমহলের ম্যানেজমেন্ট এই শুভ অনুষ্ঠানে নীলাম্বরের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন। কার্ডখানা নীলাম্বর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন আর কোথাও কিছু নেই। কেউ কোথাও হাতে লেখেনি, 'এসো কিন্তু ভাই।'

নীলাম্বর কার্ডখানা রেখে দিলেন। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস মা। এ ধরনের নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না।'

শ্যামলী খুসি হয়ে বলল, 'তুমি যেয়ো না বাবা। তোমার কি কোন মানসম্মান নেই ? সেদিনও তুমি ওই থিয়েটারের সর্বেসর্বা ছিলে। তুমিই ওই থিয়েটারকে দাঁড় করিয়েছ। কী না করেছ তুমি রূপমহলের জন্যে ? আজ যদি রতনবাবু সে কথা ভুলে যান তুমিই বা ভুলতে পারবে না কেন ?'

নীলাম্বর বললেন, 'ঠিক বলেছিস মলি। আমিও ভুলব। ভুলব কি ভুলে গেছি।'

'বেশ করেছ বাবা। ভুলে যাওয়াই ভালো।'

শ্যামলী ভিতরে চলে যাচ্ছিল, নীলাম্বর তাকে ফের ডাকলেন, 'আর শোন ?'

'বলো।'

নীলাম্বর মৃদু হাসলেন, 'রূপমহলের এবারকার ভূমিকালিপিখানা দেখেছিস ?'

শ্যামলী এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'ও আর দেখে কী হবে বাবা।'

নীলাম্বর বলতে লাগলেন, 'সভাপতি প্রধান অতিথি গণ্যমান্য সব ব্যক্তি। দুজনেই মিনিস্টার। একজন সেন্টারের আর একজন এখানকার। জাঁকজমক আড়ম্বর কত বেড়েছে তাই দেখ। কিন্তু আসলে যা অভিনীত হবে সে বস্তুটি কী, সে বস্তুটি কার ? নাট্যকার হলেন অতনু মুখোপাধ্যায়। নাম শুনেছিস কখনো ?'

শ্যামলী বলল, 'না বাবা। বোধহয় ছদ্মনাম টদ্মনাম হবে।'

নীলাম্বর হেসে বললেন, 'আরে না পাগলী না। ও নামের এমনই মহিমা যে, আসলকেই ছদ্মনাম বলে মনে হয়। কেই বা শুনেছে ওর নাম ? আর কেই বা পড়েছে ওর নাটক ? নাম দিয়েছে আবার প্রতিধ্বনি। কোন বিদেশী লেখকের প্রতিধ্বনি, শুনলেই বোঝা যাবে। আজকাল তো এইসবই হচ্ছে।'

শ্যামলী বলল, 'থাক বাবা। আমাদের ওসব আলোচনা করে কী সবে। আমরা তো কেউ আর দেখতে যাচ্ছিনে।'

নীলাম্বর নিজের মনে একটু হাসলেন। তাঁর মেয়ে আবার এসব পছন্দ করে না। অন্যের নিন্দামন্দ ভালোবাসে না। ওর নীতিজ্ঞান রুচিবোধে বাধে। প্রথম যৌবনে ছেলেমেয়েরা একটু নীতিপাগলা

হয়। নীলাম্বর নিজেও ও বয়সে কম গোঁড়া ছিলেন না। তারপর যত বয়স বেড়েছে তত গোঁড়ামি ভেঙেছে।

'নাট্যকারের তো ওই নমুনা। আর পরিচালকের নাম শুনেছিস? সদানন্দ সর্বাধিকারী।'

শ্যামলী বলল, 'শুনেছি যেন কোথায়। কাগজে-টাগজে বেরিয়েছে মাঝে মাঝে। আমি তো তেমন খোঁজ রাখিনে বাবা।'

নীলাম্বর বললেন, 'খোঁজ রাখলেও যেন কত খোঁজ পেতিস! বয়স বছর তিরিশেকের বেশি নয়। এতকাল অ্যামেচার ক্লাবটাব চালিয়েছে। পাবলিক স্টেজে এসেছে হালে। এসেই একেবারে সর্বাধিকারী। যুগান্তর এনেছে স্টেজ ডাইরেকশনে। হবে। পাবলিসিটিতে কী না হয়। ঢাক পেটাতে পারলে মূর্খকেও পণ্ডিত বলে— ।'

শ্যামলী এবারও বাধা দিল, 'থাক না বাবা, ওসব আলোচনায় আমাদের লাভ কি।'

নীলাম্বর বললেন, 'আর প্রধান অভিনেত্রী কে জানিস? শ্রীমতী সুরশ্রী হালদার! ওর নাম অবশ্য আজকাল সবাই জানে। কিন্তু কার জন্যে জানে? এই নীলাম্বরের জন্যে। আজ সেই নীলাম্বর চৌধুরীকেই সে চেনে না।'

শ্যামলী এবার ফের ধমক দিল, 'বাবা, তোমাকে বলিনি, ওই মহিলার কোন আলোচনা আমাদের বাড়িতে আর হবে না।'

উত্তেজিতভাবে নীলাম্বর উঠে সোজা হয়ে বসলেন, 'মহিলা, ও আবার মহিলা?'

ভিতরের ঘরে পর্দা সরিয়ে এবার যিনি নীলাম্বরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে কিন্তু মহিলা বলে না মেনে উপায় নেই। যদিও তাঁর পরনে লাল পেড়ে শাদা খোলের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ, হাতে হলুদের দাগ, এই মাত্র রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তবু তিনি যে রাঁধুনী নন, এ বাড়ির গৃহিণী তা তাঁকে দেখলেই চেনা যায়। মেয়ের মত লম্বা নন তিনি, বরং একটু বেঁটেই। সেই তুলনায় স্থূলাঙ্গী। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স। এরই মধ্যে সামনের দিকের চুলে অল্পসল্প পাক ধরেছে। মুখের শ্রীটুকু এখনো মেদে একেবারে ঢাকা পড়েনি। কিন্তু শ্রীর চেয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অশান্তির উদ্বেগ যে তাঁর ওপর দিয়ে গেছে সেই চিহ্নই যেন বেশি করে চোখে পড়ে।

ইন্দিরা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীকে একটু দেখে নিলেন। তারপর মনের রাগ আর বিরক্তি ঠোঁটের হাসিতে ঢেকে বললেন, 'কী ব্যাপার। অত চটাচটি কিসের জন্যে। কার সঙ্গে যুদ্ধ করছ?'

নীলাম্বর বললেন, 'তোমার সঙ্গে নয়।'

ইন্দিরা বললেন, 'তা জানি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আর কী হবে? আমি কি আর বেঁচে আছি?'

তারপর মেয়ের দিকে তাকালেন ইন্দিরা, 'মলি, তোর অফিসের বেলা হয় না? নাইতে যা এবার। এর পর তো কোনরকমে নাকে মুখে দুটি গুঁজে ছুটবি। আমার রান্না কখন হয়ে গেছে। লক্ষ্মী, সোনা, যা নাইতে যা এবার।'

শ্যামলী চলে যাওয়ার আগে বলল, 'বাবা, তুমি কিন্তু তাহলে আমাকে কথা দিচ্ছ, কিছুতেই যাবে না সেখানে। আমি অফিস থেকে ফিরে আসি। আজ তাড়াতাড়িই আসব। এসে তুমি আমি মা তিনজনে কোথাও বেড়াতে বেরোব।'

নীলাম্বর মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

শ্যামলী চলে গেল।

খোলা বারান্দায় রোদ এসে পড়ছিল। ক্যাম্বিশের সবুজ রঙের চট গুটানো ছিল। দড়ি খুলে সেই চট নামিয়ে দিলেন ইন্দিরা। খানিক দূরে একটি চামড়ার কাজ করা সুন্দর একটি মোড়া রয়েছে। সেটি টেনে নিয়ে ইন্দিরা স্বামীর পায়ের কাছে বসলেন।

নীলাম্বর বললেন, 'কী ব্যাপার। এত ভক্তির ঘটা যে, আমি কি অত ভক্তির যোগ্য?'

ইন্দিরা বললেন, 'যোগ্যই তো ছিলে।'

'এখন তো আর নেই!'

ইন্দিরা বললেন, 'তা যদি না থাকো, ভেবে দেখ সেটা কার দোষ।'

ফের উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নীলাম্বর। গলা চড়িয়ে নিজের বুক চাপড়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে

বললেন, 'আমার আমার আমার। আমি দৈবকে দোষ দিইনে, অদৃষ্টের দোহাই পাড়িনে, সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করিনে। সমস্ত দায় আমার, সমস্ত দোষ আমার। হল তো?'

কিন্তু ইন্দিরা স্বামীর পুরুষকারের দম্ভে ভুললেন না। বললেন, 'এখন তো স্টেজে নামা ছেড়ে দিয়েছ। এখন বাড়িতে বসে বসেই অ্যাকটিং চলে। তুমি অ্যাক্ট করতে থাকো, আমি মেয়েকে খেতে দিই গিয়ে।'

নীলাম্বর স্ত্রীর খোঁচায় আরো ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, 'এর মধ্যে অ্যাকটিং-এর কিছু নেই। সত্যি কথাই বলছি। যেটুকু যা করেছিলাম নিজের ক্ষমতায় করেছিলাম, আবার আমার নিজের ইচ্ছেয় সব ধূলিসাৎ করে দিয়েছি।'

ইন্দিরা আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে বললেন, 'বেশ করেছ। খুব বাহাদুরের কাজ করেছ।'

নীলাম্বর স্ত্রীর এই শ্লেষের হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলেন না। না পেযে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগলেন।

একটু পরে ইন্দিরাই আবার ট্রেতে করে পাঁউরুটি ডিম সিদ্ধ সেই সঙ্গে আরো এক কাপ চা নিয়ে এলেন।

নীলাম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ও সব আবার কেন। ওসব আমি কিচ্ছু খাব না। নিয়ে যাও সব।'

কিন্তু ইন্দিরা কিছুই সরিয়ে নিলেন না, হেসে বললেন, 'রাগ করছ কেন, খাও। আর এক কাপ চা পড়লেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যাবে।'

নীলাম্বর স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'ইন্দু, অনেক মেয়েকে হাতে ধরে অভিনয় শিখিয়েছি। তোমাকে তো সেভাবে কিছু শেখাইনি। তুমি কী করে এমন পাকা অভিনেত্রী হলে? কী করে এসব শিখলে?'

ইন্দিরা স্বামীর দিকে তাকালেন। খোঁটাটা হজম করতে একটু সময় নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রাণের দায়ে শিখেছি।'

ইন্দিরা ফের ভিতরে চলে গেলেন। নীলাম্বর ভাবলেন যাক একটু ঘা তাহলে দিতে পেরেছেন। মনে মনে খুসি হলেন নীলাম্বর। স্বামীর ওপর ইন্দিরার শ্রদ্ধা প্রেম আর সেবাযত্ন সব মিথ্যা, সব ভুয়ো—এমন ইঙ্গিতে তিনি যেমন রাগ করেন, যেমন দুঃখ পান তেমন আর কিছুতে পান না। তাই স্ত্রীকে আঘাত দিতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তোলেন নীলাম্বর। হয়তো অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। বাইরের জনপ্রিয়তা যেমন তিনি হারিয়েছেন, প্রায় বিস্মৃত, নির্বাসিত হয়েছেন, কিংবা নিজেই রঙ্গলোক থেকে নির্বাসন বরণ করে নিয়েছেন, নিজের পরিবারেও কি তেমনি অনেক কিছু হারান নি? স্ত্রীর কাছে, ছেলের কাছে, মেয়ের কাছে সেই শ্রদ্ধা আর সম্মান কি তিনি দাবি করতে পারেন? কি বিনা দাবিতে পান? ছেলে নীলাম্বুজ কদাচিৎ চিঠিপত্র লেখে। তাঁর কাছে প্রায় লেখেই না। মার কাছে লেখে, বোনের কাছে লেখে। অবশ্য পরিবারের ওপর আকর্ষণ তার এমনিতেই কমে গেছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে বার্লিনে সে নিজের ঘর সংসার পেতেছে। পুত্রেরও পুত্রলাভের খবর পেয়েছেন নীলাম্বর। সে এখন অনেক দূরে। অবশ্য এই দূরত্ব সে দেশে থেকেও রাখতে পারত। একই বাড়িতে থেকেও সে এমনি দুস্তর ব্যবধান গড়ে তুলতে পারত। ইন্দিরাও কি পাশে থেকে এত কাছে থেকে মাঝে মাঝে বিচ্ছেদসিন্ধুর ওপারে পড়ে থাকেন না?

আর মলি? তাঁর মেয়ে শ্যামলী? তার সঙ্গেওকি সেই সহজ সরল সম্পর্ক অবিকল অক্ষুণ্ণ আছে? স্ত্রী তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেন বলে অভিযোগ করলেন নীলাম্বর, কিন্তু মেয়ে? সেও কি সেই একই ধরনের অভিনয় করে না? শ্রদ্ধা না এলেও শ্রদ্ধা দেখায়, ভক্তি না এলেও ভক্তির ভান করে। বাপের ওপর কিছু সহানুভূতি আর কিছুটা অনুকম্পা হয়তো এখনো বজায় রেখেছে শ্যামলী কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। নীলাম্বর নির্মমভাবে মনে মনে স্ত্রী আর মেয়ের আচরণ খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করেন।

'কিছু খেলে না বাবা?'

অফিসের বেশে তৈরি হয়ে এসেছে শ্যামলী। আঁটসাট করে শাড়ি পরা। ছুটোছুটি করে ভিড় ঠেলে বাস ধরবে। হাতে শুধু একটি ঘড়ি। গয়নাগাটি কোথাও কিছু নেই। একেবারে নিরাভরণা। কী যে স্টাইল হয়েছে আজকাল মেয়েদের। কিছুকাল আগেও গাড়ি ছিল। বিক্রী করে দিতে হয়েছে। থাকলে হয়তো সেই গাড়িতে করেই ওকে অফিসে পাঠাতে পারতেন নীলাম্বর। ওর এত কষ্ট হত না।

শ্যামলী হাতঘড়ির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে ফের এক মিনিট দাঁড়াল। আর একবার অনুরোধ, 'খেয়ে নাও বাবা।'

নীলাম্বর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'অনেক খেয়েছি মা. অনেক খেয়েছি। আর ইচ্ছে নেই।

শ্যামলী বলল, 'ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হয় বাবা। শরীরের জন্যে খেতে হয়। খেয়ে নাও। আমি যাচ্ছি। তাড়াতাড়িই ফিরব। আমি না আসা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমরা একসঙ্গে বেরোব।'

নীলাম্বর ঘাড় কাত করে বললেন, 'আচ্ছা।'

শ্যামলী বারান্দা থেকে পথে নামল। অন্তত মিনিট সাতেক ওকে হাঁটতে হবে বাস ধরার জন্যে। কষ্ট হয় মেয়ের। কিন্তু যাতাযাতেব এই কষ্ট ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। যৌবনে কোন কৃচ্ছ্রতাই দুঃসাধ্য নয়। প্রথম বয়সে নীলাম্বরও কম কষ্ট কবেন নি। ওর কষ্ট কিসের। ও তো কোন ঘা খায়নি। অফিসে যায়, অফিস থেকে আসে। বাকি সময় বই পড়ে, ঘর সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে। কখনো বা মা আর মেয়েতে বসে গল্প করে। তখন মা-ই ওর বান্ধবী। অবশ্য সমবয়সী কলেজের পুরোন সহপাঠিনী, কি অফিসেব কলীগ—দু-একটি মেয়েবন্ধুও ওর আছে। তারাও ক্বচিৎ কখনো আসে। এসে ওর সঙ্গে গল্প করে যায়। এখনো বেশ সহজ সরল স্বাভাবিক ওর জীবন। কোন ছেলের সঙ্গে এখনো তেমনভাবে মিশতে দেখেননি নীলাম্বর। মিশলেই জটিলতা বাড়বে। অবশ্য তাঁর চোখের আড়ালে কী হয় না হয় তা নীলাম্বর জানেন না। জীবনের তিনি অনেক কিছু জেনেছেন।তবু নিজের মেয়ের মনে কী আছে তা পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। ভবানী ভ্রূকুটি ভঙ্গীং ভবঃ বেত্তি না ভূধরঃ। নীলাম্বরের ভূমিকা এখানে ভূধরের। তবু তাঁর ভবানী তাঁকে ভালোবাসে। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো' এ অনুরোধ কতবার কতজনের মুখে কতরকমভাবে শুনেছেন নীলাম্বর, আবার নিজের মেয়েব মুখেও শুনলেন। অবশ্য ওর মুখে এ কথার মানে আলাদা, স্বাদ আলাদা। এই স্বাদ ভারি মধুর। এই মুহূর্তে এই মাধুর্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। স্ত্রীকেও বৃথাই খোঁচা দিয়েছেন নীলাম্বর। কৌতুক করেই দিয়েছেন। মনে মনে জানেন, আজ সকালে ইন্দিরার এই সেবা যত্নের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত ভাঙচুরের মধ্যেও এই যে পারিবারিক সম্পর্কটুকু আছে, মন ফিরে ফিরে তাকেই ভিত্তি করতে চায়, তার কাছেই আশ্রয় খোঁজে। শুধু কি আশ্রয় চান, আশ্রয় কি দেনও না নীলাম্বর? যে যাই বলুক স্ত্রী আর ছেলে মেয়েকে কম ভালোবাসেন না তিনি। যখন বাসেন তখন তীব্র আবেগ আর প্যাশনের সঙ্গেই ভালোবাসেন। একজন লেখক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'স্নেহ প্রেম বন্ধুত্ব তোমার সবই জান্তব।'

জান্তব। হয়তো তাই। নীলাম্বর ভাবেন এক একজনের ভালোবাসার ধবন একেকরকম। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে জীবনটা বেশ কাটতে পারত। দুটি নারী দুই ভিন্নতর স্বাদে জীবনকে ভরে রাখতে পারত। কিন্তু তা হল না। তাঁর এক মন চাইল সহজ সরল স্বাভাবিক সম্ভ্রান্ত জীবন, আর এক মনের বিচিত্র বাসনা তাঁকে কাঁটায় ভরা বিঘ্নসঙ্কুল পথে পথে ঘোরাল। পৌরাণিক আধুনিক ঐতিহাসিক সামাজিক নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নীলাম্বর। কখনো সৎ চরিত্রের ভূমিকায় কখনো খল অসৎ চরিত্রের। প্রতিবারই হাততালি পেয়েছেন দর্শকদের। নানা রূপসজ্জায় তাঁর আসল রূপটি কি হারিয়ে গেছে! নাকি এই বিশ্বরূপই তাঁর নিজের রূপ? তিনি একই সঙ্গে ভালো আর মন্দ, সহজ আর জটিল, মহৎ আর ক্ষুদ্রতম?

খামের ভিতর থেকে থিয়েটারের ভূমিকালিপিটি আবার বার করে কী ভেবে সেখানা আবার খুলে

নিলেন নীলাম্বর। নামগুলির ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন। নায়কের ভূমিকায় নীরদবরণ আর নায়িকার ভূমিকায় সুরশ্রী হালদার। নীরদকে রতনবাবু অন্য দল থেকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সুরশ্রী তাঁর নিজের হাতে গড়া। নামটা পর্যন্ত তিনি নিজে দিয়েছেন। সেই নাম আজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সুরশ্রীর বোধহয় সে কথা মনেও নেই। শুধু কি নামই দিয়েছিলেন ? কিন্তু সুরশ্রী সব ভুলেছে। ভুলেছে নীলাম্বর না হলে থিয়েটারে তার আসাই হত না। এল যখন কতই বা ওর বয়স ? বড় জোর ষোল সতের। লেখাপড়া কিচ্ছু জানত না, অভিনয়েরই বা কী জানত। কিন্তু তালতলা অ্যামেচার ক্লাবে সেই সামান্য একটি সহচরীর ভূমিকায় ওকে দেখেই নীলাম্বর চিনতে পেরেছিলেন, মেয়েটির মধ্যে ক্ষমতা আছে। অসামান্য রূপবতী নয়, কিন্তু শ্রী আছে। তীক্ষ্ণতা আছে। তখনো ও গাইতে জানে না। কিন্তু কণ্ঠে স্বর আছে। নীলাম্বর খোঁজ নিলেন। বেনেপুকুরের অন্ধকার গলির পুরোন বাড়ির একতলা ঘরে ওরা থাকে। বিধবা মা আর এই কুমারী মেয়ে। কুমারী অবশ্য তখনো ছিল না। ওর মা ওকে থাকতে দেয়নি। জীবনের লেনদেন তের বছর বয়স থেকেই শুরু করেছিল সুরশ্রী। পরে শুনেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিন দেখেই জাত চিনেছিলেন তিনি। কিন্তু জাত দিয়ে কী হবে ? স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। এমন আরো কত রত্ন আরো কত অখ্যাত-কুখ্যাত স্থান থেকে নীলাম্বর কুড়িয়ে এনেছেন। এনে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। অবশ্য সবই মণিমাণিক্য ছিল না। তাদের মধ্যে অনেক ঝুটোমুক্তোও ছিল। ঝুটোর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তখন অসাধারণ আত্মবিশ্বাস নীলাম্বরের। ধুলোমুঠি তাঁর হাতে সোনামুঠি হয়ে ওঠে। রতন বিশ্বাস তখন তাঁর হাতে থিয়েটারের সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন। নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রী বাছাই, পরিচালনা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সবই এক হাতে করেন নীলাম্বর। রূপমহলে তাঁর তখন একনায়কত্ব।

মনে আছে প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাঁর সেই ভাবী নায়িকা তক্তপোষের ওপর একটা নীল রঙের ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে পড়ে ছিল। ও অসুস্থ শুনে নীলাম্বর চলে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওর মা বলল, 'না না, আপনি এমন করে ফিরে গেলে সুখলতা দুঃখ পাবে।'

বসবার ঘর থেকে ভিতরের ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সুখলতার মা।

'সুখি, একটু উঠতে পারবি ? নীলাম্বরবাবু এসেছেন।'

'নীলাম্বরবাবু ? এখানে ?'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিল সুখলতা। তক্তপোষ থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সামনে। জ্বরতপ্তা সেই তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে নীলাম্বরের মনে হয়েছিল বিদ্যুৎলতা। সেই বিদ্যুৎ মাথা নিচু করে সেদিন তাঁর পদস্পর্শ করেছিল, বলেছিল, 'আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।'

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'তুমি উঠলে কেন। তোমার জ্বর। শুয়ে থাকো তুমি।'

সে মৃদু হেসে বলেছিল, 'আমার জ্বর সেরে গেছে।'

কী মিষ্টি গলা। আর সেই শাদা সুন্দর সুগঠিত দাঁতের সারি। 'জ্বর সেরে গেছে' এ কথার মধুর ব্যঞ্জনাটুকু বুঝে নিতে নীলাম্বরের দেরি হয়নি। তবু তিনি তার কপালে হাত রেখেছিলেন, 'কই দেখি।'

বেশ জ্বর তখন ওর গায়ে। সেই জ্বর সর্বাঙ্গে, মনে সংক্রামিত হয়েছিল নীলাম্বরের। সুখলতার মা তখন নীলাম্বরকে আপ্যায়নের জন্যে চা খাবার পান সিগারেট আনাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আর সেই নীল রঙের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, সুখলতা তাঁর পায়ের কাছে বসেছিল।

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'তুমি আসবে আমাদের রূপমহলে ?'

সুখলতা হেসে বলেছিল, 'তা হলে তো স্বর্গ পাই।'

সেই রূপের স্বর্গে রসের স্বর্গে ওকে নিয়ে এসেছিলেন নীলাম্বর। ওর নামান্তর রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। জন্মান্তরও।

আদিতে অবশ্য মোহ। মোহসঞ্জাত বাসনা, না কি বাসনারঞ্জিত মুগ্ধতা। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মোহ তো সেদিন শুধু মোহেই শেষ হয়নি। নতুন নতুন নাট্যরসসৃষ্টির মূলকে সিঞ্চিত করেছে। হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। রতনবাবুর রূপমহলকে রূপোয় মুড়ে ফেলেছে। শুধু

একবার নয় বহুবার। পঙ্ককে ভয় করেন নি নীলাম্বর। জানতেন তার থেকে পঙ্কজের জন্ম হবে। বেনেপুকুরকেও তিনি পদ্মপুকুর করে তুলেছিলেন।

'কী হল ? নামটুকু বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?' ইন্দিরা ফের এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চমকে উঠলেন নীলাম্বর। স্মৃতিচারণ বন্ধ হল। থিয়েটারের ছাপানো শাদা কার্ড আর গোলাপী ভূমিকালিপি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ইন্দিরা পরিহাসের সুরে বললেন, 'আহা ও কি, ও কি, ও কী করছ ? চোরের ওপর রাগ করে কেউ কি মাটিতে ভাত খায় ? আমি এই চোখ বুঁজে রইলাম। তুলে নাও। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে রাখো। আহা তাতেও শান্তি।'

নীলাম্বর স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ! একটু হাসলেন নীলাম্বর, 'হাতী যদি পাঁকে পড়ে, চামচিকেয় লাথি মারে।'

ইন্দিরা বললেন, 'ছি ছি ছি। তোমার হল কি ? তুমি কি আজকাল ঠাট্টা তামাসাও বোঝ না ?'

এগিয়ে এসে স্বামীব পা ছুঁয়ে প্রণাম কবলেন ইন্দিরা। লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন একটু, 'কতকাল পরে বলতো।'

নীলাম্বর বললেন, 'কতকাল পরেই বটে। কিন্তু তোমার কোনটুকু তামাসা ইন্দু ? আগেরটুকু না এই শেষেরটুকু ?'

ইন্দিরার দুটি চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তুমি—তুমি একটি পাষাণ।'

মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন ইন্দিরা।

নীলাম্বর চুপ করে রইলেন।

অনেক—অনেককাল আগে বিয়েব সেই প্রথম দ্বিতীয় বছরে নীলাম্বরের মা ইন্দিবাকে শিখিয়ে দিতেন, 'স্বামীকে প্রণাম কোরো।'

মফঃস্বল শহরের বাড়ি থেকে প্রতিবার কলকাতায় আসবার সময় নীলাম্বরকে স্ত্রীর প্রণাম নিয়ে আসতে হত। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে মা দুজনকেই বকতেন। বলতেন, 'আমি যতদিন আছি এ নিয়ম তোমাদেব মানতে হবে। শোননি ববিঠাকুরের গান, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার কাজে। ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে স্বামীকে প্রণাম করে তবে ঘর থেকে বেরোবে।'

লেখাপড়া জানতেন মা। শহবেব কযেকটি রাজপরিবারের সঙ্গে মামাদের বন্ধুত্ব ছিল। মা নিজেও যেতেন সে সব বাড়িতে। বই চেয়ে এনে পড়তেন।

নীলাম্বব হেসে বলতেন, 'মা ও গানেব ও অর্থ নয়।'

মা বলতেন, 'গানের কি কেবল একটি অর্থই থাকে বাবা ?'

কিন্তু মা বেঁচে থাকতেই সেই সেকেলে নিয়ম ভেঙে দিয়েছিলেন নীলাম্বব। স্ত্রী শুধু শয্যার সম অংশভাগিনীই তো নয়, সংসারেব সর্বত্র তার সম অধিকাব ! বয়সে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায় যে অসমতা আছে প্রেম প্রীতি সখ্য তা দুব করে দিক। নীলাম্বর ছিলেন এই আদর্শের অংশীদাব।

স্ত্রীর প্রণাম নেননি নীলাম্বর, কিন্তু তরুণীঅভিনেত্রীর প্রণাম নিয়েছেন। স্টেজে উঠবাব আগে তাবা নিত্য নীলাম্বরের পায়ের ধুলো নিত। বিদায় নেওয়ার সময়ও তারা ধুলো নিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু যদি তাদের প্রণমাই হয়ে থাকতেপারতেননীলাম্বর, শুধু যদি পাথবেব দেবতার মত পুজো পেয়ে তুষ্ট থাকতেন কোন কথা ছিল না। কিন্তু তা পারলেন কই। যাদের প্রণাম নিয়েছেন, তাদের কারো কারো পায়ের তলায় নিজেকেও নামিয়ে এনেছেন। তাদেরও কারো কারো কোমল সুন্দর দুটি পা কোন কোন উচ্ছল বাতে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। কেউ আপত্তি করলে বলেছেন, 'তুমি রূপলক্ষ্মী, রসলক্ষ্মী, তুমি তো সামান্য নও।'

ইন্দিরা আর সামনে এলেন না। আড়াল থেকেই তাগিদ দিলেন, 'দোহাই তোমার এবার নাইতে যাও। ঠাণ্ডা ভাত নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকব ?'

বারান্দা থেকে এবার ঘরে এলেন নীলাম্বর। শোবার ঘর মাত্র দুখানি ! জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা ! একটি দোতলা বাড়ির আসবাবপত্র অনেক ছেড়ে দিয়ে কিছু বা আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে ছড়িয়ে

দিয়ে, বেছে বেছে ইন্দিরা বাকি জিনিসগুলি নিয়ে এসেছেন। সে বাড়ি নীলাম্বরের নিজের ছিল, এ বাড়ি ভাড়া। অনেক খুঁজেপেতে শহরতলীর নিরিবিলি গলিতে এই একতলা বাড়িটি পছন্দ করেছেন নীলাম্বর। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ থেকে বেশ দূরে থাকতে পারবেন। অবশ্য তারা আজ নিজেরাই দূরে সরে গেছে। তবু জনচক্ষুর বিশেষ করে স্বজনচক্ষুর আড়ালে এখন অজ্ঞাতবাস করতে চান নীলাম্বর। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে একবার তিনি কীচক হয়েছিলেন, আর একবার অর্জুন। এখনো তিনি সব্যসাচী, শুধু গাণ্ডীবটি নেই।

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন নীলাম্বর। বালতির পর বালতি জল ঢাললেন গায়ে মাথায়। যেন মনের সমস্ত উত্তাপ গ্লানি ক্লেদ ধুয়ে ফেলতে চান।

স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরে খালি গায়ে খেতে এলেন নীলাম্বর।

সেই প্রথম যুগে ইন্দিরা বলতেন, 'তোমার আবার জামার দরকার কি। গায়েব যা রঙ তোমার। খালি গায়েও মনে হয় রঙীন জামা পরে আছ।'

নিজের রঙের সুখ্যাতি তারপর রঙ্গজগতের আরো অনেকের মুখে শুনেছেন নীলাম্বর, স্ত্রীর সেই মুগ্ধ চোখ দুটির কথা আজ ফের তাঁর মনে পড়ল।

নীলাম্বর বললেন, 'ও কি, শুধু একটি জায়গা করেছ কেন ইন্দু! তোমার ভাতও বেড়ে নাও। আমরা একসঙ্গে বসে খাব।'

ইন্দিরা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'না তুমি আগে খেয়ে নাও।'

নীলাম্বর এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত দিলেন, 'আবার আগে পরে কেন। এসো আমরা এক পাতে বসে খাই। মনে আছে সেই প্রথম প্রথম গুরুজনদের লুকিয়ে লুকিয়ে— । আজ আর তার দরকার নেই।'

আজ নীলাম্বরের খোলা জায়গায় থাকাও যা লুকিয়ে থাকাও তাই। আজ গুরুজনরা লোকান্তরে লঘুজনরা স্থানান্তরে। আজ তাঁর ড্রাইভার নেই, দরোয়ান নেই, ঝি নেই, ঠাকুর নেই, চাকর একটি ছিল, ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। আজ আর কাউকে লুকোবার কোন কথাই ওঠে না।

কিন্তু ইন্দিরা স্বামীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'না।'

নীলাম্বরের মনে পড়ল, তখনকার দিনে ইন্দুর মান ভাঙানো কত সহজ ছিল। এ মুহূর্তের মান ও মুহূর্তে ভাঙত। যেন একটি রঙীন বুদবুদ। চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসির দূরত্ব ছিল সামান্য। আজ আর সেদিন নেই। আজ জীবন বড় কঠিন। আজ বুক ভেঙে খান খান হলেও মান ভাঙে না।

একাই খেয়ে নিলেন নীলাম্বর। ইন্দিরা খেলেন কি খেলেন না তাঁকে দেখতে দিলেন না। ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন। নীলাম্বর জানেন, আজকাল নাটক নভেল-আর বেশি পড়েন না ইন্দিরা। পড়েন মহাপুরুষ প্রসঙ্গ। ক্ষুদ্র পুরুষের সঙ্গ এড়াবার এছাড়া আর কী উপায় আছে।

নীলাম্বর নিজের ঘরে চলে এলেন। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। এ ঘরে তিনি আজকাল একাই থাকেন। এই রঙ্গমঞ্চে তিনি এখন একক। সংলাপ নেই, আছে শুধু স্বগতোক্তি। দেয়ালে এখনো দু-তিনখানা বাঁধানো মানপত্র টানানো আছে। শ্যামলী নামিয়ে ফেলতে দেয়নি। জানলার নিচে বড় একটা বেতের ঝুড়িতে পুরোন চিঠিপত্রের রাশ। অনুরাগীদের, বেশির ভাগ অনুরাগিনীদের স্তবস্তুতিও। অনেক হারিয়ে গেছে, তবু সব যায় নি।

দেয়াল ঘেঁষা গোটা তিনেক আলমারি। আলমারি ভরা বই। এ দেশের ও দেশের এ যুগের সে যুগের সাহিত্য, বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যের সংগ্রহ পড়েছেন নীলাম্বর। তবু আরো কত বাকি। শব্দ শাস্ত্র অনন্ত, রঙ্গসমুদ্র অপার। নতুন পাঠে নতুনতর স্বাদ। পড়ে পড়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাক্যের মধ্যে রস, শব্দের মধ্যে রস, অক্ষরে অক্ষরে রসক্ষরণ। এই রসের স্বাদ যে পেয়েছে সে কেন অন্য রসের সন্ধান করে, কেন অসার সুরাসার চায়, কেন সঙ্গসুধা খোঁজে। কিন্তু জীবনের তৃষ্ণা বিচিত্র। সেই ভোগবতীর স্রোত সহস্র পথে সহস্র খাতে বয়ে চলতে চায়। নীলাম্বর আজ বুঝতে পেরেছেন, চাইলেও তা বইতে দিতে নেই। জীবন তাহলে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়। কোন

সৃষ্টিই সম্ভব হবে না। যিনি স্রষ্টা তাঁর সম্ভোগ শুধু সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বাইরে যাবে না। কিন্তু এ সব নীতি কথা তো মানুষ শিশু-বয়স থেকে কণ্ঠস্থ করে। কিন্তু ক'জন মানে ? মানতে পারে কজন ? নিজের মধ্যে যে দুজন ভিন্ন সত্তা আছে, তাদের একজন মানে, একজন মানে না, একজন গড়ে, একজন ভাঙে।

শুধু বই থাকলেই হয় না। বইয়ের পাতা খুলতে জানা চাই। জানলার বাইরে একটি জীর্ণ দেয়াল। দেয়ালের ওপারে যে ক'টি নারকেল গাছ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা সতেজ, তারা চিরসবুজ। গাছগুলিতে কখনো ফল ধরে কিনা নীলাম্বর লক্ষ্য করেন নি, কখন ধরে, কারা কখন পেড়ে নিয়ে যায় নীলাম্বর জানেন না। হয়তো ফল ধরে না, হয়তো ওরা চির নিষ্ফলা। কিন্তু তা নিয়ে কোন কিছু মনে হয় না নীলাম্বরের। এই যে সবুজের সমারোহ এই কি যথেষ্ট নয়। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে, নীলাম্বর চেয়ে চেয়ে দেখেন। রোজ নয়, কখনো কখনো। কিন্তু যখন দেখেন, দেখবার মত চোখ থাকে মন থাকে তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয় শুধু এই পাতা নড়া দেখে দেখেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বইয়ের পাতা থেকে গাছের পাতা, গাছের পাতা থেকে বইয়ের পাতা। কিন্তু চোখের পাতা খুলতে জানা চাই।

শহরের বাইরে এসে বিস্তীর্ণ আকাশ পেয়েছেন নীলাম্বর। কিন্তু সে আকাশ কদাচিৎ চোখে পড়ে। ভুলেই যান যে আকাশ আছে আর তার দিকে তাকাতে হয়। নিজের নামেরও যে ওই মানে তাই বা কদিন মনে পড়ে ? জীবনের কোন মানে আছে কিনা সে জিজ্ঞাসাই বা মনে জাগে ক'দিন ? নীলাম্বর কতদিন এই জানলায় বসে সোনালী বিকেল দেখেছেন। কত যে বিচিত্র রঙ আর বিচিত্র রূপ তার সীমা নেই। থিয়েটারের গ্রীনরুমে আর কতটুকু রঙ ছিল ? তারপর সব রঙ ঢেকে দিয়ে আঁধারের কালো পর্দা নেমে আসে। সবুজ গাছগুলি এখন পটে আঁকা কৃষ্ণপুত্তলী। তাদের মাথার ওপর দিয়ে তখন আকাশ দেখা যায়। আর আকাশের অন্তর্গত তারা। অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা এও যেন এক সুবিশাল আদিহীন অন্তহীন গ্রন্থের দিগন্তজোড়া পাতা। ওলটাবার দরকার নেই। রোজই একই পাঠ। তবু পড়তে জানলে নিত্যনতুন স্বাদ। মনে হয় সকালের বিকেলের সন্ধ্যার আর গভীর রাত্রের এই আকাশ দেখে দেখেও বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পাবেন নীলাম্বর। কিন্তু এই প্রশান্ত নির্মল নিরাসক্ত মন কি অষ্টপ্রহর থাকে ?

শুধু নারীর মধ্যেই রূপ দেখেছেন নীলাম্বর, এ কথা ভুল। জলে স্থলে আকাশে বস্তুতে প্রাণীতে বিচিত্র রূপও কি তিনি দেখেন নি ?

তবু নারীর রূপ তাঁকে যতখানি আকর্ষণ করেছে মত্ত করেছে তেমন আর কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু নারী তো শুধু দৃশ্যপটই রচনা করেনি। জীবনের মঞ্চে সে সজীব সক্রিয় ভূমিকায় নেমেছে। কখনো দুখানি হাতে তাঁকে টেনেছে, কখনো দুখানি হাতে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে। নারী শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ নয়, তার স্বতন্ত্র সত্তা, ইচ্ছা, রুচি, অভিরুচি আছে।

নীলাম্বর নিজের অতীতকে চিরে চিরে দেখেন। তাঁর যে রূপসৃষ্টি তার মূলেই কি এই রূপতৃষ্ণা ? দুইটির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে ? কিন্তু শুধু রূপবোধ, শুধু সৌন্দর্যের অনুভূতির দোহাই পেড়েই কি পার পাওয়া যায় ? শুধু রূপই যে তাঁকে টেনেছে একথা তো তিনি বলতে পারেন না। কত কুরূপাও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তবে কি রূপ নয়, সৌন্দর্য নয়, আসক্তিই সব, অভ্যাসই সব ? কিন্তু অভ্যাসের মধ্যে শুধু বন্ধন আছে, তার মধ্যে মুক্তির স্বাদ কই, তার মধ্যে নিত্যনবনীতা কই ? আবার মনে হয়, এ শুধু তাঁর শ্রান্ত ক্লান্ত পরাজিত মনের মুহূর্তের চিন্তা। প্রতিটি নতুন মুখ কি তাঁকে নতুন সুখ দেয়নি ? প্রতিটি প্রণয়কে মনে হয়নি কি প্রথম প্রণয় ?

ওই সুরশ্রীকেও অসামান্য রূপবতী কেউ বলবে না। রূপসজ্জার পরে ওকে যেমন দেখায়, বিনা সজ্জায় তেমন নয়। বলতে গেলে সব মেয়েই তাই। সব মেয়েই সজ্জানির্ভরা, আর সব নারীই শুধুমাত্র রজনীগন্ধা। কমলিনীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে, বেশির ভাগই কুমুদিনী।

অনেক বন্ধু তাঁকে বলেছেন, 'ওই সুরশ্রী না ডিম্বশ্রী ওকে নিয়ে অত কেন ? ওর মধ্যে তুমি কী পেলে ?' নীলাম্বর জবাব দিয়েছেন, 'কী পেয়েছি দেখতে হলে আমার দুটি চোখ তোমার ধার নিতে হবে।'

পানরসিক কেউ থাকলে হেসে বলেছেন, 'না বন্ধু, তোমার গ্লাসটি ধার নিলেই যথেষ্ট।'

কিন্তু নীলাম্বর জানেন, শুধু গ্লাসের মাহাত্ম্য নয়। মদ না খেয়েও কতদিন তিনি রয়েছেন। মত্ততা যায়নি। পথ থেকে এমন অনেককে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন, যারা সত্যিই ঘরে আসবার যোগ্য নয়। যাদের কোন বাজারদর নেই, তাঁর আদরটুকুর মধ্যেই তাদের অমূল্যতা।

ওই সুরশ্রীও তাই। নীলাম্বর শুধু ওর ফ্ল্যাটভাড়া দেননি, ঝি চাকর রেখে দেননি, আরো অনেক কিছু দিয়েছেন। ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, অভিনয় শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাসনারঞ্জিত ভালোবাসাও দিয়েছিলেন। নীলাম্বর জানেন, পুরুষরা দিয়ে দিয়েই পায়। আর মেয়েরা শুধু নিতে জানে। যার আছে সেই দেয়। তার কত দান অপাত্রে যায়, কত মুক্তো উলুবনে ছড়িয়ে পড়ে, তবু উজাড় হবার অভ্যাস ছাড়ে না। নিজের আচরণের সমর্থন খোঁজেন নীলাম্বর। তারা দিতে দিতে নিঃস্ব হয়, তবু দিতে ছাড়ে না। তারা লুপ্ত হয়, নিশ্চিহ্ন হয়, আগুনে দগ্ধ হয়, তবু পতঙ্গবৃত্তি ছাড়ে না।

সুরশ্রীকেও দিয়েছিলেন নীলাম্বর। দুহাত ভরেই দিয়েছিলেন, কোন কার্পণ্য করেন নি। কার্পণ্য তাঁর স্বভাবে নেই। মিতাচার মিতব্যয় তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি মূর্তিমান অমিতাচারী।

দু'হাতে দিয়েছেন নীলাম্বর। দু'হাতে নিয়েছে সুরশ্রী। সেও কিছু দিয়েছে বইকি। নীলাম্বর অকৃতজ্ঞ নন। সুরশ্রী তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, তাঁর বহু সৃষ্টির মূলে উৎসাহ দিয়েছে। অনেক সময় না জেনেই দিয়েছে। ওদের দান ওইরকমই। গাড়ি বাড়ি আসবাব অলঙ্কারের মত তা চোখে দেখা যায় না। তবু যে দেখতে জানে সেই দেখে, যে পেতে জানে সেই পায়। পুরুষরা বস্তুর মাধ্যমে দেয়, ভাবের মাধ্যমে পায়। এ এক অদ্ভুত বিনিময় ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে দেহ দেখেই তারা মত্ত হয়, উন্মত্ত হয়, তবু দেহকে আঁকড়ে ধরে তারা দেহাতীতের স্বাদ খোঁজে। নীলাম্বর ভাবেন, মেয়েরা বোধ হয় অত হয় না। কিন্তু মত্ততা দেখতে ভালোবাসে। পুরুষের মত্ততার মধ্যে তাদের অহংবোধ তৃপ্ত হয়। প্রত্যক্ষতায় তাদের লজ্জা, পরোক্ষতায় পরিতৃপ্তি।

সুরশ্রীকে নীলাম্বর দিয়েওছেন পেয়েওছেন। আরো দিতেন, আরো পেতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, যা ভিতরের বস্তু তা বাইরের আঘাতে ভাঙল। ভেঙে দিলেন, রতনবাবু, ভেঙে দিল বৈষয়িক বিপর্যয়। নীলাম্বরের নির্বাচিত পর পর দুখানি নাটক সাধারণ দর্শকরা নিল না। তারাই তো প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয়খানাতেও কোনরকমে লোকসানটা বেঁচে গেল। তারপর রতন বিশ্বাসের সঙ্গে ঝগড়া। তিনি বললেন, 'দোষটা দর্শকদের নয়, দোষটা তোমার। তুমি নিজের খেয়াল-খুসি মত চলেছ। তাতে ওরা কেন খুসি হবে?'

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'শুধু যদি ওদের খুসির কথাটাই আগে ভাবি, তাহলে তো নতুন কিছুই করা যায় না। কিসে খুসি হতে হবে ওদের তা শেখানোটাও আমাদের কাজ।'

রতনবাবু বললেন, 'তাহলে এসো, থিয়েটারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমরা পাঠশালা খুলি। ছাত্র পড়াই।'

তারপর নীলাম্বরের চরিত্রের আরো অনেক খুঁৎ, আরো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বার করলেন রতনবাবু। যা থিয়েটারের বেশির ভাগ অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যেই থাকে, সফল হলে সে-সব দোষের কথা কেউ মনে রাখে না, কিন্তু অসফল হলে পাঁচ বছরের ছেলেও সেই দিকে তর্জনী বাড়ায়।

কত অভিযোগই না এসেছে। রিহার্সালে গাফিলতি করেছেন নীলাম্বর। দিনের পর দিন কামাই করেছেন। যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাতেও নাকি স্টেজে তাঁর পা টলেছে। গলায় জড়তা ধরা পড়েছে। সব অতিরঞ্জিত। টাকাকড়ির গরমিলের গুজবও তাই। শেষ পর্যন্ত রতনবাবু, রূপমহলের অন্দরমহলে আর একজনকে নিয়ে গেলেন। নীলাম্বরকে বললেন, 'তুমি বরং ক'টা দিন বিশ্রাম করো। ছুটি নাও।'

নীলাম্বর চিরদিনের মত ছুটি নিয়ে চলে এলেন। অবশ্য সহজে আসেননি।

সুরশ্রীকে বললেন, এসো আমরা নতুন কিছু গড়ে তুলি।'

গড়ে তুলবার কম চেষ্টা করেন নি নীলাম্বর। বার বার লোকসান দিয়েছেন। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বলেছেন, 'যতবার পড়ব ততবার উঠব।'

কিন্তু ওঠা আর হয়নি। মঞ্চ গড়বার শক্তি আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার শক্তি ভিন্ন ধরনের।

শেষে একদিন সুরশ্রী বলল, 'এভাবে বসে থাকলে সব যে ভুলে যাব।'

নীলাম্বর বললেন, 'আমিই তো আছি। আমি তোমাকে ভুলতে দেব কেন।'

কিন্তু অত সহজে সুরশ্রীকে ভোলানো গেল না। তার যশ চাই, অর্থ চাই, প্রতি রাত্রে হাততালি চাই। শুধু একজনের হাতের মধ্যে হাত রেখে মুখোমুখি বসে থাকলে তার চলবে কেন?

নীলাম্বর অভিমান করে বললেন, 'বেশ যাও।' তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে রঙ্গিনী থিয়েটারে চলে গেল। সে যা চেয়েছিল তাই পেল। তার বেশিই পেল হয়তো।

নীলাম্বব যা পেয়েছিলেন তা হারাতে লাগলেন। একজনের আরোহণ আর একজনের ক্রমাগত অবরোহণ। বছর পাঁচেক ধরে সেই পালা চলল। তারপর সব নিশ্চল।

জীবন যেন পাশার দান। পাশা যখন হায়ায় তখন সাধ্য নেই কারো জিতবার। জীবনের মত বড় জুয়াড়ী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। নীলাম্বব ভাবেন মাঝে মাঝে।

এক সময় পাশা খেলার প্রচণ্ড নেশা ছিল নীলাম্বরের। কিছুতেই হার মানতে চাইতেন না। অনেক ভেবে চিন্তে গুটি চালতেন। তিনি যে পাকা খেলোয়াড় এ সুখ্যাতি সবাই করত। তবু মাঝে মাঝে হেরে যেতেন নীলাম্বর। দানে হারতেন। নিজেব হাতের দান খারাপ পড়লে কিছু উপায় ছিল না। কিন্তু সঙ্গীর পাশায় খারাপ দান পড়লে তিনি তাকে শুধু মারতে বাকি রাখতেন। কম বয়সী ছেলে ছোকরা কেউ হলে কান মলে তাকে তুলে দিতেন আসর থেকে।

আজ অদৃশ্য হাতের কানমলা তিনি নিজে খাচ্ছেন। অদৃশ্য হাতেব? অন্যের হাতের? না নীলাম্বব তা স্বীকার করেন না। শাস্তি যদি পেয়ে থাকেন সে শাস্তি তাঁর নিজের হাতের, ডুবে যদি থাকেন—স্বখাত সলিলে। এই স্বীকৃতির মধ্যেই পৌরুষ। এই তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট অহঙ্কার। জীবন হয়তো একেবারে পাশাব দান নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের মত এরও কতকগুলি নিয়ম আছে। তার নামই কি নৈতিক নিয়ম! সে কি গণিতেব নিয়মের মতই অমোঘ? জীবনও কি দাবা পাশার ছক? চালে ভুল হলে আর রক্ষা নেই।

'বাবা, পাঁচটা বাজে আর কতক্ষণ ঘুমোবে? চা টা খাবে না? ওঠ এবার।'

শ্যামলীর ডাকে ঘুম ভাঙল নীলাম্বরেব। ঘুম? তিনি কি তাহলে ঘুমোচ্ছিলেন? তিনি যা দেখছিলেন, তা কি তাহলে সত্যি নয়? বাস্তব নয়?

নীলাম্বর বললেন, 'কখন এলি মলি।'

শ্যামলী বলল, 'অনেকক্ষণ হল। ছুটি নিয়ে আগেই চলে এসেছি।'

নীলাম্বর হাসলেন, 'পাছে আমি পালাই সেইজন্যে? আমাকে পাহারা দিবি, ধরে রাখবি?'

শ্যামলীও হাসল, 'তা দরকার হলে দিতে হবে বই কি।'

নীলাম্বরের মনে পড়ল এক সময় পাহারা ওরা কম দেয়নি। স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে কম চৌকিদারী করেনি। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে কতদিন তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে সন্ধ্যার পর থেকে অজস্রবার ঘরবার করেছে। পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছে বাবা কখন ফিরবেন, কী মূর্তিতে কী কাণ্ড করে ফিরবেন।

শ্যামলী বলল, 'অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ বাবা।'

নীলাম্বর বললেন, 'ভারি সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

শ্যামলী বলল, 'কিসের স্বপ্ন বাবা?'

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে একটু হাসলেন, 'শুনলে তো রাগ করবি। সেই থিয়েটারের স্বপ্ন।'

শ্যামলী মুখ ভার করে বলল, 'তুমি আর কী দেখবে।'

নীলাম্বর বললেন, 'যা বলেছিস। ছেলে বেলা থেকে ওই তো কেবল দেখে এসেছি। স্কুল কলেজের পরীক্ষার সময় পর্যন্ত থিয়েটার দেখা বাদ দিইনি। তবু পাশ করে গেছি। শুধু অভিনয় দেখেছি আর অভিনয় করেছি। জীবনে আর কিছুই করিনি। শুধু মাঝখানে বছর দুয়েক কেরানীগিরি

করেছিলাম। কিন্তু সেই কলম পেশা কিছুতেই পোষাল না। আবার কি যাব অফিসে ? এই বয়সে কেউ কি নেবে ?'

শ্যামলী বলল, 'কী দরকার বাবা ? আমিই তো আছি।'

নীলাম্বর ভাবলেন, তা ঠিক। ওরা এখনো আছে। শেষ পর্যন্ত জীবনে এমনি দুজন একজনই থাকে। সেই পুরোন বন্ধন, সেই চিরন্তন আশ্রয়।

শ্যামলী বলল, 'যাই তোমার চা নিয়ে আসি।'

যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নীলাম্বর, মেয়ের কাছে তা বলতে ভরসা পেলেন না।

থিয়েটারের সেই গ্রীনরুম। কী নাটক মনে পড়ছে না। কিন্তু তিনিই প্রধান অভিনেতা। নবীন যুবকের সর্বাঙ্গে রাজ সজ্জা। আর সেই নাটকের নায়িকা, একটু বাদেই মঞ্চের ওপর যার সঙ্গে সেই রাজপুত্রের মধুর মান অভিমান, প্রণয় সম্ভাষণ শুরু হবে, মঞ্চে উঠবার আগে সে নিচু হয়ে নীলাম্বরকে প্রণাম করছে। নীলাম্বর মঞ্চে প্রণয়ী, গ্রীনরুমে শিক্ষাগুরু। প্রণতা সেই তরুণী নারীটির রূপের তুলনা নেই। দীর্ঘ বেণী পিঠে প্রলম্বিত। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই প্রণত অবনত ভঙ্গিটি চিনতে আর বাকি নেই নীলাম্বরের। সেই পুষ্পিতা পদ্মিনী নারী নিজেই যেন অতনুর পুষ্পধনুর আকার নিয়েছে।

যবনিকার ওপাশে প্রেক্ষাঘরে উজ্জ্বল আলোর জোয়ার। সে ঘর জনসমাগমে ভরে উঠেছে। উৎসুক অধীর নাট্যামোদীর দল অপেক্ষা করছে। এবার যবনিকা উঠবে।

শ্যামলী ফের চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'মনে আছে তুমি আজ আমাদের সঙ্গে বেরোবে ? মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও বাবা।'

'তৈরি হয়ে নেব ?

'নেবে না ?'

'তোর মা যাবে তো ?'

'না গেলে ছাড়বে কে ? তুমি আর আমি দুজনে জোর করে নিয়ে যাব। যাই মাকে তাড়া দিয়ে আসি।'

চা শেষ করে কাপটি নামিয়ে রাখলেন নীলাম্বর। বড় অকৃতজ্ঞ সুরশ্রী। ঘুরে ফিরে আবার সেই রতনবাবুর থিয়েটারেই যোগ দিয়েছে। যেখানে অর্থ সেখানে সুরশ্রী, যেখানে যশ সেখানে সুরশ্রী। যেখানে তরুণ চারুদর্শন নট সেখানে সুরশ্রী। এই মুহূর্তে নীলাম্বরের মনে পড়ল না তিনিও তাই ছিলেন।

কিন্তু কেউ কেউ বলে সুরশ্রী তাঁকে ভুললেও তাঁর সেই অভিনয়ের ধারাকে ভুলতে পারে নি। তারপর অনেকের অনেকরকম হাতের ছাপ ওর ওপর পড়েছে। কিন্তু নীলাম্বরের ছাপ নাকি এখনো ধুয়ে মুছে যায়নি। কেউ কেউ বলে তা আজও স্পষ্ট অপরিম্লান। বড় দেখতে ইচ্ছা করে। অনেকদিন ওর অভিনয় দেখেন নি নীলাম্বর। আরো কত নিপুণা হয়েছে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কী করে যাবেন নীলাম্বর ? বুক পোস্টে পাঠানো একখানা কার্ড সম্বল করে কী করে যাবেন ? অত তাচ্ছিল্যের আমন্ত্রণে কী করে সাড়া দেবেন ? চাকরবাকর কেউ থাকলে, এই কার্ড দিয়ে তিনি তাকে পাঠিয়ে দিতেন। উচিত জবাব হত।

নীলাম্বর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মেয়ে বোধহয় এবার সাজতে গেছে। মাকে রাজী করাতে পেরেছে কিনা কে জানে। ইন্দিরা আজকাল আর সহজে বেরোতে চান না। বলেন, 'কোন্ মুখে বেরোব।' নীলাম্বর তো আর সে কথা বলতে পারেন না। তাঁকে কতবার কতজনের মুখ ধার করতে হয়েছে। সেই সব ধারকরা মুখই যেন তাঁর নিজের মুখ। যখন নিজের কথা একেবারে ভুলে সেই সব পরের মুখে কথা বলেছেন নীলাম্বর তখনই বেশি সার্থক হয়েছেন। এখন আর তা হবার জো নেই। এখন নিজের ওপর নিজে চেপে বসেছেন। এখন নীলাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় নীলাম্বর চৌধুরী। সে ভূমিকা তুচ্ছ নগণ্য। কিন্তু এতকাল তিনি যা দিয়েছেন তা কি কিছুই গণ্য করবার মত নয় ? তবু লোকে ভুলে যাবে, সবই ভুলবে। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। তিনিও হারাবেন। হয়তো এরই মধ্যে সব হারিয়ে বসে আছেন। পটোত্তলনের পর পটোত্তলন হচ্ছে। কে

কাকে মনে রাখে। মনে রাখাটাই যে বিচারের সব চেয়ে বড় মাপকাঠি তাইবা কে বলল। তুমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কিছু দিয়ে থাকো সেই মুহূর্তটিকে তুমি পেলে। সেই মুহূর্তটিতে তুমি অমর। সিদ্ধিতে নয়, সাধনার সেই বিরল মুহূর্তগুলির মধ্যেই অমরত্ব। তারপর জীবনভর অসংখ্য মৃত্যু আর অসংখ্য মুহূর্ত, অসংখ্য মুহূর্ত আর অসংখ্য মৃত্যু। যাঁরা ক্ষণজন্মা তাঁদের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম, ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি। যারা ক্ষণজীবী, একটি কি দুটি শুভক্ষণই তাদের সারাজীবনের সম্বল।

নীলাম্বর উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এলেন উঠোনে। পাঁচিলের ধার দিয়ে ফুলের টব পেতেছে শ্যামলী। কিছু বা অর্কিড। শখ আছে মেয়ের। অফিসের কেরানীগিরির পর যতটুকু সময় পায় উদ্যানচর্চা করে। একটি ফুলকে ফুটিয়ে তোলাই কি কম সৃষ্টি? তাতে কি কম আনন্দ?

দেয়ালের ডানদিকে আর একখানি ছোট ঘর। ভজনের বাসগৃহ। ভজন কালই ছুটি নিয়ে চলে গেছে। দোরটা খোলা।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। ওর ঘরেও সিনেমা অ্যাকট্রেসদের ছবি টাঙানো। হাসলেন নীলাম্বর। প্রভু ভৃত্য কেউ মুক্ত নয়। উত্তর দক্ষিণ জুড়ে একখানি দড়ি টানানো। তার ওপর ছেঁড়া ময়লা জামা আর পাজামাটা ফেলে গেছে। বাবু কম নয় ভজন। বেশ নবাবী আছে। কিছুদিন বাদে বাদেই নতুন জামা কাপড়ের টাকা শ্যামলীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। মাসে দুবার সেলুনে যাবার পয়সা চায়।

হঠাৎ কী হল, ওর সেই ছেঁড়া জামাটা তুলে নিলেন নীলাম্বর। ঘৃণা নেই, অপ্রবৃত্তি নেই, সেই জামা পরলেন। দোর ভেজিয়ে দিয়ে পরে নিলেন পাজামাটাও। ঘরের কোণে একরাশ ঝুল। দুহাতে তুলে নিয়ে মুখে মাখলেন। এবার মুখ দেখাতে কোন অসুবিধে নেই।

গ্রীনরুমে মেকআপ শেষ হল। এবার মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন নীলাম্বর। দেয়ালের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালেন বারান্দার সামনে। চাকরের গলার অবিকল নকল করে ডাকলেন, 'ঠাকরুণ। কত্তাবাবুর কার্টখানা দিন।'

ইন্দিরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বিকেলে গা ধুয়েছেন, চুল বেঁধেছেন, নীল পেড়ে শাড়ি পরনে। কপালে সিঁদুরের টিপ। প্রথমে একটু চমকে উঠলেন, তারপর স্বামীকে চিনতে পেরে হেসে মুখে আঁচল চেপে বললেন, 'ও কি সঙ হয়েছে?'

নীলাম্বর বললেন, 'যাক জন্ম সার্থক। তবু একটু হাসি দেখলাম মুখে।'

তারপর ফের ভজনের গলার অনুকরণ করে বললেন, 'কত্তাবাবুর কার্টখানা দিন। থিয়েটার দেখে আসি, বড় বাহারের থিয়েটার নাকি হচ্ছে আজ?'

ইন্দিরার দেওয়ার অপেক্ষা রাখলেন না নীলাম্বর। সকাল থেকে যে কার্ডখানা চেয়ারের তলায় পড়েছিল, হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে সেখানা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর ফের একটু হেসে বললেন, 'যাই ঠাকরুণ।'

এবার ইন্দিরার মুখ ফের শক্ত হয়ে উঠল। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তবু তুমি যাবেই।'

অসহায়ভাবে তিনি মেয়েকে ডাকলেন, 'মলি দেখ এসে! তোর বাবার কাণ্ড দেখ এসে।'

চুল বাঁধছিল শ্যামলী। ডাক শুনে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'এ কী ব্যাপার!'

ইন্দিরা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন, 'উনি চাকর সেজে থিয়েটারে যাচ্ছেন।'

শ্যামলী বলল, 'বাবা, তুমি কি পাগল হলে?'

ইন্দিরা বললেন, 'পাগল নয়, উনি ফের মাতাল হয়েছেন। মলি, ওঁকে ধরে নিয়ে যা। ধরে নিয়ে বেঁধে রাখ।'

শ্যামলী এগিয়ে এসে বাবার হাত ধরল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

কৌতুকের হাসিটুকু গোপন করে নীলাম্বর পরম অনুগত বালক হয়ে গেলেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বাথরুমে। শ্যামলী সাবান জল দিয়ে নিজের হাতে বাবার মুখের কালিঝুলি ধুয়ে দিতে লাগল।

ধরা পড়া দুষ্ট দুরন্ত ছেলের মত নীলাম্বর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্যামলী বলল, 'ছি ছি ছি কত কালি মেখেছ বল তো!'

নীলাম্বর বললেন, 'সব কালি কি ধুয়ে দিতে পারবি মা?'

শ্যামলী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘরে এসে আলমারি খুলল। ধোয়া জামাকাপড় বের করে নীলাম্বরের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যেতে হয় ভদ্রবেশে যাও।'

ইন্দিরা দোরের কাছ থেকে বললেন, 'আর বলে দিস ভদ্রবেশে ফিরেও যেন আসেন।'

কিন্তু ধোয়া জামাকাপড় আর পরলেন না নীলাম্বর। লুঙ্গি পরলেন, গেঞ্জি পরলেন।

শ্যামলী বলল, 'ও কি, যাবে না?'

নীলাম্বর বললেন, 'পাগল নাকি? আমার যাওয়া হয়ে গেছে। তার চেয়ে আয় তিনজনে বসে দুহাত তাস খেলি।'

ইন্দিরা ঠোঁট উলটে বললেন, 'ঈস তোমার সঙ্গে তাস খেলবে কে?'

নীলাম্বর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি গো তুমি।'

শ্যামলী তাড়াতাড়ি নিজেই আড়ালে চলে গেল। বাবা কি কাণ্ড করে বসেন তার ঠিক নেই। উনি এখন স্টেজে উঠেছেন। শ্যামলী তাঁর কাছে অডিয়েন্স ছাড়া আর কেউ নয়।

চেয়ারটা গুটিয়ে নিয়ে বারান্দায় রঙীন মাদুর পাতল শ্যামলী। মাকে জোর করে এনে তাসের আসরে বসাল। মা আর মেয়ে এক পক্ষে। নীলাম্বর একা।

তাস সাফল করে বেঁটে দিতে লাগল শ্যামলী।

সেই অবসরে নীলাম্বর বাইরের দিকে তাকালেন। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। দুদিকে সবুজের দৃশ্যপট। মাঝখান দিয়ে শাদা রাস্তা। ওই রাস্তা কোন্ এক রঙ্গমঞ্চের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। আজ আর হল না। আর একদিন যেতে হবে। কমপ্লিমেন্টারি কার্ডে নয়, টিকেট কেটেই যাবেন নীলাম্বর। সবচেয়ে সস্তা দামের টিকেটে সব চেয়ে পিছনের সারিতে বসবেন। কত নতুন আর্টিস্ট সব এসেছেন। তাঁদের নাকি সব নতুন নতুন ধাবা, সবটা হয়তো নিতে পারবেন না নীলাম্বর। একটা জেনারেশনের তফাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু খানিক খানিক নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর যেখানে ভালো লাগবে সেখানে হাততালি দেবেন। জোর হাততালি দেবেন। এতদিন পেয়েছেন, এবার তাঁর দেওয়ার ভূমিকা। এ ভূমিকায়ও উৎরানো চাই।

শ্যামলী বলল, 'তাস দিয়েছি বাবা। তাস নাও তোমার।'

নীলাম্বর একটু হেসে তাসগুলি গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

ভাদ্র ১৩৭০

মাঝ দরিয়া

বড় রকমের বৃষ্টি হলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। তিন দিন ধরে শুধু টিপ টিপ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কোথাও বেরোবার জো নেই। একটি ছাতা কি বর্ষাতি নেই সঙ্গে। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বসে শুধু মেঘলা আকাশ দেখো। পাহাড়ের নামে যে ছোট একটি টিবির মত আছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকো, আর সামনের পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়ে ক'খানা লরি যায়, গাড়ি যায়, তাই গুণতে থাকো। দিন তিনেক ধরে অনুপম দত্তচৌধুরীর এই হয়েছে নিত্য কর্ম।

এই একান্ত নির্জনতা পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। অথচ নিজেই ক'দিনের জন্য এই স্বেচ্ছানির্বাসন, এই অস্থায়ী বানপ্রস্থ বেছে নিয়েছেন অনুপম। কলকাতার স্বজন-পরিজন, বন্ধুদের ভিড় এড়িয়ে সিংভূমের এই স্বল্প-পরিচিত পল্লীতে এসে আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু নিজের মনকে চেনা বড় কঠিন। তার এক মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পর মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষার কোন মিল নেই। নিত্য পরিচিত পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে বসে সে বন্ধনমুক্তির জন্য হাত বাড়ায়। আবার তার বাইরে আসতে-না-আসতে ফের সেই বন্ধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

স্ত্রী সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুপম এড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, 'প্রতি বছরই তো

একসঙ্গে বেরোই, এবার না-হয় একটু আলাদা ব্যবস্থা হোক। একটু বৈচিত্র্য। তুমি আর-এক সময় যেয়ো।'

সঙ্গে সঙ্গে অভিমান, 'আমি জানি, তুমি শুধু বৈচিত্র্যই চাও। আমাকে এখন আব চাও না।'

এ খোঁটা শুনতে হবে অনুপম জানতেন।

হেসে বললেন, 'তবে কাকে চাই?'

সুরমা জবাব দিয়েছেন, 'কে জানে? আমি কি তাদের নাম জানি? না তুমি আমার কাছে তাদের নাম-ধাম বলো? তোমার কি অভাব আছে কিছু? তোমার নিত্য নতুন নায়িকা।'

নানা ঘাটে ঘুরে ঘুবে শেষ পর্যন্ত অভিনেতার জীবিকাই বেছে নিয়েছেন অনুপম। থিয়েটাব-সিনেমার সঙ্গে নামটি জড়িত আছে। পর্দায় তাঁকে নানা বেশে, নানা ভূমিকায দেখা যায়। রঙ্গজগতে যে থাকে তার জীবনটাও বঙ্গীন। অনেকের মত সুরমারও ধারণা তাই।

স্ত্রীর কথার জবাবে অনুপম হেসে বলেছেন, 'নায়িকা কোত্থেকে হবে বল তো? আমি কি জীবনে কখনো হিরোর রোল করেছি? সব পার্শ্বচরিত্র। বাপ দাদা, পিসেমশাই, মামাশ্বশুর, কুচক্রী নায়েব কি ম্যানেজার। এই তো সব পার্ট। এতে কি আর নিত্যনতুন নায়িকা জোটে?'

সুরমা বলেছেন, 'থাক, আমাকে আব বোঝাতে হবে না। ওতে বুঝি কিছু আটকায়? যারা জোটাবার, তারা ঠিকই জুটিয়ে নেয়।'

অনুপম একটু হেসে নাটকীয় ঢঙে বলছিলেন, 'অয়ি আয়ুষ্মতী! সতীনরা শুধু তোমার কল্পজগতেই আছেন। ইহজগতে কোথাও তাঁদের অস্তিত্ব নেই।'

সুরমা বলেছেন, 'আহাহা, কি আফশোস। থাকলে বুঝি ভালো হত?'

তা হত না। গরীবের ও-সব ঘোড়া রোগে বিপত্তিই বাড়ত, অনুপম তা জানেন। তিনি যে বয়স পেরিয়ে, যৌবন হারিয়ে রঙ্গজগতে এসে ঢুকেছেন, সে সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক অনুমপ। এখন আর কোন পিচ্ছিল পথে পা বাড়ানো নয়। কোন দুষ্প্রাপ্যের দিকে হাত বাড়ানো নয়। এই মধ্যবয়সে এসে সংসার পালনের জন্য শুধু পরিমিত অর্থ আর দর্শকদের কিছু হাততালি, অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য কিঞ্চিৎ খ্যাতি, জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন এখন এই দ্বিবর্গে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য প্রত্যাশা অসীম, আকাঙ্ক্ষা অশেষ। কিন্তু মধ্যবয়সে এসে মানুষ জ্যোতিষী না হয়েও, নিজের ভাগ্যলিপি নিজে পড়তে পাবে। তখন নিজের দৌড় টের পাওয়া যায়। সামর্থ্যের সীমাটুকু দেখে নিতে দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না। মানুষ তখন বুঝতে পারে, আকাঙ্ক্ষা অশেষ হলেও তার চরিতার্থতার শেষ আছে। তখন আপস করার পালা, মানিয়ে নেওয়ার পালা শুরু হয়ে যায়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপস, পরিবেশের সঙ্গে আপস, নিজের সীমাবদ্ধ শক্তির সঙ্গে অপরিসীম আকাঙ্ক্ষার আপস। তখন পিছনের ফেলে-আসা পথটাই বড়, সামনে এগিয়ে যাওয়ার সীমা। মধ্যবয়স আসলে ঠিক মধ্যস্থলে নয়, কর্মজীবনের অন্ত্য পর্ব।

সুরমা শেষ পর্যন্ত বেশি পীড়াপীড়ি করেন নি। বলেছেন, 'আচ্ছা যাও। দুদিন বাদেই দেখবে একা-একা থাকতে কেমন লাগে। তোমাকে যেন আমি চিনিনে। নিরিবিলি নিরিবিলি শুধু তোমার মুখের বুলি। আসলে তুমি হলে মহাসামাজিক মানুষ। তিন দিনের দিন তুমি যদি হাঁপিয়ে না ওঠো আমি কি বলেছি।'

স্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক ফলেছে, এ-কথা অনুপমকে স্বীকার করতেই হবে। ঠিক হাঁপিয়ে না উঠলেও নির্জন বাসের এই একান্ত নিঃসঙ্গতা সবসময় তেমন যেন উপভোগ্য মনে হচ্ছে না। আসলে সবই অভ্যাস। দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবনও তাই। এক অভ্যাস থেকে আরেক অভ্যাসে আসতে গেলে সময় লাগে বইকি। কোনদিন যে অবিবাহিত ছিলেন, এখন যেন ভাবতেই পারেন না অনুপম। যেন বিবাহিত হয়েই জন্মেছেন। নিজের মনেই অনুপম হাসেন। প্রথম যৌবনের সেই একক দিনগুলির কথা, হোটেল-মেসে জীবনযাপনের কথা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। অথচ সেই নিঃসঙ্গতার দিনগুলি আবার এল বলে। তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার। মৃত্যুর আগে জরা। সেই জরা সঙ্গীহীন। এমনকি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরম আপনজনও তখন দূরান্তবাসী। কাছে থেকেও তারা কাছে থাকে না। নিজেদের ঘর-সংসার, আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন

জগতে তাদের বাস। তখন যদি সঙ্গ-কামনাকে নিয়ন্ত্রণ না করা যায়, দুঃখ অনিবার্য।

একা থাকবার খানিকটা অভ্যাস আয়ত্ত করবার জন্যই যেন ক'দিনের জন্য নিঃসঙ্গভাবে বেরিয়ে পড়েছেন অনুপম।

বন্ধুর নিরিবিলি একটি বাড়ি পাওয়া গেছে।

বছরে তিনি একবার মাত্র আসেন। তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, আসবাবপত্রগুলি আবার মুখ বের করে। মানুষের গলার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তারপর তিনি চলে গেলে আবার দরজায় তালা পড়ে। সারা বাড়িফের স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। একজন মালী আছে, বহুদিনের পুরোন লোক। অনুপম আসবার আগেই সে ঘরদোর ঝেড়েপুছে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। কিন্তু একা অনুপমকে দেখে সে-ও যেন অবাক হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'বাবু, আর কেউ আসেন নি?'

অনুপম বলেছেন, 'না।'

ও বোধ হয় বাড়ির মেয়েদের আশা করেছিল। বোধ হয় কমবয়সী ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিল। শুধু একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সেবা করে তার তৃপ্তি নেই।

বাড়ির সবগুলি ঘর খুলতে দেননি অনুপম। কি দরকার! একজন মানুষের জন্য একখানি ঘরই যথেষ্ট। তবু দুখানা ঘর খুলে দিয়েছে ঝুমুর। আর আছে তিনদিকে খোলা বারান্দা। স্টেশনের কাছে যে ছোট একটি হোটেল আছে সেখান থেকে খাবার আনিয়ে নিচ্ছেন। অরুচি হলে সাঁওতালী মালীকেই বলছেন দুটো ব্যবস্থা করে দিতে।

অনুপম এসেছেন। তবু বাড়িটি যেন সাড়া দিয়ে ওঠেনি, চুপচাপ পড়ে আছে। এ-বাড়ির স্তব্ধতা ভাঙা তাঁর একার সাধ্য নয়।

এবারকার রঙ্গমঞ্চে কোন কো-অ্যাক্টর নেই।

এবার সর্বদাই অনুপমের স্বগতোক্তি। উক্তি নয়, চিন্তা। নিঃশব্দ চিন্তা। কোত্থেকে একটা কুকুর এসে জুটেছে। জাত-মাহাত্ম্যহীন রাস্তার নেড়ী কুকুর। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই সে ভারি বাধ্য হয়ে পড়েছে অনুপমের। চোখের আড়াল করতে চায় না। এখনকার মত তাঁর পাদপীঠই ওর পীঠস্থান।

মালী বলেছে, এ-বাড়ীতে মানুষজনের সাড়া পেলে ও ঠিক চলে আসে।

'খাবার লোভে আসে বাবু!'

শুধু কি খাবার লোভ? আদরের লোভও আছে। এরই মধ্যে তার পরিচয় পেয়েছেন অনুপম। মাথায় হাত বুলালে কুকুরটা সানন্দে লেজ নাড়তে থাকে। পায়ের কাছে সারা দেহ এলিয়ে দেয়।

অনুপম ভাবেন, 'মানুষ আসলে সামাজিক। যখন ধারে-কাছে কেউ থাকে না, তখন সে মালী আর কুকুরকে নিয়ে সমাজ গড়ে তোলে।'

এই একক জীবনের অভিলাষ হঠাৎ কেন এল মাঝে মাঝে ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছেন অনুমপ। কিসের জন্য এই আত্মপরীক্ষা? বৈচিত্র্যের আশা? সংসারচিন্তা থেকে সাময়িক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা? নাকি স্ত্রীর কাছ থেকে অতি-সামাজিকতার খোঁটা শুনত শুনতে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া, অনুমপ নিঃসঙ্গ ভাবে থাকতেও জানেন, অন্তত ক'দিনের জন্য আত্মনির্ভর হবার তাঁর ক্ষমতা আছে।

ভিজতে ভিজতে মালী এসে খবর দিল, 'বাবু, উকিল বাংলো থেকে ওনারা আসছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললেন, বাবুকে বলো, আমরা একটু বাদেই যাচ্ছি।'

'তাই নাকি?'

অনুপম খুশী হয়ে উঠলেন। উঠে বসলেন চেয়ারের ওপর।

'আরো দুটো চেয়ার কি হল? নিয়ে আয়। পেতে দে তাড়াতাড়ি।'

ওঁরা মানে গোকুলবাবু আর তাঁর স্ত্রী। ওঁদের সঙ্গে এখানেই আলাপ হয়েছে অনুপমের। শুধু স্টেজে আর স্ক্রীনে নয়, তার বাইরেও ছোটখাটো নাটকীয় দৃশ্য ঘটতে দেখা যায়।

সেদিন আজকের মত আকাশ এমন মেঘেলেপা ছিল না। সকালে বিছানায় শুয়েই জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখেছিলেন অনুপম। সূর্যাস্ত দেখবার জন্য বেরিয়েছিলেন রাস্তায়। খানিক দূরে একটি দীঘি আছে। তার কথা আগেই শুনেছিলেন অনুপম। একদিকে শাল বন আর একদিকে মাঠ।

মাঝখান দিয়ে পায়েচলা পথ। দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন অনুপম। মাঝে মাঝে একটি-দুটি তালাবন্ধ বাড়ি। কখনো বা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। জনমানবের সাড়া নেই। ক্বচিৎ কখনো দুটি-একটি পথিক, দু-একজন সাইকেল আরোহী।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যেন একাল থেকে সরে গিয়ে কোন অতীত যুগে চলে এসেছেন অনুপম। সেই কাল, তার শূন্যতা, স্তব্ধতা নিয়ে পড়ে আছে।

দীঘির পাড়ে এসে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন অনুপম। একপাশে কয়েকটি তালগাছ। আর এক দিকে ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি। নিস্তরঙ্গ সরোবর শুধু তার ছায়াকে সযত্নে ধরে রেখেছে।

একটু বাদে অনুপম লক্ষ্য করলেন, দীঘির ওপার থেকে ঘুরে ঘুরে আরো দুজন এদিকে আসছেন। একজন ভদ্রলোক আর একজন মহিলা।

ভদ্রলোক পরনে ট্রাউজার আর শার্ট। হাতে একটি বন্ধ-করা ছাতা। মহিলাটি তাঁর অনুবর্তিনী। দীর্ঘাঙ্গী, সুশ্রী, তন্বী কিন্তু হায় তরুণী নয়।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আলাপ করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমাদের ভারি চেনা চেনা লাগছে।'

আবিষ্কৃত হয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন অনুপম। সপ্তাহ খানেক হল এখানে তিনি এসেছেন। স্টেশনে প্রায় রোজই যাচ্ছেন। দু-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রোজই দেখা হয়েছে। তাঁরা অবশ্য অনুপমের অপরিচিত। কিন্তু তিনি তো তাঁদের পরিচিত হতে পারতেন। এঁরা কি কেউ কখনো সিনেমা দেখেন না ? যদিও নানারকমের মেক-আপ নিয়েই সিনেমায় নামেন অনুপম, তবু মুখখানা তো একেবারে বদলে যায় না। হলেনই বা তিনি পার্শ্বচরিত্র। তবু কলকাতার কাফে-রেস্তোরাঁয়, ট্রামে-বাসে লোকে এখনো তাঁকে দেখলে ফিস ফিস করে। পরিচিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে মুখের প্রসন্ন হাসি দিয়ে তারা তাদের প্রিয় অভিনেতাকে অভিনন্দন জানায়। এখানে এসে সে-দৃষ্টির দেখা পাননি অনুপম। যতই অজ্ঞাতবাস করতে আসুন, কেউ তাঁকে একেবারেই চিনবে না, এটা তাঁর আত্মাভিমানে লেগেছে। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, জায়গাটা সত্যিই পাণ্ডববর্জিত। এরা শিক্ষা-সংস্কৃতির ধার ধারে না। নাট্যরসের স্বাদ গ্রহণে এদের আগ্রহ নেই, বোধ হয় অধিকারও নেই।

যেন ধরা পড়বার জন্য লুকিয়েছিলেন অনুপম। ধরা পড়ে খুশী হলেন।

ভদ্রলোকের কথার জবাবে হেসে বললেন, 'চেনা চেনা মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। সিনেমায় আমার ছবি-টবি দেখে থাকবেন। আমার নাম—'

অনুপম সগর্বে নিজের নাম আর দীর্ঘ পদবীটি ঘোষণা করলেন। যাতে তাঁকে চিনতে ভদ্রলোকের অসুবিধা না হয়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমার স্ত্রী আগেই বলেছিলেন। আমরা সিনেমা-টিনেমা বড় একটা দেখিনে। আগে দেখতাম এখন আর হয়ে ওঠে না মশাই। তাছাড়া, মাফ করবেন, টেস্টও বদলে গেছে। কিন্তু ছায়ায় নয়, আমার স্ত্রী আপনাকে কায়াতেই দেখেছেন। সশরীরে দিনের দিন দেখেছেন। বলুন তো কোথায় ?'

ভদ্রলোকের পিছনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'আর আড়ালে থেকে লাভ কি। সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করো।'

স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক। এবার সরে দাঁড়ালেন।

মাথায় খাটো আঁচল, সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর পরা। পরণে সাদা খোলের শাড়ি। পাড়ের রঙটি অবশ্য নীল। গায়ে হাত ঢাকা জামা। সেই তিরিশ বছর আগের দেখা মুখের সঙ্গে এ-মুখের অনেক পার্থক্য। তবু চিনতে অসুবিধা হল না অনুপমের।

তিনি বললেন, 'আপনি কি রংপুর কলেজে পড়তেন ? আপনার নাম কি মল্লিকা তালুকদার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'নামটি ঠিকই আছে। কিন্তু পদবীটি উনি দয়া করে পালটে নিয়েছেন। এখন উনি মিসেস রায়। পদবীটি আমিও কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবহার করছি। আমার নাম গোকুলেশ্বর।

চলুন এগোই। এগোতে এগোতে কথা বলি। টর্চ যদিও সঙ্গে আছে, তবু কৃষ্ণপক্ষের রাত। অনেকটা পথ যেতে হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে কথা হতে লাগল। মিসেস রায় যেমন মিতভাষিণী, তেমনি মৃদুভাষিণী। তাঁর হয়ে গোকুলবাবুই কথা বলতে লাগলেন।

স্টেশনে, বাজারে ক'দিন ধরেই অনুপমকে ওঁরা লক্ষ্য করেছেন।

মিসেস রায় বলেছেন, 'তুমি গিয়ে আলাপ করো।'

মিঃ রায় বলেছেন, 'তুমি করো না। তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড—'

মিসেস রায় বলেছেন, 'যদি তিনি না হন। যদি চিনতে ভুল হয়ে থাকে, ভারি লজ্জা পাব। একজনের মত আর একজন কি হয় না? কি দরকার?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কিন্তু সন্দেহ ভঞ্জন ভালো মশাই। বলুন সত্যি কিনা। আমি কোন ব্যাপারেই সন্দেহ রাখা পছন্দ করি নে। আপনি যদি অনুপবাবু না হয়ে নিরুপবাবু হতেন, কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? ভুল হয়েছে বলে জিভ কেটে জোড় হাতে মাফ চেয়ে নিতুম। ল্যাঠা চুকে যেত।'

গোকুলবাবু হাসলেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মিসেস রায় বললেন, 'আসবেন একদিন। ফের যখন দেখা সাক্ষাৎ হল।'

রাত্রে ফিরে এসে অনেক পুরোন কথা মনে পড়েছিল অনুপমের।

তাঁদের মফঃস্বল শহরের কলেজে সেই প্রথম সহশিক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে গুটি সাতেক মাত্র মেয়ে। তাই নিয়ে দেড়শ ছাত্রের চাঞ্চল্যের সীমা নেই। আর সেই সপ্তকন্যার মধ্যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী মল্লিকা তালুকদার। তার সম্বন্ধে শুধু যে ছেলেরাই উৎসাহী তাই নয় তরুণ প্রবীণ অধ্যাপকদের দল পর্যন্ত সমান উদ্যমশীল। সে ক্লাসে থাকলে যে প্রফেসর তোতলা তাঁরও তোতলামি সেরে যায়। যিনি ক্লাসে দেরি করে আসেন, মোটেই পড়াতে চান না তিনিও বিদ্যাদানে অকৃপণ আর উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হস্টেলের ছেলেরা তার আলোচনায় মশগুল হয়। বানিয়ে বানিয়ে গল্পও বলে। কে নাকি তার সঙ্গে কথা বলেছে। কার সঙ্গে মল্লিকার বই আর চিঠির আদান প্রদান আছে। কিন্তু অনুপমরা খোঁজ নিয়ে দেখেন এসব কাহিনীর ষোল আনাই কল্পিত। মল্লিকা ভারি বাশভারি মেয়ে। কোন সহপাঠীর ওপর তার কিছুমাত্র পক্ষপাত নেই। সবাইর ওপর সমান ঔদাসীন্য। শুধু প্রফেসররা কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের কথার জবাব দেয়। কোন সহপাঠীকেই বড় একটা আমল দেয় না। যারা গায়ে পড়ে আলাপ করতে যায় তারা ঘা খেয়ে ফিরে আসে। সে আঘাত চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মনের মধ্যে বিঁধে থাকে। অনুপমের বন্ধু নিমাই মুখার্জি ছিল এ ব্যাপারে সব চেয়ে উৎসাহী। কিন্তু সেও হার মানল। একদিন স্বীকার করে বলল, 'নারে ভাই হল না। সাবজজের মেয়ে হলে কি হবে, দেমাকে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের মহিষীকে ছাড়িয়ে যায়। দরকার নেই আমার মালতী মল্লিকায়। আমাদের ওই জবা টগররাই ভালো।'

অনুপমের মনে পড়ে একবার শুধু ওর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। ড্রামাটিক ক্লাবের পক্ষ থেকে চাঁদা চাইতে গিয়েছিলেন। চাঁদাটা দিয়েছিল মল্লিকা। কিন্তু নিমন্ত্রণের কার্ড নেয়নি। হেসে বলেছিল, 'কার্ড নিয়ে কি হবে। আপনাদের ফাংশনের আগেই আমরা চলে যাচ্ছি। বাবা বহরমপুরে বদলী হয়েছেন।'

সেই ফিরিয়ে দেওয়াটাই মল্লিকার একমাত্র দেওয়া।

তবু গোকুলবাবুর মধ্যস্থতায় এই তিরিশ বছর পরে ফের নতুন করে আলাপ-পরিচয় জমে উঠেছে। ছোট জায়গা। রোজই কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায়। স্টেশনে বাজারে পাহাড়তলীতে দীঘির ধারে দেখা যায়। একদিন দেখা গেল মাইল খানেক দূরের নদী থেকে স্নান করে ফিরছেন। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। আর একদিনও তাঁকে ওই বেশে দেখতে পেলেন অনুপম। পাহাড়ের কোলে কোন এক সাঁওতালী দেবীর মন্দির থেকে পূজা দিয়ে ফিরছেন। নদীর ধারে অনুপমও গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিসর্গশোভা দেখেছেন। দেখেছেন খেয়া পারাপার। কিন্তু ওই স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতীতে অবগাহনের কথা তাঁর মনে হয়নি। সাঁওতালদের মন্দির তিনিও

দেখেছেন। অশিক্ষাপটু ঐতিহাসিক আব প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে আলাপও হয়েছে। আলোচ্য বিষয় কোনদিন আবহাওয়া, কোনদিন বাজারে মাছ তরকারির দুষ্প্রাপ্যতা। শুধু গোকুলবাবুই নন মিসেস রায়ও সে আলাপে যোগ দিয়েছেন। সৌজন্যে শিষ্টাচারে সহৃদয়তায় তিরিশ বছর আগের মল্লিকা তালুকদারের চেয়ে এখনকার মিসেস রায় অনেক বেশি মহীয়সী। তবু অনুপম বালকোচিত ক্ষোভের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাবেন এখনো ওঁর দেহে রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপ কাউকে চঞ্চল করে না। সে উত্তীর্ণযৌবনার রূপ। অনুপম যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার তরুণ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর সেই তরুণী সহপাঠিনীটিকে ফের দেখতে চান। অনুপম নিজেও যেন যৌবনোত্তীর্ণ হন নি। তাঁর যৌবন যেন কালোত্তীর্ণ হয়ে সেই তিরিশ বছর আগেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের ভুঁড়ির কথা ভুলে গিয়ে চুলের পক্কতা আর বিবলতার কথা ভুলে প্রাক্তন সহপাঠিনীর রূপ আর রূপান্তরের কথা ভাবতে থাকেন। রূপ আর যৌবন কি অভিন্ন ? যার সঙ্গে জৈব সৃষ্টি শক্তি জড়িত তাই কি রূপ ? তাহলে গতযৌবন যারা তাদের সান্ত্বনা কি ? তাদের বাকি জীবন শুধু কি ক্ষত চিহ্ন নিয়েই কাটে ? স্মৃতি ছাড়া তাদের কি আব কোন সম্পদ নেই ? সম্বল নেই ? না কি এই দৃষ্টি নিতান্তই ক্ষীণ দৃষ্টি ? দৃষ্টি বিভ্রম। জৈব সৃষ্টির বাইরেও নানা সৃষ্টি আছে। রূপেরও বিচিত্রতার অভাব নেই। অনুপম যে এই মধ্যবয়সে এসে নাটকের দরকাব মত কখনো যুবকেব কখনো অতি বৃদ্ধেব কখনো সহৃদয় ধার্মিকের কখনো নিষ্ঠুর কুটিল অমানব অর্ধমানবের রূপ সজ্জায় নামেন সেও রূপ। সেও সৃষ্টি। সন্তান সৃষ্টি নয় রস সৃষ্টি।

অনুপম পল্লীর পথে পথে নিজের মনে হাঁটেন আর ভাবেন। রূপের ভাবনা। দিন কয়েকের জন্য তিনি তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধনের ভাবনা থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন।

গোকুলবাবু শুধু ভাবের মানুষ নন ভাবকে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যে রূপান্তরিত করতেও তৎপর। তাঁরও এখানে আর কেউ পবিচিত নেই। কথা বলবার জন্য তিনি প্রায়ই আসেন।

'এই যে অনুপমবাবু, কী করা হচ্ছে শুনি ?'

তারপর পাশের চেয়ারটিতে বসে তিনি নিজেই শোনাতে থাকেন। শোনাবার মত কথা তাঁর প্রচুর জমেছে। জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টে বহু দিন কাজ করেছন। জজ হয়ে রিটায়ার করবার পরে এখন আছেন স্পেশাল সার্ভিসে।

বাংলা দেশের কোন জেলাব জল খেতে ওঁর বাকি নেই। পূর্ববঙ্গের দুধ মাছের স্বাদ এখনো জিভে লেগে আছে। আব জিভের কথায়।

গোকুলবাবুর কাছ থেকে ওঁদের পারিবারিক প্রসঙ্গও শুনেছেন অনুপম। ছেলে আর মেয়ে দুজনেই কৃতী। দুজনেই বিদেশবাসী। একটি আছে লণ্ডনে আর একজন নিউইয়র্কে। একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আব একজন এক বৃত্তিভোগী ছাত্র।

'কিছুই করতে পাবিনি মশাই। বাড়ি নয়, গাড়ি নয়, জমিজমা নয় শুধু ওদেব দু-একজনাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি। আমাব একার চেষ্টায় হত না উনি যদি সঙ্গে না থাকতেন। সেই হাতেখড়ির কাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত আমরা নিজেরাই ছিলাম ওদের মাস্টাব-মাস্টারণী।' কৃতজ্ঞ চিত্তে স্ত্রীর দিকে আঙুল বাড়ান গোকুলবাবু।

মিসেস রায় লজ্জিত হয়ে বলেন, 'থামোতো, হয়েছে। বড্ড বেশি বকো তুমি।'

'বড্ড বেশি বকো' কথাটা মাঝে মাঝে বলতে হয় মিসেস রায়কে। আব যখনই তিনি এই রুল জারি করেন ভূতপূর্ব জজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়েন।

একদিন অনুপম হেসে বলেছিলেন, 'আপনি তো বড় বাধ্য স্বামী দেখছি।'

গোকুলবাবু জবাব দিয়েছেন, 'অবাধ্য হবাব কি জো আছে। আপনি তবু ভদ্রতা কবে বললেন বাধ্য। আমার কোন কোন বন্ধু আছে, তাদের মুখের লাগাম নেই। তারা বলে তুমি একেবারে ঘরগোলা বউয়ের হাত ধরা হয়ে রয়েছ। আসলে ওরা ঠিক দেখতে পায় না। আমি ধরি নি উনি ধরে রেখেছেন। আমি সেই কোন জন্মে বিয়ের সময় ওঁব পানিগ্রহণ করেছিলাম। তারপর থেকে নতুন করে আর কিছু করিনি নতুন করে আর কিছু ধরিনি। তারপর থেকে উনিই আমার সারা সংসার ধরে রেখেছেন।'

অনুপম চুপ করে রইলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা অত সরল নয়। অমন এক কথায় বলা যায় না।

'এই যে মশাই, চুপচাপ বসেই আছেন?'

গোকুলবাবুরা এসে হাজির হলেন; একটি ছাতার মধ্যে দুজনে এসেছেন। দুজনেই ভিজেছেন অল্পস্বল্প।

চেয়ার পাতাই ছিল।

দুজনে এসে অনুপমের দু পাশে বসলেন।

অনুপম বললেন, 'ভিজে গেলেন তো? তোয়ালেটা আনি।'

গোকুলবাবু বলেন, 'না না কিচ্ছু আনতে হবে না। আপনি স্থির হয়ে বসুন তো। সামান্য ছিটেফোঁটা লেগেছে। দেখলেন তো ছাতার গুণ? ছাতাটি ছিল তাই বেরোতে পেরেছি। আমি যেখানেই বেরোই ছাতা আর স্ত্রী ছাড়া বেরোই না। রোদে বৃষ্টিতে দুইই উপকারিণী।'

মিসেস রায় মৃদু ধমক দিলেন, 'আবার বকতে শুরু করলে।'

তারপর অনুপমের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখুন কাণ্ড। কথা বলতে আরম্ভ করলে উনি একাই তো একশ। আজ আবার আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলেন।'

গোকুলবাবু হেসে বললেন, 'বকুনির জন্যে কি কম বকুনি খাই। কী করব বলো আমার কুষ্ঠিতে বোধ হয় আছে আমি বহুভাষী হব। মানে বহুভাষাবিদ নয় একই ভাষায় বহু কথা বলব। কুষ্ঠিটা একটু দেখতো পরীক্ষা করে। কোন গ্রহের ওপর কোন গ্রহের দৃষ্টির ফলে আমার মুখ থেকে এমন অবিরল বাক্যবৃষ্টি হয়?'

অনুপম সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরে ফেললেন, 'উনি কুষ্ঠি দেখতেও জানেন নাকি?'

গোকুলবাবু হেসে বললেন, 'ও আপনাকে বলা হয়নি। কোষ্ঠি, করকোষ্ঠি সবই দেখে থাকেন।'

মিসেস রায় একটু ভ্রূ কুঁচকে মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'কী শুরু করেছ বলো দেখি। ভূতের গল্প ডাকাতের গল্প সব শেষ হয়ে গেছে। আজ বুঝি আমাকে নিয়ে পড়লে?' তারপর অনুপমের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করুন আমি কিছুই জানি নে। শুধু সময় কাটাবার জন্য অল্পস্বল্প চর্চা করি।'

অনুপম হেসে বললেন, 'বেশ তো, সেই চর্চাটা এখন চলুক। সময়টা ভালো কাটবে।'

গোকুলবাবু বললেন, 'দেখই না ওঁর হাতখানা। এক সময় তো সহপাঠী ছিলেন। সেই সুবাদে না হয় দেখলেই একটু। মশাই, ফীজ্‌টা কিন্তু দিয়ে দেবেন।'

'তা দেব।' বলে হাত বাড়ালেন অনুপম। একটু ইতস্তত করে মিসেস রায় তাঁর কোমল হাতে অনুপমের স্থূল শক্ত হাতখানা তুলে নিলেন।

এর আগে উলটো ব্যাপার হয়েছে। অনুপম হাত দেখতে না জানলেও জ্যোতিষীর ভূমিকা নিয়ে অনেক কোমল হাত দেখেছেন। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী করে অদৃষ্ট দর্শনার্থিনীকে খুশি করেছেন। কিন্তু মিসেস রায় ঠিক সে রকম দেখা দেখছিলেন না। তিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি বিশ্বাস দিয়ে রেখার রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন।

দেখা শেষ হলে হাতখানা ছেড়ে দিলেন মিসেস রায়। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আর একদিন দেখব। আজ তেমন আলো নেই।'

অনুপম হেসে বললেন, 'আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আজ দেখছি দুই-ই অন্ধকার।'

মিসেস রায় বললেন, 'তা ছাড়া আপনি বোধ হয় এ সব বিশ্বাস করেন না।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন মিসেস রায়। অনুপম এ সব বিশ্বাস করেন না। মিসেস রায় যে সব বস্তু বিশ্বাস করেন—পূজাপার্বণ, মন্ত্রতন্ত্র, দেবদ্বিজে ভক্তি—তার অনেক কিছুই অনুপমের জীবন থেকে সরে গেছে। কবে সেই তিরিশ বছর আগে একই পাঠ্যতালিকায় তাঁরা পাঠ নিয়েছিলেন, পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিলেন, তারপর থেকে জীবনের পাঠ কত যে আলাদা হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। অনুপম তাঁর সহপাঠিনীকে দেখেন আর নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। অমিলটাই যেন বেশি করে চোখে পড়ে। মিসেস রায় সন্তানের সঙ্গে একাত্ম। তাদের গর্বেই তাঁর গর্ব। ছেলেমেয়ে

অনুপমেরও আছে। তারা স্কুল কলেজে পড়ে। মোটামুটি ভালো নম্বর রেখে প্রমোশন পায়। তিনি তাতেই খুশি। কিন্তু তারা ছাড়াও অনুপমের আর এক জগৎ আছে। তাঁর নিজের সৃষ্টির জগৎ। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ভালো মন্দ অনেক চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তিনি। সেই রূপ সৃষ্টির কথা অনুপম ভুলতে পারেন না। সেই সৃষ্টিকে ঘিরে অর্থের আকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা, দানের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির প্রত্যাশা—কত আশা আর নৈরাশ্যের তরঙ্গ ভঙ্গ তাঁকে দিনরাত ভাসায় ডুবায়। এক মুহূর্তে কঠিন বালির মধ্যে আছড়ে ফেলে দেয়, আর এক মুহূর্তে উচ্ছ্বাসের উল্লাসের তরঙ্গমালা তাঁকে অকূলে টেনে নিয়ে যায়। এই প্রসন্ন চরিতার্থ স্ত্রীমূর্তি, মাতৃমূর্তির মধ্যে সেই অশান্তি নেই, বিক্ষোভ নেই। আপন সুখ দুঃখ ধারণা ভাবনা নিয়ে তাঁর এককালের সহপাঠিনী আর-এক কালে আর-এক জগতে বাস করছেন।

অনুপম একটু হেসে বললেন, 'বিশ্বাস যদি না করি নাইবা করলাম। তাতে কী এসে যায়।'

মিসেস রায় একটু যেন গম্ভীর হলেন। পর মুহূর্তে হেসে বললেন, 'এসে যায় বইকি। আপনার আর্টকে কেউ যদি বিশ্বাস না করে তাতে কি আপনার কিছু এসে যায় না! বিশ্বাসী অবিশ্বাসী রসিক অরসিক সবাইর কাছে কি আপনার অ্যাকটিং একই রকম হয়? কিন্তু আজ থাক। আর একদিন ভালো করে দেখে বলব।'

তর্ক করা যেত। আর্ট আর অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে তফাৎ আছে। কিন্তু অনুপম তর্ক করলেন না। হেসে বললেন, 'কেন আজ কি ভালো কথা কিছু বলতে পারছেন না?'

মিসেস রায়ও হাসলেন, 'আপনি যেন সেদিনের সেই ছেলেমানুষটি রয়েছেন। আপনার চিত্ত বড় চঞ্চল।'

অনুপম হেসে বললেন, 'একথা বলবার জন্যে বোধ হয় হাত দেখবার দরকার হয় না, চোখ দেখলেই চলে।'

মিসেস রায় কোন মন্তব্য না করে বললেন, 'বেশ আয়ু আছে। দীর্ঘায়ু হবেন আপনি।'

অনুপম বললেন, 'আয়ুর কথা থাক। সুখসম্ভোগ যশ অর্থ?'

প্রসঙ্গটা মিসেস রায় এবারও এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ছেলেমানুষ। আয়ু যদি পদ্মপত্রে নীর, যশ অর্থ কচুবপাতায়।'

অনুপম যেন বরদাত্রীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন, 'তা হলে শুধু আয়ু নিয়ে কী করব?'

গণৎকারিণী ততক্ষণে অতি উচ্চ চূড়ায় উঠে গেছেন। উচ্চতার মহিমা আর দূরত্বের রহস্য মিশিয়ে তিনি একটু হাসলেন, 'সে তো আমার বলবার কথা নয়। আপনিই ভেবে দেখুন কী করবেন।'

তারপর মিসেস রায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও এবার ওঠো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোকুলবাবু উঠে পড়লেন। অনুপমের কাছে বিদায় নিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'একদিন আসবেন। কেবল আমরাই তো আসছি।'

অনুপম যন্ত্রের মত বললেন, 'যাব।'

তারপর কয়েক পা সদর দরজার দিকে ওঁদের এগিয়েও দিয়ে এলেন।

ছাতাটি খুলেছিলেন গোকুলবাবু। স্ত্রীর ধমকে ফের বন্ধ করলেন। এখন তো আর বৃষ্টি নেই।

টর্চ জ্বেলে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। খানিক বাদে অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে তাঁরা অদৃশ্য হলেন।

অনুপম ফের এসে চেয়ারে বসলেন। সারা বাড়ি অন্ধকার, পিছনে অন্ধকার, সামনে অন্ধকার। কালো কুকুরটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে চেয়ারের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে। মালীটার কোন সাড়াশব্দ নেই। বোধ হয় তাড়ির দোকানে চলে গেছে। মাইনে, বকশিস যা পায় সব খেয়ে ওড়ায়।

অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে অনুপম চুপ করে বসে রইলেন। আজ আর তিনি মঞ্চের পার্শ্বে নয় কেন্দ্রে। প্রত্যেকেই তার নিজের জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অন্ধকারে সেই চরিত্রের মুখে স্বগতোক্তি শোনা যেতে লাগল, 'বাকি আয়ু নিয়ে আমি কী করব? শুধু কি ক্ষোভ করব, আফশোস করব? হাহাকার করব? নিজেকে নিজের অনুসরণ করব? অনুকরণ করব? আর কিছুই করব না? কী আমার সেই

কৃত্য ? বাকি জীবন নিয়ে আমি কী করব ?'

কার্তিক ১৩৭২

ভগ্নাংশ

বীথিকা শেষ পর্যন্ত প্রায় উত্যক্ত হয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলল, 'আচ্ছা কাল। কাল শনিবার আমার হাফ ডে। কাল বেরোব আপনার সঙ্গে। কাল যাওয়া যাবে কোথাও। বেশিক্ষণ কিন্তু সময় দিতে পারব না।'

অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে। যতটুকু সময় আপনি দিতে পারবেন তাতেই হবে। আমার অবশ্য হাফ ডে নেই। সে যা হোক ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে।'

বীথিকা নিজের মনেই হাসল। যা গরজ ভদ্রলোকের তাতে তিন ঘণ্টা আগে ছুটি নেওয়া তো দূরের কথা একটা দিন অফিস কামাই করতে বললেও বোধহয় রাজি হয়ে যেতেন। আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে ওস্তাদ। এই ব্লকে যত মেয়ে কেরানী টাইপিস্ট কি টেলিফোন-অপারেটর আছে তাদের অনেকের সঙ্গেই ভদ্রলোক আলাপ পরিচয় রেখেছেন। কারো সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কারো সঙ্গে বাক্য বিনিময়, কারো সঙ্গে তার চেয়েও বেশি কিছু হয় কিনা কে জানে। বীথিকা ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। রুচি নেই। নারী-পুরুষের এইসব স্বাভাবিক আকর্ষণ বিকর্ষণে তার কৌতূহল কম। তবু অনিমেষ দত্তর সম্বন্ধে নানা কথাই কানে আসে। ট্রামে কি বাসে আর কোন মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি বসে যেতে যেতে প্রায়ই শুনতে হয়, 'শুনেছ অনিমেষবাবুর কীর্তি ?'

শুনবার ইচ্ছা না থাকলেও শুনতে হয়। কীর্তিকাহিনীগুলি প্রায় একই ধরনের। কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে নাকাল হয়েছেন, কার সঙ্গে আবার দহরম মহরম চলছে, রেস্টুরেন্টে চা খাচ্ছেন, সিনেমা দেখছেন, গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছেন— সেই সব গল্প।

বীথিকা যতজনের কাছে শুনেছে কেউ বলেনি এসব তার নিজের চোখে দেখা। কি নিজের অভিজ্ঞতার ফল। কেউ স্বীকার করেনি যে, নিজে অনিমেষবাবুর সঙ্গে বেড়িয়েছে, তার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হয়েছে। সবাইরই শোনা কথা। এই শোনা কথা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে বীথিকার। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়েছে লোকটিকে একবার বাজিয়ে দেখলে হয়। কতখানি সাহস আছে দেখলে হয় যাচাই করে। কিন্তু খানিক বাদেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে বীথিকা। দূর কী হবে অমন একজন লোকের সাহস কি ভীরুতা যাচাই করতে গিয়ে। সংসারে তার কাজের অভাব আছে নাকি ? অফিসের খাটুনির পরেও সংসারের বেশির ভাগ দায়িত্বই তার ঘাড়ে। বাবা প্রায় ইনভ্যালিড। বয়সে যতটা না বুড়ো হয়েছেন, অভাবে অনটনে রোগে ব্যাধিতে তার চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায় তাঁকে। আর যা খিটখিটে হয়েছে মেজাজ। দিনরাত কাউকে না কাউকে বকছেন। যখন আর কাউকে সামনে পান না তখন নিজেকে আর নিজের ভাগ্যকে। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আর শুনতে পারিনে বাবা। তোমার গলাবাজি আর শুনতে পারিনে। এবার বেরোও। বেরিয়ে কোথাও গিয়ে দুটো দিন থেকে এসো। আমার হাড় জুড়োক।'

বাবা বলেন, 'আমি কেন যাব। যেতে হয় তুমি যাও।'

কেউ কোথাও যান না। কারোর কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। একখানা ঘরের মধ্যে বসে বসে শুধু ঝগড়া করেন। বাবা-মার দাম্পত্য কলহ মেটাতে কম সময় যায় না বীথিকার। কম শক্তি নষ্ট হয় না। বীথিকার দিদি যূথিকাকে নিয়েও সমস্যা কম নয়। স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয়নি দিদির। গোত্রান্তরিতা হবার পরেও আবার বাপের বাড়িতে এসেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। অথচ ধার-দেনা করে দিদির বিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই ঋণ এখনো সব শোধ হয়নি। বীথিকার যতদূর বিশ্বাস দোষটা দিদির নয়। তার স্বামীটাই লক্ষ্মীছাড়া। সে কিন্তু আবার একটি গৃহলক্ষ্মীকে জোগাড় করে নিয়েছে। দিদির আর দ্বিতীয় বর জোটেনি। সংসারে যা অবস্থা সে কথা কেউ ভাবতেই পারে

না। এরপর আছে আরো তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন। সবই নাবালক-নাবালিকা। মাঝখানে যারা এসেছিল তারা নেই। রক্ষা পেয়েছে।

এমন পরিবেশে রোমান্সের কোন ধারণাই বীথিকার মনে প্রশ্রয় পায়নি, পুষ্টও হয়নি। বরং আসতে গেলে দুহাত দিয়ে তাকে সে বাধা দিয়েছে। 'ওসব আমার জন্যে নয়। অনর্থক ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি। এই বেশ আছি।'

বিয়ের প্রশ্ন ওঠেই না। কে খরচপত্র করে বিয়ে দেবে। বাবা-মার কি সেই অবস্থা। আর বিয়ে দিলে সংসার চলবেই বা কী করে। কে এই গোষ্ঠীকে খাইয়েপরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। অবশ্য যার যা সাধ্য সবাই কিছু না কিছু করে। তবু সবচেয়ে বেশি রোজগার বীথিকার নিজের। তার ওপরই সংসারের ভার। পুরো দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে। নিয়েছে কি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক মনে নেই বীথিকার।

বিয়ের প্রশ্ন যেমন ওঠে না, ভালোবাসাবাসির কথাও তেমনি অবান্তর হয়ে গেছে। প্রেমের ব্যাপারে রূপ একটা বড় ফ্যাক্টর বীথিকা তা জানে। বেশির ভাগ ছেলেই চোখ দিয়ে ভালোবাসে। আগে চোখ তার পরে হৃদয়। তবু প্রথম বয়সে কেউ কেউ তার দিকে তাকাত। থামত, কথা বলত। কেউ কেউ দু-একখানা চিঠিও দিয়েছিল। কিন্তু বাবা মা এমন গোঁড়া ছিলেন তখন যে বলবার নয়। তাঁদের অতি সতর্কতায় কোন সম্পর্কই আর গড়ে উঠতে পারেনি। বীথিকা নিজেই শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরে এসেছে। এসে ভালোই করেছে। বীথিকা পরে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছে যারা এসেছিল তারা কেউ নিষ্ঠাবান নয়, কেউ নিভরযোগ্য নয়। বীথিকা সরে না এলে ওরাই আগে সরে যেত। হয়তো কিছুটা ক্ষতি করে পালাত। অবশ্য ক্ষতির কথা মনে হতে বীথিকা নিজেই আজকাল মাঝে মাঝে হাসে। কী এমন ক্ষতি হত ? তার ছেলে-বন্ধুরা একটু আদর-টাদর করত এই তো। পরিণামের কথা না ভেবে কাউকে বেশি দূর এগোতে দেবে এমন কাঁচা মেয়ে বীথিকা নিশ্চয়ই নয়। 'আমার এই আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন পুরুষকে আমি অঙ্গ স্পর্শ করতে দিইনি।' এই অহংকারে সত্যিই কি কোন তৃপ্তি আছে আজকাল, যেন কেমন সন্দেহ হয় বীথিকার।

অফিসে বেরোবার সময় মাকে বলে নিল বীথিকা, 'মা, আজ কিন্তু আমার ফিরতে একটু দেরি হবে।'

মা আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে মুখের দিকে তাকালেন, 'কেন রে ? কোথাও যাবি টাবি নাকি ?'

'হ্যাঁ মা। অফিসেরই একটি মেয়েব বাড়িতে যাব। অনেক দিন ধরে বলছে।'

বাবা ওঁৎ পেতেই ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? এত যাওয়া-যাওয়ির কী দরকার ? অফিসে যার সঙ্গে রোজ দেখা হয় তার বাড়িতে আবার কেন যাবি ? আমি তিরিশ বছর চাকরি করেছি। কজন কর্মীদের বাড়িতে কদিন গিয়েছি গুনে বলতে পারি। Familiarity breeds contempt। দূরে দূরে থাকাই ভালো।

মা বললেন, 'ভালো জ্বালা। তাই বলে মেয়েটা কি কারো বাড়িতে যাবে না ? কোথাও গিয়ে একটু গল্প টল্প করবে না ? শুধু দিনরাত তোমার সংসারের জোয়াল টানবে ? ওর বয়স আর তোমার বয়স কি সমান ?'

বাবা বললেন, 'কেবল বয়সের খোঁটা। কেবল বয়সের খোঁটা। ওর বয়স আর তোমার বয়সও সমান নয়।'

বড় রকমের ঝগড়া লাগবার আগেই বীথিকা দোরের দিকে পা বাড়াল, যাওয়ার আগে মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'তুমি ভেব না বাবা, আমি সকাল সকালই ফিরব।'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসিস। এদিককার রাস্তাঘাট তো তেমন ভালো না। তারপর বাস-স্টপ থেকে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়। এই তো সেদিন সিনেমা দেখে এলি, আর একদিন বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলি। প্রাণ আর কত রিক্রিয়েশন চায় বল তো মা। সব চেয়ে ভালো রিক্রিয়েশন বই পড়া। ঘরে বসে বই পড়বি। ভালো ভালো বই পড়বি। সময়টা ভালো

কাটবে।'

বাবার কথার কোন জবাব না দিয়ে রাস্তায় নামল বীথিকা। মনে মনে হাসল। বাবা কিন্তু নিজে আজকাল আর কোন বই পড়েন না। মোড়ের চায়ের দোকানটা পর্যন্ত যান। খবরের কাগজখানা দেখেন। আর পাড়ার সমবয়সী বুড়োদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এ কালের ছেলেমেয়েদের চাল-চলনের সমালোচনা করেন।

অফিসে কাজের চাপ খুবই বেশি পড়ে গেল। মেসিন থেকে হাত আর তুলতে পারল না বীথিকা। মাঝে মাঝে কাজ আর ভালো লাগে না বীথিকার। যখন মন চায় না কাজ করতে আঙুলগুলি আরো অসাড় হয়ে আসে।

তার মধ্যে আবার দুবার জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়ল। আগেকার ভুলের জন্যে কিছু ভর্ৎসনা। তারপর তিন পাতা ডিকটেশন। এরপর কী আমোদপ্রমোদে কোন উৎসাহ থাকে ? না মন মেজাজ থাকে ?

তবু লিফটে নামবার সময় ছোকরা কেরানী সুশান্ত যখন বলল, 'কী ব্যাপার ! আজ যে খুব সাজগোজের ঘটা দেখছি মিস দাস ?'

বীথিকা একটু মিষ্টি হেসেই জবাব দিল, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ বেশ মানিয়েছে বাসন্তী রঙ। একেবারে ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে—'

বীথিকা বলল, 'বৌদ্ধদের শ্রমণী শ্রমণী বলে মনে হচ্ছে না তো ?'

'ষাট। শ্রমণী হতে যাবেন কোন দুঃখে।'

বীথিকা বলল, 'দুঃখ কিসের। আমার তো শ্রমিকার চেয়ে শ্রমণী হতেই বেশি ভালো লাগে।'

চারতলায় অনিমেষের অফিস। তিনতলায় বীথিকার। মাঝে মাঝে উঠতে নামতে দেখা হয়। কিন্তু আজ অন্য জায়গায় দেখা হবে বলেই বোধহয় ভদ্রলোক লিফটের খাঁচায় দেখাসাক্ষাৎ চাননি।

অফিস গেটের বাইরে গিয়েই দাঁড়িয়েছেন। বীথিকা তাঁকে পিছন থেকে একবারটি দেখে নিল। বেশ লম্বা। দেখতে ফর্সা। মোটামুটি সুপুরুষই বলা চলে। মাথা জুড়ে অত বড় টাকটা না থাকলে ভালোই দেখাত। বয়সটাও হয়তো একটু কম কম লাগত।

বীথিকাকে দেখে অনিমেষ সত্যিই খুশী হয়ে উঠল, 'এই যে এলেন তা হলে ?'

বীথিকা বলল, 'কেন আপনি কি ভেবেছিলেন আসব না ?'

'তা ঠিক ভাবিনি। তবে মাঝে মাঝে আশঙ্কা হচ্ছিল নাও আসতে পারেন।'

'এমন অভিজ্ঞতা বোধহয় আপনার অনেক হয়েছে। অনেকেই আসবে বলে আসেনি।'

কাটা কাটা কথা বলে লোকটিকে খোঁচা দিতে বেশ লাগছিল বীথিকার।

অনিমেষ কিন্তু চটল না। একেবারে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। হেসে বলল, 'তা হয়েছে। জীবনের সব ব্যাপারেই সাফল্য অসাফল্য চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।'

'থাক আপনাকে আর শাস্ত্র আওড়াতে হবে না। এবার কোথায় যাবেন বলুন।'

অনিমেষ বলল, 'চলুন এক কাপ করে চা খেয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে ঠিক করে নেব কোথায় যাব—'

বীথিকা পাদপূরণ করে বলল, 'কি যাব না।'

অনিমেষ বলল, 'সে আপনার ইচ্ছে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কিছু হতে পারে না।'

'সেই কথা দিলেই আমি আপনার সঙ্গে আসতে পারি।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি নির্ভয়ে আসুন। কোন ভয় নেই।'

বীথিকা বলল, 'ভয় আবার কিসের। সাহস আপনি দেবেন তবে আমি পাব সে কথা ভাববেন না। সাহস আমার নিজের মধ্যেই আছে।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'ভালোই তো।'

রেস্টুরেন্টে ঢুকে পর্দা-ঢাকা একটি কেবিনে গিয়ে বসল অনিমেষ। বীথিকা তার ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বসল সামনে। রেস্টুরেন্টে খাওয়ার অভ্যাস তার কম। স্বেচ্ছায় বড় একটা আসে না। কারো অনুরোধ উপরোধে ক্বচিৎ কখনো আসে। কোন ছেলের সঙ্গে শিগগির এসেছে বলে তো

মনে পড়ে না। কিন্তু আধবয়সী 'বয়'টি অনিমেষকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানাল তাতে মনে হল অনিমেষের এখানে বেশ যাতায়াত আছে। বীথিকা যে চেয়ারে এখন বসে আছে সেই চেয়ারে আরো কতজন অনিমেষের সঙ্গে বসে গল্প করেছে কে জানে। ভাবতেই বীথিকা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল।

মেনু কার্ডের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'কী খাবেন বলুন।'

বীথিকা বলল, 'আমি কিচ্ছু খাব না। আপনি যা খেতে হয় খান। আমি শুধু এক কাপ চা খাব।'

'তাই কি হয়? এক যাত্রায় পৃথক ফল? এক টেবিলে বসে পৃথক খাবার? তা ছাড়া আজ আপনি আমার গেস্ট। আপনাকে উপবাসী রেখে আমি গোগ্রাসে গিলব তাই কি সম্ভব?'

অনিমেষ ফাউল কাটলেট আর চায়ের অর্ডার দিল।

বীথিকা বলল, 'আবার ফাউল কেন?'

'আপনার কি শুধু নামেই আপত্তি? না জিনিসটাতে?'

বীথিকা বলল, 'আপত্তি কিছুতে নেই। কিন্তু সহ্য হয় না। এসিডিটির ধাত আছে। অনেক কিছুই আমার খাওয়া বারণ। যদি বা লোভে পড়ে কখনো-সখনো খাই—শরীরে নেয় না। এত খারাপ লাগে এত অস্বস্তি বোধহয় যে তার ধকল সামলাতে সামলাতে হয়তো দুদিন চলে যায়।'

অনিমেষ বলল, 'তাহলে তো আপনার কাটলেট খাওয়া ঠিক হবে না। আপনি বরং পুডিং খান।'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ বয়কে ডেকে অর্ডার পালটে দিল। একটি কাটলেট, একটি পুডিং।

খাবার এল।

অনিমেষের প্লেটে সস ঢেলে দিতে দিতে বীথিকা বলল, 'এক যাত্রায় পৃথক ফলই হল তা হলে।'

'নামে পৃথক। আসলে পৃথক নয়। সত্যি আপনি ভারি রোগা। কী ডেলিকেট হেলথ নিয়ে আপনি কাজকর্ম করেন আমি তাই ভাবি।'

বীথিকা অনিমেষের দিকে তাকাল। এই শক্তসমর্থ স্বাস্থ্যবান পুরুষটি কি তাকে অনুকম্পা করছে। সে কারো অনুকম্পার পাত্রী হতে রাজি নয়।

একটু রূঢ়স্বরে বীথিকা বলল, 'কী করব বলুন, কাজকর্ম করেই তো খেতে হবে। শরীরের দোহাই সংসারও শুনবে না, অফিসও শুনবে না।'

অনিমেষ বলল, 'শুনবে না, তবু আপনি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করলে দোহাই দিতে পারেন। আমার শরীর কখনো আমার কাজের পক্ষে বাধা হয় না। কোনদিন একটু মাথা পর্যন্ত ধরে না, সর্দিকাশি নেই, হজমে গোলমাল নেই—'

বীথিকা ভাবছিল ভদ্রলোক কী নির্লজ্জ। তার মত একটি রোগা মেয়ের সামনে নিজের স্বাস্থ্যের বড়াই করছেন। নিজের দেহের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। গায়ের জামা খুলে মাসেল দেখাবেন কিনা কে জানে।

'কিন্তু হলে কি হবে কি, এই স্বাস্থ্য আমার কোন কাজে লাগল না।'

ভদ্রলোকের শেষ কথাটায় কেমন একটু করুণ সুর লাগল।

বীথিকা অবাক হয়ে অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল, 'কাজে লাগল না মানে?'

অনিমেষ বলল, 'কই আর লাগল? লোকে রোগ-ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতেও যে অসাধ্য সাধন করে, আমি তার কিছুই করতে পারলাম না। স্বাস্থ্য নাকি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু অন্য যে কোন সম্পদের মত তারও ব্যবহার জানা চাই। নইলে কোন সম্পদই কোন কাজে আসে না।'

এর পর ভদ্রলোক মাথা নিচু করে চা খেতে লাগলেন। মাথা-জোড়া টাকটি তেমনি চকচক করছে। কিন্তু বীথিকার চোখে তেমন যেন বিসদৃশ লাগল না। রোগের জন্য অসুখী মানুষ বীথিকা দেখেছে। সে নিজেও তো তাদের একজন। কিন্তু সুস্থতা সবলতার জন্যেও কেউ আবার দুঃখ করে?

ভদ্রলোক সরকারী অফিসে অফিসার গ্রেডে কাজ করেন বীথিকা শুনেছে। চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় অবস্থা ভালো। তবু কিসের অশান্তি ওঁর মনে?

বয় এসে দাঁড়াল, ট্রেতে বিল আর মশলার বাটি।

অনিমেষ বিল মিটিয়ে দিল।
বয়ের খুশী খুশী মুখ দেখে বীথিকার মনে হল টিপসটা সে আশাতীতই পেয়েছে।
বয় চলে গেলেও আরও দু-এক মিনিট বসে রইল অনিমেষ।
বীথিকা বলল, 'কী ব্যাপার, উঠবেন না ?'
'হ্যাঁ, এবার উঠব। কিন্তু এরপর কী করা যায় বলুন তো ? কোথায় যাওয়া যায় ?'
বীথিকা আবার একটু শঙ্কিত হয়। এই রে, ভদ্রলোক কোথায় তাকে নিয়ে যাবেন ঠিক কি। বীথিকা শুনেছে, এসব মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই, অগম্য কোন স্থান নেই।
একটু সতর্কভাবে বীথিকা বলল, 'দেখুন, আমি কিন্তু বেশি সময় দিতে পারব না। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরতে হবে। অনেক কাজ রয়েছে।'
'অফিসের পরেও অনেক কাজ ?' অনিমেষ একটু হাসল।
বীথিকা বলল, 'হ্যাঁ, অফিসের পরেও কাজ থাকে। অফিসের কাজ অফিসে, বাড়ির কাজ বাড়িতে। আপনার বুঝি কোন কাজকর্ম নেই ?'
অনিমেষ বলল, 'আছে। তবে কাজের সঙ্গে আমার একটি মাত্রই সম্পর্ক।'
'কী সম্পর্ক ?'
'ফাঁকির।'
বীথিকা বলল, 'আপনি ভাগ্যবান। আপনি ফাঁকি দেন অথচ ধরা পড়েন না, কেউ আপনাকে সে জন্যে শাস্তি দেয় না।'
'কেউ দেয় না এ কথা বলি কী করে ? যে অন্যের কাছে শাস্তি পায় না, নিজের কাছে সে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পায়।'
বীথিকা বলল, 'আমি তা বিশ্বাস করিনে। আমার একটি ছোট ভাই আছে। বছর-আটেক হবে বয়স। তাকে যখন আমি শাসন করতে যাই সে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, দিদি, আমাকে মারিস নে, আমি নিজেকে নিজে মারছি। বলতে বলতে নিজের গালে নিজে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয়। দিয়ে বলে, হল তো ? এর চেয়ে কি তুই আমাকে বেশি মারতিস ?'
অনিমেষ স্মিতমুখে বীথিকার দিকে তাকাল।
বীথিকা বলতে লাগল, 'ভারি চালাক। দুষ্টুও খুব। কায়দাটা শিখেছে পিণ্টু বাবার কাছ থেকে। বাবাও ঝগড়া-বিবাদ করে হেরে গেলে নিজের গালে নিজে চড় বসিয়ে দেন। কখনো কখনো কপালও চাপড়ান। এমন ফ্রাস্ট্রেটেড মানুষ আমি আর দু'টি দেখিনি। কিন্তু যাই বলুন, নিজের গালে চড় মারা মানে নিজেকে নিজে আদর করারই সামিল। পরের হাতে চড় না খেলে মানুষের শিক্ষা হয় না।'
অনিমেষের মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বীথিকা তার পিছনে পিছনে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোল। রাস্তা পার হল। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল।
'আপনি কি রাগ করলেন ?'
অনিমেষ বলল, 'কেন ?'
বীথিকা একটু হাসল, 'আপনার আত্মসমালোচনার মাহাত্ম্যকে খাটো করে দিলাম বলে ?'
অনিমেষ বলল, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতামতের বয়সটাও তো বেড়েছে। কেউ খাটো করে দিতে চাইলেই কি অত সহজে মাথা লুটোয় ?'
ট্যাক্সিতে উঠতে একটু ইতস্তত করল বীথিকা। অনাত্মীয় কোন পুরুষের সঙ্গে এ পর্যন্ত সে একা একা কোন ট্যাকসিতে ওঠেনি। গাড়ির মধ্যে নানা রকম কাণ্ডকারখানা হয় গল্প শুনেছে।
বীথিকা একটু আপত্তির সুরে বলল, 'কোথায় যাবেন ? বাসে গেলেই হত।'
অনিমেষ বলল, 'বাসে এখন ওঠা যাবে না। দারুণ ভিড়। ট্যাক্সি যখন একটা মিলে গেছে উঠেই পড়ুন। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'
একটু ইতস্তত করে বীথিকা উঠল ট্যাক্সিতে। দিনে-দুপুরে কী আর হবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বীথিকা ভদ্রলোককে ছেড়ে দেবে না। আর কিছু না পারুক, চেঁচাতে তো পারবে।

গাড়িতে উঠে বীথিকা বলল, 'কোন্ দিকে যাবেন বলুন তো ?'

অনিমেষ বলল, 'আমার তো ইচ্ছে যে দিকে দু' চোখ যায়। কিন্তু ড্রাইভারকে সে কথা বলতে ভরসা পাচ্ছিনে।'

বীথিকা হাসল, 'কেন বলুন তো ? লোকটি আপনাকে মাতাল ভাববে ?'

অনিমেষ বলল, 'তা না-হয় ভাবল। কোন না কোন দিকে মত্ততা তো আছেই। সেজন্যে নয়।'

'তবে ?'

'চোখের সঙ্গে আমার পার্স পাল্লা দিতে পারবে না।'

'সে কি। আপনার তো শুনেছি অঢেল টাকা।'

অনিমেষ একটু হাসল, 'টাকা অঢেল নয়, সময় অঢেল। সময়ই নাকি অর্থ। সেই অর্থে অঢেল। নষ্ট করবার মত সময় যত প্রচুর, অর্থ তেমন নয়।'

নষ্ট কথাটা কানে খট করে লাগল বীথিকার।

একটু অভিমানের সুরে বলল, 'সময়টা নষ্ট হবে বলেই যখন আপনার মনে হচ্ছে, তাহলে এলেন কেন ? আমি তো আর বলিনি, আপনিই বলেছিলেন।'

অনিমেষ বলল, 'নষ্ট মানেই যে অপ্রিয় তা তো নয়। নেশার মধ্যেই যে নাশটা রয়েছে তা কে না জানে বলুন ? তবু কি কেউ নেশাটা ছাড়ে ?'

ড্রাইভারকে বালি যেতে নির্দেশ দিল অনিমেষ।

বীথিকা একটু হাসল, 'এত জায়গা থাকতে চোখে শুধু বালিই পড়ল ?'

অনিমেষ বীথিকার দিকে তাকাল, 'গুড়ে পড়ার চেয়ে তবু চোখে পড়া ভালো। চলুন, জায়গাটা মন্দ নয় দেখতে।'

সারা পথটা প্রায় চুপচাপই কাটল। বীথিকা একটু অবাক হল। ভদ্রলোক কোন অভদ্রতা তো করলেনই না ! বরং গাড়িতে উঠে একেবারে যেন নির্বাক হয়ে রইলেন। কী ভাবছেন ভদ্রলোক ? মনে মনে কি নতুন কোন মতলব আঁটছেন, নাকি অনুতাপ করছেন ? কিসের অনুশোচনা ? এমন চুপচাপ থাকতে কারই বা ভালো লাগে ? গল্প করবার জন্যেই তো আসা।

ট্যাক্‌সিটা ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার ধারে এসে ভদ্রলোক ফের মুখ খুললেন। বীথিকা লক্ষ্য করল, আবার তাঁর মেজাজ এসেছে।

একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে ভদ্রলোক বসলেন, বীথিকাকেও পাশে বসতে বললেন। তারপর হেসে বললেন, 'আপনার গল্প বলুন শুনি।'

বীথিকা বলল, 'আমার গল্প ? জীবনে বলবার মত কোন গল্পই হল না।'

অনিমেষ বলল, 'হল না ? না হতে দিলেন না ?'

বীথিকা বলল, 'কী করে হতে দিই বলুন। এত চাপ সংসারের। এত দায়-দায়িত্ব। বুড়ো বাপ-মা, অনেকগুলি নাবালক ভাই-বোন। মাঝে মাঝে এত বিরক্তি হয়, এত রাগ ধরে ! ভাবি এত সব কেন আমি দেখব ? সব বোঝা কেন আমি বইব ? কিন্তু ভাই-বোনগুলির মুখের দিকে তাকালে আবার সব ভুলে যাই। ভাবি ওদের মানুষ করার চেয়ে বড় কাজ আমার আর নেই।'

বলতে বলতে বীথিকা একটু অপ্রতিভ হল। ভদ্রলোক অপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন রূপকথা শুনছেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর দৃষ্টিতে কোন লুব্ধতা নেই। কী আছে কে জানে ? মমতা ? সহানুভূতি ?

'এবার আপনার কথা বলুন। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই গল্পের কোন অভাব নেই।'

'কি রকম ?'

'রোজ একটি করে মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়, আর গল্প গড়ে ওঠে।'

'আলাপ হলেই কি গল্প হয় ? আমাদের মধ্যে কি কোন গল্প হচ্ছে ?'

'হচ্ছে না কি ?'

চোখে চোখ পড়তেই বীথিকা মুখ নামিয়ে নিল। তারপর ঘাস ছিঁড়তে লাগল নিজের মনে।

অনিমেষ তবু চুপ করে বসে রইল।

খানিক বাদে বীথিকা ফের মুখ তুলল, 'কই বললেন না ?'

'কী বলব ?'

'কেন আপনার গল্প ?'

অনিমেষ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার সব গল্প বলবার মত নয়। আপনার সঙ্গে সে গল্পের কোন মিলও নেই। প্রথম যৌবনে সাধ হয়েছিল অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করব।'

সকৌতুকে চোখ তুলল বীথিকা, 'সে সাধ তো সব ছেলেরই থাকে। তারপর করেছেন বিয়ে ? কেমন দেখতে আপনার স্ত্রী ?'

অনিমেষ একটু হাসল, 'কী করে বলব ? এখন পর্যন্ত তো দেখিনি।'

'মানে, বিয়ে করেন নি ?'

'ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি। আত্মীয়স্বজন নিয়ে, বন্ধুদের নিয়ে। যে দেখতে ভালো, সে শুনতে ভালো নয়। যার রূপ আছে তার বিদ্যেবুদ্ধি নেই। যে যত দুর্লভা হল, আমার পণও তত কঠোর হতে লাগল। আমি যাকে চাই তার শুধু মনোরমা হলে চলবে না, তাকে আমার মনোবৃত্তি অনুসারিণীও হতে হবে।'

'তারপর ?'

'বাবা কয়েকটি বন্ধু-কন্যাকে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু তারা কেউ আমার মনোনীতা হল না। মায়ের পছন্দ-করা পাত্রীদেরও আমি বাতিল করলাম। মা রাগ করে বললেন, এ তোর বিয়ে না করার ছল। ভূ-ভারতে কি তোর যোগ্য কোন মেয়ে নেই ? তুই-ই বা এমন কোন্ রূপের কার্তিক ? তখন আমার মাথা ভরতি চুল, গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল। তবু মা আমাকে অমন একটা বিশ্রী খোঁটা দিলেন। মা দিলেন বলেই সইলাম।'

বীথিকা একটু হাসল, 'আর কেউ দিলে বুঝি সইতেন না ? মা কি এখনো আপনাকে খোঁটা দেন ?'

'না। অনেকদিন ওসব পাট বন্ধ হয়েছে ? বাবা-মা দু'জনেই চলে গেছেন।'

অনিমেষ একটু থামল। থেমে জলের দিকে তাকাল।

বীথিকাও তাকাল সেই দিকে। ঘাটে কয়েকখানা নৌকো বাঁধা। অনেক দূর দিয়ে আর একখানা নৌকো যাচ্ছে পাল তুলে। নৌকোয় উঠবার ভারি শখ বীথিকার। কিন্তু ভয়ও আছে। সাঁতার জানে না একেবারেই।

বীথিকা চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, 'তারপর ?'

'তারপর ছোটভাইরা বিয়ে করল, দাদা তো আগেই বিয়ে করেছিলেন। আমি মধ্যমকুমার, চিরকুমার রয়ে গেলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল। রাতারাতি নয়, অনেক দিন-রাত ধরে।'

'কী পরিবর্তন ?'

'এতদিন কোন মুখেই রূপ খুঁজে পেতাম না, এখন প্রতি মুখেই রূপ দেখি।'

বীথিকা লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর জোর করে সংকোচ কাটিয়ে বলল, 'সর্বনাশ! প্রতি মুখে! আপনার সেই তখনকার না দেখার মত এখনকার এই দেখাও তো সাংঘাতিক।'

'সাংঘাতিক বইকি। তখন ছিলাম অন্ধ, এখন ইন্দ্রের মত অসংখ্য লোচন। আর প্রতিটি লোচনে আসক্তির কাজল। মাঝে মাঝে মনে হয় রূপটুপ সব বাজে কথা। ওই বয়সই সব। কিন্তু সে কাজল তো শুধু চোখে থাকে না, মুখেও মাখিয়ে দেয়। তখন কিম্ভূতকিমাকার হয় চেহারা।'

ভদ্রলোক তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বীথিকার ভয় করতে লাগল। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। কিন্তু বেশিকিছু হল না। বীথিকা হতে দিল না। একবার তিনি শুধু তার হাতখানা ধরেছিলেন। বীথিকার মুঠিতে ঘাস ছিল। সেই ঘাসসুদ্ধ মুঠি আর

একজনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে একটু সময় নিয়েছিল বীথিকা। কিন্তু আর কোন সুযোগ তাঁকে দেয় নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'চলুন, এবার ওঠা যাক।'

কিসের একটা অবর্ণনীয় ভয় যে বীথিকাকে পেয়ে বসেছিল তা বলবার নয়। তার মনে হচ্ছিল নদীর স্রোতে পাল তোলা নৌকোর মত, না নৌকোর মত নয়, অসহায় কুটোর মত সে যেন অকূলে ভেসে যাচ্ছে। কে যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার ভেসে গেলে তো চলবে না। তার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। ছোট ভাইবোনগুলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ফেরার সময় ট্যাক্সি মিলল না। মিললেও বীথিকা তাতে উঠত না। উঠতে সাহস পেত না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ট্যাক্সি তাকে বাসায় পৌঁছে দিত কিনা কে জানে। গাঢ়তর কোন অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে গেলেও কিছু বলবার ছিল না, করবার ছিল না।

তারচেয়ে জনবহুল বাস অনেক নিরাপদ। ভিড়ের মধ্যে কোন ভয় নেই বীথিকার। নিবিড়তাকেই ভয়।

বীথিকা বসে এল। ভদ্রলোককে সারাটা পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হল। বীথিকার এপাশে-ওপাশে সহযাত্রিণীরা।

বরানগরে এসে যে স্টপে নামার কথা বীথিকার, তার একটা স্টপ আগেই নামল। সাবধান হওয়া ভালো। কোত্থেকে কে দেখে ফেলবে।

আশ্চর্য, ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছেন। লোকটি কী। একেবারে নাছোড়বান্দা। কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। পাড়ার কারো যদি চোখে পড়ে তবে কী ভাববে।

বীথিকা একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এ কি, আপনি এখানে নামলেন যে। আপনার তো শ্যামবাজারে গিয়ে বাস বদলাবার কথা।'

অনিমেষ বলল, 'তার আগেই মতটা বদলে ফেলেছি। চলুন, আপনাকে আর-একটু এগিয়ে দিই।'

'না না, আর এগোতে হবে না। আমি একাই বেশ যেতে পারব।'

সরু গলির মোড়টায় দাঁড়িয়ে একটি ছেলে ফুল বিক্রি করছিল। অনিমেষ বলল, 'দেখুন দেখুন, গোলাপগুলি বেশ টাটকা বলেই মনে হচ্ছে। আর বেশ বড়োও। আপনাকে কিনে দিই এক ডজন। নিয়ে যান।'

'না না, ফুল নিতে পারব না।'

অনিমেষ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'কেন?'

'জানেন না তো, আমাদের বাড়িতে ফুল সম্বন্ধে দারুণ এলার্জি।'

'কি রকম?'

'আমার বাবা ফুলের মধ্যে শুধু কীটই দেখেন না, কেউটেও দেখেন।'

'আর আপনি নিজে?'

বীথিকা বলল, 'আমার কথা আলাদা। আচ্ছা, আমাকে কি আপনার সিনিক বলে মনে হয়?'

অনিমেষ বীথিকার চোখের দিকে তাকাল। কালো বড় সুন্দর দুটি চোখ। এই চোখই অনিমেষের সবচেয়ে আগে চোখে পড়েছে।

'না, সিনিক আপনি নন, যদিও আপনি আমার সব প্রস্তাবই প্রায় নাকোচ করেছেন তবু আপনাকে নেতিবাদিনী আমি বলি নে।'

'তবে কী বলেন?'

'ঠিক তার উলটো। দায়িত্ববোধে, কর্তব্যবোধে, মায়ায় মমতায় সব ব্যাপারে আপনি অস্তিবাদিনী, অস্তিত্বময়ী।'

বীথিকার কানে যেন মধু ঝরতে লাগল। তার মনে হল, সেই দুপুরের পর থেকে এই সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখনকার এই ক্ষণটিই পরম শুভ, এই মুহূর্তটিই মাহেন্দ্র-মুহূর্ত।

একটু চুপ করে থেকে এবার বিদায় নিল বীথিকা। হেসে বলল, 'চলি, আপনার কত সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম।'

অনিমেষ শুধু হাসল। কোন কথা বলল না। সেই হাসির মধ্যে এই আশ্বাসটুকু ছিল, নষ্ট হয় নি।
আরো খানিক দূর এগিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল বীথিকা। মোড়ে একটি মিষ্টির দোকান। তার সামনে এসে দাঁড়াল। সন্দেশ-রসগোল্লা কিছুই তো আজকাল পাওয়া যায় না। আইনের নিষেধ। শুধু দরবেশ আছে। মাথা গুণে গুণে আটজনের জন্য আটটি দরবেশ কিনল বীথিকা। বাবা আগে আগে দরবেশ দু' চোখে দেখতে পারতেন না। এখন কিন্তু বেশ পছন্দ করেন।
বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বীথিকা ভাবল, শুধু এই মিষ্টি দিয়েই সব মুখ বন্ধ করা যাবে না। একচোট বর্ষণ হবে। একরাশ মিথ্যে কৈফিয়ৎ সাজাতে হবে বীথিকাকে। তা হোক। সব মিলিয়ে সময়টা কিন্তু মন্দ কাটে নি। কী করে যে কেটে গেল যেন টেরই পেল না বীথিকা। আশ্চর্য, পথে আসতে আসতে কত জিনিস যে চোখে পড়ছিল। দু'বার দুই ঝাড় শিমুলগাছ দেখেছে। পাতা একটিও নেই, শুধু ফুল। ডালে ডালে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। গন্ধ নেই, কিছু নেই, তবু ফুল যে অত সুন্দর হয়—। সুগন্ধ ফুলও ইচ্ছা করলেই পেতে পারত বীথিকা। আহা, ভদ্রলোকের হাত থেকে ফুলগুলি নিয়ে এলেই হত। উনি দিতে চাইলেন অত করে। মিথ্যে কথা তো বলতে হবেই, না হয় ওই ক'টি ফুলের উৎসকে ঢাকবার জন্য আরো কিছু মিথ্যে—।

বেশি ভিড় দেখে একটা বাস ছেড়ে দিল অনিমেষ। আর একটা বাস কখন আসবে কে জানে। তাতে ভিড় আরো বেশি হবে কিনা বলা যায় না। তবু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এবার বেশ ক্লান্তি লাগছে অনিমেষের। সারাটা দিন কীভাবে কাটল। অতি সাধারণ একটি টাইপিস্ট মেয়ের সঙ্গে। শুনলে কেউ তার রুচির প্রশংসা করবে না। কী ভয় মেয়েটির। বাড়িতে ফেরার জন্যে পাগল। একি ওর ভীরুতা না মেয়েলিপনা কে জানে। পুরো একটা দিন ওকে নিয়ে কাটিয়ে দিল অনিমেষ। একটি মেয়ের একখানি হাত ধরবার জন্যে এত তোড়জোড়, এত সময় আর অর্থের অপচয়। কিন্তু অপচয় কি ? অপচয় ঠিক বলা যায় না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনিমেষ একেবারেই কিছু পায়নি এ কথা মিথ্যে। কিন্তু এই পাওয়ার মানেটা কি। সেই একই অভ্যস্ততার মুখ। একই পদ্ধতিপ্রকরণ। রেস্টুরেন্টে চা খাওয়া, ট্যাক্সিতে করে বেড়ানো। জলের ধারে বসে কলকণ্ঠ হওয়া, কলস্বর শোনা। সব এক, সব এক। পাত্রীটি শুধু আলাদা।
তবু আসতে আসতে গোধূলির যে রক্তরাগ দেখেছিল অনিমেষ, তা কি রোজ দেখে ? একটি দরিদ্র মেয়ের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী শুনতে শুনতে যে সহানুভূতি অনুভব করেছিল তা কি রোজ করে ? সব দিক থেকেই অসম অবস্থার একটি মেয়ের সঙ্গে যে সৌহার্দ্যের স্বাদ সে অনুভব করেছে তা যে ষোল আনাই erotic তাও সত্যি নয়। সবেচেয় শেষে যে প্রশস্তিটুকু তাকে অনিমেষ জানিয়েছে, তার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নেই।
ফুলওয়ালা ছেলেটি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলে বোঝা যায় বেশি ফুল তার বিক্রি হয়নি।
অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে এক ডজন ফুল কিনল।
ছেলেটি ভারি খুশী। ওর শুকনো মুখখানি যেন আর-একটি রক্ত-গোলাপ হয়ে উঠেছে।
অনিমেষ মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকাল। ভাবল, বাড়িতে গিয়ে ফুলগুলি এবার স্ত্রীকে দেবে অনিমেষ। হ্যাঁ, সবই ওর আছে। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সব।
বীথিকাকে সে বানিয়ে বানিয়ে অন্য কথা বলেছে। সে তো রূপকথাই শুনতে চেয়েছিল।

মাঘ ১৩৭২

পুনরাবৃত্তি

ঘর সংসারের সব কাজ সেরে রাত এগারোটায় মণিমালা শুতে এলেন।
বড় মেয়ে কুমকুম টেবিল চেয়ারে বসে তখনো পরীক্ষার পড়া পড়ছে।
মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন মণিমালা, 'কীরে, আজ তোর ঘুম পায় না ? আজ যে এত

রাত অবধি জেগে আছিস ?'

কুমকুম বলল, 'বাঃ রে, পরীক্ষা এগিয়ে আসছে না ?'

মণিমালা বললেন, 'আসুক। বেশি রাত জেগে দরকার নেই। শেষে শরীর খারাপ করবে। তাছাড়া রাত জাগলেই তো বেলা করে উঠবি। আটটার আগে তোকে আর টেনে তোলা যাবে না।'

কুমকুম হেসে বললে, 'আজ তো আমি তোমার ঘরে তোমার কাছেই ঘুমোচ্ছি। আমার ভাগ্যে আজ আর ঘুমের সুখ নেই। তুমি আমাকে রাত থাকতেই টেনে তুলবে।'

মা আর মেয়ে দুজনেই শাড়ি বদলাল। কুমকুমের পরনে সবুজ রঙের শাড়ি আর লাল সোয়েটার। সুরেশ্বরবাবু বলেছিলেন ভারি মানিয়েছে ওকে। 'সবুজের সঙ্গে লাল চমৎকার মানায়। ওর যা গায়ের রঙ, তাতে সব রঙেই রঙ ধরে।' বলেছিলেন সুরেশ্বরবাবু।

মণিমালার সামনেই তার এই অষ্টাদশী তরুণী মেয়ের রূপের প্রশংসা করেন তিনি। রূপেরই হোক গুণেরই হোক প্রশংসা কার না ভালো লাগে। মেয়ের রূপের প্রশংসায় মণিমালা খুশি হন। মেয়ের তো কথাই নেই। নিজের সমবয়সী উত্তর পঞ্চাশ এই প্রৌঢ়ের রূপমুগ্ধতার দিকে মাঝে মাঝে তাকান মণিমালা। শুধু লক্ষ্য করে যান! একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। বলবার অবকাশ দেন না সুরেশ্বর। তাঁর কথা শুনে মনে হয় না তিনি কাউকে খুশি করার জন্যে এসব কথা বলছেন। শুধু নিজের খুশিকে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। এসব যেন তার স্তুতি নয় স্তব।

মায়ের পাশে শুয়ে পড়তে পড়তে কুমকুম বলল, 'তোমার বিছানা পাতা, মশারি খাটানো সব সারা। তুমি আমাদের কিছু করতে দাও না কেন মা। না করতে দিলে আমরা এ-সব কাজ শিখব কী করে ?'

মণিমালা মনে মনে হাসেন। একথা ওদের বাবার কথারই প্রতিধ্বনি। ওদের বাবাও বলেন, 'সব কেন একা একা করছ। মেয়েদের দিয়ে কাজ করাও। ওদের কাজ শিখতে দাও।'

মণিমালা সস্নেহে বলেন, 'শিখবে শিখবে। এ-সব কাজ মেয়েরা দেখে দেখেই শেখে। কোন কাজটা ওরা না জানে তাই বলো।'

কুমকুম মায়ের গা ঘেঁষে এসে শুয়েছে। ঠিক ছেলেবেলার মতই মাকে জড়িয়ে ধরেছে। 'তুমি খেটে খেটেই শরীরটা শেষ করলে মা। আমাকে কিচ্ছু করতে দেবে না, কিচ্ছু না।'

মণিমালা বললেন, 'দেব, দেব। তোর পার্ট ওয়ান পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তখন তুই রান্নাবান্না সব করিস।'

কুমকুম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যাই বলো মা, তোমাদের ওই সুরেশ্বরবাবুর কথাবার্তা যেন কেমন কেমন।'

মণিমালা চমকে উঠেন, 'কেন রে। তোকে কী বলেছেন তিনি ?'

কুমকুম বলল, 'আমাকে আবার কী বলবেন। তোমাকে আজ সন্ধ্যাবেলায় বললেন না, তোমাকে তোমার বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়। কেন তিনি ওকথা বলবেন তোমাকে ? তিনি নিজে কী ? তিনি নিজেও তো বুড়ো।'

মণিমালা সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। হেসে বললেন, 'তোর বুঝি তাতে খুব রাগ হয়েছে।'

কুমকুম বলল, 'হবে না ?'

মণিমালা বললেন, 'ও-কথা তো সবাই বলে কুমু। সবাই বলে বয়সের তুলনায় আমি বেশি বুড়িয়ে গেছি। আমার দাদারা পর্যন্ত বলে, মণি তুই আমাদের ছোট বোন, কিন্তু এখন তুই আমাদের দিদি হয়েছিস।'

কুমকুম চুপ করে রইল।

মণিমালার মনে পড়ল আজই সন্ধ্যাবেলায় ঘটেছিল ব্যাপারটা।

মাঝে মাঝে সুরেশ্বরবাবু যেমন আসেন আজও তেমনি এসেছেন। ড্রয়িং-রুমে বসে চা খাচ্ছেন, গল্প করছেন। তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন। স্বামী গেছেন সান্ধ্য-ভ্রমণে, পাড়াতেই এক বন্ধুর বাড়িতে। ছেলেদেরও ক্লাব আছে, বন্ধুবান্ধব আছে।

মণিমালা নিজেই তাঁদের এই পারিবারিক বন্ধু আর সম্ভ্রান্ত অতিথিকে আপ্যায়ন করছেন।

হঠাৎ সুরেশ্বরবাবু বললেন, 'আচ্ছা, মিসেস রায়, আপনার কি কোন অসুখ-বিসুখ আছে ?'

মণিমালা একটু হেসে বলেছিলেন, 'না তো।'

সুরেশ্বর বলেছিলেন, 'তবে কেন আপনাকে এমন শুকনো শুকনো দেখায় বলুন তো। আপনার যা বয়স—'

পরে নিজেই বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন, 'মাফ করবেন। মেয়েদের ও কথা তোলাটা ঠিক নয়। তবু বলছি আপনার বয়সের তুলনায় আপনাকে—'

মণিমালা ফের একটু হেসেছিলেন, 'বেশি বুড়ো দেখায় এই তো ? কী করব বলুন। তবে আমার কোন অসুখ-বিসুখ নেই। সেদিক থেকে সুখেই আছি। তবে বয়সকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিনে। সে চেষ্টাও করছিনে।'

কুমকুম পাশেই বসেছিল। সে বলল, 'মা তো একেবারেই সাজেটাজে না। আমরা বড় হবার পর থেকে রঙিন শাড়ি পরা ছেড়েই দিয়েছে। এত করে বলি—। নইলে আমার মাও তো সুন্দরী—'

মণিমালা লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, 'যাক তোমার আর ও-সব বলতে হবে না।'

সুরেশ্বরবাবু কুমকুমের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন, 'কুমু, ও-কথাটা আমারই বলবার। কিন্তু ভয়ে বলতে পারিনি।'

মণিমালা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'কেন ভয় কিসের ?'

সুরেশ্বরবাবু বলেছিলেন, 'পাছে বেয়াদপি করে বসি ?'

মণিমালা এ-কথার জবাবে কিছু বলেননি। স্মিতমুখে চুপ করে ছিলেন। ভদ্রলোক ফ্লার্ট করতে জানেন। কিন্তু সব কথার জবাব দিতে নেই, এ-কথাও মণিমালার জানা আছে।

একটু বাদে সুরেশ্বরই ফের কথা বলেছিলেন। 'কিন্তু আপনার attitude-ই সবচেয়ে ভালো মিসেস রায়। বয়সকে ungrudgingly মেনে নিতে পারাই সবচেয়ে ভালো। one should learn to grow old.'

মণিমালা একটু হেসে বলেছিলেন, 'আপনি কি তা শেখেন নি ?'

সুরেশ্বরবাবু বলেছিলেন, 'কই আর শিখলাম। শিখি আর বারে বারে ভুলে যাই।'

মণিমালার মেজো আর ছোট মেয়ে রীতা আর মিতা খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। দুটিই ফ্রকপরা স্কুলের ছাত্রী, একটি ক্লাস নাইনে পড়ে, আর একটি এইটে। একটির বয়স পনের আর একটির তের। ওই বয়সে চপলতা স্বাভাবিক।

তবু মণিমালা ওদের মৃদু ধমক দিয়েছিলেন, 'ও কি হচ্ছে ? হাসছিস কেন তোরা ?'

সুরেশ্বর বলেছিলেন, 'ধমকাবেন না ওদের। হাসতে দিন। ওদের হাসি ঝরনার শব্দের মত মিষ্টি। ওদের রূপ ঝরনার স্রোতের মত লীলায়িত। আপনি কি কৃষ্ণনগরের কারিগরকে খবর দিয়ে এইসব সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরি করিয়েছিলেন মিসেস রায় ? তারপর ওদের প্রাণ দিয়েছেন ?'

মণিমালা হেসে বলেছিলেন, 'অত সুখ্যাতি করবেন না। ওদের দেমাক বেড়ে যাবে। শুধু রূপ থাকলেই কি হয় ? গুণ যোগ্যতা যদি ওরা না বাড়াতে পারে ?'

সুরেশ্বর ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'পারবে নিশ্চয়ই পারবে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আপনার মেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো তাছাড়া রীতা ছবি আঁকে, মিতা নাচে। ওরা তো প্রত্যেকেই গুণান্বিতা।'

মণিমালা হেসে বলেছিলেন, 'আর ওদের দিদি। ও তো কিচ্ছু জানে না। বলে বলেও ওকে কিছু শেখাতে পারলাম না। যা কেবল ওই পড়াশুনা নিয়েই আছে। তবু কেন আপনি ওকে অত ভালোবাসেন সুরেশ্বরবাবু ?'

সুরেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'ওকে ভালোবাসি ওর স্বভাবের জন্যে।' তারপর কুমকুমের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন—

'Angel where you are there is love and goodness. Where you are nature is there.'

আরক্ত হয়েছিল কুমকুম। অত বড় মেয়ে অবুঝ তো আর নয়। মণিমালা নিজেও একটু অস্বস্তি

বোধ করেছিলেন মেয়ের এই প্রশস্তিতে কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। ভদ্রলোকের আবৃত্তি সুন্দর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট।

একটু বাদে মণিমালা হেসে বলেছিলেন, 'যা ভেবেছেনে আপনার এঞ্জেল বড় সুবিধের পাত্রী নয় সুরেশ্বরবাবু। ভারি একগুঁয়ে আর জেদী।'

সুরেশ্বর কুমকুমের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তাই নাকি? তুমিও কি বিপরীত ললিতে কঠোর?'

কুমকুম কোন জবাব দেয়নি। মণিমালার মেয়েরা কম কথা বলে। তিনি নিজেই ওদের হয়ে আলাপ চালিয়ে যান।

সুরেশ্বর আবার সেই পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন, 'যা বলছিলাম, শিখি আর ভুলে যাই। শুনেছি সাঁতার একবার শিখলে মানুষ তা ভোলে না। সাইকেল চালানো একবার শিখলে কেউ তা ভোলে না। কিন্তু সব বিদ্যার বেলায় একথা খাটে না মিসেস রায়। আমরা শিখি আর ভুলি। এদিক থেকে অভিজ্ঞতা আমাদেব কিছুই শেখায় না।'

অমনিতে সুরেশ্বরকে বেশ স্ফূর্তিবাজ মানুষ মনে হয়। কথায়-বার্তায় কৌতুক জড়ানো থাকে। চাপা কৌতুক। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে এই বিষাদ তাঁর আলাপে নতুন স্বাদ নিয়ে আসে। এই সব মুহূর্তে মণিমালার মনে হয় সুরেশ্বর চৌধুরী তাঁরই বন্ধু। ভদ্রলোক যেন রূপসজ্জার সাহায্য ছাড়াই বহুরূপী সাজ'তে পারেন। তিনি মণিমালার স্বামী প্রায় সত্তর বছরের বয়সের বৃদ্ধের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তখন মনে হয়, বাড়ির কর্তা অলোকেশবাবুই তাঁর পরম বন্ধু। তিনি যেন তাঁর সমবয়সী। অন্তত বহু অভিজ্ঞতা উপলব্ধির সম-অংশীদার। আবার তাঁদের তের বছরের সর্বকণিষ্ঠা মেয়েটির সঙ্গেও কি তাঁর কম ঘনিষ্ঠতা? মিতার সঙ্গে বসে তিনি তাঁর ধাঁধার উত্তর মেলাতে বসেন, তার নাচ দেখার জন্যে সাধাসাধি করেন। মণিমালার দুই যুবক ছেলে চন্দন আর কাজলের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বে আগ্রহী। তিনি জানতে চান তাদের সাহিত্য রুচি তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, সেই সঙ্গে তাদের বন্ধু আর বান্ধবীদের সম্বন্ধেও তাঁকে খোঁজখবর নিতে দেখা যায়। এই সুরেশ্বরই যখন মণিমালাব বড় মেয়ে কুমকুমেব সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাঁর গলায় অন্য সুর বেজে ওঠে। তখন তিনি যেন এক রোমান্টিক হিরো। যেন বাইশ তেইশ বছরের তরুণ যুবক। শুধু তাই নয়, কুমকুমকেই যেন তিনি প্রথম নারী হিসাবে দেখেছেন। মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করেন মণিমালা। এর মধ্যে কতখানি কৌতুক কতখানি যথার্থতা তিনি যেন তা সব সময় ঠিক করে উঠতে পারেন না। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন, সবই মণিমালার চোখের সামনে, তিনি কুমকুমকে সম্বোধন করে যা কিছু বলেন, সবই পাঁচজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে। এ যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে গোপন প্রেম গুঞ্জন। শত শত দর্শকের কানে গিয়ে তা পৌঁছায়।

রীতা আর মিতা কুমকুমকে ক্ষ্যাপায়—'আসলে উনি তোরই বন্ধু দিদি। উনি তোর জন্যেই আসেন।'

কুমকুম ওদের তাড়া করে, 'বয়ে গেছে আমার চেয়ে তিনগুণ বয়সে বড় ওই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে।'

ছেলেরাও বোনকে ক্ষ্যাপায়, 'উনি দেখছি তোর সবচেয়ে বড় বন্ধু।'

কুমকুম বলে, 'বন্ধুত্বের আবার বুড়ো আর গুঁড়ো কিসের?'

সুরেশ্বর যে ধরনে কথা বলেন, যে ভঙ্গিতে বসেন, তাঁর ছোটখাটো মুদ্রাদোষগুলি কাজল নকল করে দেখায়। ক্যারিকেচারে ওস্তাদ ছেলে। কাজল তাঁর পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে তাঁর কার্টুন এঁকে কুমকুমকে উপহার দেয়।

এই পরিবারের বন্ধুটিকে নিয়ে তাঁর আড়ালে রঙ্গ-কৌতুক বড় কম জমে না। সেই কৌতুকে কুমকুম নিজেও যোগ দেয়। দাদাদের সঙ্গে নিজেও হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তিনি যখন ফের একদিন এসে তিন চারটি গোলাপ ফুল নিয়ে মণিমালার তিন মেয়েকে উপহার দিয়ে বলেন, **'Three roses to three roses. To three virtues, beauty, purity and innocence.'** তখন সবাই কেমন যেন চুপ করে যায়। একজনের সোচ্চারিত এই

সৌন্দর্য সম্ভোগে আশেপাশের আর সবাই মূক হয়ে থাকে।

ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে একটু নাটুকেপনা আছে। চেহারাটিও নটসুলভ। কিন্তু সব কেমন যেন মানিয়ে যায়। তাঁর কবিত্বের মধ্যে কতটুকু কৌতুক, কতটুকু যথার্থ ঠিক করে উঠতে পারেন না মণিমালা। অভিনয় ভদ্রলোকের বৃত্তি নয়। জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বই নেই। কোন এক কলেজ লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান। তাতেই কি সংসার চলে ? হয়তো আরও কিছু করেন। আর তিনি কী করেন না করেন তা জানেন না মণিমালা। কাজটা যেন তাঁর বড় কথা নয়। তাঁর কথকতা, তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্য উপস্থিতিটাই বড়।

সুরেশ্বর অলোকেশের পার্কের বন্ধু। একদিন তিনিই চা খাওয়াবার জন্য বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন। এখন সুরেশ্বর না ডাকতেই আসেন। বন্ধুর বাড়িটাই তাঁর কাছে পার্ক হয়ে উঠেছে। তাতে মণিমালার ক্ষতি কিছু নেই। তাঁর নিজের তো আর বেরোনো হয় না। বাইরের কোন সদালাপী সমবয়সী, সমরুচির মানুষ নিজে থেকে বাড়িতে এসে হাসিগল্পে খানিকটা অবসর যদি রঞ্জিত করে দেন ভালোই লাগে। তবু মাঝে মাঝে মণিমালার মনে হয়, কেন উনি আসেন ? উদ্দেশ্যটা কী ? যথার্থ আকর্ষণটা কোথায় ?'

ভদ্রলোকের অবশ্য নিজের পরিবার-পরিজন আছে। কিন্তু তাদের কথা তিনি উল্লেখ করেন না। তেমন কোন প্রসঙ্গই উঠতে দেন না। হয় তাদের কথা তিনি ভুলে যান, না হয় ইচ্ছা করেই ভুলে থাকেন। কে জানে তাঁর পারিবারিক জীবনে কোন অপূর্ণতা কোন অশান্তি আছে কিনা। অবশ্য এই সংসারে ষোল আনা সুখ কেই বা পায়। কিছু না কিছু অপূর্ণতার দুঃখ সবাইরই থাকে। সেই দুঃখটুকু ভুলবার জন্যেই তিনি কি আসেন। নাকি ওঁর কোন দুঃখ নেই ? অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সুখ নিজের থলিতে ভরে নেওয়ার জন্যেই ওঁর এখানে আনাগোনা ?

'মা এ-ঘরে জল আছে ?'

কুমকুমের কথায় একটু চমকে উঠলেন মণিমালা।

'ওমা তুই এখনো ঘুমোসনি ?'

কুমকুম বলল, 'না কেন যেন ঘুম আসছে না। ঘুম চটে গেছে। এক গ্লাস জল খেয়ে নিই।'

মণিমালা বললেন, 'কুঁজো আছে খাটের নীচে। কাঁচের গ্লাস চাপা দেওয়া আছে, কুঁজোর মুখে। খেতে পারবি ? না আমি উঠে দেব ?'

কুমকুম বলল, 'না, না, তোমায় দিতে হবে না মা। আমি নিচ্ছি। তুমি শেষে বলবে, আমার মেয়ে এমন অকর্মা, কুঁজোর জলটুকুও গড়িয়ে খেতে পারে না।'

মশারি তুলে কুমকুম নিজেই উঠে জল খেতে গেল।

মণিমালা মেয়েকে সাবধান করে দিলেন, 'মশারি অত তুলিসনে কুমু। মশা আসবে। ভিতরে মশা ঢুকলে আর ঘুমুতে পারব না। সারারাত জেগে থাকতে হবে।'

জল খেয়ে কুমকুম এসে মায়ের পাশে ফের শুয়ে পড়ল

পাশের ঘরে অলোকেশ ঘুমুচ্ছেন। দু'পাশে তাঁর দুই মেয়ে। ঘরের দরজা খোলা। দরকার হলেই যাতে মণিমালা অসুস্থ স্বামীর কাছে যেতে পারেন। হার্ট ডিজিজের রোগী। মাঝে মাঝে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়। ডাক্তার ওষুধ পথ্য লেগেই আছে। মণিমালা একাধারে স্বামীর নার্স, প্রাইভেট সেক্রেটারী আর অভিভাবিকা। এক মুহূর্ত কাছ ছাড়া করেন না। কিন্তু আজ রীতা আর মিতা আবদার ধরেছে ওরা বাবার কাছে শোবে। তাই বড় মেয়ের কাছে এসে শুয়েছেন। ছেলেরা দোতালার দুটি আলাদা ঘরে ঘুমুচ্ছে। অমনিতে দুই ভাইয়ের মধ্যে খুব ভাব। কিন্তু কেউ কারো বিছানায় শোবে না। দু'জনেই শয্যাবিলাসী। আর যার যার ব্যক্তিগত প্রাইভেসি রাখার ব্যাপারে যত্নবান। নিজে শুতে আসবার আগে ওদের খোঁজখবর নিয়ে এসেছিলেন মণিমালা। বিছানা পেতে মশারি গুঁজে দিয়ে এসেছেন। হেসে বলেছেন, 'তোদের কতদিন আর এই নবাবী চলবে।'

চন্দন বলেছে, 'তুমি যতদিন আছ মা ততদিন একজন নবাব একজন বাদশা।'

কাজল বলেছে, 'তারপর একজন ফকির আর একজন দরবেশ।'

মণিমালা বলেছেন, 'বালাই ষাট। দরবেশ কেন হতে যাবি। দুজনে দুই বাদশাজাদীকে ঘরে নিয়ে আসবি। তারা দাসী বাঁদির মত তোদের সেবা করবে যত্ন করবে।'

কাজল হেসে বলেছে, 'ওসব স্বপ্ন রেখে দাও মা। সবাই কি আর তোমার মত? আজকালকার বউরা তোমার মত লক্ষ্মী বউ হয় না।'

মণিমালা ঘুমোবার জন্যে পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিলেন, কুমকুম আবার কথা বলল, 'আচ্ছা মা।'

'কী বলছিস।'

'তোমার আর বাবার বয়সের এত ডিফারেন্সটা উনি জানেন কী করে?'

মণিমালা বললেন, 'কী করে আবার জানবেন। দেখলেই তো বোঝা যায়। কেন এ নিয়ে কি তোর সঙ্গে ওঁর কোন কথা হয়েছে?'

কুমকুম বলল, 'আমার সঙ্গে কেন কথা হবে। সুরেশবাবু নিজেই সেদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, কিছু মনে করবেন না অলোকেশবাবু, মিসেস রায় কি আপনার দ্বিতীয় পক্ষ? বাবা হেসে বলেছিলেন, না মশাই আমার প্রথম দ্বিতীয় নেই উনিই একমাত্র। একটু বেশি বয়সে এসে ওই দুর্মতিটি হয়েছিল। তারপর বাবা তাড়াতাড়ি অন্য কথায় চলে গিয়েছিলেন। নইলে তোমরা যে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে সে কথাও উনি টেনে বের করতেন।'

মণিমালা হেসে বললেন, 'বের করলে কী আর হত।' কুমকুম বলল, 'সত্যি, এখন জানাজানি হলে তোমাদের আর কিছু ভয় নেই তাই না মা?'

মণিমালা হেসে বললেন, 'ফাজিল মেয়ে কোথাকার। ওসব কথা শুনে তোর এখন কী হবে এই রাত দুপুরে? ঘুমো শিগগির। নইলে কাল ভোরে উঠতে পারবিনে। কুমকুম বলল, 'ভোরে আমি ঠিকই উঠব মা। তোমাকে ভাবতে হবে না। পরীক্ষা তো আর তুমি দিচ্ছ না। বল না সেই গল্প; এখন আর লজ্জা কি। এখন তো সে সব প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার।'

মেয়েদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু মণিমালার মাঝে মাঝে মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। হ্যাঁ তাঁর তখন কুমকুমের এই বয়স। তিনিও তখন বি-এ থার্ড ইয়ারে পড়েন। মেজোকাকার বন্ধু হিসাবে পড়াতে আসতেন। পেশাদার টিউটর ছিলেন না। পড়াতে ভালো বাসতেন তাই আসতেন। পাঠরতাকে ভালোবাসতেন তাই আসতেন।

কুমকুম বলল, 'আচ্ছা মা, তোমাদের বয়সের ডিফারেন্স ছিল আঠের বছর তাই না? আর বাবা তোমাকে সাঁইত্রিশ বছরে বিয়ে করেছিলেন।'

মণিমালা একটু ধমকের সুরে বললেন, 'একেবারে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী। তুই আমাদের ঠিকুজী কুষ্ঠি মুখস্থ করে রেখেছিস বুঝি?'

কুমকুম বলল, 'আমি মামাবাড়িতে দিদিমণির কাছে শুনেছি। বাবার কাছেও শুনেছি।'

মণিমালা বললেন, 'ওঁর তো আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই। তোকে ওইসব কথা বলতে গেছেন। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের মুখ আলগা হয়ে যায়। তখন খাওয়া আর কথা বলা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না।' কুমকুম বলল, 'আহা বাবা তো আর চিরকালই এমন বুড়ো ছিলেন না।'

মণিমালা বললেন, 'তা ছিলেন না। ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও তাঁকে সাতাশ বছরের যুবকের মত দেখাত। সুপুরুষ ছিলেন। এখনকার এই মোটাসোটা চেহারা দেখলে ওঁর সেদিনকার চেহারার কথা ভাবতেই পারবিনে?'

কুমকুম বলল, 'পারব না কেন। আমি তখনকাব দিনের ফটোও তো সব দেখেছি। দাদু দিদিমা আর মামাদের সঙ্গে তখন তোমাদের খুব ঝগড়া-ঝাটি হয়েছিল তাই না মা?'

মণিমালা বললেন, 'থাক্ তোর সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাটতে হবে না। ঘুমো তো, ঘুমো এখন।'

কুমকুম চুপ করে রইল।

মণিমালা সেই অতীত দিনগুলির ওপর দিয়ে যেন জেট প্লেনে করে আর একবার উড়ে এলেন। অশান্তি হয়েছিল বইকি, দারুণ অশান্তি। পিতৃকূলের সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে সম্পর্ক ছেদ হতে বসেছিল। শ্বশুরবাড়িতে এসেও বেশ কিছুদিন কষ্টে কেটেছে। আর্থিক কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে কতদিন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন এ বিয়ে টিকবে না, এ বিয়েতে

সুখী হবেন না মণিমালা। কিন্তু তাঁদের অনুমানকে ভুল প্রমাণিত করেছেন তিনি। তিনি সুখী হয়েছেন, সুখী করেওছেন। তাঁর সহপাঠিনীদের মধ্যে কারও কারও প্রণয় সম্পর্ক ভেঙে গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ। কিন্তু স্বামীর কাছে অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা পেয়েছেন। একজন আধাসন্ন্যাসীকে তিনি গৃহধর্মে টেনে এনেছিলেন। কিন্তু গৃহস্থের ধর্ম থেকে তারা কেউ বিচ্যুত হননি। প্রবীণ বয়সে স্বামী আবার তাঁর ধর্মচর্চায় ফিরে গেছেন। সেই চর্চায় অন্য কোন আনুষ্ঠিকতা নেই। শুধু অধ্যয়ন চিন্তন মনন আলোচনা আলাপন। এদিক থেকে মণিমালা স্বামীর সহধর্মিণী হতে পারেননি, কিন্তু অবজ্ঞা উপহাস সংশয় দিয়ে তাঁকে বিব্রতও করেননি।

সুরেশ্বরবাবু আজ মণিমালার মুখে বয়সের ছাপ দেখেছেন। সেদিন তাঁর পুরোন সহপাঠিনী বীথিকাও বলেছিল, 'কিরে মণি, তুই কি তোর বুড়ো স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুড়ী হচ্ছিস নাকি? গাল দুটি ভেঙে গেছে, কপাল যেন মাকড়সার জাল, একি হয়েছে চেহারার।'

বাইরের লোককে বলে লাভ নেই, পাল্লা দিয়ে বুড়ো হতে হয় না, বার্ধক্য আপনিই আসে। একবার হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে অলোকেশের। সেই চিন্তা সব সময় মণিমালাকে উদ্বিগ্ন রাখে। তারপর আর্থিক সংগ্রাম আবার শুরু হয়েছে। অনেকদিন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন অলোকেশ। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু টাকা পেয়েছিলেন। সেই পুঁজি ভেঙে ভেঙে দিন চলছে। ছেলেরা অবশ্য টিউশনি করে পড়ার খরচ চালায়। ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকেই বাড়ির অবস্থা বুঝে হিসেব করে চলে। সুরেশ্বর যখন বলেন, 'আপনার ছেলে-মেয়ে কটি যেন এক গুচ্ছ ফুল', নিতান্ত মিথ্যা বলেন না। ওদের প্রত্যেকেরই বিবেচনা আছে। ওদের কোঁদল নেই, বিবাদ বিসংবাদ নেই, অযথা আবদার নেই। তাহলে কি আর পারতেন মণিমালা? তবু তাঁর সদাই চিন্তা কখন কি হয়, সদাই চিন্তা ওরা তো কেউ দাঁড়াতে পারেনি, সবাই ছাত্র-ছাত্রী। তিনি নিজেও তো জীবিকার জন্যে কখনো চেষ্টা করেননি। সেই যোগ্যতাও অর্জন করেননি। শুধু একজনের 'গৃহিণী সচিব সখি প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তার তো অর্থমূল্য নেই। তাঁকে ছাড়া অসুস্থ বৃদ্ধ স্বামীর এক মুহূর্তেও চলে না। মণিমালা তাঁকে ওষুধ খাওয়ান, পথ্য খাওয়ান, বই পড়ে শোনান, চিঠিপত্র লিখে দেন, স্বামীর কিছু লেখালেখির অভ্যাস আছে সে জন্যে ডিকটেশন নেন। বাড়িতে ঝি নেই চাকর নেই, সবই নিজের হাতে করতে হয়। অবশ্য ছেলে-মেয়েরা সবসময় তাঁকে সাহায্যের জন্যে তৈরি। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের আগ্রহই বরং বেশি। পারেও ওরা সব।

হঠাৎ মেয়ের খিল খিল হাসির শব্দে চমকে মণিমালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও কিরে, হাসছিস কেন পাগলের মত? আজ রাতে কি আর ঘুমোবিনে?'

কুমকুম সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'সুরেশ্বরবাবু সেদিন কী বলছিলেন জানো মা?'

আবার সুরেশ্বরবাবু! মণিমালা গম্ভীর হয়ে গেলেন. তারপর একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'কী বলেছিলেন তিনি?'

'তোমরা তো সবাই এক একটি প্রসাধন দ্রব্য। কেউ চন্দন, কেউ কাজল, কেউ কুমকুম। তোমার দুই বোনের নাম রাখো সিঁদুর আর লিপস্টিক।'

কুমকুম আবার হেসে উঠল, 'কথা শোন মা। লিপস্টিক বুঝি কারো নাম হয়?'

তারপর মণিমালার আরো কাছ ঘেঁষে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বলল, 'তিনি আরো কি বলেছিলেন জানো মা?'

'কী বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন তোমাদের কারোরই লিপিস্টিকের দরকার হয় না, তাই না?'

মেয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মণিমালা চুপ করে রইলেন।

কুমকুম বলল, 'তোমার লিপস্টিকের দরকার হয় না মা। তুমি তো পান খাওনা, কিছুই কর না। কিন্তু এই বয়সেও তোমার ঠোঁট দুটি কী সুন্দর। লাল টুকটুক করে।'

মণিমালা হেসে বললেন, 'থাক বাপু। এই রাত দুপুরে আমার রূপের প্রশংসা করতে হবে না তোর।'

কুমকুম বলল, 'রূপের প্রশংসার আবার রাত দুপুর দিন দুপুর আছে নাকি? আচ্ছা মা পুরু যেমন

তার বাবা যযাতিকে তার যৌবন ধার দিয়েছিলেন, আমি যদি তেমনি ধার দিই তুমি নেবে ?'

মণিমালা সকৌতুকে হাসলেন, 'ঈস কী উদারতা আমার মেয়ের। তুই দিতে পারবি ভরসা করে ?'

কুমকুম বলল, 'নিশ্চয়ই পারব। পুরু দিয়েছিল একশ বছরের জন্যে। আমরা তো ততদিন কেউ বাঁচিনে। আমি তোমাকে—'

মেয়ে হিসাব করতে লাগল।

মণিমালা বললেন, 'কতদিনের জন্যে দিবি ? দশ বছর ?'

কুমকুম বলল, 'ওরে বাবা। দশ বছর পরে আমি নিজেই বুড়ী হয়ে যাব। তার চেয়ে ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং কর মা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজি হয়ে যাও। আমি তোমাকে পাঁচ বছরের জন্যে—'

মণিমালা সস্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'কুমু তোকে পাঁচদিনের জন্যেও কিছু দিতে হবে না। আমি তোদের পাঁচজনের মধ্যে নিজের যৌবনকে পাঁচগুণ করে পেয়েছি যে। আমার আর কোন সাধ অপূর্ণ নেই। লক্ষ্মী মা আমার এবার ঘুমো। আর রাত জাগিসনে।'

মেয়ের ঘন চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন মণিমালা।

কুমকুম এবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মণিমালার ঘুম এল না। নানা এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, আচ্ছা সত্যি সত্যিই যদি এমন হয়, তিনি যদি নিজের দেহে ফের তাঁর যৌবন পেয়ে যান, কী করবেন তিনি তাঁর সেই যৌবন নিয়ে ? আর কাউকে ভালোবাসবেন ? দূর দূর। তাঁর আর দ্বিতীয় কাউকে ভালোবাসবার প্রবৃত্তিই হবে না। অলোকেশের চেয়ে পরে তিনি অনেক সুপুরুষ যৌবনদীপ্ত, ক্ষমতাগর্বিত পুরুষকে দেখেছেন। কিন্তু কাউকেই ভালোবাসতে সাধ যায়নি। দ্বিতীয় যৌবন পেলেও সেই সাধ হবে না। দ্বিতীয়বার তিনি যদি সেই আঠের বছরে ফিরে যান আবার ওই অলোকেশকেই বিয়ে করবেন, তাঁকেই ভালোবাসবেন, ধীরে ধীরে পাঁচটি সন্তানের মা হবেন। হ্যাঁ এদের পাঁচটিকেই তাঁর চাই। পঞ্চপুত্তলির একটি কম হলেও তাঁর চলবে না। ওরা একে একে আসবে, তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করবে, যৌবনের অপচয় ঘটাবে, লালন-পালন শিক্ষাদানের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপবে, কত উদ্বেগ অশান্তি চিন্তা ভাবনার বোঝা মাথায় তুলে দেবে তবু ওই পঞ্চরত্নের মালা মণিমালার না হলে চলবে না।

তাই যদি হয় জীবনে যদি সেই একই পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দ্বিতীয় যৌবন পেয়ে আর লাভ কি।

শুধু একটু লাভ আছে। কথাটা ভেবে মণিমালা নিজের মনেই হাসলেন। তাঁর দ্বিতীয় যৌবন শুধু একটি কল্যাণের কাজে লাগানো যায়। তাঁর পুনর্যৌবন একজন প্রৌঢ়ের মোহ দৃষ্টি থেকে একটি অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ নব যৌবনকে আড়াল করে রাখতে পারে।

ঘুমন্ত মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মণিমালা এবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

তৈলচিত্র

বন্ধুর মৃত্যুর পরদিন থেকেই নিরঞ্জন তাঁর অ্যালবামগুলি খুঁজে দেখতে লাগলেন। মৃত জীবিত অনেকের ফটো আছে, দুতিনটি তরুণী মেয়ের ফটো রয়েছে কিন্তু আশ্চর্য ছোট হোক বড় হোক শৈলেশের কোন একখানি ফটোও তাঁর কাছে নেই। অ্যালবাম তিনি নিজে রাখেন না। পারিবারিক অ্যালবামগুলি তাঁর স্ত্রীর দেরাজে সযত্নে রক্ষিত আছে। কোন উপলক্ষ ঘটলে কোন আত্মীয় বন্ধুকে দেখাতে হলে সুরমা সেই অ্যালমবামগুলি বার করে আনেন। সেইসব অ্যালবামে শুধু যে নিজেদের

দাম্পত্য-জীবনের বিভিন্ন সময়ের ছবি, ছেলেমেয়েদের নানা বয়সের ছবিই আছে তা নয়, নিরঞ্জনের স্বল্প পরিচিত নারী-পুরুষের বহু ফটোই সেখানে রয়েছে। বছরে একবার করে পাহাড়ের উপত্যকায় কি সমুদ্রের ধারে তাঁরা বেড়াতে বেরোন। আছে সেই সব রমণীয় নিসর্গচিত্র। কিন্তু নিরঞ্জন যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার দেখা কিছুতেই মিলছে না। ছোট বড় কোন ড্রয়ারেই শৈলেশের কোন ফটো নেই। স্ত্রীর মত অ্যালবামে ফটোগুলি আটকে রাখেন না নিরঞ্জন। তাঁর চিত্রশালা ছোট বড় নানা আকারের খামের মধ্যে। কচিৎ কখনো সেই খামে হাত পড়ে। ভিতর থেকে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের ফটো বেরিয়ে আসে। কোন কোন মুখ কিছু কিছু স্মৃতি বয়ে আনে। কোন কোন মুখ মনকে আর একবার দোলা দিয়ে যায়। নিরঞ্জনের এই গোপন সংগ্রহশালায় শৈলেশের একখানি ফটোও থাকবার কথা ছিল। একখানি কেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব তার একশখানি ছবি থাকলেও অবাক হবার কিছু ছিল না, কিন্তু নেই। পরম বন্ধুর একখানি ফটোও নিরঞ্জনের কাছে নেই। এ যেন আর এক মৃত্যু। আর এক মৃত্যুযন্ত্রণা।

কাজকর্মের ফাঁকে সুরমা একবার ঘরে এলেন। স্বামীর কাণ্ড দেখে বললেন, 'ড্রয়ারের সব কাগজপত্র নামিয়ে দেখি ঘর ভরে ফেলেছে। কী খুঁজছ অমন করে?'

নিরঞ্জন অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'খুঁজছি শৈলেশের ফটো। আশ্চর্য, ওর একখানা ফটোও আমার কাছে নেই।'

সুরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'তুমি তো বান্ধবীদের ফটোই যত্ন করে রাখো। বন্ধুদের ফটো কি রাখতে চাও যে থাকবে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার এই খোঁটা বোধহয় মরবার পরেও আমাকে শুনতে হবে।'

সুরমা বললেন, 'স্বভাব যদি না বদলায় শুনবে বইকি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'দেখো তো তোমার অ্যালবামগুলিতে কোন ফটো-টটো আছে নাকি।'

সুরমা বললেন, 'দেখেছি নেই। শৈলেশদার কোন ছবি আমার কাছেও নেই। ইদানীং তো যাওয়া-আসা তেমন ছিল না। দেখা-সাক্ষাৎ কালে ভদ্রে হত।'

নিরঞ্জন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'ইদানীংকার কথা ছেড়ে দাও। পুরোন দিনেরছবি-টবিওতো থাকতে পারত। আমার মনে হয় ছবি কিছু কিছু ছিল। হারিয়েছে।'

সুরমা বললেন, 'তাই হবে। দুতিনবার করে বাড়ি বদলাবার সময় কি কম ওলটপালট হয়েছে; এ বাড়িতে এসেও কত বই তোমার র‍্যাক থেকে চুরি গেল। আমি আর কত দিক সামলাব বলো। তোমার নিজের যদি কোন কিছুতে খেয়াল না থাকে—।'

তারপর যিনি আঘাত দিয়েছিলেন তিনিই ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণীর প্রলেপ দিলেন।

সুরমা বললেন, 'শৈলেশদার ছবির জন্যে অত ভাবছ কেন। যাক কিছুদিন, শ্রীলেখার কাছ থেকে একখানা ফটো চেয়ে নিলেই হবে।'

নিরঞ্জন ভাবলেন, তা ঠিক। সদ্য বিধবা শ্রীলেখাকে এখনই ছবির কথা বলা যাবে না। স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই সে কেবল কাঁদে। ওদের যুবক পুত্র সুব্রত অবশ্য সবাইর সামনে অমন করে কাঁদে না, আত্মীয়স্বজনের সামনেও বড় একটা আসে না। শোকার্ততা নিয়ে সে একা থাকতেই ভালোবাসে।

অফিসে বসে কাজ করতে করতে আসা-যাওয়ার পথে বাসে সহযাত্রীদের ভিড়ে পিষ্ট হতে হতে মৃত বন্ধুর কথা নিরঞ্জনের মনে পড়ে যায়। আর ভাবেন, 'আশ্চর্য ওর কোন ফটো আমার কাছে নেই কেন?'

তারপর নিজেই নিজের কাছে জবাবদিহি করতে থাকেন: 'এই না থাকাটা নিতান্তই একটা ঘটনামাত্র। এর মূলে কোন উদ্দেশ্য আরোপ না করলেও চলে। আমার আরো কত আত্মীয়স্বজনের ফটোও তো আমার কাছে নেই। আমার ফটোই বা ক'জনের কাছে আছে? প্রিয়বন্ধুর ফটো কাছে রাখাই ভালোবাসার একমাত্র নিদর্শন নয়।'

ফটো সংগ্রহের ঝোঁক নিরঞ্জনের বড়জোর দশ-পনের বছরের। তার আগে এত ঝোঁক ছিল বলে মনে পড়ে না। বরং অল্পবয়সে—কলেজে পড়ার সময় ফটো তোলার খুব সখ ছিল শৈলেশের। একটা বক্স ক্যামেরা ছিল তাতে সে অনেকের ফটো তুলেছে। প্রফেসরদের, তখনকার কালের

বন্ধুদের, নিরঞ্জন রায়ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। সামনের সারিতেই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেইসব ফটোর একখানিও নিরঞ্জনের কাছে নেই। শৈলেশের কাছেও ছিল না।

বহুদিন বাদে সেইসব ফটোর খোঁজ নিয়েছিলেন নিরঞ্জন, 'শৈলেশ, তোমার সেই ফটোগুলির কী হল ?'

শৈলেশ বলেছিল, 'রাম বল। সেসব কি আর ফটো হয়েছিল নাকি ? আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা সেগুলি নিয়ে তাদের খেলাঘর সাজিয়েছে।'

'আর তোমার সেই ক্যামেরাটি ?'

'সেটা নিয়ে গেছে আমার এক ভাইপো। খুব গাছ-পালা, নদীনালার ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ছেলেবেলায় আমি যা করেছি।'

দামি ক্যামেরা কেনার উচ্চাকাঙক্ষা সেই বয়সে খুব ছিল শৈলেশের। তারপর কবে উচ্চতর মূল্যবান আকাঙক্ষা সেই আকাঙক্ষাকে সরিয়ে দিয়েছে নিরঞ্জন তা জানেন না।

নিরঞ্জনের মনে হয় তাঁর বন্ধু শৈলেশ সেনের প্রকৃতি তাঁর স্বভাব প্রকৃতি থেকে কত আলাদাই না ছিল। ভাবনা ধারণায় নিরঞ্জন নিজেকে রক্ষণশীল বলে মনে করেন না। কিন্তু আসলে অনেক ব্যাপারেই তিনি রক্ষণশীল। যা কিছু পান তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। সে রাখা যেন ধরে বেঁধে রাখা। কিন্তু ছেড়ে দিতে, কাউকে ছেড়ে দিতে তাঁর মন চায় না। কিন্তু ভোলা মন এটুকু বোঝে না সবাইকে ধরে রাখবার মত জায়গা তোমার ঘরে কই।

শৈলেশ কিন্তু শুরু থেকেই এই ত্যাগের তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এক খেলা থেকে আর এক খেলায়, এক নেশা থেকে আর এক নেশায়, এক প্রেম থেকে আর এক প্রেমে। এরই নাম গতিশীলতা। তবু শেষ কয়েক বছরে শৈলেশ কি কিছুতেই বাঁধা পড়েনি ? এডভোকেট হিসাবে যথেষ্ট নাম হয়েছিল শৈলেশের। অর্থও যে হয়েছিল তার প্রমাণ নিউআলিপুরে তার বাড়ি গাড়ি সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি। অথচ প্রথম জীবনে শৈলেশের ওকালতির হাল দেখে কে ভেবেছিল আইন ব্যবসায়.সে এমন সফল হবে ?

আইন নিরঞ্জনও পড়েছিলেন কিন্তু তার ভিতর থেকে রস সংগ্রহ করতে পারেন নি। ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরিজীবনই বেছে নিলেন নিরঞ্জন। এ অফিস সে অফিস ঘুরে ঢুকলেন এক বিদেশী পাবলিসিটি কনসার্নে। পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার নির্বাহ মোটামুটিভাবে হয়ে যায়।

শৈলেশ মাঝে মাঝে তাঁকে বলত, 'তোমার কোন অ্যাম্বিশন   নেই। ল-এর কোর্সটা কমপ্লিট করলে ভালো করতে। প্র্যাকটিস করলে তোমারও—যা আছে তার চেয়ে ভালো হত।'

নিজের ওপর নিরঞ্জনের সেই বিশ্বাস ছিল না। তিনি হেসে বলতেন, 'না ভাই আমি জানি, আমার দৌড় কতটুকু। ও পথে না গিয়ে ভালোই করেছি। পথে পথে ঘুরতে হত। না খেয়ে মরতাম।'

ফটো তোলার নেশা শৈলেশের শেষের দিকে আর ছিল না। কিন্তু বাড়িতে ফটো রাখার অভ্যাস তার যে একেবারে চলে গিয়েছিল তা নয়। নতুন বাড়ির ড্রয়িংরুমে যেসব বন্ধুর ফটো নিরঞ্জন টাঙানো দেখেছিলেন, ওদের শোবার ঘরে যে দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে শৈলেশের অন্তরঙ্গ চিত্র দেখেছিলেন নিরঞ্জন তার কোথাও তাঁর চিহ্নমাত্র ছিল না। নিরঞ্জন একদিন বলেছিলেন, 'তোমার আমার একসঙ্গে একটা ফটো তুলতে হবে। পুরোন ছবিগুলি কোথায় যে হারিয়ে গেছে কে জানে ?'

শৈলেশ হেসে বলেছিলেন. 'যেতে দাও। যা হারিয়ে যায়, তা আগলে বসে রইবে কত আর। ফটোটটো আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমার স্ত্রী বাড়িটাকে একটা স্টুডিও বানিয়ে রেখেছে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়। কত আর ঝগড়া করে পারা যায়।'

শ্রীলেখা বলেছিলেন, 'আপনার বন্ধুর কথা আর বলবেন না। ওঁর মত উড়ুনচণ্ডী আর দুটি নেই।'

নিরঞ্জন মনে মনে হেসেছিলেন। শৈলেশ যদি সব ব্যাপারে উড়ুনচণ্ডী হত, তাহলে ওর বাড়িগাড়ি, পসার-প্রতিপত্তি হত না। আমরা সবাই কোন কোন ব্যাপারে উড়ুনচণ্ডী, কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল।

উড়ুনচণ্ডীগিরি নিশ্চয়ই নিরঞ্জনের স্বভাবের মধ্যেও আছে। কিন্তু তা বাইরে থেকে বোঝা যায়

না। তাঁর সঞ্চয়শীলতার মধ্যেই ওড়াবার ফাঁদ পাতা থাকে। তিনি যাঁদের স্মৃতিচিহ্ন জমিয়ে রাখেন, তাড়ায় তাড়ায় রঙীন ফিতে দিয়ে যে সব চিঠিপত্র বেঁধে রাখেন জীবনে কদিন সেই মিউজিয়ামের মরচেপড়া তালা খুলতে যান ? কেউ ফেলে দিয়ে ওড়ায়, কেউ রেখে দিয়ে ওড়ায়। ওড়াবার ধরনটা শুধু আলাদা। ভুলেছি এ কথা কেউ কবুল করে, কেউ করে না। ভোলবার ধরনটা শুধু আলাদা।

কিন্তু পুরোন বন্ধু শৈলেশের একখানা ফটো তাঁর চাই। এই ফটো তাঁদের কৈশোর আর প্রথম যৌবনের মধুর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেবে। অবশ্য স্মারক আরো কিছু কিছু দ্রব্য আছে। শৈলেশের উপহার দেওয়া বই এখনো দুচারখানা নিরঞ্জনের র‍্যাকে কি আলমারিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। আর স্মৃতিভাণ্ডারে আছে বহুদিনের যৌথ অধ্যয়ন, ভ্রমণ আলাপন, পরস্পরের সান্নিধ্য-সাহচর্য-সম্ভোগ। বন্ধুত্ব কি এর চেয়ে বেশি কিছু ?

শ্রদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর প্রথমে নিরঞ্জন শৈলেশের বাড়িতে খোঁজ নিলেন : 'ওর একখানা ফটো আমি নিজের কাছে রাখতে চাই। বেঁচে থাকতে অনেকবার কথা হয়েছে একসঙ্গে ফটো তুলব আমরা। কিন্তু তা তো আর হল না। শ্রীলেখা, তোমার কাছে আছে ওর কোন ফটো ?'

শ্রীলেখা সজল চোখে বললেন,'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি আর কিছুর মধ্যে নেই। আমি ভাবতেই পারছিনে উনি চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

বন্ধুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বন্ধুর পুত্রের কাছে নিরঞ্জন আবেদন জানালেন, 'তোমার বাবার একখানা ফটো দিতে পার ?'

সুব্রত বলল, 'কাকাবাবু, বাবার আলাদা ফটো তো আমার কাছে তেমন নেই। দু চারখানা যা ছিল জ্যেঠা কাকা পিসীরা নিয়ে গেছেন। এখন যেগুলি আছে সব গ্রুপ ফটো। সেগুলি নিয়ে তো আপনার কোন লাভ হবে না। আচ্ছা আমি খুঁজে দেখব।'

সন্ধানের জন্য সপ্তাহখানেক সময় দিয়ে আবার একদিন টেলিফোনে খোঁজ নিলেন নিরঞ্জন। 'কই সুব্রত, আমার ফটোর কী হল।'

সুব্রত একটু উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, 'বাবা মারা যাওয়ার পর এত ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে আছি যে, বলবার নয়। হাতের কাছে দেওয়ার মত কোন ফটো পাইনি। কিছু মনে করবেন না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'না না মনে করবার কী আছে।' তাঁর মনে হল, এই ফটোর ব্যাপারটাকে ওরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তা ছাড়া নিরঞ্জনের গুরুত্বও ওদের কাছে তেমন নেই। জীবনের যে পর্বে শৈলেশের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল, সেই পর্বে শ্রীলেখা কি সুব্রত উপস্থিত ছিল না। ওরা এসেছে তার অনেক পরে। তখন নিরঞ্জন প্রায় নেপথ্যলোকে সরে এসেছেন। ক্বচিৎ কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়, মাঝে মাঝে ফোনে কথাবার্তা চলে। কালেভদ্রে একজন আর একজনের বাড়িতে এসে চা খান, কি গল্প করেন। শ্রীলেখা কী সুব্রত কী করে বুঝবে সৌখ্যের কত নিবিড় বন্ধনে তাঁরা দুজনে আবদ্ধ ছিলেন, নিরঞ্জন আর শৈলেশ্বর। সেই সৌখ্যের কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শন তো আজ আর নেই।

টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে সুব্রত একটু ভরসা দিয়েছিল, 'কাকাবাবু, আমার কাছে তেমন ফটো নেই। তবে সলিলদার কাছে হয়তো আছে। তাকে আপনার কাছে একদিন পাঠিয়ে দেব।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সলিল কে ?'

'আর্টিষ্ট, একসময় আপনাদের অফিসে কাজ করত। আপনাকে ভালো করেই চেনে। এ ব্যাপারে সে হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

দিন কয়েক বাদে ত্রিশবত্রিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক এসে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করল। আগে স্লিপ পাঠিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। তাই আগন্তুক যে কে, তা তিনি বুঝতে পারলেন।

'আপনার নাম সলিল করগুপ্ত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নামই সলিল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না স্যার।'

মুহূর্তের মধ্যে নিরঞ্জন তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'তা হলে তুমিও আমাকে স্যার বলবে না।'

'কী বলব ?'

'শৈলেশকে কি বলতে ?'

'শৈলেশদা বলতাম।'

নিরঞ্জন বললেন, 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার নামের সঙ্গেও একটা দা বসিয়ে দিতে পার।'

সলিল বলল, 'সেই ইচ্ছা আমার গোড়া থেকেই হয়েছিল। কিন্তু ভরসা পাইনি। ভয় হয়েছিল—'

নিরঞ্জন একটু হাসলেন, 'ভয় ? আমাকে দেখে কেউ ভয় পায় না। অমি একাই ভয়ার্ত।'

আলাপজমে উঠল। নিরঞ্জন অতিথির জন্যে চা আনালেন।

সলিল বলল, 'এই অফিসে যখন আমি ছিলাম, আপনাকে দূর থেকে দেখতাম, কাছে যেতে ভরসা পেতাম না।'

'কেন ?'

'মনে হত, আপনি যেন কী ভাবছেন। কাছে এলে ডিস্টার্ব করা হবে।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন. 'আরে না না। আমাকে যা বোঝাতে চাই, লোকে আমাকে দেখে তার উল্টোটি বোঝেন।'

সলিল প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি শৈলেশদার একখানা ফটো চান ? আমাকে সুব্রত বলছিল।'

নিরঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ, ওর একখানা ফটো পেলে আমার ভালো হয়। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

সলিল বলল, 'আমি জানি। তিনি আপনার কথা আমাদের মাঝে মাঝে বলতেন।'

'কী বলতেন ?'

'বলতেন, সেই ছেলেবেলার বন্ধুত্বের কথা।'

নিরঞ্জন যেন দূর অতীতের দিনগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা বন্ধু ছিলাম। কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। একই ঘরে পাশাপাশি দিন কাটিয়েছি। নদীর ধার দিয়ে একসঙ্গে বেড়িয়েছি। গল্প করেছি, তর্ক করেছি। কখনো বা চুপচাপ বসে থেকেছি। কী করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে টেরও পাইনি। একে যদি বন্ধুত্ব বলতে হয়—'

সলিল বলল, 'বাঃ নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব বলব।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তারপর আমি সেই আঠের বছর বয়সের মধ্যেই আটকে রইলাম, আর ও বছরে বছরে এগিয়ে যেতে লাগল। খ্যাতি বিত্ত প্রতিপত্তিতে সে যেন আর এক মানুষ। মাঝে মাঝে আমার মনে হত আমরা পরস্পরের অপরিচিত। বড়জোর সামান্য পরিচিত মাত্র। আমরা শুধু একজন আর একজনের মুখ চিনি। তার চেয়ে বেশি কিছু চিনিনে।'

সলিল বলল, 'এ আপনার একটু বাড়াবাড়ি হল নিরঞ্জনদা। তিনি আপনাকে ঠিকই চিনেছিলেন। শৈলেশদা বলতেন, 'নিরুর অভিমান ছেলেদের মত।' তারপর একটু হেসে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, তিনি বলতেন, অনেকটা মেয়েদের মত।'

নিরঞ্জন মৃদু হাসলেন, 'তাই হবে।'

মনেমনে ভাবলেন, হয়তো তাই। হয়তো তাই। হয়তো বন্ধুর ধন জন মান নয়, নিজের অভিমানই তাঁকে দূরে সরিয়ে এনেছে।

সলিল বলল, 'সত্যিই ইদানীং তাঁর নানা ধরনের বন্ধু জুটেছিল। বড়লোক মক্কেল, সমব্যবসায়ী উকিল ব্যারিস্টার। তাঁদের তিনি খাতির করতেন, আবার তাঁদের সঙ্গে তাঁর কমপিটিশনও কম ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি মিশতেন অন্যভাবে।'

'কী রকম ?'

'তাঁর কথা শুনে মনে হয় প্রথম বয়সে আপনার সঙ্গে অনেকটা যেভাবে মিশেছিলেন, তাঁর মধ্য বয়সে আমিও তাঁকে অনেকটা সেই রকমভাবেই পেয়েছিলাম। যদিও আমাদের মধ্যে বয়সের বিশ

বছরের ব্যবধান। কিন্তু তাঁর চালচলনে ধারণধারণে আমি সে কথা মনে রাখতে পারতাম না। তিনি আমার সঙ্গে সমবয়সীর মত মিশতেন। মনেই হত না তাঁর অত বয়স নিজের ক্ষেত্রে অত নাম যশ। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। তক্তপোষের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। আমার স্ত্রীকে ডেকে বলতেন, রীতা চা করে নিয়ে এসো তো। কোনদিন বলতেন, তোমার হাতের রান্না না খেয়ে আজ আর যাব না।'

নিরঞ্জন শ্রদ্ধাবান প্রীতিমুগ্ধ যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের অত বন্ধুত্ব হয়েছিল?'

সলিল বলল, 'হয়েছিল। তিনি বলতেন, Law is a jealous mistress, আমার গৃহিণীও একজন jealous mistress, তাদের ফাঁকি দিয়ে আমি তোমাদের কাছে মাঝে মাঝে চলে আসি। এসে মুখ বদলে যাই, চোখ বদলে যাই। অদ্ভুত গল্প বলতে পারতেন। সেসব গল্পের তুলনা হয় না। নিজের প্রফেসন নিয়ে অত ব্যস্ত মানুষ। তবু ফাঁকে ফাঁকে তিনি নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। আর্ট সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল। উৎসাহ ছিল। অ্যাকাডেমির আর্ট একজিবিশনেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।'

একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের হৃদ্য সম্পর্কের কথা নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন নিরঞ্জন। একটু ঈর্ষাও হয়। তিনি তাঁর পুরোন বন্ধুকে পরবর্তী জীবনে এমন অন্তরঙ্গভাবে কোনদিন তো পাননি। নিজেও ধরা দিতে পারেননি। তার জন্য দায়িত্ব দুজনেরই। কার বেশি, কার কম, সেই চুলচেরা হিসাবে আজ আর লাভ কি।

সলিলকে তিনি আর-একদিন আসতে বললেন। তারপর আরো একদিন। এখন আর অফিসে নয়, অফিসের বাইরে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকে। কোন দিন একসঙ্গে বসে চা খান, কোন দিন বা কফি। তারপর সময় থাকলে রাজভবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যান। প্রথম প্রথম তাঁর সামনে সিগারেট খেত না সলিল। কিন্তু নিরঞ্জন তাকে খেতে অনুমতি দেন। 'আমি খাইনে। কিন্তু তোমার তো খেতে কোন বাধা নেই।'

নানা প্রসঙ্গের মধ্যে মাঝে মাঝে মৃত বন্ধু শৈলেশ্বরের কথাও ওঠে। দুজনে দুই পর্বের কথা বলেন। আদি পর্ব আর অন্ত্য পর্ব। এই দুই পর্বে একই মানুষ যেন দ্বিধাবিভক্ত। যেন আলাদা আলাদা। কিন্তু কোন মূল সূত্র কি নেই? কি আকৃতি কি প্রকৃতিতে মানুষ কি আমূল বদলে যেতে পারে? অপরিবর্তিত সেই মৌলিক উপাদান মনে মনে খুঁজতে থাকেন নিরঞ্জন।

তারপর সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। কাগজে মোড়া বড় একটি চ্যাপটা জিনিস সলিল স্মিতমুখে নিরঞ্জনের টেবিলের ওপর এনে রাখল। নিরঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, 'এটা কী?'

সলিল হেসে বলল, 'বলুন তো কী।'

নিরঞ্জন বললেন, 'শৈলেশের সেই ফটো বুঝি? আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

সলিল বলল, 'আমি কিন্তু ভুলিনি। খুলে দেখুন।'

'তুমিই খোল।'

মোটা সুতোর গিঁট খুলে ফেলল, সলিল। ব্রাউন রঙের কাগজের মোড়ক সরিয়ে নিল। 'দেখুন।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এ কী, এ যে অয়েল পেণ্টিং! আমি তো সামান্য একখানা ফটোর কথা বলেছিলাম।'

সলিল বলল, 'শৈলেশদার একখানা ফটো দেখেই করেছি। কেমন হয়েছে বলুন। পোর্ট্রেট আমি সাধারণত আঁকিনে। আঁকতে পারিওনে। যাঁদের ভালোবাসি তাঁদের ছবিই শুধু নিজের কাছে এঁকে এঁকে রাখি। বেশির ভাগই স্কেচ কি ওয়াটার কালারে। দেখুন তো চেনা যায় কি না।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'চেনা যায় বইকি। তুমি অবশ্য অবিকল শৈলেশকে আঁকোনি। আঁকতে চাওনি। কিন্তু আমি তোমার কাছে ওর প্রথম বয়সের ছবি চেয়েছিলাম। ভারি রূপবান ছেলে ছিল শৈলেশ। তখন মাথা ভরতি চুল ছিল আর টুকটুকে রঙ। পরে চুল উঠে যায়। তুমি ওর টাকটাই দেখিয়ে দিয়েছ।'

সলিল বলল, 'টাক আমি ঢাকিনি। টাক যেন ওঁকে আরো বেশি সম্ভ্রান্ত করেছিল। বয়স ওঁর

মুখে গাম্ভীর্য আর সেই সঙ্গে কোমল বিষণ্ণতা এনে দিয়েছিল। আমি সেই জীবনের অপরাহ্ন বেলার একটি মুড্‌কে ধরতে চেষ্টা করেছি।'

নিরঞ্জন আর্টিস্টের সব কথা মেনে নিলেন না। তাঁর প্রসন্ন পরিতৃপ্তির আনন্দটুকু শুধু দেখে নিলেন। বন্ধুর প্রৌঢ় মুখাবয়বে তিনি মনে মনে খুঁজতে লাগলেন একটি তরুণ কিশোরের মুখচ্ছবি, যাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, দানে ও গ্রহণে যে ভালোবাসা চরিতার্থ হয়েছিল। সলিলের আঁকা এই প্রতিকৃতির মধ্য নিরঞ্জন যেন একজন বিষয়ী সিদ্ধকাম ব্যবহারজীবীর মুখই বার বার দেখতে লাগলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনকে ধমক দিলেন, 'মন এ তোমার দৃষ্টিভ্রম। মন তোমার এ ভ্রম গেল না। যেখানে ঐশ্বর্য, যেখানে পৌরুষ, যেখানে অহঙ্কারের দীপ্তি সেখানে তুমি রূপ দেখতে পাও না। তুমি রূপ দেখ শুধু ঢল ঢল কাঁচা লাবণ্যে, তুমি রূপ দেখ শুধু বিনয়নম্র বশ্যতায়। স্পর্ধায় ঔদ্ধত্যে সাফল্যের মধ্যে যে চোখ ঝলসে দেওয়া রূপ তা তুমি দেখতে পাও না। কারণ সাফল্যের স্বাদ তুমি জীবনে পাওনি।

নিরঞ্জন সলিলের দিকে তাকালেন, 'তোমার তো অনেক খরচ পড়েছে। আমি সেই খরচটা দিয়ে দিই।' সলিল বলল, 'না না, ছি ছি। এই বুঝি আপনার ভালোবাসা? এই বুঝি বন্ধুত্ব? আমি গরীব তাই বলে একখানি ছবি কি আপনাকে দিতে পারিনে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'এক বন্ধুর ছবিতে দুই বন্ধুকে পাব। কিন্তু খরচটা নিলেও তোমার দানে কিছু ঘাটতি পড়ত না।'

সলিল কিছুতেই টাকার কথা কানে তুলল না। ছবিখানা ফের যত্ন করে বেঁধে দিল। চা-টা খেয়ে বিদায় নেওয়ার সময় বলল, 'নিতে আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

নিরঞ্জন বললেন, 'না না, অসুবিধে কিসের।'

কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পরেও ট্যাক্সি পেলেন না। ভিড় ঠেলে বাসে উঠতে হল। কোন রকমে দাঁড়াবার জায়গা একটু পেলেন। অন্য দিন দুখানা একখানা বই হাতে থাকে। আজ তার চেয়েও ভারি আর বড় জিনিস আছে হাতে। ফ্রেমের ধারটা দুবার করে একজন সহযাত্রীর মাথায় ঠোকা লাগল। তিনি রক্ত চক্ষু হলেন, 'ওটা কী নিচ্ছেন বলুন তো? অত বড জিনিস নিয়ে কেউ ভিড়ের বাসে ওঠে?'

নিরঞ্জন লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই সামান্য শিষ্টাচারে সহযাত্রীর মন ভিজল না। তিনি মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বিরস মুখে চুপ করে রইলেন। বাড়িতে আসবার পর তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে সুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা আবার কি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'শৈলেশের একখানা ছবি।' সুরমা বালিকার মত আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এলেন। ছবি নিয়ে বাঁধনের দড়ি কাটলেন, কাগজের আবরণ সরালেন তারপর ছবির ওপব ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়ে বললেন, 'শৈলেশবাবুর চেহাবা কিন্তু মোটেই আসেনি।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক বুঝবে না। ছবিটা একটু মডার্ন স্কুল ঘেঁষা।'

সুরমা বললেন, 'না বুঝি কিসের। মডার্ন যা কিছু তুমিই বোঝ। নিজেকে মহা যুবক মনে কর, তাই না? অল্পবয়সী দু-চারটি মেয়ের সঙ্গে মিশলেই বুঝি মডার্ন হওয়া যায়? একালের তুমি কী চেন, কতখানি জানো, শুনি? একটা জিনিসের তো নাম বলতে পারো না।'

নিরঞ্জন স্বীকার করলেন তা ঠিক। এখনকার কালকে বাদ দিয়ে এখনকার ছেলে-মেয়েদের চেনা যায় না। ছোঁয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না।

সুরমা আবার সেই ছবির প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। 'ছোট একখানা ফটোটটো আনলেই হত। এত বড় ছবি কোথায় টাঙাবে শুনি? তোমাব কি তত বড় ঘর আছে?'

তিনতলার ওপরে দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট। কিন্তু আজকাল আর জায়গার অসংকুলান হয় না। বিয়ে হওয়ার পর মেয়ে গেছে শ্বশুরবাড়ি। আসলে শ্বশুর নেই, বাড়িও নেই। স্বামীর বদলির চাকরি। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। ছেলের কর্মস্থল জামশেদপুর। সেখানে বউ নিয়ে বাসা বেঁধেছে। পুরোন স্বামী স্ত্রী আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব সামলে যুক্ত হয়েছেন। কাছে থেকে দূরত্ব রচনাই বেশি।

সুরমা বললেন, 'এত বড় ছবি তুমি কোথায় রাখবে?'

নিরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললেন, 'দুখানা ঘরে আটটি তো দেয়াল আছে। যে-কোন একটি দেয়ালে টানালেই হবে।'

সুরমা মাথা নেড়ে বললেন, 'কোন দেয়ালেই মানাবে না। আমার ঘরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছবি আছে, মায়ের ছবি আছে, তোমার বাইরের ঘরে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, তোমার বাবার ছবি, আমার বাবার ছবি আছে। কিন্তু কোন ছবিই এত বড় নয়। এই ঢেপ ছবি কোন ছবির পাশেই মানাবে না, তুমি দেখে নিয়ো।'

নিরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এনেছি যখন, রাখবার একটা জায়গা হবেই।'

সুরমা বললেন, 'হলেই ভালো।'

স্ত্রীর মুখে হাসি দেখে নিরঞ্জন বললেন, 'হাসছ যে।'

সুরমা বললেন, 'বেঁচে থাকতে খুব একটা গলায় গলায় ভাব তো দেখিনি। তুমিই মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে গিয়েছ। তিনি ডাকলেও আসেননি। তাই নিয়ে তোমার কাছ থেকে কত নালিশ শুনতে হয়েছে। এখন একেবারে ঢাউস এক ছবি কাঁধে নিয়ে এসে হাজির। আমি মরে গেলে বোধ হয় তাজমহল বানাবে।'

খোঁচা খেয়েও নিরঞ্জন একটু হাসলেন। বললেন, 'হুঁ।'

খাওয়া দাওয়ার পর ছবিখানা নিয়ে নিরঞ্জন নিজের ঘরে চলে গেলেন। দিনের বসবার ঘরই এখন তাঁর রাত্রের শোবার ঘর। এ ঘরে চেয়ার টেবিল আছে, বইয়ের র‍্যাক আর আলমারি আছে। আরো কিছু দামি জিনিসপত্র এনে সুরমা রেখেছে এ ঘরে। নিরঞ্জন সেগুলির নৈশ প্রহরী। মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে। কিন্তু আসা যাওয়ার গরজ যেন তেমন আর থাকে না।

সুরমা এসে মশারি টাঙ্গিয়ে দিলেন, ঝেড়েটেরে ঠিক করে দিলেন বিছানা।

তারপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া টেবিলের ওপর দাঁড় করানো ছবিখানা দেখে হেসে বললেন, 'বাঃ বন্ধুকে দেখি একেবারে চতুর্দোলায় তুলেছ। আজ থাক তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে। আমি যাই শুয়ে পড়ি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

সুরমার সাধা ঘুম। বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুম এসে যায়। কিন্তু নিরঞ্জনের ঘুম অত সহজে আসতে চায় না। শোয়ার আগে খানিকক্ষণ বইটই পড়েন। কোনদিন চুপচাপ শুধু শুয়ে থাকেন। মনের আকাশে অর্থহীন অসংলগ্ন ভাবনার আনাগোনা চলে।

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সুইচ অফ করে দিলেন নিরঞ্জন। পর্দা টেনে দিলেন দরজায়। পুব দিকে দুটি জানালা খোলা। সে জানালায় পুরো পর্দা নেই। আধাআধি ঢাকা। ফাঁক দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ল ঘরে। কে জানে আজ কোন তিথি। কদিন আগে মাঘী পূর্ণিমা গেছে।

জানলার বাইরে পাঁচিল ঘেঁষে বহুদিনের প্রাচীন এক নিমগাছ আছে ডালপালা ছড়িয়ে। শহরতলীতে কোন জমিদারের বাগানবাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এই ফ্ল্যাটের সারিগুলি উঠেছে। বাগানের এদিকটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। দু-একটি পাম আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ এখনো সেই প্রাচীন উদ্যানের স্মৃতি বহন করে। পারতপক্ষে সুরমা মশার ভয়ে এই জানালাগুলি খোলেন না। আর স্ত্রী এ ঘর থেকে চলে গেলেই নিরঞ্জন সব জানালা খুলে দেন। বেশি রাত্রে কি জ্যোৎস্নায় কি অন্ধকারে এই নিত্য দেখা গাছপালার ওপর যেন এক অপার্থিবতার ছাপ পড়ে। নিরঞ্জন শুয়ে শুয়ে কখনো বা চেয়ারে বসে নিজের কল্পনায় সেই অলৌকিকতাকে উপভোগ করেন।

মশারির ফাঁক দিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করানো শৈলেশের ছবিখানা ঠিক পুরো দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারছিলেন নিরঞ্জন। অনুমান করতে দোষ নেই তাঁর বন্ধু ওখানে বসে আছেন। বসে বসে নিরঞ্জনকে দেখছেন। এখন আর মক্কেলদের ভিড় নেই, সচ্ছলসম্পন্ন কৃতী, আত্মীয় বন্ধু অনুগ্রহপ্রার্থীদের ভিড় নেই; এখন, অনেক কাল বাদে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে নিভৃত নৈশআলাপের কিছু সময় হয়েছে শৈলেশের।

শৈলেশ্বর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার ছবিখানা নিয়ে বড়ই বিপদে

পড়েছ নিরু। তাই না ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'বিপদ আবার কিসের ?'

'বিপদ নয় ? তুমি চেয়েছিলে একখানা পাসপোর্ট সাইজের ফটো। তোমার সেই ছোট বড় খামগুলির মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখতে। যেমন লুকিয়ে রেখেছ যৌবনবতী বান্ধবীদের ছবি।'

নিরঞ্জন হাসলেন, 'তোমার তাতে আপত্তি করবার কী ছিল। তুমিও তো তাদের মধুর সঙ্গসান্নিধ্য পেতে। কিন্তু আমার সেই সংগ্রহশালায় শুধু যৌবনবতীরাই নেই। প্রৌঢ় আছেন, বৃদ্ধ আছেন। আমি যাঁদের কাছ থেকে কিছুমাত্র ভালোবাসা পেয়েছি তাঁদের কিছু না কিছু নিদর্শন নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। ফটো না হয় চিঠি না হয় অন্য কোন যৎসামান্য উপহার টুপহার। যা দেখলে আমার সেই হারানো ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। আমার অন্য কোন সেলিব্রেশন নেই। শুধু এই অভিজ্ঞান সঞ্চয়।'

শৈলেশ্বর বললেন, 'আমার স্বভাব ছিল একেবারে বিপরীত। আমি ওসব সঞ্চয় টঞ্চয়ের ধার ধারতাম না। যা যাবার তাকে আমি যেতে দিতাম, যা ভোলবার তাকে আমি ভুলতে দিতাম। নিরু তুমি প্রতিটি প্রীতি প্রতিটি প্রণয়ের প্রবাহকে বুকে আঁকড়ে রাখতে চাও। কিন্তু তা কি সম্ভব ? নাকি তা ভালো ? ভেবে দেখ, সারা দেহটা যদি শুধু বুকই হত, চোখ মুখ নাক কান কিছুই থাকত না, তাহলে কী কিম্ভূত কিমাকারই না আমরা হয়ে যেতাম। আমাদের হাত আছে পা আছে, আমরা যে বুক সর্বস্ব নই, বুকে ভর দিয়ে আমাদের এগোতে হয় না, জেনো এ এক পরম আশীর্বাদ ?'

'শৈল, তুমি অলঙ্কার দিয়ে কথা বলতে ভালোবাস। বাড়াতে চাইলে বুকটা কি আর অমন বাইরের দিকে থেকে বাড়ে ? তা নয়, ভিতরের দিক থেকে বাড়ে। আমি তো জানি জ্ঞানের যেমন সীমা নেই, যত বাড়াও ততই বাড়ে প্রেমেরও তেমনি সীমা নেই, যত বাড়াও ততই বাড়ে।'

শৈলেশ বললেন, 'ওটা হল তত্ত্ব। আসল তথ্য হল আমরা অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ জীব। আমরা এক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে অন্য স্থানে চরিতার্থতা খুঁজি। আমরা এক বাসনার জায়গায় আর এক বাসনাকে এনে বসাই। আমাদের ভালোবাসা নিত্য বাসা বদলায়।'

নিরঞ্জন বললেন, 'বাসা বদলাতে তুমি যে কী পটু ছিলে তা আমি জানি। তুমি আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে শৈলেশ।'

শৈলেশ্বর হাসলেন, 'আর তুমি বুঝি ভোলনি ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার বিস্মরণ আরো মর্মান্তিক। আমরা দুজনে শহরের দুই প্রান্তে থাকতাম। কিন্তু মনে হত যেন পৃথিবীর দুই প্রান্তে আছি। এই মেরুপ্রমাণ দূরত্ব তুমিই তৈরি করেছিলে শৈলেশ।'

'একা আমাকে দোষ দিতে চাও দাও। এই মামলায় আমি কনটেস্ট করব না। তুমি কি জানো না জীবনের পর্বে পর্বে বন্ধুত্বের ধারা বদলায়, ধরন বদলায়, পদ্ধতি প্রকরণ বদলে বদলে যায়। কখনো কখনো এমনো হয় আমরা পুরোন বন্ধুত্বের স্মরণ কীর্তন ভালোবাসি। কিন্তু বন্ধুর শারীরিক উপস্থিতি পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারিনে। কী করে পারব ? সেই আমি কি আমি আছি ? না কি সেই তুমিই তুমি রয়েছ ? আমরা দুজনেই বদলে গেছি। আর বদলেছি দুই ভিন্নধারায়। আমার লোকান্তর তুমি কি এই প্রথম দেখলে ? তোমার লোকান্তরও কি আমি বার বার লক্ষ্য করিনি ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'অথচ শৈলেশ, আমাদের মধ্যে নারী নিয়ে ঝগড়া ছিল না, যশ নিয়ে ঝগড়াঝগড়ি ছিল না, সম্পত্তি নিয়ে মারামারি ছিল না। আমরা কেউ কারো অনিষ্ট করিনি অশুভ চিন্তাও করিনি।'

শৈলেশ্বর হাসলেন, 'নিরু, নেতি নেতি করে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় শুনেছি। কিন্তু বন্ধুত্ব পাওয়া যায় শুনিনি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তবে কি শত্রুতা করলে পাওয়া যায় ? তাও যায় না। বৈরীভাবের সাধনায় তিন জন্মে মুক্তি ? তা হয় না। শেষের দিকে কী অবস্থা হয়েছিল জানো ? ছেলেবেলায় দেখা ঠাকুরমার তুলসীমঞ্চের কথা মনে পড়ে। গাঁয়ের বাড়িতে উঠোনের পুব দিকে ছিল সেই তুলসী গাছ। চৈত বোশেখ মাসে মাটি ফেটে একেবারে চৌচির। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই।গাছ শুকিয়ে দাঁড়া।

পাতাগুলি কবে ঝরে গেছে। ডালগুলি মরা মরা। তবু সেই গাছের মাথার ওপরে মাটির ঘট ফুটো করে ঠাকুরমা ঝরা বেঁধে দিতেন। ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ত। কোন গাছ বাঁচত, কোন গাছ বাঁচত না।'

শৈলেশ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের গাছ কি বেঁচেছে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'কী জানি। হঠাৎ তোমার মারা যাওয়ার খবব শুনে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুড়ো বয়সে আমার হৃদয় শুকিয়ে ঠাকুমার সেই গ্রীষ্মের তুলসী মঞ্চ হয়ে রয়েছে। এক ফোঁটা জলও বেরোবে না। কিন্তু বেরোল। কোত্থেকে যে আষাঢ়ের বর্ষণ নামল বুঝতেই পারলাম না। তোমার স্ত্রীকে কাঁদতে দেখলাম, ছেলেকে কাঁদতে দেখলাম। আমরাও সপরিবারে কদিন কেঁদে কাটালাম। জানো সপ্তাহখানেক আমার কাজকর্মের কোন শক্তি ছিল না। আমার সবরকমের আসক্তি লোপ পেয়েছিল।'

শৈলেশ্বর বললেন, 'শোক সম্ভোগও সুখ সম্ভোগের মত। বড় ক্ষণস্থায়ী নিরু, বড় ক্ষণস্থায়ী।'

নিরঞ্জন বললেন, 'নিশ্চয়ই ক্ষণস্থায়ী। যা যত তীব্র তা তত ক্ষীণায়ু। শোক ক্ষণস্থায়ী বলেই তো আমাদের এই কর্মজীবন দীর্ঘস্থায়ী। আমরা কাজ করতে করতে শত বছর বেঁচে থাকতে চাই, শোক করতে করতে বেঁচে থাকতে পারিনে। কীই বা ক্ষণস্থায়ী নয়? প্রেম বল বন্ধুত্ব বল ক্ষণায়ু বলে কি তাদের মাহাত্ম্য কম? তারা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মাহেন্দ্রক্ষণ।'

শৈলেশ্বর হাসলেন, 'এবার পথে এসো। আমিও তো তাই বলি। আবার আমরা সর্ব্বেবানুমতঃ সুহৃদ হলাম। তা তো হল। কিন্তু আমার অতবড় ছবিখানা নিয়ে তুমি কী করবে? কোথায় টানাবে বলতো? যেখানেই টানাও মানাবে না। কী কববে ভেবে দেখ। বেচে দেবে? না কি বেচারা সলিলকে ফিরিয়ে দেবে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার ছবি তবু আমি বয়ে নিয়ে এলাম। ঘরে এনে রাখলাম। যেখানে পারি রাখব, যতদিন পারি রাখব। কিন্তু আমার ছবি কোনদিন তুমি তোমার ঘরে নিয়ে যেতে পারবে না। সামান্য বন্ধুকৃত্যও তোমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। বন্ধু, এইখানেই তোমার ওপর আমার জিৎ।'

শৈলেশ্বর পরাজয় স্বীকার করে চুপ করে রইলেন। তাঁর আর কোন কথা শোনা গেল না।

নিরঞ্জন নিজের মনে ভাবতে লাগলেন। শুধু শৈলেশের বাড়িতে কেন মৃত্যুর পরে কারো ঘরেই হয়তো তাঁর কোন ছবি থাকবে না, স্মৃতি থাকবে না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কারো মনে তিনি তেমন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেননি। হয়তো তাঁর সমস্ত ভাবের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা অভাববাচক কিছু আছে। নতুন করে কিছু আর হওয়ার আশা নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি। মৃত্যুর পরেও কি এইসব থাকবে? এই স্বীকৃতির সাধ আর প্রণয়ের জন্যে কাঙালপণা? পাওয়ার লোভ আর হারাবার ভয়? তিনি জানেন মৃত্যুর পরে একমুঠি ধূলি ছাড়া কিছুই থাকবে না। আর সেই ধূলিও কণায় কণায় বিলীন হয়ে যাবে। একটি কণাকেও আর আলাদা করে চেনা যাবে না।

নিরঞ্জন ভাবলেন, 'মৃত্যুর পরে কী যে হয় মানুষ তা নিশ্চিত করে জানতে পারে না। কিন্তু এই জীবনেই সেই মহামৃত্যুর, মহামুক্তির, মহা পাণ্ডিত্বের স্বাদ সে ক্ষণে ক্ষণে পায়।'

ফিরে দেখা

বড় রাস্তার ধারে বাইরের দিকের এই ছোট্ট ঘরখানি নিজেই বেছে নিয়েছেন সুরপতি। অন্দরমহল থেকে এইঘর আর পাশের বসবার ঘরখানি আলাদা। ভিতর বাড়ির কোলাহল, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি চেঁচামেচি যে এঘরে একেবারে এসে না পৌঁছায় তা নয় কিন্তু পশ্চিমের দরজা বন্ধ থাকলে খুব বেশি শান্তিভঙ্গ করতে পারে না। সুরপতি আত্মীয়স্বজন লোকজন যে পছন্দ করেন না তা নয় কিন্তু পড়ন্ত বয়সে এসে একটু নিরিবিলি থাকতেই ভালো লাগে। সুরপতি লক্ষ্য করেছেন অনুভব করেছেন তাঁর ভাই আর ভাইপোরাও চায় তিনি নিরিবিলিতেই থাকুন। তারা যে

তাঁকে ভালোবাসে না তা নয় কিন্তু তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেও ভালোবাসে। একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও সংসারের দৈনন্দিন ঐকতানে সুরপতি আর নিজেব গলা মেলাতে পারেন না। বয়স রুচি প্রবৃত্তি প্রবণতার যে ব্যবধান তা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। রাস্তার ধারের ঘরখানিতে সুরপতি নিজের একাকীত্ব নিয়ে থাকেন। সেই একাকীত্ব সব সময় যে উপভোগ্য তা নয়। 'আমি বর্জিত পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত', বৃদ্ধ বয়সের এই অনুভূতি তাঁকেও মাঝে মাঝে পীড়িত করে। কিন্তু এই পীড়া মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। পড়াশুনোর অভ্যাসটা একেবারে যায়নি। সময় কাটাবার জন্যে বইপত্র আছে। বাইরে থেকে বন্ধু-বান্ধব কেউ এলে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেন। যদিও আগন্তুকদের সংখ্যা ইদানীং খুব কমে গেছে। এখন তাঁরা কালেভদ্রে আসেন। শরীর সুস্থ থাকলে সুরপতি নিজেও বেড়াতে টেরাতে বোরোন। বেরোতে না পারলেও বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ সময় কেটে যায়।

একটু দূরেই গঙ্গা। জানলা খুললে দরজা খুললেই জলধারা চোখে পড়ে। ছোটছোট নৌকো চলাচল করে। লঞ্চ যায়, জাহাজও মাঝে মাঝে। যখন কোন জলযানই থাকে না তখনো জলস্রোত থাকে। নদীকে ভালোবাসেন সুরপতি। শান্ত স্নিগ্ধ জলধারা। এ নদীতে তিনি কখনো প্লাবন দেখেননি। নদীর প্রলয়ঙ্করী মূর্তির সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় নেই তা নয় কিন্তু সে অন্য জায়গায়, জীবনের অন্য পর্বে।

গঙ্গার ধার দিয়ে যে দীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ চলে গিয়েছে সেই পথ আর পথিকদের দেখেও সময় কাটানো যায়। এ পথেও যান-বাহনের অন্ত নেই। ঘোড়া আজকাল ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। কিন্তু গাড়ি নানা ধরনেরই আছে। সাইকেল, স্কুটার, মোটব-বাইক, মোটরগাড়ি, যাত্রীবোঝাই বাস, মালবোঝাই লবি। এইসব যানবাহনের শব্দে সুরপতির আজকাল আর কোন অসুবিধা হয় না। কানে সয়ে গেছে। তিনি নানা ধরনের কর্কশ শব্দের মধ্যেও তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন, কি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। তাঁর নিদ্রারও ব্যাঘাত হয় না, শান্তিরও ব্যাঘাত হয় না।

স্কুটারে করে একটি পাঞ্জাবী তরুণ দম্পতী তাঁর ঘরের সুমুখ দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী। যুবকটি সুপুরুষ। ওরা বোধহয় এপাড়ায় নতুন এসেছে। রোজই এই বিকাল বেলায় বেড়াতে বেরোয়। মেয়েটি স্বামীর খুবই অনুগতা। পড়ে যাবার ভয়েই হোক আর অগাধ ভালোবাসাতেই হোক স্বামীকে সে লতার মত বেষ্টন করে থাকে। ওদের স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে হয় সুরপতির। অবশ্য অন্য সম্পর্কও হতে পারে। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে কি নারী-পুরুষের সম্পর্ক থাকে না? কিন্তু যে সম্পর্কই হোক ওরা গভীর আর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

এই পঞ্জাবী তরুণ দম্পতী সুরপতিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। চমক ভাঙল তাঁর ঘরের দরজায় একখানা সাদা রঙের অ্যামবাসাডরকে সশব্দে থেমে যেতে দেখে।

গাড়ির ভিতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তারপর এগিয়ে এসে সরাসরি সুরপতিকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি সুরপতিবাবু থাকেন?'

সুরপতি ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দোরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার নামই সুরপতি দত্ত। আপনি? আপনাকে তো ঠিক চিনতে—'

মহিলাটি একটু হেসে বললেন, 'তোমাকেও আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি। মাথায় একগাছিও চুল নেই। মুখের আদল একেবারে বদলে গেছে। আর কি রোগাই না হয়েছ। —আমি সর্বাণী।'

'সর্বাণী!'

'হ্যাঁ আমি সেই সর্বনাশিনী।'

সুরপতি ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি তত বদলাওনি। শুধু চুলে সামান্য পাক ধরেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

সর্বাণী বললেন,'আমিওকি বিশ্বাস করতে পারছি?' তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাজেন তুমি বরং গাড়িটা ওই বটতলায় পার্ক করে রাখো। ওখানে জায়গা আছে। যাওয়ার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

বিনা আমন্ত্রণেই সবর্ণী ঘরে ঢুকলেন। ঘরে খান দুই চেয়ার আছে। কিন্তু সবর্ণী চেয়ারে বসলেন না। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে যে ছোট একখানি খাট পাতা রয়েছে তাতে পা ঝুলিয়ে বসলেন। যেন এঘর ওঁর খুব পরিচিত যে এঘরে ওঁরও অধিকার আছে। মেয়েরা কত অভিনয়ই করতে পারে।

সুরপতি লক্ষ্য করলেন সবর্ণী খুঁটে খুঁটে ঘরের আসবাবপত্রগুলি দেখছেন। আসবাবের মধ্যে এঘরে কীই বা আছে। জামাকাপড় রাখার একটা আলনা, বইয়েব র‍্যাক, লেখাপড়ার জন্যে ছোট একখানা টেবিল। দেখার মত কিছু নেই। কিন্তু অন্য কিছু করবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না বলেই কি সবর্ণী সুরপতির ঘরের জিনিসপত্র দেখার দিকে মন দিয়েছেন?

সুরপতিও সবর্ণীকে দেখতে লাগলেন। মাথার চুলে সামনের দিকে একটু পাক ধরলেও দেহের আর কোথাও যেন তেমন একটা বয়সের চিহ্ন পড়েনি। গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রায় তেমনি আছে। একটু পুষ্টাঙ্গী হলেও বয়সের তুলনায় তা বেমানান নয়। যৌবন চলে গেলে শ্রীসৌন্দর্য বাড়ে না কিন্তু সবর্ণীর চেহারায় চালচলনে অভিজাত ঘরের গৃহিণীর পবিচয় রয়েছে। অথচ বেশবাসে কোন আড়ম্বর নেই। সবর্ণীর পরনে লাল পেড়ে সাদাখোলের শাড়ি। নিরাভরণা নয়, হাতে গলায় কানে সামান্য আভরণ আছে। তার চেয়েও বেশি করে চোখে পড়ল সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা। সেই রেখা দেখে সুরপতির বুকের মধ্যে একটি রক্তাক্ত আঁচড় পড়ল। সধবা রমণীর এই সিঁদুর শোভা সুরপতির জন্য নয়। এই কল্যাণ চিহ্ন অন্য পতির জন্যে, অন্য পুরুষের দীর্ঘায়ু কামনায়।

দেয়ালের আলনা থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলেন সবর্ণী। তারপর সুরপতির দিকে চেয়ে বললেন, 'কী দেখছ?'

সুরপতি একথার কোন জবাব দিলেন না। বরং আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

সবর্ণী একটু ইতস্তত করে বললেন, 'শিবুদার কাছে। তিনি তো তোমার এখানে আসেন মাঝে মাঝে।'

সুরপতি বললেন, 'মাঝে মাঝে নয়, বছরে দু' একবার আসে। আর পেনসনের টাকা আনার সময় যখন কলকাতায় যাই তখনো কোন কোনবার দেখা হয়ে যায়। শিবুই বুঝি তোমাকে আমার কথা বলেছে? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে বুঝি? আমি ওর নাম দিয়েছি কিং অব কমিউনিকেশন।'

সবর্ণী বললেন, 'হ্যাঁ তিনিই বলেছেন তোমার কথা। তবে যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে আমার নেই। আমার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন তুমি খুব অসুস্থ।'

সুরপতি একটু চুপ করে থেকে কী যেন মনে করবার চেষ্টা করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'সে যেদিন এসেছিল তার দুদিন আগে থেকে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। টানটা সেদিন খুব বেশি ছিল। অ্যাজমার রোগীকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছে মৃত্যুশয্যা। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ মরিনি, গা ঝাড়া দিয়ে আবার উঠে বসেছি।'

সবর্ণী মৃদুস্বরে বললেন, 'মরবে কেন? কিন্তু আমি শুনেছি তুমি রোগ পুষে রাখছ। রোগের কোন চিকিৎসা করাচ্ছ না। শুধু অ্যাজমাই নয়, তোমার ডায়বেটিস আছে, ব্লাডপ্রেসার আছে—'

সুরপতি বললেন, 'শিবেশের কাছ থেকেই বোধহয় এসব শুনেছ। ওর পেটে কথা থাকে না। সে-ই বোধহয় তোমাকে আসতে বলেছে।'

সবর্ণী সুরপতির দিকে তাকালেন। তারপর তেমনি মৃদুস্বরে বললেন, 'না তিনি আমাকে আসতে বলেননি। কেউ বলেনি। আমি নিজেই এলাম।'

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এলে?'

এ প্রশ্নের জবাব দিতে সবর্ণীর একটু সময় লাগল। আর সেই সময়টুকুতে চল্লিশ বছর আগের জীবনের একটি অধ্যায়ে পরিক্রমা করতে শুরু করলেন সুরপতি। এর আগেও কতবার যে স্মৃতিচারণ করেছেন তার ঠিক নেই। সেই দুঃখ লজ্জা গ্লানি পরাভবের কাহিনী কতবার যে বিস্মৃত হতে চেয়েছেন তারও কি হিসাব আছে?

মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমের সেই শহরটিতে বদলি হলেন সুরপতি।

মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে করেছেন। অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী। একই পাড়ার মেয়ে। সুরপতি তাকে ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন। সবুও দেখেছে, হেসে কথা বলেছে, অল্প-স্বল্প ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে। কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখার ধরন যে বদলে গেছে তা দুজনেই জানেন, দুজনেই সে সম্বন্ধে সচেতন।

কোন পক্ষের অভিভাবকদেরই অমত নেই। পালটি ঘর। শুধু একটি আপত্তি থাকলেও থাকতে পারত। সবুর বাবার অবস্থা তেমন ভালো নয়। তেমন দিতে থুতে পারবেন না। সুরপতির বাবা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে ? পণ-যৌতুক নিয়ে আমি কি করব ? আমি ওই মেয়েটিকে ঘরে আনতে চাই। ও আমার ঘর আলো করে থাকবে। তাছাড়া আমার ছেলেরও যখন পছন্দ।'

বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের আগে সবণীর মুখে যে হাসি ছিল যে আনন্দধারা ওর চোখমুখ থেকে উপচে পড়ত তা যেন আর নেই।

সুরপতি তাকে আদরে সোহাগে অস্থির করে তোলেন। দরকার নেই তবু শাড়ি গয়না সাবান স্নো নিয়ে আসেন। কিন্তু স্ত্রীর মন ওঠে না। তার মুখে হাসি ফোটে না। সবুর কেবলই অভিযোগ তুমি আমাকে ভালোবাস না।

সুরপতি জোর দিয়ে বলেন, 'কেন ভালোবাসব না ? ভালো তো বাসি।'

তারপর সবু শোবার ঘরে নিরিবিলিতে গভীর রাত্রে একদিন সোহাগ করে বলল, 'আচ্ছা সত্যি করে বলতো তোমার কী হয়েছে। দিদি বউদি সবার কাছেই শুনেছি ফুলশয্যার রাত্রেই তাদের—আর আমাদের এতদিন গেল—'

সুরপতি গম্ভীরভাবে বললেন, 'একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা। জীবনের সব ব্যাপারে আমি তাঁর উপদেশ নিয়ে চলি। তিনি আমাকে বলেছেন এক বছর যদি আমরা সংযত হয়ে থাকি আমাদের খুব ভালো হবে।'

সবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরপতির বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদে উঠেছিল, 'তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাসো না। সন্ন্যাসীর কথাই যদি শুনবে তুমি নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে গেলে না কেন ?'

ছেলে আর বউয়ের মধ্যে কিছু একটা গরমিল হয়েছে সুরপতির বাড়ির সবাই তা টের পেলেন। বিশেষ করে মা কাকিমারা। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বললেন না।

সবু চলে গেল বাপের বাড়িতে।

এর মধ্যে সুরপতির বদলির অর্ডার এল। তিনি যেন বেঁচে গেলেন।

সবুর আবার কান্না। 'তুমি আমাকে একা—'

সুরপতি বললেন, 'তোমাকে এখনই কোথায় নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে যারা বদলি হয়েছে তারা কেউ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না। আগে বাসাটাসা ঠিক করি তারপর তোমায় নেব।'

নতুন শহরে গিয়ে মেসে উঠলেন সুরপতি। মাসের পর মাস গেল। বাসা আর ঠিক হয় না। স্ত্রীকে কেবল চিঠির পর চিঠি লেখেন। দামি রঙীন কাগজে সোহাগ আর ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর মাঝে মাঝে সেই সন্ন্যাসীর উপদেশের কথা স্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেন।

'সবু, তুমি শুধু একটা বছর সবুর কর।'

কিন্তু সবণীব ধৈর্য কম। সে তিন মাসেব মাথায় তার দাদাকে নিয়ে সুরপতির মেসে এসে হাজির।

সুরপতি অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, 'কী মুশকিল বাধালে বল দেখি। বলা নেই কওয়া নেই এমন হুট করে চলে এলে এখন তোমাকে কোথায় রাখি বলতো।'

শিবেশ হালদার সুরপতির সহকর্মী বন্ধু। মেসের একই ঘরে থাকে। যেমন আড্ডাবাজ তেমনি ফক্কর। সে সুরপতির মাথার তালুতে হাত রেখে বলল, 'কেন, এখানে রাখবে।'

শিবেশ করিৎকর্মা ছেলে। পরদিনই বাসা খুঁজে বের করল। বড় বড় দুখানা ঘর। রান্নাঘর

বাথরুম। প্রশস্ত উঠোন। একধারে বাঁধানো পাতকুয়ো। ছাদ আছে, সন্ধ্যার পর যতখুশি বসে গল্প করা যায়।

সবাণী মনের মত করে ঘর সাজাল। অতিথিদের জন্য বসবার ঘরখানা মনোরম করে তুলল। জানালায় দরজায় রঙবেরঙের পর্দা, উঠোনে রঙবেরঙের ফুলের টব।

কিন্তু নারীর মুখপদ্মের সেই অম্লান শোভাটুকু কোথায় ? তা ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে আচ্ছন্ন। অপরূপ দুটি ভ্রূ প্রায়ই কুঞ্চিত হয়ে থাকে।

ক্রমে সবাণীর মুখ ফুটতেও শুরু করল, 'তুমি ডাক্তার দেখাও। তোমার সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী সব বাজে কথা।'

শিবেশকে নিয়ে ডাক্তার অনেক আগে থেকেই দেখাতে শুরু করেছিলেন। সামরিক বিভাগের সবচেয়ে বড় ডাক্তার। তিনিও বাঙালী। শহরের নামকরা লোক।

তিনি দেখেশুনে মুখ গম্ভীর করেছিলেন। বলেছিলেন 'এ তো ব্যাধি নয়, জন্মগত অর্গানিক ডিফেক্ট। এই অসম্পূর্ণতা সারবার নয়। তুমি জেনেশুনে কেন বিয়ে করলে ? কেন মেয়েটার সর্বনাশ করলে ?'

ডাক্তারের ফী মিটিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁর কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না সুরপতি। বিয়ে করা উচিত হয়নি তা তিনি জানেন। কিন্তু মুখে কি সেকথা স্বীকার করা যায় ? ছেলেবেলা থেকে যে মেয়েটি তার নয়ন হরণ করেছে মনোহরণ করেছে তাকে হাতছাড়া করা অতই সহজ ? তাছাড়া সাধু-সন্ন্যাসীরা তাকে অন্যরকম ভরসা দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মন্ত্রতন্ত্র গাছগাছড়া মাদুলী কবচের ফল অবশ্যই ফলবে তবে সময় লাগবে।

আরো এক ধরনের কূটযুক্তি সুরপতির মনের মধ্যে তখন জুড়ে বসেছিল। যে দোষে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেও তো তাঁর নিজের দোষ নয়। সেও এক ধরনের দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য শুধু কি তাঁকেই দগ্ধ করবে ? আরো একজনকে করুক। এ যেন ভাগ্যের উপর এক হাত নেওয়া। খোদার ওপর খোদকারি।

বাসা করবার পর থেকেই সবাণীর দ্বিচারিতা লক্ষ্য করলেন সুরপতি। সে অতিথিদের সামনে বন্ধুদের সামনে প্রতিবেশীদের সামনে একরকম সুরপতির কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাইরে হাসিখুশি আনন্দ উল্লাস ছাড়া যেন আর কিছু জানে না। তার হাতের রান্না মধুর মুখের কথা মধুর গতি ভঙ্গিতে মধু নিংড়ে পড়ে কিন্তু সুরপতির সঙ্গে একান্তে যখন তার দেখা হয় তখন সে বিষকন্যা। তার দৃষ্টিতে ক্রূরতা কণ্ঠে বিষ আচারে আচরণে কোথাও যেন কোন মমতা নেই। যে ছিল মোহিনী সে হল নাগিনী। তার বিষের জ্বালায় ছটফট করতে থাকেন সুরপতি।

বন্ধু শিবেশই একমাত্র ওঝা। সে আড়ালে আবডালে সবাণীকেও বোঝায় সুরপতিকেও বোঝায়। কিন্তু হতাশায় তাকেও মাঝে মাঝে অবসন্ন দেখা যায়। তার মুখেও নৈরাশ্যের বাণী ফোটে, 'ভাই তোমার অশান্তি দূর করা শিবেরও অসাধ্য। এই সমস্যার কী যে সমাধান আমি তো ভেবে পাইনে।'

তারপর সমাধান একেবারে নিজে পায়ে হেঁটে সুরপতির বাড়িতে এসে ঢুকল। প্রথমে বাইরের ঘরে তারপর ভিতরের ঘরে।

তার নাম নীরদ মুখার্জি। বয়সে সুরপতির চেয়ে বেশ ছোট। চাকরিতেও জুনিয়র। কিন্তু যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য তেমনি বলতে কইতে ওস্তাদ। দুদিনেই সে শহরের বাঙালীপাড়া জয় করে বসল। সবাণী যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শিবেশ আর সুরপতি হাজার বিধিনিষেধ আরোপ করেও কিছু করতে পারলেন না। ঝি চাকরের পাহারা বসিয়েও ব্যর্থ হলেন। তাঁরা হাঁটেন ডালে ডালে ওরা হাঁটে পাতায় পাতায়। সবাণীর গোপন অভিসারের নিত্যনতুন কলাকৌশল দেখে সুরপতির শিরায় শিরায় বৃশ্চিক হেঁটে বেড়ায়।

তারপর যা গোপন ছিল তা প্রকাশ্যে শুরু হল। সবাণীর ভাব দেখে মনে হল সে আর কোন আড়াল আবডাল রাখতে চায় না। কি আড়াল আবডাল রাখার মত তার ধৈর্য নেই। সুরপতির সামনেই সে নীরদকে আদর সোহাগ করে। অন্তত করতে উদ্যত হয়।

সুরপতিকে দেখলে ধমক দিয়ে বলে, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ ? যাও না বাইরে

যাও না।'

নীরদ ওই কথাটারই একটি মধুর সংস্করণ উপহার দেয়, 'যান না সুপরতিদা, শিবেশদার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসুন। আপনি তো বেড়াতে টেরাতে ভালোই বাসেন।'

সুরপতি মনে মনে গজরাতে থাকেন।

ক্রমে নীরদের আসন সুরপতির বাসায় আরও পাকাপোক্ত হল। সুরপতি যেন বাইরের লোক নীরদই আসল গৃহপতি। তার আদর যত্নের অন্ত নেই। সর্বাণী পারে তো আঁচল দিয়ে তার পা মুছে দেয়। পায়ের কাঁটা তুলে দেয় দাঁত দিয়ে।

সুরপতি প্রতিবাদ করলে সর্বাণী তাঁকে প্রচণ্ড ধমকে থামিয়ে দেয়, 'তুমি চুপ কর। তোমার কীর্তি কলাপের কথা আর বলো না। আর কেউ হলে লজ্জায় আত্মহত্যা করত।'

সুরপতি জানেন সর্বাণী এখন তাঁর মৃত্যু কামনা করেন। তিনিও ওদের দুজনের মৃত্যু চান। কিন্তু কেউ কাউকে মারতে পারে না। কিন্তু পরস্পরকে প্রায় প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু যন্ত্রণা দেয়।

সেই মিতভাষিণী অমৃতভাষিণী সর্বাণী একেবারে বদলে গেছে। ঝগড়ার শুরুতেই তার মুখ থেকে খিস্তি বেরোয়। এমন অশালীন অশ্রাব্য কথা বলে, জীবিকার জন্যে যেসব মেয়ে রাস্তায় দাঁড়ায় তারাও যেন তা বলতে পারে না।

তারপর একদিন ওদের হাতে হাতে ধরে ফেললেন সুরপতি। তাঁরই শোবার ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরের মুখ চুম্বন করছিল।

সুরপতির আর সহ্য হল না নীরদের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বেরোও।'

নীরদ প্রথমে একটু অপ্রতিভ হল। তারপর সুরপতির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাড় ফুলিয়ে বিদ্রূপ বিকৃত মুখে বলল, 'আমার গায়ে হাত তুললে এর ফল ভালো হবে না কিন্তু। মিথ্যে পৌরুষের বড়াই করতে এসো না। তুমি যে কতবড় পুরুষ তা সবাই জানে। আমি নিশ্চয়ই যাব। গেলে একা যাব না।'

নীরদ বর্ণে বর্ণে কথা রাখল। পরদিন সুরপতি অফিসে গিয়ে নীরদকে দেখতে পেলেন না। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন ঘর খালি। সর্বাণী খালি হাতে যায়নি, সোনাগয়না নগদ টাকা যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছে। পরে সুরপতি জেনেছিলেন ব্যাঙ্কের টাকাও সব তুলে নিয়েছে সর্বাণী। স্ত্রীর নামে সাধ করে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন সুরপতি। সে অ্যাকাউন্ট সর্বাণী ক্লোজ করে দিয়ে গেছে।

বন্ধুর কাছে গভীর আক্ষেপে নালিশ জানালেন সুরপতি, 'কী হীন মীনমাইনডেড ওরা তাই দেখ। আমার টাকাগুলি পর্যন্ত নিয়ে গেল! ওদের বিবেকে বাধল না।'

শিবেশ হেসে বলল, 'আহা বিয়ে করবে, পণযৌতুক নেবে না?'

তারপর বন্ধুকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিল, 'যা সবচেয়ে দামি তাই যখন রইল না, তুচ্ছ টাকাকড়ি সোনাদানার জন্যে আর শোক কোরো না ভাই।'

সুরপতি ভেবেছিলেন মামলা করবেন। কিন্তু বন্ধুরা নিষেধ করলেন, 'মামলায় তুমি জিততে পারবে না।' সুরপতি ভেবেছিলেন চুরির দায়ে ওদের নামে থানায় ডায়েরি করবেন। কিন্তু শিবেশ তাতেও বাধা দিল।

কিছুদিন বাদে খবর এল সিমলায় গিয়ে ওরা সিভিল ম্যারেজ করেছে।

এই অপরাধে নীরদের চাকরি গেল না। বরং চাকরিতে সে উত্তরোত্তর উন্নতি করল। সুরপতিও চাকরি ছাড়লেন না। তবে বদলির জন্যে আবেদন করলেন। সে আবেদন মঞ্জুর হল। কলকাতায় গেলেন না, দিল্লি সিমলাতেও নয়। অজ্ঞাত অখ্যাত কোন ছোট স্টেশনই তিনি চেয়েছিলেন যেখানে আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই যেখানে কোন চেনা মুখ চোখে পড়বে না।

সুরপতি সাধু সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন ঘুরেও ছিলেন তাঁদের পিছনে পিছনে। রোগ মুক্তির জন্য নয় বাসনা মুক্তির আশায়। কিন্তু পুরোপুরি তাঁদের পথে যেতে পারেননি। একবার মুখ ফিরিয়ে উল্টোপথ নেওয়ার তাঁর সাধ হয়েছিল। ভেবেছিলেন দুর্বৃত্ত হবেন, দুরাচারী হবেন, শত্রুতা করবেন সমাজ সংসারের সঙ্গে। দেখলেন তাও তাঁর ধাতে নেই।

দৈহিক অসম্পূর্ণতার পূরণ হয়নি। জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্রে পৌরুষের পরিচয়ই বা দেওয়া হল কই। প্রবল ঘৃণা প্রবল বিদ্বেষ কি প্রবল প্রেম কিছুই দীর্ঘ জীবনকে প্লাবিত করল না। আরও পাঁচজন গৃহস্থের মত তিনিও সাধারণ সুখদুঃখ হাসিকান্নার মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিলেন। শুধু তফাৎ এই, গৃহস্থদের গৃহিণী থাকে অন্তত কিছুকালের জন্যেও থাকে, তিনি গৃহিণীহীন গৃহী। মাঝে মাঝে মনে হয় নারী যেন তাঁর সারাজীবনের প্রতীক। নারী যেমন হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, জীবনও যেন তেমনি হাত ছাড়া। জীবনের কোন কিছুই যেন তিনি শক্তমুষ্ঠিতে ধরতে পারেননি।

অথচ পরিণত বয়সে এসে বুঝতে পেরেছেন যাকে তিনি অভিশাপ মনে করেছিলেন তা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। অন্ধতা খঞ্জতা বধিরতার মতই এও এক ধরনের অঙ্গহীনতা। তার জন্য সারাজীবন হীনমন্যতাকে বয়ে বেড়াবার প্রয়োজন ছিল না।

অতীত জীবনের চল্লিশ বছর ঘুরে আসতে চল্লিশ সেকেণ্ডের চেয়ে বেশি সময় লাগল না সুরপতির। মনোযানের চেয়ে কোন বিমান বেশী দ্রুতগামী ?

তিনি সবাণীর দিকে তাকিয়ে আগের প্রশ্নটি আবার তুলে ধরলেন, 'কেন এলে ?'

সবাণী বললেন, 'দেখতে এলাম।'

সুরপতি কোন জবাব দিলেন না।

সবাণী বললেন, 'আমি শিবুদার কাছে সব শুনেছি। টাকাতো তুমি কম রোজগার করনি কিন্তু হাতে কিছুই রাখোনি। ভাইপোদের পড়িয়েছ, ভাইঝিদের বিয়ে দিযেছ, দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের জন্যে সব বিলিয়ে দিয়েছ।'

সুরপতি মৃদু হেসে বললেন, 'সে তো সবাই করে।'

সবাণী বললেন, 'সবাই করে না। সব দিয়ে থুয়ে হাতখালি করে বসে আছ। যাদের জন্য তারা তোমার দিকে কেউ আর তাকাচ্ছে না।'

সামান্য গুণগান, সহানুভূতি। তবু সুরপতির মনে হল এ যেন প্রেমগুঞ্জনের চেয়েও মধুর।

সুরপতি মৃদু স্বরে বললেন, 'ওসব থাক। তোমার কথা শুনি।'

'কী শুনতে চাও বলো।'

সুরপতি বললেন, 'তুমি সুখী হয়েছ ?'

এ প্রশ্ন যেন অসঙ্গত। তাই সুখের উপকরণগুলির কথা তিনি নিজেই বলে যেতে লাগলেন, 'আমি জানি তোমরা কলকাতায় বাড়ি করেছ, গাড়ি করেছ। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীরদ ব্যবসা বাণিজ্যে নেমেছে। তার গৃহেও লক্ষ্মী, বাণিজ্যেও লক্ষ্মী। তুমি সুখী হয়েছ সবাণী।'

সবাণী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বললেন, 'সেকথা কি কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে ? জীবনে পুরো সুখ কি কারো হয় ?'

সুরপতি বললেন, 'শিবু আমাকে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু একটি কথা বলেনি। আমিও তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কেমন যেন মুখে আটকে গেছে। আজ যদি তোমার কাছে কথাটা জানতে চাই কিছু মনে করবে না তো ?'

সবাণী মুখ তুলে বললেন, 'মনে করবার কী আছে ? বল না।'

সুরপতি তবু একটু দ্বিধান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমাদের ছেলেমেয়ে ক'টি ?'

সবাণীর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। বললেন, 'একটিও না।'

কথাটা শুনে একটু যেন উল্লাস বোধ করলেন সুরপতি। তিনি ওকে দৈহিক সুখ দিতে পারেননি, নীরদও ওকে সন্তান সুখ দিতে পারেনি। পরক্ষণে নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হলেন সুরপতি। একটু সহানুভূতির সুরে বললেন, 'হলে ভালো হত। এতদিনে নাতিনাতনীতে ঘর ভরে যেত।'

সবাণীও চুপ করে রইলেন।

সুরপতি ভাবলেন নিঃসন্তান হওয়ার দুঃখই কি ওর একমাত্র দুঃখ ? কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না, পাছে আর কোন অপরাধ করে বসেন। পাছে আর কোন দুঃখের কথা শুনে

নিজের মনে সুখবোধ হয়। মনের অগোচরে তো পাপ নেই।

সবর্ণী ততক্ষণে লালরঙের বেশ একটু বড় আকারের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানি চেক বই আর কালো রঙের ফাউন্টেন পেন বের করলেন। তারপর সুরপতির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি আমার সব কথা শুনলে, এবার আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।'

'বল কি অনুরোধ।'

সবর্ণী বললেন, 'সেদিন আমি তোমার ঘরের সব নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। নিঃস্ব করে রেখে গিয়েছিলাম তোমাকে। আজ সব ফিরিয়ে দিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। কিন্তু তুমি কিছু অন্তত নাও।'

সুরপতি বললেন, 'না সবর্ণী।'

'না কেন? তোমার চিকিৎসার দরকার, ওষুধ-পথ্যের দরকার। এ টাকা তো তোমারই।'

চেকে সুরপতির নাম লিখতে উদ্যত হলেন সবর্ণী।

কিন্তু সুরপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'না।'

তারপর হাত বাড়িয়ে এই প্রথম তিনি পরস্ত্রীর কোমল সুন্দর হাতখানি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বললেন, 'না। তুমি যে দিতে চেয়েছ এই যথেষ্ট। তুমি যে এসেছ এই যথেষ্ট। জীবনে যে আর একবার দেখা হল এই যথেষ্ট। আর আমার কিছুতে দরকার নেই।'

ছলছল চোখে আর একজোড়া ছলছল চোখ দেখতে পেলেন সুরপতি।

সেই প্রথম শুভদৃষ্টির পর জীবনে শুভ বলতে কিছু আর ছিল না। দুজনের মাঝখানে ছলনা বঞ্চনার পাহাড় জমে উঠেছিল। আজ আবার দ্বিতীয়বার দৃষ্টি বিনিময় হল। এখন কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করবারও নেই প্রবঞ্চিত হবার ভয়ও আর নেই।

সুরপতি ভাবলেন, 'এই যথার্থ শুভদৃষ্টি।'

না ডাকতেই রাজেন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে। গাড়ির ভিতর থেকেই সে বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে যে মা।'

সবর্ণী সাড়া দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ চল যাই।'

সুরপতির দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে চলি।'

সুরপতি দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পথের বাঁকে যতক্ষণ না গাড়িখানা মিলিয়ে গেল তিনি তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল কান পেতে রইলেন।

বাড়ির চাকর যোগরাজ এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। একটু অনুযোগের সুরে বলল, 'কর্তাবাবু কিছু খেলেন না। বউদিরা সব সিনেমায় গেছেন। ফিরে এসে শুনতে পেলে রাগ করবেন।'

যোগরাজকে তিনি আরো দু-একবার ঘরের সামনে দেখেছেন। কিন্তু সেও ঢুকতে সাহস পায়নি, আলাপে ব্যাঘাত হবার ভয়ে তিনিও তাকে ডাকেননি।

আশ্চর্য! সবর্ণীকে এক কাপ চা খেতে বলার কথাও মনে পড়েনি তাঁর।

একবার ভাবলেন, ওকেই একটু তিরস্কার করবেন।

'তুই তো বলতে পারতি। বাড়িতে কেউ এলে একটু আদর যত্ন করতে হয়।'

কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন সুরপতি।

যোগরাজ যদি বলে, 'কই বাবু কেউ তো আসেনি। আপনি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলেন। আপনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন, দিনের বেলায় জেগেও স্বপ্ন দেখেন, তেমনি কিছু একটা দেখেছেন।'

যদি বলে! ওকে কিছু না বলাই ভালো।

সত্যি, নিজের ভিজে চোখ ছাড়া সে যে এসেছিল তার আর তো কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই!

শ্রাবণ ১৩৮১